ভারতের সাধক

ভারতের সাধক

(১১শ খণ্ড)

শঙ্করনাথ রায়

করুণা প্রকাশনী । কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ

ভাদ্র ১৩৬৫

প্রকাশক

বামাচরণ মুখোপাধ্যায়

করুণা প্রকাশনী

১৮এ, টেমার লেন

কলিকাতা-৯

মুদ্রাকর

অনিলকুমার ঘোষ

দি অশোক প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

২০১এ, বিধান সরণী

কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদশিল্পী

সুপ্রকাশ সেন

যামুনাচার্য

দশম শতাব্দীর তৃতীয় পাদ। দাক্ষিণাত্যে পাণ্ড্যরাজের সভায় এ সময়ে আচার্য বিদ্বজ্জন-কোলাহলের প্রবল প্রতাপ। রাজা এই পণ্ডিত শিরোমণিকে গভীরভাবে শ্রদ্ধা করেন, মান্য করেন গুরুর মতো। দেশের শ্রেষ্ঠ শাস্ত্রবিদ্‌দের প্রায়ই আহ্বান করিয়া আনা হয়, রাজসভায় আচার্য কোলাহলের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয় তাঁহাদের তর্কদ্বন্দ্ব। এইসব তর্কসভার পরিচালনায় পাণ্ড্যরাজের উৎসাহ উদ্দীপনার অবধি নাই। রাজ্যের জ্ঞানীগুণীরা সেখানে আমন্ত্রিত হইয়া আসেন, আর তাঁহাদের সমক্ষে, তুমুল উত্তেজনার মধ্যে, তর্কশূরেরা একে অন্যকে আক্রমণ করিতে থাকেন।

প্রতি ক্ষেত্রেই জয়ী হইতে দেখা যায় শক্তিমান্ ক্ষুরধারবুদ্ধি আচার্য কোলাহলকেই। সভার শেষে রাজা পরম সমাদরে তাঁর সভা-পণ্ডিতের গলায় অর্পণ করেন পুষ্পমাল্য, রাজকোষ হইতে দান করেন প্রচুর অর্থ। শুধু তাহাই নয়, রাজার বিধান অনুসারে তর্কে পরাজিত পণ্ডিতেরা পরিণত হন আচার্য কোলাহলের সামন্ত পণ্ডিত রূপে এবং এই পণ্ডিত সম্রাটকে প্রতি বৎসর তাঁহারা প্রেরণ করেন সম্মান-দক্ষিণা।

সেদিন নিজের ভবনে বসিয়া আচার্য কোলাহল তাঁহার হিসাবের খাতাটি দেখিতেছিলেন। হঠাৎ তিনি বড় গম্ভীর হইয়া পড়েন, তখনি ভারপ্রাপ্ত শিষ্য বন্‌জিকে সেখানে ডাকাইয়া আনেন।

রুষ্টস্বরে আচার্য বলেন, "বন্‌জি, তুমি যে এতটা অকর্মণ্য তা আমার জানা ছিল না। আজ তিন বৎসর যাবৎ পণ্ডিত ভাষ্যাচার্য আমার বাৎসরিক সামন্ত-কর দেয় নি, তা তুমি জানো?"

হিসাবের খাতাটির দিকে একবার তাকাইয়া শিষ্য বন্‌জি নিরুপায়ভাবে তখন মাথা চুলকাইতেছেন। আচার্য এবার ক্রুদ্ধস্বরে

বলিয়া উঠেন, "শোন, কালই তুমি ভাষ্যাচার্যের গৃহে যাও। বকেয়া পাওনা কড়ায় গণ্ডায় আদায় ক'রে নিয়ে এসো। নতুবা আমার এখানে তোমার স্থান নেই।"

"আজ্ঞে, কয়েক বৎসর ক্ষেতে শস্য হয় নি বলে ভাষ্যাচার্য আপনার পাওনা টাকা বাকী ফেলেছেন। বার বার তাগাদা দিয়েছি আমি, কিন্তু কোনো ফল হয় নি।"

"একটা ফল অবশ্যই হয়েছে। দেখে এসো গিয়ে, ঐ অঞ্চলটের লোকেরা ইতিমধ্যেই বলাবলি শুরু ক'রে দিয়েছে, 'ভাষ্যাচার্য আর আজকাল সামন্ত-কর দিচ্ছেন না, হয়তো রাজপণ্ডিত দিগ্‌বিজয়ী কোলাহলের বশ্যতা থেকে তিনি মুক্ত হয়েছেন।' আর তারা এটা বলতে পারছে, বনজি, তোমারই মূর্খামির জন্যে।"

পরের দিনই গুরুর প্রতিনিধি হিসাবে বনজি ভাষ্যাচার্যের চতুষ্পাঠীতে গিয়া উপস্থিত। আচার্য গ্রামান্তরে এক শিষ্যের বাড়িতে গিয়াছেন, কাল ফিরিবেন। প্রবীণ পড়ুয়ারা কোথায় বেড়াইতে গিয়াছে। চতুষ্পাঠীতে আচার্যের আসনের কাছে বসিয়া শাস্ত্র পাঠে রত শুধু দ্বাদশ বৎসরের পড়ুয়া বালক যামুন।

বনজী ঘরে ঢুকিয়াই রুক্ষস্বরে প্রশ্ন করে, "ওরে ছোক্‌রা, তোদের আচার্য কোথায় পালিয়েছেন, বল্‌তো।"

"কে আপনি? এত বাজে বকছেন কেন? আচার্য পালাতে যাবেন কেন? কার ভয়ে?" ক্রুদ্ধস্বরে উত্তর দেয় যামুন।

"আমি পণ্ডিত বনজি, রাজপণ্ডিত বিদ্বজ্জন-কোলাহলের শিষ্য। তোর গুরুর সামন্ত-কর তিন বৎসরের বাকী পড়েছে, তিনি তা খেয়ে বসে আছেন। জানিস তো, এ টাকা আদায় না দিলে রাজার আদেশে তোদের চতুষ্পাঠী উঠে যাবে।"

ক্রোধে উত্তেজনায় বালক পড়ুয়া যামুনের শরীর তখন থরথর করিয়া কাঁপিতেছে। দৃঢ়স্বরে সে উত্তর দেয়, "ভাখো বনজি, আমার বুঝতে বাকী নেই, তোমার আচার্য দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিত হতে পারেন, বিদ্বজ্জন-কোলাহল উপাধি তাঁর থাকতে পারে, কিন্তু বিদ্যা বস্তুটি

তাঁর ভেতরে আদৌ নেই। আর তাঁর ছাত্র তুমি যে একটি গণ্ডমূর্খ, তা তোমার বচন ও বাচন ভঙ্গীতেই প্রকাশ পাচ্ছে।"

"এতবড় স্পর্ধা তোর, ছোকরা! সামনে দাঁড়িয়ে যা-তা বলে যাচ্ছিস। আচার্য কোলাহল যে কে, কি তাঁর প্রতাপ, তা তুই জানিসনে। জানে তোর গুরু। যাক্, এই আমি বলে দিয়ে যাচ্ছি, এ চতুষ্পাঠী আমি মাটিতে মিশিয়ে দিয়ে তবে ছাড়বো।"

"তা তোমার যা সাধ্য তা করতে পারো। কিন্তু এটা জেনে রেখো, তোমার গুরু যে বিদ্যাহীন, আমার একথাটি পরম সত্য।"

"তার মানে?" মারমুখী হয়ে রুখে দাঁড়ায় বনাঞ্জ।

বিদ্যা অখণ্ড বোধ এনে দেয়, সমদর্শিতা দেয়, বিনয় দেয়। সবভূতকে বেঁধে নেয় স্নেহ প্রেমের ডোরে। সে বিদ্যা তোমার আচার্যের নেই। আরো শুনে নাও মূর্খ! বিদ্যা হচ্ছে আত্মজ্ঞানের আলো, ঐশ্বরীয় আলো, এ আলো যিনি পেয়েছেন তিনিই হচ্ছেন বিদ্বান্। তোমার আচার্য দুর্ভাগা, কূট তার্কিকতার ভাগাড়ে পড়ে তাই কেবলই খাবি খাচ্ছেন।"

বনাঞ্জ ক্ষিপ্তপ্রায় হয়, চতুষ্পাঠী হইতে বাহির হইয়া আসে। চীৎকার করিয়া গালমন্দ করিতে থাকে জঘন্য ভাষায়।

বালক পড়ুয়া যামুন এবার প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়ায়, দৃঢ় সংযত কণ্ঠে বলিয়া ওঠে, "শোন বনাঞ্জ। তোমার গুরুর এই অন্ধ অহমিকা এবং ঔদ্ধত্য আমি ভেঙে দেবো, সংকল্প করেছি। প্রতিপক্ষ হিসাবে আমি তাঁকে তর্কযুদ্ধে আহ্বান করছি। রাজসভায় এই তর্ক অনুষ্ঠিত হবে একথাটি তাঁকে এবং পাণ্ড্যরাজকে তুমি জানিয়ে দেবে।"

বিস্ময়ে বাক্‌রোধ হয় বনাঞ্জির। এ বালক কি পাগল? বারো বৎসরের একটা নবীন পড়ুয়া, অর্বাচীন ছোকরা, তর্কবিচারে আহ্বান করছে দক্ষিণ ভারতের শ্রেষ্ঠ রাজপণ্ডিতকে? তবে কি বনাঞ্জি এতক্ষণ একটা পাগলের সঙ্গে ঝগড়া ও চেঁচামেচি করিতেছে?

সংযত ও প্রশান্ত কণ্ঠে বালক যামুন আবার জানায়, "বনাঞ্জি, আমার কথাকে বালকের কথা বলে উড়িয়ে দিয়ো না যেন। আচার্য

নাথমুনি আমার পিতামহ, আর ঈশ্বরমুনি আমার পিতা। আমাদে
বংশের ওপর প্রভু শ্রীরঙ্গনাথের কৃপা ও বর রয়েছে। আরো শুনে
রাখো, বন্‌জি, আমার গুরুর কৃপায় বহুতর শাস্ত্র আমি ইতিমধে
আয়ত্ত করেছি। আচার্য কোলাহলকে তর্কে আহ্বান করার শক্তি
আমি ধারণ করি। শাস্ত্রতত্ত্ব বা কূটপ্রশ্ন যে কোনো দিক দিয়ে আমি
তাঁকে ধরাশায়ী করতে পারবো, এ বিশ্বাসও আমার আছে।”

পণ্ডিত বন্‌জি রাগে গজ্‌গজ্‌ করিতে করিতে তখনি স্থান ত্যাগ
করে, ত্বরায় উপনীত হয় রাজধানীতে। সরাসরি রাজসভায় গিয়ে
নিবেদন করে ভাষ্যাচার্যের ছাত্রের সব কথা।

সকল কিছু শোনার পর আচার্য কোলাহল ক্রোধে ফাটিয়া
পড়েন, এ ঔদ্ধত্যের সমুচিত দণ্ড দিবার জন্য রাজাকে বলিতে
থাকেন। সভাসদেরাও বালকের ধৃষ্টতায় কম বিস্মিত হন নাই।

পাণ্ড্যরাজ গম্ভীর স্বরে বলেন, “আমার মনে হয়, শুধু একটি
বালক পড়ুয়ার কথা নিয়ে এত উত্তেজিত হয়ে ওঠা আমাদের পক্ষে
ঠিক নয়। চতুষ্পাঠীর যিনি পরিচালক সেই ভাষ্যাচার্যের কাছে
আমি দূত পাঠাচ্ছি। সে জেনে আসুক, ভাষ্যাচার্য নিজে এ-বিষয়ে
কি বলতে চান। হয় তিনি তাঁর ছাত্রের হ'য়ে ক্ষমা প্রার্থনা করুন
নয়তো পরিষ্কার ক'রে জানিয়ে দিন তর্কবিচার সম্পর্কে তাঁর
মতামত।” বিশেষ পত্রী দিয়ে তখনি এক দূতকে প্রেরণ করা হইল।

এদিকে শিষ্যালয় হইতে ফিরিয়া আসার পরই ভাষ্যাচার্য যামুনের
মুখ হইতে সকল কথা শুনিলেন। ভয়ে তাঁহার মুখ শুকাইয়া গেল।
কহিলেন, “বৎস যামুন, এ তুমি অত্যন্ত অসমীচীন কাজ করেছো।
আচার্য কোলাহল দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিত, তাছাড়া, অত্যন্ত আত্মম্ভরীও
বটে। অচিরে সে প্রতিহিংসা গ্রহণ করবে। এবার আমার এবং
আমার এ চতুষ্পাঠীর দুর্দশার সীমা থাকবে না।”

প্রবীণ ও নবীন ছাত্রেরা একে একে সেখানে আসিয়া জড়ো
হইয়াছে। সবারই চোখে মুখে আতঙ্কের ছায়া, চতুষ্পাঠীর উপরে
রাজরোষ ঘনাইয়া আসিতেছে, এবার আর কাহারো নিস্তার নাই।

যুক্তকরে নিবেদন ক'রে যামুন, "প্রভু, আমায় আপনি ক্ষমা করুন। যে সব কথা আমি বন্‌জিকে বলেছি, তা বলেছি তার ঔদ্ধত্যের সমুচিত জবাব দেবার জন্যে, আর আপনার সম্মান রক্ষার জন্যে।"

"যামুন, তুমি সংসার বিষয়ে অনভিজ্ঞ। আচার্য কোলাহলকে রাজা শ্রদ্ধা করেন গুরুর মতো, রাজসভায় তাঁর বিপুল প্রতিপত্তি, তাঁর শিষ্যকে কঠোরভাবে বলা ও চটিয়ে দেওয়া তোমার উচিত হয় নি। অনেক জটিলতা ও বিপদের সৃষ্টি করলে তুমি।"

"প্রভু, আপনার মান সম্ভ্রমের মুখ চেয়েই তো আমি এ বিপদের ঝুঁকি নিয়েছি। তাছাড়া, আমার অন্তরাত্মা থেকে কে যেন বার বারই বলছে, 'কোনো ভয় নেই। তোমার মেধা ও প্রতিভা দিয়ে গুরুর সম্মান রক্ষা করো, আত্মম্ভরী আচার্য কোলাহলের সম্মুখীন হও। জয় তোমার সুনিশ্চিত।"

আচার্য কিছুকাল চুপ করিয়া রহিলেন. কহিলেন, "বৎস প্রভু শ্রীরঙ্গনাথের প্রিয় ভক্ত, সিদ্ধ মহাত্মা, নাথমুনির পৌত্র তুমি। তাছাড়া, আমি তো জানি, ঈশ্বর প্রদত্ত কি অমানুষী প্রতিভা নিয়ে তুমি জন্মেছো, মাত্র বারো বৎসর বয়সে কি বিপুল শাস্ত্রজ্ঞান তুমি আয়ত্ত করেছো। হয়তো ঈশ্বরের কোনো অভিপ্রায় রয়েছে এই ব্যাপারে। তোমার মাধ্যমেই হয়তো আচার্য কোলাহলের দম্ভ চূর্ণ হবে, অত্যাচার দূর হবে, এ দেশের সারস্বত জীবন হয়ে উঠবে শুদ্ধতর, পবিত্রতর।

"আমায় আশীর্বাদ করুন, প্রভু। আপনার প্রসাদে যেন জয়যুক্ত হই আমি"—গুরুর চরণ বন্দনা করিয়া প্রার্থনা জানায় যামুন।

গুরু আশীর্বাদ করিলেন বটে, কিন্তু মন হইতে আতঙ্ক দূর হইল না। দৈবী কৃপা ছাড়া আসন্ন বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার আর কোনো উপায় নাই।

পরের দিন ভোর হইতে না হইতেই পাণ্ড্যরাজের দূত আসিয়া উপস্থিত। পণ্ডিত ভাষ্যাচার্য পত্রীর উত্তরে পরিষ্কার ভাষায় জানাইয়া

দিলেন,—তাঁহার ছাত্র বালক হইলেও অমানুষী প্রতিভা ও বিদ্যাবত্তার অধিকারী। যথাসময়ে প্রস্তাবিত তর্ক-বিচারের সভায় সে উপস্থিত থাকিবে।

সারা পাণ্ড্যরাজ্যে এ সংবাদ দাবানলের মতো ছড়াইয়া পড়িল। আচার্য কোলাহল বহুলশ্রুত দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিত, সেই মহারথীকে বিচারদ্বন্দ্বে আহ্বান করিয়াছে এক বারো বৎসরের বালক। এর চাইতে আশ্চর্যকর কথা আর কি হইতে পারে।

আচার্য কোলাহল ছিলেন অতিমাত্রায় বিদ্যাদর্পী, ধরাকে তিনি সরা জ্ঞান করিতেন। কাজেই পাণ্ড্য রাজসভায় এবং রাজধানীর বুধ-সমাজে তাঁহার শত্রুর অভাব নাই। অনেকে ভাবেন, দৈবের বিধানে যদি কোলাহলের পতন ঘটে, তবে কি চমৎকারই না হয়!

সর্বত্র জটলা শুরু হইয়া যায়, কে জানে এই বালক প্রতিদ্বন্দ্বী ঐশ্বরীয় শক্তিতে শক্তিমান্ কিনা। নতুবা এত স্পর্ধা তার! সারা দেশের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতকে পরাজয় করার সাহস তাহার কি করিয়া হইল?

বালক তর্কযোদ্ধা যামুন যে বিস্ময়কর পাণ্ডিত্য ও প্রতিভার অধিকারী, রাজা ইতিমধ্যে একথা জানিয়াছেন। কিন্তু কি করিয়া সে দুর্ধর্ষ তর্কশূর কোলাহলের সঙ্গে আঁটিয়া উঠিবে, সে কথাটিই তিনি ভাবিয়া পাইতেছেন না।

রাজা ও রানী সেদিন বাগানে বেড়াইতেছেন, উভয়ের মধ্যে বিতর্ক উঠিল, তর্কসভায় কে হইবে জয়ী?

রাজার ধারণা রাজসভায় দিগ্‌বিজয়ীর সম্মুখে দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে বালক ভয়ে মূর্ছা যাইবে। রানী কিন্তু ভাবেন ভিন্নরূপ। বলেন, "মহারাজ আমার কিন্তু কেবলই মনে হচ্ছে, এ বালক ঐশ্বরীয় শক্তিতে শক্তিমান্। যে ভাবে সাহস ক'রে সে তর্কযুদ্ধে নামতে আসছে তাতে আবার মনে হয়, প্রতিপক্ষকে অনায়াসে হারিয়ে দেবে, মহারাজ।"

"এটা তার সাহস, না দুঃসাহস, না হাস্যকর প্রয়াস, তা কে বলবে?" সহাস্যে মন্তব্য করেন রাজা।

"মহারাজ, দুদিন থেকে বার বারই আমার মনে চিন্তার ঝলক খেলে যাচ্ছে। বারো বৎসর বয়সেই তো বালক অষ্টাবক্র রাজা জনকের সভাপণ্ডিত আচার্য বন্দীকে হারিয়েছিলেন শাস্ত্রীয় তর্কে। আর আচার্য শঙ্কর? ষোল বৎসর বয়সেই হলেন তিনি ভারতজয়ী পণ্ডিত। আমার দৃঢ় ধারণা, মহারাজ, এ বালক ঐ ধরনের ঐশ্বরীয় শক্তির অধিকারী। সে জিতবেই জিতবে।"

"যদি সে না জেতে, তবে?"

"তবে আমি আপনার দাসীদের দাসী হয়ে থাকবো মহারাজ,"—বাজী ধরে বসেন রানী।

কথায় কথায় পাণ্ড্যরাজেরও জেদ চড়িয়া যায়। উত্তেজিত কণ্ঠে বলেন, "তা হলে রানী, তুমিও শুনে নাও আমার শপথ। যদি বালক যামুন জয়ী হয়, আমি তৎক্ষণাৎ দান করবো তাকে আমার রাজ্যের অর্ধেক অংশ। দেখা যাক, কে জয়ী হয় এই বিচারে।"

রাজা ও রানীর এই বাজী ধরার কথা শহরে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে, জনসাধারণের কৌতূহলের সীমা থাকে না।

রাজার প্রেরিত স্বর্ণখচিত শিবিকায় আরোহণ করিয়া যামুন রাজধানী মাদুরায় উপনীত হইলেন। শুধু রাজধানীরই নয়, রাজ্যের দূর দূরান্তের কৌতূহলী মানুষেরাও ভিড় করিয়াছে রাজসভায়। শাস্ত্রবিদ্ আচার্য, শিক্ষিত ও অশিক্ষিত বহু নাগরিকই সেদিন সভায় মিলিত হইয়াছে সেদিনকার অসম ও অদ্ভুত তর্কযুদ্ধ দেখার জন্য। উত্তেজনা ও উন্মাদনার অবধি নাই।

বালক যামুন ধীর গম্ভীরভাবে সভাকক্ষে উপস্থিত হয়, নতশিরে রাজা ও রানীকে জ্ঞাপন করে তাহার শ্রদ্ধা। এই ক্ষুদ্র বালকের দিকে এতক্ষণ কৌতূহল ভরে তাকাইয়া ছিলেন আচার্য কোলাহল। এবার রানীর দিকে মুখ ফিরাইয়া তাচ্ছিল্যের হাসি হাসিয়া প্রশ্ন করেন, "আলওয়ান্দারা?" অর্থাৎ, এই বালকই কি করবে আমায় পরাজিত?

বালক পণ্ডিতের প্রতি পরিপূর্ণ আস্থা জ্ঞাপন করিয়া রানী দৃঢ়

স্বরে বলিয়া উঠেন, "আলওয়ান্দার," অর্থাৎ, হাঁ, এই বালকই তো করবে পরাজিত।[১]

রাজসভায় তিল ধারণের স্থান নাই, উৎসাহ উদ্দীপনায় সবাই চঞ্চল, প্রতীক্ষায় রহিয়াছে তর্কযুদ্ধের।

পাণ্ড্যরাজ নির্দেশ দিবার সঙ্গে সঙ্গে আচার্য কোলাহল শুরু করেন তাঁহার প্রশ্ন। পাণিনি ও অমরকোষ হইতে কয়েকটি প্রশ্ন প্রথমে তিনি উত্থাপন করেন। ঋজু, দৃপ্ত ভঙ্গীতে দাঁড়াইয়া অবলীলায় যামুন তাহার উত্তর দেন। মীমাংসার দক্ষতায় এবং বাচনভঙ্গীর চমৎকারিত্বে দর্শকেরা প্রীত হইয়া উঠেন। ঘন ঘন করতালিতে সভাগৃহ মুখর হইয়া উঠে।

এবার যামুনের প্রশ্ন করার পালা। যামুন কিন্তু বেশ বুঝিতে পারিয়াছেন, দিগ্‌বিজয়ী আচার্য কোলাহল তাঁহাকে আদৌ কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী পণ্ডিতের সম্মান দেন নাই। গণ্য করিয়াছেন এক নগণ্য বালক পড়ুয়ারূপে, তাই এবার নিজের প্রশ্নবাণ নিক্ষেপের আগে কোলাহলকে তিনি চটাইয়া দিলেন। কহিলেন, "আচার্য, আপনার প্রশ্নগুলোর কোনো গুরুত্ব নেই। আপনি বোধহয় আমাকে ক্ষুদ্রকায় বালক ভেবে অবজ্ঞা করেছেন। আরো ভেবেছেন, আপনার মতো বিরাটকায় হলে এবং বিরাট উদর থাকলেই পাণ্ডিত্য হয় অগাধ। তবে কি আমরা ধরে নেবো, একটা বিশালকায় হাতি আপনার চাইতে বড় পণ্ডিত?"

সভায় হাসির হররা বহিয়া যায়, আর সেই সঙ্গে গণ্ডগোলও বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

যামুন আবার কহিলেন, "আচার্যবর, আপনার বোধহয় জানা আছে, অষ্টাবক্র মুনি যখন জনকের সভাপণ্ডিত বন্দীকে পরাভূত করেন, তখন তাঁর বয়স ছিল বারো বৎসর। কাজেই বয়সের কথা ভেবে আমার সঙ্গে যেন প্রশ্নোত্তর করবেন না।"

---

১ বেদান্ত দর্শনের ইতিহাস (১ম ভাগ): প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী, শঙ্কর-মঠ, বরিশাল।

পাণ্ড্যরাজ হাসিয়া কহিলেন, "ও সব কথা থাক। এবার রাজ-পণ্ডিতকে প্রশ্ন করা হোক। সত্যকার তর্কবিচার চলুক।"

রাজার নির্দেশ মানিয়া নিয়া যামুন এবার উঠিয়া দাঁড়ান, বলেন, "আচার্য কোলাহল, আপনাকে আমি তিনটি অতি সাধারণ প্রশ্ন করবো। আপনি সাধ্যমতো উত্তর দিন সভার সমক্ষে। আমার প্রথম বক্তব্য : আপনার মাতা বন্ধ্যা নন। এ-বাক্যটি আপনি খণ্ডন করুন।"

আচার্য কোলাহল তো হতবাক্। একি অদ্ভুত হেঁয়ালিপূর্ণ বাক্য! নিজের মাতার পুত্ররূপে জলজ্যান্ত তিনি রাজসভায় বসিয়া আছেন, কি করিয়া তিনি বলিবেন যে তাঁহার মাতা বন্ধ্যা? নাঃ, এ কোনো প্রশ্নই নয়। উত্তরও ইহার কিছু দেওয়া যায় না।

শ্লেষাত্মক হাসি হাসিয়া যামুন বলেন, "এবার আমার আর দুটি বাক্য শুনুন আচার্যবর। আমি বলছি, পাণ্ড্যরাজ সম্পূর্ণরূপে নিষ্পাপ। আপনি এটি খণ্ডন করুন। আমার শেষ বাক্য,—আমাদের রানীমাতা, যিনি এখানে সিংহাসনে উপবিষ্টা রয়েছেন তিনি সাবিত্রীর মতো সাধ্বী। আপনি আমার এ বাক্যটিও খণ্ডন করুন।"

আচার্য কোলাহল বিভ্রান্ত ও বিব্রত হইয়া পড়েন। অভিযোগের সুরে রাজাকে বলিয়া উঠেন, "মহারাজ, এ দুটি বাক্য খণ্ডন করতে হলে আমায় প্রমাণ করতে হবে, আপনি পাপী এবং আমাদের রানীমা সতী সাধ্বী নন। না—না, এ বড় ধৃষ্ট প্রশ্ন, বড় কূট এবং হেঁয়ালিপূর্ণ প্রশ্ন। আমি এর উত্তর দেব না।"

পণ্ডিত কোলাহলের পক্ষীয় পণ্ডিত এবং ছাত্রেরা সভামধ্যে চেঁচামেচি শুরু করিয়া দেয়,—এসব প্রশ্ন অশালীন, অসমীচীন। কোলাহলের বিরোধীরাও মহাউত্তেজিত। তাহারা বার বার জেদ করিতে থাকে, প্রশ্ন যখন করা হইয়াছে—তাহার খণ্ডন অবশ্যই করিতে হইবে। দুই পক্ষের এই বাদানুবাদে রাজসভা মুখর হইয়া উঠে।

সবাইকে শান্ত হইতে আদেশ দিয়া রাজা কহিলেন, "বেশ তো,

আচার্য কোলাহল যখন উত্তর দিতে অসমর্থ হয়েছেন, এবার প্রতিপক্ষ যামুনই তাঁর নিজের প্রশ্ন খণ্ডন করবেন।"

যামুন উঠিয়া দাঁড়ান, রাজা ও বুধমণ্ডলীকে অভিবাদন জানাইয়া বলেন, "এবার তাহলে আমার প্রস্তাব একটি একটি ক'রে আমিই খণ্ডন করছি। আচার্য কোলাহল তাঁর মাতার একমাত্র পুত্র, তবুও আমি বলবো, তাঁর মাতা বন্ধ্যা। শ্রেষ্ঠ ধর্ম-শাস্ত্রকার মনু বিধান দিয়েছেন, একমাত্র পুত্রের পিতা একাধিক পুত্র লাভের জন্য পুনরায় বিবাহ করতে পারে। শাস্ত্রকার চেয়েছেন, পুত্রদের মধ্যে একটি যেন বেঁচে থাকে এবং গয়ায় গিয়ে পিণ্ড দিতে সক্ষম হয়। মেধাতিথির ভাষ্যেও আমরা দেখি—একঃ পুত্রোঽপুত্রো বা। সুতরাং আচার্য কোলাহলের মাতাকে বন্ধ্যা বলা যেতে পারে।"

সভাকক্ষে গুঞ্জন উঠে। অনেকেই বলিতে থাকেন, "যেমন কুট প্রশ্ন, তেমনি কৌশলপূর্ণ খণ্ডন। বেশ বেশ!"

যামুন অতঃপর বলা শুরু করেন, "এবার রাজার নিষ্পাপত্বর কথায় আসছি। সংহিতার একটি শ্লোকে মনু বলেছেন, প্রজার রক্ষণাবেক্ষণের পরিবর্তে রাজা প্রজার কাছ থেকে কর গ্রহণ করেন। প্রজার উৎপন্ন বস্তুর ষষ্ঠাংশ তাঁর প্রাপ্য; এই উৎপন্ন বস্তু বলতে ভৌতিক এবং আধ্যাত্মিক দুই-ই বুঝায়। কাজেই একথা বলা যেতে পারে যে, রাজা তাঁর প্রজাদের পাপপুণ্যেরও এক ষষ্ঠাংশ গ্রহণ ক'রে থাকেন। আপনারা বলুন, রাজ্যের প্রজারা কি নিষ্পাপ? তারা যদি নিষ্পাপ না হয়ে থাকে, তবে রাজাও কোনক্রমে নিষ্পাপ নন।"

"এবার মহারানীর সাধ্বীত্বের কথা। মনু বলেছেন, অভিষেক-অনুষ্ঠানের সময় রাজার দেহে বিরাজ করতে থাকেন সূর্য, চন্দ্র, ইন্দ্র, বরুণ প্রভৃতি অষ্টদিক্‌পাল। তদনুযায়ী রাজ্ঞী রাজার এবং তাঁর অভ্যন্তরাস্থিত অষ্টদিক্‌পালের, উভয়েরই মহিষী। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে কি ক'রে বলবো, তিনি সাবিত্রী-সমা সাধ্বী?"

বালক পণ্ডিতের প্রতিভা ও শানিত বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্যে সবাই

চমৎকৃত। সবাই উপলব্ধি করিলেন। শাস্ত্রপারঙ্গম তো তিনি বটেই, ব্যাখ্যান কৌশল, কূটবুদ্ধি ও চাতুর্যেও তিনি অপরাজেয়।

প্রতিপক্ষ দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত কোলাহল নীরবে নত মস্তকে বসিয়া আছেন আর সভাকক্ষের সবাই যামুনকে জানাইতেছেন তাঁহাদের সোল্লাস অভিনন্দন।

অতঃপর রাজার আদেশে শুরু হয় বেদ, উপনিষদ ও ধর্মশাস্ত্রের দুরূহ তত্ত্ব ও দার্শনিকতার বিচার-দ্বন্দ্ব। আচার্য কোলাহলের সে উৎসাহ, সে আত্মবিশ্বাস, সে দম্ভ আর নাই। সারস্বত জীবনের দীপশিখাটি কে যেন এক ফুৎকারে নিভাইয়া দিয়াছেন। কোনো-ক্রমে হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া তিনি শাস্ত্রের জটিল তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে চাহিতেছেন, আর প্রতিভাধর বালক প্রতিদ্বন্দ্বীর এক একটি তীক্ষ্ণ প্রশ্নবাণে হইতেছেন বিপর্যস্ত। বিচারের শেষের দিকে তর্কেশ্বর কোলাহল একেবারে ভাঙিয়া পড়িলেন। এবার সমবেত বুধমণ্ডলীর সমর্থন লাভের পর পাণ্ড্যরাজ ঘোষণা করিলেন, এ বিচারে যামুন জয়লাভ করিয়াছেন।

তখনি চারিদিকে ধ্বনিত হয় বালক পণ্ডিত যামুনের সাধুবাদ ও জয়ধ্বনি, জয়মাল্য অর্পিত হয় তাঁহার কণ্ঠে।

রাজ্ঞীর আনন্দের অবধি নাই। পার্শ্বে উপবিষ্ট হতমান, নতশির, আচার্য কোলাহলের দিকে তাকাইয়া শ্লেষের সুরে বলিয়া উঠেন, "আলওয়ান্দার, আলওয়ান্দার।" অর্থাৎ, আচার্য তা'হলে এই বালকই শেষটায় পরাজিত করল আপনার মতো দিক্‌পাল আচার্যকে।

তর্কবিচার সভা ভঙ্গ হইল। অতঃপর পাণ্ড্যরাজ রানীর নিকট যে শপথ করিয়াছিলেন তাহা রক্ষা করিলেন, যামুনকে প্রদান করিলেন রাজ্যের অর্ধাংশ।

পাণ্ড্যরাজের বিচার সভার সেদিনকার এই বিজয়ী বালক পণ্ডিতই উত্তরকালের দেশবরেণ্য মহাসাধক যামুনাচার্য। ভক্তিবাদের ভাস্বর আলোকস্তম্ভরূপে দশম শতকের দাক্ষিণাত্যে ঘটে তাঁহার অভ্যুদয়। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের মহান্ উদ্‌গাতা ও ধারক বাহকরূপে,

তিনি পরিচিত হইয়া উঠেন। আচার্য রামানুজের প্রেরণাদাতা ও আরাধ্য পূর্বসূরীরূপে সারা ভারতে অর্জন করেন অতুলনীয় কীর্তি।

দক্ষিণ ভারতে মাদুরাইর এক বিখ্যাত বিষ্ণুভক্ত ব্রাহ্মণ পরিবারে যামুনাচার্যের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম ঈশ্বরমুনি। পিতামহ নাথমুনি ছিলেন এক দিক্‌পাল পণ্ডিত, ভক্তিসিদ্ধ মহাপুরুষ বলিয়াও চারিদিকে তাঁহার খ্যাতি ছিল।

শঙ্কর মঠের স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী এই মনীষী ও সাধক সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "দশম শতাব্দী হইতে বিশিষ্টাদ্বৈত সাধনার স্রোত প্রবল বেগে প্রবাহিত হইয়া ভবিষ্যতে মহাপ্লাবনের সুচনা করিতে লাগিল। মহাপুরুষ শ্রীনাথমুনি এই দার্শনিক যজ্ঞের প্রথম পুরোহিত। অনুমান ৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের প্লাবন সূচিত হয়। যামুনাচার্যের সময় নাথমুনির সাধনার ফল ফলিতে আরম্ভ হয় এবং রামানুজের সাধনায় সেই ফল পরিপূর্তি লাভ করে। নাথমুনির হৃদয়ে যে প্লাবনের সুচনা হয়, সেই প্লাবনই পরবর্তীকালে সমস্ত ভারতকে প্লাবিত করিয়াছে[১]।"

দক্ষিণী ভক্তসমাজে নাথমুনি শ্রীবৈষ্ণব সমাজের প্রথম আচার্যরূপে সম্মানিত। তাঁহার সম্পর্কে প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব আচার্য বেঙ্কটনাথ লিখিয়াছেন,—'সমস্ত অজ্ঞান-অন্ধকারের বিনাশক আমাদের এই দর্শন নাথমুনির দ্বারা সূচিত, যামুনের বহু প্রয়াসের মাধ্যমে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, আর রামানুজের দ্বারা সম্যক্‌রূপে বিস্তারিত[২]।'

নাথমুনি 'ন্যায়তত্ত্ব' নামে একটি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন বলিয়া বেঙ্কটনাথ উল্লেখ করিয়াছেন, এবং কিছু কিছু উদ্ধৃতির অনুবাদও তিনি দিয়াছেন। কিন্তু ঐ গ্রন্থ আর পাওয়া যায় নাই। অধ্যাপক শ্রীনিবাসচারীর মতে, ঐটি হইতেছে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ মতের প্রথম আধুনিক গ্রন্থ[৩]।

---

১ বেদান্ত দর্শনের ইতিহাস : স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, শঙ্কর মঠ, বরিশাল।

২ সঙ্কল্পসূর্যোদয় : বেঙ্কটনাথ

৩ দ্য ফিলসফি অব বিশিষ্টাদ্বৈত : পি, এন, শ্রীনিবাসচারী, আদেয়ার।

উত্তরজীবনে নাথমুনি শ্রীরঙ্গনাথের এক অন্তরঙ্গ সিদ্ধভক্ত ও শ্রীরঙ্গমের শ্রেষ্ঠ আচার্যরূপে বিপুল খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীসম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ আচার্য রামানুজ তাঁহার স্তোত্ররত্ন ও অন্যান্য রচনায় পূর্বসূরী নাথমুনির কথা সশ্রদ্ধভাবে উল্লেখ করিয়াছেন, প্রশস্তি গাহিয়াছেন অকুণ্ঠভাবে।

নাথমুনির একমাত্র পুত্র ঈশ্বরমুনি। এই পুত্রটিকে পরম স্নেহে ও আদরে তিনি লালন করেন, বড় হইয়া উঠিলে সযত্নে নিজের কাছে রাখিয়া নানা শাস্ত্রে তাঁহাকে পারঙ্গম করিয়া তুলেন। শাস্ত্রজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে পুত্র ঈশ্বরের জীবনে দেখা দেয় প্রবল বিষ্ণুভক্তি, ইষ্টদেব বিষ্ণুর অর্চনা ও সাধনায় তিনি নিবিষ্ট হইয়া পড়েন। পুত্রের বিদ্যাবত্তা ও সাধননিষ্ঠা দর্শনে নাথমুনির অন্তর তৃপ্তি ও আনন্দে ভরিয়া উঠে।

অতঃপর তরুণ কৃতী পুত্রকে বিবাহ দেওয়াইয়া নাথমুনি তাহাকে সংসারাশ্রমে প্রবিষ্ট করেন এবং কয়েক বৎসর পরে, ৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ভূমিষ্ঠ হয় এক সুদর্শন, সুলক্ষণযুক্ত পৌত্র। ক্ষুদ্র স্বল্পবিত্ত সংসারে এ যেন দিবালোকের এক ঝলক আলোক-রশ্মি। সারা গৃহ আনন্দে উল্লাসে পূর্ণ হইয়া উঠে।

এই পৌত্রের নাম রাখা হয় যামুন, বালককাল হইতেই প্রকাশ পায় তাহার অসাধারণ মেধা ও প্রতিভা। একবারটি যাহা কিছু শ্রবণ করে, আর কখনো সে তাহা বিস্মৃত হয় না। শুধু তাহাই নয়, এক এক সময়ে অধীত বিষয় সম্পর্কে নূতন নূতন প্রশ্ন তুলিয়া শিক্ষকদের সে অবাক করিয়া দেয়।

ঈশ্বরমুনি শাস্ত্রবিদ্ ব্রাহ্মণ বংশের যোগ্য প্রতিনিধি হইয়া উঠিয়াছেন। পরম আদরের পৌত্র যামুনও গড়িয়া উঠিতেছেন সহজাত শুভ সংস্কার নিয়া। আগামী কয়েক বৎসরের মধ্যেই সে যে এক কৃতী পড়ুয়া হইয়া উঠিবে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। কিন্তু এসময়ে নাথমুনির সংসার জীবনে নিপতিত হয় দৈবের এক নির্মম আঘাত। আকস্মিক এক কঠিন রোগে ভুগিয়া প্রিয় পুত্র ঈশ্বরমুনি ইহলোক ত্যাগ করেন।

একমাত্র পুত্রের এই বিয়োগ ব্যথায় নাথমুনি মুহ্যমান হইয়া পড়েন, হৃদয়ে জাগিয়া উঠে তীব্র বৈরাগ্যের আগুন। সংকল্প স্থির করিয়া ফেলেন, এবার চিরতরে সংসার ত্যাগ করিবেন, সন্ন্যাস নিয়া শুরু করিবেন কঠোর তপস্যা, প্রভু রঙ্গনাথজীর পবিত্র পীঠে অবস্থান করিয়াই কাটাইয়া দিবেন জীবনের বাকী দিনগুলি।

গৃহের লোকদের ভরণপোষণের মোটামুটি ব্যবস্থা করার পর বালক পৌত্র যামুনকে তিনি পাঠাইয়া দিলেন গুরুগৃহে। কুলপ্রথা অনুযায়ী এ বয়সে সবাই তাঁহারা শাস্ত্রপাঠ সমাপ্ত করিয়াছেন গুরুর সন্নিধানে বাস করিয়া। যামুনের জন্যও সেই ব্যবস্থাই করা হইল। পণ্ডিত ভাষ্যাচার্য একজন খ্যাতিমান্ শাস্ত্রবিদ্, সদাচারী ও বিষ্ণুভক্ত বলিয়াও তাঁহার সুনাম রহিয়াছে। যামুনকে তাঁহার আশ্রয়ে রাখিয়া নাথমুনি নিশ্চিন্ত হইলেন। তারপর একদিন শ্রীরঙ্গমে উপনীত হইয়া গ্রহণ করিলেন বৈষ্ণবীয় সন্ন্যাস।

বিষ্ণু আরাধনার সঙ্গে সঙ্গে নিগূঢ় যোগ সাধনায়ও ব্রতী হন নাথমুনি। অতঃপর কয়েক বৎসরের মধ্যে শ্রীরঙ্গম অঞ্চলে সাধক হিসাবে তাঁহার খ্যাতি ছড়াইয়া পড়ে। যোগে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, তাই সাধক মহলে তাঁহার সম্ভ্রমের সীমা ছিল না, সবাই তাঁহাকে অভিহিত করিত নাথমুনি নামে।

এদিকে অল্পকাল মধ্যে বালক যামুন পরিচিত হইয়া উঠেন ভাষ্যাচার্যের চতুষ্পাঠীর অন্যতম অগ্রণী ও প্রতিভাধর ছাত্ররূপে। এই নবীন পড়ুয়ার প্রতি পণ্ডিত ভাষ্যাচার্যের স্নেহ মমতার সীমা ছিল না। ঈশ্বরমুনির ঘরের ছেলে যামুন, স্বভাবতই পিতা ও পিতামহের সাত্ত্বিকী সংস্কার ও সহজাত মেধা নিয়া সে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। তদুপরি দিনের পর দিন প্রকাশ পাইতেছে তাঁহার মননশক্তি ও প্রতিভার চমৎকারিত্ব। গোড়া হইতেই আচার্য বুঝিয়া নিয়াছেন, তাঁহার এই বালক পড়ুয়া ঈশ্বরপ্রদত্ত অসামান্য প্রতিভার অধিকারী, কালে অবশ্যই সে গণ্য হইবে দিক্‌পাল পণ্ডিতরূপে। তাই স্বভাবতই

ভাষ্যাচার্য যামুনকে প্রাণ ঢালিয়া এতদিন পড়াইয়াছেন। গড়িয়া তুলিয়াছেন এক সর্বশাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিতরূপে।

ছাত্র যামুনকে কেন্দ্র করিয়া আচার্য অনেক কিছু আশা করিয়াছেন, ভবিষ্যতের সুখ স্বপ্ন দেখিযাছেন। কিন্তু সে যে সেদিন হঠাৎ এমন করিয়া দুর্ধর্ষ পাণ্ডিত কোলাহলের সহিত সংঘর্ষ বাধাইয়া বসিবে এবং সে সংঘর্ষে জয়ী হইবে, এ কথা তাঁহার মনে কোনোদিন স্থান পায় নাই।

এবার ভাষ্যাচার্যের আনন্দ আর ধরেনা। দর্পী অত্যাচারী আচার্য কোলাহল পাণ্ড্যরাজ্য ছাড়িয়া দূরে পলায়ন করিয়াছে। বালক শিষ্যের বিজয়ে ভাষ্যাচার্যের নিজের খ্যাতি প্রতিপত্তি যেমন বাড়িয়াছে, তেমনি জাঁক বাড়িয়াছে তাঁহার চতুষ্পাঠীর।

বিজয়ী নবীন পণ্ডিত যামুনের জীবনের ধারা এবার বহিয়া চলে এক নূতনতর খাতে। নিজে তিনি বালক, রাষ্ট্রীয় কর্মের কোনো অভিজ্ঞতা নাই। তাই পাণ্ড্যরাজের অভিভাবকত্ব ও সহায়তায় পরিচালনা করিতে থাকেন তাঁহার নবলব্ধ রাজ্যের সমস্ত কিছু দায়িত্ব। এই সঙ্গে বহিয়া চলে তাঁহার সারস্বত জীবনের ধারা। দেশ দেশান্তর হইতে শাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিতেরা আসিয়া জড়ো হন তাঁহার রাজধানীতে এই পণ্ডিতদের সাহচর্যে যামুন গড়িয়া তোলেন এক শাস্ত্রপারঙ্গম বুধমণ্ডলী।

ক্রমে যৌবনে পদার্পণ করেন রাজা যামুন। শক্তি, আত্মবিশ্বাস ও প্রতিভার মূর্তবিগ্রহ তিনি। পার্শ্ববর্তী রাজাদের উপর স্বভাবতই তাঁহার প্রভাব ধীরে ধীরে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। রাজ্যের আয়তন অচিরে বৃদ্ধি পায়, রাজকীয় বিত্ত বিভব হয় পুঞ্জীভূত এবং ভোগ বিলাসের পরিবেশ সৃষ্টি হয় তাঁহার চারিদিকে। দশ বারো বৎসরের মধ্যে যামুন পরিণত হন এক ধনজন পরিপূর্ণ রাজ্যের অধীশ্বররূপে।

স্বাধ্যায়ী, তপস্বী এবং দরিদ্র ব্রাহ্মণের গৃহে তাঁহার জন্ম। কিন্তু

ভাগ্যচক্রের আবর্তনে রাজশক্তি ও রাজ্যবৈভবের দিকেই তিনি আকৃষ্ট হইয়া পড়েন।

আরো কয়েক বৎসর অতীত হইলে স্বভাবতই যামুন বিস্মৃত হন তাঁহার প্রথম জীবনের সাত্ত্বিকী, সদাচারী, তপোনিষ্ঠ চিত্তবৃত্তির কথা। রাজ্যের প্রসার ও প্রভাবের জন্য, ধন মান ও বিলাস বৈচিত্র্যের জন্য, দিন দিন তিনি উৎসাহী হইয়া উঠেন। প্রথম জীবনের পরম সম্ভাবনার উপর ধীরে ধীরে নামিয়া আসে বিস্মৃতির যবনিকা।

এভাবে প্রায় তেইশ বৎসর কাল পরমানন্দে তিনি রাজদণ্ড পরিচালনা করেন এবং সর্বত্র পরিচিত হইয়া উঠেন এক কৌশলী রাজনীতিবিদ্ ও দক্ষ শাসকরূপে। রাজ্যের পরিধি তাঁহার দিনের পর দিন আরো বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

গৃহত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস নিবার পরও নাথমুনি কিন্তু পৌত্র যামুনের কথা বিস্মৃত হন নাই। বরং তাঁহার কল্যাণময় দৃষ্টি সতত নিবদ্ধ রহিয়াছে তাঁহারই দিকে। সিদ্ধপুরুষের উপলব্ধিতে আসিয়া গিয়াছে যামুনের আত্মিক জীবনের পরম সম্ভাবনার কথা। ধ্যান বলে তিনি জানিয়াছেন, ভক্তিধর্মের এক মহান্ নেতারূপে ভবিষ্যতে ঘটিবে তাঁহার অভ্যুদয়, সহস্র সহস্র সাধক লাভ করিবে তাঁহার পরমাশ্রয়। তাছাড়া, ইহাও তিনি জানিয়াছেন, যামুনের তপস্যা, তাঁহার সিদ্ধি, তাঁহার দার্শনিকতা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের এক দৃঢ় ভিত্তিভূমি গড়িয়া তুলিবে, সারা ভারতের ধর্ম-সংস্কৃতির আন্দোলনে ঘটাইবে এক কল্যাণময় পদক্ষেপ।

যামুন রাষ্ট্র পরিচালনার কাজ নিয়া সদা ব্যস্ত। কিন্তু দিব্য দৃষ্টি সহায় নাথমুনি যে দেখিয়াছেন, তাঁহার সহজাত সাত্ত্বিকী সংস্কার, ত্যাগ বৈরাগ্য ও কৃচ্ছ্রময় তপস্যার সংস্কার, জীবনের গভীরতর খাতে বহিয়া চলিয়াছে অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার মতো। সে প্রচ্ছন্ন ধারার আত্মপ্রকাশের আর বেশী দেরি নাই। লগ্নটি প্রায় আসিয়া পড়িয়াছে।

এদিকে নাথমুনির নিজের মহাপ্রয়াণের দিনটিও নিকটবর্তী হয়। বিদায়ের দিন অন্তরঙ্গ শিষ্য, উচ্চকোটির ভক্তিসিদ্ধ সাধক, মানাক্কাল নম্বিকে নিভৃতে নিজের শয্যার পাশে ডাকাইয়া আনিলেন। কহিলেন, "নম্বি, তোমার ওপর বহু কর্তব্যের ভারই বহুবার চাপিয়েছি। এবার চাপিয়ে দেবো একটি ঐশ্বরীয় কাজের দায়িত্ব।

"আজ্ঞা করুন প্রভু, এ দাস যে কোনো কঠিন কাজে পিছপাও হবে না।" জোড়হস্তে নিবেদন করেন নম্বি।"

"তা জানি বৎস। এবার মন দিয়ে শোনো আমার কথা। আমার সময় পূর্ণ হয়েছে. আজই আমি এই দেহের খোলস ছেড়ে যাচ্ছি। কিন্তু তার আগে দক্ষিণদেশের সহস্র সহস্র ভক্তের, বিশেষ ক'রে শ্রীসম্প্রদায়ের অনুগামীদের একটা আশ্রয় গড়ে তোলার কথা আমি ভাব্‌ছি। নম্বি, তুমি আমার পৌত্র, রাজা যামুনকে তো জানো ?

"আজ্ঞে হ্যাঁ, তাঁর ওখানে আমি কয়েকবার গিয়েছি। সদাচারী এবং ধার্মিক রাজা, তা স্বীকার করতে হবে।"

"শোনো নম্বি, যতই ভালো হোক, রাজত্ব নিয়েই সে মজে আছে। তা থেকে তাঁকে টেনে বার করতে হবে।"

"সে কি কথা, প্রভু, এ আপনি কি বলছেন ?"

"হ্যাঁ নম্বি, তাই করতে হবে এবং তোমাকেই তা করতে হবে। প্রভু রঙ্গনাথ আমায় তাঁর স্বরূপ দেখিয়ে দিয়েছেন। একটা শক্তিধর মহাবৈরাগী প্রচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে রাজা যামুনের ভেতরে। সে জানে না যে সে ঈশ্বর প্রেরিত মহাসাধক। বহুজনের উদ্ধারকারী সে। কিন্তু আপন স্বরূপ সে বিস্মৃত হয়েছে, ডুবে আছে বিষয়ের পঙ্কে। তাকে সেই পঙ্ক থেকে টেনে তুলতে হবে, জানিয়ে দিতে হবে তাঁর প্রকৃত পরিচয়, বুঝিয়ে দিতে হবে ঐশ্বরীয় কার্যের গুরুদায়িত্বের কথা।"

"কিন্তু, প্রভু, আমায় দিয়ে কি ক'রে এই দুরূহ কাজ সম্পন্ন হবে, তা আমি বুঝে উঠতে পারছিনে।"

"তুমিই এটা করবে, বৎস। রাজা যামুন সব সময়ে রাজকার্যের জটিল জালে আবদ্ধ। তাঁকে কৌশলে তোমায় ভুলিয়ে আনতে

হবে শ্রীরঙ্গনাথের চরণ তলে। তাঁর ভেতরকার সুপ্ত শক্তিকে জাগিয়ে তুলতে হবে। রঙ্গনাথের কৃপায় তুমি ভক্তিসিদ্ধ হয়েছো। তোমার পবিত্র সঙ্গ দেবে যামুনকে কিছুদিনের জন্য। দেখবে মুক্তি আস্বাদনের লোভে উন্মত্তের মতো বেরিয়ে আসবে সে তার সোনার পিঞ্জর থেকে। যে-কোনো উপায়ে তাঁকে টেনে বার ক'রে এনো, নম্বি, গুরু হিসেবে এই আমার শেষ নির্দেশ তোমার প্রতি।"

"আপনার আজ্ঞা এ দাস শিরোধার্য করছে, প্রভু।"

বৃদ্ধ নাথমুনির অন্তর তৃপ্তিতে ভরিয়া উঠে। চোখে মুখে ছড়াইয়া পড়ে দিব্য আলোকের আভা, হৃদ্‌পদ্মে প্রভু রঙ্গনাথজীর ধ্যান করিতে করিতে প্রবিষ্ট হন নিত্যলীলার মহাধামে।

মানাক্কাল নম্বি অচিরে উপনীত হন যামুনের রাজধানীতে। নাথমুনির প্রিয়তম শিষ্য তিনি, তাছাড়া শ্রীরঙ্গমের এক খ্যাতনামা সাধক তিনি। যামুনের সহিত পূর্ব হইতেই তিনি সুপরিচিত। সভাগৃহে নম্বির দর্শন পাওয়া মাত্র সসম্ভ্রমে যামুন জ্ঞাপন করেন অভ্যর্থনা, পিতামহের অন্তিম সময়ের কথা শ্রবণ করেন তাঁহার কাছে। তারপর রাজ-অতিথি ভবনে নম্বির যথোচিত অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করিয়া লিপ্ত হইয়া পড়েন জরুরী কাজে।

ইতিমধ্যে কয়েকদিন কাটিয়া গিয়াছে, কিন্তু রাজা যামুনের সঙ্গে কোনো কথাবার্তা বলার সুযোগই নম্বি পাইতেছেন না। মন্ত্রীর কাছে দরবার করিয়াও রাজার সহিত সাক্ষাৎ করা সম্ভব হইতেছে না।

লোকের কানাঘুষায় শুনিলেন, প্রতিবেশী একটি দুষ্ট রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধের আয়োজন চলিতেছে, যামুন তাই অতিমাত্রায় ব্যস্ত। এজন্যই ভক্ত নম্বিকে কোনো সময় দেওয়া তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইতেছে না।

নম্বি এবার তাঁহার কার্যক্রম স্থির করিলেন। গুরু নাথমুনি বলিয়া গিয়াছেন, প্রয়োজন বোধে ছলাকলার আশ্রয় নিবে, সেই অনুসারে এক কৌশলপূর্ণ উপায়ও তিনি গ্রহণ করিলেন।

বহু চেষ্টায় সেদিন রাজার সহিত সাক্ষাৎ ঘটিল। যামুন সৌজন্য

ও বিনয় দেখাইয়া কহিলেন, "ভক্তপ্রবর, আমি একটা আসন্ন যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে মহাব্যস্ত, ইচ্ছা সত্ত্বেও আপনার মতো বৈষ্ণব সাধকের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে পারছিনে।"

নম্বি একথার সুযোগ নিতে ছাড়িলেন না। সবিনয়ে কহিলেন, "মহারাজ, যুদ্ধের প্রস্তুতির সব চাইতে বড় কথা—অর্থ, সমরোপকরণ ও সেনা বাহিনী। আপনার তো কিছুরই অভাব নেই।"

"ভক্তবর, বড় রকমের উদ্যোগ আয়োজনে কোনো কোনো দিকে অভাব তো কিছুটা থাকবেই। প্রতিপক্ষ অতি খল এবং শক্তিশালী। তাকে চকিতে আক্রমণ ক'রে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করতে চাই আমি। নতুবা বিষদাঁত বার বার গজাবে, আর অযথা আমাদের কামড়াতে আসবে।"

"অভিজ্ঞ রাজনীতিকের মতোই কথা বলছেন আপনি।" প্রশংসার সুরে বলেন নম্বি।

"যত সত্বর হয়, একটি বৃহৎ অশ্বারোহী বাহিনী আমি গড়ে তুলতে চাই, এই বাহিনী নিয়ে তড়িৎবেগে আক্রমণ করা যায়, আকস্মিক ও তীব্র আক্রমণে শত্রু সেনা হয় ছিন্নভিন্ন। কিন্তু এই বাহিনীকে বড় ক'রে তুলতে হলে বিদেশ থেকে আনা দরকার অজস্র বলবান্ ও বেগবান্ অশ্ব। এর জন্য প্রচুর অর্থ চাই। রাজকোষে টান পড়ে গিয়েছে। এ সম্পর্কিত ব্যবস্থাদি নিয়ে একটু ব্যতিব্যস্ত রয়েছি আমি। একটু অপেক্ষা করুন, অবসর ক'রে নিয়ে আপনার সঙ্গে আবার আলাপ করবো।"

"মহারাজ, প্রচুর অর্থ হলেই তো আপনার সব সমস্যা মিটে যায়।"

"তা যায় বৈ কি। কিন্তু হঠাৎ তা চাইলেই তো আর এ বস্তু পাওয়া যায় না।"

নম্বি এবার ছাড়েন তাঁহার অমোঘ বাণ। কহেন, "মহারাজ অর্থের জন্য ভাবনা নেই। প্রচুর অর্থ আমার কাছে গচ্ছিত রয়েছে, হ্যাঁ, বিপুল পরিমাণ ধনরত্ন রয়েছে, এবং আপনিই হচ্ছেন তার

একমাত্র উত্তরাধিকারী। এ ধন সম্পদ আপনার হাতে ন্যস্ত ক'রে আমি দায়িত্ব থেকে রেহাই পেতে চাই, মহারাজ।"

মুহূর্তে যামুনের আয়ত নয়ন দুটি ঝক্‌ঝক্ করিয়া উঠে, উৎসাহে উদ্দীপনায় খপ্ করিয়া নম্বির হাত দুটি তিনি ধরিয়া ফেলেন। বলেন, "বলুন, তাড়াতাড়ি বলুন, কার অর্থ? কে-ই বা দান করেছেন আমাকে?"

"মহারাজা, আপনার পিতামহ নাথমুনি সাংসারিক আশ্রমে দরিদ্র ছিলেন বটে, কিন্তু সন্ন্যাস নেবার পর বিপুল অর্থের মালিক হন তিনি। শ্রীরঙ্গমের পুণ্যভূমিতে নিভৃতে তপস্যা করার কালে দৈব কৃপায় বিপুল ধনরত্ন তিনি প্রাপ্ত হন। সে সব গচ্ছিত রয়েছে আপনারই জন্য। নাথমুনির ঐশ্বর্য তাঁর একমাত্র পৌত্র ছাড়া আর কে পাবে বলুন তো?"

"কোথায় আছে সে ধন, মহাত্মন্, কে জানে তার সন্ধান? বলুন, বলুন, সব আমায় অকপটে খুলে বলুন।" রাজা যামুনের এবার ধৈর্য ধারণ করা দায়।

প্রশান্ত কণ্ঠে উত্তর দেন নম্বি, "মহারাজ, একমাত্র আমিই জানি সে গুপ্তধনের সন্ধান। যদি পেতে চান, আর দেরি না ক'রে আমার সঙ্গে চলুন।"

উৎসাহে যামুন চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছেন। বলেন, "এখুনি আমি আমার দেহরক্ষীদের তৈরী হতে নির্দেশ দিই, যানবাহনের ব্যবস্থাদিও করতে বলি।'

উত্তরে নম্বি কহিলেন, "মহারাজা, গুপ্তধনের স্থানটি হচ্ছে দূরে, শ্রীরঙ্গম অঞ্চলে। আর সেখানে আপনাকে যেতে হবে একলাটি আমার সঙ্গে এবং গোপনে ছদ্মবেশে। বেশী জানাজানি হলে কিন্তু সব বেহাত হয়ে যাবে। ওখান থেকে ফেরবার সময় লোকলস্কর ও যানবাহনের ব্যবস্থার জন্য আপনাকে ভাবতে হবে না।"

যামুন তাঁহার রাজকার্যের ভার কিছুদিনের জন্য মন্ত্রীর উপর ন্যস্ত রাখিলেন। প্রচার করিয়া দিলেন, শরীর পীড়াগ্রস্ত, তাই

কিছুদিন তিনি প্রাসাদের অভ্যন্তরে থাকিয়া বিশ্রাম নিবেন, কেহ যেন এ কয়টি দিন তাঁহাকে বিরক্ত না করে।

সেইদিনই গভীর রাত্রে নম্বিকে সঙ্গে নিয়া যামুন গোপনে ত্যাগ করেন রাজপ্রাসাদ। সাধারণ নাগরিকের ছদ্মবেশে উভয়ে রওনা হন পুণ্যভূমি শ্রীরঙ্গমের দিকে।

পথে চলিতে চলিতে নম্বি কহিলেন, "মহারাজ, সারাটা পথ পদব্রজে অতিক্রম করতে হবে। আমি স্থির করেছি, প্রতিদিন তিন ক্রোশের বেশী আমরা অগ্রসর হবো না। কারণ, আপনার পক্ষে বেশী শ্রম সহ্য করা কঠিন।"

যামুন রাজপ্রাসাদের বিলাসব্যসনে অভ্যস্ত, পদব্রজে চলার অভ্যাস মোটেই নাই, নম্বির কথায় তৎক্ষণাৎ সায় দিলেন।

তিন ক্রোশ অন্তর এক একটি গ্রামে পৌঁছিয়া উভয়ে বিশ্রাম করিতেন। তারপর ভক্ত নম্বি শুরু করিতেন তাঁহার ইষ্টসেবার কাজ। স্নান বন্দনাদি শেষ করিয়া ঠাকুরের প্রসাদ রন্ধন করিতেন, তারপর পূজা ও ভোগ নিবেদনের পর রত হইতেন গীতাপাঠে। ভাবাপ্লুত কণ্ঠে উচ্চ স্বরে প্রতিদিন তিন অধ্যায় তিনি পাঠ করিতেন, আর পাশে বসিয়া যামুন তাহা শ্রবণ করিতেন।

নম্বি ভক্তিসিদ্ধ পুরুষ। গীতা পাঠ শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে সারা দেহ তাঁর পুলকাঞ্চিত হইয়া উঠে। চোখে মুখে ফুটিয়া উঠে দিব্য জ্যোতির আভা, অপার্থিব আনন্দে তিনি ভরপুর হইয়া উঠেন।

যামুন সবিস্ময়ে পরম ভক্তের এই আনন্দঘন মূর্তির দিকে চাহিয়া থাকেন। অন্তরে বার বার লাগে দোলা, ভাবিতে থাকেন, অপার আনন্দের অধিকারী এই নম্বি, স্বর্গীয় আনন্দের আস্বাদ লাভ ক'রে জীবন তাঁর হয়েছে ধন্য, কৃতার্থ। গীতাপাঠ, বহুতর শাস্ত্রপাঠ, যামুন আগে বহু করেছেন। কিন্তু স্বাধ্যায়কে এমন ক'রে ইষ্ট চিন্তনের সঙ্গে মিশিয়ে মধুর ক'রে তো কখনো তুলতে পারেন নি। তাছাড়া, রাজকার্যে লিপ্ত হবার পর থেকে একের পর এক মায়া বন্ধনের মধ্যে

জড়িয়ে পড়েছেন যামুন। দিব্যলোকের আনন্দ ও প্রসাদ থেকে রয়েছেন বঞ্চিত।'

মহাপুরুষ নম্বির পাঠ যেন চৈতন্যময়। উচ্চারিত এক একটি শ্লোক যেন উন্মোচিত ক'রে ঈশ্বর চেতনার এক একটি দিব্য স্তর। পরমপ্রভু শ্রীকৃষ্ণের মহাবাণী বার বার অনুরণিত হয় যামুনের অন্তরে —ভক্তি নিয়ে এসো, শরণাগতি নিয়ে এসো আমার কাছে, আমি তোমায় দেবো পরাশান্তি, দেবো পরামুক্তি। এ বাণী মন-ভোলানো প্রাণ-গলানো। এ বাণী যে অমোঘ।

সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ে আসে তীব্র অনুশোচনা। যে বিষয় বিভব ক্ষণস্থায়ী, যে দেহ ভঙ্গুর ও মরণশীল তাহা নিয়াই নির্বোধের মতো সময় কর্তন করিয়াছেন এতদিন। আর নয়, এবার ছিন্ন করিতে হইবে এই বন্ধন ডোর, শুরু করিতে হইবে অমৃতময় জীবনের পথ-সন্ধান।

ছয় দিনের পথে অষ্টাধ্যায়ী গীতা নম্বি পাঠ করিলেন, এই পাঠ যামুনের অন্তরে জাগাইয়া তুলিল দিব্যলোকের স্পর্শ, কাজ করিল মন্ত্রচৈতন্যের মতো। 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' ঘটিল রাজা যামুনের বিষয়-বিমোহিত জীবনে।

সপ্তম দিনের প্রত্যুষে উভয়ে পৌঁছিয়া গেলেন শ্রীরঙ্গমে। কাবেরীতে স্নান সমাপনের পর নম্বি যামুনকে উপস্থিত করিলেন শ্রীবিগ্রহ রঙ্গনাথজীর সম্মুখে। প্রেমাপ্লুত স্বরে কহিলেন, "মহারাজ, এই দেখুন আপনার পিতামহ নাথমুনির গুপ্ত ভাণ্ডার। এই ভাণ্ডারের সন্ধান আপনাকে দেবো বলে আমি প্রতিশ্রুত ছিলাম আমার গুরুর কাছে, আজ তা পালিত হল।"

বিগ্রহ দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে যামুন প্রেমাবেশে আত্মহারা হইয়া গেলেন। দরদর ধারে ঝরিতে লাগিল পুলকাশ্রু। রঙ্গনাথজীর জ্যোতির্ময়, আনন্দঘন, মূর্তি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল তাঁহার হৃদয়াকাশে। বাহ্যচৈতন্য হারাইয়া মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন মন্দিরতলে।

সেইদিন হইতে যামুন পরিণত হন এক নূতন মানুষে। রাজা যামুনের এবার মৃত্যু ঘটিয়াছে, সেস্থলে জাগিয়া উঠিয়াছে ভক্তিপ্রেম পথের এক ভিখারী সাধক।

রাজসিংহাসন ও রাজবৈভব যামুন চিরতরে ত্যাগ করিলেন, পিতামহ নাথমুনির পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া গ্রহণ করিলেন সন্ন্যাস। প্রেম, ভক্তি ও প্রপত্তির পথে, ইষ্টপ্রাপ্তির পথে, শুরু হইল তাঁহার অভিযাত্রা।

রাজধানী হইতে স্বজনেরা, পাত্রমিত্রেরা, যামুনকে ফিরাইয়া নিতে আসিলেন। কিন্তু অনুনয় ও অশ্রুজল ত্যাগী ভক্তের সংকল্প টলাইতে পারিল না। স্মিত হাস্যে তিনি উত্তর দিলেন, "যে রাজ্য, যে বিষয়বৈভব নিয়ে এতদিন দিন কাটিয়েছি তা ক্ষণস্থায়ী, মূল্যহীন। এবার এক নূতন রাজার অধীনে কাজ নেবো। সে রাজার দ্বিতীয় নেই, আর রাজ্য তাঁর সারা সৃষ্টি জুড়ে,—অখণ্ড, অনন্ত, শাশ্বত সে রাজ্য। সে রাজ্যের রাজাই শুধু দিতে পারেন অমৃতত্ব আর অখণ্ড দিব্য আনন্দ। পরমপ্রভু শ্রীবিষ্ণুই সেই রাজা,—আর তাঁর জাগ্রত বিগ্রহ এই শ্রীরঙ্গনাথ। এখন থেকে আজীবন আমি থাকবো তাঁরই সেবক হয়ে।"

আত্মপরিজন ও শুভানুধ্যায়ীরা বুঝিলেন বৈরাগ্যবান্ সাধককে সংসার জীবনে আর ফিরাইয়া নিবার উপায় নাই, হতাশ হইয়া তাঁহারা দেশে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

শ্রীরঙ্গমের ভক্ত-সমাজে, বিশেষত বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীদের মধ্যে, আনন্দের জোয়ার বহিয়া যায়। সকলেরই মনে আশা জাগিয়া উঠে, ভক্তি প্রেমের যে পথটি নাথমুনি প্রবর্তন করিয়া গিয়াছেন, প্রতিভাধর যামুনের সাধনা ও সিদ্ধিতে সে পথটি এবার আরো প্রশস্ততর হইবে, হইবে আরো আলোকোজ্জ্বল।

শ্রীরঙ্গনাথের সেবা পূজায় যামুন এবার প্রাণমন ঢালিয়া দেন। সেই সঙ্গে চলে ভক্তিমার্গীয় সাধনতত্ত্ব ও দর্শনের গবেষণা ও গ্রন্থ-রচনা। কয়েক বৎসরের মধ্যে এক ভক্তিসিদ্ধ মহাপুরুষরূপে তিনি

পরিচিত হইয়া উঠেন। শ্রীরঙ্গমের ভক্তগোষ্ঠীর নেতারূপে, বিশিষ্টা-দ্বৈতবাদের শ্রেষ্ঠ আচার্যরূপে, সারা দাক্ষিণাত্যে বিস্তারিত হয় তাঁহার খ্যাতি প্রতিপত্তি।

অমানুষী প্রতিভা নিয়া আচার্য যামুন জন্মিয়াছেন, বহুপূর্ব হইতেই সর্বশাস্ত্রে তিনি পারঙ্গম। এবার তাঁহার সেই পাণ্ডিত্য ও নেতৃত্বের দক্ষতা ঐশ্বরীয় কার্যে নিয়োজিত হইল।

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের এক বিস্তৃততর দার্শনিক ব্যাখ্যা আচার্য যামুন উপস্থাপিত করিলেন। পিতামহ নাথমুনি যে দার্শনিকতার প্রবর্তন করেন, তাহার ভিত্তিকেই তিনি করিলেন দৃঢ়তর। যামুনাচার্যের পরবর্তীকালে তাঁহার নাতিশিষ্য রামানুজের অবদানের ফলে এই বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ পরিগ্রহ করে এক পূর্ণতর অবয়ব, আত্মপ্রকাশ করে আচার্য শঙ্করের প্রতিপক্ষীয় সুসম্বদ্ধ দার্শনিক মতবাদরূপে।

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের ধারা এদেশে সুপ্রাচীন কাল হইতে বহমান। ব্রহ্মসূত্রে আচার্য আশ্মরথ্যকে উল্লেখ করা হইয়াছে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী-রূপে। মহাভারতে পাঞ্চরাত্রমতের কথা বর্ণিত আছে, ঐ মতবাদে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের ছায়াটিকে স্পষ্টরূপে দেখা যায়।

ব্রহ্মসূত্রের বিষ্ণুপর ব্যাখ্যার সূচনা দশম শতকে। নাথমুনি ও যামুনাচার্যের পরে একাদশ শতকে রামানুজের আবির্ভাব ঘটে এবং তাঁহার বিষ্ণুসাধনা ও দার্শনিক ব্যাখ্যার মাধ্যমে প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠে বিশিষ্টাদ্বৈত মতের ভক্তিবাদ।

কিন্তু একথা ভুলিলে চলিবে না, নাথমুনি, যামুন ও রামানুজের ভক্তিবাদের উৎস আড়বার সাধকদের জীবন সাধনা। তামিলদেশে ভক্ত আড়বারগণ আবির্ভূত হন ঐতিহাসিক যুগের অনেক পূর্বে। শ্রীবৈষ্ণবেরা বলেন, প্রাচীন আড়বার আচার্যদের অভ্যুদয় ঘটে দ্বাপর যুগের শেষের দিকে। এই অভ্যুদয়ের ধারা এবং গুরু-পরম্পরা কলিযুগ অবধি বহিয়া চলে।

ভক্তিসিদ্ধ প্রাচীন আড়বারদের মধ্যে রহিয়াছেন: কাঞ্চীর পোঁইহে, মল্লাপুরীর পূদত্ত, ময়লাপুরের পে, মহীসারের তিরুমিড়িশি।

পরবর্তীকালের উল্লেখযোগ্য হইতেছেন—শঠকোপ, মধুর কবি, কুলশেখর, পেরিয়া, অণ্ডাল প্রভৃতি। ইঁহাদের প্রেমভক্তিময় জীবনের কাহিনী ও রচিত স্তবগাথা হাজার হাজার বৎসর যাবৎ দাক্ষিণাত্যকে ভক্তিরসে সিঞ্চিত করিয়াছে। অগণিত নরনারীর জীবনে আনিয়াছে ভক্তি, প্রেম ও শরণাগতির প্রেরণা।

আড়বারদের এই ভক্তিবাদ এবার নবতর রূপ পরিগ্রহ করিল যামুনাচার্যের সাধনা, সিদ্ধি ও দার্শনিক তত্ত্বের মধ্য দিয়া।

প্রাচীন আড়বার ও তাঁহাদের উত্তরসূরী বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী সাধক ও দার্শনিকদের প্রসঙ্গে স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী লিখিয়াছেন:

—প্রাচীন আলোয়ারগণ যে ভক্তির স্নিগ্ধ শান্তভাব প্রবাহে অবগাহন করিয়া পূতপবিত্র হইয়াছেন, সেই পূত প্রবাহের সহিত দার্শনিকতার সম্মিলনে পুণ্যতীর্থের সৃষ্টি হইয়াছে। যামুনাচার্য্যের সময় হইতেই ইহাদের মধ্যে দার্শনিক প্রতিভার বিকাশ হইয়াছে। একদিকে যেমন আলোয়ারগণ ভক্তিবাদের প্রসার করিয়াছেন, অন্যদিকে তেমন দ্রমিড়াচার্য্য গুহদেব, টঙ্ক, শ্রীবৎসাঙ্ক প্রভৃতি আচার্য্যগণ দর্শনের মহিমা প্রকটিত করিয়াছেন। যামুনাচার্য্যের পূর্বে বেদান্তদর্শনের ভাষ্যকার দ্রমিড়াচার্য্য আপনার প্রতিভার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। শ্রীবৎসাঙ্ক মিশ্র, টঙ্ক প্রভৃতি আচার্য্যগণ ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। 'সিদ্ধিত্রয়' নামক গ্রন্থে যামুনাচার্য্য প্রাচীন আচার্য্যগণের নামোল্লেখ করিয়াছেন। ভাষ্যকার দ্রমিড়াচার্য্য, টীকাকার টঙ্ক, ও শ্রীবৎসাঙ্ক প্রভৃতি আচার্য্যগণ শ্রীসম্প্রদায়ভুক্ত। আচার্য্য ভর্তৃপ্রপঞ্চ, ভর্তৃহরি, ব্রহ্মদত্ত শঙ্কর প্রভৃতি নির্বিশেষ ব্রহ্মবাদী। আচার্য্য ভাস্কর ভেদাভেদবাদী। যখন নির্বিশেষ ব্রহ্মবাদের ও ভেদাভেদবাদের অভ্যুদয় হইয়াছে, তখন স্বীয় মত প্রতিষ্ঠার জন্যই যামুনাচার্য্যের দার্শনিক ক্ষেত্রে অবতরণ। দশম শতাব্দী দার্শনিক প্রতিভার যুগ, সকলক্ষেত্রেই নবজীবনের সূত্রপাত হইয়াছে। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদও তখন আপনার প্রতিষ্ঠার জন্য অগ্রসর হইয়াছে।

—অনেকে মনে করেন, শঙ্করের জ্ঞানবাদে ব্যভিচারের সূত্রপাত হইলে, আচার্য্য রামানুজ প্রভৃতির আবির্ভাব হয়; কিন্তু আমাদের মনে হয় এই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। কারণ, যামুনাচার্য্যের অবতরণ কালেই বাচস্পতির আবির্ভাব কাল। বাচস্পতির মহিমা যখন সমস্তদেশে পরিব্যাপ্ত হইতেছিল, তখনই রামানুজের আবির্ভাব। একাদশ শতাব্দীতে বাচস্পতির প্রতিভা সমস্ত ভারতে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। ভারতের আচার্য্যগণ সকলেই অবতার। ধর্মের গ্লানি না হইলে অবতার অবতীর্ণ হন না। জীবন চরিতকার-গণ অবতারের ফলে ধর্মের গ্লানি অঙ্গীকার করিয়া লইয়াছেন। আচার্য্য রামানুজ ও মধ্ব প্রভৃতির আবির্ভাবের কারণ শাঙ্করমতের গ্লানি। কিন্তু রামানুজ ও মধ্বের যুগে শাঙ্কর সম্প্রদায়ের প্রতিভার আরও অধিকতর স্ফূর্তি হইয়াছে। যে মতের গ্লানি হয়, তাহার স্ফূর্তি অসম্ভব। যদি শাঙ্করমতের গ্লানি হইত, তাহা হইলে দার্শনিক মনীষার প্রস্ফুরণ হইতে পারিত না। আমাদের বিবেচনায় যখন শাঙ্করমতের প্রাধান্য সুস্থিত হইয়াছে, তখন প্রতিদ্বন্দ্বী মতবাদ সকল স্বীয় প্রতিষ্ঠার জন্য শাঙ্করমত আক্রমণ করিয়াছেন।

…—প্রবল শত্রুকে পরাজিত করিবার জন্যই সমধিক প্রচেষ্টার আবশ্যকতা, যদি শাঙ্করমতের গ্লানিই আরম্ভ হইয়াছিল। তাহা হইলে যামুনাচার্য্য, রামানুজাচার্য্য প্রভৃতি আচার্য্যগণ বদ্ধপরিকর হইয়া শাঙ্করমত খণ্ডন করিতেন না। বিশেষতঃ যামুনাচার্য্য নির্বিশেষ ব্রহ্মবাদী আচার্য্যগণের নামোল্লেখ করিয়া তাহাদের মত নিরসনের জন্যই 'প্রকরণ প্রক্রমের' আবশ্যকতা স্বীকার করিয়াছেন। প্রবল যোদ্ধাকে পরাজিত করিবার জন্যই এরূপ চেষ্টা স্বাভাবিক।

—শাঙ্করমতের প্রবলতায় ও ভাস্করমতের অভ্যুদয়ে বিষ্ণুভক্তিবাদ স্থাপনের জন্যই যামুনাচার্য্যের প্রয়াস। যখন শঙ্করের জ্ঞানবাদে সমস্ত দেশ প্লাবিত, তখনই যামুনাচার্য্যের দার্শনিক ক্ষেত্রে অবতরণ। দক্ষিণ ভারতে তৎকালে সকল সম্প্রদায়ই আপন আপন মতবাদের

প্রতিষ্ঠার জন্য লালায়িত। যামুনাচার্য্যও বৈষ্ণবমতের প্রতিষ্ঠার জন্য দার্শনিক ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন।

যামুনাচার্যের রচিত গ্রন্থসমূহেব মধ্যে প্রধান—সিদ্ধিত্রয়ম। বিশিষ্টাদ্বৈত সিদ্ধান্ত ইহাতে সুন্দররূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। তাঁহার অপর রচনাবলী নাম—স্তোত্ররত্নম্, আগমপ্রামাণ্যম্ এবং গীতার্থ সংগ্রহ।

আচার্য যামুন তাঁহার দার্শনিক ব্যাখ্যায় প্রধানত শঙ্করের নির্বিশেষ ব্রহ্মাত্মবাদকে আক্রমণ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মতে চেতন ও অচেতন সকল বস্তুই হইতেছে ব্রহ্মের শরীর, আর ব্রহ্ম সেই শরীরের আত্মা এবং অধিষ্ঠাতা। শরীর ও শরীরীকে এক বলিয়া ধরা হইয়া থাকে, কাজেই ব্রহ্ম স্বরূপত এক এবং অদ্বিতীয়। তরঙ্গ, ফেনা ও বুদ্বুদ প্রভৃতি অংশ থাকা সত্ত্বেও সমুদ্রকে এক ও অখণ্ড বলিয়া গণ্য করা হয়; তেমনি জীব, জগৎ ও ঈশ্বর প্রভৃতির অনেকত্ব থাকিলেও সমষ্টিভূত সত্তা, পুরুষোত্তম নারায়ণ এক এবং অখণ্ড।

আচার্য যামুন আরও বলেন, ঈশ্বর পুরুষোত্তম; সৃষ্ট জীব হইতে তিনি শ্রেষ্ঠ। ঈশ্বর পূর্ণ, জীব অণু অংশ। ঈশ্বর ও জীব নিত্য পৃথক। তাঁহার মতে, মুক্ত জীব ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করে, কিন্তু ঈশ্বরভাব লাভ করিতে সক্ষম হয় না।

ব্রহ্ম ও জীবের ভেদের কথা বলিতে গিয়া তিনি বলিয়াছেন—এই দুইয়ে স্বজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদ নাই। কিন্তু স্বগত ভেদ রহিয়াছে। তাঁহার মতে, 'মৌলিক পদার্থ তিনটি,—চিৎ, অচিৎ ও পুরুষোত্তম। চিৎ—জীব, অচিৎ—জগৎ, আর পুরুষোত্তম—ব্রহ্ম। ব্রহ্ম সবিশেষ—সগুণ, অশেষ কল্যাণ গুণের নিলয়, সর্বনিয়ন্তা। জীব তাঁহার চির দাস।'

সাধক যামুনের প্রাণের আকাঙ্ক্ষা, তিনি থাকিবেন পরম প্রভুর ঐকান্তিক নিত্যকিঙ্কর হইয়া। দাস্য ও পরাভক্তিতে তিনি

অভিলাষী, কাজেই সবিশেষ ব্রহ্ম এবং তাঁহার মূর্ত ব্রহ্মরূপই তাঁহার ধ্যেয়।

তাঁহার এই দার্শনিক সিদ্ধান্ত প্রধানত বিষ্ণুপুরাণ হইতে তিনি গ্রহণ করিয়াছেন। ঐ পুরাণে মহামুনি পরাশর চিৎ, অচিৎ ও ঈশ্বর সম্বন্ধে যে দিগ্‌দর্শন দিয়াছেন। আচার্য শ্রদ্ধাভরে তাহার গুণকীর্তন করিয়াছেন।[১]

যামুনাচার্যের স্তোত্ররত্নে পরাভক্তি ও শরণাগতির তত্ত্বটি বড় মনোরম হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। প্রাণের আকুতি উৎসারিয়া ভক্তি-সিদ্ধ মহাপুরুষ বলিতেছেন :

মখনাথ যদস্তি যোঽস্ম্যহং
সকলং তদ্ধি তবৈব মাধব।
নিয়তং স্বমিতি প্রবুদ্ধধীরথ বা
কিংনু সমর্পয়ামি তে॥

—হে নাথ, হে মাধব, যা কিছু আমি, যা কিছু আমার সকলই যে তোমার প্রভু! যদি কখনো আমার এরূপ জ্ঞান হয় যে,—সকলই সর্বসময়ে একান্তভাবে তোমার—তবে আমার কোন্ বস্তু কি ক'রে করবো তোমায় সমর্পণ?

"এই শরণাপত্তির সহিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের সাদৃশ্য আছে।—কি দিব আমি, যে ধন তোমারে দিব, সেই ধন তুমি। আচার্য যামুন সর্বস্ব তাঁহাতে বিকাইয়া দিয়াছেন, আর বৈষ্ণব কবি যাহা কিছু সকলই নারায়ণ রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। যামুনাচার্যের ভাব—তবৈবাহং। বৈষ্ণব কবির ভাব অনেকটা পরিমাণে— মমৈব ত্বং।

"ঈশ্বরের সহিত জীবের পিতা, মাতা, তনয়, সুহৃদ্ সকল সম্বন্ধই সম্ভব, কিন্তু দাস্য ভাবই যামুনাচার্যের মতে শ্রেষ্ঠ। এক স্তোত্রে তিনি প্রার্থনা করিতেছেন, 'হে প্রভু, তোমার প্রতি দাস্য ভাবই সকল ভাবের শিরোমণি। একমাত্র দাস্যসুখে আসক্ত ব্যক্তির গৃহে

১. ভাগবতধর্মের প্রাচীন ইতিহাস, ২য় খণ্ড: স্বামী বিদ্যারণ্য, (প্রাচ্যবাণী মন্দির)

কীটজন্মও সার্থক, তবুও অন্যবুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তির গৃহে চতুর্মুখ ব্রহ্মা হইয়া জন্মানোও কাম্য নয়।[১]

প্রভু শ্রীরঙ্গনাথের সেবা, দাস্য ও বিশিষ্টাদ্বৈত সিদ্ধান্তের প্রচার, এইসব নিয়া দীর্ঘকাল অতিবাহিত হইয়াছে। এবার যামুনাচার্য পৌঁছিয়াছেন বার্ধক্যের কোঠায়। মনে কেবলই দুশ্চিন্তা. ভক্তিবাদের যে ভিত্তি তিনি রচনা করিয়াছেন, তাহার উপর সৌধ গড়িয়া তুলিবে কে? দার্শনিক সিদ্ধান্তগুলিকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা দরকার, সে কাজের উপযোগী ভক্তি ও প্রতিভাই-বা সমকালীন কোন্ সাধকের আছে?

এসব নানা চিন্তায় আচার্যের অন্তর আলোড়িত হয়। কাঁদিয়া কাঁদিয়া রঙ্গনাথজীর চরণে দিনের পর দিন নিবেদন করেন, "প্রভু, ভক্ত নিয়েই তোমার সংসার, দেখো ভক্তিধৃত শ্রীসম্প্রদায় যেন তোমার কৃপা হতে বঞ্চিত হয় না। ভক্তি, প্রপত্তি ও দাস্যভাবের মাহাত্ম্য প্রকটিত হোক, এই যে আমার অন্তরের একমাত্র আকুতি।"

কিছুদিনের মধ্যেই প্রভু বরদরাজের অন্তরঙ্গ ভক্ত কাঞ্চীপূর্ণের সহিত শ্রীরঙ্গম মন্দিরে যামুনাচার্যের দেখা। কথাপ্রসঙ্গে কাঞ্চীপূর্ণ কহিলেন, "আচার্যবর, শাঙ্কর বেদান্তী যাদবপ্রকাশের কৃতী ছাত্র লক্ষ্মণের কথা আমি আপনাকে বলতে চাই। অদ্বৈত সিদ্ধান্তে সে পারঙ্গম, কিন্তু কি বিস্ময়কর ভক্তি ও সংস্কার নিয়ে সে জন্মেছে। তেমনি রয়েছে অমানুষী প্রতিভা। বেদান্তের বিষ্ণুপর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ নিয়ে দিনরাত রয়েছে সে মগ্ন হয়ে। লক্ষ্মণকে আমি তার বাল্যকাল থেকে জানি, যৌবনেও তাকে দেখছি অন্তরঙ্গভাবে। আমার কোনো সন্দেহ নেই আচার্য, বরদরাজের সে কৃপাপ্রাপ্ত, ভক্তি আন্দোলনের সে এক চিহ্নিত নায়ক।"

আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া বলেন যামুনাচার্য, "কাঞ্চীপূর্ণ, প্রভু রঙ্গনাথজীর চরণে বার বার মিনতি জানিয়েছি আমি, শ্রীসম্প্রদায়ের

১. বেদান্ত দর্শনের ইতিহাস, ১ম ভাগ।

একটি উপযুক্ত ভাবী নেতার জন্য। আশা হচ্ছে, প্রভুর কৃপা প্রসাদ আমরা পেয়ে গিয়েছি। তোমার আজকের সুসংবাদে আমি পরম আনন্দিত।"

কাঞ্চীপূর্ণ আরো জানান, "আচার্য, অধ্যাপক যাদবপ্রকাশের সঙ্গে লক্ষ্মণের বার বার মতদ্বৈধ ঘটেছে দ্বৈত ও অদ্বৈতবাদের সিদ্ধান্ত নিয়ে। আমার মনে হয়, উভয়ের ছাড়াছাড়ি হবার আর বেশী দেরি নেই।"

যামুন বলিলেন, "অতি উত্তম কথা। কাঞ্চীপূর্ণ, কিছুদিন যাবৎ আমি ভাবছি, কাঞ্চীতে গিয়ে প্রভু বরদরাজকে একবার দর্শন ক'রে আসবো।"

"আচার্য। সেই সুযোগে আমরা কাঞ্চীর ভক্তেরা, আপনাকে নিয়ে আনন্দ করতে পারবো।" সোৎসাহে বলে উঠেন কাঞ্চীপূর্ণ।

যামুনাচার্য সেদিন বরদরাজ বিগ্রহ দর্শনে আসিয়াছেন। স্নান তর্পণ ও পূজাদি সমাপ্ত হইয়াছে। অন্তর তাঁহার দিব্য আবেশে ভরপুর। এবার কাঞ্চীপূর্ণ ও অন্যান্য ভক্তদের সঙ্গে নিয়া ফিরিয়া চলেন নিজের আবাসে।

ভাবমত্ত অবস্থায় ধীরে ধীরে পথ চলিতেছেন, হঠাৎ কাঞ্চীপূর্ণ তাঁহাকে বলিয়া উঠেন, "আচার্য, দেখুন দেখুন, বেদান্তকেশরী যাদবপ্রকাশ এদিকে এগিয়ে আসছেন, সঙ্গে রয়েছে তাঁর কৃতী শিষ্যদল। আমাদের প্রিয়ভাজন ভক্ত-প্রবর লক্ষ্মণও রয়েছেন তাঁর সঙ্গে।

যামুনাচার্য রাস্তার একপাশে সরিয়া দাঁড়ান। অদূরে অধ্যাপক যাদবপ্রকাশ তাঁহার ছাত্রদল নিয়া পদব্রজে চলিয়াছেন, আর তাঁহার হাতটি ন্যস্ত রহিয়াছে লক্ষ্মণের স্কন্ধদেশে।

মহাপুরুষ যামুনাচার্য একদৃষ্টে, ভাবময় নেত্রে চাহিয়া আছেন লক্ষ্মণের দিকে। আচার্যের চোখে মুখে ছড়াইয়া পড়িয়াছে প্রসন্ন মধুর হাসির আভা।

কাঞ্চীপূর্ণ হর্ষভরে বলেন, "আচার্য আপনি অনুমতি দিলে

লক্ষ্মণকে আমি ডেকে নিয়ে আসি, আপনার আশীর্বাদ গ্রহণ ক'রে সে ধন্য হোক।"

"না কাঞ্চীপূর্ণ, তার প্রয়োজন নেই। লক্ষ্মণকে আমি আশীর্বাদ ইতিমধ্যেই করেছি। তাঁর ভেতরে পরাভক্তির উন্মেষের জন্য আমার দৃষ্টি দিয়েই করেছি শক্তিপাত। এই লক্ষ্মণই যে শ্রীসম্প্রদায়ের ভাবী নায়ক, একথা আজ আমি জেনেছি অভ্রান্তভাবে। অযথা তার সঙ্গে এসময়ে বাক্যালাপ করলে অদ্বৈত বেদান্তী যাদবপ্রকাশের সঙ্গে নূতন ক'রে এখানে তর্কযুদ্ধ হবে, আমার অন্তরের প্রসন্নমধুর ভাবটি নষ্ট হবে। শ্রীবরদরাজের দর্শনের অভীষ্ট ফল আমি হাতে হাতে এখানে পেয়ে গেছি।"

উত্তরকালে যাদবপ্রকাশের ঐ প্রতিভাদীপ্ত প্রধান ছাত্রেরই অভ্যুদয় ঘটে আচার্য রামানুজরূপে, বিশিষ্টাদ্বৈত মতের প্রখ্যাত প্রবক্তারূপে। ভারতের দার্শনিক সমাজে গ্রহণ করেন তিনি কালজয়ী আসন।

শ্রীরঙ্গমে ফিরিয়া আসিয়াছেন যামুনাচার্য। কিন্তু হৃদয়ে তাঁহার জাগিয়া রহিয়াছে ভক্ত পণ্ডিত লক্ষ্মণের লাবণ্যময় রূপ। পবিত্রতা, তেজস্বিতা আর বিষ্ণুভক্তির যে দিব্য আভা আচার্য তাঁহার আননে দেখিয়া আসিয়াছেন, আর তাহা ভুলিতে পারেন কই?

লক্ষ্মণের সাধন প্রস্তুতি যাহাতে পূর্ণাঙ্গ হইয়া উঠে, অচিরে যাহাতে সে শ্রীসম্প্রদায়ের দায়িত্ব গ্রহণ করে—এই প্রার্থনাটি যামুন আকুল অন্তরে নিবেদন করেন পরমপ্রভুর চরণে। লক্ষ্মণকে একান্ত ভাবে নিজজন রূপে প্রাপ্ত হইবেন, এই উদ্দেশ্যে এ সময়ে এক স্তোত্রও তিনি রচনা করেন। শ্রীসম্প্রদায়ের ভক্তদের মধ্যে এই স্তোত্রটি আজো স্মরণীয় হইয়া আছে।

অল্পদিনের ব্যবধানে শ্রীরঙ্গমে বসিয়া আর এক শুভ সংবাদ প্রাপ্ত হন যামুনাচার্য। সম্প্রতি লক্ষ্মণের সহিত তাঁহার গুরু যাদবপ্রকাশের তীব্র মতভেদ দেখা দিয়াছে এবং উভয়ের মধ্যে ঘটিয়াছে বিচ্ছেদ।

পরম ভক্ত প্রবীণ আড়বার সাধক কাঞ্চীপূর্ণের প্রতি লক্ষ্মণ চিরদিনই অতিশয় শ্রদ্ধাবান্। এবার তিনি এই সিদ্ধ মহাত্মারই আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারই নির্দেশ মতো করিতেছেন সাধন-ভজন, শ্রীবরদরাজের সেবা-অর্চনা ও শাস্ত্রপাঠ।

লক্ষ্মণের প্রাণের আকাঙ্ক্ষা, সিদ্ধ মহাত্মা কাঞ্চীপূর্ণের নিকট তিনি দীক্ষা গ্রহণ করিবেন। কিন্তু এ আকাঙ্ক্ষা তাঁহার পূর্ণ হয় নাই। মহাত্মা বার বারই কেবলই তাঁহাকে এড়াইয়া চলিতেছেন।

যতবারই কাঞ্চীপূর্ণকে লক্ষ্মণ চাপিয়া ধরেন, তিনি বলেন, "বৎস, আমি প্রভু বরদরাজের কাঙাল ভক্ত। তাছাড়া, আমি যে জাতে শূদ্র, তোমার মতো পবিত্রদেহ ব্রাহ্মণকে আমি দীক্ষা দেব কি ক'রে? সর্বোপরি কথা, প্রভুর কাছ থেকে আমি জেনেছি, তোমার গুরুকরণ হবে অন্যত্র। এবং তার আর বেশী দেরি নেই।"

তবুও লক্ষ্মণ কিন্তু মহাত্মা কাঞ্চীপূর্ণকেই জ্ঞান করেন গুরুরূপে, ত্রাতারূপে। তাঁহারই নির্দেশ মতো নিত্যকার সাধনভজন করেন, পবিত্র শালকূপ হইতে জল বহিয়া আনিয়া স্নান করান বরদরাজ শ্রীবিগ্রহকে। এই বিগ্রহের অর্চনা ও ধ্যান জপে তন্ময় হইয়া থাকেন।

এদিকে বৃদ্ধ যামুনাচার্য শ্রীরঙ্গমের মঠে গুরুতর পীড়ায় শয্যাশায়ী হইয়া পড়িয়াছেন। নিজে স্পষ্টতই বুঝিয়া নিয়াছেন, শেষের দিনের আর বেশী দেরি নাই। এবার প্রধান ও অন্তরঙ্গ ভক্ত মহাপূর্ণকে ডাকিয়া কহিলেন, "আমার বিদায়ের লগ্ন প্রায় সমাগত। এ সময়ে শ্রীসম্প্রদায়ের, ভক্তিবাদের, ভবিষ্যৎ ভেবে ব্যাকুল হয়েছি। বাচস্পতি মিশ্রের অভ্যুদয় ঘটেছে, শাঙ্কর মত তিনি নিপুণভাবে প্রপঞ্চিত করছেন। এর বিরুদ্ধে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ আর কতদিন যুঝতে পারবে, টিকে থাকতে পারবে?"

"আপনার নির্দেশের দিকেই তো আমরা চেয়ে আছি, মহাত্মন" —উত্তরে বলেন মহাপূর্ণ।

"ভাবছি কেবল ভক্তশ্রেষ্ঠ লক্ষ্মণের কথা। শুনেছো বোধহয়, যাদবপ্রকাশের সঙ্গে সকল সম্বন্ধ সে ছিন্ন করেছে, আশ্রয় নিয়েছে কাঞ্চীপূর্ণের কাছে। শ্রীবরদরাজের সেবায় করছে সে দিন যাপন। তুমি শিগ্‌গীর কাঞ্চীতে চলে যাও। তাঁকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে এসো শ্রীরঙ্গমে। দেহান্ত হবার আগে আমার মনের সংকল্প ক'টি তার কাছে বলে যেতে চাই।"

আশ্বাস দিয়ে মহাপূর্ণ বলেন, "আচার্যবর, আমি এক্ষুনি রওনা হচ্ছি কাঞ্চীতে। কালবিলম্ব না ক'রে লক্ষ্মণকে আপনার কাছে উপস্থিত করছি।"

কাঞ্চীতে পৌঁছিয়াই প্রভু বরদরাজের মন্দিরে প্রণাম নিবেদন করিতে গেলেন মহাপূর্ণ। সেখানে ভক্তদের কাছে শুনিলেন, শ্রীবরদরাজের স্নান অভিষেক সম্পন্ন করানো লক্ষ্মণের নিত্যকার প্রধান সেবা কর্ম—আর দেরি নাই, এখনি তিনি সেখানে আসিয়া পড়িবেন।

মহাপূর্ণ আর ধৈর্য ধরিতে পারিতেছেন না। পথের দিকে একটু অগ্রসর হইতেই দেখিলেন, লক্ষ্মণ ধীরপদে মন্দিরের দিকে আসিতেছেন, মুখে গুন্‌গুন্‌ করিয়া গাহিতেছেন বিষ্ণুর স্তবস্তুতি আর মাথায় বহিয়া আনিতেছেন পবিত্র জলের বৃহৎ ভাণ্ড।

নিকটে গিয়া প্রসন্নমধুর কণ্ঠে মহাপূর্ণ গাহিয়া উঠিলেন যামুনাচার্যের রচিত এক অপূর্ব স্তোত্র। এ স্তোত্রের ভাব ভাষা ও মধুর ঝঙ্কার লক্ষ্মণের অন্তরে জাগাইয়া তোলে দিব্য উন্মাদনা। সাশ্রুনয়নে প্রশ্ন করেন, "মহাত্মন্, এ অমিয়মাখা স্তোত্র কোথায় পেলেন আপনি, শ্রীবিষ্ণুর কৃপাধন্য কোন মহাপুরুষের রচনা এটি, দয়া ক'রে আমায় বলুন।"

"এ যে আমার প্রভু যামুনাচার্যের রচনা। শ্রীসম্প্রদায়ের সেই মধ্যমণি ছাড়া আর কার হৃদয়ে হবে এমনতর দিব্য জ্যোতির বিচ্ছুরণ? আর কে পরিবেশন করবে এমন অমৃত?"

"রঙ্গনাথজীর প্রিয়তম সেবক, মহাত্মা যামুনাচার্যের চরণ দর্শনের

অভিলাষ আমার অনেক দিন থেকে। ভাগ্যহীন আমি, তাই বঞ্চিত রয়েছি এতদিন। আপনি তাঁর নিজজন, কৃপা ক'রে আমায় নিয়ে যাবেন তাঁর আশ্রয়ে ?"

"বৎস, আমি যে আচার্য প্রভু যামুনের কাছে থেকেই এসেছি তোমার কাছে। তোমার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য তিনি ব্যাকুল, তোমার পথ চেয়েই যে রয়েছেন। তাছাড়া, তিনি এখন অন্তিম শয়নে শায়িত। বৎস, তাঁর দর্শন যদি পেতে চাও, আর এক মুহূর্ত বিলম্ব ক'রো না।"

ক্রমাগত চারদিন পথ চলার পর দেখা গেল প্রভু শ্রীরঙ্গনাথের মন্দির। কাবেরীর অপর তীরে পৌঁছিয়াই উভয়ে হইলেন বজ্রাহতের মতো স্তম্ভিত। দক্ষিণী বৈষ্ণব জগতের শ্রেষ্ঠপুরুষ যামুনাচার্য আর ইহজগতে নাই। সহস্র সহস্র শোকার্ত নরনারী তাঁহার মরদেহটি বেষ্টন করিয়া ক্রন্দন করিতেছে, আর মঠের ভক্ত শিষ্যেরা রত রহিয়াছে তাঁহার শেষকৃত্যের কাজে।

আচার্যের চন্দনলিপ্ত, পুষ্পশোভিত দেহের সম্মুখে লক্ষ্মণ সাষ্টাঙ্গ প্রণাম নিবেদন করিলেন। উঠিয়া দাঁড়াইতেই লক্ষ্য পড়িল তাঁহার হস্তের দিকে। দেখিলেন, তিনটা অঙ্গুলি তাঁহার মুষ্টিবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে।

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে সেবকদের দিকে তাকাইতেই তাঁহারা কহিলেন, "তিনটি সংকল্প-সিদ্ধির বিষয়ে আচার্য প্রভু অন্তিম শয্যায় বিশেষ-ভাবে চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন, তারই চিহ্ন রয়ে গিয়েছে ঐ বদ্ধ অঙ্গুলি তিনটিতে।"

একথার সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল, ভক্তপ্রবর লক্ষ্মণ এক দিব্যভাবে আবিষ্ট হইয়া পড়িয়াছেন। ঐ আবেশের মধ্যেই, অর্ধবাহ্য অবস্থায় তিনি উচ্চারণ করিলেন ক্রমান্বয়ে তিনটি সংকল্প বাণী। কহিলেন, "বিষ্ণুভক্তিময় দ্রাবিড় বেদের প্রচার করবো আমি, জ্ঞানহীন জনগণের মধ্যে বিতরণ করবো সেই ভক্তির সুধা। লোকরক্ষার

ব্রত নিয়ে আমি রচনা করবো তত্ত্বজ্ঞানময় শ্রীভাষ্য। আর পুরাণরত্ন বিষ্ণু পুরাণের রচয়িতা পরাশর মুনির নামে চিহ্নিত ক'রে আমি গড়ে তুলবো ভক্তিবাদের এক শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাতাকে।"

অন্তরঙ্গ ভক্ত শিষ্যেরা লক্ষ্য করিলেন এক অবিশ্বাস্য দৃশ্য! ঐ সংকল্প বাণীর এক একটি উচ্চারিত হইতেছে, আর সঙ্গে সঙ্গে কোন্ এক অদৃশ্য পুরুষের অলৌকিক শক্তির ইঙ্গিতে একে একে খুলিয়া যাইতেছে প্রাণহীন যামুনাচার্যের তিনটি বদ্ধ অঙ্গুলি।

সকলেই উপলব্ধি করিলেন, ভক্তপ্রবর লক্ষ্মণই যামুনাচার্যের সেই ভাবী উত্তরাধিকারী, ঈশ্বরের চিহ্নিত সেই মহানায়ক যিনি এবার গ্রহণ করিবেন শ্রীসম্প্রদায়ের নেতৃত্বভার।

দেখা গেল, দেহান্তের পরও আচার্য যামুন নিজের সংকল্পে রহিয়াছেন অবিচল, আর ঐশী বিধানের অমোঘতার তত্ত্বটিও তিনি এই সময়ে ইঙ্গিতে ভক্তদের সবাইকে বুঝাইয়া দিয়া গেলেন।

শেষকৃত্য শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কাবেরীর বিশাল তটভূমি মুখর হইয়া উঠে সহস্র কণ্ঠের স্তবগানে। তারপর অন্তরঙ্গ ভক্তেরা ভাঙিয়া পড়েন শোকার্ত কান্নায়।

জাগ্রত বিগ্রহ শ্রীরঙ্গনাথের শ্রেষ্ঠ কিঙ্কররূপে এতদিন শ্রীরঙ্গমে বিরাজিত ছিলেন যামুনাচার্য। দক্ষিণী ভক্তিবাদের ছিলেন এক চির-ভাস্বর আলোকস্তম্ভ, আজ সেই স্তম্ভটির ঘটিল শোকাবহ তিরোধান।

গোস্বামী লোকনাথ

প্রেমভক্তিধর্মের এক শক্তিধর নায়করূপে শ্রীগৌরাঙ্গ সবেমাত্র নবদ্বীপে আবির্ভূত হইয়াছেন। বৈষ্ণবসাধক ও ভক্ত নরনারী দলে দলে শরণ নিতেছেন তাঁর চরণতলে। বর্ষীয়ান্ সর্বজন শ্রদ্ধেয় বৈষ্ণবনেতা অদ্বৈত আচার্য, শ্রীবাস পণ্ডিত, অবধূত নিত্যানন্দ প্রভৃতিকে একে একে তিনি করিয়াছেন আত্মসাৎ।

শ্রীবাসের কীর্তনের অঙ্গন প্রভু এবং তাঁহার মরমী পরিকরদের মিলন স্বর্গ। এই স্বর্গে নিত্য নূতন উদ্‌ঘাটিত হইতেছে লীলানাট্য, আর রসবিলাসের বৈচিত্র্য। প্রকাশিত হইতেছে তাঁহার চমকপ্রদ ভগবত্তা-ভাব।

পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকের নবদ্বীপ কীর্তিত ছিল ভারতের এক শ্রেষ্ঠ বিদ্যাকেন্দ্ররূপে। উচ্চতর টোল ও চতুষ্পাঠীগুলিতে বিরাজ করিতেন দিক্‌পাল পণ্ডিত, তার্কিক ও দার্শনিকেরা। শতশত প্রতিভাধর ছাত্র ইঁহাদের সান্নিধ্যে থাকিয়া গ্রহণ করিত নব্যন্যায়, স্মৃতি ও বেদ বেদান্তের পাঠ। প্রাচ্যের এই অক্সফোর্ডে আসিয়া জড়ো হইত সমকালীন ভারতের পণ্ডিত পড়ুয়ারা। তাই তখনকার দিনে নবদ্বীপের সারস্বত জীবনের যে কোনো তরঙ্গ, যে কোনো তর্ক বিচার, যে কোনো ধর্ম সংস্কৃতির আন্দোলন, অচিরে ছড়াইয়া পড়িত দেশের সর্বত্র এবং সমাজজীবনের সর্বস্তরে।

শ্রীগৌরাঙ্গের নূতন প্রেমধর্মের জোয়ার তখন ঢেউ তুলিয়াছিল দেশের দিগ্‌বিদিকে। সুদূর উত্তর বাংলার তালখড়ি গ্রামেও এ ঢেউ সেদিন পৌঁছিয়া গিয়াছিল।

তালখড়ি চতুষ্পাঠীর তরুণ পণ্ডিত লোকনাথ চক্রবর্তী লোকমুখে গৌরাঙ্গের আবির্ভাব কাহিনী শুনিলেন; শুনিয়া হৃদয় তাঁহার অপার আনন্দে ভরিয়া উঠিল। এই গৌরাঙ্গ যে তাঁহারই প্রিয় বন্ধু বিশ্বম্ভর

মিশ্র, উভয়ে তাঁহারা প্রায় সমবয়সী। লোকনাথ যখন আচার্য অদ্বৈতের কাছে ভাগবত অধ্যয়নে রত, বিশ্বম্ভর তখন গঙ্গাদাস্ পণ্ডিতের টোলে ব্যাকরণ পাঠ করেন, উভয়ের মধ্যে কত ঘনিষ্ঠতা, কত হৃদ্যতাই না ছিল। সেই বিশ্বম্ভর আজ আবির্ভূত হইয়াছেন গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের মহানায়করূপে, শ্রেষ্ঠ সাধকেরা তাঁহাকে জ্ঞান করিতেছেন ভগবান্‌রূপে। এই জন্যই তো লোকনাথের আনন্দের অবধি নাই।

বিষয়-বিরক্ত, নৈষ্ঠিক বৈষ্ণবসাধক, লোকনাথ পণ্ডিত নিজের সংকল্প স্থির করিয়া ফেলিলেন। সংসার হইতে চিরবিদায় নিয়া উপনীত হইলেন নবদ্বীপে।

প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ নিজ ভবনের অলিন্দে বসিয়া আছেন। গদাধর, মুরারী, শ্রীরাম প্রভৃতি অন্তরঙ্গ ভক্তেরা সম্মুখে উপবিষ্ট। প্রভু ভাবাবেশে মত্ত হইয়া কখনো কৃষ্ণকথা কহিতেছেন, কখনো বা কৃষ্ণ-বিরহের আর্তিতে হইতেছেন মুহ্যমান। এক এক সময়ে তাঁহাকে দেখা যাইতেছে অতিশয় চিন্তাকুল, গম্ভীরবদন।

সন্ন্যাস নিবার সংকল্প প্রভু ইতিমধ্যে স্থির করিয়া ফেলিয়াছেন। অন্তরঙ্গ কয়েকজন ভক্তকে বুঝাইয়াছেন, কৃষ্ণের বিরহে উন্মত্ত হইয়া তিনি নিজে ঘরসংসার ত্যাগ না করিলে কৃষ্ণের জন্য লোকে ব্যাকুল হইবে কেন? সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী না হইলে বিষয়ী লোকে তাঁহার কথা শুনিতে চাহিবে কেন? তাই মাঝে মাঝে প্রভুকে গম্ভীর হইতে দেখিয়া ভক্তদের প্রাণ শুকাইয়া যাইতেছে। বিষণ্ণ অন্তরে ভাবিতেছেন, হয়তো আসন্ন বিচ্ছেদের আর দেরি নাই।

এমনি সময়ে দীর্ঘ পথ পরিব্রাজনের পর শ্রান্ত ক্লান্তদেহে ভক্ত-প্রবর লোকনাথ সেখানে আসিয়া উপস্থিত। ছিন্ন তরুর মতো, বিরহখিন্ন লোকনাথ লুটাইয়া পড়েন প্রভুর পদতলে।

বাহু প্রসারিয়া প্রভু তাঁহাকে প্রেমভরে আলিঙ্গন দিলেন। প্রাণ তাঁহার পরম আনন্দে উচ্ছলিত। কৃষ্ণের চিহ্নিত ভক্ত লোকনাথের হৃদয়ে জাগিয়াছে কৃষ্ণপ্রেমের আর্তি, সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া তাই সে ছুটিয়া আসিয়াছে তাঁহার কাছে।

বার বার শ্রীগৌরাঙ্গ গদ্‌গদ স্বরে বলিতে থাকেন, "লোকনাথ, আমার প্রাণের লোকনাথ, তুমি এসে গিয়েছো। আহা, কৃষ্ণের কি কৃপা। হারানো বন্ধুকে আজ আবার আমি ফিরে পেলাম।"

নব ভাবে উদ্দীপিত হইয়া প্রভু এবার শুরু করেন তাঁহার নর্তন কীর্তন। প্রভুর দিব্যলাবণ্যময় রূপ, ভাবের প্রমত্ততা, আর ঘন ঘন সাত্ত্বিক প্রেমবিকার দর্শনে লোকনাথ আনন্দে একেবারে আত্মহারা। বহুদিনের সুখস্বপ্ন আজ তাঁহার সফল। কৃষ্ণপ্রেমের মূর্তবিগ্রহ শ্রীগৌরাঙ্গের মধুময় সান্নিধ্যে এবার তিনি আসিয়া পড়িয়াছেন, তাঁহার দিব্যপ্রেমে হইয়াছেন ভরপুর। লোকনাথের নয়ন মন প্রাণ আজ তাই সার্থক হইয়া উঠিয়াছে।

গভীর রাত্রে কীর্তন, কৃষ্ণকথা এবং ইষ্টগোষ্ঠী শেষ হইল। প্রভু কহিলেন, "লোকনাথ, বহুদূর থেকে পদব্রজে তুমি এসেছো, পথশ্রান্ত তুমি। আজ গৃহে গিয়ে বিশ্রাম নাও। কাল প্রভাতে আমাদের সাক্ষাৎ হবে। অন্তরঙ্গ কথা, প্রাণের গোপন কথা, তোমায় তখন বলবো। লোকনাথ, কৃষ্ণের কি অপার মহিমা, তোমার মতো বন্ধুর সঙ্গে আবার আমার মিলন ঘটিয়ে দিয়েছেন। কৃষ্ণের কাজে তোমায় দিয়ে আমার বড় প্রয়োজন। কাল তোমায় সব খুলে বলবো।"

প্রভুর এই স্নেহপূর্ণ বাণী শোনার পর ঘরে গিয়া লোকনাথ সারা রাত আর ঘুমাইতে পারেন নাই। অনির্বচনীয় আনন্দে চিত্ত তাঁহার উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে। প্রভুর স্নেহপূর্ণ কথা কয়টির অনুরণন চলিতেছে তাঁহার অন্তরে।

রাত্রি প্রভাত হইতেই লোকনাথ শ্রীগৌরাঙ্গের কাছে গিয়া উপস্থিত হন। চরণ বন্দনা করিয়া উঠিয়া দাঁড়ান, প্রভু তাঁহাকে জড়াইয়া ধরেন সস্নেহ আলিঙ্গনে। প্রসন্ন কণ্ঠে বলেন, "লোকনাথ, তুমি মহাভাগ্যবান্। কৃষ্ণের কর্মে অবিলম্বে তোমায় নিযুক্ত হতে হবে। নবদ্বীপে আর তোমার থাকার আবশ্যক নেই, তুমি বৃন্দাবনে চলে যাও। কৃষ্ণের প্রেমমাধুর্যে মণ্ডিত লীলাস্থলীগুলো আজো

লোকচক্ষুর অন্তরালে রয়ে গিয়েছে। বহু বৎসরের ব্যবধানে সেই সব পুণ্যস্থল হয়েছে অরণ্যে পরিণত। তুমি এগুলো উদ্ধারের ভার নাও। এখন থেকে তপস্যা আর কৃষ্ণলীলা-তীর্থের উদ্ধার এই দুটি হোক তোমার নিত্যকার পবিত্র কর্ম।"

লোকনাথের মাথায় যেন বজ্রাঘাত হয়। একি নিষ্ঠুর কথা কহিতেছেন গৌরসুন্দর। করজোড়ে কহিলেন, "প্রভু, বড় আশা ক'রে, ঘরসংসার ছেড়ে দিয়ে নবদ্বীপে এসেছি, তোমার ভুবনমোহন লীলা দর্শন করবো, আর ভিখিরির মতো পড়ে থাকবো একধারে। আর তুমি আমার সে আশায় এমন ক'রে বাজ হানছো? তোমার দর্শনলাভের পরেই এমন ক'রে কেন আমায় দূরে ঠেলে দিচ্ছো? আমার কোন দোষে এমন নির্মম হলে তুমি।"

"আমি নির্মম কোথায় লোকনাথ? তোমায় যে কৃষ্ণের কর্মের ভার দিয়েছি, এছাড়া বৈষ্ণবের আর কি ঈপ্সিত বস্তু থাকতে পারে, বলতো?"

"না প্রভু, তুমি যাই বলো, আমি বুঝতে পারছি, তোমার বিশাল হৃদয়ে নগণ্য লোকনাথের জন্য এতটুকু স্থানও নেই। তাই তাঁকে এমনভাবে করছো অপসারিত।"

প্রভু উত্তরে বলেন, "লোকনাথ, বৃন্দাবনই যে আমার হৃদয়। সেই বৃন্দাবনেই তো আমি তোমায় স্থাপন করছি স্থায়ীভাবে। কৃষ্ণ বলেছেন, বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছামি। সেই বৃন্দাবনে চিরদিন কৃষ্ণসঙ্গী হয়ে, কৃষ্ণধ্যানে বিভোর হয়ে, তুমি থাকবে। একি কম সৌভাগ্যের কথা? লোকনাথ যে বৃন্দাবনের কৃষ্ণ আর বৃন্দাবন-লীলা তোমার উপজীব্য, সেই বৃন্দাবনেই তো তোমায় পাঠাচ্ছি।"

"প্রভু, এত কঠিন হ'য়ো না তুমি। আমায় এ সময়ে দূর ক'রে দিয়ো না।" ক্রন্দন করিয়া বলেন লোকনাথ।

প্রভু আবার প্রবোধ দিয়া বলেন, "আমার কথা মন দিয়ে শোনো লোকনাথ। নিত্যবৃন্দাবন সিদ্ধ বৈষ্ণবের আস্বাদ্য, সবার জন্য তো নয়। কিন্তু ভৌম বৃন্দাবন আস্বাদ্য সকল ভক্ত নরনারীর। আমি

চাই, ভৌম বৃন্দাবনকে তোমার সাধনা ও কর্ম দিয়ে জাগিয়ে তোল, তার দুয়ার উন্মোচন ক'রে দাও ভক্ত ও পাষণ্ডী সবাইর জন্য। ভেবো না লোকনাথ, বৃন্দাবনে আমিও যাবো, আর যাবে আমার প্রাণপ্রিয় ভক্তেরা। সবাই মিলে প্রকটিত করবো কৃষ্ণলীলার পবিত্র পীঠস্থানগুলি। লীলা মাহাত্ম্যের প্রচার ক'রে জীবন করবো সফল।"

সঙ্গে সঙ্গে প্রভু বৃন্দাবন বাসের নির্দিষ্ট স্থান এবং দিনচর্যার ইঙ্গিতও দিয়া দিলেন। এসম্পর্কে ভক্ত নিত্যানন্দ দাস তাঁহার রচিত প্রেমবিলাস-এ লিখিয়াছেন :

চীরঘাট বাসস্থলী কদম্বের সারি।
তার পূর্ব পাশে কুঞ্জ পরম মাধুরি॥
তমাল বকুল বট আছে সেই স্থানে।
বাস কর সেই স্থানে সুখ পাবে মনে॥
বাসস্থলী বংশীবট নিধুবন স্থান।
ধীর সমীরণ মধ্যে করিবে বিশ্রাম॥
যমুনাতে স্নান কর, অযাচক ভিক্ষা।
ভজন স্মরণ কর জীবে দেহ দীক্ষা॥

প্রভুর দর্শন ও কৃপালাভের পরই এই বিচ্ছেদ বিরহের চিন্তা অসহনীয়। অন্তরঙ্গ ভক্তদের নিয়া প্রাণপ্রিয় প্রভু নবদ্বীপে আনন্দের মেলা বসাইয়া দিয়াছেন, উৎসারিত করিতেছেন প্রেমভক্তি রসের দুর্লভ প্রবাহ। এসব ছাড়িয়া নির্জন অরণ্যসঙ্কুল বৃন্দাবনে কি করিয়া দিন অতিবাহিত করিবেন, লোকনাথ ভাবিয়া পান না। এই সঙ্গে প্রভুর আজ্ঞার কথা এবং কৃষ্ণলীলাস্থল উদ্ধারের ঐশ্বরীয় ব্রত উদ্‌যাপনের গুরুত্বও বিস্মৃত হওয়া যায় না। বৃন্দাবনে বাস করিতে অবশ্যই তিনি যাইবেন। কিন্তু প্রভুর পুণ্যময় দর্শন ও সঙ্গ যে তাঁহার আরো কিছুদিন চাই।

সজল নয়নে প্রভুর নিকট ভিক্ষা করিলেন আর কয়েকটি দিনের মধুময় সান্নিধ্য। প্রভু সম্মত হইলেন। পাঁচদিন নবদ্বীপের প্রেম-লীলা প্রাণ ভরিয়া দর্শন করিলেন লোকনাথ, তারপর রওনা হইলেন

বৃন্দাবনধামে। এ জীবনে প্রভুর সঙ্গে আর তাঁহার সাক্ষাৎ হয় নাই। প্রভুর আদিষ্ট ঐশী কর্মের উদ্‌যাপন এবং প্রভুর নির্দেশিত পন্থায় কৃষ্ণভজন হইয়াছিল তাঁহার দীর্ঘ জীবনের উপজীব্য।

লোকনাথের বৃন্দাবন যাত্রার কথাবার্তা যখন চলিতেছে, গদাধর পণ্ডিতের নবীন শিষ্য ভূগর্ভ তখন কাছেই ছিলেন দণ্ডায়মান। বৃন্দাবনে গিয়া সাধনভজন করিবেন, এই ইচ্ছাটি তাঁহার মনে বহুদিন যাবৎ প্রচ্ছন্ন ছিল। ভূগর্ভ দেখিলেন, তাঁহার পক্ষে এ এক পরম সুযোগ। কহিলেন, "প্রভু, আপনার আজ্ঞা যদি মিলে, তবে আমিও পণ্ডিত লোকনাথের সঙ্গী হয়ে বৃন্দাবনে যেতে পারি। তাঁর পার্শ্বচর হয়ে আপনার মনোমতো কার্য এ অধম কিছুটা সম্পন্ন করতে পারবে। সে হবে আমার পরম সৌভাগ্য।"

সহায়সম্পদহীন অবস্থায় বৃন্দাবনে গমনের পর লোকনাথের একটি সঙ্গী থাকিবে এত অতি উত্তম কথা। প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ তাই মহাআনন্দিত। সোৎসাহে ভূগর্ভকে লোকনাথের সহযাত্রী হইবার অনুমতি দিলেন, প্রভুর অনুমতির পর গদাধর পণ্ডিতেরও কোনো আপত্তি রহিল না। ত্বরায় উভয়কে প্রভু রওনা করিয়া দিলেন তাঁহার আদিষ্ট কর্ম উদ্‌যাপনের জন্য।

ভক্তদের সঙ্গে কীর্তনরঙ্গে গৌরাঙ্গপ্রভু প্রায়ই প্রমত্ত হইয়া উঠিতেন, সাত্ত্বিকপ্রেম বিকারের ফলে হারাইয়া ফেলিতেন বাহ্যজ্ঞান। আবার দিব্যভাবেও প্রায়ই থাকিতেন আবিষ্ট। কিন্তু লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, প্রেরিত পুরুষরূপে যে ঐশী ব্রত উদ্‌যাপন করিতে তিনি আসিয়াছেন, যে কর্মসূচী গ্রহণ করিয়াছেন, শত ভাবাবেশ বা প্রমত্ততার মধ্যেও সে লক্ষ্য ও সে দায়িত্ব তিনি বিস্মৃত হন নাই, তাহা হইতে এতটুকুও বিচ্যুত হন নাই।

আচার্য অদ্বৈত, শ্রীবাস প্রভৃতির সহায়তায় প্রভু নবদ্বীপে তুলিয়াছেন বৈষ্ণব আন্দোলনের বিপুল ভাবতরঙ্গ।

অবধূত নিত্যানন্দকে আত্মসাৎ করিয়া তাঁহাকে গৃহী করিয়াছেন এবং ব্রতী করিয়াছেন বাংলার বৈষ্ণবীয় সংগঠনের কাজে।

আর বাসুদেব সার্বভৌম, স্বরূপ, রায় রামানন্দ এবং রাজা প্রতাপরুদ্রের মাধ্যমে দৃঢ়মূল করিয়া তুলিয়াছেন উড়িষ্যার ভক্তি-আন্দোলন।

সর্বশেষে তিনি লোকনাথ, রূপ, সনাতন প্রভৃতিকে বৃন্দাবনের গোস্বামীরূপে বসাইয়া দিয়া গড়িয়া তুলিয়াছেন নবযুগের বৃন্দাবন। বৃন্দাবনের ভক্তি সাম্রাজ্যের পত্তন ও প্রসার হইয়াছে ঐ গোস্বামীদের তপস্যা ও কর্মে। ইহার ফলে ভৌম বৃন্দাবনের কৃষ্ণলীলাস্থলের উদ্ধার যেমন সম্ভব হইয়াছে, তেমনি বৃন্দাবনের পবিত্রতা ও মাধুর্য প্রতিফলিত হইয়াছে সারা ভারতের জনমানসে।

ঐশ্বরীয় কর্ম প্রভু অপূর্ব দূরদর্শিতার সহিত নিষ্পন্ন করিতেন, এবং ঐ কর্মসূচীর প্রতিটি ধাপের প্রতি সতত নিবদ্ধ থাকিত তাঁহার তীক্ষ্ণ সজাগ দৃষ্টি।

প্রিয় সুহৃদ্ ও প্রিয় ভক্ত লোকনাথকে সুদূর বৃন্দাবনে পাঠানোর সিদ্ধান্তের পিছনেও ছিল সেই দূরদর্শিতা এবং অন্তর্দৃষ্টি।

বৃন্দাবনের কৃষ্ণলীলাস্থলীর পুনরুদ্ধার কর্মে গোস্বামী লোকনাথ ছিলেন প্রথম পথিকৃৎ। তাঁহার অক্লান্ত চেষ্টায় দুর্গম অরণ্যে শুরু হইয়াছিল সহস্র ভক্তের সমাগম। উত্তরকালে রূপ, সনাতন ও শ্রীজীব প্রভৃতি প্রতিভাধর গোস্বামীরা প্রেমধর্মের প্রাণকেন্দ্র বৃন্দাবনে গৌড়ীয় ধর্ম সংস্কৃতির যে বিরাট সৌধ গড়িয়া তুলিয়াছেন, লোকনাথই প্রস্তুত করিয়াছিলেন তাহার ভিত্তিভূমি।

কঠোর বৈরাগ্য, কৃচ্ছ্রময় তপস্যা এবং বিগ্রহসেবার অনন্ত নিষ্ঠা নিয়া কাঙাল বৈষ্ণব সাধকের যে জলন্ত মূর্তি নিজ জীবনে তিনি দেখাইয়া যান, দীর্ঘদিন তাহা গৌড়ীয় গোস্বামী ও সাধককুলের কাছে ছিল স্মরণীয়।

আরও একটি বিশিষ্ট অবদান ছিল লোকনাথ গোস্বামীর। উত্তরকালের গৌড়ীয় ধর্মের অন্যতম প্রাণপুরুষ নরোত্তমের তিনি

ছিলেন দীক্ষাগুরু। সদা আত্মগোপনশীল মহাবৈরাগী লোকনাথকে তিতিক্ষাপরায়ণ সাধক নরোত্তম যেভাবে তাঁহার দীক্ষাগুরুরূপে লোক-লোচনের সম্মুখে আনয়ন করেন, আজো গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সমাজে তাহার স্মৃতি অম্লান রহিয়াছে।

গোস্বামী লোকনাথের জন্ম হয় আনুমানিক ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে যশোহর জেলার তালখড়ি গ্রামে। পিতার নাম পদ্মনাভ চক্রবর্তী, মাতা সীতাদেবী।

পদ্মনাভ খ্যাতনামা পণ্ডিত ছিলেন। যৌবনে নবদ্বীপে থাকিয়া তিনি বিদ্যা অর্জন করেন এবং বৈষ্ণব আচার্য শ্রীঅদ্বৈতের নিকট বৈষ্ণবীয় ধর্মে দীক্ষালাভ করেন। গৃহে ফিরিয়া পদ্মনাভ এক চতুষ্পাঠী স্থাপন করেন, দেশের সে অঞ্চলে সুপণ্ডিত আচার্য এবং ভক্তিমান্ সাধক বলিয়া তিনি পরিচিত হইয়া উঠেন। লোকনাথ গোস্বামী তাঁহার তৃতীয় সন্তান।

বালক বয়সে লোকনাথ পিতার চতুষ্পাঠীতেই শিক্ষা লাভ করেন। চৌদ্দ বৎসর বয়সেই দেখা যায়, সংস্কৃত সাহিত্য ও শাস্ত্রে তাঁহার সন্তোষজনক ব্যুৎপত্তি হইয়াছে। অতঃপর উচ্চতর শিক্ষার জন্য প্রেরিত হন নবদ্বীপে। এস্থানে আসিয়া লোকনাথ শাস্ত্র অধ্যয়নে রত হন এবং পিতার আদেশে তাঁহার গুরু অদ্বৈত আচার্যের কাছে শুরু করেন ভাগবত পাঠ। অদ্বৈতের পাঠচক্র ও কীর্তন সভায় তাঁহার ঘনিষ্ঠ সঙ্গী ছিলেন গদাধর। অদ্বৈতের শাস্ত্র ব্যাখ্যা ও বৈষ্ণবসাধনার প্রভাবে পড়িয়া লোকনাথ কৃষ্ণভজনে ও কৃষ্ণতত্ত্ব অধ্যয়নে উৎসাহী হইয়া উঠেন।

অতঃপর কয়েক বৎসরের মধ্যে লোকনাথ ভাগবতের তত্ত্বে অধিকার লাভ করেন। কৃষ্ণ আরাধনা ও কৃষ্ণপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা অন্তরে জাগিয়া উঠে দুর্নিবারভাবে। এসময়ে আচার্য অদ্বৈত এই স্নেহভাজন তরুণকে কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষা দেন। এই দীক্ষার পর হইতেই

লোকনাথের অন্তর্জীবনে আসে দূরপ্রসারী পরিবর্তন। প্রেমভক্তির রস উপজিত হয় তাঁহার সাধনসত্তায়, তত্ত্বানুসন্ধান ও সাধনভজনে তিনি নিবিষ্ট হইয়া পড়েন।

নবদ্বীপের ছাত্রজীবনেই লোকনাথ তরুণ বিশ্বম্ভরের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসেন। উভয়েই ছিলেন প্রায় সমবয়সী এবং শুদ্ধসত্ত্ব, তাই অচিরে উভয়ের মধ্যে গড়িয়া উঠে অচ্ছেদ্য সখ্যতার বন্ধন।

নবদ্বীপের পাঠ সাঙ্গ হইলে লোকনাথ যশোহরে স্বগ্রাম তালখড়িতে ফিরিয়া যান, চতুষ্পাঠী খুলিয়া শুরু করেন অধ্যাপক বৃত্তি। সুপণ্ডিত অধ্যাপক এবং কৃষ্ণভক্ত আচার্যরূপে ধীরে ধীরে সে অঞ্চলে তাঁহার সুনাম ছড়াইয়া পড়ে।

জনশ্রুতি আছে, এসময়ে পণ্ডিত বিশ্বম্ভর, উত্তরকালের শ্রীচৈতন্যপ্রভু, একবার তালখড়িতে আসিয়া উপস্থিত হন। পণ্ডিত হিসাবে বিশ্বম্ভর তখন পূর্ববাংলার কয়েকটি অঞ্চলে পরিভ্রমণ করিতেছিলেন।

নবদ্বীপ হইতে বিশ্বম্ভর পণ্ডিতের আগমনের কথা শুনিয়া লোকনাথের পিতা পদ্মনাভ গ্রামের উপান্তে গিয়া উপস্থিত হন, নবীন পণ্ডিতকে আতিথ্য গ্রহণ করান তাঁহার গৃহে। প্রাক্তন সুহৃদ্ এবং নবদ্বীপের প্রতিভাধর নবীন পণ্ডিত বিশ্বম্ভরের আগমনে লোকনাথের আনন্দ আর ধরে না। ছাত্র জীবনের কথা, নবদ্বীপের পুরাতন কথা প্রভৃতি আলোচনায় উভয়ে মত্ত হইয়া পড়েন।

এই সাক্ষাতের কয়েক বৎসর পরেই বিশ্বম্ভরের জীবনে ঘটে বিরাট রূপান্তর। তীক্ষ্ণধী, বিদ্যাদর্পী, নবীন পণ্ডিত পরিণত হন এক নূতন মানুষে। নূতন প্রেমভক্তি আন্দোলনের মহানায়করূপে নবদ্বীপের সাধক ও পণ্ডিতসমাজে সৃষ্টি করেন তিনি বিরাট চাঞ্চল্যের। অচিরে অগণিত বৈষ্ণব ভক্তের দিক্‌দিশারী ও আশ্রয় দাতারূপে তিনি কীর্তিত হইয়া উঠেন।

এই সময়েই লোকনাথ ব্যাকুল হইয়া উঠেন প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গের দর্শনের জন্য। জননী সীতাদেবী বহুপূর্ব হইতেই বুঝিয়া নিয়াছেন, পুত্র তাঁহার সত্যকার বৈরাগ্যবান্ সাধক, তাঁহার কৃষ্ণরতি ও কৃষ্ণ

আরাধনার জের এখানেই থামিবে না। কৃষ্ণের বাঁশী অতি সত্বরই একদিন তাঁহাকে টানিয়া নিবে ঘর-সংসারের বাহিরে।

জননী সীতাদেবী ও জনক বৃদ্ধ পণ্ডিত পদ্মনাভের ভাগ্য ভাল, তরুণ লোকনাথের গৃহত্যাগের শোক তাঁহাদের সহ্য করিতে হয় নাই। পুত্র বিরাগী হওয়ার পূর্বেই, অল্পদিনের ব্যবধানে তাঁহারা লোকান্তরে চলিয়া যান।

লোকনাথের জ্যেষ্ঠ দুই ভ্রাতা ইতিমধ্যে বিবাহ করিয়া সংসারী হইয়াছেন, লোকনাথ তখনো অবিবাহিত। এসময়ে তাঁহার বয়স প্রায় পঁচিশ বৎসর। এই তরুণ বয়সেই অন্তরে জাগিয়া উঠিয়াছে তীব্র নির্বেদ, মন তাঁহার একান্তভাবে পড়িয়া রহিয়াছে নবদ্বীপে। সেখানে প্রেমধর্মের নব উদ্‌গাতা, তাঁহার প্রাক্তন সুহৃদ্‌ গৌরচন্দ্রের উদয় ঘটিয়াছে, ভক্তিপ্রেমের আলোকে সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে বাংলার তমসাবৃত অধ্যাত্মগগন। সে আলোকের হাতছানি লোকনাথকে আজ পাগল করিয়া তুলিয়াছে।

অগ্রহায়ণ মাসের এক নিশীথ রাত্রে সমাগত হয় তাঁহার জীবনের পরম লগ্ন। ইষ্টদেবের অমোঘ হাতছানিটি তাঁহাকে ব্যাকুল করিয়া তোলে। কৃষ্ণ-কৃষ্ণ বলিয়া ঘরের বাহিরে আসিয়া দাঁড়ান লোকনাথ। পদব্রজে ছুটিয়া চলেন অন্ধকারময় পথপ্রান্তর দিয়া। দীর্ঘপথ অতিক্রম করিয়া তৃতীয় দিবসে উপস্থিত হন নবদ্বীপে, প্রভুর দর্শন লাভে হন কৃতকৃতার্থ। তারপর মাত্র পাঁচ দিনের ব্যবধানে প্রভুর আন্তরিক ইচ্ছায় ও নির্দেশে চিরদিনের জন্য চলিয়া যান বৃন্দাবন ধামে

বৃন্দাবনের যাত্রাপথে লোকনাথ ও ভূগর্ভকে প্রায় তিনমাস অতিবাহিত করিতে হয়। তখনকার দিনে পথঘাট মোটেই নিরাপদ ছিল না, কাজেই লোকনাথ ও ভূগর্ভকে বিপদসঙ্কুল নানা অঞ্চল এড়াইয়া বহুপথ ঘুরিয়া বৃন্দাবনে উপস্থিত হইতে হয়।

এই তিন মাসে লোকনাথ ও ভূগর্ভ উভয়ে উভয়কে ঘনিষ্ঠভাবে চিনিয়াছিলেন, আবদ্ধ হইয়াছেন অচ্ছেদ্য একাত্মকতার বন্ধনে।

বৃন্দাবনে বাস করার সময়েও উভয়ের এই প্রীতির বন্ধন অক্ষুণ্ন ছিল। শাস্ত্রবিদ্ প্রেমিক বৈষ্ণব লোকনাথ ছিলেন প্রভুর লুপ্ততীর্থ উদ্ধারের প্রধান ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি, আর ভূগর্ভ পণ্ডিত ছিলেন তাঁহার সদা সহচর ও বিশ্বস্ত সহকারী।

উভয়ে মিলিয়া মথুরা ও ব্রজমণ্ডলের নানা স্থানে পরিভ্রমণ শুরু করেন এবং এই সঙ্গে চলে লীলাস্থলীসমূহের অনুসন্ধান। পুরাণ শাস্ত্র ও জনশ্রুতির ইঙ্গিত গ্রহণ করিয়া বহুতর স্থানে তাঁহারা ঘোরাফেরা করিতে থাকেন। কিন্তু মথুরা, বৃন্দাবন ও ব্রজমণ্ডলের বিস্তৃত অঞ্চল তখন অরণ্যে আবৃত, পথঘাট দুর্গম, তস্কর ও দস্যুদের দ্বারা উপদ্রুত। নিঃসহায় বৈরাগীদ্বয় কি করিয়া এই কার্য সম্পন্ন করিবেন ভাবিয়া পান না।

স্থানীয় সাধুদের কাছে পুরাণবর্ণিত কৃষ্ণলীলাস্থলসমূহের কিছু কিছু সন্ধান পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তাহার প্রামাণিকতা প্রতিপন্ন করা কঠিন হইয়া পড়ে।

এই অঞ্চল অরণ্যে পরিণত হওয়ার পর কিছু সংখ্যক নিম্নশ্রেণীর লোক ও বুনো জাতি এখানে আসিয়া বসবাস স্থাপন করিয়াছে। প্রাচীন পুরাবৃত্ত বা ঐতিহ্যের খবর ইহারা রাখে না। বংশ পরম্পরায় কোনো জনশ্রুতিও ইহাদের মধ্যে প্রচলিত নাই।

এই সব অসুবিধা সত্ত্বেও লোকনাথ ও ভূগর্ভ বিপুল নিষ্ঠা ও অধ্যবসায় নিয়া প্রভুর আদিষ্ট কর্ম সম্পন্ন করিতে থাকেন।

বৃন্দাবনের লুপ্ততীর্থ উদ্ধার ও দর্শনের জন্য আচার্য অদ্বৈত ও ও নিত্যানন্দ প্রভু কম পরিশ্রম করেন নাই। কিন্তু ব্রজমণ্ডলে তাঁহারা বাস করিয়াছেন অল্প দিনের জন্য। তাই সত্যকার কোনো অনুসন্ধান চালানো তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। লোকনাথ ও ভূগর্ভ এখানে আসিয়াছেন স্থায়ী অধিবাসী হিসাবে, আর শিরোধার্য করিয়া নিয়াছেন লুপ্ততীর্থ উদ্ধারের মহাব্রত। যত শ্রমসাধ্য, যত কষ্টপূর্ণ ও বিপদসঙ্কুলই হোক, আপ্রাণ চেষ্টায় এ ব্রত যে তাঁহাদের উদ্‌যাপন করিতেই হইবে।

অনাহারে অনিদ্রায় দেহ ক্লিষ্ট হইয়া পড়িতেছে। জনমানবহীন দুর্গম গভীর বনে কত দিন ও রাত্রি কাটাইতে হইতেছে, কিন্তু কোনো কিছুতেই তাঁহাদের ভ্রূক্ষেপ নাই। যখন যেখানে যে জনশ্রুতি ও শাস্ত্রীয় ইঙ্গিতের সন্ধান মিলিতেছে অপার নিষ্ঠায় সে সব লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতেছেন, আর তীর্থচারী সাধু মহাত্মাদের সাহায্য নিয়া চলিতেছে সেগুলির তথ্য নিরূপণ ও সনাক্তকরণ।

মথুরা ও ব্রজমণ্ডলের পৌরাণিক ইতিহাস ও ঐতিহ্য অতি প্রাচীন। রামায়ণেই আমরা মথুরার উল্লেখ প্রথম পাই। তখনকার দিনে এটি প্রচলিত ছিল মধুপুরী নামে। মহর্ষি বাল্মীকি বলিতেছেন,—ইয়ং মধুপুরী রম্যা মধুরা দেব নির্মিতা।[১] এই মধুপুরী পরে মধুরাই হইয়াছে এবং তাহারই অপভ্রংশ,—মথুরা। পরবর্তীকালে এই নাম অনুসরণ করিয়াই দাক্ষিণাত্যে গড়িয়া উঠিয়াছে মধুরাই বা মাদুরা নগরী।

পুরাণশাস্ত্র মতে, মধু দৈত্য স্থাপন করেন মধুরাই। তখনকার দিনে এই অঞ্চলে আর্য প্রভাব প্রসারিত হয় নাই। মধু দৈত্যের পুত্র ছিলেন লবণ। এই লবণকে পরাস্ত ও নিহত করিয়া রামচন্দ্রের অনুজ শত্রুঘ্ন মধুপুরী বা মধুরা অধিকার করেন। তখন হইতে এই অঞ্চল আর্যদের অধিকারে আসে এবং আর্য সভ্যতার এক বিশিষ্ট কেন্দ্ররূপে পরিচিত হইয়া উঠে। পরবর্তীকালে শূরসেন বংশীয় আর্যেরা এখানে বসতি স্থাপন করেন এবং শক্তিমান্ রাজবংশরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

শূরসেন ক্ষত্রিয়বংশে কালক্রমে আবির্ভাব ঘটে প্রসিদ্ধ নৃপতি যযাতির। ইঁহার পুত্র যদুর অধস্তন বংশীয় যাদবেরা মথুরায় পরাক্রান্ত হইয়া উঠেন। এই যাদবদেরই বৃষ্ণি শাখায় আবির্ভূত হন অবতার পুরুষ—বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ।

---

১ রামায়ণ, উত্তরকাণ্ড ৮৩

যাদবদের অন্যতম শাখা ভোজ বংশের প্রধান, রাজা কংস, মথুরার রাজসিংহাসন অধিকার করেন। বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের সহিত কংসের সংঘর্ষ ঘটে এবং তিনি নিহত হন। এই সময় হইতেই ভারতের রাষ্ট্রীয় ও সমাজজীবনে মথুরা এবং ব্রজমণ্ডলের খ্যাতি প্রতিপত্তি প্রচারিত হইতে থাকে।

ভারত যুদ্ধের পর সম্রাট্ যুধিষ্ঠির অর্জুনের পৌত্র পরীক্ষিৎকে স্বীয় রাজ্যভার প্রদান করিয়া মহাপ্রস্থানের পথে চলিয়া যান। যাত্রার পূর্বে মথুরামণ্ডলের রাজারূপে অভিষিক্ত করেন শ্রীকৃষ্ণের প্রপৌত্র বজ্রনাভকে। ভক্তিমতী মাতার প্রেরণায় বজ্রনাভ প্রপিতামহ শ্রীকৃষ্ণের স্মৃতিপূজার ব্যবস্থায় তৎপর হইয়া উঠেন।[১] তাঁহার উদ্দীপনা ও প্রয়াসের ফলে সৃষ্ট হয় শ্রীকৃষ্ণের কয়েকটি পবিত্র বিগ্রহ। ইহাদের নাম যথাক্রমে—শ্রীগোবিন্দ। শ্রীমদনগোপাল এবং শ্রীগোপীনাথ। রাজা বজ্রনাভের উৎসাহ ও প্রযত্নে এবং ভক্তিমান্ আচার্যদের সহায়তায় এই বিগ্রহদের অর্চনা ও ভোগরাগের পদ্ধতি প্রবর্তিত হয়। ব্রজমণ্ডল ও মথুরার সাধকগণ দীর্ঘদিন এই বিগ্রহদের সেবা পূজা করিতে থাকেন এবং জাগ্রত বিগ্রহরূপে জনগণের কাছে ইহারা পরিচিত হইয়া উঠেন। এই সময়ে ভক্তিমান্ সাধু মহাত্মাদের প্রচেষ্টায় প্রভু শ্রীকৃষ্ণের বহুতর লীলাস্থল নূতন করিয়া আবিষ্কৃত হয় এবং গণ্য হয় পবিত্র তীর্থরূপে।

পরবর্তীকালে কলির প্রভাবে এই সব বিগ্রহ ও তীর্থ লুপ্ত হইয়া যায়। বিশেষ করিয়া জৈন ও বৌদ্ধধর্মের প্রভাব এবং হিন্দু বৌদ্ধের সংঘর্ষের ফলে ব্রজমণ্ডল ও মথুরার ধর্ম সংস্কৃতির উপর নিপতিত হয় প্রচণ্ড আঘাত। এ সময়ে জনজীবন যেমন বিপর্যস্ত হয়, তেমনি ক্ষতিগ্রস্ত হয় অজস্র তীর্থ, মঠ, মন্দির ও সাধনপীঠ। ইতিহাসের পাঠকমাত্রেই জানেন, চীনা পরিব্রাজকদের লেখনীতে হিন্দুতীর্থ মথুরা গণ্য হইয়াছে একটি বৌদ্ধনগরীরূপে।[২]

১ শ্রীশ্রীবৃন্দাবন রহস্য : রামযাদব বাগচী

২ মথুরা : গ্রাউস

কালক্রমে মথুরা ও ব্রজমণ্ডলের জনবসতি কমিয়া যায়। সারা অঞ্চল দুর্গম অরণ্যে পরিবৃত হইয়া পড়ে।

মথুরার রাজকীয় বৈভব ও প্রভাব যাহাই থাকুক, বৃন্দাবন কিন্তু পৌরাণিক যুগে প্রধানত একটি বনরূপেই বিরাজ করিত। বহু সাধু মহাত্মা এবং ভক্তিমান্ গৃহীদের আশ্রম ও আবাস ছড়ানো ছিল এই জনপদের আশেপাশে এবং সর্বত্র।

স্কন্দ পুরাণের মথুরাখণ্ডে সংক্ষেপে বৃন্দাবনের একটি মনোরম বর্ণনা আমরা পাই।

বৃন্দাবনং সুগহনং বিশালং বিস্তৃতং বহু।
মুনীনামাশ্রমৈঃ পূর্ণং বন্যবৃন্দসমন্বিতম্॥

বৃন্দাবনের বৈশিষ্ট্য ও ঐতিহাসিক বিবর্তন সম্পর্কে ইতিহাসবিদ্ লেখক শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র লিখিয়াছেন :

—৮৪ ক্রোশ পরিমিত স্থান লইয়া এই বিশাল বন অবস্থিত। এখনও ইহার দ্বাদশটি বন ও চতুর্বিংশ তপোবন তীর্থস্থানে পরিণত। পূর্বকালে এইসব বনভাগে মুনির আশ্রম ছিল। সাধকেরা নিজমনে সাধনভজন করিতেন, আর জঙ্গলের মধ্যে আভীর প্রভৃতি অনুন্নত এবং অন্য বন্যজাতির বাসভূমি ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ছিল। শেষে পশ্চিম সীমান্তের গিরিপথ দিয়া যখন মুসলমান বাহিনী ধন লুণ্ঠনের প্রত্যাশায় দলে দলে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিতে লাগিল মথুরা নগরীর উপকণ্ঠে বলিয়া সে সব আক্রমণের ফল বৃন্দাবনের উপর ফলিতেছিল।

—গজনীপতি মাহ্‌মুদ যখন বহুদিন ধরিয়া মথুরা লুণ্ঠন করেন, দেব-বিগ্রহ ভগ্ন করিয়া দুর্ভেদ্য অভ্রভেদী মন্দিরসমূহ ভূমিসাৎ করেন, তখন বৃন্দাবনও ফলভোগে বঞ্চিত হয় নাই। বৃন্দাবন পরিক্রমার অন্তর্গত একটি বনের নাম মহাবন। উহার রাজা মাহ্‌মুদের নিকট পরাজিত ও পদানত হইয়াও রক্ষা পান নাই ; তিনি যখন প্রজাবর্গের দারুণ হত্যাকাণ্ড সম্মুখে দেখিলেন, তখন নিজ স্ত্রী-পুত্রের হত্যাসাধন

করিয়া অবশেষে আত্মহত্যা দ্বারা নিজের উদ্ধারসাধন করেন। সে দৃশ্য দেখিয়া বৃন্দাবন হইতে বহুলোক পলায়ন করে।

ক্রমে পাঠানেরা দিল্লী গৌড় প্রভৃতি নানাস্থানে রাজতক্ত পাতিয়া দেশ শাসন করিতে লাগিলেন। বৃন্দাবনের জঙ্গল আরও শ্বাপদসঙ্কুল হইয়া রহিল। তীর্থানুসন্ধিৎসু নির্ভীক সাধুরা ব্যতীত সে বনে আর কেহ ভ্রমণ করিতে আসিতেন না। সে জঙ্গলে শুধু বন্যেরাই বাস করিত।

—দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে গৌড়াধিপ লক্ষ্মণ সেনের সভা কবি জয়দেব যখন বৃন্দাবন দর্শনে আসেন তখন বৃন্দাবন শুধু অরণ্যই ছিল। তাঁহার কোমলকান্ত পদাবলীতে বৃন্দাবনের যে রসময়ী ললিতকান্তি ফুটিয়া উঠিয়াছিল তাহা কেবল প্রেমরসিকের কল্পনারই সামগ্রী। এখন যেমন শ্রীবৃন্দাবন নির্বিঘ্ন ভক্ত সাধকের শেষাশ্রয়রূপে জনকোলাহলের মধ্যেও শান্তিনিকেতনে পরিণত হইয়াছে, পাঠান রাজত্বকালে উহার সে দশা ছিল না। বাঙালীর একটা গৌরবের কথা এই, তাহারাই বৃন্দাবনের বনজঙ্গলের আবাদ করিয়া ভক্তির পত্তন করিয়াছিলেন।

—বাঙালী যখন এই নববৃন্দাবনের সৃষ্টি করেন, তখন বাংলা-দেশের এক সুবর্ণযুগ। পাঠান বিজয়ের উদ্দাম আক্রোশ প্রশমিত হইয়াছে আর পরাক্রান্ত পাঠান নৃপতিগণ স্বাধীনভাবে বঙ্গের শাসনদণ্ড পরিচালন করিতেছেন। তখন বিখ্যাত হুসেন শাহ্ গৌড়ের সিংহাসনে সমাসীন; দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠিত; অন্নপণ্য সর্বত্র সুলভ; শিল্পকলার সমধিক উন্নতিতে বঙ্গদেশ খ্যাত। হুসেনের রাজদরবার প্রতিভাসম্পন্ন হিন্দু অমাত্য এবং কৃতী ও পণ্ডিত দ্বারা সমলঙ্কৃত। নবদ্বীপ, চন্দ্রদ্বীপ, বিক্রমপুর প্রভৃতি বহুস্থানের শিক্ষা-সদনে সহস্র সহস্র বিদ্যার্থীর জ্ঞান-পিপাসা মিটিতেছিল। বাঙালী কোনো বিষয়ে পরমুখাপেক্ষী ছিল না। একমাত্র ধর্মক্ষেত্রে নানাবিধ ব্যভিচার ও অবনতি দেখা যাইতেছিল।

১ সপ্তগোস্বামী : সতীশচন্দ্র মিত্র

—এমন সময় নবদ্বীপে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাব হইল। অপরিণত বয়সে তাঁহার অলৌকিক শক্তিপ্রভাবে সকল সমস্যা ও সকল বিকারের অভিনব সমাধান হইয়াছিল। ইহাই, শুধু বঙ্গীয় কেন, ভারতীয় ইতিহাসের একটি নবযুগ। সে যুগে ইতিহাসের যে নূতন ধারা প্রবাহিত হইয়াছিল। তাহার একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল বৃন্দাবন। শ্রীগৌরাঙ্গদেব স্থায়ীভাবে বৃন্দাবনে বাস না করিলেও তাহারই প্রেরণায় তাঁহারই ব্যবস্থায়, তাঁহার প্রেরিত ভক্ত-সম্প্রদায়ের একাগ্র চেষ্টায় শ্রীবৃন্দাবনে বাঙালীর নূতন উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল। সেই ঔপনিবেশিকদিগের একমাত্র সাধনা—ভক্তির রাজ্য প্রতিষ্ঠা, ভক্তিবাদের ভিত্তিপত্তন এবং লীলা-ধর্মের প্রবর্তন।

—সেই ঔপনিবেশিকদের অগ্রদূত হইয়াছিলেন—শ্রীলোকনাথ গোস্বামী; ছায়ার মতো তাঁহার সহচর ছিলেন, অন্য এক বাঙালী ব্রাহ্মণ—শ্রীভূগর্ভ গোস্বামী।

বৃন্দাবনে পৌঁছানোর প্রায় দুই মাস পরে লোকনাথ সংবাদ পাইলেন, প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ ভক্তজনদের কাঁদাইয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন। নূতন নাম নিয়াছেন, শ্রীচৈতন্য। পুরীতে কিছুদিন অবস্থান করার পর প্রভু বহির্গত হইয়াছেন দাক্ষিণাত্যের তীর্থভ্রমণে। তীর্থদর্শন আর নবতর প্রেমভক্তি ধর্মের প্রচার দুই-ই চলিতেছে সমভাবে।

প্রভুর ত্যাগবৈরাগ্যময় সন্ন্যাসমূর্তি দর্শনের জন্য লোকনাথ ও ভূগর্ভ ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। বৃন্দাবনের কাজ কিছুদিনের জন্য স্থগিত রাখিয়া উভয়ে রওনা হইলেন দক্ষিণ ভারতের দিকে।

কিন্তু প্রভু শ্রীচৈতন্য সদাই রহিয়াছেন ভ্রাম্যমাণ। তন্ন তন্ন করিয়া দক্ষিণের বহু তীর্থ ও সাধনপীঠে লোকনাথ ও ভূগর্ভ তাঁহাকে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, কিন্তু দর্শন মিলিল না।

এদিকে শ্রীচৈতন্য পুরীধামে আসিয়া প্রেমভক্তি আন্দোলনের ভিত্তিভূমি গড়িয়া তুলিতে তৎপর হইয়াছেন। শক্তিমান্ বৈষ্ণব

সাধকেরা কেন্দ্রীভূত হইতেছেন তাঁহার চারিদিকে। অতঃপর প্রভু গৌড়ে গিয়া রূপ, সনাতনকে আত্মসাৎ করিলেন, বৃন্দাবনে তাঁহার আসার কথা ছিল কিন্তু তাহা হইয়া উঠিল না।

পরবর্তী বৎসরে প্রভু বৃন্দাবনে উপস্থিত হইলেন বটে, কিন্তু লোকনাথ, ভূগর্ভ তখন সেখানে নাই। উভয়ে দক্ষিণদেশের তীর্থে তীর্থে তখনো প্রভুর দর্শনের আশায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন। কিছুদিন পরে বৃন্দাবনে প্রত্যাবর্তন করিয়াই শুনিলেন প্রভু শ্রীচৈতন্য ভাবাবিষ্ট অবস্থায় ব্রজমণ্ডলের নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া রওনা হইয়াছেন প্রয়াগের দিকে।

উন্মত্তের মতো লোকনাথ ও ভূগর্ভ ছুটিয়া চলিলেন প্রভুকে ধরিবার আশায়। পথে রাত্রির অন্ধকার নামিয়া আসিল। শ্রান্ত-ক্লান্ত দেহে উভয়ে আশ্রয় নিলেন এক বৃক্ষতলে।

গভীর রাত্রে লোকনাথ দর্শন করিলেন এক চাঞ্চল্যকর স্বপ্ন। জ্যোতির্ময় মূর্তিতে প্রভু আবির্ভূত হইয়াছেন তাঁহার সম্মুখে, তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া প্রসন্নমধুর কণ্ঠে কহিতেছেন :

তোমার নিকটে নিরন্তর আছি আমি।
বৃন্দাবন হৈতে কোথা না যাইহ তুমি॥
প্রয়াগ হইতে আমি যাব নীলাচল।
শুনিতে পাইবে মোর বৃত্তান্ত সকল॥

(নরোত্তম বিলাস)

এই স্বপ্ন দর্শনের মধ্য দিয়া ভক্ত লোকনাথের বিরহখিন্ন হৃদয়ে কৃপাময় প্রভু বুলাইয়া দিলেন শান্তির প্রলেপ। লোকনাথের গণ্ড বাহিয়া ঝরিতে লাগিল পুলকাশ্রু। প্রভুর বাণী শিরোধার্য করিয়া সংকল্প গ্রহণ করিলেন, এ-জীবনে আর কখনো বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া কোথাও যাইবেন না, প্রভুর আদিষ্ট কর্ম উদ্‌যাপন ও প্রভুর ধ্যান মননেই করিবেন দিনযাপন।

শ্রীবিগ্রহ সেবার একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা বেশ কিছুদিন যাবৎ

জাগ্রত হইয়াছে লোকনাথের অন্তরে। কিন্তু কোথায় কোন্ শ্রীবিগ্রহ প্রকট হইবেন সেবা পূজার জন্য, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না। সেদিন প্রয়াগের পথ হইতে ফিরিবার কালে ব্রজমণ্ডলের কিশোরী কুণ্ডে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। পবিত্র কুণ্ডে স্নান করার সময় লোকনাথ তাঁহার ইষ্টদেবের কৃপায় লাভ করিলেন এক পরম সুন্দর বিগ্রহ—শ্রীরাধাবিনোদ। এখন হইতে এই বিগ্রহের সেবা ও ধ্যান জপ হইয়া উঠে তাঁহার ব্যক্তিগত সাধনজীবনের প্রধান উপজীব্য।

শ্রীবিগ্রহ কৃপাভরে দর্শন দিয়া সেবা প্রকট করিয়াছেন বটে কিন্তু তাঁহার ভক্তের কাঙালত্ব তো মোচন করেন নাই। প্রভুর সেবায় আসন, শয্যা, সাজপোষাক ভোগরাগ অনেক কিছু উপকরণ দরকার। নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণব লোকনাথের পক্ষে এসব জোটানো কঠিন, কোনো অর্থ সম্বলই যে তাঁহার নাই। অরণ্যচারী সাধু তিনি, দিন রাত বনে বনে লুপ্ত তীর্থ উদ্ধারের জন্য ঘুরিয়া বেড়ান, একখানা পর্ণকুটিরও তাঁহার নাই।

বনের অধিবাসীরা সাধুবাবাকে ভালোবাসে, তাহারা প্রস্তাব দেয়, "বাবাজী, নিজে তুমি যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়াও, থাকা খাওয়ার কোনো ঠিক নেই। কিন্তু ঠাকুর যখন কৃপা ক'রে এসেছেন তোমার কাছে, তাঁকে তো ভালোভাবে রাখতে হবে। আমরা তোমায় একটা কুঁড়েঘর বেঁধে দিচ্ছি, সেখানে ঠাকুরের সেবা পূজা তুমি করতে থাকো।"

লোকনাথ উত্তর দেন, "বাবা, আমি যেমন বনচারী আমার ঠাকুরও যে তাই। যতদিন আমি বনে বনে ঘুরে বেড়াবো, তিনিও থাকবেন সঙ্গে সঙ্গে। আমি থাকবো বৃক্ষতলে আর আমার ঠাকুর থাকবেন বৃক্ষের কোটরে।"

সেই ব্যবস্থাই আপাতত চলিতে থাকে। রোজ প্রত্যূষে উঠিয়া লোকনাথ ভক্তিভরে বনতুলসী ও বনফুল তুলিয়া আনেন, নিবিষ্ট হইয়া সম্পন্ন করেন শ্রীবিগ্রহের পূজা। বেলা হইলে অরণ্যের শাক

পাতা ফল কুঁড়াইয়া আনিয়া প্রস্তুত করেন ভোগরাগ। ইষ্টবিগ্রহকে শয়ান দেন পুষ্পশয্যায়, ঘুম পাড়ান তাঁহাকে বৃক্ষপল্লবের বাতাস দিয়া। নিত্যকার সেবা পূজা ও জপ ধ্যানের শেষে সহচর ভূগর্ভকে নিয়া সারা দিনের মতো বাহির হইয়া পড়েন লুপ্ত, অবজ্ঞাত ও প্রচ্ছন্ন লীলাস্থলীর সন্ধানে।

কিন্তু এক একদিন এই অনুসন্ধান কর্মে দূরদূরান্তে চলিয়া যাইতে হয়, বিগ্রহ সেবায় উপস্থিত হয় নানা অন্তরায়। অবশেষে তিনি গ্রহণ করেন এক নূতনতর ব্যবস্থা। শনের গোছা পাকাইয়া এক ঝোলা তৈরি করেন, তাহারই মধ্যে স্থাপিত করেন শ্রীবিগ্রহকে। তারপর সেটি কণ্ঠে ঝুলাইয়া ঘুরিয়া বেড়ান নিত্যকার কর্মে।

লোকনাথের পবিত্র চরিত্র, সেবা নিষ্ঠা, বৈষ্ণবীয় দৈন্য ও প্রেমাবেশ দেখিয়া বনবাসীরা ক্রমে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হয়। ধীরে ধীরে দূর জনপদ হইতে দুই একটি করিয়া ভক্ত তাঁহার নিকট আসিতে থাকে।

বিগ্রহের সেবা পূজার জন্য তাহাদের কেহ কেহ অনেক সময়ে ফল মূল ইত্যাদি কিনিয়া আনিত। লোকনাথ সানন্দে প্রভুর ভোগ লাগাইতেন, তারপর ঐসব বিতরণ করিয়া দিতেন ভক্ত ও বনবাসী দরিদ্র ব্যক্তিদের মধ্যে। সেবা পূজার কোনো উপচার বা ভেট তিনি একদিনের তরেও সঞ্চয় করিতেন না। প্রাপ্তিমাত্রেই তাহা বিতরিত হইয়া যাইত।

বৈষ্ণবীয় দৈন্য ও ত্যাগ তিতিক্ষার মূর্ত বিগ্রহ লোকনাথের আদর্শ জীবন সম্পর্কে ভক্তি রত্নাকর লিখিয়াছেন :

> যে বৈরাগ্য তাঁর তা' কহিতে অন্ত নাই।
> শ্রীরাধাবিনোদ কৃপা কৈলা এই ঠাঁই॥
> ফলমূল শাক অন্ন যবে যে মিলয়।
> যত্নে তাহা শ্রীরাধাবিনোদে সমর্পয়॥
> বর্ষা শীতাদিতে এই বৃক্ষতলে বাস।
> সঙ্গে জীর্ণ কাঁথা অতি জীর্ণ বহির্বাস॥

আপনি হইতা সিক্ত অতি বৃষ্টি নীরে।
ঠাকুরে রাখিতা এই বৃক্ষের কোটরে॥
অন্য সময়েতে জীর্ণ ঝোলায় লইয়া।
রাখিতেন বক্ষে অতি উল্লসিত হিয়া॥

(৫ম তরঙ্গ)

এই বৈরাগ্যময় তপস্যা ও কর্মনিষ্ঠার ফল ক্রমে ফলিতে আরম্ভ করে। একের পর এক কতকগুলি লুপ্ত ও বিস্মৃত তীর্থের উদ্ধার সাধন করেন লোকনাথ। সারা ব্রজমণ্ডলে এবার সাড়া পড়িয়া যায়। গৌড়ীয় সাধক লোকনাথ গোস্বামীর প্রতি পতিত হয় ভক্ত সমাজের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি। তাঁহার নিজের ব্যাপক অনুসন্ধানের সঙ্গে মিলিত হয় প্রভু শ্রীচৈতন্যের দিক্‌দর্শন। ব্রজমণ্ডলে আসিয়া প্রভু ভাবপ্রমত্ত অবস্থায় কয়েকটি লীলাস্থল ও শ্রীকুণ্ডের আবিষ্কার করেন, স্থানীয় সাধু-সন্ন্যাসী ও জনসাধারণ এগুলি সম্পর্কে নূতন করিয়া সজাগ হন, শ্রদ্ধান্বিত হন।

লোকনাথের এই একনিষ্ঠ প্রয়াসের সঙ্গে শুধু প্রভু শ্রীচৈতন্যের আবিষ্কারই যুক্ত হয় নাই, পরবর্তীকালে আগত রূপ গোস্বামী ও সনাতন গোস্বামীর কর্মতৎপরতাও অশেষভাবে তাঁহার কার্যের সহায়ক হইয়া উঠে।

পুরীধাম হইতে শক্তি সঞ্চারিত করিয়া প্রভু শ্রীচৈতন্য রূপ ও সনাতনকে ব্রজমণ্ডলে পাঠাইয়া দিয়াছেন। এই দুই গোস্বামী অশেষ শাস্ত্রবিদ্, পরিচালন-দক্ষতা এবং অভিজ্ঞতাও তাঁহাদের যথেষ্ট। ইঁহাদের আগমনের পর লোকনাথ গোস্বামীর কর্মভার অনেকটা কমিয়া গেল, আগেকার মতো বন বনান্তরে ছুটাছুটি করার প্রয়োজনীয়তা আর তেমন রহিল না।

রূপ ও সনাতনকে ডাকিয়া লোকনাথ তাঁহার নিজের উদ্ধারকরা লুপ্ত তীর্থগুলি বুঝাইয়া দিলেন, শাস্ত্র ও পুরাণের তথ্যের সহিত মিলাইয়া এবং এই দুই মনীষীকে দিয়া অনুমোদন করাইয়া নূতন

তীর্থগুলির মাহাত্ম্য প্রকটিত করিলেন। কতকগুলির নূতন নূতন নামাকরণও এ সময়ে করা হইল। পরবর্তীকালে রঘুনাথ গোস্বামীর প্রচেষ্টায় শ্যামকুণ্ড রাধাকুণ্ডের উদ্ধার সাধন সম্পূর্ণ হয় এবং সারা ব্রজমণ্ডল তীর্থ, বিগ্রহ এবং কুণ্ডের মাহাত্ম্যে পূর্ণ হইয়া উঠে।

ব্রজমণ্ডল সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসু, শ্রীমৎ নারায়ণ ভট্ট নামক এক সাধক 'শ্রীব্রজভাব বিলাস' গ্রন্থের রচয়িতা। এই গ্রন্থে তিনি লিখিয়া গিয়াছেন যে, প্রভু শ্রীচৈতন্যের আদিষ্ট কর্ম উদ্‌যাপন করিতে গিয়া লোকনাথ গোস্বামী তিনশত তেত্রিশটি বন ও তীর্থ আবিষ্কারে সমর্থ হন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, নারায়ণ ভট্টের এই গ্রন্থ রচিত হয় রূপ গোস্বামীর ও সনাতন গোস্বামীর জীবিতকালে। সেই সময়ে শ্রীচৈতন্যের এই দুই প্রধান পরিকরের অনুমোদন ছাড়া ব্রজ সম্পর্কিত গ্রন্থাদির প্রকাশ সম্ভব ছিল না। কাজেই লোকনাথের আবিষ্কৃত লীলাস্থলের এ সংখ্যাটিকে মোটামুটিভাবে ঠিক বলিয়া ধরিয়া নেওয়া যাইতে পারে।

অতঃপর গৌড়ীয় ভক্ত সমাজের উপর পতিত হইল মহা দুর্দৈবের আঘাত, প্রভু শ্রীচৈতন্য নীলাচলে লীলা সংবরণ করিলেন।

এসময়ে ভক্তপ্রবর রঘুনাথ দাস বিষাদখিন্ন হৃদয়ে কাঁদিতে কাঁদিতে উপস্থিত হইলেন বৃন্দাবনে। লোকনাথ, রূপ, সনাতন, গোপাল ভট্ট, রঘুনাথ ভট্ট প্রভৃতি বৃন্দাবনে আগে হইতেই অবস্থান করিতেছেন, ভক্তিপ্রেম সাধনার আলোক প্রজ্বলিত করিয়াছেন। প্রভু চৈতন্যের এই প্রতিভাধর পরিকরদের ঐকান্তিক সাধনা ও কর্মের ফলে ভৌম বৃন্দাবনে পত্তন হইল এক নবতর ভক্তি সাম্রাজ্যের। এই ভৌম বৃন্দাবনের প্রথম ও বরেণ্য পথিকৃৎ লোকনাথ গোস্বামী।

"এখন যেখানে বৃন্দাবনের গোকুলানন্দ আশ্রম, সেইস্থানে বনের মধ্যে লোকনাথের কুঞ্জ ছিল। তাহা পথ হইতে দূরে, বৃক্ষবল্লরীর আড়ালে, নিভৃত নিলয়ে স্থাপিত। সহজে তাহা খুঁজিয়া বাহির করা যাইত না। লোকনাথও বিশেষ প্রয়োজন না হইলে কুঞ্জ ছাড়িয়া কোথাও যাইতেন না; যাঁহার সন্ধানে বৃন্দাবনে আসিয়াছেন, তাঁহারই

ধ্যানধারণায় পূজার্চনায় তাঁহার দিবা বিভাবরী অতিবাহিত হইত। তখন রূপ গোস্বামীই সমগ্র ব্রজমণ্ডলের কর্তা, বিপন্নভক্তের সহায়, নিরাশ্রয়ের আশ্রয় ছিলেন। পাণ্ডিত্যের ভিত্তিতে সেখানে যে একপ্রকার বৈষ্ণব বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল, শ্রীরূপ তাহার কর্ণধার। কত দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত নবমতের মূল ধ্বংস করিবার জন্য গোস্বামিগণের বিদ্যা পরীক্ষা করিতে আসিতেন, তাঁহাদের সঙ্গে বিচার বা জয়পরাজয় রূপের ব্যবস্থায় হইত ; কোনো কিছু নূতন বিধি নিষেধ প্রবর্তিত করিতে হইলে, তাহা রূপই সকলের পরামর্শ লইয়া করিতেন। এ সব ব্যাপারে লোকনাথের সময়ক্ষেপ করিতে হইত না। তিনি নিজের সাধনভজন ও দেবসেবা লইয়াই থাকিতেন।"[১]

বৃন্দাবন ও ব্রজমণ্ডলের গোস্বামীরা এক-একজন ছিলেন প্রদীপ্ত ভাস্করের মতো। প্রতিভা, শাস্ত্রবিদ্যা, কৃচ্ছ্রসাধন ও ভজননিষ্ঠা নিয়া ভক্তি আন্দোলনের যে মহান্ কেন্দ্র তাঁহারা স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহার যশঃপ্রভায় চারিদিক আলোকিত হইয়া উঠিয়াছিল।

শ্রীচৈতন্যের প্রচারিত প্রেমভক্তি ধর্মের মূলে ছিল ভাগবতে বর্ণিত পরমপুরুষ রসময় কৃষ্ণের তত্ত্ব। এই তত্ত্ব রূপ, সনাতন, গোপাল ভট্ট, রঘুনাথ দাস প্রভৃতি প্রোজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছিলেন তাঁহাদের মনীষা ও তপস্যার মধ্য দিয়া। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধনা ও দার্শনিকতার বৈশিষ্ট্য সে সময়ে শুধু গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের জীবনকেই উদ্দীপিত ও প্রভাবিত করে নাই, সারা ভারতের সমক্ষেও তুলিয়া ধরিয়াছে প্রেমভক্তি সাধনার এক নূতনতর আলোকবর্তিকা।

কিন্তু বৃন্দাবনের এই দূরপ্রসারী প্রভাব ও ঔজ্জ্বল্য খুব বেশী দিন বর্তমান থাকে নাই। প্রভু শ্রীচৈতন্যের অপ্রকটের পরে প্রবীণ নেতৃদ্বয় নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত লীলা সংবরণ করিয়াছেন। অতঃপর বৃন্দাবনে—একে একে নিভিল দেউটি। প্রথমে সনাতন, তার পরে রূপ ও রঘুনাথ ভট্ট করিলেন মহাপ্রয়াণ। রঘুনাথদাস গোস্বামী

১ সপ্তগোস্বামী : সতীশচন্দ্র মিত্র

শ্রীচৈতন্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লীলাপরিকর, প্রেমভক্তি সাধনার এক মূর্ত বিগ্রহ। কিন্তু তিনি তখন নিজেকে একান্তভাবে গুটাইয়া নিয়াছেন। রাধাকুণ্ডের নিকটে বসিয়া রত রহিয়াছেন কঠোর তপস্যায়, বৃন্দাবনের সাধক ও ভক্তেরা তাঁহার পুণ্যময় সঙ্গ হইতে বঞ্চিত। এসময়ে বৃন্দাবনের সাধন প্রদীপ জ্বালাইয়া রাখিয়াছেন প্রধানত তিন গোস্বামী—লোকনাথ, গোপাল ভট্ট ও শ্রীজীব। শ্রীজীব বিপুল মনীষা ও শাস্ত্র জ্ঞানের অধিকারী, সংগঠন শক্তিও তাঁহার অসাধারণ। রূপ গোস্বামীর তিরোধানের পর হইতে তিনিই বৃন্দাবনের ভক্তি সাম্রাজ্যের প্রধান পরিচালক ও ব্যবস্থাপক। গোপাল ভট্ট গোস্বামী পূর্বাশ্রমে ছিলেন শাস্ত্রবিদ্ শুদ্ধাত্মা ব্রাহ্মণ। বৃন্দাবনে আসিয়া তিনি বৈষ্ণবধর্মের সংহিতা রচনা করিয়া সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছেন। এই সর্বজনীন শ্রদ্ধা ও প্রভু শ্রীচৈতন্যের মনোনয়ন তাঁহাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে গুরুস্থানীয় মহাপুরুষরূপে। এই গোস্বামীদের মধ্যে লোকনাথ ছিলেন সকলের চাইতে বয়োবৃদ্ধ, ত্যাগ তিতিক্ষা, ভজন-নিষ্ঠা ও ভজনসিদ্ধির দিক দিয়া বরেণ্য।

ইতিমধ্যে বৃন্দাবনের গোস্বামীরা প্রায় অর্ধশতক ব্যাপিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতবাদের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন, বহুতর শাস্ত্রগ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। কিন্তু গৌড়ে এসবের প্রচার তেমন হয় নাই। গৌড় প্রভু শ্রীচৈতন্যের দেশ। যে দেশে সর্বপ্রথম তিনি রচনা করেন নিগূঢ় প্রেমধর্মের মধুচক্র, সেখানে কি তাঁহার পরিকরদের ভক্তিশাস্ত্র ও ভক্তি সাহিত্যের প্রচার ঘটিবে না, নব উজ্জীবন সাধিত হইবে না? লোকনাথ, শ্রীজীব প্রভৃতি বড় চিন্তিত হইয়া উঠিয়াছিলেন, মনে দুঃখও পাইতেছিলেন।

এই প্রচার ও উজ্জীবনের কর্ম বড় দুরূহ, বড় দায়িত্বপূর্ণ। এই কর্মভার গ্রহণের জন্য চাই এমন সব সাধক যাঁহারা কর্মকুশল, তত্ত্ববিদ্ এবং আপন আপন সাধনা ও সিদ্ধির আলোকে প্রেমধর্মের উদ্দীপনা সৃষ্টি করিতে পারেন, লক্ষ লক্ষ মানুষকে চালিত করিতে পারেন অধ্যাত্মজীবনের পথে।

কিছুদিনের মধ্যে আশার রশ্মি দেখা গেল। ত্যাগ বৈরাগ্য ও মুমুক্ষার আর্তি নিয়া বৃন্দাবনে একে একে উপস্থিত হইলেন তিনটি চিহ্নিত সাধক—শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দ। প্রাণের আবেগে নিজ নিজ প্রদেশ হইতে বৃন্দাবনে তাঁহারা ছুটিয়া আসিলেন, নিপতিত হইলেন গোস্বামী প্রভুদের পদপ্রান্তে।

উত্তরকালে এই তিন নবীন সাধক গৌড়ীয় বৈষ্ণব আন্দোলনে সংযোজন করেন নূতনতর অধ্যায়। শ্রীনিবাস রাঢ় বঙ্গে সহস্র সহস্র ভক্তকে আশ্রয় প্রদান করেন। শ্যামানন্দের প্রভাবে উড়িষ্যায় শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত নবধর্ম বিস্তৃতি লাভ করে, আর নরোত্তম উত্তর বঙ্গ এবং আসামে বহাইয়া দেন ভক্তিপ্রেমের জোয়ার।

শ্রীনিবাস গোপাল ভট্ট গোস্বামীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া ধন্য হন, আর শ্যামানন্দ দীক্ষালাভ করেন শ্রীজীবের কাছে। নরোত্তমের গুরুকরণ তখনো সম্ভব হয় নাই। গোস্বামী লোকনাথের তপস্যাপূত সিদ্ধোজ্জ্বল মূর্তি নরোত্তমের অন্তরপটে চিরতরে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে। বার বার নরোত্তম তাঁহার চরণে লুটাইয়াছেন, অশ্রুজলে তাঁহার কুটিরের মৃত্তিকা সিক্ত করিয়াছেন দীক্ষা প্রাপ্তির জন্য। কিন্তু লোকনাথ কৃপার দুয়ার উন্মোচন করেন নাই। তাঁহার সংকল্প ছিল —কখনো কাহাকেও শিষ্য করিবেন না, এখনো সেই সংকল্পে আছেন অবিচল। নরোত্তমের তাই মনোকষ্টের অবধি নাই।

শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দ এই তিন প্রতিভাধর নবীন বৈষ্ণবকে শাস্ত্র শিক্ষার ভার নিয়াছেন শ্রীজীব। রূপ, সনাতনের স্নেহধন্য উত্তরসাধক শ্রীজীব, প্রভু চৈতন্যের অচিন্ত্য ভেদাভেদ-বাদের প্রধান প্রবক্তা ও ব্যাখ্যাতা তিনি। তাছাড়া ব্রজমণ্ডলের বৈষ্ণবগোষ্ঠীর নায়ক ও প্রধান পরিচালকরূপেও তিনি চিহ্নিত। নবাগত প্রতিভাধর শিষ্যত্রয় অপরিসীম শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা নিয়া তাঁহার কাছে অধ্যয়ন করিতেছেন ভক্তিপ্রেম ধর্মের শাস্ত্রতত্ত্ব।

শিক্ষাগুরু শ্রীজীবের প্রবল ইচ্ছা, তাঁহার এই তিনটি ত্যাগী ও

প্রতিভাধর শিষ্যকে নিয়োজিত করিবেন প্রভু শ্রীচৈতন্যের ধর্মের প্রচার ও প্রসারকল্পে। কিন্তু নরোত্তমকে নিয়া গোল বাধিয়াছে। দীক্ষা গ্রহণ না করিয়া বৃন্দাবন হইতে তিনি এক পা-ও নড়িবেন না। মনে মনে গুরুরূপে বরণ করিয়াছেন গোস্বামী লোকনাথকে, কিন্তু তাঁহার কৃপা লাভের কোনো চিহ্নই দেখা যাইতেছে না।

শ্রীজীব এবং বৃন্দাবনের বিশিষ্ট বৈষ্ণব সাধুরা ব্যাপারটির গুরুত্ব বুঝেন। নরোত্তমের মতো প্রতিভাধর নবীন সাধকের প্রচেষ্টা ব্যতীত গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধন ও শাস্ত্রতত্ত্বের প্রচার সফল হইবে না। সবাই মিলিয়া লোকনাথ গোস্বামীকে চাপিয়া ধরিলেন, অনুনয় করিলেন— তিনি কৃপা না করিলে তো নরোত্তমকে নব পরিকল্পিত কর্মভার দেওয়া সম্ভব হইতেছে না। তাঁহার কাছে দীক্ষা পাইলে তবেই সে বৃন্দাবন ত্যাগ করিবে।

একান্তে তপস্যারত, নিগূঢ় ভজনানন্দে মত্ত, গোস্বামীর সেই একই কথা—শিষ্য গ্রহণের দায়িত্ব এ-জীবনে তিনি আর গ্রহণ করিবেন না, আর যে প্রতিজ্ঞা ইতিপূর্বে করিয়াছেন, কোনো মতেই তাহা তিনি ভাঙিতে পারিবেন না।

নরোত্তমের বাড়ি রাজসাহী জেলার পদ্মাতীরস্থ খেতরী গ্রামে। পিতা কৃষ্ণানন্দ মজুমদার ছিলেন প্রভাবশালী জমিদার। রাজা উপাধি ছিল তাঁর, আর ছিল বহু লক্ষ টাকার বিষয় বৈভব।

নরোত্তমের মাতা নারায়ণী দেবী অতিশয় ধর্মপ্রাণা। দীর্ঘদিন সন্তান লাভে বঞ্চিত হইয়া তিনি বহুতর ব্রত পূজার অনুষ্ঠান করেন এবং দেবতার কৃপায় লাভ করেন পুত্র নরোত্তমকে। শুভ সাত্ত্বিক সংস্কার নিয়া নরোত্তম জন্মগ্রহণ করেন, তাই বাল্যকাল হইতেই তাঁহার জীবনে দেখা যায় ত্যাগ বৈরাগ্য ও ধর্মপরায়ণতা। বিশেষ করিয়া প্রভু চৈতন্যের জীবন ও আদর্শ তাঁহাকে উদ্দীপিত করিতে থাকে। অতঃপর তরুণ বয়সে পিতার প্রাসাদের রাজতুল্য ধন, ঐশ্বর্য ও ভোগবিলাসময় জীবন ত্যাগ করিয়া বাহির হইয়া পড়েন মুক্তির সন্ধানে।

বৃন্দাবনে আসার পর শ্রীজীবের স্নেহ ও আশীর্বাদ লাভে নরোত্তম ধন্য হন, তাঁহার প্রসাদে বৈষ্ণবীয় শাস্ত্রতত্ত্বে পারঙ্গম হইয়াও উঠেন। শ্রীজীব জানেন, নরোত্তম উত্তরবঙ্গের রাজতুল্য জমিদারের সন্তান, প্রচুর বিত্ত বিভবের উত্তরাধিকারী। সেজন্যই যে তিনি তাঁহাকে এত স্নেহ করিতেন তাহা নয়। নরোত্তম জন্ম-বৈরাগী, রাজতুল্য বিষয় বৈভব ত্যাগ করার শক্তি তিনি রাখেন, নরোত্তম প্রতিভাধর নবীন শাস্ত্রবিদ্, নরোত্তম কৃচ্ছ্রব্রতী ভজননিষ্ঠ সাধক। তাই শ্রীজীবের এত প্রিয় তিনি। এই প্রিয় নবীন সাধকের উপর তাঁহার অনেক আশা, অনেক ভরসা। ঐশ্বরীয় কর্মের অনেক ভার তাঁহার উপর তিনি চাপাইতে চান। তাই শ্রীজীব তাঁহাকে গড়িয়া পিটিয়া তুলিতেছেন, পরিচিত করাইয়া দিতেছেন শ্রেষ্ঠ সাধুদের সঙ্গে।

শ্রীজীবের কৃপা ও স্নেহ মিলিয়াছে। এবার নরোত্তমের চাই গোস্বামী লোকনাথের কৃপাদীক্ষা। এই দীক্ষা লাভ করিতে পারিলে তবেই জীবন তাঁহার কৃতার্থ হইতে পারে। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নরোত্তম বহু চেষ্টাই করিয়াছেন, কিন্তু এ যাবৎ কোনো ফলোদয় হয় নাই। লোকনাথ প্রভু তাঁহার প্রতিজ্ঞায় অটল, এদিকে ভক্ত নরোত্তমও পণ করিয়া বসিয়াছেন, শিষ্যত্ব নিতে হইলে নিবেন একমাত্র তাঁহারই কাছে।

নরোত্তম স্থির করিলেন, দীক্ষা সম্পর্কে এবার শেষ চেষ্টায় ব্রতী হইবেন। লোকনাথের কুঞ্জ ছিল বৃন্দাবনের এক প্রান্তে, এক নিভৃত অরণ্যে। এই কুঞ্জের অনতিদূরে লোকনাথ কঠোর ভজনসাধনের জন্য এক ঝুপড়ি বাঁধিলেন। দিন রাতের অধিকাংশ সময় জপ ধ্যানে অতিবাহিত হইত, কিছুটা সময় ব্যয় করিতেন শ্রীজীবের নিকট শাস্ত্র অধ্যয়নে, অবশিষ্ট সময়ে নিবিষ্ট থাকিতেন বহু আকাঙ্ক্ষিত গুরুমূর্তির ধ্যানে।

স্বল্পভাষী, তপস্যারত লোকনাথ গোস্বামীর নিকটে তিনি কখনো আসিতেন না, কথাবার্তাও বলিতেন না। মৃদুস্বরে ইষ্টনাম গাহিয়া

গাহিয়া টহল দিতেন তাঁহার কুঞ্জের চারিদিকে। সর্বদা লক্ষ্য রাখিতেন সদা ভজনশীল লোকনাথকে কেহ যেন বিরক্ত না করে। তাঁহার নির্দিষ্ট দিনচর্যায় ব্যাঘ্যাত না জন্মায়।

কিছুদিন এভাবে চলিল। অতঃপর নরোত্তম উদ্ভাবন করিলেন গুরুসেবার এক বিচিত্র উপায়। লোকনাথ প্রত্যূষে উঠিয়া নিকটস্থ বনের এক নির্দিষ্ট স্থানে শৌচে যাইতেন। নরোত্তম স্থির করিলেন, এখন হইতে গুরুর মেথরের কাজটি তিনি গ্রহণ করিবেন, ইহাতে একদিকে বৃদ্ধ গুরুর পরিচর্যা যেমন করা হইবে, তেমনি তাঁহার নিজেরও হইবে অহমিকার বিনাশ। উত্তরবঙ্গের শ্রেষ্ঠ ভূম্যধিকারীর পুত্র তিনি, এতকাল দেশে রাজতুল্য সম্মানে থাকিয়া আসিয়াছেন, অকল্পনীয় ভোগবিলাসের মধ্যে বর্ধিত হইয়াছেন। লোকের কাছে রাজসম্মান প্রাপ্তির ফলে অন্তরে যে অহংবোধ দানা বাঁধিয়াছে, এই ত্যাগ বৈরাগ্যের জীবনেও হয়তো তাহা একেবারে যায় নাই সূক্ষ্ম-ভাবে রহিয়া গিয়াছে। বৃন্দাবনে আসার পরেও লক্ষ্য করিয়াছেন, মন্দিরের পূজারী ও সাধু সন্ন্যাসী, যাঁহারা তাঁহার পূর্বাশ্রমের সংবাদ জানেন, বেশ কিছুটা সমীহ করেন তাঁহাকে, সম্ভ্রমও দেখাইয়া থাকেন। ইহার সূক্ষ্ম প্রতিক্রিয়া কি কিছু তাঁহার জীবনে সৃষ্ট হইতেছে না? নাঃ—এবার গুরুর মেথরের কাজের মধ্য দিয়া সেটিকে নিশ্চিহ্ন করিবেন।

সংকল্প অনুযায়ী কাজ শুরু করিয়া দিলেন। প্রত্যহ চারদণ্ড রাত্রি থাকিতে নির্দিষ্ট বনের প্রান্তে উপস্থিত হইতেন, স্থানটিকে কণ্টকশূন্য করিয়া ঝাঁটা দিয়া ভালোভাবেই মার্জন করিতেন। নিকটেই রাখিয়া দিতেন সদ্য তোলা এক ভাণ্ড জল। তারপর ঝাঁটা গাছটি এককোণে পুঁতিয়া রাখিয়া সরিয়া পড়িতেন সেখান হইতে। আবার বেশ খানিকটা বাদে ফিরিয়া আসিয়া কোদালির সাহায্যে স্থানটি ময়লা-মুক্ত করিয়া ফেলিতেন। এমনিভাবে অন্তরালে আত্মগোপন করিয়া নরোত্তম দিনের পর দিন চালাইয়া যান তাঁর গুরুসেবা।

প্রথম দিনেই লোকনাথ গোস্বামী বুঝিলেন, কেহ অলক্ষ্যে থাকিয়া তাঁহার সেবা করিতে চাহিতেছে। ভাবিলেন, স্থানীয় বুনো লোকদের অনেকে তাঁহাকে সাধু বাবাজী বলিয়া জানে। হয়তো কাহারো খেয়াল হইয়াছে বৃদ্ধ সাধুর একটু সহায়তা করা, তাই এসব করিতেছে।

এভাবে মাসের পর মাস অতিবাহিত হয়, শেষে বৎসর গড়াইয়া যায়। কৃষ্ণভাবে সদা বিভাবিত, আপনভোলা লোকনাথ গোস্বামীর মনে হঠাৎ একদিন একটা ধাক্কা লাগে। ভাবেন, 'কাজটি তো আমার পক্ষে বড় গর্হিত হচ্ছে। কোনো ভক্ত হয়তো সাধু সেবার জন্য এই মেথরের কাজ অবলীলায় ক'রে যাচ্ছে, কিন্তু আমি নিজে সর্বস্ব ছেড়ে বৈরাগ্য অবলম্বন করেছি, কৃষ্ণ ভজনে মত্ত রয়েছি, সেই আমি কেন তার এই সেবা নেবো, কেনইবা নিজেকে এভাবে পাপে জড়াবো। না—না, এ তো হতে পারে না। আজই নিশ্চয় এর প্রতিবিধান করতে হবে।'

রাত্রি শেষ হইবার পাঁচ ছয় দণ্ড বাকী, সেই সময়ে লোকনাথ বনের ঐ নির্দিষ্ট স্থানটির কাছে গিয়া এক বৃক্ষের আড়ালে গোপনে দাঁড়াইয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পরেই অদূরে দেখা গেল এক মনুষ্য মূর্তি। সারা বন তখনো অন্ধকারাচ্ছন্ন, লোকটি কে তাহা বুঝিতে পারা যাইতেছে না।

লোকনাথ গোস্বামী হাঁক দিয়া কহিলেন, "কে তুমি ওখানে? কি করছো, বল। ভয় নেই, এসো আমার কাছে।"

লোকটির দিক হইতে কোনোই সাড়া শব্দ নাই। নীরবে ধীর পদে সে নিকটে আসিয়া উপস্থিত হয়, তারপর অকস্মাৎ লুটাইয়া পড়ে লোকনাথের চরণতলে।

অন্ধকারের ঘোর তখনো কাটে নাই, তাই ভূলুণ্ঠিত ব্যক্তিটি উঠিয়া দাঁড়ানোর পরও লোকনাথ তাঁহাকে চিনিতে পারেন নাই। আবার সহজ কণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন, "কে তুমি বাবা?"

নতশিরে লোকটি উত্তর দেয়, "আমি নরোত্তম।"

"তুমি। তা হলে রোজ তুমিই একাজ করছো," সবিস্ময়ে বলিয়া উঠেন গোস্বামী লোকনাথ।

"আজ্ঞে হ্যাঁ, প্রভু, আপনার কোনো বিঘ্ন না জন্মিয়ে যদি কিছু সেবা করতে পারি, এজন্য এ কাজটুকু করছি।"

"রাজতুল্য জমিদারের পুত্র হয়ে, এই মেথরের কাজ তুমি করছো, বাবা। না, না, নরোত্তম, এতো ঠিক নয়। এতো আমি চলতে দিতে পারিনে," ব্যাকুল স্বরে বলেন লোকনাথ।

"প্রভু, আমি কাঙাল আশ্রয়হীন, অতি অভাজন। আপনার চরণে আত্মসমর্পণ ক'রে আছি। আপনি ছাড়া আমার আর গতি নেই। অন্তত এটুকু সেবা আমায় করতে দিন।" কাকুতি জানান নরোত্তম।

"হুঁ।" বলিয়া গোস্বামী লোকনাথ গম্ভীর হইলেন, নিষ্পলক নেত্রে তাকাইয়া রহিলেন করুণাপ্রার্থী তরুণ ভক্তের দিকে।

নরোত্তম এবার হৃদয়ে কিছুটা বল পাইয়াছেন। জোড়হস্তে কহিতে লাগিলেন, "প্রভু, রাজসংসারে আমি জন্মেছি, কিন্তু সে সংসার-সুখ কোনো দিনই আমায় তৃপ্তি দিতে পারে নি। কৃষ্ণকৃপার লোভ, মহাপ্রভুর কৃপার লোভ আমায় হাতছানি দিয়ে বাইরে টেনে এনেছে। কিন্তু বৃন্দাবনধামে এসেও ভজনের প্রকৃত পথ খুঁজে পাচ্ছিনে, পাষাণে বার বার মাথা কুটে মরছি। গুরু কৃপা না হলে তো মহাপ্রভুর কৃপা, ইষ্টের কৃপা মিলবে না। আপনার চরণেই নিজেকে উৎসর্গ ক'রে আমি অপেক্ষা ক'রে আছি। আপনি যদি নির্দয় হন, এ ছার দেহ তবে বৃন্দাবনের রজেই দেবো বিসর্জন।"

গোস্বামী লোকনাথের অন্তর বিগলিত হইয়াছে, নয়ন হইয়াছে করুণার্দ্র। মৃদুস্বরে আপন মনে কহিলেন, "নরোত্তম, আমি বুঝেছি, তুমি মহাপ্রভুর আপন জন, তাঁর কৃপার অধিকারী। তাঁর পবিত্র কর্মের চিহ্নিত পুরুষ তুমি। কিন্তু বৎস, নিজের প্রতিজ্ঞা আমি নিজে কি ক'রে ভাঙি? একি কঠিন পরীক্ষায় কৃষ্ণ আমায় ফেলেছেন।"

লোকনাথের চরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম নিবেদন করিলেন নরোত্তম।

তারপর একটি গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া নতশিরে ধীরপদে সেখান হইতে চলিয়া গেলেন।

পরের দিনই কিন্তু দেখা গেল, নরোত্তমের অমানুষী আর্তির ফল ফলিয়াছে। নিত্যকার কুঞ্জ পরিক্রমা সমাপণ করিয়া তিনি নিজের ভজন-কুটিরে ফিরিতেছেন এমন সময়ে লোকনাথ তাঁহাকে নিকটে আহ্বান করিলেন। গোস্বামী প্রভুর চোখে মুখে প্রসন্নতার আভা। নরোত্তম নূতন আশায় বুক বাঁধিলেন, অনুভব করিলেন, হিমালয়ের হিমবাহ ধীরে ধীরে গলিতে শুরু করিয়াছে, শতধারে এবার উহা ঝরিয়া পড়িবে প্রাণদায়িনী ঝর্ণারূপে।

অতঃপর লোকনাথ নরোত্তমকে একদিন তাঁহার ভজনকুঞ্জে ডাকাইয়া আনেন। বলেন, "বৎস, কয়েকটা শপথ তোমায় নিতে হবে আমার কাছে। আজ হতে ভোগবিলাসের কোনো সম্পর্ক রাখবে না, এমনকি চিন্তায়ও তার স্থান দেবে না। আর আজীবন থাকতে হবে তোমায় ব্রহ্মচারী হয়ে।"

বৈরাগ্য সাধনার সকল কঠোর পথই যে লোকনাথ একান্তভাবে অনুসরণ করিয়া চলিয়াছেন। এ শপথ উচ্চারণে তাই এক মুহূর্ত বিলম্ব করিলেন না।

লোকনাথ করুণাভরা কণ্ঠে কহিলেন, "নরোত্তম, বৎস, তুমি নরোত্তমই বটে। তোমার মতো যোগ্য শিষ্যকে উপলক্ষ ক'রেই কৃষ্ণ আমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করালেন। আমি তোমায় দীক্ষা দেব। আগামী শ্রাবণী পূর্ণিমার তিথিতে তুমি পাবে তোমার ইষ্টমন্ত্র।"

নরোত্তম আনন্দে আত্মহারা, সাশ্রুনয়নে তৎক্ষণাৎ লুটাইয়া পড়েন লোকনাথের চরণে। তারপর এই সুসংবাদ জানানোর জন্য বাহির হইয়া পড়েন শ্রীজীব ও অন্যান্য বৈষ্ণব সাধকদের ভজন-কুটিরের দিকে।

বহু আকাঙ্ক্ষিত দীক্ষা লাভ করিলেন নরোত্তম। এবার সোৎসাহে রত হইলেন সদ্‌গুরুর সর্বাত্মক সেবায়। এই সঙ্গে গুরুর উপদেশ

নিয়া নিগূঢ় অন্তরঙ্গ প্রেমসাধনার ক্রমগুলি তিনি অতিক্রম করিতে লাগিলেন।

নরোত্তম বিশ্বাস করিতেন গুরুর অর্জিত সাধনা ও সিদ্ধির উত্তরাধিকারী হইতে হইলে চাই সেবা পরিচর্যার মাধ্যমে গুরুর সহিত একাত্মকতা গড়িয়া তোলা। আত্মিক সাধনার এই মূল সূত্রটি ধরিয়া, আপ্রাণ চেষ্টায় এখন হইতে তিনি অগ্রসর হইতে থাকেন। নরোত্তমের এই গুরু সেবা ও গুরু পরিচর্যার কাহিনী সারা ব্রজমণ্ডলের গল্পকাহিনীর বস্তু হইয়া উঠে।

শিষ্য নরোত্তম এক বিরাট শুদ্ধসত্ত্ব আধার, আর গুরু লোকনাথ গোস্বামীও ব্রজরসের সিদ্ধ মহাত্মা, তদুপরি দিব্য করুণা ধারার বিরাট উৎস তিনি। গুরুর কৃপা তাই একবার ঝরিয়া পড়িল অঝোরধারে। যে নিগূঢ় ব্রজরস সাধনার পদ্ধতি নিজে অনুসরণ করিয়া লোকনাথ সিদ্ধ হইয়াছিলেন, সযত্নে যথাযথভাবে তাহাই শিখাইয়া দিলেন তাঁহার একমাত্র শিষ্যকে।

নরোত্তম আর নর রহিলেন না, তপস্যার বলে আর গুরুর কৃপা বলে হইয়া উঠিলেন দেব-মানব। বৃন্দাবনের পথেঘাটে দেব-দেউলে তাঁহার তপঃসিদ্ধ, আনন্দঘন মূর্তিটি যে একবার দর্শন করিত সেই শির নত করিত সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধা সহকারে।

শ্রীজীব গোস্বামী নরোত্তমকে পূর্ব হইতেই অশেষভাবে স্নেহ করিয়া আসিতেছেন। লোকনাথের নিকট হইতে কৃপাদীক্ষা প্রাপ্তির পর নরোত্তম যে নিগূঢ় ব্রজরস সাধনায় পারঙ্গম হইয়াছে, ইহা তাঁহার দৃষ্টি এড়ায় নাই। গোস্বামী এবং সিদ্ধ মহাত্মাদের মহলে শ্রীজীব প্রস্তাব তুলিলেন, সিদ্ধ সাধক নরোত্তমকে দান করা হোক 'ঠাকুর' উপাধি। অতঃপর গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে যাহাতে তিনি গুরু স্থানীয় সাধক পুরুষরূপে সম্মান প্রাপ্ত হন, এই জন্যই তাঁহার এই প্রস্তাব। সানন্দে সকলেই ইহাতে সম্মতি দিলেন এবং এখন হইতে সাধু নরোত্তম হইলেন—নরোত্তম ঠাকুর। বৃন্দাবনে এসময়ে ঠাকুর বলিতে লোকে বুঝিত বরেণ্য বৈষ্ণব সাধক নরোত্তমকে। নরোত্তমের

এই স্বীকৃতি ও মর্যাদার ভিতর দিয়া সাধক-সমাজে বিশেষভাবে ফুটিয়া উঠিল সিদ্ধ মহাত্মা লোকনাথ গোস্বামীর অবদানের প্রকৃত মাহাত্ম্য।

"লোকনাথ ক্রমে জরাগ্রস্ত এবং স্থবির হইয়া পড়িতেছিলেন; পুজার্চনার সকল রীতি রক্ষা করিতে পারেন না, জপ সংখ্যাও প্রত্যহ পূর্ণ হয় না। তবুও তিনি স্বাবলম্বনের পূর্ণ মূর্তি, কাহারও অপেক্ষা করিতে চাহিতেন না। নরোত্তম যে এত সেবা করিতেন, তবুও তিনি পরবশ হইলেন না। নরোত্তমের যখন গৃহে ফিরিবার ব্যবস্থা হইল তিনি তাহাকে অম্লান বদনে অনুমতি দিলেন, অথচ দ্বিতীয় শিষ্য গ্রহণ করিলেন না। নরোত্তমই তাঁহার একমাত্র শিষ্য।

লোকনাথের আর একটি বিশেষত্ব ছিল। তিনি আপনার কথা কাহাকেও কিছু বলিতেন না। কোনো প্রকারে কেহ তাঁহার কোনো গুণগাথা গায় তাহা তিনি পছন্দ করিতেন না। তিনি নিজে কোনো শাস্ত্রগ্রন্থ লিখেন নাই, অথচ রূপ, সনাতন ও গোপাল ভট্ট প্রভৃতি গোস্বামিগণের সাধনতত্ত্বের অনেক সারাংশ তাঁহার নিকট হইতেই গৃহীত।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ যখন বৃন্দাবনের সকল ভক্তগণের উপদেশ ও আনুকুল্যে তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত রচনা করিতেছিলেন, তখন লোকনাথও তাঁহাকে অনেক সাহায্য করেন, কিন্তু গ্রন্থ মধ্যে তাঁহার নিজের কোনো প্রসঙ্গ উল্লেখ করিতে তিনি বারংবার নিষেধ করিয়াছিলেন। এজন্য সেই বিরাট গ্রন্থে সে যুগের বহু কথা, বহু ঘটনা চোখের জলের কালিতে লিখিত হইয়াছিল, তাহার মধ্যে লোকনাথের কোনো কথা নাই। সে যুগে এমন আত্মগোপন গোপাল ভট্ট ব্যতীত গোস্বামীপাদদিগের মধ্যেও আর কেহ করেন নাই। লোকনাথ গোস্বামীর জীবদ্দশায় কোনো লেখক তাঁহার কোনো কথা কোনো গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিতে সাহস করেন নাই। এই জন্যই লোকনাথ চরিত্রের অনেক তথ্য মনুষ্য নেত্রের

পথবর্তী হইবার অবসর পাইতেছে না। লোকনাথের মতো নিস্পৃহ, সর্বত্যাগী মহাপুরুষ অতি বিরল[১]।"

বৃন্দাবনে গোস্বামীদের প্রতিভা, উৎসাহ ও কর্মনিষ্ঠার ফলে বহুতর বৈষ্ণব শাস্ত্র রচিত ও সংগৃহীত হইয়াছে। শ্রীজীব গোস্বামী ও অন্যান্য উচ্চকোটির সাধুরা স্থির করিয়াছেন এই অমূল্য শাস্ত্র সম্পদ গৌড়ে পাঠানো হইবে। ইহার দায়িত্বভার গ্রহণ করিবেন শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দ, শ্রীজীবের তিন প্রতিভাধর ছাত্র। ইঁহাদের জন্য ব্যবস্থা করা হইবে উপযুক্ত যানবাহন ও রক্ষীদল।

লোকনাথ গোস্বামীর বয়স তখন প্রায় একশত বৎসর। বৃন্দাবনের প্রাচীনতম সিদ্ধপুরুষ তিনি। তাঁহার কুঞ্জে আসিয়া শ্রীজীব তাঁহার প্রস্তাব উপস্থাপিত করিলেন। কহিলেন, "শ্রীনিবাস ও শ্যামানন্দের সঙ্গে নরোত্তমকেও আমরা গৌড়ে পাঠাতে চাই। এদের মতো কঠোরতপা ভক্ত সাধকই বৈষ্ণব শাস্ত্র এবং বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারে সমর্থ। মহাপ্রভুর আরব্ধ আজ সম্পন্ন করার জন্য এদের গৌড়ে যাওয়া প্রয়োজন।"

গোস্বামী লোকনাথ সোৎসাহে সমর্থন করিলেন এই প্রস্তাব। কহিলেন, "শ্রীজীব, তোমাদের এই ব্যবস্থাপনায় মহাপ্রভুর কর্ম সিদ্ধ হবে, জীবের কল্যাণ সাধিত হবে। এতো অতি আনন্দের সংবাদ। নরোত্তমকে গৌড়ে যাবার অনুমতি অবশ্যই আমি দেবো।"

বিদায়কালে প্রাণপ্রিয় শিষ্যকে লোকনাথ গোস্বামী কহিলেন, "বৎস নরোত্তম, আমি প্রাণভরে আশীর্বাদ করি, তোমার এই নূতন ব্রত সুসম্পন্ন হোক। তুমি আমার একমাত্র শিষ্য, সার্থকনামা শিষ্য। যখন যেখানে থাকো, বিষয় সংস্পর্শ সম্পূর্ণরূপে বর্জন ক'রে, তা থেকে দূরে থাকবে। ভজনানন্দে ও অষ্টপ্রহরীয় লীলা অনুধ্যানে করবে দিন যাপন।"

আসন্ন বিচ্ছেদের কথা স্মরণ করিয়া নরোত্তম শোকাকুল হইয়া উঠিয়াছেন, কপোল বাহিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িতেছে। তাঁহাকে

১ লোকনাথ গোস্বামী : সতীশচন্দ্র মিত্র

প্রবোধ দিয়া লোকনাথ আবার কহিলেন, "বৎস, তোমায় আমি শিষ্য করেছি, নিজের দীর্ঘ দিনের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ ক'রে। আমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়েছে তোমার ভক্তি ও পুণ্যের বলে। আজ আমি তোমার কৃতবিদ্যতা ও সাধনোজ্জ্বলা বুদ্ধি দেখে পরম সন্তুষ্ট। যে কয়দিন বেঁচে আছি, আর কাউকে আমি শিষ্য করবো না। আমার শিক্ষা দীক্ষা ও সাধনের প্রদীপকে একলাটি তুমিই রাখবে জ্বালিয়ে।"

জোড়হস্তে কাতরকণ্ঠে নরোত্তম বলেন, "প্রভু, আশীর্বাদ করুন, গৌড়ের কর্মব্রতের ফাঁকে ফাঁকে এ অধম যেন আপনার চরণ দর্শন ক'রে যেতে পারে।"

"না বৎস," সুস্পষ্ট ভাষায় বলেন লোকনাথ গোস্বামী, "তোমার আর বৃন্দাবনধামে আসবার প্রয়োজন নেই। তোমার আমার এই শেষ দেখা।"

গুরুগত প্রাণ ভক্ত নরোত্তমের মাথায় যেন বজ্রাঘাত হয়। তৎক্ষণাৎ মূর্ছিত হইয়া তিনি ভূমিতলে পতিত হন।

কিছুকাল পরে বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিলে গুরুদেবের চরণে প্রণিপাত করিয়া ভিক্ষা মাগেন তাঁহার পাদুকা দুইটি। এই পাদুকা শিরে ধারণ করিয়া নিষ্ক্রান্ত হন বৃন্দাবন হইতে।

অতঃপর তপঃসিদ্ধ মহাপুরুষ লোকনাথ গোস্বামী আর বেশী দিন জীবিত থাকেন নাই। আনুমানিক ১৫৮৮ খ্রীষ্টাব্দে নির্ধারিত চিরবিদায়ের ক্ষণটি আসিয়া যায়। ইষ্টদেব শ্রীরাধাবিনোদের বিজয়-মূর্তির দিকে সজল নয়নদুটি নিবদ্ধ করিয়া নরলীলায় ছেদ টানিয়া দেন চিরতরে। বৃন্দাবনের নব উজ্জীবনের জন্য যে প্রথম আলোক-বর্তিকাটি প্রভু শ্রীচৈতন্য স্বহস্তে জ্বালাইয়া দিয়াছিলেন, সেদিন তাহা নির্বাপিত হইয়া যায়।

রূপ গোস্বামী

শ্রাবণ মাসের বর্ষণ-জর্জর নিশীথ রাত্রি। ঝুপ ঝুপ করিয়া অঝোর-ধারে বৃষ্টি পড়িতেছে, সেই সঙ্গে রহিয়াছে উদ্দাম ঝড়ের হাওয়া। এই দুর্যোগের রাত্রে রামকেলি হইতে একটি তাঞ্জাম চলিয়াছে গৌড় শহরের দিকে। পথঘাট পিচ্ছিল, বাহকেরা খুব সতর্কপদে চলিতেছে।

তাঞ্জামের ভিতরে চিন্তিত মনে বসিয়া আছেন সন্তোষ দেব, সুলতান হুসেন শাহের রাজস্ব বিভাগের অধিকর্তা। সুলতানের জরুরী তলব আসিয়াছে তাড়াতাড়ি হাজির হওয়ার জন্য। তাই ভরা বর্ষার এই মধ্য রাত্রেই এভাবে তাঁহাকে ছুটিতে হইয়াছে।

হঠাৎ অসময়ে কেন এই তলব? দপ্তরের কোনো গোলযোগ? বড় ধরনের কোনো তহবিল তছরুপ? না সুলতান গোপনে কোনো সামরিক অভিযানে যাইতেছেন, এজন্য কোষাগার খোলার জন্য অধিকর্তাকে এমন তাড়াতাড়ি ডাকিয়া নেওয়া? জরির কিংখাবে মোড়া তাঞ্জামের ভিতরে, তাকিয়া হেলান দিয়া বসিয়া আছেন সন্তোষ দেব। গড়গড়ার নলটি মুখে বসানো। চিন্তিত মনে মাঝে মাঝে সেটি টানিয়া চলিয়াছেন, বাদশাহী অম্বুরি তামাকের ধোঁয়া ও সুবাস ছড়াইতেছে চারিদিকে।

ঘন অন্ধকারময় রাজপথ হঠাৎ প্রদীপ্ত হইয়া উঠে বজ্র বিদ্যুতের আলোকে। একটা প্রকাণ্ড বৃক্ষ ঝড়ে ভাঙিয়া পড়িয়াছে, আড়াআড়ি ভাবে পতিত হওয়ায় রাস্তাটি প্রায় বন্ধ। পথ চলিবার উপায় নাই। রাজপথের একপাশে সারি সারি পর্ণকুটির, রজকেরা এগুলিতে বাস করে। রাজপুরীর কাজকর্ম করিয়া সংসার চালায়।

রাজপথ বন্ধ, তাই বাহকেরা তাঞ্জামটি নিয়া একটি পর্ণকুটিরের ছাঁচতলা ঘেঁষিয়া ধীরপদে চলিতেছে, বর্ষণের ফলে সেখানে তখন

জমিয়া গিয়াছে হাঁটুজল, জল ঠেলিয়াই ধীরে ধীরে বাহকদের চলিতে হইতেছে।

তাঞ্জামে উপবিষ্ট অবস্থায় সন্তোষদেবের কানে পৌঁছিল পর্ণ-কুটিরের ভেতরকার আওয়াজ। গভীর রাত্রে এমন ঘোর বর্ষায়, কে পথ চলিয়াছে তাহা নিয়া চলিয়াছে ধোপা ও ধোপানীর কথাবার্তা।

পুরুষ কণ্ঠের প্রশ্ন, "অন্ধকারে, সপ্ সপ্ শব্দে হাঁটুজল ঠেলে কে যাচ্ছে, কে জানে?

নারীকণ্ঠের মন্তব্য শোনা যায়, "কে আর হবে? হয় কুকুর, বা চোর। নয়তো রাজার কোনো গোলাম। এ ঘোর দুর্যোগে আর কেউ তো বেরুবে না।"

"না গো, কুকুর নয়, চোরও নয়। কয়েকটা মানুষের পায়ের জল-ঠেলা শব্দ পাচ্ছি। হয়তো কোনো হতভাগা রাজকর্মচারী রক্ষীদল নিয়ে পথ চলেছে জরুরী তলব পেয়ে।"

তাঞ্জামের ভিতর অর্ধশায়িত ছিলেন সন্তোষদেব, ক্ষিপ্রভাবে তিনি উঠিয়া বসেন। দম্পতির কথাগুলি যেন তাঁহাকে দংশন করে বৃশ্চিকের মতো। কুকুর বা তস্কর বা রাজার গোলাম। একই পর্যায়ভুক্ত এসব। দরিদ্র নিরক্ষর দম্পতির কথা বটে, স্থূল ধরনের মন্তব্য বটে, কিন্তু কথাগুলি তো মোটামুটিভাবে অসত্য নয়। রাজার গোলামী হলেও, এ গোলামী ঘৃণ্য, অসহ্য। সোনার খাঁচা বা লোহার খাঁচা, বন্দী পাখির জীবনে একই দুর্ভাগ্য বহন করিয়া আনে।

ক্ষুণ্ণ মনে নিজের সমগ্র জীবনের দিকে দৃষ্টিপাত করেন সন্তোষ-দেব। বিষয় বৈভব যথেষ্ট অর্জন করিয়াছেন, রাজ সরকারে প্রচুর সম্মান। সুলতানের অনুগৃহীত বলিয়া দেশের সবাই সমীহ করে, সম্ভ্রম দেখায়। কিন্তু এই মান-ঐশ্বর্যময় জীবন এখনও তো দাসত্বের শৃঙ্খলে বাঁধা। মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় দীর্ঘ দিন জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিয়াছেন। কিন্তু আজো তাহা করায়ত্ত হয় নাই। এই ব্যর্থ জীবন, বন্ধ্যা জীবন, আজ সত্যই তাঁহার পক্ষে বড় দুর্বহ। নাঃ আর নয়, এবার রাজ-প্রশাসনের উচ্চপদ ছাড়িয়া, বিত্তবিষয় সবকিছু বিলাইয়া দিয়া

বাহির হইবেন মুমুক্ষার পথে। ইষ্টদর্শনের জন্য, কৃষ্ণলাভের জন্য করিবেন মরণ পণ।

সেদিনকার এই উদ্দীপনা ও আর্তি সন্তোষদেবের জীবনে ঘটায় রূপান্তর। রাজানুগ্রহ ও রাজসেবা চিরতরে তিনি ত্যাগ করেন, কৃষ্ণ-সেবায় সমগ্র জীবন করেন নিয়োজিত। সারা ভারতের এক শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব নেতারূপে, মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের অন্যতম প্রধান পার্ষদরূপে তিনি কীর্তিত হইয়া উঠেন, পরিগ্রহ করেন প্রভুর প্রদত্ত রূপ গোস্বামী নাম। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের অন্যতম অধিনায়ক রূপে বৃন্দাবনে যে ভূমিকা তিনি গ্রহণ করেন আজো তাহা অবিস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে।

রূপ গোস্বামীর পূর্বপুরুষ ছিলেন দাক্ষিণাত্যের বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। এক সময়ে কর্ণাটের কোনো অঞ্চলে ইঁহারা রাজত্ব করিতেন। পরবর্তীকালে ইঁহাদের একটি অধস্তন পুরুষ গৌড়ে আসিয়া রাজ সরকারে কর্ম গ্রহণ করেন এবং স্থায়ীভাবে গৌড়েই বসবাস করিতে থাকেন।

এই বংশের মুকুন্দদেব ছিলেন গৌড়ের বাদশাহের এক সুদক্ষ ও আস্থাভাজন উচ্চ কর্মচারী। ইঁহার পুত্রের নাম কুমারদেব। শাস্ত্র-বিদ্ বৈষ্ণব বলিয়া তাঁহার খ্যাতি ছিল। কুমারদেব তিনটি নাবালক পুত্র রাখিয়া অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন। পিতামহ মুকুন্দদেবকে গ্রহণ করিতে হয় তিন পৌত্র, অমর, সন্তোষ ও বল্লভকে মানুষ করার দায়িত্বের ভার।

অমর সন্তোষ ও বল্লভ উত্তরকালে প্রভু শ্রীচৈতন্যের কৃপা ও আশ্রয় লাভ করেন এবং প্রভু তাঁহাদের নূতন নামকরণ করেন, যথাক্রমে—সনাতন, রূপ ও অনুপম। অনুপম তাঁহার একমাত্র পুত্র শ্রীজীবকে রাখিয়া অকালে ইহলোক ত্যাগ করেন। আর উত্তরকালে সনাতন ও রূপের অভ্যুদয় ঘটে শ্রীচৈতন্যের অন্তরঙ্গ পার্ষদরূপে, বৃন্দাবনের ভক্তি সাম্রাজ্যের নিয়ন্তারূপে।

পিতামহ মুকুন্দদেব সনাতন ও রূপের শিক্ষার সুবন্দোবস্ত করিতে কোনো ত্রুটি করেন নাই। রামকেলিতে রামভদ্র বাণী-বিলাসের নিকট তাঁহারা ব্যাকরণ পাঠ সমাপ্ত করেন। তারপর তাঁহাদের নবদ্বীপে পাঠানো হয়, সেখানে রত্নাকর বিদ্যাবাচস্পতি এবং বাসুদেব সার্বভৌমের নিকট অধ্যয়ন করেন উচ্চতর শাস্ত্র।

মুকুন্দদেব বিচক্ষণ ব্যক্তি। বুঝিলেন, শুধু শাস্ত্রবিদ্যায় রাজ-সরকারে উচ্চপদ মিলিবে না, এজন্য চাই ফার্সী ও আরবী ভাষার শিক্ষা। সপ্তগ্রামের শাসক সৈয়দ ফকরুদ্দীন মুকুন্দদেবের বন্ধু, ফার্সী ও আরবীতে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। তাঁহার তত্ত্বাবধানে থাকিয়া উভয় ভ্রাতা ঐ ভাষা দুইটি যত্ন সহকারে অধ্যয়ন করিলেন। অল্প সময়ের মধ্যে ব্যুৎপন্ন হইয়াও উঠিলেন।

দরবারে পিতামহের প্রতিপত্তি ছিল, তাই অল্পবয়সে সনাতন রাজকার্যে ঢুকিয়া পড়িলেন। প্রখর বুদ্ধি, প্রতিভা ও কর্মকুশলতার গুণে অধিকার করিলেন মুখ্য সচিবের পদ। ছোটভাই রূপকে তিনি ঢুকাইয়া দিয়াছিলেন রাজস্ব বিভাগে, বিদ্যাবুদ্ধি ও পরিচালন দক্ষতায় অল্পসময়ে তিনি সুলতানের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন, উন্নীত হইলেন রাজস্ব অধিকর্তার উচ্চপদে।

গৌড়ের সন্নিহিত গ্রাম রামকেলিতে উভয় ভ্রাতা বাস করিতেন। পদমর্যাদা, বিত্ত এবং শিক্ষাদীক্ষার দিক দিয়া তাঁহারা অগ্রণী। ধর্ম এবং সমাজের নেতৃত্বও ছিল তাঁহাদেরই করায়ত্ত। রামকেলিতে তাঁহাদের ভবনে প্রায়ই আগমন ঘটিত শাস্ত্রবিদ্ ব্রাহ্মণদের, ধর্মীয় আলোচনা ও বিচার অনুষ্ঠিত হইত সোৎসাহে। রূপ ও সনাতনের বিদ্যা ও বৈদগ্ধ্য সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। ব্রাহ্মণ এবং সাধু সজ্জনের ভিড় লাগিয়াই থাকিত তাঁহাদের গৃহে, আদর আপ্যায়ন দানধ্যানে রূপ ও সনাতন সকলের সন্তোষ বিধান করিতেন।

রামকেলির এই পরিবেশ হইতে বাহির হইলেই দেখা যাইত রূপ সনাতনের আর এক রূপ। সেখানে তাঁহারা গৌড়ের বাদশাহের আস্থাভাজন ও অতি অন্তরঙ্গ উচ্চ কর্মচারী। দরবারের মুসলিম

পরিবেশের রূপান্তরিত মানুষ তাঁহারা। চোগা চাপকান সমন্বিত পোষাক, আরবী ফার্সী বুলির চমৎকারিতা, এবং মুসলমানী আদপ কায়দা দেখিয়া বুঝিবার উপায় নাই যে তাঁহারা নিষ্ঠাবান্ হিন্দু এবং সনাতন ধর্মের ধারক ও বাহক।

বৈষ্ণবীয় সংস্কার পূর্ব হইতেই বর্তমান ছিল রূপ ও সনাতনের বংশে। এবার উভয় ভ্রাতার মধ্যে এই সংস্কার ধীরে ধীরে প্রবল হইয়া উঠে। প্রেমভক্তির রসধারায় অন্তর অভিসিঞ্চিত হয়, কৃষ্ণকৃপা ও কৃষ্ণপ্রাপ্তির জন্য প্রাণমন হয় অধীর চঞ্চল। মুক্তির আকুতি আর বিষয় বৈরাগ্য ক্রমে দুর্বার হইয়া উঠে।

সারা গৌড়দেশে তখন নবদ্বীপের চাঞ্চল্যকর সংবাদ ছড়াইয়া পড়িয়াছে। শ্রীচৈতন্যের অভ্যুদয়ের কথা, প্রেমভক্তি ধর্মের নবতন আন্দোলনের কথা, অন্যান্য স্থানের মতো রামকেলিতেও আলোচিত হইতেছে। ভক্ত মানুষ, মুক্তিকামী মানুষ, নূতনতর আবেগ আর নূতনতর আশায় অধীর হইয়া উঠিয়াছে।

সনাতন ও রূপ এসময়ে প্রভু শ্রীচৈতন্যের চরণাশ্রয় চাহিয়া পত্র দিলেন। প্রভু জানাইলেন, এখন নয়, আরো কিছুদিন তোমরা অপেক্ষা কর।

অতঃপর সন্ন্যাস গ্রহণের পর প্রভু নিজেই একদিন বৃন্দাবন গমনের ছলে রামকেলিতে আসিয়া উপস্থিত। রূপ ও সনাতন ছুটিয়া গেলেন তাঁহার পদপ্রান্তে, সংসার ত্যাগের জন্য উভয়ে অস্থির হইয়া পড়িয়াছেন। এবারও প্রভু বাধা দিলেন, কহিলেন, আরো কিছুকাল ধৈর্য ধারণ কর।

প্রভুর সেদিনকার দিব্য দর্শন ও আশীর্বাদ লাভের পর হইতেই বিষয় বিতৃষ্ণায় দুই ভ্রাতার মন ভরিয়া উঠিয়াছে। অতঃপর কি করিয়া নিগড় কাটিয়া ফেলিয়া মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলিবেন, এই চিন্তাই কেবল করিতেছেন।

মনের এই নির্বিন্ন অবস্থায় সেদিনকার দুর্যোগময় রাত্রে রূপের সর্বসত্তায় এক প্রচণ্ড নাড়া পড়িয়া গেল। সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া

ফেলিলেন,—চিরতরে করিবেন গৃহত্যাগ। প্রভু শ্রীচৈতন্তের পদাশ্রয় গ্রহণ করিয়া হইবেন কাস্থা করঙ্গধারী বৈষ্ণব, অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করিবেন কৃষ্ণভজনে।

রূপ এবং সনাতন দুই ভ্রাতা নিতান্ত আকস্মিকভাবে রাজ-ঐশ্বর্য ত্যাগ করিয়া বৈরাগী হন নাই এবং মন্ত্রবলে প্রেমভক্তি রসের রহস্ত জ্ঞাত হন নাই। এজন্য সংসার জীবনে, উচ্চ রাজপদে থাকার কালে দীর্ঘ প্রস্তুতির মধ্য দিয়া তাঁহাদের চলিতে হইয়াছে। এ প্রস্তুতির মূল্য নিরূপণ না করিলে তাঁহাদের ত্যাগপূত জীবনের মূল রহস্তের সন্ধান পাওয়া যাইবে না। ভক্তি রত্নাকর বলিতেছেন :

সদা সর্বশাস্ত্র চর্চা করে দুইজন।
অনায়াসে করে দোহে খণ্ডন স্থাপন॥
ন্যায়সূত্র ব্যাখ্যা নিজকৃত যে করয়।
সনাতন রূপ শুনিলে সে দৃঢ় হয়॥

গবেষক ও ইতিহাসকার সতীশচন্দ্র মিত্র সনাতন ও রূপের শাস্ত্রচর্চার চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন :

শুধু নিজেরা দুইজনে তর্ক করিয়া কোনো মত খণ্ডন বা নূতন মত স্থাপন করিতেন, তাহা নহে, অন্য পণ্ডিতেরাও কেহ ন্যায়শাস্ত্রের কোনো নূতন ব্যাখ্যা করিলে তাহা উভয় ভ্রাতাকে জানাইয়া এবং অনুমোদিত করিয়া না লইলে কাহারও চিত্ত স্থির হইত না। এইভাবে উচ্চ রাজকার্য হইতে যেটুকু অবসর মিলিত, ভ্রাতৃদ্বয় তাহা শাস্ত্র-চর্চায় অতিবাহিত করিতেন। সনাতনের গুরুদেব বিদ্যা-বাচস্পতি মহাশয় সাধারণত নবদ্বীপ-সংলগ্ন বিদ্যানগরে বাস করিতেন। যখন তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা পুরীতে এবং পিতা কাশীতে যান, তখন তিনি সময় সময় দীর্ঘকাল গৌড়ে আশ্রয় লইতেন। দূরদেশ হইতে যে সব শাস্ত্রদর্শী পণ্ডিত সুব্রাহ্মণ আসিতেন, রাজাজ্ঞাতেই আসুন বা সনাতনের আহ্বানেই আসুন, দুই ভ্রাতা পরম যত্নে রামকেলির বাড়িতে তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিতেন এবং সশ্রদ্ধ আপ্যায়নে সকলকে পরিতুষ্ট করিতেন। এজন্য তাঁহারা

অজস্র অর্থব্যয়ে কখনো কুণ্ঠিত হইতেন না। রামকেলিতে চতুষ্পাঠী বসিয়াছিল, সংস্কৃত শাস্ত্রের পঠনপাঠন হইত। তাঁহারা সে সকল অনুষ্ঠানের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এইরূপ নানাভাবে রামকেলিতে বহু ব্রাহ্মণ আসিতেন, সুদূর কর্ণাটদেশ হইতেও তাঁহাদের নিজ সম্প্রদায়ভুক্ত বৈদিক ব্রাহ্মণেরা আসিতেন। সুগন্ধ কুসুম ফুটিলে তাহার সৌরভামোদে চারিদিক হইতে ভৃঙ্গকুল আসিয়া থাকে, তেমনি তাঁহাদেরও যশ সর্বত্র বিকীর্ণ হইয়াছিল। সমাগত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের অনেকেরই জন্য তাঁহারা বাসস্থানের ব্যবস্থা করিয়া দিয়েছিলেন।

"কর্ণাট দেশাদি হইতে আইলা বিপ্রগণ॥
সনাতন রূপ নিজ দেশস্থ ব্রাহ্মণে।
বাসস্থান দিলা সবে গঙ্গা সন্নিধানে॥
ভট্টগোষ্ঠী বাসে 'ভট্টবাটী' নামে গ্রাম।
সকলে শাস্ত্রজ্ঞ, সর্বমতে অনুপম॥"

কলিকাতার নিকটবর্তী আধুনিক ভট্টপল্লী বা ভাটপাড়ার মত রামকেলির পার্শ্বে ভাগীরথী তীরেও আর একটি ভট্টবাটী গ্রাম হইয়াছিল; এখন তাহার চিহ্ন পর্যন্ত নাই।

তাঁহারা যে অবসরকালে কেবল শাস্ত্রচর্চা লইয়াই থাকিতেন, তাহা নহে, ধর্ম সাধনায়ও তাঁহারা পশ্চাদ্‌পদ ছিলেন না। একদিনেই মানুষ নূতন করিয়া গড়িয়া উঠে না। সকল প্রতিভারই উন্মেষ পূর্ব জীবনে হইয়া থাকে। যদি কেহ ভাবিয়া থাকেন, মুসলমান নৃপতির কর্মচারী রূপ সনাতন বৃন্দাবনে গিয়া একদিনেই অসাধারণ পণ্ডিত ও ভক্তচূড়ামণি হইয়াছিলেন, তাহা মিথ্যা কথা। উভয় ভ্রাতা অসাধারণ পণ্ডিত পূর্ব হইতেই ছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের ভক্তির উন্মেষ কর্মজীবনেই হইয়াছিল, নতুবা তাঁহাদিগকে দেখিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নীলাচল হইতে ছুটিয়া রামকেলিতে আসিতেন না। উভয় ভ্রাতা অতি ভক্তিনিষ্ঠার সহিত শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন করিতেন এবং বৃন্দাবনলীলার অনুষ্ঠানও প্রায়শ করিতেন।

বৃন্দাবনলীলার বহু বিগ্রহ রামকেলি গ্রামের নানাস্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, এজন্য ঐ গ্রামের অন্য নাম, কৃষ্ণকেলি। রামকেলিতে তাঁহাদের আবাস বাটীর চারিধারে শ্যামকুণ্ড, রাধা কুণ্ড, বিশাখা কুণ্ড —এই নামে কতকগুলো সরোবর রহিয়াছে। তাহাদের সাধনভজন সম্বন্ধে ভক্তিরত্নাকরে আছে—

বাড়ীর নিকটে অতি নিভৃত স্থানেতে।
কদম্বকানন রাধাশ্যাম কুণ্ড তা'তে॥
বৃন্দাবনলীলা তথা করয়ে চিন্তন।
না ধরে ধৈরয নেত্রে ধারা অনুক্ষণ॥

এখানেও তাঁহারা বিগ্রহ সেবা করিতেন, এখানেও তাঁহারা সাধুসঙ্গ ও সাধুসেবা করিতেন। সময়ে সময়ে তাহা করিতে না পারিয়া বিরক্ত ও বিষণ্ণ হইতেন। বিষয়ী রাজার সেবা এবং রাজকার্য পরিচালনা করিতে গিয়া যখন পদে পদে তাঁহাদের অনুকূল পথের অন্তরায় উপস্থিত হইত, তখন তাঁহারা অবিরত অনুতাপানলে দগ্ধ হইতেন, উহাতেই তাঁহাদের বৈরাগ্যের পথ উন্মুক্ত করিয়াছিল।

রূপ এবং সনাতন দুই ভাইয়েরই প্রতিভার বিকাশ দেখা দিয়াছিল তাঁহাদের যৌবন উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে। এই সঙ্গে মিলিত হইয়াছিল সংস্কৃত শাস্ত্র এবং আরবী ফার্সী-সাহিত্যের পারদর্শিতা। তারপর উভয়ে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিলেন নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য নিয়া। "দর্শনশাস্ত্রে সনাতনের এবং কাব্য ব্যাকরণাদিতে রূপের কিছু বিশেষ অধিকার ছিল। যৌবনেই লোকের কবিত্বের উন্মেষ হয়, রূপেরও তাহা হইয়াছিল। তিনি গৌড়ে থাকিতেই তাঁহার দুইখানি কাব্য হংসদূত ও উদ্ধব-সন্দেশ রচনা করেন। অগ্রজ অপেক্ষা রূপ বোধহয় পারসীক ভাষায় অধিকতর পারদর্শিতা লাভ করিয়া ছিলেন। তাঁহার কাব্যানুরক্তির ইহাও অন্যতম কারণ। তাঁহার ভাষার মধ্যে যে কোমল কাব্যকলার মধুর নিক্বণ অনুভূত হয়,

তাহাতে পারস্য সাহিত্যের ঋণ অস্বীকার করা যায় না। তরুণ বয়সে সপ্তগ্রামে থাকিয়া উভয় ভ্রাতায় তথাকার প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও শাসনকর্তা, সৈয়দ ফকরউদ্দীনের নিকট থাকিয়া পারসীক ভাষা শিক্ষা করেন।

"সনাতনের বিদ্যাবুদ্ধি ও কার্যদক্ষতায় মুগ্ধ হইয়া সুলতান হুসেন শাহ তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা রূপকে রাজস্ব বিভাগে উচ্চ পদ প্রদান করেন। ঐ বিভাগের কার্যে যেরূপ সূক্ষ্ম সন্ধান, কার্যকুশলতা এবং লোকপরিচালনের ক্ষমতা থাকা প্রয়োজনীয় রূপের তাহা ছিল। তিনি স্থূলকায় ছিলেন, তাঁহার মুখাবয়বে এমন একপ্রকার কঠোর তেজস্বিতা প্রচ্ছন্ন ছিল যে তাঁহাকে দেখিলেই লোক মস্তক অবনত করিত। সুকুমার দেহ সনাতনের প্রশান্ত মূর্তি ও ভাবগাম্ভীর্য দেখিয়া লোকে তাঁহাকে ভক্তি করিত, রূপের মুখপ্রতিভা দেখিয়া সকলে তাহাকে ভয় করিত। রূপের মতো ব্যক্তি লোকপাল হইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। বৃন্দাবনে গিয়া তিনিই তথাকার সর্বময় কর্তা হইয়াছিলেন। তাঁহার মতো রাশভারী লোকদিগের অন্তঃকরণে কোনো নীচতা বা সংকীর্ণতা আসিতে পারে না, তাঁহারা সর্বত্রই সর্বকার্যে বিশ্বাসী ও প্রতিপত্তিশালী হন।

"রাজকার্যে রূপের অপ্রতিহত ক্ষমতা ও বিশ্বস্ততার জন্য সুলতান হুসেন শাহ তাঁহাকে সাকর বা সাকের (বিশ্বস্ত) মল্লিক" এই সম্মান-সূচক নাম এবং উপাধি দিয়াছিলেন। তিনি সকল কার্যই বলদর্পের সহিত করিতেন। তাঁহার সংকল্প স্থির হইতে বিলম্ব হইত না; সংকল্প হওয়া মাত্র উহা তিনি কার্যে পরিণত করিতে দৃঢ় চেষ্টা করিতেন। রাজস্ব সচিবরূপে রূপ যে রাজা প্রজা সকলের নিকট হইতে প্রীতি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহা বলাই বাহুল্য। তিনি এমন সুন্দরভাবে পারসীক লিখিতে, পড়িতে ও অনর্গল বলিতে পারিতেন এবং সকল মুসলমান কর্মচারীর সহিত মিশিয়া কার্য নির্বাহ করিতেন যে সাকর মল্লিক মুসলমান বা হিন্দু ছিলেন, তাহা কেহ বুঝিতে পারিত না। নানাভাবে বিধর্মীদিগের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে

মিশিতে গিয়া তিনি ও তাঁহার ভ্রাতারা সকলেই কতকটা ম্লেচ্ছাচারী হইয়া গিয়াছিলেন। রাজকার্যে তাঁহাদের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হইত এবং মুসলমানী হাবভাবে তাঁহাদিগকে আত্মগোপন করিতে বাধ্য হইতে হইলেও তাঁহারা নিজগৃহে কখনও শাস্ত্রচর্চা পরিত্যাগ করেন নাই। তাঁহারা পণ্ডিতগণকে পাইলে দর্শনাদি শাস্ত্র লইয়া ঘোর তর্কবিতর্ক করিতেন।"[১]

সেদিন সুলতানের সহিত সাক্ষাতের পরই রূপ রামকেলিতে ফিরিয়া আসিলেন আর কালবিলম্ব না করিয়া সরাসরি উপস্থিত হইলেন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সনাতনের কক্ষে। তারপর নিবেদন করিলেন নিজ সংকল্পের কথা।

সব কিছু শোনার পর সনাতন গম্ভীর হইয়া উঠেন। প্রশান্ত কণ্ঠে বলেন, "তোমার বক্তব্য সবই আমি শুনলাম। কিন্তু আমি তো এতে সম্মতি দিতে পারিনে, ভাই। আমি জ্যেষ্ঠ, আমি স্থির ক'রে রেখেছি, প্রথমে আমিই করবো সংসার ত্যাগ। আগে আমায় যেতো দাও। পরে সুযোগমতো তুমি একদিন চলে আসবে।"

নিজ সিদ্ধান্তে রূপ অটল। যুক্তকরে বলেন, "জীবনের সকল কিছু ব্যাপারে আপনি আমার শিক্ষাদাতা, প্রেরণাদাতা। আপনাকে আমি শুধু বড় ভাই রূপেই দেখি না, গুরুস্থানীয় বলে মনে করি। সব কাজ করি আপনারই উপদেশ ও নির্দেশ মতো। কিন্তু এবারটি আমার নিজের প্রাণের আবেগ অনুযায়ী চলতে দিন।"

সনাতন ধীর স্থির বিচক্ষণ। উত্তর দেন, "আবেগের কথা তুমি বলছো বটে, কিন্তু যুক্তি বা শালীনতার কথাও তো জড়িত রয়েছে এতে। তুমি যদি আগে সংসার ছাড়ো, লোকে আমায় কি বলবে বলতো? আমি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, বয়সও আমার যথেষ্ট হয়েছে। এই বয়সে রাজকার্য থেকে অবসর নেওয়াই তো আমার উচিত। তাছাড়া, মহাপ্রভুর উপদেশ মতোই এতকাল আমি সংসারে রয়ে

১ রূপ গোস্বামী: সতীশচন্দ্র মিত্র

গিয়েছি, আর তো আমি ধৈর্য ধারণ করতে পারছিনে। আমাকে বৈরাগ্য গ্রহণ করতেই হবে।"

এবার নিজ যুক্তিতর্কের জাল বিস্তার করেন রূপ। দৃঢ়স্বরে নিবেদন করেন, "রাজ সরকারে আপনি অত্যন্ত দায়িত্বপূর্ণ কাজ নিয়ে রয়েছেন। শান্তির সময়ে প্রশাসনের ব্যাপারে, যুদ্ধবিগ্রহে সর্বদাই বাদশাহ আপনার মতামতকে মূল্যবান মনে করেন। আপনার পরামর্শ নেন। তাই নয় কি?"

"হ্যাঁ, একথা যথার্থ।"

"বিশেষ ক'রে এ সময়ে উড়িষ্যারাজের সঙ্গে বাদশাহের ঘোর মনান্তর চলছে, যে কোনো সময়ে একটা যুদ্ধ বেধে যেতে পারে।"

"হ্যাঁ, সে সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।"

"তাই তো এ সময়ে আপনি রাজকর্ম ত্যাগ করলে বাদশাহ ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠবেন। তারপর আবার আমি যখন চলে যাবো, তিনি ভাববেন, আমরা ষড়যন্ত্র করেছি, একযোগে কাজে ইস্তাফা দিয়ে বাদশাহকে বিপদে ফেলবার চেষ্টা করছি। তার ফলে আমাদের আত্মীয়স্বজনদের উপর ঘোর অত্যাচার চলতে থাকবে। কাজেই আমার প্রস্তাবটিই আপনি মেনে নিন।"

সনাতন এবার কিছুটা নরম হইয়াছেন। এই সুযোগে রূপ আবার কহিলেন, "সংসারের এবং আত্মীয়-কুটুম্বদের ভরণপোষণের ব্যবস্থা সব আমি তাড়াতাড়ি সেরে ফেলছি। এ নিয়ে আপনাকে ভাবতে হবে না। আমি চলে যাবার পর আপনি যাতে সহজে এখান থেকে নিষ্ক্রান্ত হতে পারেন সে ব্যবস্থাও আমি ক'রে যাবো।"

রূপের প্রার্থনা এবার মঞ্জুর হইল। সনাতন প্রাজ্ঞ এবং বিচক্ষণ বটে, কিন্তু সংসারের ব্যবস্থাপনা নিয়া তিনি কোনো মাথা ঘামাইতেন না, প্রধানত রূপই এসব কাজ করিতেন। এবার উভয়ে মিলিয়া রুদ্ধদ্বার কক্ষে বেশ কিছুক্ষণ পরামর্শ চলিল এবং কার্যক্রম সম্বন্ধে একমত হইলেন।

সকলের সঙ্গে দেনা পাওনার হিসাব রূপ তাড়াতাড়ি মিটাইয়া ফেলিলেন। রামকেলি রাজধানী গৌড়ের অতি নিকটে, সেখানে আত্মপরিজনদের আর থাকা তেমন নিরাপদ নয়। তাহাদের কিছু সংখ্যককে পাঠানো হইল চন্দ্রদ্বীপের প্রাসাদে বাকলায়। ফতেহাবাদের প্রেমভাগে আর একটি ভবন তাঁহাদের ছিল, সেখানেও সরাইয়া দিলেন অনেককে। ধন সম্পত্তি সমস্ত কিছু গুছাইয়া নেওয়া হইল। বিগ্রহ সেবা, কুলগুরু, ব্রাহ্মণ ও প্রাপকদের অসুবিধা না হয় এজন্য দরাজ হাতে করিলেন এককালীন দান। চৈতন্য চরিতামৃতে এই বিলি ব্যবস্থা সম্পর্কে বলা হইয়াছে :

শ্রীরূপ গোসাঞি তবে নৌকাতে ভরিয়া।
আপনার ঘর আইলা বহু ধন লঞা॥
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবে দিল তার অর্ধ ধনে।
এক চৌঠি ধন দিল কুটুম্ব ভরণে॥
দণ্ডবন্ধ লাগি চৌঠি সঞ্চয় করিল।
ভাল ভাল বিপ্রস্থানে স্থাপ্য রাখিল॥

তাছাড়া, সংকট সময়ে সনাতনের প্রয়োজন হইতে পারে ভাবিয়া এক মুদির কাছে রূপ দশ হাজার টাকা গচ্ছিত রাখিলেন।

ইতিমধ্যে রূপ শ্রীচৈতন্যের সন্ধান নিবার জন্য নীলাচলে লোক পাঠাইয়াছিলেন। শুনিলেন, প্রভু ঝাড়িখণ্ডের পথে বৃন্দাবনের দিকে রওনা হইয়া গিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে পথে মিলিত হইবেন, এবং একত্রে বৃন্দাবনে পৌছিবেন এজন্য রূপ আগ্রহী। তাই তাড়াতাড়ি হাতের কাজ সারিয়া নিয়া পদব্রজে ধাবিত হইলেন ঝাড়িখণ্ডের অরণ্য পথে। সঙ্গে চলিলেন মুমুক্ষু কনিষ্ঠ ভ্রাতা অনুপম।

কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর শুনিলেন, হুসেন শাহ সনাতনের বৈরাগ্য প্রবণতায় ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, এবং তিনি মুখ্য সচিবের কাজ ত্যাগ করিবেন একথা বলায় তাঁহাকে নিক্ষেপ করিয়াছেন কারাগারে। তৎক্ষণাৎ পথ হইতে রূপ একটি লোক মারফত পত্রী পাঠাইলেন। লিখিলেন, সনাতন যেন এ সংকটে, প্রয়োজন বোধে, মুদির নিকট

গচ্ছিত রাখা টাকাটা কাজে লাগান এবং উৎকোচ দিয়া কারাগার হইতে মুক্ত হইয়া আসেন।

মুক্তিলাভের ঐ পন্থাটি গ্রহণ করা ছাড়া সনাতনের আর উপায় ছিল না। অতঃপর কারাগার হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া তিনি শ্রীচৈতন্যের চরণাশ্রয় লক্ষ্য করিয়া যাত্রা করেন। দীর্ঘপথ অতিক্রম করার পর কাশীতে পৌঁছিয়া লাভ করেন তাঁহার দর্শন। এই দর্শনের সময়েই সনাতনকে করেন প্রভু আত্মসাৎ।

রূপ এবং বল্লভ প্রয়াগে পৌঁছিয়া শুনিলেন, শ্রীচৈতন্য বৃন্দাবন হইতে ফিরিবার পথে সেখানে উপস্থিত হইয়াছেন। প্রভুর বহু আকাঙ্ক্ষিত দর্শন এবার সম্ভব হইবে, আশ্রয় মিলিবে তাঁহার চরণতলে। রূপের আনন্দ আর ধরে না।

শ্রীচৈতন্য বিন্দুমাধব মন্দিরে আসিয়াছেন। ভাবাবিষ্ট অপরূপ আনন্দঘন মূর্তি, মুখে মধুর কণ্ঠের কৃষ্ণনাম। সহস্র সহস্র ভক্ত এই দেবমানবকে দর্শন করিতে আসিয়াছে। আনন্দে অধীর হইয়া, তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া ভক্ত ও দর্শনার্থীরা নাচিতেছে গাহিতেছে। এক বিরাট জনসংঘট্ট সেখানে।

দূর হইতে প্রভুর দিব্য ভাবাবেশ দেখিয়া রূপের সারা দেহ পুলকাঞ্চিত হইয়া উঠে, নয়নে বহিতে থাকে অশ্রুধারা। কিন্তু সেই বিপুল জনসমুদ্রে প্রভুর সম্মুখীন হইবেন কি করিয়া? এক দক্ষিণী ভক্ত ব্রাহ্মণের গৃহে সেদিন শ্রীচৈতন্যের ভিক্ষার নিমন্ত্রণ ছিল। তিনি সেখানে উপস্থিত হইলে রূপ ও বল্লভ দুই ভ্রাতা গিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। প্রভু তো মহাউল্লসিত। বার বার কহিতে থাকেন, "কৃষ্ণের কি অপার করুণা তোমাদের ওপর। বিষয়কূপ থেকে এবার দু'জনকে উদ্ধার করলেন। আহা কি ভাগ্যবান্ তোমরা দু'ভাই।"

প্রভু ত্রিবেণীর তীরে ভক্ত গৃহে বাস করিতেছেন। রূপ এবং বল্লভও নিকটস্থ এক কুটিরে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

বৈদিক যজ্ঞে পারঙ্গম, শাস্ত্রবিদ্ বল্লভ ভট্ট সে-সময়ে ত্রিবেণীর

অদূরে এক গ্রামে অবস্থান করিতেছিলেন। শ্রীচৈতন্য ও তাঁহার গৌড়দেশাগত দুই নবাগত ভক্তকে ভট্টজী সেদিন তাঁহার গৃহে নিমন্ত্রণ করিলেন।

রূপের দিব্যকান্তি ও ভাবাবেশ দেখিয়া বল্লভ ভট্ট মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন। সানন্দে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে যাইবেন, রূপ অমনি চকিতে দূরে সরিয়া গেলেন, "না—না, ভট্টজী, আমায় কেন আপনি স্পর্শ করছেন? আমি অস্পৃশ্য পামর। এতকাল কাটিয়ে এসেছি পাপকর্মে। আমি তো আপনার স্পর্শযোগ্য নয়!"

বিলাস ও ঐশ্বর্যে চিরলালিত, ক্ষমতার চূড়ায় বসিয়া থাকিতে সদা অভ্যস্ত, রূপের এই দৈন্য ও বৈরাগ্যভাব দেখিয়া শ্রীচৈতন্য মহা সন্তুষ্ট। অদূরে বসিয়া মিটিমিটি হাসিতেছেন তৃপ্তির হাসি।

দশদিন প্রয়াগে প্রভুর পুণ্যময় সান্নিধ্যে অবস্থান করেন রূপ। এই দশদিনেই প্রভু তাঁহার সাত্ত্বিক আধারে উজাড় করিয়া ঢালিয়া দেন বৈষ্ণবীয় সাধনার নিগূঢ় তত্ত্ব। ব্রজরসের পরমতত্ত্ব ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেন তাঁহার নিজ মুখে।[১]

শ্রদ্ধা ভক্তি ও কৃষ্ণসেবার মাহাত্ম্য বর্ণনা করেন প্রভু। তারপর ভক্তি সাধনার, ক্রম, কৃষ্ণভক্তিরসের বৈচিত্র্য, এবং সর্বোপরি কান্তা-ভাব সম্পন্ন মধুর রসের দিক্‌দর্শন করেন। শুধু তাহাই নয়, কৃপাভরে নবীন সাধক রূপের আধারে, করেন শক্তি সঞ্চারিত।

কৃষ্ণভক্তি ভক্তিতত্ত্ব রসতত্ত্ব প্রান্ত।
সব শিখাইলা প্রভু ভাগবত সিদ্ধান্ত॥
রামানন্দ পাশে যত সিদ্ধান্ত শুনিলা।
রূপে কৃপা করি তাহার সব সঞ্চারি॥
শ্রীরূপ হৃদয়ে প্রভু শক্তি সঞ্চারিলা।
সর্বতত্ত্ব নিরূপিয়া প্রবীণ করিলা॥

(চৈ-চরিতামৃত)

১ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়: কবি কর্ণপুর

রূপের হৃদয় মন স্বর্গীয় আনন্দে পূর্ণ হইয়া উঠে, প্রভুর কৃপায় জীবন হয় কৃতকৃতার্থ। এবার প্রভু বারাণসীর দিকে যাইবেন, প্রেমালিঙ্গন ও আশীর্বাদ দিয়া কহিলেন, "রূপ "তুমি বৃন্দাবনে যাও। যে তত্ত্ব লাভ করলে, বৃন্দাবনের পবিত্র ধামে এবার তা স্ফুরিত হয়ে উঠুক, এই আমি চাই।"

অতঃপর রূপ ও অনুপম বৃন্দাবনে চলিয়া আসিলেন। এখানে পৌঁছিয়াই ভক্তপ্রবর সুবুদ্ধি রায়ের সঙ্গে তাঁহাদের সাক্ষাৎ ঘটিল।

সুবুদ্ধি রায় ছিলেন গৌড়ের এক প্রভাবশালী ভূম্যধিকারী। বাদশাহ হুসেন শাহ তাঁহার প্রথম জীবনে, যখন সহায় সম্পদহীন ভাগ্যান্বেষী যুবক মাত্র, তখন তিনি সুবুদ্ধি রায়ের অধীনে এক নগণ্য চাকুরী গ্রহণ করেন। কোনো অপরাধে লিপ্ত থাকায় সুবুদ্ধি রায় তাঁহার উপর ক্রুদ্ধ হন এবং চাবুক মারিয়া তাঁহাকে শাস্তি দেন। ঐ চাবুকের ক্ষতের দাগ দীর্ঘদিন পরেও একেবারে মিলাইয়া যায় নাই। উত্তরকালে এই হুসেনের ভাগ্য পরিবর্তিত হয়, তিনি গৌড়ের বাদশাহ হইয়া বসেন।

হুসেন শাহের বেগম একদিন স্বামীর পৃষ্ঠে ক্ষতের দাগ দেখিয়া বিস্মিত হন এবং উহার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। পুরাতন দিনের ঘটনাদি বাদশাহ বিবৃত করেন এবং উল্লেখ করেন প্রাক্তন মনিব সুবুদ্ধি রায়ের বেত্রাঘাতের কথা। বেগম তো একথা শুনিয়া মহা উত্তেজিত। জেদ ধরিয়া বসেন, সুবুদ্ধি রায়কে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হোক। হুসেন শাহ কিন্তু এ দণ্ড দিতে সম্মত হন নাই। বলেন প্রাক্তন অন্নদাতার প্রাণনাশ করা তাঁহার দ্বারা সম্ভব হইবে না। অতঃপর বেগম ও ওমরাহ্‌রা সবাই মিলিয়া স্থির করেন, প্রাণনাশের বদলে সুবুদ্ধি রায়ের ধর্মনাশ করা হোক। এই প্রস্তাব অনুযায়ী, অপরাধীর মুখে কুখাদ্য পুরিয়া দেওয়া হইল।

জাতিভ্রষ্ট মর্মাহত সুবুদ্ধি রায় তখন বিত্ত বিষয় ছাড়িয়া কাশীতে শাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিতদের কাছে উপস্থিত হন, জানিতে চাহেন জাতি নাশের

জন্য প্রায়শ্চিত্তের বিধান। পণ্ডিতেরা বলেন, এজন্য তপ্তঘৃত পান করিয়া তাঁহাকে আত্মহত্যা করিতে হইবে।

প্রভু শ্রীচৈতন্য তখন কাশীধামে উপস্থিত হইয়াছেন, তাঁহাকে ঘিরিয়া ভক্ত সমাজে জাগিয়া উঠিয়াছে প্রবল উদ্দীপনা। সুবুদ্ধি রায় শ্রীচৈতন্যের চরণে নিপতিত হইলেন, কাঁদিয়া কহিলেন "প্রভু, আপনি স্বয়ং ঈশ্বর। আমায় বলুন, জাতি নাশের পাপ স্খালনের জন্য কি প্রায়শ্চিত্ত আমায় করতে হবে।"

প্রভু কহিলেন, "একবার কৃষ্ণনাম যত পাপ হরে, জীবের কি সাধ্য আছে তত পাপ করে? তোমার কোনো ভয় নেই। তুমি বৃন্দাবনে যাও, সেখানকার পবিত্র রজে প্রত্যহ গড়াগড়ি দাও, আর কৃষ্ণনামের জপধ্যানে জীবন সার্থক ক'রে তোল। এই হল তোমার প্রায়শ্চিত্তের বিধান।"

সুবুদ্ধি রায়ের প্রাণে এবার নূতন আশা সঞ্চারিত হয়। বৃন্দাবনে আসিয়া শুরু করেন ত্যাগ তিতিক্ষাময় বৈষ্ণব জীবন।

গৌড় বাদশাহের অন্যতম প্রধান কর্মচারী রূপকে সুবুদ্ধি রায় ভালো করিয়াই চিনিতেন। বৈরাগী হইয়া তিনি শ্রীচৈতন্যের শরণ নিয়াছেন এবং বৃন্দাবনে আসিয়াছেন জানিয়া তাঁহার আনন্দের আর অবধি নাই।

ছুটিয়া আসিয়া রূপ ও অনুপমকে প্রেমভরে জড়াইয়া ধরিলেন, ঘুরিয়া ঘুরিয়া দর্শন করাইলেন পবিত্র দ্বাদশ বন।

প্রভু শ্রীচৈতন্যের কৃপার কথা, শ্রীকৃষ্ণের লীলা মাহাত্ম্যের কথা আলোচনা করিয়া কিছুদিন আনন্দে কাটিয়া গেল।

লোকনাথ ও ভূগর্ভ তখন ব্রজমণ্ডলের অভ্যন্তর ভাগে অরণ্যে ঘোরাঘুরি করিতেছেন, ইঁহাদের সঙ্গে রূপ ও অনুপমের এসময়ে সাক্ষাৎ হয় নাই। প্রায় একমাস বৃন্দাবনে বাস করার পর রূপের মন উচাটন হইয়া উঠিল। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সনাতন চিরদিন তাঁহার পথপ্রদর্শক ও পরিচালক। গুরুর মতো রূপ তাঁহাকে শ্রদ্ধা করেন। সেই সনাতন এখনো বাদশাহের কারাগারে রহিয়াছেন না মুক্ত

হইয়াছেন, সে সংবাদ তাঁহার জানা নাই। মনের দুশ্চিন্তা কোনো-মতেই হয় না। অবশেষে অনেক কিছু ভরিয়া চিন্তিয়া দুই ভ্রাতা কিছুদিনের জন্য বৃন্দাবন ত্যাগ করিলেন, বাহির হইয়া পড়িলেন সনাতনের সন্ধানে। পদব্রজে চলিলেন কাশীর দিকে।

সনাতন ইতিমধ্যে কারাগার হইতে মুক্ত হইয়াছেন কাশীতে গিয়া লাভ করিয়াছেন শ্রীচৈতন্যের কৃপা। সেখান হইতে ভিন্ন পথে তিনি বৃন্দাবনে পৌঁছিলেন, রূপের সহিত সাক্ষাৎ ঘটিল না। কাশীতে পৌঁছাইয়া সনাতনের সংবাদ পাইয়া রূপ প্রকৃতিস্থ হইলেন। প্রভু চৈতন্যের কৃপা তিনি লাভ করিয়াছেন, একথা জানিয়া আনন্দে মন প্রাণ ভরিয়া উঠিল।

অনুজ অনুপম ছিলেন ইষ্ট শ্রীরামচন্দ্রের উপাসক। বৃন্দাবনে থাকা সম্পর্কে তিনি তখনো মন স্থির করিতে পারেন নাই। রূপকে কহিলেন, গৌড়ের দিকে তাঁহার মন চলিতেছে, এসময়ে সনাতনও সংসার ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিয়াছেন, রূপ যদি আর একবার কিছুদিনের জন্য গৌড়ে যান, বিষয় সম্পর্কিত শেষ বিলি ব্যবস্থা করিয়া আসেন তবে বড় সুবিধা হয়।

কনিষ্ঠ ভ্রাতার অনুরোধে রূপকে রাজী হইতে হইল, উভয়ে প্রত্যাবর্তন করিলেন গৌড়দেশে। সেখানে পৌঁছানোর পর ঘটিল এক মহাদুর্দৈব, অল্প কিছু দিনের মধ্যে এক মারাত্মক রোগে ভুগিয়া অনুপম ইহলোক ত্যাগ করিলেন।

প্রিয় অনুজের এই শোকাবহ মৃত্যু রূপকে ফেলিয়া দিল নানা সাংসারিক দায়িত্ব ও সমস্যার মধ্যে। এদিকে প্রভু শ্রীচৈতন্যের চরণ দর্শনের জন্য, তাঁহার পুণ্যময় সান্নিধ্যের জন্য, মন তাঁহার অধীর হইয়া উঠিয়াছে। তাই যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি এখানকার সমস্যা মিটাইয়া ফেলিয়া পদব্রজে ছুটিয়া চলিলেন নীলাচলে।

আগে হইতেই রূপ মনে মনে স্থির করিয়া আসিয়াছেন, ভক্ত হরিদাসের কুটিরে তিনি আশ্রয় নিবেন, তারপর সুযোগমতো করিবেন

প্রভুর চরণ দর্শন। দীর্ঘদিন গৌড় দরবারে থাকায় ম্লেচ্ছ স্পর্শদোষ তাঁহার ঘটিয়াছে, তাই প্রভু শ্রীচৈতন্যের নিষ্ঠাবান্ উচ্চবর্ণের ভক্তদের গৃহে অবস্থান করা তাঁহার পক্ষে ঠিক নয়।

প্রবীণ ভক্ত হরিদাসের কুটিরে পৌছিতেই বাহু প্রসারিয়া রূপকে তিনি জ্ঞাপন করেন আন্তরিক সংবর্ধনা। স্নেহভরে কহেন, "রূপ, তুমি আসবে, তা আমরা সবাই জানি। মহাভাগ্যবান্ তুমি, প্রভু সাগ্রহে তোমার প্রতীক্ষা করছেন, বার বার বলছেন তোমারই কথা।"

প্রভু শ্রীচৈতন্যের দিনচর্যা ছিল প্রত্যহ সকালবেলায় অন্তরাল-বাসী পরম ভক্ত হরিদাসকে দর্শন দেওয়া। জগন্নাথদেবের উপল ভোগের সময় প্রভু সেখানে স্বগণসহ উপস্থিত থাকিতেন। তারপরই চলিয়া আসিতেন হরিদাসের নিভৃত কুটিরে। এখানে অন্তরঙ্গ পার্ষদ ও ভক্তদের নিয়া চলিত ইষ্টগোষ্ঠী এবং প্রেমরস তত্ত্বের আলোচনা।

হরিদাসের কুটিরে প্রভু পদার্পণ করার সঙ্গে সঙ্গে রূপ ছুটিয়া আসিলেন, নিবেদন করিলেন দণ্ডবৎ প্রণাম। আলিঙ্গন ও কুশল প্রশ্নাদির পর পরমানন্দে সবাই প্রভুকে ঘিরিয়া বসিলেন, ভাগবত ও কৃষ্ণকথার জোয়ার বহিতে লাগিল।

পুরীধামের রথযাত্রা তখন আসন্ন। গৌড়ীয়া ভক্তদল প্রভুর দর্শন ও সান্নিধ্যের লোভে পদব্রজে দীর্ঘপথ অতিক্রম করিয়া আসিয়াছেন। প্রভুর সহিত মিলনের পর মাতিয়া উঠিয়াছেন আনন্দরঙ্গে। এই ভক্তদের মধ্যে রহিয়াছেন প্রবীণ বৈষ্ণবাচার্য শ্রীঅদ্বৈত, নিত্যানন্দ প্রভৃতি।

সেদিন কয়েকটি অন্তরঙ্গ ভক্ত সঙ্গে নিয়া প্রভু হরিদাসের কুটিরে আসিয়াছেন। রূপকে আলিঙ্গন দানের পর অদ্বৈত ও নিত্যানন্দকে কহিলেন, "কৃষ্ণের আহ্বানে রূপ বিষয় কূপ ছেড়ে চলে এসেছে। আপনারা দু'জন তাঁকে আশীর্বাদ দিন, কৃষ্ণের ভজনে সে যেন সিদ্ধ হয়, আর কৃষ্ণভক্তি রসের গ্রন্থ লিখে যেন সাধন করতে পারে জীবের মঙ্গল।"

গৌড়ীয় নেতারা, রামানন্দ রায়, স্বরূপ দামোদর প্রভৃতি এই

প্রতিভাধর নূতন ভক্তকে জ্ঞাপন করেন তাঁহাদের প্রাণভরা আশীর্বাদ। রূপের চেহারার একটা বিশেষ মাধুর্য ও কমনীয়তা ছিল, আর তাই স্বভাবে ছিল বিনয় ও দৈন্যের পরাকাষ্ঠা। অচিরে প্রভুর গৌড়ীয়া ও ওড়িশী ভক্তদের তিনি পরম প্রিয় হইয়া উঠিলেন।

প্রভু তাঁহার ভক্তগোষ্ঠী সঙ্গে যেখানে যেখানে উপস্থিত হন, দিব্য আনন্দের স্রোত বহিয়া যায়। ভক্তিপ্রেমের দিব্য ভাবাবেশে সবাই মাতোয়ারা হইয়া উঠেন। কখনো শ্রীমন্দির চত্বরের কীর্তনে, কখনো সমুদ্র স্নানে, কখনো বা গুণ্ডিচা মার্জনে, দিনের পর দিন চলে উৎসব আর আনন্দ-হুল্লোড়।

ভক্ত হরিদাসের মতো রূপও নিজেকে দৈন্যভরে মনে করেন ম্লেচ্ছাধম, তাই শ্রীজগন্নাথের মন্দিরের ভিতরে কখনো যান না। দূর হইতেই দর্শন ও প্রণাম করেন। প্রভুর নর্তন কীর্তন ও পুণ্যময় নানা অনুষ্ঠানে প্রবল জনসংঘট্ট হয়, সেসব স্থানও রূপ সযত্নে পরিহার করিয়া চলেন। দূর হইতে প্রভু ও ভক্তগোষ্ঠীর আনন্দলীলা মুগ্ধনেত্রে দর্শন করেন, প্রণাম জানান বার বার।

কিন্তু রাতের অধিকাংশ সময়ই কাটে হরিদাসের নিরালা ভজন-কুটিরে। এখানে নামমূর্তি হরিদাস প্রায় সময়ে নিবিষ্ট থাকেন তাঁহার সংকল্পিত নামজপের সাধনায়। আর এককোণে একান্তে বসিয়া রূপ ব্যাপৃত থাকেন রসশাস্ত্রের অবগাহনে আর গ্রন্থরচনায়।

প্রত্যহ জগন্নাথদেবের ভোগরাগ সম্পন্ন হইবার পর একান্তবাসী ভক্তদ্বয় হরিদাস আর রূপের জন্য প্রসাদ পাঠানো হয়। ঐ প্রসাদ গ্রহণ করিয়া উভয়ে নিরত হন নিজ নিজ নির্দিষ্ট সাধনায় ও কর্মে।

"রূপ গোস্বামী আজন্ম সুকবি। একাধারে এমন কবিত্ব, পাণ্ডিত্য ও ভক্তি অতি কম দেখা যায়। গৌড়ে থাকিতে তিনি হংসদূত ও উদ্ধব-সন্দেশ নামক কাব্য রচনা করেন, উহা পরে বৃন্দাবনে শেষ হইয়া প্রচারিত হয়। গৃহত্যাগ করিয়া আসিবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক নাটক লিখিতে থাকেন। উহাতে তিনি কৃষ্ণের

ব্রজলীলা ও অন্যান্য লীলা একত্র লিখিবেন বলিয়া স্থির করেন। পরে নীলাচলে আসিবার সময় স্বপ্নাদেশে ও মহাপ্রভুর আজ্ঞায় পৃথক পৃথক দুইখানি নাটক রচনার পরিকল্পনা স্থির হয়। শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা-বিষয়ক নাটকের নাম দিয়াছিলেন 'বিদগ্ধ মাধব' এবং তাঁহার পুরলীলা-বিষয়ক নাটকের নামকরণ হয় 'ললিত মাধব'। নীলাচলে আসিবার পর হইতে তিনি অধিকতর একাগ্রতার সহিত এই দুইখানি নাটক একই সময়ে লিখিতেছিলেন। হরিদাস ঠাকুরের শান্তরসাস্পদ কুটিরে এবং সপার্ষদ মহাপ্রভুর সঙ্গগুণে ও আশীর্বাদের ফলে রূপের স্বাভাবিক কবিত্ব প্রতিভা বিশেষভাবে স্ফুরিত হইয়াছিল। গ্রন্থদ্বয়ের অধিকাংশই নীলাচলে বসিয়া লিখিত হয়, পরে বৃন্দাবনধামে গিয়া প্রথমে বিদগ্ধ মাধব ও তৎপরে ললিত মাধব সমাপ্ত হয়।"

নীলাচলের বৃহত্তম ও মহত্তম অনুষ্ঠান রথযাত্রা আসিয়া যায়। লক্ষ লক্ষ ভক্ত নরনারী ভারতের নানা দিগ্‌দেশ হইতে এই সময়ে মহাধামে আগত হয়, শ্রীজগন্নাথের বিজয়যাত্রা দেখিয়া প্রাণমন সার্থক করে। এই রথযাত্রার আর এক বড় আকর্ষণ—দেবমানব প্রভু শ্রীচৈতন্যের উপস্থিতি ও নৃত্য কীর্তন।

রথ টানা শুরু হইলে ভক্ত ও পার্ষদদের নিয়া প্রভু রথাগ্রে কীর্তন করিতে থাকেন। সাত্ত্বিক প্রেমবিকারের ঐশ্বর্য প্রকটিত হয় তাঁহার গৌরকান্তি দিব্যশ্রীমণ্ডিত দেহে। এ অপার্থিব মূর্তি ও ভাবমত্ততা দেখিয়া অগণিত দর্শনার্থী আনন্দে উদ্বেল হইয়া উঠে।

রথাগ্রে প্রভুর দেবদুর্লভ নৃত্য ও উদ্দণ্ড কীর্তন রূপ প্রাণ ভরিয়া দূর হইতে দর্শন করেন, দিব্য ভাবের আবেশে প্রমত্ত হইয়া উঠেন। জীবন মন সার্থক জ্ঞান করিয়া প্রত্যাবর্তন করেন ভজন-কুটিরে।

প্রভুর ইচ্ছা অনুসারে নীলাচলে তিনি বাস করেন প্রায় দশমাস।

১ সপ্ত গোস্বামী: সতীশচন্দ্র মিত্র

তাঁহার জীবনে এই দশটি মাসের মূল্য অপরিসীম। প্রভুর শ্রীচৈতন্যের প্রেমময় সান্নিধ্যে, তাঁহার অন্তরঙ্গ পার্ষদদের স্নেহময় পরিবেশে, অবিরাম অন্তরে তাঁহার বহিয়া চলে দিব্যরসের প্রবাহ। শুধু তাহাই নয়, কৃষ্ণভক্তি ও কৃষ্ণপ্রেম লীলাবিষয়ক যে সব গ্রন্থ লেখানোর জন্য প্রভু ইচ্ছুক তাহারও প্রস্তুতি এসময়ে ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠে। কৃষ্ণতত্ত্ব ও ব্রজরসতত্ত্বের উৎস সন্ধানটি প্রভুর কৃপায় এসময়ে রূপ প্রাপ্ত হন। প্রয়াগে থাকিতে যে অমৃতময় তত্ত্বোপদেশ প্রভু দিয়াছিলেন, তাহাই এবার নূতনতর উদ্দীপনা নিয়া উদ্‌গত হইতে থাকে তাঁহার অন্তস্তল হইতে।

সুকবি, প্রতিভাধর ও সুপণ্ডিত রূপ প্রভুর নির্দেশে কৃষ্ণলীলা ও কৃষ্ণরসের নাটক লিখিতেছেন। কিন্তু কাব্যপ্রতিভা থাকিলেই কৃষ্ণরসের, ব্রজরসের, পরমতত্ত্ব উদ্‌ঘাটন করা যায় না, কৃষ্ণলীলার প্রকৃত মাহাত্ম্য ও ফুটাইয়া তোলা যায় না। এজন্য একদিকে চাই ব্রজরসের সম্যক্ উপলব্ধি আর চাই রসনাট্যের আঙ্গিক ও সিদ্ধান্ত বিষয়ে নির্ভুল প্রয়োগনৈপুণ্য।

শ্রীচৈতন্য ইতিপূর্বেই রূপের সাধন-আধারে তাঁহার শক্তি সঞ্চারিত করিয়াছেন। এবার সেই শক্তির-স্রোতকে উৎসারিত ও বিস্তারিত করিতে চান জনকল্যাণে।

প্রভুর ব্রজরসতত্ত্বের দুই পরম রসজ্ঞ পার্ষদ—রামানন্দ রায় এবং স্বরূপ দামোদর। প্রভু স্থির করিলেন, এই দুই বিদগ্ধ ও প্রবীণ পার্ষদকে তিনি নিয়োজিত করিবেন রূপের নব রচিত কাব্যের রস আস্বাদনে ও মূল্য নিরূপণে।

রামানন্দ রায় রসতত্ত্বের শাস্ত্রে বাহ্যত শ্রীচৈতন্যেরও উপদেষ্টা। দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের কালে প্রভু এই মরমী সাধককে আত্মসাৎ করেন, তাঁহার মুখ দিয়া প্রকাশিত করেন মধুর রস এবং নিগূঢ় ভজনের মর্মকথা।

রামানন্দ শ্রীচৈতন্যকে বলিতেন. "প্রভু, ব্রজরসতত্ত্ব, কান্তাভাব ও রাধাতত্ত্বের মহিমা আমি কি জানি? আমি তোমার কাষ্ঠপুত্তলী,

আমায় তুমি যেভাবে নাচাও, যেভাবে বলাও, তাই আমি করি, আর তাই বলি।"

প্রভু দৈন্যভরে উত্তর দিতেন, "রায় আমি শুষ্ক সন্ন্যাসী। মহাভাবময়ী শ্রীরাধিকার রসতত্ত্ব আমি কি জানি? আহা, সে তত্ত্ব যে তুমিই আমায় শেখালে।"

উভয়ের এই মতদ্বৈধ আর আনন্দ-কলহ প্রায়ই চলিত, আর অন্তরঙ্গ পার্ষদ ও ভক্তেরা মিটিমিটি হাসিতেন।

রামানন্দ রায় উড়িষ্যার এক শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব, কৃষ্ণরস তত্ত্বে পারঙ্গম এবং যশস্বী নাট্যকার। প্রভু শ্রীচৈতন্যের দর্শন লাভের পূর্বে তিনি সংস্কৃত ভাষায় 'জগন্নাথ বল্লভ' নাটক রচনা করিয়া যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। প্রেমভক্তির সাধনায় আগে হইতেই তিনি অনেক দূর অগ্রসর ছিলেন, এবার শ্রীচৈতন্যের আশ্রয় নিয়া সেই সাধনায় হইয়াছেন সিদ্ধকাম।

প্রভুর অন্যতম শ্রেষ্ঠ পার্ষদ স্বরূপ দামোদরও কৃষ্ণতত্ত্ব ও ব্রজরসের এক শ্রেষ্ঠ মর্মজ্ঞ সাধক এবং ধারক বাহক। শুধু তাহাই নয়, স্বরূপের আরও গুণ আছে, তিনি—'সংগীতে গন্ধর্বসম শাস্ত্রে বৃহস্পতি'।

তাঁহার মধুর রসের সংগীতে শ্রীচৈতন্য ভাবোন্মত্ত হইতেন, আবার তাঁহারই প্রবোধবাক্যে ও সংগীতে হইতেন আশ্বাসিত, লাভ করিতেন বাহ্যজ্ঞান।

স্বরূপের আরো বৈশিষ্ট্য ছিল। তিনি একদিকে যেমন রসজ্ঞ এবং নিগূঢ় মধুর রসের সাধক, তেমনি বৈষ্ণব সাহিত্যে সুপণ্ডিত এবং কঠোর, সূক্ষ্ম সমালোচনার জন্য প্রখ্যাত।

মহাভাবের মূর্ত বিগ্রহ ছিলেন প্রভু শ্রীচৈতন্য, তাই প্রেমভক্তি-ধর্মের কোনো বাক্য বা রচনার বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত বা রসাভাব কখনো সহ্য করিতে পারিতেন না। তাই সদা পার্শ্বচর ও মরমী ভক্ত স্বরূপকে তিনি নিয়োজিত করিয়াছিলেন বৈষ্ণবীয় রসতত্ত্বের নিরূপণে এবং পরীক্ষাকর্মে—

গ্রন্থশ্লোক গীত কেহো প্রভু আগে আনে।
স্বরূপ পরীক্ষা কৈলে পাছে প্রভু শুনে।

এমনি দুই উচ্চকোটির সাধক ও ব্রজরসের তত্ত্বজ্ঞ এবার রূপের রচনা শ্রবণ করিবেন, সূক্ষ্মভাবে পরীক্ষা করিবেন।

প্রভু একদিন রথাগ্রে নৃত্যকীর্তন করিতেছেন। হঠাৎ ভাবপ্রমত্ত হইয়া 'কাব্য প্রকাশের' যঃ কৌমারহর ইত্যাদি বাক্যসূচক শ্লোকটি উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। নিভৃত মধুময় পরিবেশ, আর একান্ত-চিত্ত কান্তা আর কান্তের নিভৃত মধুর মিলনের রস এই শ্লোকটিতে উৎসারিত।

প্রভুর অন্তরের ভাব বুঝিয়া স্বরূপ দামোদর তখনই এই রসের অনুসারী এক মধুর সংগীত রচনা করিলেন, তখনি প্রভুকে গাহিয়া শুনাইলেন, প্রভু অত্যন্ত খুশী হইয়া উঠিলেন।

পরের দিন শ্রীচৈতন্য রায়-রামানন্দ, স্বরূপ প্রভৃতিকে সঙ্গে নিয়া হরিদাস ও রূপকে দেখিতে আসিয়াছেন। হঠাৎ তাঁহার নজরে পড়ে হরিদাসের কুটিরের চালে গুঁজিয়া-রাখা একটি তালপত্র।

প্রভু অত্যন্ত কৌতূহলী হইয়া উঠেন, বলেন, "নিয়ে এসো দেখি, কি রয়েছে ওতে।"

রূপ বড় লাজুক এবং বিনয়ী, কহিলেন, "না প্রভু, ওটা তোমার দেখবার যোগ্য কিছু নয়।"

"তা হোক, নিয়ে এসো আমার কাছে।"

তালপত্রটি তাড়াতাড়ি খুলিয়া আনা হইল এবং দেখা গেল, এটিতে লিখিত রহিয়াছে রূপের সদ্য রচিত কয়েকটি প্রেমরসে উচ্ছল মনোরম শ্লোক।

গতকাল প্রভু কান্তা ও কান্তের নিভৃত মিলন সম্পর্কে যে শ্লোকটি বলিয়া উঠেন এবং স্বরূপ যাহা গীতচ্ছন্দে রূপায়িত করিয়া শোনান, এটি সেই ভাবেরই দ্যোতক। কালিন্দী পুলিনে নিভৃতে কৃষ্ণ ও রাধার মিলনানন্দের কথা লিখিয়াছেন রূপ তাঁহার অতুলনীয় ভাব, ভাষায় এবং ছন্দে।

এই তালপত্রের রচনাটি প্রভু সবাইকে নিয়া সোৎসাহে শুনিলেন, আর বার বার মুক্তকণ্ঠে করিতে লাগিলেন গুণগান। "আহা, আহা, এমন রসবস্তু তো সচরাচর পাওয়া যায় না। রূপ, তুমি আমাদের আজ সত্যই বড় আনন্দ দিলে।"

প্রভুর এই উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় রূপের কাব্যপ্রতিভার প্রতি স্বরূপ রামানন্দ প্রভৃতির দৃষ্টি সেদিন বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইল।

আর একদিন প্রভাতে প্রভু হরিদাসের কুটিরে আসিয়াছেন। সঙ্গে আছেন স্বরূপ, রামানন্দ প্রভৃতি বিশিষ্ট ভক্তবৃন্দ।

প্রভু জানেন, রূপের কাব্য রচনা কিছুটা বেশ অগ্রসর হইয়াছে। এ কাব্য যে মধুর রসের এক উৎসরূপে গণ্য হইবে, অন্তর্যামী প্রভুর তাহা অজানা নাই।

আজ ভক্তপ্রবর রূপের মহিমা তিনি বাড়াইতে চান এবং বিশেষ করিয়া স্বরূপ ও রামানন্দের মতো রস-বিচারকদের স্বীকৃতি দিয়া তাঁহাকে নব প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করিতে চান।

সোৎসাহে প্রভু নিজেই একদিন রূপের খাতাপত্র টানিয়া বাহির করিলেন, কিছু কিছু অংশ তিনি পাঠ করিলেন। ভাষার লালিত্যে, রসের পারিপাট্যে ও শাস্ত্র-সিদ্ধান্তে এ রচনা সত্যিই অপরূপ।

প্রভু বিশেষ করিয়া বিদগ্ধ মাধবের পাণ্ডুলিপি হইতে একটি রমণীয় শ্লোক সবাইকে শুনাইতে লাগিলেন। এ শ্লোকটির মর্ম :

'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' এই দুটি বর্ণ—
আহা, কি অমৃত দিয়েই না হয়েছে সৃষ্ট।
রসনায় যখন এ নামের হয় উচ্চারণ—
হৃদয়ে উদ্গত হয় শত রসনা লাভের বাসনা।
কর্ণে শ্রবণ করলে স্পৃহা ওঠে জেগে—
কোটি কোটি কর্ণের জন্য।
আর চেতনায় যখন এ নামের হয় স্ফুরণ।
জীবের সর্ব ইন্দ্রিয় হয় যে পরাভূত।

ভক্তেরা আনন্দে উল্লসিত হইয়া উঠেন, আর এক বাক্যে সবাই প্রশস্তি গাহিতে থাকেন, নাম মাহাত্ম্যের এমন মধুর শ্লোক তো সহসা শুনা যায় না!

প্রভু শ্রীচৈতন্যের চোখ মুখ তৃপ্তির আনন্দে ভরিয়া উঠিয়াছে, প্রসন্ন অন্তরে বার বার রূপকে জানাইতেছেন আশীর্বাদ।

স্বরূপ এ সময়ে রামানন্দ রায়কে সার কথাটি বুঝাইয়া দিলেন। প্রভুর অন্তরের ইচ্ছা জানিয়া রূপ এক মহান্ কর্মে ব্রতী হইয়াছেন, শুরু করিয়াছেন কৃষ্ণলীলার নূতন নাটক রচনা।

প্রভু নির্দেশ দিলেন, "রূপ, সবাই তোমার রচনা শুনে উল্লসিত হয়ে উঠেছে। তোমার নূতন নাটক থেকে কিছু কিছু অংশ পড়ে শোনাও।"

রূপ সংকোচে আড়ষ্ট হইয়া আছেন, জোড়হস্তে নিবেদন করেন, "প্রভু, ম্লেচ্ছাধম আমি, কৃষ্ণলীলা নাট্য আমি কি লিখবো? শুধু লিখছি, তোমার ইচ্ছেটি জেনে।"

"না—না রূপ। তোমার রচনার কিছু কিছু অংশ রামানন্দ আর স্বরূপকে আজ পড়ে শোনাও।"

নাটক পাঠ শুরু হইল। স্বরূপ ও রামানন্দ তো মহাবিস্মিত। ভাষা, রস ও সিদ্ধান্ত সব দিক দিয়াই এ কাব্য অতি চমৎকার। প্রভু উপযুক্ত লোকের উপরই দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছেন। উপস্থিত সবাই ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন। প্রভুর দৃষ্টি বিশেষভাবে রামানন্দের দিকে নিবদ্ধ। রামানন্দের সারা অন্তর আনন্দে বিস্ময়ে ভরিয়া উঠিয়াছে। রূপকে লক্ষ্য করিয়া গদ্‌গদ স্বরে তিনি উচ্চারণ করিলেন প্রশস্তিবাণী :

> কবিত্ব না হয় এই অমৃতের ধার।
> নাটক-লক্ষণ সব সিদ্ধান্তের সার।
> প্রেম পরিপাটি এই অদ্ভুত বর্ণন।
> শুনি চিত্ত-কর্ণের হয় আনন্দ ঘূর্ণন।

(চৈ-চরিতামৃত, অন্ত্য)

রামানন্দ মরমী ও শাস্ত্রবেত্তা, নিজের নাটক 'জগন্নাথ বল্লভ'-এ সতর্কভাবে নিগূঢ় ও সূক্ষ্ম রসতত্ত্বের মীমাংসা তিনি করিয়াছেন। রূপের নাটকাংশ শুনিয়া তিনি সত্যই বিস্মিত। বুঝিলেন, এ কাজের পশ্চাতে রহিয়াছে প্রভু শ্রীচৈতন্যের প্রেরণা ও ঐশী ইঙ্গিত। নতুবা এমন বস্তু নবাগত ভক্ত রূপের লেখনীতে পরিবশিত হওয়া তো সম্ভব নয়। প্রভুর দিকে তাকাইয়া এবার সহাস্যে কহিলেন :

ঈশ্বর তুমি যে চাহ করিতে।
কাষ্ঠের পুত্তলী তুমি পার নাচাইতে॥
মোর মুখে যে সব রস করিলে প্রচারণে।
সেই রস দেখি এই ইঁহার লিখনে॥
ভক্তকৃপায় প্রকাশিতে চাহ ব্রজরস।
যারে করাও সে করিবে, জগৎ তোমার বশ॥

(চৈ-চরিতামৃত, অন্ত্য)

প্রভুর দিব্য প্রেরণা, কৃপা ও রসজ্ঞ বৈষ্ণবদের স্বীকৃতি রূপ লাভ করিয়াছেন। তাঁহার প্রতি সকলের আস্থা জাগিয়া উঠিয়াছে। এবার প্রভু তাঁহাকে বিদায় দিতে মনস্থ করিলেন।

সকলের আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া রূপ সেদিন বৃন্দাবনে রওনা হইতেছেন, এ সময়ে প্রভু কহিলেন :

ব্রজে যাই রস শাস্ত্র কর নিরূপণ।
লুপ্ত সব তীর্থ তার করিহ প্রচারণ॥
কৃষ্ণসেবা রসভক্তি করহ প্রচার।
আমিও দেখিতে তাহা যাব একবার॥

বৈষ্ণব শাস্ত্রের লিখন ও প্রচার, তীর্থ উদ্ধার ও বিগ্রহ সেবা এবং কৃষ্ণভক্তির পথে ভক্ত জনসমাজকে চালিত করা, এই তিনটি ঐশীকর্মের সূচনা ও প্রসার শ্রীচৈতন্য তাঁহার বৃন্দাবন সংগঠনের মধ্য দিয়া করিতে চাহিয়াছিলেন। সেই কথাটিই তাঁহার চিহ্নিত সেবক, প্রতিভাধর রসতত্ত্বের ব্যাখ্যাতা, রূপের মনে সেদিন দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত করিয়া দিলেন।

রূপ ও সনাতনের যুক্ত প্রতিভা এবং কর্মনিষ্ঠার ফল কয়েক বৎসরের মধ্যে ফলিতে দেখা যায়।—“উভয়ে কঠোর সাধনায় ও শাস্ত্রালোচনায় আত্মনিয়োগ করিয়া পরিমূর্ত প্রেমিকের আদর্শ স্বরূপ শীঘ্রই সর্বজাতীয় ভক্তের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। একদিকে যেমন দৈন্যমূর্তির অন্তরালে পাণ্ডিত্যের বিকাশ হইতে লাগিল, অন্যদিকে তেমনিই রাগানুগা ভক্তির দিব্যোন্মাদ তাঁহাদিগকে সকলের স্মরণীয় ও বরণীয় করিয়া তুলিল। একভাবে যেমন কাহারও মনে কোনো আধ্যাত্মিক সমস্যা উপস্থিত হইলে তিনি তাহার সমাধানের প্রত্যাশায় উঁহাদের দীর্ঘ কুটিরের দ্বারস্থ হইতেন, অন্যভাবে তেমনই কেহ মানবরূপী দেবতা দেখিয়া জীবন চরিতার্থ করিবার জন্য তাঁহাদের দর্শন লাভের জন্য লালায়িত হইতেন। তাঁহাদের ভবনকুঞ্জ মানব্-কুলের পবিত্র তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হইল।

“কত ভক্ত ও শিষ্য আসিলেন। তাহাদের সাহায্যে ভারতবর্ষের নানা প্রদেশ হইতে অসংখ্য শাস্ত্রগ্রন্থ সংগৃহীত হইয়া বৃন্দাবনে আসিল। উঁহাদের সাহায্যে সনাতনের বিচার শক্তি ও রূপের কবিত্ব প্রতিভা নূতন নূতন শাস্ত্রপথ পাইয়া গিরিনদীর মতো ক্ষিপ্রগতিতে ছুটিয়া চলিল। তাঁহাদের লিখিত, সংকলিত ও ব্যাখ্যাত ভক্তি-গ্রন্থসমূহ বিশ্বমানবের সার সম্পত্তি হইতে লাগিল।...

“মহাপ্রভু সনাতনকে বৃন্দাবনধামে পাঠাইবার সময় বলিয়া দিয়াছিলেন যে তিনি যেন শ্রীধামে তাঁহার দীন ভক্তবৃন্দের আশ্রয়-স্থল হন। কিন্তু সে কার্য তাঁহার একনিষ্ঠ কনিষ্ঠ ভ্রাতা দ্বারাই বিশেষ-ভাবে সাধিত হইয়াছিল। সনাতন কিছু আত্মহারা গম্ভীর প্রকৃতির লোক, সাধারণ কর্মপটুতা রূপেরই অধিক ছিল। উপযুক্ততার অনুপাতে মানুষের কর্মভার আপনিই জুটিয়া থাকে। চৈতন্যদেবের প্রবর্তনায় বা প্রচারিত উপদেশের ফলে যেমন দলে দলে ভক্তগণ নানাদিক হইতে বৃন্দাবনে আসিতেছিলেন, রূপ অগ্রণী ও উদ্যোগী হইয়া তাঁহাদের সকলের তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন। যিনি যেমন প্রকৃতির লোক, তাহাকে সেইভাবে কুটির বাঁধিয়া বাস করিতে দিয়া,

সকলের অভাব অভিযোগের সুমীমাংসা করিয়া রূপ গোস্বামী বৃন্দাবনের ভক্তমণ্ডলীর কর্তা হইয়া বসিলেন। এই কর্তৃত্বই গোস্বামী নামের সার্থকতা রাখিল। কাজের লোক চিনিয়া লইতে কাহারও বিলম্ব হয় না। নূতন ভক্ত কেহ আসিলে তিনি সর্বাগ্রে রূপকেই খুঁজিয়া বাহির করিতেন। প্রবাসী ভক্তেরা অঙ্গুলি দিয়া তাঁহাকেই দেখাইয়া দিতেন; কোনো পর্ব উৎসব অনুষ্ঠানের প্রস্তাব হইলে রূপই তাহার ব্যবস্থা করিতেন। এই প্রকার নানারূপে রূপ শ্রীকৃষ্ণ-রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনের রাজা, রূপ হইলেন তাঁহার রাজপ্রতিনিধি। রূপের নাম শীঘ্রই দেশে প্রচারিত হইল, শত শত ভক্ত তাঁহার অনুবর্তন করিয়া ব্রজমণ্ডলে এক সঙ্ঘ গড়িলেন। লোকে রূপের কথায় উঠিত বসিত এবং তাঁহার উপদেশের ফলে জ্ঞান ও সাধনার পথে অগ্রসর হইয়া ধন্য হইত। কে বড়, কে ছোট তাহা সকলে জানিত না, রূপ-সনাতন এই জোড়া নামে সকলে রূপেরই প্রধান্য স্বীকার করিত। সমাজের প্রতি এমন অবাধ প্রতিপত্তি কম শক্তির পরিচায়ক নহে[১]।"

প্রভু শ্রীচৈতন্য শ্রীবিগ্রহ সেবার যে নির্দেশ দিয়াছিলেন রূপ ও সনাতন তাহা একদিনের তরেও বিস্মৃত হন নাই। লুপ্ততীর্থ উদ্ধারের পরিকল্পনার সঙ্গে তাঁহারা লুপ্ত শ্রীবিগ্রহের পুনরাবির্ভাবের কথাও একান্তমনে ব্যাকুলভাবে ভাবিতেছিলেন।

বৃন্দাবনে কাজ শুরু করার পর দীর্ঘ বৎসর গত হইয়াছে। রূপ ও সনাতনের পরে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন গোপাল ভট্ট, রঘুনাথ ভট্ট প্রভৃতি পণ্ডিত ও সাধকগণ। শ্রীচৈতন্যের লীলা সংবরণের পরে রঘুনাথ দাস প্রভৃতি বিশিষ্ট ভক্তেরাও বৃন্দাবনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গৌড়ীয় গোস্বামীদের তপস্যা, পাণ্ডিত্য, ও সংগঠনের গুণে বৃন্দাবন পরিণত হইল ভারতের এক শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবকেন্দ্র রূপে।

---

১ রূপ গোস্বামী : সতীশচন্দ্র মি

ইতিমধ্যে ব্রজমণ্ডলের প্রাচীন এবং হারাইয়া যাওয়া পবিত্র বিগ্রহগুলির অনুসন্ধান প্রবলভাবে চলিতেছিল, এই সঙ্গে মিলিত হইয়াছিল সনাতন রূপ প্রভৃতির আর্তি ও ব্যাকুল প্রার্থনা। এ প্রার্থনার ফল অচিরে ফলিল। সনাতন গোস্বামী মথুরার চৌবেজীর গরীব বিধবার নিকট হইতে মদনগোপাল বিগ্রহ সংগ্রহ করিয়া আনিলেন। শ্রীবিগ্রহ কৃপাভরে চৌবে ঘরনীকে স্বপ্ন দেখাইয়া নিজেই নিজেকে সঁপিয়া দিলেন কাঙাল ভক্ত সনাতনের করে।

মদনগোপাল বিগ্রহের পর গোস্বামীদের করায়ত্ত হয় গোবিন্দদেব বিগ্রহ। ব্রজমণ্ডলের প্রসিদ্ধ এবং সুপ্রাচীন অষ্টমূর্তির মধ্যে এইটি সর্বপ্রধান। শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র বজ্রনাভের আমলের পরে এই বিগ্রহ আত্মগোপন করেন। রূপ গোস্বামীর অলৌকিকী প্রয়াসই এই পবিত্র ঐতিহ্যময় বিগ্রহকে লোকলোচনের সম্মুখে প্রকটিত করে এবং তিনিই পরম আনন্দে গ্রহণ করেন ইঁহার সেবা পূজার দায়িত্ব।

এই গোবিন্দদেবের উদ্ধার সাধনের কাহিনী আজো ব্রজমণ্ডলের জনমানসে জাগরূক রহিয়াছে, আজো পরম জাগ্রত বিগ্রহরূপে ইনি বিরাজিত রহিয়াছেন ভারতের প্রেমিক সাধকদের অন্তরপটে।

প্রাচীন শাস্ত্রীয় গ্রন্থাদি ঢুঁড়িয়া রূপ গোস্বামী জানিয়াছিলেন, বৃন্দাবনের যোগপীঠে রাজা বজ্রনাভের এই শ্রীবিগ্রহটি বিরাজ করিতেন। কান্থা-করঙ্গধারী সনাতন ও রূপ যখন বৃন্দাবনের অরণ্যে প্রান্তরে তীর্থ উদ্ধারের জন্য ঘুরিয়া বেড়াইতেন, তখন হইতেই গোবিন্দদেব রূপের হৃদয়-সিংহাসন জুড়িয়া বসেন। কিন্তু কোথায় প্রাচীনকালের সেই যোগপীঠে, কোথায় কোন্ নদীগর্ভে বা দুর্গম বনে সেই বিগ্রহ আত্মগোপন করিয়া আছেন, তাহা কে বলিবে?

যখন যেখানে থাকিতেন কাঙাল বৈষ্ণব রূপ জপধ্যান শেষে রোজ জানাইতেন আকুল প্রার্থনা, "হে প্রভু, হে প্রাণনাথ, কোথায় তুমি লুকিয়ে আছো, আমায় তার সন্ধান দাও, এই ভক্তাধমের প্রাণ রক্ষা করো।"

এই প্রার্থনা একদিন ইষ্টদেব শুনিলেন, তাঁহার কৃপার উদ্রেক

হইল। সেদিন যমুনা তীরে বসিয়া সজল নয়নে শ্রীগোবিন্দের স্মরণ করিতেছেন, এমন সময়ে সেখানে আবির্ভূত হয় দিব্য লাবণ্যময় শ্যামকান্তি এক চঞ্চল ব্রজবালক।

"হেই বাবাজী, বসে বসে নিদ্ যাচ্ছো, না তোমার গোবিন্দের ধেয়ান করছো? গোবিন্দ তো হোথায়। ঐ গোমাটিলার ভেতরে।"

ধ্যানাবেশ কাটিয়া যায় রূপ গোস্বামীর, চমকিয়া আসন হইতে উঠিয়া দাঁড়ান। ব্যাকুল স্বরে প্রশ্ন করেন, "ভাই, গোমাটিলার কোথায় লুকিয়ে আছেন তিনি, কে আমায় তা বলে দেবে?"

"কেন, বাবাজী আমি বাতিয়ে দেবো তোমায়। জানতো ঐ গোমাটিলার এক জায়গায় রোজ দুপুরবেলায় একটা গাই চরতে আসে, আর ঠিক ঐ জায়গাতেই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে দুধ ঢেলে দিয়ে যায়। ওরই নিচেই তো রয়েছেন তোমার গোবিন্দজী।"

অপার্থিব আনন্দে প্রাণ-মন অধীর হইয়া উঠে, অর্ধবাহ্য অবস্থায় গোস্বামী ভাবিতে থাকেন, একি সত্যি সত্যিই কোনো ব্রজবালক, না দিব্যলোকের কোনো অধিবাসী? না স্বয়ং শ্রীগোবিন্দই ছদ্মবেশে হইয়াছেন আবির্ভূত? তীব্র-রসাবেশ জাগিয়া উঠে রূপ গোস্বামীর সারা দেহে মনে, তখনি তিনি মূর্ছিত হইয়া পড়েন।

জ্ঞান ফিরিয়া আসিলে দেখেন, সেই সুদর্শন বালক আর নাই, কোথায় সে অন্তর্হিত হইয়াছে।

ব্যগ্রভাবে রূপ গোস্বামী তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া যান সন্নিহিত গ্রামে। সবাইকে প্রশ্ন করেন গোমাটিলার রহস্যের কথা, গাভীর নিত্যকার দুগ্ধ ক্ষরণের কথা।

ব্রজবাসীরা সোৎসাহে বলিতে থাকে, "হাঁ, বাবাজী, তুমি তো ঠিক কথাই বলছো। অনেক বৎসর ধরে আমরা যে দেখে আসছি, গাই-এর দুধ ঠিক একটা জায়গাতে নিয়মিতভাবে ঝরে পড়ে। ওখানে কোনো দেবতা আছেন নিশ্চয়।"

আনন্দাশ্রু বহিতে থাকে রূপ গোস্বামীর নয়নে। সারা দেহ

ভাবাবেশে বার বার কণ্টকিত হইতে থাকে। আকুল প্রার্থনা জানান গ্রামের লোকদের কাছে, "ভাই সব, তোমরা চল। সবাই মিলে আমায় সাহায্য দাও। ঐ স্থান থেকে বার হয়ে আসবেন আমাদের সকলের প্রাণপ্রিয় ঠাকুর, শ্রীগোবিন্দদেব।"

বাবাজীর এই উৎসাহ ও প্রেরণায় সবাই উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠে, সমবেত চেষ্টায় শুরু হয় খননের কাজ। সেই দিনই আবিষ্কৃত হন শ্রীগোবিন্দের পবিত্র বিগ্রহ।

ঐ গোমাটিলাই যে দ্বাপর যুগের যোগপীঠ এবং ঐ বিগ্রহই যে বজ্রনাভ মহারাজের প্রতিষ্ঠিত ও পূজিত গোবিন্দদেব শাস্ত্রবাক্য উদ্ধৃত করিয়া রূপ গোস্বামী গ্রামবাসীদের কাছে, সাধু সন্ত ও ভক্তজনের কাছে, একথা প্রমাণিত করিলেন।

গোস্বামীর তপস্যার ফলে গোবিন্দদেব নিজে কৃপা করিয়া প্রকটিত হইয়াছেন, একথা অচিরে সারা ব্রজমণ্ডলে ছড়াইয়া পড়ে। দলে দলে ভক্ত ও সাধু সজ্জনেরা সেখানে সমবেত হইতে থাকেন, সবাই মিলিয়া অনুষ্ঠান করেন এক বিরাট ভাণ্ডারার।

উত্তরকালে রূপ সনাতনের সহকর্মী রঘুনাথ ভট্টের এক ধনবান শিষ্য গোবিন্দদেবের একটি সুন্দর মন্দির ও জগমোহন নির্মাণ করিয়া দেন।[১]

বৃন্দাবনের গৌড়ীয় গোস্বামীদের শাস্ত্র প্রণয়ন, সংকলন এবং প্রকাশনার বিস্তার ও গভীরতা দেখিলে বিস্মিত না হইয়া পারা যায় না। সহায়-সম্পদহীন এই কাঙাল ভক্তেরা দীর্ঘদিনের সাধনা ও

১ উড়িষ্যার রাজা প্রতাপরুদ্রের পুত্র, পুরুষোত্তম জানা, রূপ গোস্বামীর তিরোধানের কিছু পূর্বে এই মন্দির-বিগ্রহের পাশে একটি রাধিকা-মূর্তি স্থাপন করেন। মন্দিরটি পরবর্তীকালে জীর্ণ হইয়া পড়িলে অম্বরের রাজা মানসিংহ ইহার স্থলে লাল পাথরের কারুকার্যময় এক সুবৃহৎ মন্দির নির্মাণ করিয়া দেন। অতঃপর অওরঙ্গজেব এটির প্রধান অংশ ভগ্ন করিয়া দিলে মন্দিরের সৌন্দর্য ও বৈভব নষ্ট হয়।

কর্মনিষ্ঠায় যে শাস্ত্র-সম্পদ গড়িয়া তোলেন, তাহার তুলনা ইতিহাসে বিরল।

বৈষ্ণব ইতিহাসের গবেষক ও ব্যাখ্যাতা সতীশচন্দ্র মিত্র লিখিয়াছেন : ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমপাদে ইঁহারা যে ধর্ম গড়িয়া দেশময় তুমুল আন্দোলন তুলিয়াছিলেন, তাহার প্রবাহ কয় শতাব্দী পরে হইতে পারিত, তাহা কে জানে? কারণ বঙ্গের যাঁহারা শক্তিশালী বা সমৃদ্ধিশালী লোক, সমাজে যাঁহারা কুলীন বলিয়া চিহ্নিত, বঙ্গীয় সমাজের উচ্চস্তরের সেই ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য প্রভৃতি জাতির অধিকাংশই তখন শাক্ত মতাবলম্বী—তাঁহারা গৌড়ীয় বৈষ্ণবমতের ঘোর শত্রু ছিলেন। পাণ্ডিত্য প্রতিভায় বংশ পরম্পরায় যে ব্রাহ্মণগণ সর্বত্র খ্যাতিসম্পন্ন, ধর্মসাধনা অপেক্ষাও আচার-নিষ্ঠায় যাঁহাদের অধিক আগ্রহ, তাঁহারা সকলেই নবমতকে অশাস্ত্রীয় এবং অনাচরণীয় বলিয়া উপেক্ষা করিতেছিলেন। সুতরাং প্রবর্তক প্রভুদিগের অন্তর্ধানের পর এক তাঁহাদের ধর্মকে বাঁচাইয়া রাখা গুরুতর সমস্যার বিষয় ছিল। এদেশে শাস্ত্রের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠাপিত না হইলে কোনো ধর্মই টিকিবে না ; এই পণ্ডিতের দেশে যেখানে সেখানে তর্ক-যুদ্ধে সকলকে পরাজিত করিয়া নিজমত স্থাপন করিতে না পারিলে, সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইবে—এ রহস্য চৈতন্য বুঝিতেন। ভাবের বন্যায় জলোচ্ছ্বাস আসিতে পারে, কিন্তু কালে শুষ্ক বালুকায় তাহা শুকাইয়া যাওয়া বিচিত্র নহে। তাহাকে দৃঢ় মৃত্তিকার খাতে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে না পারিলে, ইহা সুপেয় সলিলপূর্ণ গভীর জলাশয়ে পরিণত হইয়া চিরপিপাসুর তৃষ্ণা নিবারণে সমর্থ হইবে না।

—এই জন্যই শ্রীচৈতন্য নিজ ভক্তের মধ্য হইতে বাছিয়া বাছিয়া লোক পাঠাইয়া তাঁহাদের দ্বারা বৈষ্ণবমতের শাস্ত্রগঠন ও সংকলন করাইয়াছিলেন। জগতের সকল জাতির নেতৃবৃন্দের মধ্যে যিনিই উপযুক্ত লোক নির্বাচনে সুপটু এবং গুণগ্রাহী ও সূক্ষ্মদর্শী তিনি জগতে জয়লাভ করিয়াছেন। চৈতন্যমতের সাফল্যের ইহাই প্রধান কারণ।

—তিনি যাহাদিগকে মোহিনী মূর্তিতে আত্মসাৎ করিয়া শক্তি সঞ্চারিত করিয়াছিলেন, তাঁহার সেই বাছা বাছা ভক্তেরা নিখিল হিন্দু শাস্ত্রের আকর স্থান হইতে রত্নোদ্ধার করিয়া নব প্রবর্তিত গৌড়ীয় মতকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের নিকট লোকে সর্বপ্রথমে পাণ্ডিত্যে পরাজিত হইয়া মস্তক অবনত করিয়াছিলেন, তবে তো নবমতের বিজয়ে পতাকা উড়িয়াছিল। নতুবা আজ শ্রীচৈতন্যের ধর্মের কি পরিণতি হইত, কে বলিবে? যে সব সংসারত্যাগী অসাধারণ শাস্ত্রদর্শী দৈন্যবেশী সন্ন্যাসী ভক্তেরা বৃন্দাবনকে কেন্দ্রস্থল করিয়া, তথায় বসিয়া অসংখ্য দার্শনিক গ্রন্থ লিখিয়া বৈষ্ণবধর্মের ভিত্তিমূল রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান ছিলেন তিনজন—শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপ গোস্বামী এবং উহাদের ভ্রাতুষ্পুত্র ও শিষ্য শ্রীজীব গোস্বামী। সনাতন তাঁহার ধর্মকে ও ভক্তিবাদের সিদ্ধান্তকে সনাতন-ধর্মমতের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া প্রমাণিত করিয়াছেন। রূপ সে ধর্মের সাধন-প্রণালীর রূপ নির্ণয় করিয়াছেন, আর শ্রীজীব তাঁহার বিবিধ সন্দর্ভে তত্ত্বব্যাখ্যা করিয়া সে ধর্মকে চিরজীবী করিয়া গিয়াছেন।

এই গোস্বামীদের মধ্যে ত্যাগে, তপস্যায়, সংগঠন শক্তিতে, শাস্ত্র ও কাব্য রচনায় রূপ গোস্বামী ছিলেন অনন্যসাধারণ। কিন্তু তাঁহার শ্রেষ্ঠতম অবদান তাঁহার কৃষ্ণলীলা এবং কৃষ্ণরসে রসায়িত কাব্য ও নাটক।

"রূপ গোস্বামী আজন্ম কবি এবং অল্পবয়সেই পরম পণ্ডিত। তাঁহার হস্তাক্ষর যেমন মুক্তাপঙ্‌ক্তির মতো সুন্দর তাঁহার ভাষাও তেমনি মার্জিত, অলংকৃত এবং নিরুপম কবিত্বপূর্ণ। তাঁহার রচনা সর্বত্রই গভীর চিন্তাশীলতার পরিচয় দেয়; নব নব ভাব ও সুন্দর শব্দ-সমাবেশে তাঁহার শ্লোকগুলি বিষয়ানুরূপ গাম্ভীর্যে বিমণ্ডিত হইয়া কাব্য রসকলায় ভরপুর থাকে। সেই গুরুগম্ভীর শব্দ সম্ভারে ভারাক্রান্ত শ্লোকগুলি পড়িবামাত্র রূপ গোস্বামীর লেখনীপ্রসূত

বলিয়া ধরিতে পারা যায় এবং অর্থের উপলব্ধি হইবামাত্র উহাদের কবিত্ব-কৌশলে মুগ্ধ হইতে হয়। এমন ভাবুক, এমন লেখক যৌবনাবধি কেন যে মুসলমান শাসকের রাজস্বসচিব হইয়া তৃপ্ত ছিলেন তাহা বিস্ময়ের বিষয়। পারিপার্শ্বিক অবস্থার দোষে প্রমত্ত কবিকেও প্রচণ্ড বৈষয়িক করিতে পারে, ইহা তাহারই দৃষ্টান্ত। সংসারকে যে ভালো করিয়া ধরিতে জানে, কর্মবাসনার সমাপ্তি হইলে সেই আবার সংসারকে ভালো করিয়া ছাড়িতে পারে। মরিচা কাটিয়া গেলে সকল ধাতুরই ঔজ্জ্বল্য প্রকাশ পায়; বিষয় মরীচিকার হাতে নিস্তার পাইয়া রূপ যে নবজীবন পাইয়াছিলেন, তাহার ঔজ্জ্বল্যে সমগ্র ভারতবর্ষ উদ্ভাসিত হইয়াছে।

"রাজকর্মচারী থাকিবার কালেও তিনি কখনও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সঙ্গে শাস্ত্রচর্চায় বিরত হন নাই, তাঁহার কবি প্রতিভা কখনও সম্পূর্ণ লুক্কায়িত থাকে নাই। সংসার ছাড়িয়া বৃন্দাবনে আসিবার পর যখন তিনি রাশি রাশি শাস্ত্রগ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া তাহা লইয়া তদ্‌গতচিত্ত থাকিতেন, তখন তাহার চিন্তার ধারা স্বভাবত উছলিয়া পড়িত, ভাষা আসিয়া দাসীর মতো উহা বহন করিয়া লোকশিক্ষার জন্য গ্রন্থিত করিয়া রাখিত। কত কাব্য নাটক, কত স্তোত্র বা মন্ত্র কবিতা, কত সারার্থ-ব্যাখ্যা বা শাস্ত্র সংগ্রহ যে তাঁহার লেখনী মুখে প্রকাশিত হইত, তাহা বলিবার নহে। রূপ গোস্বামী বহু প্রকারের বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। শ্রীজীব গোস্বামী স্বপ্রণীত 'লঘুতোষণী' গ্রন্থে নিজ বংশের পরিচয় কালে ঐ সকল গ্রন্থের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন।[1]

কাব্য, নাটক, রসগ্রন্থ, স্তোত্র, ভাণিকা এবং শাস্ত্রসংগ্রহ পুস্তক সব মিলাইয়া রূপ গোস্বামী ষোলখানা গ্রন্থ প্রণয়ন ও সংকলন করেন। বিদগ্ধমাধব এবং ললিতমাধব এই নাটক দুইটিতে নায়ক শ্রীকৃষ্ণের বিদগ্ধ এবং ললিত এই দুইটি মাধুর্যময় রূপে এবং রাধা ও প্রধানা সখীদের সহিত তাঁহার মিলনলীলা বর্ণনা তিনি করিয়াছেন।

১ রূপ গোস্বামী: সতীশচন্দ্র মিত্র

মধুর রস যে সাধকদের উপজীব্য, এই নাটক দুইটিতে তাঁহাদের জন্য পরিবেশিত হইয়াছে কৃষ্ণের অনুপম ভাবমূর্তি ও নিগূঢ় প্রেমতত্ত্ব। কিন্তু রূপ গোস্বামীর গ্রন্থসমূহের মধ্যে সর্বপ্রধান হরিভক্তি রসামৃত-সিন্ধু এবং উজ্জ্বল নীলমণি। রসগ্রন্থ নামে এই দুইটি প্রসিদ্ধ।

ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর রচনায় সনাতন এবং রূপ এই দুই ভ্রাতারই অবদান রহিয়াছে। সনাতনই সেখানে শাস্ত্ররহস্যের বিচারকর্তা এবং রূপ তাঁহার নির্দেশ এবং সম্মতি নিয়া তত্ত্ব ও সিদ্ধান্ত স্থির করিয়াছেন, দীর্ঘ বৎসরের পরিশ্রমে এই মহাগ্রন্থ লিখিয়াছেন। এজন্য তিনিই ইহার রচয়িতারূপে পরিচিত। এই গ্রন্থে ভক্তিরসের বিভিন্ন ধারার ব্যাখা বিশ্লেষণ তিনি দিয়াছেন এবং ভক্তির স্বরূপ ও প্রকারভেদ নির্ণয় প্রসঙ্গে উপস্থাপিত করিয়াছেন গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতবাদ।

ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে রূপ গোস্বামী শান্ত দাস্য প্রভৃতি সব রসের বর্ণনা দিয়াছেন, কিন্তু মধুর রস অত্যন্ত গূঢ় বলিয়া তাহার আলোচনা করিয়াছেন সংক্ষেপে। এই গূঢ় রসের বিস্তৃত ব্যাখ্যা পাওয়া যায় তাঁহার উজ্জ্বল নীলমণিতে। ভক্তি সমুদ্র হইতে নীলমণিতুল্য মধুর অথবা উজ্জ্বলরস আহরণ করিয়াছেন বিদগ্ধ লেখক, তাই ইহার নামকরণ করিয়াছেন—উজ্জ্বলনীলমণি। মধুর রসের বিস্তৃত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে এ গ্রন্থ ভরপুর।

শাস্ত্রসংগ্রহ গ্রন্থসমূহের মধ্যে রূপ গোস্বামীর লঘুভাগবতামৃত বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এটি আসলে সনাতন গোস্বামীর মহান্ গ্রন্থ বৃহৎ ভাগবতামৃতের সংক্ষেপণ। বিদগ্ধ রূপের মতে ভাগবতামৃত দুই প্রকারের,—কৃষ্ণামৃত ও ভক্তামৃত। গ্রন্থটি তাই বিভক্ত করা হইয়াছে দুই ভাগে। শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ নির্ণয়, অবতার তত্ত্বের আলোচনা এবং কৃষ্ণ অবতারের শ্রেষ্ঠত্ব এই গ্রন্থে তিনি প্রতিপাদিত করিয়াছেন। মথুরামণ্ডলে শ্রীকৃষ্ণ এখনো নিত্যলীলা করিয়া চলিয়াছেন, এবং দেবতারা সদাই তাহা দর্শন করেন,—এই তত্ত্বটি তিনি উপস্থাপিত করিয়াছেন শাস্ত্র পুরাণের বহুতর উদ্ধৃতি দিয়া।

বৈষ্ণবীয় সাধনা ও সিদ্ধির মূর্ত বিগ্রহ ছিলেন রূপ গোস্বামী। কোমলতা ও কঠোরতা, বৈরাগ্য ও অনুরাগ, বৈধী এবং রাগানুগা সাধনার ধৃতি, একসঙ্গে অপরূপ বৈশিষ্ট্য নিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছিল তাঁহার মহাজীবনে। ভক্তি ও জ্ঞানের ঘটিয়াছিল বিরাট সমন্বয়।

নিজস্ব সাধনজীবনে তিনি ছিলেন ডোরকৌপীনধারী দিনাতিদীন বৈষ্ণব। তৃণের অপেক্ষা নীচু এবং তরু অপেক্ষা সহিষ্ণু—মহাপ্রভুর এই বৈষ্ণবীয় আদর্শ রূপায়িত হইয়াছিল তাঁহার মধ্যে। কিন্তু এই সঙ্গে ছিল তাঁহার ধর্মীয় আদর্শ রক্ষার নিষ্ঠা ও অনমনীয়তা। শিষ্য ও ভক্তদের মধ্যে বিন্দুমাত্র শৈথিল্য বা স্খলন পতন ঘটিলে মুহূর্তমধ্যে প্রকটিত হইত তেজস্বী সিদ্ধপুরুষের অগ্নিগর্ভ মূর্তি, রুদ্ররোষে তিনি ফাটিয়া পড়িতেন। বৃন্দাবনের ভক্তসমাজে তাই রূপ গোস্বামী গণ্য হইতেন এক অনন্যসাধারণ বৈষ্ণব নায়করূপে।

দিক্‌পাল পণ্ডিত এবং অতুলনীয় কৃষ্ণরসবেত্তা ছিলেন রূপ-গোস্বামী। বৈষ্ণবীয় দৈন্য ও বিনয় ছিল তাঁহার চরিত্রের বড় বৈশিষ্ট্য, আর প্রতিষ্ঠা তাঁহার দৃষ্টিতে ছিল—শূকরী বিষ্ঠা। ভারতের দিগ্‌দিগন্ত হইতে কত ধর্মনেতা, কত দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিত বৃন্দাবনে আসিতেন, রূপ গোস্বামীর কাছে উপস্থিত হইতেন তর্ক-বিচারের জন্য। তিনি কখনো এজাতীয় দ্বন্দ্বে লিপ্ত হইতেন না, সানন্দে তৎক্ষণাৎ লিখিয়া দিতেন জয়পত্র। প্রতিদ্বন্দ্বী বুক ফুলাইয়া স্থানত্যাগ করিলে রূপ রত হইতেন তাঁহার শাস্ত্ররচনায় অথবা ভজনসাধনে।

একবার আচার্য বল্লভ ভট্ট রূপ গোস্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন। ভট্টজী বিষ্ণুস্বামী সম্প্রদায়ের প্রখ্যাত নেতা এবং ভক্তি-পুরাণ শাস্ত্রে সুপণ্ডিত। রূপ গোস্বামী তখন নিজের কুটিরে ভক্তিরসামৃতের পুঁথি রচনায় নিবিষ্ট আছেন, আর শ্রীজীব তাঁহার পাশে বসিয়া একটি পাখা হাতে নিয়া ভক্তিভরে তাঁহাকে ব্যজন করিতেছেন। রূপ ভট্টজীকে সসম্মানে অভ্যর্থনা জানান, একপাশে আসন বিছাইয়া বসিতে দেন।

কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর ভট্টজী রূপ গোস্বামীর সগু লিখিত পুঁথির দুই চারিটি শ্লোক শুনিতে চাহিলেন। রূপ মঙ্গলাচরণের দুই একটি শ্লোক পাঠ করার সঙ্গে সঙ্গে বল্লভ ভট্ট শাস্ত্রীয় বিতর্ক তুলিলেন, কহিলেন, "গোস্বামীজী, এ শ্লোকে ত্রুটি রয়েছে দেখতে পাচ্ছি, একটু সংশোধন ক'রে নেওয়া সঙ্গত।"

"অতি উত্তম কথা," তখনি সানন্দে বলিয়া উঠেন রূপ গোস্বামী। "আপনি দয়া ক'রে নিজে সংশোধন ক'রে দিলে বড়ই উপকৃত বোধ করবো। আপনি কাজটা এখানে বসে শেষ করুন। এদিকে আমার আবার ঠাকুর সেবার কাজ আছে, বেলা হয়ে যাচ্ছে, আমি যমুনায় স্নান সমাপন ক'রে আসছি।"

পুঁথিটি তেমনিভাবে খুলিয়া রাখিয়া প্রশান্ত মনে, অবলীলায়, রূপ গোস্বামী চলিয়া গেলেন।

শ্রীজীব কিন্তু এতক্ষণ চুপচাপ একপাশে উপবিষ্ট ছিলেন। ভট্টজী লেখনীটি হাতে নিয়া পাণ্ডুলিপি সংশোধনে উদ্যত হইতেই তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। কঠোর স্বরে কহিলেন, "আচার্য, একটু অপেক্ষা করুন। আগে স্থির হোক সংশ্লিষ্ট এ শ্লোকটিতে কোনো ত্রুটি আছে কিনা। আমাদের গোস্বামী প্রভু দৈন্যের অবতার। আপনি সম্পূর্ণ-রূপে ভ্রান্ত, একথা জেনেও আপনার অহংবোধকে উনি এভাবে কিছুটা প্রশ্রয় দিচ্ছেন।"

"কে হে তুমি অর্বাচীন! তোমার স্পর্ধাতো দেখ্‌ছি কম নয়। তুমি জানো, আমি কে?"

"আজ্ঞে, আপনার পরিচয় শুনেছি।"

"তবে? এমন সাহস পেলে কোথায়।"

"আচার্যবর, এ সাহস এসেছে গুরুকৃপায়। আপনি যাঁর লেখা সংশোধন করতে যাচ্ছেন, তাঁর কাছেই হয়েছে আমার দীক্ষা আর শাস্ত্র শিক্ষা। সে শিক্ষার এক কণাও আয়ত্ত করতে পারি নি। তবুও তাঁর প্রসাদে আমার মতো অর্বাচীনই বৃন্দাবনে আগত দুই চারিটি দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিতকে পরাস্ত করেছে।"

"হুম্।" ভিতরকার ক্রোধ ও উত্তেজনা অতিকষ্টে সংযত করিয়া বল্লভ ভট্ট কহিলেন, "বেশ, গোস্বামীর এই শ্লোকটি যে সঙ্গত তার কারণ দর্শাও।"

"আপনি আদেশ করলে দেখাতে পারি বৈ কি।" একথা বলিয়া প্রতিভাধর তরুণ পণ্ডিত শ্রীজীব প্রাচীন শাস্ত্র হইতে ঐ শ্লোকের যথার্থতা সপ্রমাণ করিলেন।

আচার্য বল্লভ ভট্ট কিছুক্ষণ তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া রহিলেন, তারপর পাণ্ডুলিপিটি সশব্দে বন্ধ করিয়া দিয়া বিদায় নিলেন।

পথিমধ্যে রূপ গোস্বামীর সঙ্গে ভট্টজীর দেখা। আচার্য এসময়ে বড় গম্ভীর বদন। কহিলেন, "গোস্বামী মহারাজ, আপনার কুটিরে উপবিষ্ট ঐ তরুণ বৈষ্ণবটি কে?"

"কেন বলুন তো? ঐটি আমার শিষ্য, শ্রীজীব।"—সন্দিগ্ধ স্বরে উত্তর দেন রূপ। বল্লভ ভট্ট এবার বিষণ্ণ স্বরে সংক্ষেপে বর্ণনা করেন শ্রীজীব সম্পর্কিত ঘটনার কথা। তারপর ধীর পদে সেখান হইতে প্রস্থান করেন।

কুটিরের আঙিনায় পা দিয়াই রূপ গোস্বামী কঠোর স্বরে শ্রীজীবকে নিকটে ডাকিলেন। প্রেমবিলাস এই বিস্ফোরণশীল পরিস্থিতির বর্ণনায় বলিতেছেন:

শ্রীরূপ ডাকিয়া কহে শ্রীজীবের প্রতি।
অকালে বৈরাগ্য বেশ ধরিলে মূঢ়মতি॥
ক্রোধের উপরে ক্রোধ না হইল তোমার।
তে কারণে তোর মুখ না দেখিব আর॥

শ্রীজীব নতশিরে নীরবে দাঁড়াইয়া আছেন। মুহূর্তমধ্যে তিনি উপলব্ধি করিয়াছেন নিজের অপরাধের গুরুত্বের কথা। সত্যিই তো, ক্রোধ ত্যাগ না করিলে সর্বত্যাগী বৈরাগী হওয়া, শ্রীকৃষ্ণের চরণে নিবেদিত-প্রাণ ভক্ত হওয়া তো সম্ভব নয়!

রূপ গোস্বামী এবার কহিলেন, "তুমি কি ভেবেছো, বল্লভ ভট্ট যে ভ্রান্ত, একথা আমি বুঝি নি। সব বুঝেই আমি তাঁকে প্রশ্রয় দিয়েছি,

তাঁর কাছে নতি স্বীকার করেছি। অনেক দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিতকেই বৃন্দাবনে আমি বিনা-তর্কে জয়পত্র দিয়ে দিয়েছি। তোমার তো এসব অজানা নেই। মহাপ্রভুর পবিত্র ধর্ম যে প্রচার করবে, তার তো তোমার মতো আচরণ থাকা উচিত নয়। শুধু ক্রোধ নয়, সূক্ষ্ম অহংবোধও তোমার এ মনোভাবে প্রচ্ছন্ন রয়েছে। এগুলো পরিহার যদি করতে পারো, তবেই আসবে আমার কাছে, নতুবা নয়।”

প্রাণাধিক ভ্রাতুষ্পুত্র এবং নিজের হাতে গড়া দিক্‌পাল শিষ্য শ্রীজীব বৃন্দাবনের ভক্তি সাম্রাজ্যের তিনি ভবিষ্যৎ অধ্যক্ষ। সেই শ্রীজীবকে এক মুহূর্তে বিতাড়িত করিতে রূপ গোস্বামীর সেদিন এতটুকুও বাধে নাই। বৈষ্ণবীয় নীতি ও নিষ্ঠা বিষয়ে এমনি বজ্রকঠোর ছিলেন তিনি।

গুরুকে প্রণাম করিয়া, ক্রন্দন করিতে করিতে জীব গোস্বামী প্রবেশ করেন বৃন্দাবনের এক জনমানবহীন দুর্গম জঙ্গলে। সেখানে লতাপাতা দিয়া এক পর্ণকুটির বাঁধিয়া শুরু করেন নূতনতর কৃচ্ছ্র ও তপস্যা। সংকল্প করেন, যে শোধন ও রূপান্তর গুরু দাবি করিয়াছেন তাহা সাধিত না হইলে লোকালয়ে আর কখনো ফিরিয়া আসিবেন না, জীবনপাত করিবেন এই অরণ্যে।

কয়েক মাস অতিবাহিত হইয়া গেল। অত্যধিক কঠোরতার মধ্য দিয়া শ্রীজীব দিনাতিপাত করিতেছেন। দূর গ্রাম হইতে কেহ কখনো আসিয়া যদি কিছু খাদ্য দেয়, তাহা দিয়াই জীবনধারণ করেন। এক একদিন কোনো রাখাল বা ভক্ত বনবাসী একমুষ্টি গম নিয়া হয়তো উপস্থিত হয়। তাহাই চূর্ণ করিয়া জলসহ তিনি পান করেন। আবার নিমগ্ন হন দীর্ঘ সময়ের জপ ধ্যানে।

হঠাৎ একদিন এই বনের প্রান্তস্থিত গ্রামে সনাতন গোস্বামীর আগমন ঘটে। গ্রামের সবাই প্রাচীন মহাত্মা সনাতনের ভক্ত ও অনুরাগী। নানা কুশল প্রশ্নাদির পর নবীন বৈরাগীর কথাটি প্রকাশ হইয়া পড়ে। কৌতূহলী সনাতন তখনি বহির্গত হন তাঁহার খোঁজে।

দর্শন পাওয়া মাত্র শ্রীজীব লুটাইয়া পড়েন পিতৃব্যের চরণতলে, নিবেদন করেন তাঁহার দুর্ভাগ্যের কথা। স্নেহে করুণায় সনাতনের হৃদয় বিগলিত হইল, সান্ত্বনা দিলেন নানা ভাবে কিন্তু রূপের মনোভাব কি, সঠিকভাবে তাহা জানেন না। তাই তাঁহার সম্মতি না নিয়া শ্রীজীবকে নিজের সঙ্গে নিতে সাহসী হইলেন না।

বৃন্দাবনে আসার পর রূপের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইতেই সনাতন প্রশ্ন করিলেন, "তোমার ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর রচনা কতটা এগিয়েছে? সমাপ্ত হতে আর বিলম্ব কত?"

রূপ গোস্বামী উত্তর দিলেন, "কাজ তো অনেকটা অগ্রসর হয়েছে। এতদিন সমাপ্ত হয়ে যেতো যদি শ্রীজীব কাছে থাকতো, আর তার সাহায্য পেতাম। তাকে তো সেদিন হঠাৎ এ স্থান ত্যাগ করতে হয়েছে।"

"আমি সব শুনেছি। বনে ভ্রমণ করার সময় শ্রীজীবের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎও ঘটেছে। আহা! অনাহারে, অনিদ্রায় ও কঠোর তপস্যায় তার যা হাল হয়েছে, তার দিকে আর তাকানো যায় না। অতি শীর্ণ, অতি দুর্বল তার দেহ। দেখলাম, কোনো মতে প্রাণটুকু মাত্র রয়েছে।

সনাতনের অন্তরের কথা এবং তাঁর ইঙ্গিতের মর্ম রূপ বুঝিলেন। সনাতন শুধু তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাই নয়, তাঁহার গুরুস্থানীয়—তাঁহার হৃদয়ের দেবতা। তাই স্থির করিলেন, আর নয়, এবার শ্রীজীবকে ক্ষমা করিতে হইবে। প্রায়শ্চিত্ত তাহার ইতিমধ্যে অনেকটা হইয়াছে।

সেই দিনই পত্রী পাঠাইয়া শ্রীজীবকে ডাকাইয়া আনিলেন, সেদিনকার অপরাধটি তখনি মার্জনা করা হইল। গুরুর করুণা লাভ করিয়া শ্রীজীব যেন পুনর্জীবন প্রাপ্ত হইলেন।

এই ঘটনার মধ্য দিয়া সারা বৃন্দাবনের ভক্তসমাজে একটা ত্রাসের সঞ্চার হইয়াছিল এবার তাহা দূর হইল। সবাই হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন।

বৃন্দাবনে প্রভু শ্রীচৈতন্যের আদিষ্ট কর্ম উদ্‌যাপনে রূপ সনাতন নিজেদের জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। কাঙাল কান্থা করঙ্গিয়া এই দুই বৈরাগী পত্তন করিয়াছেন এক বিরাট ভক্তি সাম্রাজ্যের। বিশেষ করিয়া তাঁহারা চিহ্নিত হইয়াছেন প্রভু প্রচারিত ভক্তি-প্রেমধর্মের চিহ্নিত অধিনায়করূপে। তৎকালীন ভক্ত সমাজের অন্যতম মুখপাত্র কৃষ্ণদাস কবিরাজ এই দুই গোস্বামীর মূল্যায়ন করিতে গিয়া লিখিয়াছেন :

সনাতন কৃপায় পাইনু ভক্তির সিদ্ধান্ত।
শ্রীরূপ কৃপায় পাইনু রসভার প্রান্ত॥

প্রায় অর্ধশত বৎসরের বিপুল উদ্যম ও প্রয়াসের ফলে ভক্তিধর্ম ও রসতত্ত্বের বিরাট শাস্ত্র ভাণ্ডার রচিত হইয়াছে, গঠিত হইয়াছে নিগূঢ় সাধনার সিদ্ধিতে সমুজ্জ্বল সাধকগোষ্ঠী। সর্বাপেক্ষা আনন্দের কথা, এই শাস্ত্রভাণ্ডার এবং এই সাধকগোষ্ঠীর কুশলী ও প্রতিভাধর নেতারূপে ধীরে ধীরে অভ্যুদয় ঘটিতেছে শ্রীজীবের। রূপ গোস্বামীও সনাতন গোস্বামী উভয়ে প্রাচীন হইয়াছেন, দীর্ঘদিনের কৃচ্ছ্র ও পরিশ্রমে স্বাস্থ্যও তাঁহাদের ভাঙিয়া পড়িতেছে। এবার তাই উন্মুখ হইয়া আছেন শেষের দিনটির জন্য।

অল্পকালের মধ্যে, আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথিতে বৃদ্ধ সনাতন গোস্বামী সবাইকে শোকসাগরে ভাসাইয়া দেহত্যাগ করিলেন। দেবপ্রতিম জ্যেষ্ঠভ্রাতা, শিক্ষাগুরু এবং রূপের জীবনের সর্বকর্মের উদ্যোক্তা ও নায়ক ছিলেন সনাতন গোস্বামী। তাই এই বিচ্ছেদ রূপের পক্ষে বড় মর্মান্তিক। কাঁদিয়া কাঁদিয়া সনাতনের শেষকৃত্য সমাপন করিলেন, সাড়ম্বরে ভাণ্ডারা অনুষ্ঠানও সমাপ্ত হইয়া গেল। তারপর রূপ গোস্বামী প্রবেশ করিলেন তাঁহার নিভৃত ভজনকুটিরে।

জীবনের অবশিষ্ট কয়েকটি মাস এই কুটির হইতে তাঁহাকে বাহির হইতে দেখা যায় নাই, ইষ্টধ্যানে ও ইষ্টনাম জপে নিরন্তর থাকিতেন তিনি অভিনিবিষ্ট।

১৫৫৪ খ্রীষ্টাব্দের চিহ্নিত ক্ষণে মহাসাধকের চির বিদায়ের লগ্নটি আসিয়া যায়, প্রাণপ্রভু গোবিন্দদেবের শ্রীবিগ্রহের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া প্রবিষ্ট হন নিত্যলীলায়। ভারতের অধ্যাত্ম-আকাশ হইতে খসিয়া পড়ে প্রেমভক্তি সাধনার এক অত্যুজ্জ্বল নক্ষত্র।

তন্ত্রাচার্য শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব

উনবিংশ শতাব্দীর ভারতে ধর্ম-সংস্কৃতি, শিক্ষা ও রাষ্ট্রচিন্তায় এক নব জাগৃতির সূচনা হয়। এই জাগৃতির প্রধান উৎসটি সেদিন বিরাজিত ছিল বাংলাদেশে। পাশ্চাত্যের শিক্ষা ও ধ্যান ধারণায় তখন নব্যপন্থী বাঙালীর জীবন প্রভাবিত। শিক্ষিত মহলে আধুনিক বিচারবুদ্ধি, যুক্তিনিষ্ঠা ও বস্তুতান্ত্রিকতা দিন দিন প্রবল হইয়া উঠিতেছে। ধর্ম, সমাজ ও রাজনীতিতে শুরু হইয়াছে নূতন মূল্যায়ন। ইহাতে একদিকে সুফল যেমন ফলিয়াছে, কুফলও কম দেখা দেয় নাই। নব্যপন্থীদের বেশীর ভাগই উন্নাসিক ও উগ্রমতবাদী। ভারতের ধর্ম-সংস্কৃতির অনেক কিছুই তাঁহাদের মতে হেয় ও কুসংস্কাচ্ছন্ন, তাই অনেক কিছুই নস্যাৎ করিয়া দিতে তাঁহারা উৎসাহী হইয়া উঠিয়াছেন।

মানস সংকটের এই দুর্দিনে আবির্ভাব ঘটে সনাতন ধর্মের ধারক বাহক একদল শক্তিধর আচার্য ও সাধকের। শাশ্বত ভারতের প্রাণ-স্পন্দন তাঁহারা উৎকর্ণ হইয়া শুনিয়াছেন, দু'চোখ ভরিয়া দেখিয়াছেন তাঁহাদের ধ্যানের ভারতকে, আকণ্ঠ পুরিয়া পান করিয়াছেন প্রাচীন শাস্ত্র, সাধনা ও তত্ত্বজ্ঞানের সুধা। তারপর অবতীর্ণ হইয়াছেন ভারত-ধর্মের উজ্জীবন ও বিস্তার সাধনে। এই শক্তিধর আচার্য ও সাধকদের অন্যতম শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব।

শক্তি সাধনায় শিবচন্দ্র সিদ্ধ হন, তারপর তন্ত্রের পরম তত্ত্বের প্রচারে ব্রতী হইয়া তন্ত্রকুশল একদল সাধককে তিনি উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলেন। শিবচন্দ্র ও তাঁহার পূর্ণাভিষিক্ত শিষ্য স্যর জন উড্রফ, শুধু ভারতেই নয়, সারা বিশ্বে তন্ত্রশাস্ত্র ও তন্ত্রসাধনার যে বিজয়-কেতন উড়াইয়া গিয়াছেন, এদেশের ধর্ম-সংস্কৃতির ইতিহাস কোনোদিন তাহা বিস্মৃত হইবে না।

১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে, অবিভক্ত বাংলার নদীয়া জেলার কুমারখালিতে, শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব ভূমিষ্ঠ হন। গৌরী নদী বিধৌত এই গ্রামটিতে তখন ছিল বহু সম্পন্ন গৃহস্থ ও সাধু সজ্জনের বাস। নিকটবর্তী গ্রাম ভাঁড়ারায় থাকিয়া সাধনভজন করিতেন মরমিয়া সাধক লালন ফকির। দ্বিজটা সন্ন্যাসী, সনাতন গোস্বামী, মহাত্মা সোনাবঁধু, পাগল হরনাথ প্রভৃতি সিদ্ধ সাধকদের অধ্যুষিত ছিল এই অঞ্চল।

কুমারখালির ভট্টাচার্য বংশ চিরদিনই সাধনা ও শাস্ত্রচর্চার জন্য প্রসিদ্ধ। এই বংশেরই অত্যুজ্জ্বল রত্ন, তন্ত্রাচার্য শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব। পিতার নাম চন্দ্রকুমার তর্কবাগীশ। মাতা—চন্দ্রময়ী দেবী। পিতামহ কৃষ্ণসুন্দর ভট্টাচার্য ছিলেন একজন বিশিষ্ট তন্ত্রশাস্ত্রবিদ্, তান্ত্রিক ক্রিয়া অনুষ্ঠানেও তাঁহার দক্ষতা ছিল অসাধারণ।

এই ভট্টাচার্যদের আদিনিবাস ছিল ফরিদপুর জেলার কুমার-নদের তীরে গহিশালা গ্রামে। পরবর্তীকালে নদীয়ার কুমারখালিতে তাঁহারা বসবাস করিতে থাকেন। এ বংশের পিতৃপুরুষদের মধ্যে কামদেব, জয়দেব ও নিমানন্দ ভট্টাচার্যের তন্ত্রসাধনার খ্যাতি দীর্ঘদিন প্রচারিত ছিল।

শিবচন্দ্রের হাতেখড়ি হয় সাধক-সাহিত্যিক কাঙাল হরিনাথের কাছে। উত্তরকালেও শিবচন্দ্রের সাধনা ও সাহিত্যচর্চার উপর কাঙালের প্রভাব কিছুটা বিস্তারিত হয়।

পাঁচ বৎসর বয়সে বালককে স্থানীয় স্কুলে ভর্তি করিয়া দেওয়া হয়। এখানে জলধর সেন ছিলেন তাঁহার অন্যতম সহপাঠী।

কুমারখালি স্কুলে শিবচন্দ্র পড়াশুনা করিতেছেন, মেধাবী ছাত্র বলিয়া শিক্ষকদের প্রিয় হইয়াও উঠিয়াছেন, কিন্তু ইতিমধ্যে হঠাৎ সামান্য একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া তাঁহার জীবনের গতি পরিবর্তিত হইয়া গেল।

আজন্ম সুহৃদ্ জলধর সেন ইহার এক বিবরণ দিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন

শিবচন্দ্রের পিতা, আমাদের চন্দ্রকাকা, অত্যন্ত তেজস্বী ব্রাহ্মণ ছিলেন। শিবচন্দ্র তখন চরিতাবলী পড়েন।

সেই সময় চন্দ্রকাকা একদিন শিবকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'ও কি পড়িস্‌রে শিব?'

শিবচন্দ্র বলিলেন,—'ডুবালের গল্প।'

'ডুবালের গল্প? দেখি,' এই বলে বইখানা হাতে নিয়ে চার পাঁচ লাইন পড়ে সেটি দূরে নিক্ষেপ করে, বললেন,—'এইসব বুঝি পড়া হয়?' দেশে আর মানুষ নেই, মহাপুরুষ নেই—পড়িস কিনা ডুবালের গল্প। যাঃ কাল থেকে আর তোকে স্কুলে যেতে হবে না। এই ডুবালেই দেখছি দেশটা ডুবালে।

তেজস্বী ব্রাহ্মণের যে কথা সেই কাজ। পরদিন থেকে শিবচন্দ্র আর স্কুলে গেলেন না।

ইংরেজী স্কুলে পড়াশুনা করা এবং তাহার প্রতিশ্রুতিময় সম্ভাবনা শেষ হইয়া গেল। অতঃপর পিতা শিবচন্দ্রকে নবদ্বীপের এক চতুষ্পাঠীতে পাঠাইয়া দেন এবং সেখানেই গড়িয়া উঠে শিবচন্দ্রের শাস্ত্র-সাধনার ভিত্তি।

ব্যাকরণ, কাব্য, অলংকার অল্পকালের মধ্যেই তিনি আয়ত্ত করিয়া ফেলেন। বিশেষ করিয়া এই কিশোর ছাত্রের সহজাত কবিত্বের খ্যাতি স্থানীয় পণ্ডিত মহলে ছড়াইয়া পড়ে।

নবদ্বীপের সারস্বত জীবন তখন ছিল চাঞ্চল্যময় এবং প্রাণবন্ত। দেশবিদেশ হইতে প্রতিভাধর ছাত্রেরা এখানকার টোলে শাস্ত্রপাঠ করিতে আসিতেন। এ সময়কার স্মৃতিচারণ করিতে গিয়া শিবচন্দ্র উত্তরকালে তাঁহার বাল্যকালের সহজাত কবিত্ব শক্তির এক মনোজ্ঞ বর্ণনা দিয়াছেন :

নবদ্বীপের হর ভট্টাচার্য মহাশয়ের বার্ষিক শ্রাদ্ধ তত্রত্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিতসমাজে একটা বিশেষ বার্ষিক ব্যাপার বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। এই ব্যাপার শীতকালে অনুষ্ঠিত হইত। পৌষ কি মাঘমাসে তাহা আমার মনে নাই, উক্ত শ্রাদ্ধে নবদ্বীপ ও তাহার প্রান্তবর্তী

গ্রাম-সমূহের অধ্যাপক ও ছাত্রসমাজ সাদরে নিমন্ত্রিত হইতেন; বলা অধিক যে ব্যাকরণ, সাহিত্য, স্মৃতি ও ন্যায়শাস্ত্রের সকল টোলেই মাসাবধি পূর্ব হইতে ছাত্রগণ তর্কবিচারে 'শান' দিতে আরম্ভ করিতেন। উহা যেন ছাত্র সমাজের একটা বার্ষিক পরীক্ষার সময়, কে কাহাকে পরাজয় করিয়া নিজে কৃতী হইবে সে জন্য সকলেই বিশেষ ব্যস্ত।

আমার সেরূপ ব্যস্ততার কোনো কারণ ছিল না। ব্যাকরণের ছাত্র আমি,—আমার বিচার আচার কিসের? অন্যান্য ছাত্রগণের সহিত আমিও সেদিন নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়াছিলাম। গিয়া দেখি বিশাল সভা প্রাঙ্গণে কোথাও ন্যায়ের, কোথাও স্মৃতির, কোথাও সাহিত্যের, কোথাও ব্যাকরণের ছাত্রগণের দলে দলে একেবারে বিচার বিতর্কের দাবানল জ্বলিয়া উঠিয়াছে। সাত আট শত ছাত্র, দুই শতের অধিক অধ্যাপক—নানা শাস্ত্রের ভাষাভেদে বিচারের স্থানটি বিষম কোলাহলে পরিপূর্ণ। কেবল অধ্যাপক মধ্যস্থগণই যাহা কিছু নিস্তব্ধ। চতুর্দিকে পাঁচশতেরও অধিক শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ ও ভদ্রগণ শ্রোতা দর্শকরূপে দণ্ডায়মান।

তখনও পাকা টোলের ছাত্রগণ আসিয়া উপস্থিত হন নাই। এই টোলের ছাত্রসংখ্যা তখন শতাধিক এবং সকল ছাত্রই মৈথিলী ব্রাহ্মণ। কবিতার পাদপূরণ করিতে পারিতাম বলিয়া আমার কিছুটা খ্যাতি ছিল। আমি উপস্থিত হইবা মাত্রই সভার কর্তৃপক্ষগণ একটি দৃশ্য পদার্থ স্বরূপে আমাকে বিশেষ আদর করিয়া তদানীন্তন অধ্যাপক সমাজের শীর্ষস্থানীয় হরমোহন তর্ক চূড়ামণি, প্রসন্নকুমার ন্যায়রত্ন, ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন প্রভৃতি অধ্যাপকগণ সভার মধ্যস্থলে যেখানে উপবিষ্ট ছিলেন আমাকে তাঁহাদের নিকট আনিয়া বসাইয়া দিলেন।

আমি যেমন গিয়া বসা, অমনই সমস্যা পূরণের তরঙ্গ উঠিল। অধ্যাপকগণ অনেকেই এক একটি প্রশ্ন করিলেন, তাহার সকল-গুলিরই উত্তর দিতে লাগিলাম। এই কৌতুক দেখিবার নিমিত্ত

তারিণীচরণ চট্টোপাধ্যায় (ভারতবর্ষের ইতিহাস প্রণেতা ও সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যাপক) আনন্দবাবু প্রভৃতি তখনকার গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ আসিয়া আমাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইলেন।

এই সময় দেখিলাম—পাকা টোলের ছাত্রমণ্ডলী সেই সভায় আসিতেছেন। সে এক অদ্ভুত অপরূপ দৃশ্য। সকলেই হিন্দুস্থানী বস্ত্র পরিহিত, গলে রুদ্রাক্ষমালা, কপালে রক্তচন্দনের তিলক ত্রিপুণ্ড্র, মস্তকের শিখায় এক একটি জবাপুষ্প; অধিকাংশই সুদীর্ঘ মূর্তি এবং গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ—হন্ হন্ করিয়া দ্রুতপদে বিচারোন্মুখ স্ফুরিত ওষ্ঠাধরে তাঁহাদের সেই সভা প্রবেশ মনে করিলেও এক অপূর্ব দৈব দৃশ্য বলিয়াই বোধ হয়। যাহা হউক, তাঁহারা সভার মধ্যস্থলে আসিয়া মণ্ডলাকারে বসিলেন।

বিচারের চেষ্টা হইতেছিল কিন্তু সম্মুখেই আমার পাদপূরণের ঘটাঘট্ট এবং সুখ্যাতির গৌরবটা যেন তাঁহাদের কিছু অসহ্য বোধ হইল। তাঁহারা বিচারের দিক হইতে আমার দিকেই দৃষ্টি প্রসারণ করিলেন এবং হরমোহন তর্কচূড়ামণি মহাশয়কে বলিলেন, "আমরা একবার ইহার পরীক্ষা করিব। আমাদের প্রদত্ত সমস্যা যদি পূরণ করিতে পারে, তবেই ইহাকে কবি বলিয়া স্বীকার করিব, অন্যথায় নহে।"

এতদিন পর্যন্ত কখনও সমস্যা পূরণে আমার কোনো রূপ ভয়, বিভীষিকা বা আতঙ্ক উপস্থিত হয় নাই। কিন্তু আজ এই সকল মৈথিলী ছাত্রগণের এই ভীম ভৈরব মূর্তি আর ন্যায়শাস্ত্রের প্রখর বিদ্যার স্ফূর্তি, এই দুই দেখিয়া আমার মনে ভয়ের উদয় হইয়াছিল।

তাঁহারা ত্বরিত পদে আমার নিকট আসিয়া আকৃষ্ট মুষ্টি প্রসারণ পূর্বক সদম্ভে প্রশ্ন করিলেন, "সূচ্যগ্রে ষট্‌কুপং তদুপরি নগরী, তত্র গঙ্গা প্রবাহ।" অর্থাৎ একটি সূচের অগ্রভাগে ছয়টি কূপ, তাহার উপর এক নগরী, তাহাতে গঙ্গাপ্রবাহ।

শুনিয়া তো আমার চক্ষুস্থির। এ পর্যন্ত পাদপূরণের সময়ে

কখনও বিশেষ সময় লইয়া কোনোদিন কিছু চিন্তা করি নাই, প্রশ্ন শুনিবামাত্র তাহার উত্তর যখন যাহা মনে আসিয়াছে তখন তাহাই দিয়াছি, কিন্তু আজিকার প্রশ্নে সে চিন্তার আবশ্যক হইল বলিয়া লজ্জায় ভয়ে আড়ষ্ট হইলাম।

একটু চিন্তার পর আমার উত্তরের উপক্রম দেখিয়া পাণ্ডিত্য, এবং চাতুর্যের চূড়ামণি হরমোহন তর্কচূড়ামণি মহাশয় তখন আমাকে সাবধানতার ইঙ্গিতপূর্বক কহিলেন, "মুখে উত্তর করিও না, কাগজে লিখিতে হইবে।" ইহা বলিয়া দোয়াত কলম কাগজ আমার কাছে সরাইয়া দিলেন।

আমি একবার ঊর্ধ্বে দৃষ্টিপাত করিয়া সর্বান্তঃকরণে জগদম্বাকে স্মরণ করিয়া কবিতা লিখিলাম। আমার লেখা শেষ হইলে, চূড়ামণি মহাশয় আমার হাত হইতে কাগজখানি লইয়া শ্লোকটি মনে মনে পড়িয়া দেখিলেন, দেখিয়া তখন উহা মুষ্টিবদ্ধ করিয়া তারিণীচরণ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত যাবতীয় ভদ্রগণকে ডাকিয়া বলিলেন, "আপনাদিগকে একবার ইহার মধ্যস্থ হইতে হইবে। মৈথিল সমাজের সহিত নবদ্বীপ সমাজের চিরকাল বিদ্যার স্পর্ধা, তজ্জন্য আমি বলিতেছি, আজ মৈথিলী ছাত্র সমাজ এই বালকের প্রতি যে ভয়ঙ্কর কূট সমস্যার কঠোর বজ্র নিক্ষেপ করিয়াছেন, তাহা আপনারা স্বচক্ষে দেখিলেন, স্বকর্ণে শুনিলেন। এখন বঙ্গীয় বালকের দ্বারা এই মৈথিলী অধ্যাপকগণের কূট সমস্যার উত্তর যাহা হইল তাহা এই কাগজে লেখা আমার হাতে। আগে আমি উহা পড়িতে দিব না। ইহারা যে শ্লোকের এক চরণে আজিকার এই প্রশ্ন করিয়াছেন অবশ্য তাহার আরও তিন চরণ আছে—ইহা ধ্রুব নিশ্চিত। উঁহাদের দেশে এই সমস্যার উত্তরে সেই তিন চরণে কি লেখা আছে, তাহা না দেখিয়া না শুনিয়া আমরা আমাদের উত্তর উঁহাদিগকে দেখিতে দিব না। সেই তিন চরণ কি, অগ্রে আমাদিগকে বলুন।"

তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের কূট কৌশলে বাধ্য হইয়া তাঁহাদিগকে

উহা বলিতে হইল, দুই কবিতার সমালোচনার জন্য উহাও কাগজে লিখিয়া লইলেন। সেই তিন চরণের ভাব মাত্র আমার মনে আছে —অর্থাৎ চন্দ্র সূর্যের যদি গতি স্তব্ধ, জলে যদি অগ্নি জ্বলে, পর্বতের শিখরে যদি পদ্ম প্রস্ফুটিত হয়, তবেই এরূপ প্রশ্ন হয়।

তাঁহাদের সেই শ্লোকের ব্যাখ্যা সাধারণকে বুঝাইয়া দিয়া চূড়ামণি মহাশয় তখন আমার সমস্যা পূরণের শ্লোকটি আমাকে পাঠ করিতে বলিলেন। আমি উহা পড়িলাম এবং উহার অর্থও সাধারণকে বুঝাইয়া দিলাম। শ্লোকটির কিছুমাত্র এখন মনে নাই, তবে যাহা মনে আছে তাহা এই—মনুষ্য জীবনের অতি সূক্ষ্মাগ্র মনই সুতীব্র সূচ্যগ্রস্বরূপ, তাহারই উপরিভাগে ছয়টি কূপ—কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য; তদুপরি নগরী এই বিশাল সংসার, তন্মধ্যে গঙ্গা প্রবাহ—ইহলোক পরলোকে নিরন্তর যাতায়াত।

ইহা শুনিয়া মৈথিলীগণ নিজেরাই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিলেন "আমাদের যাহা শ্লোক আছে, এ শ্লোকের নিকট তাহা সমস্যাপূরণ বলিয়াই গণ্য নহে।"

তখন তর্কচূড়ামণি মহাশয়ও বলিতে লাগিলেন, "তবে বল তোমাদের দেশের প্রসিদ্ধ, প্রবীণ ও প্রাচীন অধ্যাপকগণ দ্বারা যাহা হয় নাই, আমাদের বঙ্গদেশের দশ এগার বৎসরের বালকের দ্বারা তাহা সম্পন্ন হইল। ইহাও জানিয়া রাখিবে, এই বালক আমাদের নবদ্বীপ সমাজের গৌরব পতাকা।"

মৈথিলীগণ সানন্দে তাঁহার সে কথা স্বীকার করিয়া সহাস্য বদনে আমাকে যথেষ্ট আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন, "বালক আজ শুধু কবি নয়, 'কবিরত্ন' বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়া বাঙালীর—বিশেষত নবদ্বীপ পণ্ডিতসমাজের মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন।

এ সভাতেই বালককালে সর্বসম্মতিক্রমে আমার কবিরত্ন উপাধি লাভ হইল[১]।

---

১ বীরাচারী তন্ত্রসাধক শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব: বসন্তকুমার পাল, হিমাদ্রি...কা ২৯শে পৌষ, ১৩৭২

সংকোচবশত নবদ্বীপের প্রবীণ পণ্ডিতদের প্রদত্ত এই উপাধি কিন্তু শিবচন্দ্র জীবনে কখনো ব্যবহার করেন নাই।

শিবচন্দ্রের মেধা ও প্রতিভা দেখিয়া এ সময়ে যে সব অধ্যাপক বিস্মিত হন তাঁহাদের মধ্যে দু'একজন প্রস্তাব করেন, শিবচন্দ্রকে সংস্কৃত কলেজে পড়ানো হোক। কিন্তু শিবচন্দ্রের রক্ষণশীল পিতা ও পিতামহের সম্মতি মিলিল না, কারণ সেখানেও ইংরেজীর ছোঁয়াচ রহিয়াছে। নবদ্বীপের টোলেই উচ্চতর পাঠ তিনি সমাপ্ত করিলেন। পারঙ্গম হইয়া উঠিলেন ব্যাকরণ, সাহিত্য, স্মৃতি ও দর্শনশাস্ত্রে।

সংস্কৃত টোলের অধ্যয়ন শেষে শিবচন্দ্র কলিকাতায় গিয়া বিদ্যাসাগর উপাধি পরীক্ষা দেন, এই পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণও হন। কিন্তু এই বিদ্যাসাগর উপাধি গ্রহণেও তাঁহাকে সে সময়ে রাজী করানো যায় নাই।

তিনি দৃঢ়স্বরে সাইকে বলেন, "ভেবে দেখলাম, আমার গুরু-স্থানীয় জীবনানন্দ বিদ্যাসাগর মহাশয় বেঁচে থাকতে 'বিদ্যাসাগর' উপাধি ব্যবহার করা আমার পক্ষে সমীচীন হবে না। এতে তাঁর অসম্মান করা হবে। কাজেই এ উপাধি আমি বর্জন করছি।"

সমবেত পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁহার এ কথা শুনিয়া মহা সমস্যায় পড়িলেন। অতঃপর অনেক কিছু ভাবিয়া চিন্তিয়া তাঁহারা শিবচন্দ্রকে ভূষিত করিলেন বিদ্যার্ণব উপাধিতে। উত্তরকালে এই উপাধি দ্বারাই জনসমাজে তিনি পরিচিত হইয়া উঠেন।

পরীক্ষা, উপাধি, এসব সম্পর্কে তরুণ শিবচন্দ্রের আর যেন তেমন উৎসাহ নাই। বরং এই বয়সেই অধ্যাত্মজীবনের আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিয়াছে তাঁহার অন্তরে। জন্মান্তরের শুভ সংস্কার নিয়া জন্মিয়াছেন, তদুপরি রহিয়াছে পিতা ও পিতামহের শাস্ত্রজ্ঞান ও সাধনার বীজ। বংশের বৈশিষ্ট্য হইতেছে তান্ত্রিক সাধনা—এই সাধনার দিকেই তিনি নিয়ত আকৃষ্ট হইতেছেন। জগজ্জননী তারা-মায়ের অমোঘ আহ্বান হৃদয়ে দোলা দিতেছে বার বার।

'বিদ্যাসাগর' উপাধি ত্যাগের সময় শিবচন্দ্র তাঁহার তারা-মায়ের

উদ্দেশ্যে একটি কবিতা লিখেন। তরুণ বিদ্যার্থী কিভাবে অধ্যাত্ম-জীবনের পথে এ সময়ে মোড় নিতেছেন, এই ভাবময় কবিতাটিতে তাহার চিহ্ন পরিস্ফুট :

ভাইরে! আর কি কর বিদ্যার সাধন
মহাবিদ্যা মাকে ভুলে?
যাত্রা কর সেই পরীক্ষায় তারানামের
নিশান তুলে॥
তারা বিদ্যা, তারা শিক্ষা, তারা বিশ্ববিদ্যালয়।
শাস্ত্র তারা, ছাত্র তারা, স্বয়ং গুরু তারাময়॥
যত দেখ দর্শন শাস্ত্র (ওরে) তারার দর্শন
কিছুতেই নয়।
ওরে, সব অদর্শন, যদি আমার তারা মায়ের
দর্শন না হয়॥
তারা পদাম্বুজ প্রান্তে যারা করে তারা লয়।
এই তারাতেই তারা দেখে যায়রে
তারা তার আলয়॥
তারা মায়ের মায়া বলব কি ভাই।
হ'লে পরে মহা প্রলয়।
শব হয় এসব, তবু সে সব—ভাইরে
মা মোর কোলে লয়॥
ভাই—এ সময় ভাই। সময় থাকতে বল
—জয় জয় তারার জয়।
যে বলে সেই তারার জয় জয়, সেই
করে সেই তারার জয়॥
তাই—তারা হয়েও তারার জয় নাই,
কেবল তারার ছেলের জয়।
অধিকন্তু, তারার জয়ে—তারা হয় রে
মৃত্যুঞ্জয়।

অধ্যাত্ম-জীবন গঠনের স্পৃহা ক্রমেই বাড়িয়া উঠিতেছে। তাই শিবচন্দ্র এবার অধ্যাত্ম-ভারতের মর্মকেন্দ্র কাশীতে গিয়া উপস্থিত হন। শাস্ত্র পাঠ, ধর্মদর্শনের আলোচনা ও সাধনভজন সব কিছুরই সুযোগ-সুবিধা এখানে রহিয়াছে। শিবচন্দ্র এই সুযোগ সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করার জন্য তৎপর হইয়া উঠেন। প্রসিদ্ধ বেদান্তী, শতাধিক বর্ষীয় আচার্য, রামরাম স্বামীর নিকট এ সময়ে তিনি বেদান্তের পাঠ নিতে থাকেন।

আগম নিগমের রহস্যবেত্তাও কাশীধামে কয়েকজন আছেন। ইঁহাদের পদপ্রান্তে বসিয়া তন্ত্রশাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্ব শিক্ষা করিতে শিবচন্দ্র সচেষ্ট হন।

অসামান্য মেধা ও প্রতিভা নিয়া তিনি জন্মিয়াছেন। তাই অল্প সময়ের মধ্যে ষড়দর্শনের মর্ম এবং সাধনভজনের বিভিন্ন পন্থা সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করিতে তাঁহাকে দেখা যায়।

কাশী হইতে ফিরিয়া আসিয়া শিবচন্দ্র নিজ জীবনের লক্ষ্য এবং আদর্শ স্থির করেন। তন্ত্রতত্ত্ব ও তন্ত্র সাধনায় পারঙ্গম হইবার জন্য হন কৃতসংকল্প।

পিতামহ কৃষ্ণসুন্দর ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ তান্ত্রিক। তন্ত্রশাস্ত্র ও তান্ত্রিক ক্রিয়ায় তাঁহার পারদর্শিতার কথা সারা নদীয়া জেলায় পরিব্যাপ্ত। শিবচন্দ্র তাঁহারই নিকট হইতে তন্ত্রসাধনার পাঠ নেওয়া স্থির করিলেন।

কৃষ্ণসুন্দর আনন্দে উল্লসিত হইয়া উঠেন, বলেন, "শিব, তুমি যে আমাদের বংশের ঐতিহ্য অনুযায়ী শক্তিসাধনায় রত হতে চাও, তন্ত্রতত্ত্ব আয়ত্ত করতে চাও, এ অতি উত্তম কথা। জানতো, আমাদের বংশেই জন্মেছেন তন্ত্রসিদ্ধ মহাপুরুষ কামদেব, জয়দেব, নিমানন্দ প্রভৃতি। এদের শক্তি বিভূতির কথা আজো মধ্য বাংলার সাধক ও পণ্ডিতেরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে থাকেন। এই সব সিদ্ধ-পুরুষদের ধারা তোমার ভেতর দিয়ে বয়ে চলুক, এই তো আমি চাই। কিন্তু এজন্য তোমাকে চলতে হবে একটা সুনির্দিষ্ট পথ অনুসরণ ক'রে।"

শিবচন্দ্র উত্তরে বলেন, "কি করতে হবে, আজ্ঞা করুন। শক্তি আরাধনার জন্য আমি বদ্ধপরিকর। আরও স্থির করেছি, তন্ত্র সাধনা সম্বন্ধে লোকের মনে, বিশেষ ক'রে এ যুগের শিক্ষিত মানুষের মনে, যে ভুল ধারণা আছে তা দূরীভূত করবো।"

"এজন্য তো প্রস্তুতি চাই, ভাই।"

"আপনি আমায় নির্দেশ দিন কি করতে হবে, এজন্য জীবন দিতেও আমি কুণ্ঠিত হবো না।"

"দুটো কাজ তোমায় করতে হবে। তুমি আনুষ্ঠানিক দীক্ষা গ্রহণ করো, তন্ত্রাভিষেক গ্রহণ করো এবং তন্ত্রোক্ত ক্রিয়া সম্যক্‌ভাবে আয়ত্ত করো। এই সঙ্গে তন্ত্রের প্রকৃত শাস্ত্রতত্ত্ব ও গূঢ় রহস্যের সঙ্গে পরিচিত হয়ে ওঠো।"

"এ সম্পর্কে আপনি যা করতে বলবেন, যেখানে যেতে বলবেন, আমি সেজন্য প্রস্তুত।"

"কোথাও তোমায় যেতে হবে না। আমাদের এই গৃহেই রয়েছে প্রাচীন তন্ত্রশাস্ত্রের বহুতর প্রাচীন পুঁথি। পিতৃপুরুষেরা এগুলো বহুকাল ধরে সংগ্রহ ক'রে আসছেন বাংলার প্রাচীন তন্ত্রাচার্যদের কাছ থেকে। নেপাল ও তিব্বত থেকেও আনীত হয়েছে তালপত্রে ভূর্জপত্রে লেখা কিছুসংখ্যক মূল্যবান পুঁথি। এগুলো তুমি আমার কাছে বসে অধ্যয়ন করো। শক্তি সাধনার শাস্ত্রীয় ভিত্তি দৃঢ় ক'রে তোল। আমি আশীর্বাদ করছি, অচিরে তুমি তন্ত্রসিদ্ধ হও, পরিণত হও তন্ত্রের বিশিষ্ট আচার্যরূপে।"

অভিজ্ঞ ও প্রবীণ তান্ত্রিক বলিয়া পিতামহ কৃষ্ণসুন্দরের সুনাম ছিল। শিবচন্দ্র অবিলম্বে তাঁহার নিকট হইতে গ্রহণ করিলেন শাক্তী দীক্ষা। এই সঙ্গে শুরু করিলেন আগম নিগম শাস্ত্রের চর্চা। প্রাচীন ও দুর্লভ যে সব পুঁথি গৃহে সযত্নে সঞ্চিত ছিল, এবার সেগুলি তিনি যত্ন সহকারে পাঠ করিতে থাকেন। ফলে তন্ত্রের শাস্ত্রীয় ভিত্তিটি তাঁহার জীবনে দৃঢ়তর হইয়া উঠে। শুধু তাহাই নয়, কয়েক বৎসরের মধ্যে কৌল সাধন ও কৌল শাস্ত্রের প্রকৃত স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে তিনি সফলকাম হন।

এই সময় ভেড়ামারা গ্রামের চিন্তামণি দেবীর সহিত শিবচন্দ্রের বিবাহ হয়। কিন্তু এই পত্নী বেশী দিন জীবিত থাকেন নাই, একটি শিশু কন্যা রাখিয়া তিনি লোকান্তরে চলিয়া যান। পরবর্তীকালে পিতা চন্দ্রকুমারের আগ্রহে ও নির্দেশে আবার শিবচন্দ্রকে গার্হস্থ্য জীবনে প্রবেশ করিতে হয়। ঐ স্ত্রী ছিলেন কুমারখালি গ্রামের কন্যা, নাম—মনমোহিনী দেবী।

আজীবন ঘর সংসারে অবস্থিত রহিয়াছেন শিবচন্দ্র, দেশের মানুষ ও সমাজকে ভারতের আত্মিক-জীবনের প্রেরণায় করিয়াছেন উদ্বোধিত, আর তন্ত্রতত্ত্বের প্রচারে করিয়াছেন আত্মনিয়োগ। কিন্তু তাঁহার সমস্ত কিছু অস্তিত্ব, সমস্ত কিছু কর্মোদ্যমের অন্তরালে সদা-বিরাজিত রহিয়াছেন তাহার ইষ্টদেবী সর্বমঙ্গলা মা। এই মায়ের কৃপায় ও মায়ের সাধনায় তাঁহার জীবন হইয়াছে দিব্য আনন্দ ও চৈতন্যে ভরপুর। উত্তর জীবনে এক তন্ত্রসিদ্ধ মহাপুরুষরূপে ঘটিয়াছে তাঁহার অভ্যুদয়।

তরুণ বয়সেই আপন জীবনের আদর্শ ও লক্ষ্য শিবচন্দ্র স্থির করিয়া ফেলেন। তন্ত্রসাধনায় সিদ্ধকাম হইবেন এবং তন্ত্রশাস্ত্রের প্রকৃত স্বরূপ ও মাহাত্ম্য সর্বত্র প্রচার করিবেন—এই সংকল্পটি তাঁহার মনে ধীরে ধীরে দানা বাঁধিয়া উঠে।

জন্মগত সংস্কারের প্রভাবে শিবচন্দ্র স্বভাবতই মাতৃসাধনায় উদ্বুদ্ধ। ভট্টাচার্য বংশের পুরাতন তান্ত্রিক ঐতিহ্য এবং নিমানন্দ প্রভৃতি সিদ্ধ কৌলদের কাহিনী বাল্যকাল হইতে দৃঢ়মূল হইয়া বসিয়া গিয়াছে তাঁহার অন্তরে। এবার তাঁহাদেরই অনুসৃত সাধনপন্থা তিনি গ্রহণ করিলেন একনিষ্ঠভাবে।

এই তন্ত্র সাধনা শুরু করার কয়েক বৎসরের মধ্যেই সিদ্ধিলাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠেন শিবচন্দ্র। শিবধাম বারাণসীতে বেদান্তী যোগী তান্ত্রিক বৈষ্ণব সকল সাধকেরই আনাগোনা। প্রকাশ্যে এবং প্রচ্ছন্ন-ভাবে মাঝে মাঝে প্রাচীন ও শক্তিধর তন্ত্রসাধকেরা এখানে আসিয়া

অবস্থান করেন। উচ্চকোটি সাধক মহলে প্রায়ই ব্যাকুলভাবে খোঁজাখুঁজি করেন শিবচন্দ্র। ইঁহাদের আস্তানা বাহির করিয়া, ঘনি সান্নিধ্যে বাস করেন, শিক্ষা করেন সাধনার নানা নিগূঢ় পদ্ধতি।

শিবচন্দ্রের প্রধান শিষ্য এবং দীর্ঘ দিনের সহচর দানবাি গঙ্গোপাধ্যায় বলিয়াছেন, "কাশীধামে থাকার কালে একবার দেখ যায়—জটাজূট সমন্বিত, রক্তচক্ষু, এক অতি প্রাচীন তান্ত্রিক মহাত্মার পিছনে পিছনে শিবচন্দ্র ঘোরাফেরা করিতেছেন। এ সময়ে মণি কর্ণিকার শ্মশানে অমাবস্যার নিশীথ রাত্রে কয়েকটি নিগূঢ় ক্রিয়া এ সময়ে ঐ মহাত্মার সাহায্য নিয়া অনুষ্ঠান করেন। নিজের দৃ সংকল্প, দুর্জয় সাহস ও একনিষ্ঠার ফলে শিবচন্দ্র মহাত্মাটির বিশেষ কৃপ লাভ করেন এবং তন্ত্রসাধনার কয়েকটি সিদ্ধি তাঁহার করায়ত্ত হয়।

অতঃপর কাশী হইতে শিবচন্দ্র স্বগ্রাম কুমারখালিতে ফিরিয় আসেন। এখন হইতে জগন্মাতার দর্শনের জন্য তিনি অধীর হইয় উঠেন, মত্ত হন প্রচণ্ড সাধন সমরে। দেখি, ছেলে হারে কি ম হারে—এই ভাব! সারা দিন রাতের অধিকাংশ সময় কাটিয়া যা মাতৃপূজায় আর মাতৃধ্যানে। আর অমাবস্যার নিশি আসিলেই গভীর রাত্রের সূচীভেদ্য অন্ধকারের মধ্যে উপবেশন করেন গ্রামে উপান্তে মহাশ্মশানে। চারিদিকে কঙ্কাল করোটির ছড়াছড়ি, আ মাঝে মাঝে দুই একটি চিতার আগুনে দগ্ধ হইতেছে শবদেহ।

তন্ত্রোক্ত সাধন-উপচার সঙ্গে নিয়া শিবচন্দ্র শ্মশানে বসিয়া সমা করেন তাঁহার নিগূঢ় ক্রিয়া অনুষ্ঠান। 'তারা তারা' শব্দে উত্থিত হ তাঁহার ভীমভৈরব আরাব। তারপর স্বরচিত সাধন সংগীতের মধ দিয়া শুরু হয় তাঁহার প্রাণের আকুতি। ইষ্টদেবীর চরণে সিদ্ধি সংকল্প নিবেদন করেন বার বার :

স্বয়ম্ভু-শয়নে নিদ্রা পরিহরি,—
ষড়দলে সুষুম্না পথ ভেদ করি,
জাগো জাগো, মহা-যোগ যোগেশ্বরী,
সে যোগ সংযোগে জা-গো।

ঢুলু ঢুলু আঁখি উন্মীলন করি,
চাহগো চিন্ময়ি! নিদ্রা পরিহরি,
ব'স দিগম্বর-হৃদে দিগম্বরী,
ঘুচাও মা বিরাগ ॥
নব অনুরাগে মাত মাতঙ্গিনি!
মহাকাল-হৃদে কাল কাদম্বিনী
দোল দোল দিগম্বর নিতম্বিনি;
পুরাও যে সোহাগ।
সোহাগের ভরে সাদরে অধরে,
ধর কাদম্বিনী করাম্বুজ পরে,
মাতি শিবানন্দে, মাতাও শিবচন্দ্রে
(দাও) স্বধাম-সমাধি যোগ।
কুল মন্ত্রময়ি! কুল তন্ত্র মাঝে
কুল কুণ্ডলিনি! কুলযন্ত্র বাজে
সে কুল-কুণ্ডলে, এলোকেশী সাজে
একবার সাজগো!
লয়ে কুল-নাথে কুল সমী কুলে
কুল যজ্ঞে পূর্ণাহুতি দাও মা! কুলে
সে আহুতি তরে ও যন্ত্র কুহরে।
জানত মা! আজ জা-গো।

অনন্ত কোটি বিশ্বের মহাবিস্তারে, অনাদ্যন্ত এ সৃষ্টিতে শিবচন্দ্রের আরাধ্যা জননী মহাকালীর লীলা বিস্তারিত। ব্রহ্মানন্দের লহরী লীলায় নিরন্তর চলে তাঁহার লীলাবিলাস। এ লীলা বৈচিত্র্যের বর্ণনা দিয়াছেন শিবচন্দ্র অন্তরের ভাব গদ্‌গদ ভাষায়। শুধু ভাবের ঐশ্বর্য নয়, বাংলা গদ্যের নিটোল মাধুর্য ও বলিষ্ঠতার প্রকাশ দেখি তাঁহার এই বর্ণনায়ঃ

"আমরি মরি মরি! কি মধুর ভৈরব নিস্তব্ধতা! আর কিন্তু

অনন্তশান্তি প্রস্রবণ। আনন্দময়ী মায়ের আমার ব্রহ্মানন্দ লহরী যেন কৈবল্যধাম হতে নিষ্যন্দিত হয়ে এই ধরাধাম বিপ্লবিত করেছে। আমরি! আমরি! অমাবস্যার মহানিশার এই নবনীরদ নিবিড় নীল সৌন্দর্য সাগরে পূর্ণিমার পূর্ণেন্দু চন্দ্রিকা কি আজ জলবুদ্বুদ বিন্দু বলিয়া বোধ হয় না? উর্ধ্বে এই অনন্ত আকাশ, নিম্নে এই বিশাল বিস্তীর্ণ ধরিত্রীমণ্ডল—ইহারই আবার মধ্যস্তরে কখন শূন্য, কখন পূর্ণ, কখন বায়ু, কখন অগ্নি, কখন মেঘ, কখনও বিদ্যুৎ, কখন বৃষ্টি, কখন রশ্মি—কত রঙ্গে কত তরঙ্গ কতবার আসছে, কতবার যাচ্ছে, কার সাধ্য তাহার ইয়ত্তা করে?

"শুধুই কি এই? এর মধ্যে আবার কত চন্দ্র সূর্য কত গ্রহপুঞ্জ নক্ষত্রলোক স্তরে স্তরে সুসজ্জিত। জ্যোতিষ্কমণ্ডলের এই সমুজ্জ্বল জ্যোতিঃপুঞ্জ এক জ্বলছে আর নিভ্‌ছে, যেন সুবর্ণময় কুসুমস্তবক খচিত প্রসারিত নীলাম্বরের উদ্দীপ্ত অঞ্চল বায়ুবেগে একবার উড়ছে, একবার পড়ছে—আর সেই সঙ্গে সঙ্গে এই চন্দ্র সূর্য এবং গ্রহ নক্ষত্র জ্যোতিষ্কদামও যেন অয়ন ঋতু তিথি ভেদে এক একবার জ্বলে উঠছে, অঞ্চলের পরিবর্তনে আবার যেন নিভে যাচ্ছে—কখন দিন, কখন রাত্রি, কখন সন্ধ্যা, কখন বা মধ্যাহ্ন। কখন শীত, কখন গ্রীষ্ম, কখন শরৎ, কখন বসন্ত, কখন পূর্ণিমা, কখন অমাবস্যা, কত নিত্য নব পরিবর্তন এ অঞ্চলে একবার উঠছে একবার পড়ছে—অথচ লোকে দেখছে—আকাশ কেবল শূন্য শূন্য বই আর কিছুই নয়। এমন অসীম পূর্ণতা কি আর কোথাও সম্ভবে?

"এই অসীম অনন্ত আকাশের নামই অম্বর—অসম্বর স্বরূপিণী দিগম্বরী মা আমার এই অম্বরে গা ঢাকা দিয়েছেন। পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতনী যাকে নিজের আবরণ করেছেন, সে যদি শূন্য হয় তবে আর পূর্ণ কার নাম? উর্ধ্বে দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া বলি তা'ত হল—আবরণ বলেই কি এমন ক'রে গা ঢাকা দিতে হয় যে—স্বর্গ, মর্ত, রসাতল, আকাশ পাতাল—কোথাও আর খুঁজে সন্ধান পাবার উপায় নাই। তুমি গা ঢাকাই দাও আর যাই করো, ও অসম্বর স্বপ্রকাশ স্বরূপ

তোমার অম্বরে কি গা ঢাকে মা? আমার কিন্তু দেখে বোধ হয়, খেলার ঘোরে উন্মাদিনী বালিকা যখন আপন ভাবে আপনি আত্মহারা হ'য়ে বসনভূষণ দূরে ফেলে খেলতে খেলতে এক দিগন্ত হতে অন্য দিগন্তে ছুটে পালায়, তেমনি কি জানি কি খেলার ঘোরে, আপন ভাবে বিভোর হ'য়ে, মা তুই তোর এই দিগম্বর ছুঁড়ে ফেলে উন্মাদিনী উলঙ্গিনী সেজে যেন কোন নিভৃত দিগন্তে গিয়ে কোথায় আবার কি খেলা খেলছিস্। তাই তোর অভাবে তোর বসন এই পূর্ণ আকাশও আজ শূন্য হয়ে পড়ে আছে, অম্বরের অঞ্চলে এই স্তরে স্তরে কত চন্দ্র সূর্য গ্রহ নক্ষত্র প্রকৃতির সোহাগের হিল্লোলে ও অভিমানে ধূলায় পড়ে গড়াগড়ি দিচ্ছে।"

বড় ভয়ঙ্করা, বড় মধুরা, বড় স্নেহময়ী শিবচন্দ্রের এই ইষ্টদেবী। এই দেবীকে সাধনসমরে পরাভূত করিতে হইবে, সাধক শিবচন্দ্রের হৃদয়সাগরে ঘটাইতে হইবে তাঁহার জ্যোতির্ময় পূর্ণ প্রকাশ :

কে রে, শ্যামা ত্রিভঙ্গিনী।
অলস আবেশে খল খল হাসে,
একাকিনী তবু সমর রঙ্গিণী।
প্রেমে টলমল অরুণ কমল,
মদে ঢল ঢল ত্রিনয়নী।
গলিত বসনে, দলিত রসনে
মধুর হাসনে মনোমোহিনী।
মুক্ত মহাকালে, নৃত্য তালে তালে,
নিত্য লীলাময়ী উন্মাদিনী।
শিবচন্দ্র হৃদি—আনন্দ জলধি
তরল তরঙ্গে চন্দ্রাননী।

"নাচ মা মোর এলোকেশী"—ভাবের ঘোরে এই গান প্রায়ই গাহিয়া উঠিতেন শিবচন্দ্র। হৃদয়াকাশের অন্তহীন গহ্বর, আর বিশ্ব

সৃষ্টির আদি অন্তহীন মহাবিস্তার, এই দুইয়েতেই রহিয়াছে পরাশক্তি জগজ্জননীর এলোকেশ বিস্তারিত। সর্বত্রই শিবচন্দ্র দর্শন করেন মহামায়ার মায়া। আদরের সন্তান তাঁহার ভাবরসে আপ্লুত হইয়া মাকে এই মায়া প্রসঙ্গে যাহা বলিয়াছেন, অধ্যাত্ম-সাহিত্যে তাহার তুলনা খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। তিনি বলিয়াছেন :

"মা, তুমি মায়া বিজয়িনী কিন্তু মায়া বিধ্বংসিনী নও, যেহেতু তুমি মা, ত্রিলোকলোচনের আলোকরূপিণী, মায়া তোমার নিবিড় অন্ধকারময়ী তমঃ শক্তি, আঁধার আলোকের শরণাগত, তাই মায়া তোমার চরণাশ্রিতা, ভাব দেখিয়া আমার বোধ হয়, মা! এই মায়াই তোমার আলুলায়িত কেশপাশ, তাই নিত্য-লীলায় নিত্যধামে তোমার ঐ নিত্য মূর্তির উপাদান কুঞ্চিত কেশকলাপরূপে অনিত্য জগৎ প্রসবিত্রী মায়াকেও তুমি স্থান দিয়াছ, মায়া তোমারি ইচ্ছায় উৎপন্না, তোমারই অবলম্বনে অবস্থিতা। তুমি যদি তোমার শ্রীঅঙ্গে তাহার অবস্থান অঙ্গীকার করিয়া স্থান না দিতে, তবে কি মায়ার সত্তা বলিয়া জগতে কোনো পদার্থ থাকিত? তবে কি মায় কেশরূপে হেলিয়া দুলিয়া, তোমার সোহাগ ভরে ঢলিয়া ঢলিয়া চর চুম্বনের অধিকার পাইত? .

"মায়া লীলার অভিনয়ে কেশরূপে পরিণত তোমারই সচেত কেশকলাপ যখন সংযত মস্তকে সম্বদ্ধ ছিল···তখন ভাবিয়া দেখিব ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি, সংহার যাঁহাদিগের এক এক কটাক্ষের ফ তাঁহারা যাঁহার চরণতলে ধূলায় লুণ্ঠিত—আমরা তাঁহার মস্তকে বাস করি, ইহা অপেক্ষা বিষম ধৃষ্টতার বিষয় আর কি আছে ভক্ত বলিয়া ত্রিজগৎ যাঁদের চরণাম্বুজের মকরন্দ মধুপানে নিত অধিকারী—আমরা তাঁহার নিত্য দেহের নিত্যসঙ্গী অঙ্গীভূ হইয়াও সে চরণ সেবায় নিত্য বঞ্চিত, ইহা অপেক্ষা বিধির বিড়ম্ব তো আর নাই। ভাবিয়া চিন্তিয়া, কেশপাশ সহসা যেন চরণতলে খসিয়া পড়িল। কেবল পড়িল তাহা নহে, না জানি কি কি মাধুর্যে রসাস্বাদে চরণযুগল বেড়িয়া ধরিল, আর মকরন্দ মধুপানে ভাবে

ভরে বিভোর হইয়া হেলিয়া দুলিয়া, ঢলিয়া ঢলিয়া নাচিতে নাচিতে খেলিতে লাগিত, ফুল্ল কমলে ভ্রমরমালা মধুমত্ত হইয়া যেন ঝাঁকে ঝাঁকে উড়িয়া একবার এপাশে একবার ওপাশে ঝঙ্কার দিয়া পড়িতে লাগিল, মঞ্জীররব সংশিঞ্জিত চরণাম্বুজ বেড়িয়া যেন সেই নৃত্যের তালে তালে আপন গান সংযোজিত করিল।

"চির নিগড় বন্ধনগ্রস্ত সংসার কারারুদ্ধ জীব আমরা, তাই তোর মুক্ত কুন্তলকলাপকান্তি ত্রিতাপ তপ্ত হৃদয়ে শান্তির অনন্তধারা ঢালিয়া দেয়। কেশপাশ হেলিতেছে দুলিতেছে, খেলিতেছে আর তারই সঙ্গে সঙ্গে নাচিয়া নাচিয়া প্রেমানন্দে ঢলিয়া পড়িতেছে। ঐ পতিতপাবন বন্ধনমোচন দৃশ্য দেখিয়া প্রাণ যেন আনন্দে নাচিয়া উঠে।

বলিব কি মা! কালোরূপে ঐ এলো চুলে কেমন যে দেখায় মা! তাহা বলিবার নহে, শুনাইবারও নহে, দেখাইবারও নহে, কেবল প্রাণ ভরিয়া দেখিবার কথা। কিন্তু মা! দেখিবে কে? প্রাণে তুমি না জাগিলে নয়নে তোমায় দেখা যায় না। মুক্ত জীব না হইলে কেহ কি কখন মুক্তকেশীর স্বরূপ রূপ দর্শনের অধিকারী হয়? এই জন্য এলোকেশী রূপে নৃত্যনিরতা মায়ের স্বরূপ দর্শন লালসায় সাধককুল সর্বদা লালায়িত। যে ভক্তের নয়নে মুক্তকেশী পাগলী মেয়ের আহ্লাদ-বিহ্বল রূপের ক্ষণপ্রভা মুহূর্তের জন্য পতিত হইয়াছে, তাহার মন আর বিশ্বের কোনো রূপেই আকৃষ্ট হয় না। তাহার চিত্ত মধুকর করুণাময়ীর চরণ সরোজের মধুপানে নিরন্তর বিভোর হইয়া থাকে। বহুবিধ সন্তাপে তাপিতচিত্ত জীব যদি একবার কালভয় নিস্তারিণী কালীর অভয় চরণে শরণাগত হয়, বিবিধ সমস্যা সমাকীর্ণ সংসারক্ষেত্রে আর তাহাকে বিড়ম্বিত হইতে হয় না। ব্যথিতপ্রাণ সন্তানকুলকে এই রহস্যময় তত্ত্বকথা স্মরণ করাইয়া অভয়দান করিবার জন্যই অভয়ামায়ের এই মুক্ত কেশলীলা[১]।"

মাঝে মাঝে অতীন্দ্রিয় দিব্য দর্শন ঘটিতেছে। চকিতে আবির্ভূত

---

১. হিমাদ্রি পত্রিকা ১৩ই মাঘ ১৩৭৩

হইয়া জগজ্জননী, তাঁহার আদরিণী মা সর্বমঙ্গলা, আবার তেমনি চকিতে হইতেছেন অন্তর্হিত। কত ভাবে, কত ঐশ্বর্যেই না দর্শন দেন ষড়ৈশ্বর্যময়ী। কখনো আসেন রণরঙ্গিণী বেশে। কখনো করুণাময়ী বরাভয়দায়িনী, কখনো বা তিনি স্নেহপীযূষময়ী সত্যকার জননী। ধ্যানসিদ্ধ মহাপুরুষ মায়ের এই লীলাময়ী রূপ দর্শনের কথা বিবৃত করিয়াছেন তাঁহার সংগীতে :

এই দেখছি শ্যামাঙ্গিনী
হচ্ছে আবার হেমাঙ্গিনী।
এই দেখ্‌ছি মা রক্তবস্ত্রা,
অমনি দেখি উলঙ্গিনী।
এই যে মা তোর বেণী বন্ধ,
আবার দেখি মুক্তকেশী।
এই দেখি ভ্রূকুটী ভঙ্গী,
আবার দেখি আসছে হেসে।
এই দেখি মা তীক্ষ্ণ অসি,
শোভিছে বাম করোপরে।
এই দেখি মা জপের মালা,
ঘুরিছে ঐ দক্ষিণ করে।
এই দেখি মা সিংহাসনে,
আবার দেখি পদ্মাসনে।
আবার দেখি ঘোর শ্মশানে,
নাচছ শব শিবাসনে।
এই দেখি কিশোরী, মাগো,
হচ্ছ আবার ষোড়শী।
অমনি ভীমা ধূমাবতী,
অমনি রম্যা রূপসী।
এই দেখি মা দৈত্যের জিহ্বা,
ধরেছ ওই বাম করে।

আবার দেখি দক্ষিণ হস্তে
অভয় দিচ্ছ অমরে।
এই দেখি মেতেছ, মাগো!
শত্রুর সনে সমরে।
আবার দেখি পুত্র স্নেহে,
ঝরছে দুধ ওই পয়োধরে।
এই দেখি মা ত্রিনয়নে,
চন্দ্র সূর্য অগ্নি জ্বলে।
আবার দেখি সেই নয়নে,
করুণা কটাক্ষ গলে।

মায়ের করুণা কটাক্ষ আর রুদ্র রোষ দুইকেই মায়ের দান হিসাবে শিরোধার্য করিতেন সাধক শিবচন্দ্র। সর্বমঙ্গলা মায়ের আদরের দুলাল রূপে পরিচিত ছিলেন তিনি। কিন্তু তাঁহার এই আদরের দুলালকে মা জীবনে কম দুঃখকষ্ট দেন নাই, পরীক্ষার আগুনেও কম দহন করেন নাই। কিন্তু মাতৃগতপ্রাণ সাধক সকল কিছু সহ্য করিয়াছেন অম্লানবদনে।

তখন শিবচন্দ্র স্বগৃহ কুমারখালিতে বাস করিতেছেন। মাতৃ-পূজায় আর মাতৃধ্যানে সদাই তিনি বিভোর থাকেন। সংসারের আয় তেমন কিছুই নাই, আকাশবৃত্তি গ্রহণ করিয়া আছেন, যেদিন যাহা কিছু মায়ের ভোগরাগের জন্য উপস্থিত হয় তাহাতেই গৃহের সবাই করেন উদরপূর্তি।

প্রায় দুই দিন হয় অন্ন সংস্থান নাই। কোনো মতে দুই একটি ফল সংগ্রহ করিয়া দেবী সর্বমঙ্গলার ভোগ দেওয়া হইতেছে।

সব চাইতে বিপদ শিশুকন্যা কালীকুমারীকে নিয়া। তাহার খাদ্য যোগাড় না করিলে তো চলিবে না। পত্নী চিন্তামণি দেবী তাই অনাহারে দুশ্চিন্তায় প্রায় ভাঙিয়া পড়িয়াছেন। এদিকে মাতৃমণ্ডপে বসিয়া ভাবাবিষ্ট সাধক শিবচন্দ্র ইষ্টবিগ্রহের সম্মুখে পরমানন্দে গাহিয়া চলিয়াছেন:

কবে গো, আনন্দময়ী! এ দীনে সে দিন দিবে?
যে দিন—দিন রাত্রি হবে, রাত্রি আমার দিন হবে।
নিশাচরে দিবাচরে, সমান হবে চরাচরে,
দিবাকর নিশাকর করে, আলোক আঁধার হবে।
সম্পদ বিপদ হবে, বিপদ সম্পদ রবে,
স্বজন বিজন হবে, বিজন স্বজন হবে।
পিতামাতা ভ্রাতা জায়া, অসার সংসার মায়া,
ঘুচিবে সব ছায়া কায়া, আসা যাওয়া সমান হবে।
সংসার শ্মশান সাজিবে, শ্মশান সংসার হবে,
নদীতট শয্যা হবে, ভার্যা হবে চিতা যবে।[১]

উদাত্ত কণ্ঠের গান ও ভাবাবেশ শেষ হইতেছে না, পত্নী ক্রু শিশুকন্যাকে কোলে নিয়া মণ্ডপে এক একবার ঝগড়া করিতে গিয়াছেন, আবার ফিরিয়া আসিতেছেন।

অবশেষে গান থামিলে, পত্নী সম্মুখে আসিয়া কহিলেন, "এসব তো বেশ শুনলাম। কিন্তু দুটো ভাতের সংস্থান কি ক'রে হবে? তুমি নিজে দুদিন উপবাসী রয়েছো। শিশু মেয়েটাকে এ দুদিন যদিইবা কিছু খেতে দেওয়া হয়েছে। আজ তার কোনো ব্যবস্থাই নেই।"

প্রশান্ত স্বরে উত্তর দেন শিবচন্দ্র, "ছাখো, মা সর্বমঙ্গলা তাঁর এ সৃষ্টিটা তোমার আমার সঙ্গে পরামর্শ ক'রে করেন নি, চালাচ্ছেনও নিজেরই ইচ্ছেমতো। চালাবার শক্তিও তার আছে।"

"এসব তো অনেক বড় কথা, তাঁর সৃষ্টির কথা। আমাদের মতো ক্ষুদ্র মানুষের কথা ভাববার সময় আছে কি তাঁর?"

"কি হাস্যকর কথা বলছো তুমি। এই অনন্ত কোটি গ্রহ তারায় যেমন আছেন তিনি, তেমনি আছেন অণুপরমাণুতে। তার তো কোনো কিছুকেই ভুলবার উপায় নেই। মা আমার সর্বমঙ্গলা। ব্যবস্থা একটা করেছেনই তিনি।"

১. গীতাঞ্জলি: শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব

কথা কয়টি শেষ হইতে না হইতেই গ্রামের পোস্টমাস্টার শশধর চক্রবর্তী সেখানে আসিয়া হাজির।

"কি মনে ক'রে ভাই?" স্মিতহাস্যে প্রশ্ন করেন শিবচন্দ্র।

উত্তরে বলেন পোস্টমাস্টার, "ঠাকুরমশাই, আপনার একটা টেলিগ্রাম মনিঅর্ডার, আর চিঠি আছে। পিয়নের অসুখ, আজ সে কাজে বেরোয় নি। তাই বাড়ি যাবার পথে আপনার এ দুটো আমি নিজেই দিয়ে যাচ্ছি।"

এই টাকা ও চিঠিটি পাঠাইয়াছেন উত্তরপ্রদেশেস্থিত গোরখপুরের এক ভক্ত। তিনি লিখিয়াছেন, 'গভীর রাতে ঘুমিয়ে আছি, হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। দেখলাম, জ্যোতির্ময়ী মূর্তিতে দেবী সর্বমঙ্গলা মণ্ডপ আলো ক'রে বসে আছেন। আর আমার দিকে তাকিয়ে বলছেন, কুমারখালিতে আমার ছেলে শিবচন্দ্রকে শিগগীর একশো টাকা তুমি পাঠিয়ে দাও। বাড়ির সবার উপবাসে মরবার অবস্থা।'

"এই নাও এবার," পত্নীর দিকে টাকাটা ঠেলিয়া দিলেন শিবচন্দ্র। "মায়ের ভোগরাগের ব্যবস্থা মা নিজেই ক'রে নিলেন। বুঝলে তো, সন্তানের ওপর মায়ের দৃষ্টিটি ঠিকই থাকে।"

সৃষ্টি স্থিতি লয়ের মূলে রহিয়াছেন পরাশক্তি মহামায়া, কৈবল্যে আর লীলায় সর্বত্র সর্বকালে তাঁহারই পরমসত্তা ক্রিয়াশীল। সিদ্ধ সাধক শিবচন্দ্রের দিব্য অনুভূতির এই তত্ত্বটি তাঁহার হৃদয়ের এক স্বতোৎসারিত সংগীতে ফুটিয়া উঠিয়াছে। তিনি গাহিয়াছেন:

কৈবল্যের সেই নিত্য লীলায়
লীলাময়ী আমারই মা।
মহাকালের হৃৎকমলে তালে তালে
নাচছে শ্যামা।
শিবের বামে জীবের বামে আমারই
সেই একই মা,
সর্বত্র সমদক্ষিণা, বামা হয়েও নন মা
বামা।

শক্তি স্বরূপিণী মা মোর, জীবেরও মা,
শিবেরও মা।
কি জীব, কি শিব, দুই-ই হন শব,
কোলে যদি না করেন মা,
জননে জননী মা মোর, ধারণে হন
ধাত্রী মা।
কারণে ক্রিয়া শক্তি, কার্যে ফল-
বিধাত্রী মা।
জীবনে জীবনী-শক্তি, মৃত্যুরূপা
মরণে, মা।
সাধনায় সাধনা, মুক্তি দানে মুক্ত-
কেশী—মা।
কোলের ছেলে কোলে করে, দোলে
মা মোর কি শুধু মা।
আপন কোলে আপনি দোলে, আনন্দ
হিল্লোলে মা।
আপন মুখে আপন নাম ঐ,
গেয়ে বেড়ায়, আমারই মা,
মায়ের কেবা আপন, কেবা হয় পর,
আর কিছু নাই সবই যে মা
কোন্ মা তুমি, কে মা তুমি, সে কথায়
আর কাজ কি বা?
যে মা, সে মা, হও মা! তুমি বলতে
দাও মা! 'জয় মা শ্যামা'।

কাশীধামের সেই ঈশ্বর প্রেরিত প্রাচীন তন্ত্রসিদ্ধ পুরুষের কাছ হইতে নিগূঢ় ক্রিয়া গ্রহণ করার পর হইতেই শিবচন্দ্রের নয়নসমক্ষে

অভীষ্ট সাধনের বর্ত্মটি খুলিয়া যায়। মরণপণ সংকল্প নিয়া শেষ পর্যায়ের প্রয়াসে তিনি ব্রতী হন।

এ সময়ে কৈলাস ও মানস সরোবরে বৎসরাধিক কাল তিনি অবস্থান করেন এবং সেখানেও লাভ করেন এক উচ্চকোটির কৌল-সাধকের কৃপা। সেখানে অনুষ্ঠান করেন কঠোর তপস্যার।

তারপর জ্বালামুখী, বিন্ধ্যাচল, কামাখ্যা প্রভৃতি দেবীপীঠে মাতৃ-আরাধনা সম্পন্ন করিয়া প্রত্যাগত হন নিজ গৃহে। এখানে সর্বমঙ্গলা মণ্ডপে বসিয়া ধ্যানরত অবস্থায় বীরাচারী মহাসাধকের জীবনে আসে তাঁহার বহু প্রার্থিত পরমপ্রাপ্তির লগ্ন। জ্যোতিঃঘন, ষড়ৈশ্বর্যময়ী জগজ্জননী আবির্ভূতা হন তাঁহার নয়নসম্মুখে।

মহাকৌল শিবচন্দ্রের হৃদয় দহরে ফুটিয়া উঠে একমেবোদ্বিতীয়ম্ পরমসত্তার মহাপ্রকাশ। সেই প্রকাশের সম্মুখে শিব শিবানীতে পার্থক্য নাই, ব্রহ্ম ও শক্তিতে সদা রহিয়াছে অভেদ দর্শন, ধ্যেয় ও ধ্যাতা সেখানে একাকার। এই পরম উপলব্ধির কথা উত্তর জীবনে ঝঙ্কৃত হইয়াছে মহাসাধকের কণ্ঠে:

পূজার আগে সোঽহং, পরে সোঽহং,
মধ্যে যে ত্বং, সে ও অহংময়;
নইলে তোমার অঙ্গন্যাসে, আমার কিবা আসে?
আমার অঙ্গন্যাসে তোমার কিবা হয়?
প্রেম জাগে যখন, আর কি তখন,
তোমায় আমায় সাধনা হয়,
তখন অভেদ সম্বন্ধে—,
মাতি প্রেমানন্দে,
ব্রহ্মময়ীর পূজায় পূজক ব্রহ্মময়[১]॥

সাধনার সিদ্ধি ও ইষ্টদর্শন হইয়াছে, শিবচন্দ্রের অন্তরপটে মাঝে মাঝে ঘটিতেছে জ্যোতির্ময়ী জগজ্জননীর আবির্ভাব। আবার

১ গীতাঞ্জলি (১ম): শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব

চকিতে হইতেছে তাঁহার অদর্শন। এ সময়কার ব্যবহারিক জীবনে শিবচন্দ্র বহুতর কর্ম নিয়া ব্যাপৃত থাকিতেন। কখনো তন্ত্রতত্ত্বের প্রচারে, কখনো বা ইষ্টদেবীর পূজা অনুষ্ঠানে, তিনি মত্ত থাকিতেন। কখনো তৎপর হইয়া উঠিতেন দেশমাতৃকার পূজারী মুক্তিসংগ্রামীদের সমর্থনে। কিন্তু যে কর্মেই নিয়োজিত থাকুন, অন্তরে জগজ্জননীর স্মরণ মনন অনুধ্যান চলিত নিরন্তর।

পণ্ডিত রাধাবিনোদ গোস্বামী উত্তরকালে শিবচন্দ্রের স্মৃতিতর্পণ করিতে গিয়া তাঁহার এ সময়কার মনোভাবের চিত্র দিয়াছেন[১]: "দিদিমার সহিত তাঁহার (বিদ্যার্ণবের) সর্বমঙ্গলা মন্দিরে আমারও যাতায়াত ছিল। কিন্তু আমি তখন ছোট। মনে পড়ে, সেই সময়েই একবার তিনি খুব ধুমধামের সহিত পাঁচখানি দুর্গাপূজা করিয়াছিলেন। যাহা হৌক, পরে আমি যখন স্কুলে পড়ি, সেই সময়ে একদিন তাঁহার আলোচনা সভায় যোগদান করার সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল। সেদিন তিনি অনেক ভালো কথা বলিয়াছিলেন। পরে তাঁহার 'তন্ত্রতত্ত্বে' সেই সকল আলোচনা পড়িয়া আমি মুগ্ধ হইয়াছিলাম। তিনি আলোচনা করিতেছিলেন, আর মাঝে মাঝে তারা, 'তারা, তারা ব্রহ্মময়ী' বলিয়া ধ্বনি করিয়া উঠিতেছিলেন। বার কয়েক শুনিবার পর আমি ফস্ করিয়া বলিয়া বসিলাম,—বেশ তো বলিতেছেন, কিন্তু মাঝে মাঝে অমন চিৎকার করিয়া উঠিতেছেন কেন? বলিয়াই তৎক্ষণাৎ আমি সংকুচিত হইয়া পড়িলাম। কোথায় সামান্য গ্রাম্য বিদ্যালয়ের অর্বাচীন তরুণ ছাত্র আমি, আর কোথায় হাইকোর্টের চিফ জাস্টিস, সারপেন্ট পাওয়ার প্রভৃতির লেখক, উডরফ সাহেবের গুরু, ভারতের অদ্বিতীয় সংস্কৃত বক্তা, তন্ত্রাচার্য শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব মহাশয়।"

উপস্থিত সবাই সচকিত হইয়া উঠিয়াছেন বালকের ঐ মন্তব্যে। ভাবিতেছেন, শিবচন্দ্র এবার হয়তো ক্রুদ্ধ হইয়া বালককে তিরস্কার করিবেন। কিন্তু কার্যত দেখা গেল অন্যরূপ।

১ স্মৃতি তর্পণ: তন্ত্রাচার্য শিবচন্দ্র, গৌরভাবিনী, মাঘ-চৈত্র ১৩৬৩।

চক্ষু নিমীলিত করিয়া কিছুক্ষণ শিবচন্দ্র নীরব রহিলেন, তারপর বালকের দিকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে তাকাইয়া মৃদুস্বরে কহিলেন, "ঠিক বলেছিস তুই। তারা—তারা ব'লে কত ডাকছি, কত কেঁদে মরছি, কিন্তু ছেলের কথায় যখন তখন সে বেটি তো সাড়া দেয় না। সব সময়ে তো পাইনে তার দর্শন!" বলিতে বলিতে শিবচন্দ্রের চক্ষু দুইটি অশ্রুসজল হইয়া আসিল। ভক্ত ও দর্শনার্থীরা মাতৃসাধকের দিব্যভাবমণ্ডিত আননের দিকে নির্নিমেষে চাহিয়া রহিলেন।

কুমারখালির প্রবীণ ভক্তসাধক কাঙাল হরনাথ এবং তরুণ শিবচন্দ্রের অন্তরঙ্গতা ছিল অতি গভীর। এই অন্তরঙ্গতার প্রভাব শিবচন্দ্রের উপর বিশেষভাবে পতিত হয়, তাঁহার তন্ত্রধৃত জীবনে বাল্যকাল হইতেই দেখা দেয় উদারতা ও অসাম্প্রদায়িকতা। তাই কালা ও কৃষ্ণের অভেদ তত্ত্ব তাঁহার ভিতরে অতি সহজভাবে স্ফুরিত হইয়া উঠে।

কাঙাল হরনাথ শিবচন্দ্রের পিতার কাছে মন্ত্র দীক্ষা নিয়াছিলেন, আবার শিবচন্দ্র শৈশবে হাতেখড়ি নিয়াছিলেন হরনাথেরই কাছে। উভয় পরিবারে তাই ঘনিষ্ঠ আত্মিক যোগ ছিল।

শুদ্ধা ভক্তির সাধনায় কাঙাল হরনাথ উচ্চাবস্থা লাভ করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার লেখায় গানে ও উপদেশে সমন্বয়মূলক প্রেমধর্ম প্রচার করিয়া বেড়াইতেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ফিকিরচাঁদ সংসদে বাল্যকালে শিবচন্দ্র প্রায়ই যাতায়াত করিতেন, কাজেই হরনাথের ভক্তিভাব অনেক পরিমাণে তাঁহাকে রসায়িত করিয়াছিল।

উত্তর জীবনে শিবচন্দ্র তন্ত্রসাধক ও তন্ত্রশাস্ত্রবিদ্‌রূপে খ্যাত হইয়া উঠেন। স্বদেশ এবং হিন্দুধর্মের উজ্জীবনের জন্য নানা কল্যাণকর প্রয়াসের সহিত তিনি যুক্ত হইয়া পড়েন। এ সময়ে কাঙাল হরনাথের সহিত প্রায়ই তাঁহাকে পরামর্শ করিতে দেখা যাইত। কি করিয়া শাক্ত ও বৈষ্ণবের বিবাদ ও মনোমালিন্য মেটানো যায়, কি করিয়া

জড়বাদী পাশ্চাত্য সভ্যতার প্লাবন হইতে সনাতন ধর্মকে রক্ষা করা যায়, উভয়ে সেই পন্থা উদ্ভাবনের চেষ্টা করিতেন।

মনীষী বঙ্কিমচন্দ্র এ সময়ে কৃষ্ণচরিত্র রচনা করেন, নিজের মতবাদ ও যুক্তি তর্ক বিশ্লেষণের মধ্য দিয়া কৃষ্ণ-চরিত্রের এক আধুনিক ব্যাখ্যা তিনি স্থাপন করেন।

বঙ্কিমের এই ব্যাখ্যার সহিত শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব একমত হন নাই, তিনি তৎক্ষণাৎ ইহার এক সমালোচনা লিখিয়া ফেলেন। প্রবীণ সাধক হরনাথকে পড়িতে দিয়া জানিতে চাহেন তাঁহার অভিমত।

হরনাথ বলেন, "তুমি শক্তিমান্ সাধক, তত্ত্ব জানো। এ ধরনের সমালোচনায় শুধু দোষ ত্রুটি উদ্‌ঘাটিত হয়। এসব না লিখে বরং প্রকৃত তত্ত্ব, প্রকৃত রস উদ্‌ঘাটন কর। কৃষ্ণলীলা মাধুর্যের রস পরিবেশন কর সর্বজনের কল্যাণে। তাতে কাজ বেশী হবে।"

শিবচন্দ্র তৎক্ষণাৎ এ কথা মানিয়া নিলেন। অতঃপর কিছুদিনের মধ্যে রচনা করিলেন 'রাসলীলা'। তন্ত্রসিদ্ধ মহাপুরুষের এই গ্রন্থটি পড়িলে বুঝা যায়, পরম বস্তুতে কোনো ভেদ নাই, তাঁহার রসের ধারায় পরিতৃপ্ত হয় জাতি বর্ণ নির্বিশেষে বিশ্বের সকল মানুষ।

কাঙাল হরনাথ যখন ইহলোক ত্যাগ করেন, তখন শিবচন্দ্র তাঁহার ভক্তদের সঙ্গে কাঁধ মিলাইয়া মরদেহটি সংকারের জন্য বহন করিয়া নিয়া যান। রক্ষণশীল ব্রাহ্মণদল অধ্যুষিত কুমারখালিতে তাঁহার এই কার্যটি অনেকের কাছে নিন্দনীয় বলিয়া গণ্য হয়। কিন্তু তত্ত্ববিদ্ সাধক শিবচন্দ্র সেদিকে দৃক্‌পাত করেন নাই।

প্রখ্যাত মরমিয়া সাধক লালন ফকীর সে-বার কুমারখালিতে শিবচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন।

লালন নিকটেই থাকেন। সাধক হিসাবে শিবচন্দ্রের প্রতিষ্ঠার কথা, তাঁহার শাস্ত্র রচনা ও বাগ্মিতার কথা, তিনি শুনিয়াছেন। বয়স

হিসাবে সিদ্ধ ফকীর লালন শিবচন্দ্র হইতে বড়। কিন্তু নিজেই সখ্যতা দেখাইতে আসিয়াছেন, পদব্রজে উপস্থিত হইয়াছেন শিবচন্দ্রের দুর্গামণ্ডপের সম্মুখে।

শিবচন্দ্র তো মহা আনন্দিত, পরম সমাদরে এই সিদ্ধ ফকীরকে অভ্যর্থনা জানাইলেন। স্মিত হাস্যে কহিলেন, "বড় অনুগ্রহ আমার ওপর।"

"অনুগ্রহ নয়– দর্শন। হেথায় দর্শন করতে এলাম আমার দাদা ঠাকুরকে।" সারল্যভরা হাসি হাসিয়া বলেন লালন। "তাছাড়া, পড়শী তো আমরা বটেই। সেই মনের মানুষ যে জন, তাঁকে ঘিরেই তো আমরা সব পড়শীরা দিন গুজরান করছি। আপনি যার জন্য ফকীর, আমিও তাঁর জন্যই। তাই না দাদাঠাকুর?"

বাউল বেশী লালন ফকীরের কাঁধে ঝোলা, হাতে একতারা। আর বীরাচারী মাতৃসাধক শিবচন্দ্রের পরিধানে একটি গৈরিক বসন, সারা দেহ ভস্মলিপ্ত, কপালে বৃহৎ রক্ত চন্দনের ফোঁটা আর ত্রিপুণ্ড্রক। দুই-ই ফকীর বই কি। গ্রামের লোকেরা লালনের আগমনবার্তা পাইয়াই ছুটিয়া আসিয়াছে। সর্বমঙ্গলার মণ্ডপের সম্মুখে দুই সাধককে ঘিরিয়া কৌতূহলী হইয়া দাঁড়াইয়া আছে সংলাপ শোনার প্রতীক্ষায়।

শিবচন্দ্র গদ্‌গদ স্বরে বলেন, "ফকীর, তোমায় পেয়ে আনন্দ আমার উথলে উঠ্‌ছে, সে আনন্দ প্রকাশ করার ভাষাও ফেলেছি হারিয়ে। যাক্, এসেছো যখন, প্রাণের পিপাসা মেটাও, বিলাও তোমার বাউল গানের সুধা।"

একতারা বাজাইয়া নাচিয়া নাচিয়া গান ধরেন লালন ফকীর :

আমি একদিনও না দেখলাম তারে।
আমার বাড়ির কাছে আরশীনগর
—পড়শী বসত করে।

গ্রাম বেড়ে তার অগাধ পানি,
ও তার নাই কিনারা নাই তরণী পারে।

মনে বাঞ্ছা করি দেখবো তারে,
কেমনে সে গাঁয়ে যাই রে।
কি কব পড়শীর কথা, ও তার
হস্তপদ স্কন্ধমাথা নাই রে।
ও সে ক্ষণেক ভাসে শূন্যের উপর
ক্ষণেক ভাসে নীরে।
পড়শী যদি আমায় ছুঁতো
ও মোর যম যাতনা সকল যেতো দূরে।
সে আর লালন একখানে রয়,
তবুও লক্ষ যোজন ফাঁক্ রে।

শিবচন্দ্র বিহ্বল হইয়া গিয়াছেন, প্রিয় ভক্ত দানবারিকে ডাকিয়া উৎফুল্ল কণ্ঠে কহিলেন, "দানু, দানু, প্রাণ ভরে শোন, কি অপূর্ব গান ফকীরের। সিদ্ধপুরুষ ছাড়া এ গান কে গাইতে পারে?"

বলিহারের রাজার কৌল সাধনার উপর অত্যন্ত শ্রদ্ধা ছিল। তিনি স্থির করিলেন, আচার্য শিবচন্দ্রকে বরণ করিবেন তাঁহার সভা-পণ্ডিতরূপে। ভাবিলেন, সেই সুযোগে তাঁহার উপদেশ নিয়া অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য তান্ত্রিক ক্রিয়া অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা যাইবে।

বহু অনুনয় বিনয় করিয়া শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণবকে বলিহারে নিয়া যাওয়া হইল। সেখানে থাকিয়া শিবচন্দ্র বেশ কিছুদিন রত হইলেন শাস্ত্রচর্চা ও তপস্যায়। কিন্তু অতঃপর সভাপণ্ডিতের বৃত্তি তাঁহার অসহ্য হইয়া উঠিল। হঠাৎ একদিন সেখানকার বাস উঠাইয়া দিয়া ফিরিয়া আসিলেন কুমারখালির নিজ আবাসে।

ভক্ত পরিবৃত হইয়া তিনি থাকিতেন। ঘরে স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি ছিল, তারপর ছিল ইষ্টদেবীর পূজার দায়িত্ব। তাই শিবচন্দ্রকে এই সময়ে প্রতিমাসে বহু অর্থ ব্যয় করিতে হইত। বলিহারের সভাপণ্ডিত হিসাবে প্রতিমাসে বাঁধাধরা একটা মোটা আয় ছিল, এবার তাহাও বন্ধ হইয়া গেল।

আত্মীয় বন্ধুবান্ধবেরা চিন্তিত হইয়া উঠিলেন, সংসারের বিপুল ব্যয়-ভার এবার কি করিয়া চলিবে? শিবচন্দ্র উত্তর দিলেন, "মায়ের অভয় পদে যে শরণ নিয়ে আছে, তার আবার ভয় কি? নাঃ—এখন থেকে কোনো ব্যক্তি বিশেষের অর্থ সাহায্যের ওপর আর আমি নির্ভর করবো না। আমার মা সর্বমঙ্গলা যা হোক একটা ব্যবস্থা করবেন বৈ কি।"

অতঃপর সংসারের ব্যয় এবং সর্বমঙ্গলার ভোগ রাগ ও পূজা অর্চনার ব্যয় নির্বাহ হইত নিতান্তই ইষ্টদেবীর অনুগ্রহে। যেদিন যেমন অর্থের দরকার হইত, তাহা উপস্থিত হইত দূর দূরান্তের ভক্ত ও অনুরাগীদের নিকট হইতে।

দ্বারভাঙ্গার মহারাজা কামেশ্বর সিং বরাবরই তন্ত্রসাধনার অনুরাগী ছিলেন। উচ্চকোটির সাধক মহলে তাঁহার যাতায়াত ছিল এবং সুযোগ পাইলেই ক্রিয়াবান্ সাধকদের নিকট হইতে তিনি উপদেশ গ্রহণ করিতেন।

কামেশ্বর সিংজী একবার তারাপীঠে মহাত্মা বামাক্ষেপার নিকট উপস্থিত হন এবং অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য শ্মশানে বসিয়া অভিচার অনুষ্ঠানের প্রার্থনা জানান।

ক্ষেপা তাঁহাকে আশীর্বাদ দিয়া বলেন, "তুমি তন্ত্রসাধক শিবচন্দ্রের কাছে যাও, তিনি শক্তিমান্, তান্ত্রিক নিগূঢ় অনুষ্ঠানেও দক্ষ। তাঁর কৃপা পেলে সিদ্ধ হবে তোমার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা।"

নির্দেশমতো, কিছুদিনের মধ্যে কামেশ্বর সিংজী কুমারখালিতে শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণবের কাছে আসিয়া উপস্থিত। ক্ষেপার কথা শুনিয়া এবং মহারাজার আন্তরিক ইচ্ছার পরিচয় পাইয়া শিবচন্দ্র তাঁহাকে সাহায্য করিতে রাজী হন। অচিরে গভীর নিশাযোগে স্থানীয় শ্মশানে অনুষ্ঠিত হয় মহাকালীর আরাধনা। শিবচন্দ্রের ব্যক্তিত্ব ও সাধনবিভূতি দেখিয়া কামেশ্বর সিংজী মুগ্ধ হন, পরিণত হন তাঁহার এক অনুরাগী ভক্তরূপে।

অতঃপর আরও কয়েকবার কামেশ্বর সিংজী আচার্য শিবচন্দ্রের

সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং তন্ত্রের সাধন ও তত্ত্ব সম্পর্কে উপদেশ লাভ করেন। একবার শিবচন্দ্রের দেওঘরে অবস্থানের কালে তিনি তাঁহার সহিত মিলিত হন এবং সেখানকার শ্মশানে বসিয়া সম্পন্ন করেন তাঁহার উত্তরসাধকের কর্ম।

সিদ্ধ কৌল শিবচন্দ্রের শ্মশান সাধনার তথ্য খুব কমই জানা গিয়াছে। তাঁহার উত্তর সাধকদের প্রদত্ত যৎসামান্য সংবাদ হইতে এ সম্পর্কে একটা মোটামুটি চিত্র দাঁড় করানো যায়।

তাঁহার শ্মশান সাধনা ছিল তিথি ও যোগ সাপেক্ষ। এই যোগ যে কখন সমাগত হইবে তাহা অপরে জানিত না। এই শুভ লগ্ন যখন উপস্থিত হইত তখন তিনি শ্মশানভূমিতে গমন করিয়া সাধনা করিবার জন্য অস্থির হইয়া পড়িতেন। মাতৃতত্ত্বপিপাসু শিষ্যগণ যখন তাঁহার সহিত গমন করিতেন, শিক্ষাদানকল্পে যাহা আবশ্যক সকলকেই তাহা প্রদর্শন করিতেন, তবে উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন শিষ্য না হইলে কখনো সঙ্গে লইতেন না বা সাধনার সময় নিকটে থাকিতে সম্মতি দিতেন না।

—হাওড়া শিবপুরের শশধর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সিদ্ধ কৌল বামাক্ষ্যাপার আশ্রম তারাপীঠে কিছুদিন অবস্থান করেন। ক্ষেপা একদিন তাঁহাকে আদেশ করিলেন 'ওরে, তুই কুমারখালির পণ্ডিত শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণবের কাছে যা, সেখানে তুই সায়েস্তা হবি।'

—ভাগ্যবান্ সাধক এই আদেশ প্রাপ্তির পর বিদ্যার্ণবের গৃহে সমাগত হইয়া তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন, তারপর সর্বদা ভক্তি প্রণত হইয়া তাঁহার নিকট সাধনা বিষয়ে নানা শিক্ষা গ্রহণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে কিছুকাল অতিবাহিত হইবার পর একদা যখন শ্মশান সাধনার সুযোগ উপস্থিত হইল, তিনি গুরুদেবের সহিত নিশীথে সাধনার জন্য গৌরীতটে শ্মশানে উপস্থিত হইলেন। সাধনার কোনও প্রক্রিয়া কয়েকবার-এই শিষ্যকে প্রদর্শন করার পরও যখন যথাযথ অনুষ্ঠানে তিনি অক্ষম হইলেন, তখন সেই নিস্তব্ধ শ্মশানেই ঠাকুর সক্রোধে শিষ্যকে চিমটা দ্বারা প্রহার করিলেন। তারপর

আবশ্যকীয় ক্রিয়া ও সাধনায় তত্ত্বপিপাসু শিষ্যকে কৃতিবান্ করিয়া নিশা শেষে গৃহে ফিরিলেন।

—ইহা ছাড়াও ঘোর নিশীথে কখনও কখনও কোনো শ্মশানে বসিয়া শ্মশানবাসিনী শ্যামা মায়ের আরাধনায় তিনি নিমগ্ন থাকিতেন। সেখানে যে কি প্রকার ক্রিয়াকলাপ অনুষ্ঠান করিতেন, কিভাবে যোগ সমাধিতে মগ্ন হইয়া থাকিতেন, তাহা আর অন্য কেহ জানিতে পারিত না ; যদি কিছু জানা সম্ভব তাহা তাঁহার ভাগ্যবান্ শিষ্য দানবারি গঙ্গোপাধ্যায়ই একমাত্র জানিতে পারিতেন।

কয়েকজন জার্মান পণ্ডিত সে-বার বারাণসীতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। ভারতীয় সাধনা ও ধর্ম সংস্কৃতির সম্বন্ধে ইঁহারা অতিশয় অনুসন্ধিৎসু। শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব তখন বারাণসীতে অবস্থান করিতেছেন, সারা উত্তর ভারতে তাঁহার তখন প্রচুর খ্যাতি। তাত্ত্বিক ও ক্রিয়াবান এই সিদ্ধ মহাপুরুষকে জার্মান পণ্ডিতেরা সোৎসাহে দর্শন করিতে আসিলেন। সবাই তাঁহারা ভালো সংস্কৃত জানেন, কাজেই কথাবার্তায় কোনো অসুবিধা হইল না। তাঁহাদের প্রশ্নের উত্তরে শিবচন্দ্র ভারতীয় সাধনার বৈচিত্র্য ও গভীরতা, বিশেষত প্রত্যক্ষ দর্শন ও অনুভূতির মর্মকথা বুঝাইয়া বলিলেন।

তন্ত্রের আলোচনা উঠিল এবং এই সাধনধারার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তিনি এক মনোজ্ঞ ভাষণ দিলেন। এই ভাষণে বর্ণনা করিলেন তাঁহার নিজের উপলব্ধি এবং শাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্ব।

জার্মান পণ্ডিতেরা একমনে তাঁহার ভাষণ শুনিতেছেন, আর নির্নিমেষে চাহিয়া আছেন তাঁহার মুখের দিকে।

বিদায়ের সময় সবাই একে একে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া এই সিদ্ধ মহাত্মার চরণ বন্দনা করিলেন, পরমানন্দে গ্রহণ করিলেন তাঁহার সস্নেহ আশীর্বাদ।

শিবচন্দ্রের অন্তরঙ্গ ভক্তশিষ্য এবং তাঁহার বহু নিগূঢ় ক্রিয়ার উত্তরসাধক ছিলেন কুমারখালির দানবারি গঙ্গোপাধ্যায়। গুরুর

জীবনের বহু ঘটনায় প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন তিনি। তিনি বলিয়াছেন, "দীর্ঘকাল ঠাকুরের সঙ্গ করেও তাঁকে বুঝতে পেরেছি বলে মনে হয় না। তাঁর সাধনজীবনের কার্যকলাপ যা কিছু দেখেছি, তা থেকে আমার এই ধারণা জন্মেছে যে, তিনি ছিলেন মহাশক্তি মহামায়ার কৃপাপ্রাপ্ত সাধক, বিপুল শক্তি-বিভূতির উৎস।

"বীরাচারী, দক্ষিণাচারী, বামাচারী সব তন্ত্রসাধকেরাই আসতেন তাঁর কাছে। প্রত্যেককেই যাঁর যাঁর নিজস্বধারা ও প্রণালী অনুযায়ী প্রক্রিয়া তিনি দেখিয়ে দিতেন। নিগূঢ় উপদেশ পেয়ে তাঁরা কৃতার্থ হতেন। সত্যকার সাধনকামীদের প্রতি তিনি ছিলেন পরম কৃপালু, হাতে কলমে তাঁদের শিক্ষা দিতেন, অনেক সময় শ্মশানে বসে সারা রাত্রি ব্যস্ত থাকতেন তাঁদের নিয়ে। বহুবার নিজে সঙ্গে থেকে এসব আমি দেখেছি।

"কাশীতে দেখেছি—ভারতের নানা প্রদেশ থেকে শুধু শাক্তই নয়, আরো অন্য সম্প্রদায়ের সাধক—শৈব, সৌর, বৈষ্ণব, গাণপত্য, আসতেন তাঁর কাছে উপদেশপ্রার্থী হয়ে। সবারই আধ্যাত্মিক সমস্যার সমাধানে হাসিমুখে সাহায্য করতেন গুরুদেব।"

শিবচন্দ্রের মাতৃপূজার অনুষ্ঠানাদি সংখ্যায় যেমন অজস্র ছিল, তেমনি ছিল জাঁকজমকপূর্ণ ও ব্যয়বহুল। কিন্তু সব সময়েই দেখা যাইত মায়ের প্রসাদে প্রয়োজনীয় অর্থ পূর্বাহ্নেই হইত সংগৃহীত হইয়াছে ভক্তদের খেদের কোনো কারণ থাকিত না।

একবার শিবচন্দ্র মহা আড়ম্বরের সহিত পঞ্চ-দুর্গোৎসবের অনুষ্ঠান করেন। তাঁহার এই পূজা যেমনি অভিনব, তেমনি বৈচিত্র্যপূর্ণ। সারা বাংলার ঘরে ঘরে এই রাজসিক মহাপূজার কাহিনী প্রচারিত হয় এবং দূরদূরান্ত হইতে অগণিত ভক্ত সাধক ও কৌতূহলী দর্শক তাঁহার পূজাক্ষেত্রে আসিয়া জড়ো হন।

শিবচন্দ্রের এই পঞ্চদুর্গার মূর্তিতে ছিল পাঁচটি বিভিন্ন ভঙ্গীর রূপকল্পনা। এগুলি যথাক্রমে: সিংহে আরূঢ়া মহিষমর্দিনী, আর সম্মুখে আরাধনারত শ্রীরামচন্দ্র ও তাঁহার পরিকরগণ বাংলার

দশপ্রহরণধারিণী দেবী-দুর্গা; চণ্ডীতে বর্ণিত শ্রীদুর্গা; নবদুর্গা পরিবৃতা লক্ষ্মী সরস্বতী ইত্যাদি সহ মহিষমর্দিনী দেবী; চৌষট্টি যোগিনী এবং দশমহাবিদ্যা বেষ্টিতা—মহাচণ্ডী।

শিবচন্দ্রের পরিকল্পিত এই মহাপূজার মর্মকথা এবং তাৎপর্য—অগণিত শক্তি ও প্রতীকের মূলে রহিয়াছে এক এবং অখণ্ড পরমাশক্তি।

এই মহাপূজায় কাশীধাম ও বাংলার প্রখ্যাত পণ্ডিত ও সাধকেরা উপস্থিত ছিলেন এবং এ পূজা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল দেশের প্রভাবশালী ভূম্যধিকারীদের অকৃপণ সহায়তায়।

বাহ্য পূজার প্রয়োজনের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দিতেন শিবচন্দ্র। তাছাড়া, দেবীপূজায় তন্ত্রোশাস্ত্রোক্ত কোনো খুঁটিনাটি অনুষ্ঠান ও উপচার বাদ দিবার কথা তিনি ভাবিতে পারিতেন না। শাস্ত্রোক্ত আরাধনায় জনমানসে দেবী স্ফুরিতা হইয়া উঠেন এবং মৃন্ময়ী চিন্ময় রূপ পরিগ্রহ করেন, একথাটি বার বার তিনি বলিতেন। পূজা সম্পর্কে শিবচন্দ্র লিখিয়াছেন:

"যাঁহার শক্তি আমাতে সংক্রামিত করিতে হইবে, তাঁহার তত্ত্ব-সাগরে আমার আত্মঅস্তিত্ব একেবারে ডুবাইয়া দিতে হইবে। নতুবা তাঁহার সে শক্তি কিছুতেই আমাতে সংক্রামিত হইবার নহে। যাঁহার ভাবে যিনি যতদূর আত্মহারা হইয়াছেন তিনি তাঁহাতে ততদূর তন্ময়ত্ব লাভ করিয়াছেন; যতদূর তন্ময়তা সিদ্ধি হইয়াছে, ততদূরই শক্তি তাঁহাতে সংক্রামিত হইয়াছে। শক্তিরাজ্যে ইহা নৈসর্গিক নিয়ম।

"মাকে ডাকিবার, বিবিধ উপচারে অর্চনা করিবার, এবং তাঁহার ভাবে আত্মহারা হইবার মতো শক্তি হৃদয়ে সঞ্চয় করিবার পর মায়ের প্রতিমায় তাঁহার আবির্ভাবের কথা বিচার করা আবশ্যক। তুমি দেখ প্রতিমার পূজা, কিন্তু যিনি স্বয়ং পূজা করেন, অলৌকিক দৃষ্টি বলে তিনি কিন্তু দেখিতে পান—অচেতন প্রতিমা যন্ত্রে চৈতন্যময়ীর পূর্ণ আবির্ভাব। প্রাণ প্রতিষ্ঠার পর হইতে বিসর্জনের পূর্ব পর্যন্ত

সাধকের সিদ্ধাঞ্জনস্নিগ্ধ নয়নে মৃন্ময়ী প্রতিমা তখন চিন্ময়ীর স্বরূপে আবির্ভূত হইয়া নিত্য নব লাবণ্যময়ী ব্রহ্মময়ী বিশ্বজননীর ব্রহ্মময় কান্তিচ্ছটা উদ্গীরণ করে।”

“মায়ের ভক্ত তাঁহার অন্তর হইতে চিন্ময়ীর যে জ্যোতির আনিয়া মৃন্ময়ীতে সংযোজিত করেন, মৃন্ময়ীতে পূজা শেষ করিয়া আবার সেই চিন্ময়ীর জ্যোতিঃ চিন্ময়ীতে সংযোজিত করেন। তখন বাহিরের মণ্ডপে যেমন ভুবনভরা রূপের ছটা, অন্তরের মণ্ডপেও দেখি তেমনই অনুপম সৌন্দর্য-ঘটা।”

বিশ্বজননীর লীলা সদাই তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তজনের হৃদয়ে। চকিত আবির্ভাব ও অন্তর্ধানে, আলোয় আঁধারে, বহু বিচিত্র রসে এই লীলা উচ্ছলিত। মায়ের এই লীলা তাঁহার জীবনে কোন্ রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে সে সম্পর্কে শিবচন্দ্র বলিতেছেন, “মা আমাদের যেমন ভিতরে তেমনি বাহিরে, যেমন বাহিরে তেমনি ভিতরে। কিছুদিন এইরূপে ভিতরে বাহিরে আসা যাওয়া করিতে করিতে প্রাণের কপাট যেদিন একেবারে খুলিয়া যাইবে, সেইদিন আমার আবাহন বিসর্জন একেবারে জন্মের মতো ঘুচিয়া যাইবে। বাহিরে চাহিলে যেদিন ভিতরের মূর্তি আমি দেখিতে পারিব, ভিতরে চাহিলে যেদিন বাহিরের মূর্তি দেখিব, ভিতরে বাহিরে,—বাহিরে ভিতরে যেদিন এক হইয়া যাইবে, সেইদিন মা আমার আসা যাওয়া ঘুচাইয়া চরণ দুখানি গোছাইয়া স্থির হইয়া বসিবেন। অশান্ত নৃত্যকালী সেইদিন আমার শান্ত হইবেন কিংবা কি জানি অন্তরে বাহিরে খোলাপথ পাইয়া হয়তো আনন্দময়ী আরও ছুটাছুটি করিবেন। কিন্তু সে ছুটাছুটি করিলেও সেদিন আমি আর তাঁহাকে আনিবও না, লইবও না, তিনি আপনি আনন্দে আপনি আসিবেন, আর আপনি যাইবেন—আপনি নাচিবেন, আপনি গাইবেন, আপন খেলা আপনি খেলিবেন, আমি সেই সঙ্গে সঙ্গে তাল দিয়া ‘জয় মা—জয় মা’ বলিয়া নাচিয়া বেড়াইব।”

শিবচন্দ্রের অনুরাগী ভক্ত এবং তাঁহার জীবনের বহু ঘটনা ও অনুষ্ঠানের প্রত্যক্ষদর্শী, শ্রীবসন্তকুমার পাল তাঁহার কুলকুণ্ডলিনী-পূজার বিবরণ দিতে গিয়া লিখিয়াছেন :

পরমসিদ্ধ, মাতৃসাধন সুধার অর্ণব, শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণবের আরাধিতা সর্বমঙ্গলা দেবীর নিত্যকার পূজার সহিত অন্যতম অপরিহার্য অবশ্য অনুষ্ঠান-অঙ্গ তন্ত্রোক্ত বিধানে কুলকুণ্ডলিনী শক্তির পূজা এবং ভোগ ব্যবস্থিত ছিল। উহার উপচারাদির মধ্যে প্রধান ছিল কাঁচা দুগ্ধ, উৎকৃষ্ট জাতীয় সুপক্ক কদলী ও পরমান্ন প্রভৃতি। এই পূজাটি অনুষ্ঠিত হইত শিবমন্দিরে শিবসন্নিধানে। ভোগ নিবেদন সমাপন করিয়া শিবচন্দ্র নিমীলিতনেত্রে ধ্যান নিমগ্ন হওয়ার অনতিকাল মধ্যেই কোথা হইতে কুলকুণ্ডলিনী স্বরূপিণী একটি বৃহৎ গোক্ষুরসর্প (সাড়ে চার ফুট পাঁচ ফুট লম্বা) আসিয়া দুগ্ধ, পরমান্ন ও পাত্রস্থিত নিবেদিত আহার্য ভোজনে রত হইত। কখনও কখনও সঙ্গে আর একটি শ্বেত সর্পের আগমনও হইত, অবশ্য শ্বেতসর্পটি প্রত্যহ দেখা যাইত না। পরিতোষ সহকারে ভোগ প্রসাদ আহারান্তে সর্পটি ফণা বিস্তারপূর্বক ধ্যানে উপবিষ্ট শিবচন্দ্রের মস্তকের উচ্চতায় সমান ঊর্ধ্বে উঠিয়া দণ্ডায়মান অবস্থায় ফোঁস ফোঁস শব্দে দুলিতে থাকিত।

অর্ধোন্মীলিত নেত্রে ভাবাবিষ্ট শিবচন্দ্র—"আয় মা, আয় মা, এলি ? ব্রহ্মময়ী তারা মা আমার, আয় আয়"—ধ্বনি করিতে করিতে সম্মুখে হস্ত সম্প্রসারণপূর্বক কুণ্ডলিনী স্বরূপা অজগরটির মস্তকে হাত বুলাইয়া দিলে উহা তাঁহার ক্রোড়ে উঠিয়া এবং কুণ্ডলী পাকাইয়া বিরাট ফণাটি বিস্তারপূর্বক হিস্ হিস্ শব্দে ডানে বামে দুলিতে থাকিত। আবার ক্ষণকাল পরেই বিদ্যার্ণব ঠাকুরের কখনও দক্ষিণবাহু কখনও বামবাহু জড়াইয়া ধরিয়া ক্রমে উপরে উঠিয়া তাঁহার কণ্ঠ সংলগ্ন হইয়া পুনঃ ফণা বিস্তার করিয়া তাঁহার বুকের সহিত মাথাটি লাগাইয়া যেন কান পাতিয়া থাকিত।

মনে হইত, সর্পটি যেন বিদ্যার্ণব হৃদয়ের গভীরতম অন্তস্তল-উত্থিত মর্মোচ্ছ্বাস ধ্বনি শ্রবণ করিবার জন্য এভাবে তাঁহার বক্ষসংলগ্ন হইয়া

থাকিত। আর বিদ্যার্ণব ঠাকুর মাঝে মাঝে ভাব নিমগ্ন অবস্থায়ই "তারা তারা তারা" বলিয়া তারায় আত্মহারা হইয়া তারস্বরে ধ্বনি দিতে থাকিতেন।

এইরূপে বারকয়েক ধ্বনি দেওয়ার পর পুনঃ সর্পের মস্তকে হস্ত সঞ্চালন করিলে সর্পটি এবার বিদ্যার্ণবের কণ্ঠ হইতে শিরে উঠিয়া দুই-চারবার বিস্তৃত ফণায় দোল দিয়া ধীরে ধীরে সম্মুখস্থ শিবের লিঙ্গমূর্তিটির শীর্ষে আরোহণ করিত, পূর্ববৎ ফণা বিস্তার করিয়া, ক্ষণকাল থাকিয়া, কোথায় আবার অদৃশ্য হইয়া যাইত।

সর্পটি চলিয়া যাইবার পর শিবচন্দ্র ভোগের ভুক্তাবশিষ্ট হইতে প্রসাদ লইয়া "তারা তারা" ধ্বনি করিতে করিতে সাশ্রুনয়নে তাহা গ্রহণ করিতেন। প্রথম প্রথম সকলেই তাঁহাকে এই প্রসাদ গ্রহণে বিরত থাকিবার জন্য আকুতি ও অনুরোধ করিত—কিন্তু তিনি নির্ভয়ে মায়ের প্রসাদ খাইয়া ফেলিতেন। নিঃসন্দেহে দুঃসাহসিক ছিল এই কার্য।[১]

তন্ত্রসাধন, তন্ত্রসিদ্ধি ও তন্ত্রশাস্ত্রের তত্ত্বের আলোকে ভাস্বর হইয়া উঠিয়াছিল শিবচন্দ্রের জীবন। এবার এই ভাস্বর জীবনে দেখা দেয় আচার্যের ভূমিকা। আচার্যরূপে জনকল্যাণের তিনটি বৃহৎ কর্মসূচী তিনি গ্রহণ করেন।

প্রাচীন তন্ত্রসাধনার অবনতি এদেশে বহু শত বৎসর যাবৎ শুরু হইয়াছে। এই অবনতি নিম্নতম পর্যায়ে আসিয়া পৌঁছিয়াছে বৌদ্ধ-তান্ত্রিকতার শেষ যুগে। সাধনার ভিতরে ঢুকিয়া পড়িয়াছে নানা বীভৎসতা, নিষ্ঠুরতা ও যৌন কদাচার। শাস্ত্রের ভিতরে দেখা দিয়াছে নানা বিভ্রান্তি ও অপব্যাখ্যা। ফলে এই নিগূঢ় মুক্তি-সাধনা সম্পর্কে জনসাধারণের মনে এই যুগে সঞ্চারিত হইয়াছে ঘৃণা, সন্দেহ ও অহেতুক আতঙ্ক।

এই অধঃপতন ও অপব্যাখ্যার কবল হইতে তন্ত্রসাধনা ও তন্ত্রশাস্ত্রকে মুক্ত করার জন্য তৎপর হইয়া উঠিলেন শিবচন্দ্র।

এই কার্য সাধন করিতে হইলে সাধনা এবং শাস্ত্রের প্রকৃত স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করা আবশ্যক। তাই সাধনকামী শিষ্যদের সম্মুখে তিনি তুলিয়া ধরিলেন নিজের বীরাচারী ও শুদ্ধতর ক্রিয়াসমন্বিত সাধনা। কাশীতে থাকা কালে ভারতের কৌল সাধক এবং পণ্ডিত মহলে শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণবের তন্ত্রসিদ্ধির কথা প্রচারিত হয় এবং বহু মুমুক্ষু ভক্ত তাঁহার নিকট আশ্রয় গ্রহণ করিতে আসেন, দীক্ষা ও উপদেশ পাইয়া তাঁহারা ধন্য হন।

প্রকৃত তন্ত্রশাস্ত্র এবং তন্ত্রতত্ত্বের প্রচার না হইলে তন্ত্র সম্পর্কে লোকের ভয় এবং সন্দেহ দূর হইবে না, অনুরাগও আসিবে না। তাই নিজের নিভৃত সাধনচক্র হইতে শিবচন্দ্রকে বাহিরে আসিতে হইল, অমিত উৎসাহ ও কর্মশক্তি নিয়া প্রচারকর্মে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন।

সর্বপ্রথমে কাশীধামে উচ্চকোটির সাধক ও শাস্ত্রবিদ্‌দের নিয়া শিবচন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন সর্বমঙ্গলা সভা। এই সভার মাধ্যমে, শিবচন্দ্র এবং তাঁহার সহযোগী মনীষী ও সাধকদের চেষ্টায় তন্ত্রের শুদ্ধতর রূপটির সহিত সাধক ও ভক্ত জনগণের পরিচয় সাধিত হইতে থাকে।

শিবচন্দ্র একাধারে ছিলেন সিদ্ধপুরুষ, শাস্ত্রবিদ্, কবি ও বাগ্মী, কাজেই তাঁহার ব্যক্তিত্বের আকর্ষণ ছিল অপরিসীম। বিশেষ করিয়া জনজীবনে তাঁহার বাগ্মিতার প্রভাব ছিল বিস্ময়কর। বাংলা, সংস্কৃত এবং হিন্দিতে অনর্গলভাবে তিনি বক্তৃতা দিতে পারিতেন। তাঁহার জ্ঞানের গভীরতা, ভাষার আবেগময় ঝঙ্কার এবং তেজোদৃপ্ত উদ্দীপনায় সহস্র সহস্র শ্রোতা বিমুগ্ধ হইয়া যাইত, গ্রহণ করিত উচ্চতর জীবন সাধনার প্রেরণা।

এই সময়ে সারা উত্তর ভারতে সনাতন ধর্মের উজ্জীবনের জন্য এক প্রবল ভাবতরঙ্গ উত্থিত হয়। এই তরঙ্গের শীর্ষে অধিষ্ঠিত দেখি ধর্ম সংস্কৃতির ধারক বাহক একদল প্রতিভাধর পুরুষকে। ইহাদের

মধ্যে অগ্রণী—শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব, স্বামী কৃষ্ণানন্দ, শশধর তর্কচূড়ামণি, কালিবর বেদান্তবাগীশ প্রভৃতি।

শিবচন্দ্র এবং ইঁহাদের সমবেত চেষ্টায়, বিশেষত ইঁহাদের বাগ্মিতা ও লেখনীর প্রভাবে, ভারতের ধর্ম ও সংস্কৃতি সম্পর্কে শিক্ষিত সমাজে নূতন মূল্যবোধ জাগিয়া উঠে, হিন্দু ধর্মের শাশ্বত ও সর্বজনীন রূপের প্রতি সকলের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়।

শিবচন্দ্রের আবাল্য বন্ধু জলধর সেন তাঁহার অসাধারণ বাগ্মিতা সম্পর্কে বলিয়াছেন, "সাধু-ভাষায় এমন ওজস্বিনী বক্তৃতা ক'রে ঘণ্টার পর ঘণ্টা শ্রোতৃবর্গকে মন্ত্রমুগ্ধ ক'রে রাখবার শক্তি সত্যসত্যই শিবচন্দ্রের ছিল। সে সময়ে আরও একজনের সে শক্তি ছিল, তিনি পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন। উভয়ের বক্তৃতার একটা পার্থক্য এই ছিল যে, শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন চলতি ভাষায় বক্তৃতা করতেন, আর শিবচন্দ্র সাধুভাষায় বলতেন। বাংলা ভাষা যে কতদূর শক্তিসম্পন্ন, বাংলা ভাষার মাধুর্য যে কতদূর মনোমদ, যাঁরা বাগ্মীপ্রবর শিবচন্দ্রের বক্তৃতা শুনেছেন তাঁরা সেকথা অকুণ্ঠিত চিত্তে স্বীকার করবেন।"

তন্ত্রের প্রকৃত স্বরূপ ও মাহাত্ম্য প্রচারে উদ্বুদ্ধ হইয়া শিবচন্দ্র রচনা করিলেন 'তন্ত্রতত্ত্ব'। এই মহান্ গ্রন্থ তাঁর সারস্বত জীবনের এক মহান্ কীর্তি। তন্ত্রশাস্ত্রের প্রাচীনত্ব, মহত্ত্ব এবং প্রামাণিকতা এই গ্রন্থে তিনি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এই সঙ্গে চেষ্টা করিয়াছেন তন্ত্র সম্পর্কে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিদের অশ্রদ্ধা ও অবিশ্বাস দূর করিতে। এই গ্রন্থে তন্ত্রসিদ্ধ মহাপুরুষ শিবচন্দ্র একথাও প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে তন্ত্রের সহিত বেদ, দর্শন প্রভৃতির ও পুরাণের কোনো বিরোধ নাই। শুধু তাহাই নয়, তন্ত্র, বেদান্ত, বৈষ্ণব শাস্ত্র প্রভৃতি সকলেরই মধ্যে হিন্দু সাধনার পরমতত্ত্ব প্রতিফলিত, এই উদার সার্বভৌম মতও তিনি ইহাতে উপস্থাপিত করিয়াছেন। এই উদার শুভবুদ্ধি ও অখণ্ড জীবনবোধ শিবচন্দ্রকে চিহ্নিত করিয়া দেয় সমকালীন ভারতের এক অসামান্য ধর্মনেতা রূপে।

কবি, সাহিত্যিক ও তত্ত্বদর্শী শিবচন্দ্রের রচনার সংখ্যা কম নয়।

সাহিত্যিক মূল্যায়নের দিক দিয়াও এগুলি বৈশিষ্ট্যের দাবি রাখে। তাঁহার রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—তন্ত্রতত্ত্ব (১ম ও ২য় ভাগ), গঙ্গেশ (নাটক), দুর্গোৎসব (২খণ্ড), মা, কর্তা ও মন (১ম, ২য়) রাসলীলা (১ম, ২য়), গীতাঞ্জলি (১ম, ২য়), শৈব গীতাবলী, ভাগবতী তত্ত্ব, স্বভাব ও অভাব, পীঠমালা, স্তোত্রমালা, এবং দশমহাবিদ্যা স্তোত্র।

কৌল তত্ত্ব ও সাধনার ধারক বাহক 'শৈবী' নামক একটি পত্রিকাও কয়েক বৎসর তিনি সম্পাদনা করিয়াছিলেন।

বাংলার মানস ও সমাজ বিবর্তনে তন্ত্রের সাধন ও দার্শনিকতার প্রভাব অস্বীকার করার উপায় নাই। যুগে যুগে এ প্রভাব সক্রিয় হইয়া রহিয়াছে। শিবচন্দ্র তন্ত্রসিদ্ধ মহাপুরুষ এবং তন্ত্রশাস্ত্রের বিশিষ্ট প্রবক্তা, বিশেষ করিয়া উনবিংশ শতকের তন্ত্র-উজ্জীবনের চিহ্নিত নেতা। তাই বাংলায় তন্ত্রধৃতির বৈশিষ্ট্যটি স্মরণ রাখিয়াই তিনি অবতীর্ণ হইয়াছিলেন তাঁহার জীবন ব্রত উদ্‌যাপনে।

এ প্রসঙ্গে বাংলার সাহিত্য ও সমাজ মানসের সুধী সমালোচক অধ্যাপক মোহিতলাল মজুমদারের বক্তব্য অনুধাবনযোগ্য :

—তন্ত্র বলিতে যাহা বুঝায় তাহা বহু দেশের বহুকালের সাধন পদ্ধতির অঙ্গীভূত হইয়াছিল। প্রাক্ ঐতিহাসিক যুগেও ইহার প্রচার ছিল। উহা প্রাক্ বৈদিক তো বটেই। উহারই নানা রূপ ভেদ, নানা জাতির সাধনায় ঘটিয়াছে ; এককালে জগতের সকল সুপ্রাচীন সমাজে উহা প্রচলিত ছিল। সেই মূল তত্ত্বকে বহন করিয়া অতঃপর নানা যুগের নানা ধর্ম অল্পবিস্তর তান্ত্রিকতা আশ্রয় করিয়াছে। এ কথা সত্য হইলেও, বাংলার সম্বন্ধে দুইটি বিশেষ কথা অনুধাবন করিবার আছে। প্রথমত—এই বাংলার ভূমিতে উহা একটি নিরবচ্ছিন্ন ধারায় বহিয়া আসিয়াছে এবং এই বাংলাতেই ঐ সাধনার চরমোৎকর্ষ ঘটিয়াছে। দ্বিতীয়ত—তন্ত্র অর্থে যে সাধনতত্ত্ব বা পদ্ধতিই বুঝাক না কেন এবং যে কালে যে ধর্মের

সহিত যুক্ত হইয়া উহা একটি বিশিষ্ট রূপ ধারণ করুক না কেন সেই সকল মত ও সাধনপন্থা এই বাংলায় একটি বিশিষ্ট বাঙালী পন্থায় রূপান্তরিত হইয়াছে। তেমন আর কোথাও হয় নাই অতএব এমন কথা বলা যাইতে পারে যে, ঐ তন্ত্রও এই বাংলাদেশে একটা বিশেষ ভাববীজকে আশ্রয় করিয়াছে। এক কথায় শৈবতান্ত্রিক বা বৌদ্ধতান্ত্রিক বা তিব্বতীয়, চীনা তান্ত্রিক অথব আরও কোনো আদিম অসংস্কৃত তান্ত্রিক সাধনা কোনো এককালে বাংলায় প্রবেশ করিয়া থাকিলেও, বাঙালীর নিজের একটা তন্ত্র ছিল—সেই তন্ত্রে সকল তন্ত্রই বাঙালী তন্ত্র হইয়া উঠিয়াছে। এই বাঙালী তন্ত্রের সর্বশেষ জয় ঘোষণা আমরা দেখিয়াছি বাংলার শাক্ত ও বৈষ্ণব সাধনার অভ্যুদয়ে, বাংলার সহস্র সার্বিক সাধনার যে একটি বিশেষ সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহার পূর্ণ পুষ্পিতরূপ উহাই।[১]

সিদ্ধ কৌল শিবচন্দ্রের প্রচারিত তান্ত্রিকতায় বাংলার তন্ত্র-সাধনার সেই উদার ও সর্বসমন্বিত রূপ, সেই পুষ্পিত ও ফলিত রূপ আমরা দেখিতে পাই।

মহামায়া জগদম্বার স্বরূপ ব্যাখ্যা করিতে গিয়া সাধক শিবচন্দ্র লিখিয়াছেন :—মা! স্বরূপতঃ তোমার কোনো অংশই কখনও একেবারে দুইভাগে ঢাকা পড়িতে পারে না; কারণ একভাগে তুমি চিরকাল আবৃতা, আচ্ছাদিতা—লুক্কায়িতা অন্তর্হিতা, আর অন্যভাগে তুমিই নিবারণসুন্দরী—তুমি স্বপ্রকাশ জ্যোতির্ময়ী নিখিল আবরণের আবরণরূপিণী ব্যোমব্যাপিনী দিগম্বরী। যে ভাগ তোমার পশ্চাৎবর্তী তাহাই মা!—মায়া রাজ্য; আর যাহা মায়ার অতীত তত্ত্ব তাহাই তোমার সম্মুখবর্তী। মহাবিদ্যার দৃষ্টিপাতে অবিদ্যার আঁধার ঘুচিয়া যায়, তাই তোমার সম্মুখে মায়া দাঁড়াইতে পারে না। কিন্তু মা! এ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ডের একমাত্র উপাদান মায়া তবে কাহার আশ্রয়ে দাঁড়াইবে? তাই তো মায়া তোমার চরণে শরণাগতা, অভয়পদের

১ বাংলা ও বাঙালী : মোহিতলাল মজুমদার

চিরাশ্রয়ে নিরাপদে রক্ষিতা ; তাই মা! মায়ার অতীতা হইয়াও স্বয়ং তুমি মায়াময়ী মহামায়া[১]।

জগজ্জননীর অখণ্ড অদ্বৈতসত্তার উদ্ভাসন দেখা দিয়াছে সাধক শিবচন্দ্রের জীবনে। স্নেহময়ী ইষ্টদেবী আর পরাৎপরা মহাশক্তি এবার তাঁহার উপলব্ধিতে এক এবং অখণ্ড হইয়া গিয়াছেন। তাই তিনি বলিতেছেন :

—মূলে তিনি ব্রহ্মময়ী, বৃক্ষে তিনি মায়াময়ী, পুষ্পে তিনি জগন্ময়ী আবার ফলে তিনি মুক্তিময়ী ; ব্রহ্ম, ঈশ্বর, মায়া, অবিদ্যা এই চারি তাঁহারই স্বরূপ। একা তিনিই এই চতুর্ভাগে বিভক্ত হইয়া চরাচর জগতে আনন্দ লীলায় অভিনেত্রী, আপন আনন্দে আপনি মাতিয়া তিনি উন্মাদিনী, আপনি জন্মিয়া, আপনি মরিয়া, আপন শ্মশানে আপনি নাচিয়া, আপন শবে শিব হইয়া আপনি তিনি বিলাসিনী। আপনি পুরুষ আপনি প্রকৃতি, আপনি মহাকাল যুবতী, আপনি রতি, মতি, গতি পরমানন্দ নন্দিনী। আপনি মায়া, আবার আপনি অমায়া, আপনি মায়ারূপিণী ; আপনি বিদ্যা, আপনি অবিদ্যা, আপনি সাধ্যাসনাতনী, বেদ বেদান্ত পুরাণ তন্ত্র যাহাকে তুমি জিজ্ঞাসা করিবে, তিনি তাঁহার এই অদ্বৈত বিভূতির সুস্পষ্ট সাক্ষ্য প্রদান করিবেন।

—সাধক সেই শাস্ত্রীয় আস্তিক্য দৃষ্টিতেই তাঁহার বিদ্যা এবং অবিদ্যা উভয়রূপে ব্রহ্মাণ্ডলীলা দেখিয়া, কি বন্ধনে কি মোচনে, উভয় দশাতেই মায়ের কোলে বসিয়া থাকেন, তিনি সেই সোহাগে গলিয়া গিয়া সেই অভিমানে কঠিন হইয়া, আদরে মায়ের কোলে বসিয়া, বন্ধনে বদ্ধ দুটি হাত মায়ের হাতে ধরিয়া দিয়া গদ্‌গদ স্বরে বলিতে থাকেন "মা! তুই বড় পাগলী মেয়ে।"

. .

তন্ত্র অর্বাচীন নয়, সুপ্রাচীন—সনাতন তন্ত্র বেদবহির্ভূত নয়, বেদেরই অংশ। বৈদিক ঋষিদের অনেককেই তন্ত্রের মন্ত্রশক্তির

১ মা (১ম ভাগ) : শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব

সহায়তা গ্রহণ করিতে দেখা গিয়াছে। তাই বেদ ও তন্ত্রকে পৃথক করিয়া দেখা অতিশয় ভ্রমাত্মক—একথাটি শিবচন্দ্র বার বার তাঁহার লেখায় ও ভাষণে জোর দিয়া বলিয়াছেন :

—ভগবান্ ভূতভাবন নিজেই বলিয়াছেন : 'মথিত্বা জ্ঞানদণ্ডেন বেদাগম মহোদধি',—আমি জ্ঞানদণ্ডদ্বারা বেদশাস্ত্ররূপ মহাসমুদ্র মন্থন করিয়া তন্ত্ররূপ অমৃতের উদ্ধার করিয়াছি।..."

—বেদ বেদাঙ্গ বেদান্ত যদি তন্ত্রের পূর্বে না থাকিবে তবে বেদশাস্ত্র-সমুদ্রের মন্থন সম্ভবে কিরূপে? এতাবৎ যিনি তন্ত্রের প্রচারকর্তা, তিনিই তো নিজ মুখে বলিয়াছেন : বেদের পর তন্ত্রের প্রচার। তবে আর তন্ত্র আধুনিক বলিয়া নূতন কথাটা কি শুনাইলে ভাই? কিন্তু তাই বলিয়া মনে করিও না ৪০ হইতে ৭০ বৎসর যাহাদের পরমায়ুর পূর্ণ সংখ্যা তাহাদের পক্ষেও আধুনিক। ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-স্থিতি সংহার যাঁহার এক কটাক্ষের ফল, তন্ত্রের এ আধুনিকতা তাঁহার চক্ষেই শোভা পায়। দ্বিনেত্রের উপর যাঁহার ত্রিনেত্র উদ্ভাসিত, তন্ত্রের স্বরূপ তাঁহার দৃষ্টিতেই প্রতিবিম্বিত, ভগবানের আজ্ঞা, শব্দব্রহ্ম এবং পরব্রহ্ম উভয়েই আমার নিত্যদেহ। হিন্দুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া যথাশাস্ত্র তন্ত্রে বিশ্বাস করিতে হইলে ব্রহ্মের সচ্চিদানন্দ স্বরূপে আর শব্দব্রহ্মরূপে শাস্ত্রকে তাঁহারই নিত্যমূর্তি বলিয়া অবনতমস্তকে মানিয়া লইতে হইবে। তাহাতে কি বেদ, কি পুরাণ, কি তন্ত্র, কি জ্যোতিষ —ইহাদের সকলকেই ভগবানের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বলিয়া জানিতে হইবে। শাস্ত্রসকল যে এক কেন্দ্রবন্ধনে আবদ্ধ তাহার একটি বন্ধন ছিন্ন করিলেই সমস্তই বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবে। কাহারও সাধ্য নাই ইহার কোনো একটির বিপর্যয় ঘটাইতে পারে।

—বেদ-মূলকতা না থাকিলে যেমন কোনো শাস্ত্রের প্রামাণ্য নাই, কোনো শাস্ত্রের প্রামাণ্য না থাকিলেও তদ্রূপ বেদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নাই। বিশেষতঃ তন্ত্রশাস্ত্র মন্ত্রশাস্ত্র; মন্ত্রই বেদের জীবনীশক্তি বা পরমাত্মা। সুতরাং তন্ত্রশাস্ত্রের অভাব হইলে, বেদ তো তখন চেতনাহীন। বেদেও লোকের যেমন অধিকার, তন্ত্রেও তেমনিই।

আসলে বৈদিক হইয়া যেমন বেদ বুঝিতে হয়, তান্ত্রিক হইয়া তেমনি তন্ত্র বুঝিতে হয়। সেইরূপ উপনয়ন সংস্কারে সংস্কৃত হইয়া যেমন প্রকৃত ব্রাহ্মণ হইতে হয়, সাধনা করিয়া তেমনি সিদ্ধ হইতে হয়। মন্ত্রশাস্ত্র যদি বেদের আত্মা হয়, তবে আর বেদের পর তন্ত্রের সৃষ্টি—ইহা সঙ্গত কিরূপে ?....

—স্বয়ং মহাদেব হইতে আরম্ভ করিয়া ঋষিগণ পর্যন্ত সকলেই বেদের অনুসরণ-কর্তা ভিন্ন কর্তা কেহ নহেন। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, রামচন্দ্র প্রভৃতি ভগবদবতার এবং অন্যান্য দেবগণ যুগযুগান্তে সময়ে সময়ে বেদের প্রকাশক হইয়াছেন এইমাত্র। শাস্ত্র প্রচারের সময় সকল ঋতু মাস বৎসরাদির ন্যায় স্ব স্ব চক্রবর্তেই ঘুরিয়া আসিতেছে, তাই বেদেও তন্ত্রমন্ত্রের উল্লেখ দেখিতে পাই।

—বেদে তন্ত্রমন্ত্রের উল্লেখ শুনিয়া হয়তো অনেকেই চমকিত হইবেন। প্রকৃতপক্ষে আমরা তন্ত্রকে একমাত্র মন্ত্রশক্তিরই লীলাখেলা—সাধনাসিদ্ধির আকর—ভিন্ন আর কিছু বুঝি না। সেই মন্ত্র-শক্তিই বেদের সঞ্জীবনী। অন্যান্য শাস্ত্র বেদের অঙ্গ হইলেও মন্ত্রশক্তি বেদের পরমাত্মা। জগৎপিতা ও জগজ্জননীর প্রশ্নোত্তরে তাহাই আগম ও নিগম মূর্তিতে পুনঃপ্রকটিত হইয়াছে মাত্র। বেদ ও তন্ত্র উভয়ের যথাশাস্ত্র অধিকারী যিনি, তিনি একথা কখনও অস্বীকার করিতে পারিবেন না।

তন্ত্রশাস্ত্র যে বেদ ভিত্তিক, বেদেরই 'অন্তর্ভুক্ত, এবিষয়ে শিবচন্দ্র নিঃসংশয় ছিলেন। তাই লিখিয়াছেন[১] :

—হিন্দুজাতির একমাত্র আশ্রয় বেদবৃক্ষ—তান্ত্রিক পঞ্চোপাসনা উহারই পঞ্চশাখা। এই বিশাল শাস্ত্রবৃক্ষ সহস্র মন্বন্তর কল্পকল্পান্তরের প্রাচীন। জীবাত্মা পরমাত্মায় যে ভেদ, বেদ ও তন্ত্রে সেই ভেদ অর্থাৎ আত্মার অস্তিত্বে যেমন মনের (ন্যায় মতে জীবাত্মার) অস্তিত্ব, তন্ত্রের অস্তিত্বেও সেইরূপ বেদের অস্তিত্ব। জীবদেহে পরমাত্মা যেমন বিশুদ্ধ চিৎশক্তি, শাস্ত্রদেহেও তন্ত্র তদ্রূপ মন্ত্রময়ী চিৎশক্তি।

১ তন্ত্রতত্ত্ব, ১ম ভাগ : শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব

জীবাত্মায় যেমন সগুণ মনঃশক্তির প্রক্রিয়াসকল নিত্য প্রবাহিত, বেদেও তদ্রূপ স্বত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই ত্রিগুণ অধিকারানুরূপ জ্ঞানময় শক্তিসকল নিত্য অধিষ্ঠিত। মারণ, উচাটন ইত্যাদি ব্যাপারের অধিকাংশ তন্ত্রোক্ত প্রক্রিয়া অথর্ববেদে কথিত হইয়াছে। আবার বেদোক্ত অনেক মন্ত্রই তান্ত্রিক উপাসনায় নির্দিষ্ট হইয়াছে। ইহার পর বেদের যে শত সহস্র শাখা লুপ্ত হইয়াছে তাহাতে কত শত তান্ত্রিক উপাসনাতত্ত্ব বিলীন হইয়াছে, কাহার সাধ্য তাহার ইয়ত্তা করিবে? অন্য উদাহরণ নিষ্প্রয়োজন, বেদের সর্বস্ব সার সম্পত্তি প্রণবও যে তন্ত্রমন্ত্রারিক্ত নহে সাধকবর্গ মন্ত্রতত্ত্বে তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাইবেন।

তন্ত্র সাধনায় মন্ত্রের চৈতন্যময় ক্রিয়াশক্তির গুরুত্ব অত্যন্ত বেশী —একথাটি শিবচন্দ্র তাঁহাদের শিষ্যদের কাছে বার বার বলিতেন। আরও বলিতেন: "সাধকের আত্মশক্তি বায়ু স্থানীয় এবং মন্ত্রশক্তি অগ্নিস্থানীয়, এজন্য তাঁহার আত্মশক্তি নিমেষ মধ্যে তাহাকে বিপুল করিয়া তুলিতে পারে। শাস্ত্র যত কেন দূর পারাবার না হয়, একমাত্র ভেলা যেমন অগ্রসর হইয়া তোমাকে তাহার পারান্তরে লইয়া যাইবে, তদ্রূপ জ্ঞান, যোগ, সমাধিতত্ত্ব যত কেন দূরান্তর না হয় মন্ত্রময়ী মহাদেবী মূর্তিমতী হইয়া তোমার হাত ধরিয়া তাহার অপর পারে লইয়া যাইবেন। জ্ঞান, যোগ, সমাধি যাহারই কেন অনুষ্ঠান না কর, দেখিবে তাহার সকলের মধ্যেই সর্বেশ্বরী আনন্দময়ী মুক্তকেশী মা আমার আনন্দে হাসিয়া হাসিয়া নাচিতেছেন। তাঁহারই অশ্রান্ত নৃত্যভরে আমার জ্ঞানের সমুদ্রে প্রেমের তরঙ্গ উদ্বেলিত হইয়া পড়িতেছে।"

তন্ত্র গৃহ আর শ্মশান, যোগ ও ভোগ এই দুটিকেই যুক্তভাবে একীভূত সত্তায় দেখিতে শিখায়। জগৎ সৃষ্টির প্রতিটি ধূলিকণায় ব্রহ্মময়ী জগজ্জননীর বিভূতি ও স্বরূপ দর্শন করিয়া তন্ত্রাচারী বীর সাধক আনন্দে উদ্বেল হইয়া উঠে। তারপর দ্বৈত হইতে তাঁহার উত্তরণ ঘটে অদ্বৈতে, লীলা হইতে পৌঁছে গিয়া অদ্বৈতে। এই তত্ত্ব

ব্যাখ্যা করিতে গিয়া শিবচন্দ্র বলিয়াছেন, "অন্ধকার না থাকিলে যেমন আলোকের স্বরূপ অবগত হওয়া যাইত না তদ্রূপ এই নাম রূপাত্মক দ্বৈত ব্রহ্মাণ্ড না থাকিলে অদ্বৈত তত্ত্বও অবগত হওয়া যাইত না, দ্বৈতাদ্বৈত বিচার করিবার কর্তাও কেহ থাকিত না, প্রয়োজনও হইত না। মৃত্তিকা বুঝিতে হইলেই, যে দেশে ঘট কুম্ভ কুম্ভকার কিছুই নাই সেই দেশে গিয়া বুঝিতে হইবে, এরূপ নহে। বুদ্ধি থাকিলে ঘট সম্মুখে রাখিয়াই বুঝিতে হইবে যে, ইহা স্বরূপতঃ মৃত্তিকা বই আর কিছুই নহে; এইরূপে মৃত্তিকা তত্ত্ব যিনি বুঝিয়াছেন তিনি ঘট দেখিয়া বিস্মিত হন না. অধিকন্তু ব্রহ্মময়ীর অনন্ত শক্তি দেখিয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়া নামরূপ সকল ভুলিয়া প্রতিরূপে সেইরূপ দেখিতে থাকেন—যেরূপে এই বিশ্বরূপ ডুবিয়া গিয়া ব্রহ্মরূপের আবির্ভাব হয়, তুমি আমি ঘট দেখিলেও জ্ঞানী যেমন তাহাকে মৃত্তিকা বই আর কিছুই দেখেন না, তদ্রূপ তুমি আমি স্ত্রীপুত্র পরিবারময় সংসার দেখিলেও তান্ত্রিক সাধক তাহাতে ব্রহ্মময়ীর স্বরূপ বই আর কিছুই দেখেন না।"

কালপ্রবাহের ফলে, যুগপরিবর্তনের প্রভাবে, তন্ত্রসাধনা এবং তন্ত্রশাস্ত্রের মধ্যে অনেক কিছু অবাঞ্ছনীয় বস্তু ঢুকিয়া পড়িয়াছে। তাহার ফলে তন্ত্র ও কৌলসাধকদের বিরুদ্ধে পুঞ্জীভূত হইয়া রহিয়াছে সন্দেহ, ঘৃণা এবং অপপ্রচার। ইহার প্রতিবিধান কিরূপে হইবে? তন্ত্রসাধনা ও তন্ত্রশাস্ত্রকে ত্যাগ করিলে তো প্রকৃত সমস্যার সমাধান হইবে না। বরং ইহাদের পরিশুদ্ধ করিয়া নিতে হইবে, সাধনালব্ধ সত্যের কষ্টিপাথরে যাচাই করিয়া নিতে হইবে। এক কথায় তন্ত্রকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে তাঁহার স্বমহিমায়, স্থাপন করিতে হইবে প্রকৃত সাধনার্থীদের পূজাবেদীর উপর।

আচার্য শিবচন্দ্র তাই বলিয়াছেন, "পথে প্রান্তরে শ্রান্ত পথিকের বিশ্রামের শান্তিনিকেতন এই যে কোটি কোটি অশ্বত্থ বটবৃক্ষ দিগ্‌দিগন্তে শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া কি লৌকিক পথিক পরমার্থ পথিক লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি সাধু সন্ন্যাসী সাধক সিদ্ধমহাপুরুষ-

গণকে আশ্রয় দিয়া রক্ষা করিতেছে, কত যোগী যোগীন্দ্র, ঋষি মহর্ষি মুনিগণের সাধনা সিদ্ধ এই সকল স্থাবর গুরুতরুগণের চরণ প্রান্তে নিত্য নিবেদিত ত হইতেছে ; সেই বিশাল বৃক্ষের প্রান্তরে অন্ধকারে সর্বস্ব অপহরণের জন্য চোর দস্যুদল, কোঠরে বা শাখা-প্রশাখায় শরীর ঢাকিয়া কখনও কি লুক্কায়িত থাকে না ? এখন সেই অপরাধেই কি যেখানে দেখিব অশ্বত্থ বটবৃক্ষ, সেইখানেই তাহাকে সমূলে ছেদন করিতে হইবে ? কোনো রমণী কখনও যদি ব্যভিচারিণী হয়, এই অপরাধে বিবাহ প্রথা উঠাইয়া দেওয়া যেমন বুদ্ধিমানের কাজ নহে, বর্তমান সমাজেও অত্যাচারী স্বেচ্ছাচারীদিগের দোষে সর্বমঙ্গলরূপ শাস্ত্রভাণ্ডার তন্ত্রশাস্ত্রকে ত্যাগ করাও তাহাই।"

কালের প্রভাবে পুণ্যময় ভারতে ধর্ম এবং আত্মিক সাধনার অবনতি ও অবক্ষয় শুরু হইয়াছে, আর শক্তিবিভূতিধর সিদ্ধ তান্ত্রিক মহাপুরুষেরা দিন দিন দুর্লভ হইতেছেন। কিন্তু প্রকৃত শ্রদ্ধা এবং প্রকৃত দৃষ্টি দিয়া দেখিতে জানিলে এই সিদ্ধ মহাত্মাদের দর্শন এখনও মিলে। এখনও প্রচ্ছন্ন অস্তিত্ব হইতে, অন্তরাল হইতে, মাঝে মাঝে তাঁহারা প্রকট হন। এ সম্পর্কে নিজের অভিজ্ঞতা ও দর্শনের ভিত্তিতে শিবচন্দ্র মুমুক্ষদের আশ্বাস দিয়া বলিয়াছেন :

"এখনও তান্ত্রিক সিদ্ধ সাধক মহাপুরুষগণ নিজ নিজ তপঃপ্রভাবে ভারতের দিগ্‌দিগন্ত প্রজ্বলিত করিয়া রাখিয়াছেন, এখনও ভারতের শ্মশানে প্রতি অমাবস্যার ঘোরে মহানিশায় প্রজ্বলিত চিতাগ্নির সঙ্গে সঙ্গে ভৈরব ভৈরবীগণের জ্বলন্ত দিব্যজ্যোতি নৈশতমসা বিদীর্ণ করিয়া গগনাঙ্গন আলোকিত করে, এখনও শ্মশানের জলমগ্ন মৃত ও পচিত শবদেহ সাধকের মন্ত্রশক্তি প্রভাবে পুনর্জাগ্রত হইয়া সিদ্ধ সাধনায় সাহায্য করে, এখনও তান্ত্রিক যোগিগণ দৈব দৃষ্টি প্রভাবে এই মর্তলোকে বাস করিয়া দেবলোকের অতীন্দ্রিয় কার্য সকল প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। এখনও ভবভয়ভীত প্রণত শরণাগত ভক্ত সাধককে মুক্ত করিবার জন্য ভক্তভয়ভঞ্জিনী মুক্তকেশী মহা-শ্মশানে দর্শন দিয়া থাকেন। এখনও ব্রহ্মময়ীর সেই ব্রহ্মাদি বন্দিত

পদাম্বুজে ব্রহ্মরন্ধ্র স্থাপন করিয়া সাধক ব্রহ্মস্বরূপে মিশিয়া যান, এখনও মন্ত্রশক্তির অদ্ভুত আকর্ষণে পর্বতনন্দিনীর সিংহাসন টলিয়া থাকে। মুক্তিপুরীর শ্রান্ত যাত্রী সাধকের পক্ষে ইহাই চিরপ্রশস্ত রাজপথ, শয্যাশায়ী মুমূর্ষু অন্ধের পক্ষে ইহা অন্ধকার বই আর কিছুই নহে; কিন্তু অন্ধ, নিশ্চয় জানিও—এ অন্ধকার তোমারই নয়নপথে।"

প্রকৃত নিষ্ঠাবান্ ও ক্রিয়াবান্ তন্ত্রসাধকের জন্য শিবচন্দ্র যন্ত্র, অভিষেক, অভিচার ইত্যাদির ব্যবস্থা করিতেন, আর সাধারণ মাতৃ-সাধক ভক্তদের বেলায় জোর দিতেন মাতৃনাম জপের উপর। তিনি বলিতেন: "মাতৃনামে তারকব্রহ্ম নাম, এ নাম জাতিবর্ণ নির্বিশেষে সবাইকে উদ্ধার করে। তেমনি তন্ত্রসাধনা নির্বিচারে কোল দেয় সবাইকে।—"পারের ঘাটে নৌকায় উঠিতে যেমন জাতি বিচার নাই, গঙ্গার জলে স্নান করিতে যেমন পুণ্যাত্মা পাপাত্মার বিচার নাই, কাশীধামে মৃত্যু হইলে নির্বাণ মুক্তির অধিকারে যেমন স্থাবর জঙ্গম কীট পতঙ্গ কাহারও কোনো তারতম্য নাই, তদ্রূপ এই ভবসাগরের পারের নৌকায় জ্ঞানগঙ্গার পবিত্র জলে ব্রহ্মাণ্ডময় বারাণসী তান্ত্রিকদীক্ষায় দীক্ষিত হইতে কাহারও কোনো বাধা নাই। অধিক কি, কাহাকেও আত্মসাৎ করিতে অগ্নির যেমন আপত্তি নাই, তদ্রূপ কাহাকেও ব্রহ্মসাৎ করিতেও তন্ত্রের কোনো আপত্তি নাই, তাই তান্ত্রিক দীক্ষা ত্রৈলোক্য নিস্তারের অদ্বিতীয় এবং অমোঘ উপায়।"

শিবচন্দ্রের সাধনা, সিদ্ধি ও তত্ত্বোজ্জ্বলা বুদ্ধি তাঁহার জীবনে ফুটাইয়া তুলিয়াছিল সত্যকার পরমবোধ ও সমদর্শিতা। মহাকালীর আরাধনা ও শ্মশান-সাধকের আরাবে প্রমত্ত হইয়া উঠিতেন যে শিবচন্দ্র, তিনিই কৃষ্ণ-উপাসনা ও গোপীপ্রেমের কথা বলিতে বলিতে পুলকাঞ্চিত হইতেন, বক্ষ প্লাবিত হইত অশ্রুজলে।

তিনি বলিতেন, "আজও ভারতবর্ষের সে শুভদিনের সুপ্রভাত

হয় নাই, যাহাতে আমরা স্বাধীনভাবে গোপী প্রেমের বিনিময়ে ভগবানের তত্ত্বনির্ণয় নির্বিঘ্নে নিঃসংকোচে সাধারণের সমক্ষে খুলিয়া দিতে পারি।”

জননী সর্বমঙ্গলার সিদ্ধ সাধক, মহাকালীর পরমতত্ত্বের সংবাহক, শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব অবলীলায় গোপীপ্রেম সম্বন্ধে যে উচ্ছ্বসিত প্রশস্তি গাহিয়াছেন তাহা যে কোনো মহাবৈষ্ণবের লেখনীতেও দুর্লভ। তিনি লিখিয়াছেন :

—গোপীগণ নিজ নিজ হৃদয়কুম্ভ লইয়া প্রেমের জল আনিতে শ্যাম সরোবরের অভিমুখে ধাবিত হইয়াছেন, সে অগাধ প্রেমের জলে কামের কুম্ভ ডুবাইয়াছেন, দেখিতেছেন—তাহাতে একা গোপী কেন? অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের সুরাসুর নরনারী ঐ ত্রিতাপহরণ বারিদবর্ণ বারি সঞ্চয়ের জন্য তাঁহার কূলে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন, কেহ ডুবিয়াছেন, কেহ ডুবিতেছেন, কেহ ডুবাইতেছেন, আবার কেহ ডুবিবেন, কেহ ডুবাইবেন, যিনি একবার আসিয়াছেন তিনি আর ফিরিয়া যাইবেন না, যদিও কেহ ফিরিয়া যান, যেমন আসিয়াছিলেন তেমন আর ফিরিয়া যাইবেন না।

—শ্যাম সাগরের অগাধ জলে কামের কান্তি এবার ধুইয়া গিয়া প্রেমিকের প্রেমময় অঙ্গপ্রত্যঙ্গে শ্যামকান্তি ছড়াইয়া পড়িবে। তখন কি সাগরে কি নগরে, কি গহনে, কি পবনে, কি ভুবনে, শ্যামময় নয়ন হইয়াছে অথবা নয়নময় শ্যাম হইয়াছেন, বাঁশী বাজাইয়া মন হরণ করিয়া মনের অধীশ্বর আপনি আসিয়া মনের স্থান পূরণ করিয়াছেন, মনের সঙ্গে প্রাণকেও আকর্ষণ করিয়াছেন, এখন অবশিষ্ট বহির্মুখ দেহ বৃত্তি অন্তর্মুখ হইতে পারে না, হইলেও অন্তস্তাড়িত বহিঃনির্বাসিত কামকে বহিঃপ্রেম তরঙ্গের মতো প্রতিঘাতে লাঞ্ছিত মূর্ছিত করা যায় না, তাই সে বহির্মুখ দেহবৃত্তি বাহিরে আকর্ষণ করিয়া যোগীন্দ্রগণের অন্তরের নিধি বৃন্দাবনের নিকুঞ্জকাননে প্রেমমন্থর নটবর ত্রিভঙ্গ মধুর শ্যামসুন্দর আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন, তাই গৃহপিঞ্জর ভগ্ন করিয়া কুলবিহঙ্গী গোপিনীকুলকে কুলনাথ আজ প্রেমসাগরের অকূল কূলে

আকর্ষণ করিয়াছেন। কাহার সাধ্য তাহার জলে আত্ম অস্তিত্ব আর রাখিতে পারে ?

প্রকৃত শাক্ত ও বৈষ্ণবের মধ্যেকার কোনো পার্থক্যকে শিবচন্দ্র কোনোদিন আমল দিতেন না। স্বরচিত পদাবলীতে যে তত্ত্ব তিনি উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার সিদ্ধ জীবনের সমদর্শিতা ও অভেদদর্শনের পরিচয় আমরা পাই। তিনি লিখিয়াছেন :

শ্যাম ভক্ত আর শ্যামা ভক্ত,
আপনাকে দাও তাঁরই কাছে।
ওরে দাস হয়ে যাও প্রভুর পাছে,
ছেলে হয়ে রও মায়ের কাছে।
যারে শ্যামের বাঁশী বাজল প্রাণে,
তার কি আবার দু'কুল আছে ?
নাচ্‌ছে, শ্যামার অসি অট্টহাসি—
ভাঙ্গল কুল সে কুলের মাঝে।
কুলের মাঝে কুলের মা যে,
কুলকুণ্ডলিনী সাজে।
সে কুলের কাণ্ডারীর হাতে।
ঐ যে কুলের বাঁশী বাজে॥

কৈলাস ধাম আর বৈকুণ্ঠ ধাম সিদ্ধপুরুষের ধ্যাননেত্রে এক হইয়া গিয়াছে, জগজ্জননী উমা হইয়া উঠিয়াছেন রাসেশ্বরী—কৃষ্ণশক্তির সহিত একাত্মকা এবং একীভূতা। তাঁহার স্বরচিত নাটকে এই তত্ত্বের ব্যঞ্জনা পাই :

তপনে মা'র প্রভাশক্তি গগনে মায়ের মহিমা।
চন্দ্রমায় চন্দ্রিকা মা মোর, অণুতে মা অণিমা॥
পবনে মা বেগশক্তি, দহনে মোর দাহিকা মা।
জলে মায়ের শীতলতা, মধুরে মা'র মধুরিমা॥
ধরিত্রীর ধারণা শক্তি, জগদ্ধাত্রী আমারই মা।

বিধাতার বিধাতৃশক্তি, বিষ্ণুর স্থিতি-শক্তি মা।
মহারুদ্রের মহারৌদ্রী মহাশক্তি সেই আমার মা।
ব্রহ্মলোকে সাবিত্রী মা, বৈকুণ্ঠবাসিনী রমা॥
কৈলাসধামে, বাবার বামে, আমার মা-ই সেই গৌরী উমা।
আবার সেই—গোলোকধামে, শ্যামের পাশে
রাসেশ্বরী আমারই মা॥[১]

দীক্ষায়, শিক্ষায় এবং বংশগত ঐতিহ্য ও সংস্কারে শিবচন্দ্র ছিলেন নির্ভেজাল তান্ত্রিক। কিন্তু তৎসত্ত্বেও বৈষ্ণব সাধনার প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ছিল অপরিসীম।

গ্রামে মদনমোহনের একটি মন্দির ছিল, প্রতি বৎসর ঠাকুরের রথযাত্রা উৎসব সেখানে অনুষ্ঠিত হইত। মন্দির হইতে রথ মেলার দূরত্ব প্রায় এক মাইল। একটি বৃহৎ চৌদোলায় শ্রীবিগ্রহকে চড়ানো হইত, গ্রামবাসী ভক্তেরা সেটিকে কাঁধে তুলিয়া পরিক্রমণ করিতেন সমস্তটা পথ।

সেবার শিষ্যগণসহ তন্ত্রাচার্য শিবচন্দ্রও কাঁধে নিয়াছেন ঠাকুরের ঐ চৌদোলা। একে সেটি অত্যন্ত ভারী, তদুপরি একাজে তাঁহার মোটেই অভ্যাস নাই। কিছুটা পথ অগ্রসর হওয়ার পর গুরুভার চৌদোলার চাপে তাঁহার শরীর বাঁকিয়া গেল, ঘন ঘন হাঁফাইতে লাগিলেন।

এ সময়ে পাশ হইতে এক ব্যক্তি রসিকতা করিয়া মন্তব্য করিলেন, "আরে, একি আর মায়ের দুলালের কাজ?"

ক্লান্ত দেহে পথ চলিতে চলিতে শিবচন্দ্র তৎক্ষণাৎ দিলেন একধার এক সরস উত্তর, "আমি তো না হয় শুধু এক জায়গায় বেঁকে গেছি। কিন্তু বৃন্দাবনের দুলাল আর মা-যশোদার দুলাল, যাঁকে আমরা কাঁধে করেছি, তাঁর কি অবস্থা বলতো? তিনি তো নিজেই হয়েছেন ত্রিভঙ্গ মূর্তি—তিন জায়গায় বেঁকে গিয়েছেন। আমি কিন্তু

১ গজেশ (নাটক): শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব

ভাই, বহু চেষ্টা ক'রেও এখন অবধি অতটা বেঁকে যেতে পারি নি।” একথায় মদনমোহনের মিছিলের মধ্যে একটা হাসির উচ্ছ্বাস বহিয়া গেল।

প্রথম পরিচয়ের পর হইতে শিবচন্দ্রের আকর্ষণে লালন ফকীর মাঝে মাঝে কুমারখালিতে আসিয়া উপস্থিত হইতেন। দুই সাধকের মিলনে বহিয়া যাইত দিব্য আনন্দের তরঙ্গ।

লালন জাতিতে মুসলমান, ফকীর বাউলদের তিনি মধ্যমণি। কিন্তু জাতের বিচার তাঁহার কাছে কিছু নাই। একবার তাঁহাকে নিয়া গ্রামে একটু চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইল।

বহুদূরের পথ হইতে লালন ফকীর সেদিন আসিতেছিলেন। গ্রামে প্রবেশ করার পথেই পড়িল স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের টোল। সেখানে একটু বিশ্রাম করিবেন ভাবিয়া লালন বহির্বাটীর ঘরটিতে ঢুকিয়া পড়িলেন, এক কোণে বসিয়া পণ্ডিতমশাই একমনে ধূমপান করিতেছিলেন, লালন ফকীরের দিকে চোখ পড়িতে তড়াক্ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, রাগে গর্‌গর্ করিতে করিতে হুঁকাটি উপুড় করিয়া সবটা জল ফেলিয়া দিলেন।

নিমেষ মধ্যে লালন ব্যাপারটি বুঝিয়া নিলেন, পণ্ডিতমশাই জাত যাওয়ার ভয়ে ভীত, তাই তাড়াতাড়ি হুঁকার জল তাঁহাকে ফেলিয়া দিতে হইল। মনে মনে তিনি আহত হইলেন বটে, কিন্তু মুখে কিছুই বলিলেন না, ধীর পদে রওনা হইয়া গেলেন শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণবের চণ্ডীমণ্ডপের দিকে।

লালনকে পাইয়া শিবচন্দ্র আনন্দে উচ্ছল, দুই বাহু প্রসারিয়া তাঁহাকে কোল দিলেন। তারপর বিশ্রাম এবং জলযোগের পর শুরু হইল লালনের স্বরচিত বাউল সংগীত। ইতিমধ্যে ফকীরের আগমন বার্তা চারিদিকে রটিয়া গিয়াছে, মণ্ডপের সম্মুখে জড়ো হইয়াছে বহু কৌতূহলী দর্শক।

করজোড়ে দাদাঠাকুরকে নমস্কার জানাইয়া লালন এবার গান ধরিলেন :

সবে বলে লালন ফকীর হিন্দু কি যবন ?
লালন ব'লে আমার আমি না জানি সন্ধান ॥
এক ঘাটেতে আসা যাওয়া।
একই পাটনী দিচ্ছে খেওয়া।
তবুও কেউ খায়না কারও ছোঁয়া,
—ভিন্ন জল কোথাতে পান ?
বিবিদের নাই মুসলমানী।
পৈতা যার নাই সেও বাম্‌নী ॥
দেখরে ভাই দিব্যজ্ঞানী
দুই রূপ করলেন কিরূপ প্রমাণ।

শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব হাসিয়া বলেন, "ফকীর, তুমি সিদ্ধপুরুষ, তোমার আবার জাত কি ? ঈশ্বর আর তার সৃষ্টি, সব তোমার চোখে যে একাকার হয়ে গিয়েছে।"

"দাদাঠাকুর, মানুষের মনের মণিকোঠায় যিনি বসে আছেন, তিনি যে সকলের, আর সকলেই যে তাঁর। এই সাদা কথাটা কেউ বুঝে না বলেই তো যত গোল।"

একতারায় ঝঙ্কার তুলিয়া, ভক্তিরসে রসায়িত হইয়া, লালন আবার গাহিতে থাকেন :

ভক্ত কবীর জাতে জোলা,
প্রেম ভক্তিতে মাতোয়ালা।
ধরেছে সে ব্রজের কালা,
দিয়ে সর্বস্ব তার।
এক চাঁদে হয় জগৎ আলো।
এক বীজে সব জন্ম হলো।
ফকীর লালন ক'য়, মিছে কলহ
কেন করিস্ সদাই ?

গোঁড়া রক্ষণশীল দলের কিছু সংখ্যক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সেখানে উপস্থিত ছিলেন। লোকের কানাঘুষায় ইতিমধ্যে তাঁহারা শুনিয়াছেন,

স্মৃতিরত্নের বহির্বাটীর ঘটনার কথা। তাঁহারা বলেন, "মুসলমান লালনের স্পর্শদোষ এড়ানোর জন্য হুঁকোর জল ফেলে দেওয়া হয়েছে, তাতে দোষ কি হয়েছে? বর্ণাশ্রম আর আচার বিচার সব লোপ পেলে হিন্দুধর্মের রইল কি?"

এবার শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণবকে লক্ষ্য করিয়া তাঁহারা বলেন, "আচ্ছা, মা-সর্বমঙ্গলার দুয়ারের সামনে মুসলমান লালন ফকীরকে দিয়ে বর্ণাশ্রম বিরোধী এই যে সব গান আপনি গাওয়াচ্ছেন, এটা কি ভালো হচ্ছে?"

শিবচন্দ্র উত্তরে কিছু বলিবার আগেই লালন ভাবাবেশে নাচিয়া নাচিয়া আবার গান ধরেন:

ধর্ম-প্রভু জগন্নাথ
চায়না রে সে জাত অজাত।
ভক্তের অধীন সে রে।
যত জাত-বিচারী দুরাচারী,
যায় তারা সব দূর হয়ে।
লালন ক'য়, জাত হাতে পেলে
পুড়াতাম আগুন দিয়ে রে।

আগুন দিয়া পোড়ানো হইবে 'জাত'-কে? এসব কি কথা? বর্ণাশ্রম ধর্মের চাঁইদের কয়েকজন উত্তেজিত হইয়া উঠেন, নিন্দা সমালোচনা শুরু করেন।

শিবচন্দ্র সতেজে উঠিয়া দাঁড়ান। সবাইকে নীরব হইতে ইঙ্গিত করিয়া বলিতে থাকেন, "ছাখো, জাতিভেদ মানা বা না মানা যার যার নিজের ব্যক্তিগত কথা। এ নিয়ে নিন্দা সমালোচনা বা ঝগড়া বিবাদ থাকবে কেন? বহিরঙ্গ জীবনে যত ভেদ বিভেদই আমরা দেখি না কেন, মূলত সর্ববস্তু ও সর্বজীব এক। একই ব্রহ্মময়ী মা সবার ভেতরে রয়েছেন অনুস্যূত। হিন্দুর বেদ, তন্ত্র ও দর্শনে রয়েছে সেই পরম এক এবং অদ্বিতীয়ের কথা। মুসলমান ধর্মও বলেছে— লা ইলাহা ইল্লা আল্লাহ্। আল্লাহ্ ছাড়া অপর কোনো ঈশ্বর নেই

—তিনিই হচ্ছেন অদ্বিতীয় সত্তা। তবে, এ নিয়ে বৃথা এতো বাদ বিসম্বাদ কেন, বলতো?”

অতঃপর বেদ ও আগম নিগম হইতে বহুতর শাস্ত্রবাক্য উদ্ধৃত করিয়া সবাইকে তিনি বুঝাইয়া দিলেন, হিন্দুর ব্রহ্মবাদ ও পরা-শক্তিবাদের আসল কথা—অভেদ তত্ত্ব। এই তত্ত্বের উদারতা ও সর্বজনীনতা উপলব্ধি না করিলে হিন্দুধর্ম রক্ষা করা সম্ভব হইবে না। নিন্দুক ও সমালোচকেরা এবার নীরব হইয়া গেল।

লালন ফকীর সিদ্ধ বাউল, সদানন্দময় পুরুষ, বহিরঙ্গ জীবনের অনেক কিছু ঝড় ঝাপটার বহু উর্ধ্বে তিনি বিচরণ করেন। লালন কহিলেন, “দাদাঠাকুর, পাহাড়ের ওপরে উঠে গেলে নিচের সব কিছু সমান দেখা যায়, তোমার তাই হয়েছে। তুমি পাহাড়ের চূড়ায় উঠে বসে আছো, আর আপন ভাবে আপনি রয়েছো মশগুল। তাইতো, মাঝে মাঝে তোমায় নামিয়ে আনি আমাদের এই মাটিতে, এতো বিতর্ক, এতো হৈ-হুল্লোড় ক'রে তোমায় হুঁশে আনি, তোমার ভেতরকার প্রেমরস টেনে বার করি।”

প্রেমাবিষ্ট সিদ্ধপুরুষ শিবচন্দ্র ফকীরকে আবদ্ধ করেন প্রেম-আলিঙ্গনে, টানিয়া নেন বুকের মধ্যে।

“আবার আসবো দাদাঠাকুর, আবার প্রাণভরে তোমার কথা শুনবো,”—একথা বলিয়া লালন সেদিনকার মতো বিদায়গ্রহণ করেন।

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দ। বঙ্গভঙ্গের আগুন তখন দাবানলের মতো বাংলার দিকে দিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে। প্রখ্যাত নেতা ও বাগ্মী সুরেন্দ্র-নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এসময়ে কুষ্টিয়ায় আসিয়াছেন স্বদেশী মেলায় ভাষণ দিবার জন্য। তাঁহার পার্শ্বে উপবিষ্ট আছেন রুদ্রাক্ষ ও রক্তচন্দনে বিভূষিত তেজোদৃপ্ত শিবচন্দ্র।

সুরেন্দ্রনাথ বক্তৃতা দিলেন ইংরেজীতে, যুক্তি-তর্ক, ভাবময়তা ও রাষ্ট্রচেতনায় তাহা ভরপুর। কিন্তু গ্রামাঞ্চলের খুব কম লোকেরই

তাহা বোধগম্য হইল। এবার শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব উঠিলেন তাঁহার বক্তব্য বলার জন্য। প্রায় দশ সহস্র নরনারী শহরের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে সমবেত হইয়াছে, তাহাদের সম্মুখে জগন্মাতা আর দেশমাতার ঐক্যবোধ জাগাইয়া তুলিয়া উদাত্ত কণ্ঠে, সাধু বাংলা ভাষায়, প্রাণ-উন্মাদনাকারী ভাষণ দিতে তিনি শুরু করেন, শ্রোতারা ভাবের উচ্ছ্বাসে উদ্বেল হইয়া উঠে।

সিংহ-পুরুষ শিবচন্দ্র ওজস্বিনী ভাষায় কহিলেন, "দেশমাতা আর জগন্মাতায় কোনো ভেদ নেই। অখিল ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিনী হয়ে রয়েছেন মা ব্রহ্মময়ী। এই ধরিত্রী ও তার অংশ ভারতবর্ষ সেই ব্রহ্মময়ীরই অংশ ছাড়া আর কিছু নয়। জগজ্জননী মহামায়া যেমন বিশ্বাতীতা, তেমনি আবার বিশ্বগতাও বটেন। তাই ধ্যানদৃষ্টিতে দেখা যায়; দেশমাতার ভেতরেই রয়েছেন চৈতন্যরূপা ব্রহ্মময়ী।"

স্বদেশের এই চৈতন্যময় সত্তার কথাটি বজ্র নির্ঘোষে ঘোষণা করিয়া আবার তিনি কহিলেন, "এই আমাদের 'মা'-টি, ইনি কিন্তু শুধু মাটি নন—ইনি, হলেন প্রকৃত 'মা'-টি। এই 'মা'-টিকে খাঁটি ক'রে ধরতে হবে। নান্য পন্থা বিদ্যতে অয়নায়। এই 'মা'-টিকে এতদিন আমরা চিনতে পারি নি, একে ছেড়ে দিয়ে বসে আছি, তাই তো আমরা মাটি হতে বসেছি। শিবহীন দক্ষযজ্ঞ বিনাশের পর এমনি ক'রেই মায়ের অঙ্গচ্ছেদ হয়েছিল।"

শিবচন্দ্রের এই ভাষণ শুনিয়া জনতার মধ্যে প্রবল উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়, জয়ধ্বনি ও করতালিতে সভাপ্রাঙ্গণ মুখরিত হইয়া উঠে। প্রধান বক্তা সুরেন্দ্রনাথ বিস্ময় বিস্ফারিত নয়নে সাধক শিবচন্দ্রের দিকে চাহিয়া থাকেন।

সেদিনকার ঐ স্মরণীয় বক্তৃতা সম্পর্কে পণ্ডিত রাধাবিনোদ বিদ্যাবিনোদ লিখিয়াছেন, "তাঁহার সেই ছন্দোময়ী ভাষার কি মাধুর্যময়ী তেজস্বিতা, আর তাঁহার সেই উদাত্ত কণ্ঠের কি কমনীয় নমনীয়তা। তিনি উচ্ছ্বসিত হইয়া ললিত উদাত্ত কণ্ঠে বক্তৃতা করিতেছিলেন, মনে হইতেছিল যেন পুণ্য সলিলা জাহ্নবী কল-

তরঙ্গভঙ্গে নাচিয়া নাচিয়া ছুটিয়া চলিয়াছেন। তদুপরি তাঁহার ত্রিপুণ্ড্রক লাঞ্ছিত গৌরবর্ণ ললাটস্থিত রক্ততিলকের আভা, আয়ত নেত্র সমুদ্ভাসিত তপ্তকাঞ্চন বিনিন্দিত মুখমণ্ডলের সেই প্রশান্ত জ্যোতি, আবক্ষ-লম্বিত কাঁচ পাথর সমন্বয়ে গ্রথিত রঙবেরঙের বিচিত্র রুদ্রাক্ষের মালা, সর্বোপরি আজানুলম্বিত সেই রক্তগৈরিক, সবগুলি মিলিয়া তাঁহাকে এক অনির্বচনীয় শ্রী প্রদান করিয়াছিল।

"তিনি বক্তৃতা প্রদান করিতেছিলেন ভাবে বিভোর হইয়া। আর তাঁহার দুই আয়ত নেত্র বহিয়া দর-বিগলিত ধারায় অশ্রু নির্গত হইয়া তাঁহার বক্ষোদেশ প্লাবিত করিতেছিল। মহাকবি ভবভূতির বজ্রাদপি কঠোরানি মৃদুনি কুসুমাদপি ইত্যাদি উক্তি যে বর্ণে বর্ণে সত্য, সেদিন সেকথা আমরা সম্যক্ বুঝিতে পারিয়াছিলাম। বুঝিয়াছিলাম, শিবচন্দ্র সত্যই একজন লোকোত্তর-চরিত পুরুষ।"

কাশী ও বৈদ্যনাথধাম শিবচন্দ্রের খুব প্রিয় ছিল। কাশীতে নানা গুপ্ত শক্তিপীঠে বিশেষ করিয়া মণিকার্ণিকার শ্মশানে কৌলপদ্ধতি অনুসারে বহু নিগূঢ় তান্ত্রিক ক্রিয়া তিনি সম্পন্ন করিয়াছিলেন। পরবর্তীকালে, সর্বমঙ্গলা সভা স্থাপনের পর দীর্ঘদিন কাশীই ছিল তাঁহার প্রধান কর্মকেন্দ্র। সেখানে অবস্থান করিয়া উত্তর ভারতের তন্ত্রাচারী সাধকদের সঙ্গে তিনি যোগাযোগ রক্ষা করিতেন এবং সর্বমঙ্গলা সভার মাধ্যমে তন্ত্রশাস্ত্রের প্রচারে তৎপর থাকিতেন।

তপস্যার জন্য কয়েকবার তিনি বৈদ্যনাথধামে অবস্থান করেন। এই সময়ে শুধু সেখানকার বাঙালী সমাজেই নয়, স্থানীয় পণ্ডিত এবং পাণ্ডাদের মধ্যেও, তাঁহার প্রভাব ছড়াইয়া পড়ে। ইঁহাদের অনেকে তাঁহাকে শিবকল্প মহাপুরুষ বলিয়া মনে করিতেন, দেবতা জ্ঞানে শ্রদ্ধা ও সমীহ করিতেন।

বৈদ্যনাথধামের শ্মশানটি ছিল শিবচন্দ্রের অতি প্রিয় সাধন-স্থান। কৃষ্ণা চতুর্দশী বা অমাবস্যার নিশীথ রাত্রে এই প্রাচীন শ্মশানে গিয়া তিনি উপস্থিত হইতেন, সারা রাত্রি ব্যাপিয়া অনুষ্ঠান করিতেন

তাঁহার সংকলিত ক্রিয়া এবং অভিচার। মাঝে মাঝে কৌলপন্থার শ্রেষ্ঠ ক্রিয়া শবসাধনাও তিনি সেখানে সম্পন্ন করিতেন।

গঙ্গাপ্রসাদ ফলাহারী নামে এক শক্তিমান্ তান্ত্রিক সাধক সেই সময়ে বৈদ্যনাথধামে বাস করিতেন। শিবচন্দ্রের শক্তি বিভূতি ও তন্ত্রশাস্ত্রের জ্ঞান সম্পর্কে অবগত হইয়া গঙ্গাপ্রসাদজী তাঁহার খুব অনুরক্ত হইয়া পড়েন। শ্মশানের কয়েকটি নিগূঢ় অনুষ্ঠানে তিনি যোগ দেন শিবচন্দ্রের সহকারীরূপে।

শিবচন্দ্র যখন যেখানেই বাস করুন না কেন, ইষ্টদেবী সর্বমঙ্গলার অর্চনা ও ভোগের ব্যাপারে কখনো কোনো ত্রুটি হইতে পারিত না। তাঁহার এই তান্ত্রিকী পূজার উপচার ও বিধিবিধান ছিল নানা রকমের এবং এগুলি সম্পর্কে কখনো কোনো ত্রুটিবিচ্যুতি ঘটিবার উপায় ছিল না। পূজা, ভোগরাগ, আরতির প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি তান্ত্রিক প্রণালী অনুসারে সম্পন্ন করা হইত। কুমারী পূজা এবং শিবাভোগ প্রদানও ছিল শিবচন্দ্রের নিত্যকার কর্ম। ভোগ প্রসাদ গ্রহণে শিবাদল যদি কখনো দেরি করিত, সজল নয়নে 'আয় আয়' বলিয়া শিবচন্দ্র তাহাদের ডাকিতে থাকিতেন এবং তারপরেই ঘটিত তাহাদের আবির্ভাব। নীরবে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে প্রসাদ গলাধঃকরণ করিয়া তাহারা সরিয়া পড়িত।

শিবচন্দ্রের আচার্য জীবনে কৃপালীলার প্রকাশ বহুবার দেখা গিয়াছে। শুধু ভক্ত ও মুমুক্ষু মানুষই তাঁহার আশ্রয় নেয় নাই, ঈশ্বর-বিমুখ এবং সংশয়বাদী দুরাত্মারাও তাঁহার চরণে ঠাঁই নিয়াছে, দীক্ষা ও শিক্ষার মধ্য দিয়া শুরু করিয়াছে উন্নততর জীবন।

কালীধন চট্টোপাধ্যায় ছিলেন এমনই এক ব্যক্তি। হাওড়ার ব্যাঁটরা গ্রামে তিনি বাস করিতেন। দেব দ্বিজে কোনোদিনই তাঁহার ভক্তি শ্রদ্ধা ছিল না; অতিমাত্রায় ছিলেন আত্মম্ভরী ও ঈশ্বরদ্বেষী। সাধু সন্তের দেখা পাইলেই তাঁহাদের সম্বন্ধে নিন্দা ও বক্রোক্তি শুরু করিতেন, কখনো কখনো অপমান করিতেও ছাড়িতেন না।

শিবচন্দ্র তখন কিছুদিনের জন্য হাওড়ার শিবপুরে অবস্থান করিতেছেন। এই খ্যাতনামা তন্ত্রসিদ্ধ পুরুষকে দর্শনের জন্য প্রতিদিন সেখানে ভিড় জমিয়া উঠিত।

কালীধন চট্টোপাধ্যায়কে মাঝে মাঝে ঐ দিক দিয়া যাওয়া আসা করিতে হইত। অদূরে দাঁড়াইয়া তিনি এই জনসংঘট্ট দেখিতেন এবং শিবচন্দ্র সম্পর্কে করিতেন নানা শ্লেষাত্মক উক্তি। শিবচন্দ্রের বিশিষ্ট শিষ্য যতীন মুখোপাধ্যায়ের সহিত কালীধনের বন্ধুত্ব ছিল। যতীনবাবু একদিন কহিলেন, "সাধুকে ভালো ক'রে ঘনিষ্ঠভাবে না দেখে তাঁর সম্পর্কে মন্তব্য করা কি ভালো হে? কালীধন, তুমি একদিন আমার সঙ্গে ঠাকুরের কাছে চল। তাঁর দিব্যমূর্তি একটিবার দর্শন করলে, আর ওজস্বিনী বাণী শুনলে, তোমার এত সব লম্ফঝম্ফ আর থাকবে না।"

কালীধনের মুখে তাচ্ছিল্যের হাসি। বলেন, "নিজের পায়ে যার জোর নেই, সে-ই লাঠি ভর দিয়ে হাঁটে। সাধুর ওপর নির্ভর করে তারাই, যারা দুর্বল, আর নেই কোনো আত্মবিশ্বাস। তাছাড়া, ভাই, ঠিক ক'রে বলতো, তোমার এই তান্ত্রিক গুরুর শক্তি কতটা, আর কি তিনি আমায় দিতে পারেন?"

"তিনি সেই শান্তি দিতে পারেন, যা আজ অবধি কোথাও তুমি পাও নি। আর যদি তার চেয়ে আরো বড় কিছু চাও, ঈশ্বর দর্শন চাও, তাঁর কৃপায় তাও হতে পারে। মা-সর্বমঙ্গলার আদরের দুলাল শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব। মায়ের কাছে যা যিনি সুপারিশ করবেন তাই যে তুমি পাবে ভাই।"

"যাই বল না কেন, মাথায় জটা, পরনে গৈরিক, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, ঐ সব সাধু সন্ন্যেসী দেখলেই রাগে আমার পিত্তি জ্বলে যায়। থাক্ ভাই, ওসব আসরে যেতে আমায় আর অনুরোধ ক'রো না।"

"কালীধন, একবার আমার গুরুকে দর্শন ক'রেই এসোনা। সারা জীবনটা তো পাষণ্ডের মতোই কাটালে, পাপও ঢের তুমি করেছো। একবার ভগবানের রাজ্যের এ দিকটাও একটু জাখোনা। তুমি শক্ত

লোক, আত্মবিশ্বাসী লোক, এ সাধু তো তোমার মতো লোককে দর্শনমাত্র গিলে খাবেন না।”

কি জানি কেন, কালীধনের সুমতি হইল, বন্ধুর সঙ্গে উপস্থিত হইলেন সিদ্ধ মহাপুরুষ শিবচন্দ্রের আবাসে।

কালীধনকে দেখামাত্র আচার্য শিবচন্দ্র তাঁহাকে কাছে ডাকিলেন, স্নেহপূরিত কণ্ঠে কহিলেন, “ওরে আয়, আয়। আমার কাছে আয়। মায়ের পাগল ছেলে যে তুই, এতদিন মাকে ভুলে কোথায় ছিলি? তোর সঙ্গে একটিবার দেখা না ক'রে যে এ জায়গা আমি ছাড়তেই পারছিলুম না। আয় আয়।”

মুহূর্ত মধ্যে কালীধনের নয়ন সমক্ষে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল সিদ্ধপুরুষের জ্যোতির্ময় দিব্যমূর্তি। অন্তরাত্মা হইতে কে যেন ডাকিয়া বলিল, ‘অকূলে পথহারা হয়ে এযাবৎ কেবলি তুই ঘুরে বেরিয়েছিস্, পাপ-প্রবৃত্তির তাড়নায় দিক্‌ভ্রান্ত হয়েছিস্ বার বার। এবার মিলেছে তোর পরমাশ্রয়। এই পরম দয়াল মহাত্মার চরণে তুই শরণ নে, লাভ কর্ পরমা পরম শান্তি।”

অহংকার, বিচারবুদ্ধি বা বিতর্কের কোনো অবকাশ রহিল না। আবেশে কালীধনের সারা দেহ ঘন ঘন কম্পিত হইতেছে, দুই চোখে ঝরিতেছে অশ্রুধারা, ছুটিয়া গিয়া পতিত হইলেন শিবচন্দ্রের আসনের সম্মুখে, কিছুক্ষণের জন্য বাহ্যজ্ঞান রহিল না।

অতঃপর আচার্য শিবচন্দ্রের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া কালীধন চট্টোপাধ্যায় শুরু করেন তন্ত্রানুসারী সাধন-ক্রিয়া। গুরুর কৃপায় উত্তরকালে পরিণত হন এক বিশিষ্ট সাধকরূপে।

তন্ত্র-অনুরাগী সাধকদের শিবচন্দ্র সাধারণত সংসারে থাকিয়াই সাধন করিতে বলিতেন। সে-বার এক সন্ন্যাসকামী দীক্ষিত শিষ্যকে তিনি বলিয়াছিলেন, “দেবাদিদেব স্বয়ং বলেছেন, গৃহস্থ আশ্রমে থেকেও ভক্ত সাধকেরা সিদ্ধি লাভ করতে পারে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, ঘর-সংসারে জড়িয়ে থেকে কেবলই ধন বৃদ্ধি ক'রে যেতে হবে। সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী সাধন ও গুরুকৃপার বলে ব্রহ্মলাভ

ক'রে থাকে, আবার সংসার-আশ্রমী সাধকের হৃদয়ে ব্রহ্মতত্ত্বের স্ফুরণ হলে গোটা সংসারটাই হয়ে পড়ে ব্রহ্মময়।

"সংসার ছেড়ে অত দূরের পথ পর্যটন করা কলিযুগের জীবের পক্ষে সহজসাধ্য নয়, তাই তন্ত্রশাস্ত্র বলেছেন, সংসারে বাস ক'রেই বাড়িয়ে তোল ব্রহ্মদৃষ্টি। যে সব সাধক গৃহী হয়েও বৈরাগ্যবান্ এবং কায়মনোবাক্যে সন্ন্যাসী, তাঁরাই তো সত্যকার শ্মশানবাসী। শব আর কঙ্কালে পূর্ণ পূতিগন্ধময় মহাশ্মশানে তাঁরাই তো চৈতন্যরূপী মহাশিব।

"জগজ্জননী মহামায়া অনাদি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে তাঁর মায়ারূপী কেশপাশ এলিয়ে দিয়েছেন, সবাইকে ভোলাচ্ছেন তাঁর মায়ায়। আবার ছাখো, ঐ কেশপাশ ছুঁয়ে আছে তাঁর চরণ ছু'টি। ঐ চরণে রয়েছে যে তাঁর কৃপা, যে কৃপায় হয় সিদ্ধি আর মুক্তি। সংসারে থেকে ক্রিয়াবান্ সার্থক তান্ত্রিক হও, মহামায়ার চরণ ধরে পড়ে থাকো, মায়ার কেশপাশে আর জড়িয়ে পড়তে হবে না।"

শিবচন্দ্রের করুণালীলার অপর একটি ঘটনা শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার পাল বর্ণনা করিয়াছেন।

একদিন কুমারখালিতে সর্বমঙ্গলার মন্দিরে বসিয়া ভক্ত শিষ্যদের সাহত তিনি নানা তত্ত্বালাপ করিতেছেন। হঠাৎ সেখানে এক জরুরী তারবার্তা আসিয়া উপস্থিত। যশোরের নলডাঙ্গার জমিদার এটি প্রেরণ করিয়াছেন, তাঁহার পুত্র হঠাৎ এশিয়াটিক কলেরায় আক্রান্ত হইয়াছে এবং জীবনের কোনো আশা নাই, শিবচন্দ্র যেন কৃপা করিয়া তাঁহাকে রক্ষা করেন।

এই পরিবারটির উপর শিবচন্দ্রের গভীর স্নেহ ছিল। কিছুক্ষণ নীরবে থাকিবার পর তিনি সর্বমঙ্গলার একটি বিশেষ পূজা অনুষ্ঠানের জন্য তৎপর হইয়া উঠিলেন।

তখন রাত্রি হইয়া গিয়াছে। ঘন অন্ধকারে চারিদিক সমাচ্ছন্ন। দানবারি গঙ্গোপাধ্যায় এবং অন্যান্য ভক্তেরা আচার্যের নির্দেশ পাইয়া

অতি সত্বর প্রয়োজনীয় বহুবিধ উপচার সংগ্রহ করিয়া আনিলেন। কিন্তু একজোড়া বোয়াল মৎস্য কোনোমতেই জোটানো গেল না।

কথাটি শিবচন্দ্রের কানে যাওয়া মাত্র তিনি কহিলেন, "চিন্তার কোনো কারণ নেই। এখনি কাউকে পাঠিয়ে দাও কুণ্ডুবাবুদের পুকুরে, মাছ পেতে দেরি হবে না।" এই নির্দেশ অনুযায়ী মৎস্য অনতিবিলম্বে ধরিয়া আনা হইল, এবার শিবচন্দ্র তাঁহার সহকারীদের নিয়া রুদ্ধদুয়ার মন্দিরে শুরু করিলেন মায়ের অর্চনা।

পূজা শেষে হোমকুণ্ডে দেওয়া হইল পূর্ণাহুতি। রাত্রি তখন শেষ হইয়া আসিয়াছে, শিবচন্দ্র মন্দিরকক্ষ হইতে বাহিরে আসিয়া সহাস্যে কহিলেন, "আর ভয় নেই, মা সর্বমঙ্গলার কৃপায় ছেলেটির প্রাণরক্ষা হয়েছে। এবার কয়েকদিনের ভেতরই সে সুস্থ হয়ে উঠবে।"

তিন দিন পরেই কুমারখালিতে আর একটি তারবার্তা আসিয়া উপস্থিত। লেখা রহিয়াছে, রোগীর সংকট কাটিয়া গিয়াছে, ঠাকুরের কৃপাদৃষ্টি যেন তাহার উপর নিবদ্ধ থাকে।

শিবচন্দ্রের আচার্য জীবনে, তন্ত্রশাস্ত্র প্রচারের কাজে, বড় সহায়ক ছিলেন তাঁহার দীক্ষিত ও কৃপাপ্রাপ্ত শিষ্য স্যর জন উডরফ। তন্ত্র সাধনা ও তন্ত্রশাস্ত্রের পুনরুজ্জীবন ঘটুক, শুদ্ধ বীরাচারী তন্ত্রসাধনা আবার পূর্ব গৌরবে অধিষ্ঠিত হোক, এই প্রার্থনাই শিবচন্দ্র বার বার নিবেদন করিতেন জননী সর্বমঙ্গলার কাছে। আরো চাহিতেন, শুধু ভারতেই নয়, সারা বিশ্বে এই মাতৃসাধনার বীজ ছড়াইয়া পড়ুক এবং এই সাধনার মাধ্যমে ভারতের ধর্ম সংস্কৃতির জয়গৌরব ঘোষিত হোক দিগ্‌বিদিকে।

শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণবের প্রণীত তন্ত্রতত্ত্বের ইংরেজী অনুবাদ সম্পন্ন করান শিষ্য উডরফ। তন্ত্ররহস্য উদ্‌ঘাটনের জন্য ইংরেজী ভাষায় আরো কয়েকটি মহামূল্যবান গ্রন্থও তিনি রচনা করেন, আজো তাহা সারা বিশ্বের শিক্ষিত সমাজের সম্মুখে তন্ত্রের বিজয় বৈজয়ন্তী

উড্ডীন করিয়া রাখিয়াছে।[১] এই গ্রন্থগুলি উডরফ রচনা করেন তাঁহার ছদ্মনামে। আভালন নাম দিয়া এগুলি প্রকাশিত হয়।

এ সব গ্রন্থে তন্ত্রের তত্ত্ব এবং ধর্মসাধনায় তন্ত্রের বৈজ্ঞানিক উপযোগিতার উপর উডরফ জোর দিয়াছিলেন। নিগূঢ় রহস্যে ঘেরা তন্ত্রসাধনার প্রতি এতকাল বিশ্বের শিক্ষিত সমাজে যে ভীতি ও অবজ্ঞা ছিল, উডরফের প্রয়াসে তাহার কিছুটা দূর হয়।

শিবচন্দ্র ও উডরফের যুগ্ম প্রচার প্রয়াস, রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের যুগ্ম সত্তাকে স্মরণ করাইয়া দেয়। রামকৃষ্ণ-শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণের অধ্যাত্মবাদকে সারা জগতের সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়াছিলেন, অদ্বৈত বেদান্তের যুগোপযোগী ব্যাখ্যার মধ্য দিয়া গুরুর মহিমা ঘোষণা করিয়াছিলেন। উডরফও তেমনি আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন স্বীয় গুরু তন্ত্রাচার্য শিবচন্দ্রের শাস্ত্রপ্রচার কর্মের ধারক বাহকরূপে। তাঁহার রচনার মাধ্যমে তন্ত্রের মাহাত্ম্য নূতন করিয়া ঘোষিত হইয়াছিল, বিশ্বের জ্ঞানী-গুণী মহলে শুরু হইয়াছিল তন্ত্রচর্চার ব্যাপক প্রয়াস। উডরফ বিবেকানন্দের মতো বিরাট আধ্যাত্মিক পুরুষ ছিলেন না, একথা ঠিক, কিন্তু ভারতীয় অধ্যাত্মশাস্ত্রের প্রচারকল্পে তাঁহার নিষ্ঠা ও দক্ষতার কথা অস্বীকার করার উপায় নাই।

ইংরেজী ভাষায় রচিত উডরফের তন্ত্রসাহিত্য ইউরোপ ও আমেরিকার মনীষীদের মধ্যে তন্ত্রতত্ত্ব ও তন্ত্রসাধনা সম্পর্কে প্রবল অনুসন্ধিৎসার সৃষ্টি করিয়াছিল। তখনকার দিনের 'ইণ্টার ন্যাশনাল জার্নাল অব তান্ত্রিক অর্ডার ইন আমেরিকা' প্রভৃতি পত্রিকা এই অনুসন্ধিৎসা ও গবেষণার পরিচয় দিয়াছে।

উডরফের মাধ্যমে শিবচন্দ্রের সহিত প্রসিদ্ধ কলাতত্ত্ববিদ্ ই. বি.

১ এ বিষয়ে উডরফের প্রধান সহযোগী ছিলেন অধ্যাপক প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় (বর্তমানের প্রখ্যাত তান্ত্রিক সন্ন্যাসী স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ), এবং শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল মজুমদার

হ্যাভেল এবং ডঃ আনন্দ কুমারস্বামীর পরিচয় সাধিত হইয়াছিল এবং তাঁহারা উভয়েই তন্ত্রাচার্যের ভাবধারায় যথেষ্টরূপে প্রভাবিত ও অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন।

শিবচন্দ্রের মুখে তন্ত্রের প্রকৃত স্বরূপ এবং ভারতীয় অধ্যাত্মতত্ত্ব এবং নন্দনতত্ত্বের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ শুনিয়া ডঃ কুমারস্বামী মুগ্ধ হন। শুধু তাহাই নয়, কিছুদিন পরে হিন্দুধর্ম গ্রহণের জন্য তিনি আগ্রহী হইয়া উঠেন। ভট্টপল্লীর রক্ষণশীল পণ্ডিতেরা কুমারস্বামীর হিন্দুধর্মে আশ্রয় নিবার প্রস্তাব সমর্থন করেন নাই। তাঁহারা বিধান দেন, কুমারস্বামী খ্রীষ্টান, শাস্ত্রমতে ম্লেচ্ছকে হিন্দুরূপে গ্রহণ করা সম্ভব নয়।

এসময়ে শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব অগ্রসর হইয়া আসেন ডঃ কুমারস্বামীর সহায়তায়। বহুতর প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থ হইতে উদ্ধৃতি দিয়া তিনি প্রমাণ করেন, ম্লেচ্ছের হিন্দুকরণ এবং ম্লেচ্ছের পক্ষে হিন্দুধর্মের আশ্রয় গ্রহণ মোটেই অশাস্ত্রীয় নয়। তাছাড়া, তন্ত্রশাস্ত্রের উদার বিধানের কথা উল্লেখ করিয়াও কুমারস্বামীর হিন্দুত্ব গ্রহণের প্রস্তাব তিনি জোরালো ভাবে সমর্থন করেন। দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেন, আর্য-অনার্য, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, সাধু পাষণ্ডী সবাই মাতৃতত্ত্ব ও তন্ত্রশাস্ত্রের অধিকারী সাধক। জগজ্জননীর কোলে উঠিবার দাবি অস্বীকার করার কোনো উপায় নাই।

শোনা যায়, বিদ্যার্ণবের এই উদার এবং শাস্ত্রীয় যুক্তিতর্ক সমন্বিত ঘোষণার পর কুমারস্বামীর হিন্দুধর্ম গ্রহণে আর কেউ কোনো বাধা জন্মান নাই।

আর্টস্কুলের অধ্যক্ষ ই. বি. হ্যাভেলের সহিত বিচারপতি উডরফের ঘনিষ্ঠতা ছিল। ভারতীয় চারুকলার মর্ম উদ্‌ঘাটনের জন্য হ্যাভেল এক সময়ে খুব ব্যাকুল হইয়া উঠেন। এসময়ে উডরফের পরামর্শে তিনি শরণ নেন শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণবের।

তন্ত্রতত্ত্বের আলোকে শিবচন্দ্র ভারতীয় নন্দনতত্ত্ব, চারুকলা এবং ভাস্কর্যের অপরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করেন সুধী গবেষক হ্যাভেলের

কাছে। এই সব ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ শুনিয়া হ্যাভেলের বহু সংশয়ের নিরাকরণ হয়, ভারতীয় নন্দনতত্ত্বের মর্মকথা জ্ঞাত হইয়া তিনি আনন্দে অধীর হইয়া উঠেন।

অতঃপর উডরফের ভবনে হ্যাভেল এবং কুমারস্বামী মাঝে মাঝে শিবচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন। তন্ত্রতত্ত্ব ও নন্দনতত্ত্বের নানা নিগূঢ় বিষয় প্রতিভাধর শিবচন্দ্র এই সময়ে সংস্কৃত ভাষায় অনর্গল-ভাবে বলিয়া যাইতেন, আর উডরফ এবং তাঁহার সংস্কৃতের শিক্ষক হরিদেব শাস্ত্রী ঐ দুই সুধী জিজ্ঞাসুকে তাহা ইংরেজীতে বুঝাইয়া দিতেন।

বিদ্যার্ণবের তত্ত্ব ব্যাখ্যা এবং উপদেশ এই সময়ে গভীরভাবে হ্যাভেলকে প্রভাবিত করে। হিন্দু দেবদেবীর সূক্ষ্মতর দিব্য অস্তিত্ব ও মাহাত্ম্য সম্পর্কে নূতনতর চেতনা ও শ্রদ্ধা তাঁহার মধ্যে জাগিয়া উঠে। শোনা যায়, এসময়ে হ্যাভেল তান্ত্রিক ঐতিহ্যযুক্ত কোনো কোনো দেবদেবীর ভাস্কর্যমূর্তি দর্শনে ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়িতেন। কখনো বা অর্ধবাহ্য অবস্থায়, পদ্মাসন করিয়া বসিয়া পড়িতেন তাঁহাদের সম্মুখে। এ সময়ে হ্যাভেলকে এই আসন হইতে উঠাইয়া আনিতে গিয়া আর্টস্কুলের সহযোগীরা হইতেন গলদ্‌ঘর্ম।

হ্যাভেল সরলভাবে বন্ধুমহলে বলিতেন, তন্ত্রাচার্য শিবচন্দ্রের প্রসাদেই ভারতীয় ভাস্কর্যের বহু নিগূঢ় রহস্য তাঁহার দৃষ্টি সমক্ষে উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। এজন্য তাঁহার কৃতজ্ঞতার সীমা ছিল না।

শিবচন্দ্রের আচার্য জীবনের এক অত্যুজ্জ্বল অধ্যায়, শিষ্য স্যর জন উডরফকে দীক্ষা দেওয়া এবং তন্ত্র প্রচারে তাঁহাকে উদ্বুদ্ধ করা।

ব্যারিস্টারী ছাড়িয়া উডরফ তখন কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতির পদ গ্রহণ করিয়াছেন। কিছুদিনের জন্য তিনি অস্থায়ী প্রধান বিচারপতি পদেও নিযুক্ত হইয়াছিলেন। হিন্দু সাধনা ও

ভারত তন্ত্রের প্রতি চিরদিনই তাঁহার প্রবল অনুসন্ধিৎসা। এসময়ে হাইকোর্টের প্রবীণ ভকীল অটলবিহারী ঘোষের সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠতা জন্মে। অটলবিহারী ছিলেন 'আগম অনুসন্ধান সমিতি'র একজন বিশিষ্ট সদস্য। কিছুদিনের মধ্যে উডরফ এই সমিতির সংস্রবে আসেন এবং তন্ত্রসাধনার রহস্য সম্পর্কে কৌতূহলী হইয়া উঠেন। তাঁহার এই কৌতূহল ক্রমে পরিণত হয় সত্যকার অনুসন্ধিৎসায় এবং তন্ত্রের মূল গ্রন্থ পাঠ করার জন্য তিনি ব্যস্ত হইয়া পড়েন।

এজন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন, সংস্কৃত ভাষা ভালোভাবে শিক্ষা করা। হাইকোর্টের সরকারী দোভাষী, হরিদেব শাস্ত্রী, সংস্কৃতে সুপণ্ডিত এবং ইংরেজীতেও তাঁহার দক্ষতা আছে। উডরফ তাঁহাকেই নিযুক্ত করিলেন নিজের শিক্ষকরূপে। তাঁহার মতো প্রতিভাধর ব্যক্তির পক্ষে এই ভাষা আয়ত্ত করিতে বিলম্ব হয় নাই, অল্পদিনের মধ্যেই ভারত এবং তিব্বতের কতকগুলি দুরূহ তন্ত্রগ্রন্থ তিনি অধ্যয়ন করিয়া ফেলিলেন।

তন্ত্রের সাধন রহস্য অবগত হওয়ার ইচ্ছাও ক্রমে তাঁহার দুর্বার হইয়া উঠে। কিন্তু শুধু গ্রন্থ পাঠে তাহা আয়ত্ত করা সম্ভব নয়। এজন্য চাই দক্ষ ক্রিয়াবান্ কৌল সাধকের সাহায্য ও কৃপা। তেমন মহাপুরুষের সন্ধান কোথায় পাইয়া যায়? এখন হইতে এ চিন্তাই উডরফের চিত্তকে আলোড়িত করিতে থাকে। সংস্কৃতের শিক্ষক হরিদেব শাস্ত্রীকে মাঝে মাঝে এবিষয়ে প্রশ্ন করেন, অনুরোধ জানান দক্ষ কোনো তন্ত্রাচার্যের সন্ধান দিবার জন্য।

দৈবযোগে উপস্থিত হয় এক পরম সুযোগ। হাইকোর্টের একটি মামলার ব্যাপারে হিন্দুশাস্ত্রের, বিশেষত তন্ত্রশাস্ত্রের, কতকগুলি প্রশ্নের উপর আলোকপাতের জন্য কাশী হইতে আহ্বান করা হয় পণ্ডিত শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণবকে।

হরিদেব শাস্ত্রী সহাস্যে উডরফকে বলেন, "আপনি একটি উচ্চকোটির তন্ত্রবিদের সন্ধান চাচ্ছিলেন, এবার তিনি এসে গিয়েছেন।"

"কে বলুন তো, শাস্ত্রীজী," ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করেন উডরফ।

"শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণবের কথাই আমি বলছি। হাইকোর্টের কাজ উপলক্ষে তিনি কলকাতায় এসেছেন। এই সুযোগে আপনি তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলুন। আমার মনে হয়, আপনার মনে তন্ত্রসাধনার জন্য যে গভীর আগ্রহ জন্মেছে, তা মিটতে পারে এঁরই সাহায্যে।"

"তাঁকে আজই তবে নিয়ে আসুন আমার গৃহে।"

"তবে একটা কথা, স্যর, ইনি কিন্তু ইংরেজী ভাষা জানেন না মোটেই। এরূপ আচার্য আপনার পছন্দ হবে কিনা, জানিনে।"

"ইংরেজী না-জানা শাস্ত্রবিদ্ই তো আমি চাই। তাঁর ভেতরে রয়েছে নির্ভেজাল বস্তু।"

হরিদেব শাস্ত্রীর সাহায্য নিয়া উডরফ নিজের ভবনেই সাক্ষাতের ব্যবস্থা করিলেন আচার্য শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণবের সঙ্গে। যথাসময়ে বিদ্যার্ণব সেখানে উপস্থিত হইলে সসম্ভ্রমে তাঁহাকে আনিয়া বসাইলেন নিজের ড্রয়িংরুমে।

তন্ত্রাচার্যের প্রথম দর্শনেই উডরফ অভিভূত হন। শক্তি-সাধনা ও তত্ত্বজ্ঞানের মূর্ত বিগ্রহ তাঁহার সম্মুখে উপবিষ্ট। আয়ত নয়ন দুটি শাণিত ছুরিকার মতো ঝক্ঝক্ করিতেছে। মাথায় দীর্ঘ কেশের গুচ্ছ, ললাটে বৃহৎ সিঁদুরের ফোঁটা এবং রক্তচন্দনের তিলক। কণ্ঠে বিলম্বিত রুদ্রাক্ষ ও স্ফটিকের কয়েক লহর মালা। পরিধানে একটি গৈরিক রঞ্জিত আলখাল্লা। নির্নিমেষ নয়নে এই বীরাচারী সিদ্ধ কৌলের দিকে উডরফ চাহিয়া আছেন।

ক্ষণপরেই শুরু হয় তন্ত্রশাস্ত্র সম্পর্কে উভয়ের দীর্ঘ আলোচনা। উডরফ তাঁহার এক একটি প্রশ্ন উত্থাপন করেন, আর শিবচন্দ্র তৎক্ষণাৎ অবলীলায় তাঁহার সমাধান জ্ঞাপন করেন, সমর্থন টানিয়া আনেন প্রাচীন শাস্ত্রের ভূরি ভূরি উদ্ধৃতি হইতে।

বিস্ময়ে হতবাক্ হইয়া গিয়াছেন স্যার জন উডরফ। ভাবেন, শুধু শাস্ত্রবিদ্যা আহরণ করিয়া এমনতর তাত্ত্বিক দিক্দর্শন তো কেহ দিতে পারেন না। অলৌকিক শক্তি ও অলৌকিক প্রজ্ঞা রহিয়াছে এই

মহাপুরুষের প্রতিটি উচ্চারিত বাক্যের পিছনে। প্রতিটি বাক্য যেন মন্ত্রচৈতন্য দিয়া আবির্ভূত হইতেছে, উডরফের সর্বসংশয় ভঞ্জন করিয়া দিতেছে সঙ্গে সঙ্গে।

বিদায়ের কালে শিবচন্দ্র কহিলেন, "সাহেব, আপনার ভেতরে জন্মান্তরের শুভ সংস্কার রয়েছে, নতুবা তন্ত্র সম্বন্ধে এরূপ শ্রদ্ধা, আর অনুসন্ধিৎসা তো সম্ভব নয়।"

বিদ্যার্ণব কাশীধামে চলিয়া গেলেন, কিন্তু উডরফের মানসপটে দীপ্যমান রহিল সিদ্ধকৌল মহাপুরুষের সেই তপস্যাপূত মূর্তি ও তাঁহার শাস্ত্রীয় ভাষণের স্মৃতি।

তন্ত্রশাস্ত্রের নানা তথ্য ও তন্ত্র সম্পর্কিত প্রশ্ন এ-সময়ে উডরফের মনে জাগিয়া উঠিত। এগুলির মীমাংসা অবশ্য চাই। হরিদেব শাস্ত্রীর মাধ্যমে এসব প্রশ্ন তিনি কাশীতে শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণবের কাছে প্রেরণ করিতেন, উত্তরে তিনিও সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার বক্তব্য জানাইয়া দিতেন, করিতেন জটিল তত্ত্ব ও রহস্যের মীমাংসা।

অতঃপর কয়েক মাসের মধ্যেই উডরফ তাঁহার সংকল্প স্থির করিয়া ফেলিলেন। হরিদেব শাস্ত্রীকে কহিলেন, "শাস্ত্রীজী, আমার অন্তরে আচার্য শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণবের প্রথম দর্শনের স্মৃতি চিরউজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। কোনোমতেই তাঁকে ভুলতে পারছিনে। স্থির করেছি, তাঁর কাছ থেকেই আমি দীক্ষা নেবো।"

"একি অদ্ভুত কথা আপনি বলছেন, স্যর উডরফ? তান্ত্রিক দীক্ষা নেবার তাৎপর্য নিশ্চয় কিছুটা আপনি জানেন?" সবিস্ময়ে বলিয়া উঠেন হরিদেব শাস্ত্রী।

"তা জানি বৈ কি। তান্ত্রিক আচার অনুষ্ঠান ও ক্রিয়া আমায় সম্পন্ন করতে হবে নিখুঁতভাবে, এ জীবনের অনেক কিছু সংস্কার, আচার আচরণ ত্যাগ করতে হবে। তাতে আমি মোটেই পশ্চাদ্‌পদ হবো না।"

"তা যেন বুঝলুম। কিন্তু বিদ্যার্ণব মশাইর সম্মতি তো আগে

নেওয়া চাই। ভিন্ন দেশ, ভিন্ন জাতি, ভিন্ন ধর্ম সংস্কৃতি আপনার। সহজে যে তিনি আপনাকে সাধন দেবেন, তন্ত্রের গূহ্য তত্ত্ব ও ক্রিয়া শেখাবেন, তা তো আমার মনে হচ্ছে না।"

"শাস্ত্রী, সেই জন্যই তো আপনাকে আমার উকিল নিযুক্ত করা। আমার হয়ে আপনি বিদ্যার্ণবকে জোর ক'রে বলুন। আমার দিক থেকে আমি মন স্থির ক'রে ফেলেছি। এমন কি, আমার স্ত্রীর অনুমতিও মিলে গিয়েছে।"

"এসব প্রশ্নের মীমাংসা দূর থেকে হয় না। তাহলে, বরং চলুন, আমরা দুজনে মিলে কাশীতে যাই। সেখানে গিয়ে বিদ্যার্ণবকে আপনি আপনার প্রার্থনা জানাবেন। আমিও যথাসাধ্য বলবো।"

"এ অতি উত্তম কথা। চলুন তা হলে কাশীতে গিয়ে তাঁকে আমি সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাই।"

কয়েকদিনের মধ্যেই উভয়ে উপনীত হইলেন কাশীধামে। শিবচন্দ্র তখন পাতালেশ্বরে অবস্থান করিতেছেন। এই সময়ে তাঁহার সর্বমঙ্গলা সভার জয়জয়কার চারিদিকে। দেশের দিগ্‌দিগন্ত হইতে তন্ত্রসাধনার অনুরাগীরা জড়ো হইতেছেন তাঁহার কাছে। ধনী দরিদ্র, শিক্ষিত অশিক্ষিত সকল ভক্তকেই তিনি দিতেছেন তাঁহার সাহায্য ও কৃপাপ্রসাদ।

শিবচন্দ্রের ভবনে গিয়া উডরফ ও হরিদেব শাস্ত্রী শুনিলেন, সেদিন সাড়ম্বরে মায়ের পূজা অনুষ্ঠিত হইতেছে। বিদ্যার্ণব মহাশয় অত্যন্ত ব্যস্ত, সাহেবকে পূজা শেষ না হওয়া অবধি ঘণ্টা তিনেক অপেক্ষা করিতে হইবে।

ভক্ত সেবকেরা উডরফ ও শাস্ত্রীজীকে পরম সমাদরে অভ্যর্থনা জানান এবং একটি নিভৃত কক্ষে নিয়া বসাইয়া দেন। অদূরে গৃহের অভ্যন্তরে দেবীর পূজা ও হোম অনুষ্ঠিত হইতেছে, কানে আসিতেছে সিদ্ধ কৌল শিবচন্দ্রের উচ্চারিত মন্ত্র, আর আবেগ কম্পিত কণ্ঠের ঘন ঘন আরাব—তারা, তারা, তারা।

পূজা-অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়া গেল। রক্ত গৈরিক পট্টবাস পরিহিত শিবচন্দ্র ধীরপদে সেই কক্ষে আসিয়া উপস্থিত হন, তাম্রকুণ্ড হইতে ভস্ম নিয়া লেপন করিয়া দেন উডরফ এবং হরিদেব শাস্ত্রীর ললাটে।

মুহূর্ত মধ্যে উডরফের সর্বসত্তায় সঞ্চারিত হয় এক অলৌকিক শক্তির প্রবাহ। একটা বিদ্যুতের তরঙ্গ যেন তাঁহার সারা দেহকে বিপর্যস্ত করিয়া ফেলে, প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ থরথর করিয়া কাঁপিতে থাকে, বাহ্যচৈতন্য বিলুপ্ত হইবার উপক্রম হয়।

এই সময়ে শিবচন্দ্রের ইঙ্গিতে হরিদেব শাস্ত্রী তাঁহাকে দুই হাতে জড়াইয়া ধরেন, পার্শ্বস্থিত তক্তপোশে শোয়াইয়া দেন।

কিছুক্ষণ বাদেই উডরফের সংবিৎ ফিরিয়া আসে, সুস্থ এবং স্বাভাবিক হইয়া উঠিয়া শিবচন্দ্রকে নিবেদন করেন সশ্রদ্ধ প্রণাম। শিবচন্দ্রের আশীর্বাদ ও কুশল প্রশ্নাদি শেষ হইলে শুরু হয় আসল কথাবার্তা।

উডরফ নিবেদন করেন, "ঠাকুর, কলকাতায় প্রথম যেদিন আপনাকে দর্শন করি, সেদিন থেকেই আমার মন জুড়ে বসে আছে তন্ত্রসাধনার আকাঙ্ক্ষা। তাই আজ আপনার শরণ নিতে এসেছি।"

শিবচন্দ্রের আয়ত নয়নদ্বয় আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠে। প্রসন্ন কণ্ঠে বলেন, "সাহেব, আপনার ওপর জগন্মাতার আশীর্বাদ নিরন্তর বর্ষিত হোক। আপনি ভাগ্যবান, তাতে সন্দেহ নেই। জগন্মাতার সন্তান তো এ জগতে কতোই রয়েছে, কিন্তু মাতৃসাধনার জন্য এমন ব্যাকুল হয়ে ওঠে কয়জন?"

"আমার দিক দিয়ে বন্ধন ও বাধাবিঘ্ন অনেক, তা আমি জানি," অকপটে বলেন উডরফ। "কিন্তু, আমার একান্ত প্রার্থনা, কৃপা ক'রে সে সব আপনি দূর ক'রে দিন। তন্ত্র সাধনার আলোক দিয়ে জীবন আমার ধন্য করুন।"

"সাহেব, গোড়াতেই আমি বলে রাখতে চাই, এই সাধনা ও তত্ত্ববিদ্যা গুরুমুখী। শ্রদ্ধাবান্ হয়ে, ত্যাগতিতিক্ষা নিয়ে, গুরুর কাছে পুরোপুরিভাবে আত্মসমর্পণ করতে হবে, তবেই সিদ্ধি হবে করায়ত্ত। তাতো সহজ কথা নয়।"

"আমি আপনার চরণে নিজেকে উৎসর্গ করতে চাই। শক্তি সাধনার আলো জেলে আপনি আমায় পথ দেখিয়ে দিন এই আমার প্রার্থনা।'

এবার স্নেহমধুর কণ্ঠে শিবচন্দ্র কহিলেন, "সাহেব, আমি হরিদেব শাস্ত্রীর কাছে শুনেছি, আপনি সুপণ্ডিত এবং প্রকৃত তত্ত্বান্বেষী। এ খুবই আনন্দের কথা। কিন্তু আপনাকে বিশেষভাবে আমার দুই একটা নির্দেশ দেবার আছে।"

"বলুন। যথাসাধ্য আমি তা পালন করবো।"

"আমাদের এই ভারতবর্ষ পুণ্যময় হয়েছে, প্রজ্ঞানময় হয়েছে শত শত যোগী ঋষি ও সিদ্ধ মহাত্মাদের পুণ্য ও জ্ঞানের আলোকে। উচ্চকোটির এই সব সাধক প্রচ্ছন্ন রয়েছেন এদেশের হিমালয় অঞ্চলে, গঙ্গা, যমুনা, কাবেরীর তটে তটে, রয়েছেন বহুতর তীর্থ ও জাগ্রত মহাপীঠে। প্রকৃত শ্রদ্ধা নিয়ে, যুক্তপাণি হয়ে, তাঁদের সন্ধানে বেরুলে আজকের দিনেও তাঁদের সাক্ষাৎ মিলে। আপনি হিমালয় অঞ্চলে গিয়ে এঁদের দু-চার জনকে খুঁজে বার করুন, তাঁদের কাছ থেকে আশীর্বাদ ও উপদেশ নিন্। তাই হবে আপনার সাধনার বড় প্রস্তুতি।" এই প্রস্তুতির পর স্থির করা যাবে, তন্ত্রদীক্ষা আপনি নেবেন কিনা, কার কাছে নেবেন।"

শ্রদ্ধাভরে শিবচন্দ্রকে প্রণাম করিয়া উডরফ কলিকাতায় চলিয়া আসিলেন। এখন হইতে তাঁহার ধ্যান জ্ঞান হইয়া উঠিল সিদ্ধ মহাত্মাদের অনুসন্ধান ও কৃপালাভ। এজন্য অজস্র চিঠিপত্র তিনি লিখিতে লাগিলেন, সাধু মহল সম্পর্কে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদেরও পাঠাইলেন দিকে দিকে।

কাশীতে সেদিন শিবচন্দ্রের ভবনে এক অলৌকিক দিব্য অনুভূতি লাভ করেন উডরফ। এই অনুভূতির পুণ্যময় স্মৃতিটি উত্তরকালে তাঁহার অন্তরে চির জাগরূক ছিল।

এ সম্পর্কে স্যার জন উডরফ শিবচন্দ্রের প্রধান শিষ্য দানবারি গঙ্গোপাধ্যায়কে বলিয়াছিলেন, "কাশীতে ঠাকুর শিবচন্দ্রের ভবনে

সেদিন উপস্থিত হবার পরেই এক দিব্য অনুভূতিতে আমার বাহ্যজ্ঞান প্রায় লোপ পেয়ে যায়। একটা বিদ্যুতের প্রবাহ যেন আকস্মিক-ভাবে আমার দেহের ভেতরে প্রবেশ করে, ছড়িয়ে পড়ে প্রত্যেকটি অঙ্গে প্রত্যঙ্গে। মনে হতে থাকে, সারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যেন চক্রাকারে ঘূর্ণিত হচ্ছে আর অপসৃত হয়ে যাচ্ছে সৃষ্টির নিঃসীম মহাকাশে। মনের ক্রিয়া তারপর স্তব্ধ হয়ে গেল।

"কিছুক্ষণ বাদে দেখা গেল চৈতন্যের পুনরাবির্ভাব, ধীরে ধীরে ফিরে এলাম নিজের অভ্যন্তরে, একটা দিব্য পরিবেশে। বিদ্যুতের মতন দ্যুতিমান একটা বিরাটায়তন ওঙ্কার রূপায়িত হয়ে উঠল আমার নয়ন সমক্ষে। তার ভেতরে নিরন্তর ভেসে বেড়াচ্ছিল পবিত্র মাতৃবীজ সমন্বিত দিব্যোজ্জ্বল মন্ত্ররাশি। হরিদেব শাস্ত্রী আমায় পরে বলেছিলেন, আমার অর্ধবাহ্য অবস্থা লক্ষ্য ক'রে ঠাকুর শিবচন্দ্র ইঙ্গিতে শাস্ত্রীজীকে নির্দেশ দিয়েছিলেন আমাকে শুইয়ে দিতে। কিছুক্ষণ পরে অবশ্য আমার সংবিৎ ফিরে এসেছিল, তখন ঠাকুরের উপদেশ পেয়ে আমি ধন্য হয়েছিলাম।"

উডরফ তখন কলিকাতায়। হাইকোর্টের দীর্ঘ অবকাশ আসিয়া পড়িয়াছে। এ সময়ে তাঁহার এক সংবাদদাতার নিকট হইতে চিঠি পাইলেন, হরিদ্বারের কাছাকাছি অঞ্চলে এক ব্রহ্মবিদ্ মহাত্মার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।

আর কালবিলম্ব না করিয়া তিনি হরিদ্বারের দিকে রওনা হইয়া গেলেন। সঙ্গে চলিলেন তাঁহার দোভাষী হরিদেব শাস্ত্রী এবং আরো দুই তিনটি সাধনকামী বন্ধু।

হরিদ্বারের নিকটস্থ এক পর্বতের নিভৃত কন্দরে ঐ মহাত্মার দর্শন পাওয়া গেল। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর সমাধি হইতে তিনি ব্যুত্থিত হইলেন, হাতছানি দিয়া সবাইকে ডাকিয়া নিলেন তাঁহার নিজের আসনের কাছে।

অপার শান্তির প্রবাহ যেন স্তব্ধ হইয়া রহিয়াছে এই প্রাচীন

তাপসের গুহাস্থিত জীবনে। দিব্য আনন্দের আলো দু'চোখ হইতে ঠিকরাইয়া পড়িতেছে, সমগ্র গুহার পরিবেশকে করিয়া তুলিয়াছে স্নিগ্ধমধুর ও শান্তিময়।

স্নেহপূর্ণ স্বরে মহাত্মা উডরফকে প্রশ্ন করিলেন, "বেটা, মনে হচ্ছে তুমি এদেশের নও, বিদেশ থেকে এসেছো। কি তোমার মনোবাঞ্ছা, খুলে বল।"

"বাবা, ভগবৎ দর্শনের জন্য প্রাণ বড় অধীর হয়ে উঠেছে। কিন্তু এ দর্শনের পথ বড় কঠিন, বড় বিপদসঙ্কুল। এ পথে সদ্‌গুরুর দর্শন যদি না মিলে, তিনি যদি হাত ধরে না নিয়ে যান, তবে তো একেবারে উপায় নেই। আমি তাই গুরুর সন্ধানে বেরিয়েছি। আপনি আমায় কৃপা করুন, এ বিষয়ে সাহায্য করুন।"

"দেখো বেটা, ভগবানের লীলা কত বিচিত্র, কত চমৎকার। সাত সমুদ্রের পারে তোমার দেশ। সংস্কার, জন্ম, পরিবেশ সব ভিন্‌দেশী। আর তিনি তোমায় এদেশে টেনে এনে গুরুর সন্ধানে ঘোরাচ্ছেন অরণ্যে পর্বতে।"

অতঃপর মহাত্মা উডরফকে গুহার এক নিভৃত কোণে নিয়া বসাইলেন, স্পর্শ করিলেন তাঁহার ব্রহ্মদণ্ডে। এ যেন এক অবিশ্বাস্য ইন্দ্রজাল। উডরফের চিত্তপটে একের পর এক ফুটিয়া উঠিল বহুতর বিচিত্র দৃশ্য। এ সব দৃশ্য যেন পূর্বজন্মে নিজ জীবনে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন অনির্বচনীয় আনন্দে প্রাণ ভরিয়া উঠিল।

মহাত্মা স্মিতহাস্যে বলিলেন, "বেটা, এসব দৃশ্য যা দেখলে সবই তোমার নিজ জীবনের। বহুপূর্বে জন্মান্তরের ধারায় এসব ঘটনা ঘটেছে। এই ঘটনা পরম্পরার ভেতর দিয়েই গড়ে উঠেছে তোমার সংস্কার, আর তোমার অন্তর্জীবন। এর ফলেই সমুদ্র পার হয়ে, অজানা আনন্দের হাতছানিতে, তুমি এদেশের দেবভূমিতে এসে পৌঁছেছো। যথেষ্ট সুকৃতি তোমার রয়েছে, বেটা।"

দিব্য আনন্দের স্রোত বহিয়া চলিয়াছে উডরফের শিরায় শিরায়। উদ্দীপনায় অধীর হইয়া জোড়হস্তে কহিলেন, "বাবা, শুনেছি ব্রহ্মবিদ্

গুরু শিষ্যের তিন জন্মের সংস্কার ও সাধন ফল দেখে তারপর দীক্ষা দেন। দেখতে পাচ্ছি, আমার বহুজন্মের ওপর আপনার দিব্য দৃষ্টি রয়েছে প্রসারিত। তবে আপনিই এ অধমকে দীক্ষা দিয়ে কৃতার্থ করুন।”

“না বেটা, আমি তোমার গুরু নই। একাধারে শাস্ত্রবিদ্, জ্ঞানী, কর্মী ও শক্তি সাধনায় পারঙ্গম সাধক হবেন তোমার গুরু। তিনি তোমার কাছাকাছিই রয়েছেন। শুভলগ্ন উপস্থিত হলে তাঁর কৃপা তুমি পাবে।”

মহাত্মা এবার নীরব হইলেন, ধুনির সম্মুখে বসিয়া শুরু করিলেন তাঁহার ধ্যান মনন। অতঃপর উডরফ ও তাঁহার সঙ্গীরা প্রণাম নিবেদন করিয়া গুহা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

এবার সন্ধান আসিল হৃষিকেশের এক প্রখ্যাত যোগীর। গঙ্গার অপর পারে, ঘন অরণ্যে আবৃত এক কুঠিয়ায়, এই যোগী দীর্ঘদিন তাঁহার তপস্যায় নিমগ্ন রহিয়াছেন। দুইজন ভক্তিমান্ সঙ্গী নিয়া উডরফ তাঁহার সকাশে উপস্থিত হইলেন।

প্রণাম করার সঙ্গে সঙ্গে যোগী সহাস্যে কহিলেন, “বেটা, কেন তুমি বৃথা এদিকে ওদিকে ঘুরে মরছো, বলতো? হিমালয়ের ব্রহ্মবিদ্ মহাত্মাদের দর্শন করছো, ভালো কথা। এ দর্শনে পুণ্য হয়, মন স্থির হয়, প্রত্যাহার ও ধ্যান ধারণা আপনি এসে যায়।”

“সেইজন্যেই তো এখানে আমার আসা, মহারাজ,”—যুক্তকরে নিবেদন করেন উডরফ।

“কিন্তু বেটা, তোমার তপস্যার স্থান তো এটা নয়, তোমার গুরুও এখানকার কেউ নন। এখানকার উচ্চকোটির মহাত্মারা পরাজ্ঞানের উৎস, কর্ম বা শাস্ত্র প্রচারের ধার তাঁরা ধারেন না। তোমার ভেতরের দিকে তাকিয়ে দেখতে পাচ্ছি, তোমার সাধনার সঙ্গে কিছুটা ঐশ্বরীয় কর্মও যুক্ত রয়েছে। তোমার স্থান তাই এখানে নয়, লোকালয়ে। তপস্যা ও জনকল্যাণ, দুই-ই তোমায় করতে হবে সমভাবে।”

নানা চিন্তায় বিহ্বল হইয়া পড়েন উডরফ। ব্যবহারিক জীবনের সূক্ষ্ম বিচার বিশ্লেষণে তিনি অতিমাত্রায় কুশলী। তীক্ষ্ণধী ব্যারিস্টার হিসাবে এক সময়ে তিনি সুপরিচিত ছিলেন। তারপর কলিকাতা হাইকোর্টের এক বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ বিচারপতিরূপে তাঁহার খ্যাতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু এই সিদ্ধ মহাত্মাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলিয়া কোনো স্থির সিদ্ধান্তেই যে আসিতে পারিতেছেন না।

ভাবিলেন, শিবচন্দ্র সিদ্ধ কৌল সাধক। নিজেই তিনি আগ্রহ করিয়া উডরফকে পাঠাইয়াছেন এই সব ঈশ্বরকল্প মহাত্মার সন্ধানে। এক্ষেত্রে বুঝিয়া নিতে হইবে, শিবচন্দ্র চাহিতেছেন, তাঁহার চাইতে বেশী শক্তিধর কোনো মহাপুরুষের নিকট উডরফ দীক্ষা গ্রহণ করুন। কিন্তু এখানে আসার পর উডরফের অভিজ্ঞতা হইয়াছে অন্য রকমের। এই মহাত্মাদের মতে, শিবচন্দ্রের মতো জ্ঞানবান্ ও কর্মী পুরুষই তাঁহার গুরু হওয়ার উপযুক্ত।

সংশয় ও বিপরীতধর্মী চিন্তাস্রোতে চিত্ত যখন বিভ্রান্ত এবং আলোড়িত, এমন সময়ে, উত্তরাখণ্ডে থাকিতেই, আর এক ব্রহ্মজ্ঞ যোগী পুরুষের সংবাদ পান উডরফ।

গুপ্তকাশীর নিকটস্থ এক পর্বতগুহায় ইনি বাস করেন। স্থানীয় সাধক ও জনসাধারণের বিশ্বাস ইঁহার বয়স তিন চার শত বৎসরের কম নয়।

নিকটস্থ এক অরণ্যে উডরফ ও তাঁহার সঙ্গীরা তাঁবু ফেলিলেন। বিশ্রাম ও আহারাদির শেষে উপনীত হইলেন যোগীরাজের গুহায়।

বেশ কিছুক্ষণ সেখানে অপেক্ষা করার পর মহাত্মার ধ্যান ভাঙিল। ইঙ্গিতে দর্শনার্থীদের তিনি নিকটে ডাকিলেন। প্রণামান্তে উডরফ শুরু করিলেন তত্ত্বজ্ঞানের দুই চারিটি প্রশ্ন।

যোগীরাজ সহাস্যে মৃদুস্বরে কহিলেন, "বেটা, তোমার ভেতরে ঈশ্বর দর্শনের ব্যাকুলতা রয়েছে ঠিকই, কিন্তু অহংবোধ আর সংশয় সৃষ্টি করেছে দুস্তর বাধা।"

"বাবা, আপনার কথা অতি যথার্থ। আমি অন্ধ পথিক। কৃপা

করে আমায় আপনি চক্ষুষ্মান করুন। আমায় পথ দেখিয়ে দিন। তত্ত্ববিদ্ গুরুর সাহায্য না পেলে, এক পা'ও যে আমি অগ্রসর হতে পারছিনে। সেই গুরুর সন্ধানে বেরিয়েছি, কিন্তু তিনি রয়ে গেছেন নাগালের বাইরে।"

যোগীরাজ উত্তরে বলিলেন, "বেটা, তুমি অন্ধ, একথা ঠিক। তত্ত্বজ্ঞান যাঁর জীবনে ফুটে ওঠে নি, সে অন্ধই বটে। কিন্তু তোমায় জিজ্ঞেস করি, এর আগে যে দুই মহাত্মার কাছে গিয়েছিলে, তাঁরা তো তোমার বিধিনির্দিষ্ট গুরুর ইঙ্গিত ঠিকই দিয়েছেন। সেই চক্ষুষ্মান্ মহাত্মাদের বাক্যে তো তুমি কান দাও নি। অন্ধের মতো পথ চলছো, আর হোঁচট খাচ্ছো।"

বিস্ময় বিস্ফারিত নয়নে বৃদ্ধ যোগীরাজের দিকে তাকাইয়া থাকেন উডরফ। উপলব্ধি করেন, এই ঈশ্বরকল্প মহামানবের দৃষ্টির বাহিরে কোনো কিছুই নাই।

করজোড়ে কহিলেন, "বাবা, কৃপা ক'রে আমায় বলুন, কি আমি করবো, কার কাছে শরণ নেবো।"

"শোন বেটা। আগের দুই সর্বজ্ঞ মহাত্মা যা বলেছেন, তার ওপরে আমার আর কিছু বলার নেই। এবার স্বস্থানে ফিরে যাও, সদ্‌গুরু তুমি সেখানে বসেই পাবে। আরো একটা কথা মনে রেখো। জীবন ক্ষণস্থায়ী, এর একটি মুহূর্তও বিনা সাধনভজনে অপচয় ক'রো না। শিগ্‌গীর গিয়ে সদ্‌গুরুর আশ্রয় নাও, তাঁর উপদেশমতো কাজ করো। জীবনকে আহুতি দাও ঈশ্বরের যজ্ঞে। তবেই না ঈশ্বর তোমায় কোলে টেনে নেবেন।"

যোগীরাজের নিকট বিদায় নিয়া নিজের তাঁবুতে ফিরিয়া আসেন উডরফ। এবারে দৃষ্টি তাঁহার ক্রমে স্বচ্ছ হইয়া উঠে। পরিষ্কারভাবে বুঝিতে পারেন, তন্ত্রাচার্য শিবচন্দ্র এতদিন শুধু তাঁহাকে পরীক্ষা করিয়াছেন। ব্যারিস্টারী এবং জজিয়তী জীবনের অত্যুগ্র বিচার বিশ্লেষণ, অহমিকা বোধ আর সংশয়, এতদিন উডরফকে ঘাটে ঘাটে ঘুরাইয়া মারিয়াছে। এবারে তাঁহাকে নিতে হইবে স্থির সিদ্ধান্ত।

সেইদিনই তাঁবু তুলিয়া সঙ্গীদের সমভিব্যাহারে উডরফ রওনা হইলেন কলিকাতার দিকে।

হাইকোর্টের ছুটি ফুরাইতে তখনো বেশ কিছুটা দেরি আছে গুপ্তকাশী হইতে ফিরিয়া কয়েকদিনের জন্য উডরফ শৈলাবাস দার্জিলিং-এ বেড়াইতে গিয়াছেন। সেদিন ঘুম্ পাহাড়ের এক বনের মধ্য দিয়া পথ চলিতেছেন, হঠাৎ চোখে পড়িল এক সাধুর ঝুপড়ি। অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, ভস্মমাখা, দীর্ঘবপু এক সাধু ধুনি জ্বালাইয়া ধ্যানমগ্ন রহিয়াছেন। কপালে তাঁহার সিন্দুর ও রক্ত চন্দনের ফোঁটা, গলায় হাড়ের মালা। বুঝা গেল, ইনি তান্ত্রিক সন্ন্যাসী।

ধ্যান ভঙ্গ হইলে উডরফ ভক্তিভরে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। কথা প্রসঙ্গে জানা গেল, দীর্ঘদিন ইনি তিব্বতে তপস্যারত ছিলেন। এবার গুরুর আদেশে ফিরিতেছেন সমতল ভূমিতে।

ভাঙা ভাঙা হিন্দিতে উভয়ের আলাপ চলিতেছে। এ সময়ে স্যার উডরফ তাঁহার মনের কথা খুলিয়া বলিলেন, "মহারাজ, আমি তন্ত্র সাধনার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে পড়েছি, কিন্তু সদ্‌গুরু লাভ এখনো হয়ে ওঠে নি।"

কিছুক্ষণ নীরবে নয়ন মুদিয়া থাকিয়া সন্ন্যাসী কহিলেন, "কেন বেটা, তোর গুরু তো তোর জন্য অপেক্ষা ক'রেই রয়েছেন। তাঁর নাম শিবচন্দ্র। তাঁর কাছ থেকেই মিলবে তোর শান্তি আর মুক্তির সন্ধান।"

সন্ন্যাসীকে প্রণাম জানাইয়া উডরফ সানন্দে বিদায় নিলেন। এবার আর তাঁহার মনে কোনো সংশয় নাই, দ্বিধা দ্বন্দ্ব নাই। ব্যারিস্টার ও বিচারপতি হিসাবে আইনের বহুতর কূট প্রশ্ন ও জটিল রহস্যের মীমাংসা তিনি করিয়াছেন, সেক্ষেত্রে প্রচুর সাহস ও আত্মবিশ্বাস তাঁহার আছে। কিন্তু অধ্যাত্ম জীবনের পথঘাট, গলিঘুঁজি অনেক কিছুই তাঁহার জানা নাই। প্রকৃত সমর্থ গুরু কে? তাঁহার ঈশ্বরনির্দিষ্ট গুরুই বা কোথায় রহিয়াছেন? কোন্ পথে

কোন্ সাধন প্রণালী অনুসরণ করিয়া হইবেন তিনি সিদ্ধকাম ?—তাঁহার প্রতিভা ও বিদ্যাবত্তা এ সব প্রশ্নের কোনো সদুত্তর দিতে পারে না।

এজন্যই তো বার বার সাধু মহাত্মাদের কাছে তিনি ঘোরাফেরা করিতেছেন, অপেক্ষায় রহিয়াছেন নির্ভুল পথ নির্দেশের।

হিমালয়ের যোগী তপস্বীদের কথায় ও ইঙ্গিতে তাঁহার ধারণা জন্মিয়াছে তন্ত্রসিদ্ধ মহাপুরুষ শিবচন্দ্রই তাঁহার বিধিনির্দিষ্ট গুরু। কিন্তু এই চিহ্নিত গুরু তো নিজে স্পষ্ট করিয়া কিছু বলিতেছেন না। একটা অনিশ্চিতির মধ্যে তাঁহাকে ঝুলিয়া রাখিয়াছেন।

এবার তান্ত্রিক সন্ন্যাসীর স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন বাণী তাঁহার হৃদয়ে জাগাইয়া তুলিয়াছে দৃঢ় প্রত্যয়ের শক্তি। শিবচন্দ্রের নাম বলিয়া দিয়া সন্ন্যাসী তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছেন দ্বিধা-দ্বন্দ্বের আবর্ত্ত হইতে। এবার লক্ষ্য তাঁহার স্থির। শিবচন্দ্রের নিকট হইতেই গ্রহণ করিবেন বহু আকাঙ্ক্ষিত দীক্ষা, মাতৃসাধনায় হইবেন সিদ্ধকাম।

কলিকাতায় ফিরিয়াই উড়রফ তাড়াতাড়ি হরিদেব শাস্ত্রীকে ডাকাইয়া আনিলেন। বলিলেন, “শাস্ত্রীজী, আমি সংকল্প স্থির ক'রে ফেলেছি, আচার্যবর শিবচন্দ্রের কাছ থেকেই দীক্ষা নেবো।”

শাস্ত্রীর চোখে মুখে প্রসন্নতার ছাপ। কহিলেন, “কাশীতে শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণবের গৃহে আপনার যে অলৌকিক অনুভূতি হয়েছিল, ওঙ্কার মধ্যস্থ মাতৃবীজ আপনি দর্শন করেছিলেন, তা বোধহয় আপনার স্মরণ আছে।”

“সে অনুভূতি, সে দর্শন, কোনোদিনই ভোলবার নয়।”

“আমি তখনি বুঝেছিলাম, সিদ্ধ কৌল শিবচন্দ্রের কৃপা আপনি পেয়ে গেছেন। কিন্তু তারপরও আপনি হেথায় হোথায় অনর্থক গুরুর জন্ত এত খোঁজাখুঁজি করেছেন।”

"সে কথা ঠিক। হয়তো আচার্যদেব, নিজেই ইচ্ছে ক'রে আমায় ঘুরিয়েছেন, আমার সংশয় ছেদন করার জন্য, সংকল্পকে দৃঢ় ক'রে তোলবার জন্য।"

"আপনি সাধনার যোগ্য আধার। শ্রদ্ধা, সরলতা ও পবিত্রতা আপনার আছে। আমার কিন্তু কেবলই ভয় হচ্ছে, তান্ত্রিক সাধনায় যে সব আচার আচরণ আবশ্যক, তা কি আপনি ধৈর্য ধরে করতে পারবেন? আচার্য শিবচন্দ্র কিন্তু অতিমাত্রায় আনুষ্ঠানিক ও ক্রিয়াবান্, মাতৃসাধনায় একটু ত্রুটিবিচ্যুতি দেখলে ক্ষেপে ওঠেন। তাঁর সব নির্দেশ পালন ক'রে আপনি কি চলতে পারবেন?"

"আমি সব কিছুর জন্য মনকে তৈরী করেছি, শাস্ত্রীজী। তন্ত্রসিদ্ধির জন্য প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি ক্রিয়া ও আচার আমি অবশ্য পালন করবো। তাছাড়া, আমার স্ত্রী এলেনের সম্মতিও আমি নিয়েছি। আমার শক্তি হিসেবে তিনিও দীক্ষা আর সাধন নেবেন। শাস্ত্রীজী, আমার মন বড় ব্যাকুল হয়ে পড়েছে। যত সত্বর হয় আপনি আচার্যদেবকে কলকাতায় নিয়ে আসুন।"

উডরফ ও হরিদেব শাস্ত্রীর সনির্বন্ধ অনুরোধে, কিছুদিনের মধ্যে শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব কলিকাতায় উপস্থিত হইলেন। সাক্ষাৎ ও কুশল প্রশ্নাদির পর শিবচন্দ্র স্মিতহাস্যে কহিলেন, "কি সাহেব, তোমার পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবার সব শেষ হয়েছে তো? মনের দ্বন্দ্ব সংশয় তো আর নেই?"

উডরফ জোড়হস্তে নতশিরে দণ্ডায়মান্, কাতর স্বরে কহিলেন, "আচার্যদেব, আমি অবিদ্যার আবর্তে পড়ে মার খাচ্ছি। আমায় উদ্ধার করুন, মাতৃসাধনার দীক্ষা আমায় দিন।"

"সাহেব, কাশীধামে যখন তুমি আমার কাছে গিয়েছিলে, তখনি আমি তোমায় দীক্ষা দিতে পারতাম। দিই নি, তার কারণ আছে। তোমরা ইউরোপীয়রা বড় ভোগসুখী, বাস্তবধর্মী এবং বিচারশীল। বিজ্ঞানের পরীক্ষাগারে না দেখে, চাক্ষুষ না দেখে, তোমরা কোনো কিছু মেনে নিতে চাও না, তাই না?"

"হ্যাঁ, সে কথা যথার্থ।"

"সেই জন্যই তোমায় আমি এদেশের উচ্চকোটির সাধু মহাত্মাদের কাছে যেতে বলেছিলাম। তাঁদের শক্তিবিভূতির পরিচয় নিশ্চয় তুমি প্রত্যক্ষ ক'রে এসেছো।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। তাঁদের যোগবিভূতি অকল্পনীয়। কাছে গিয়ে দাঁড়ালে মনে হয়, তাঁদের দৃষ্টির তুলনায় আমরা অন্ধ, জ্ঞান-বিজ্ঞানের এতো কিছু অধ্যয়ন ক'রেও আমরা অর্বাচীন, মূর্খ।"

"এই মূল্যবোধটি তোমার হোক্, শুধু সেজন্যই তাঁদের কাছে আমি তোমায় পাঠাই নি। সিদ্ধ মহাত্মারা বড় কৃপালু। বিশেষ ক'রে যাঁরা সত্যকার মুমুক্ষু, সত্য উপলব্ধির জন্য ত্যাগ তিতিক্ষায় পশ্চাদ্‌পদ নয়, তাঁদের প্রতি ঐ মহাত্মাদের স্নেহ ও কৃপার অবধি নেই। তুমি ভিন্নদেশীয় লোক, ভিন্ন সংস্কার ও সংস্কৃতির মানুষ, তবুও তন্ত্রসাধনায় আগ্রহী হয়ে উঠেছো, এটা তাঁরা বুঝেছেন এবং তোমায় আশীর্বাদও দিয়েছেন।"

"মূলে রয়েছে আপনারই কৃপা।"

"আমার শুভেচ্ছা ছিল বৈ কি। যাক্, মহাত্মাদের কৃপায় তোমার সংশয় মিটেছে, যাচাই করার বুদ্ধি হয়েছে দূরীভূত। এবার আমি তোমায় শাক্তী দীক্ষা দেবো। কিন্তু তোমার শক্তি ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, আমার স্ত্রী এলেন এজন্য প্রস্তুত, তিনিও আপনার কাছে দীক্ষা নেবার জন্য উৎসুক হয়ে আছেন।"

লেডি এলেন উডরফ পাশের ঘরেই ছিলেন, আহ্বান পাওয়ামাত্র দ্রুতপদে আসিলেন। শিবচন্দ্রের চরণে লুটাইয়া নিবেদন করিলেন সশ্রদ্ধ প্রণাম।

নির্ধারিত শুভ লগ্নে উডরফ দম্পতির দীক্ষা অনুষ্ঠান এবং দেবী সর্বমঙ্গলার পূজা-হোম সুসম্পন্ন হইয়া গেল।

অনুষ্ঠান সমাপ্ত হইবার পর উডরফ করজোড়ে নিবেদন করেন, "আচার্যদেব, দীক্ষা দিয়ে, মাতৃপূজার অধিকার দিয়ে, আজ আপনি আমায় উদ্ধারের পথে নিয়ে এলেন। এবার আমার কর্তব্য গুরুদক্ষিণা

নিবেদন করা। কৃপা ক'রে আমায় বলুন, কোন্ বস্তু আপনার প্রিয়। যে কোনো উপায়ে আমি তা সংগ্রহ ক'রে আপনার চরণে প্রণামী দেবো।"

শিষ্যের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতেই শিবচন্দ্রের ভাবান্তর ঘটিল। কিছুক্ষণের জন্য মৌনী থাকিয়া প্রশান্ত কণ্ঠে বলিলেন, "বৎস, আমার প্রিয় বস্তু তুমি আমায় প্রণামী দিতে চাও, আমার সন্তোষ বিধান করতে চাও, খুবই আনন্দের কথা। কিন্তু কোনো জাগতিক বস্তুতে আমার বিন্দুমাত্র আকর্ষণ নেই। মায়ের কোলে বসে, মাতৃমূর্তি আমি দর্শন করেছি, মত্ত রয়েছি মাতৃসাধনায়। আর তো কোনো কাম্য বস্তু আমার নেই। তুমি আমার প্রিয় মাতৃতত্ত্ব ও মাতৃনাম জগতে প্রচার করো। যতদিন জীবন থাকে, এই মহান্ কর্মেই তুমি রত হয়ে থাকো। এতেই হবে আমার সত্যকার সন্তুষ্টি বিধান, আর এটাই হবে তোমার গুরুদক্ষিণা।"

মাতৃগত-প্রাণ সিদ্ধপুরুষের কথা কয়টি শুনিয়া বিস্ময় ও আনন্দে উডরফের অন্তর ভরিয়া উঠে। করজোড়ে নিবেদন করেন, "আমায় আশীর্বাদ করুন আপনার ঈপ্সিত কর্ম যেন আমি উদ্‌যাপন করতে সমর্থ হই।"

"তথাস্তু, বৎস। মায়ের তত্ত্ব, মায়ের তারক-নাম প্রচারের ব্রত তোমার সার্থক হোক্।"

এ সময়ে শিবচন্দ্র কিছুদিন কলিকাতায় অবস্থান করেন এবং নূতন শিষ্য উডরফকে তন্ত্রোক্ত আচার অনুষ্ঠান ও পূজা হোমের ক্রিয়া পদ্ধতি দেখাইয়া দিতে থাকেন।

সিংহবাহিনী, দশভুজা মহিষমর্দিনী, দেবী দুর্গা উডরফের ইষ্ট-বিগ্রহ। এই বিগ্রহের অর্চনা তন্ত্রশাস্ত্রের বিধান অনুযায়ী ষোড়শ-উপচারে নিত্য তিনি সম্পন্ন করিতেন। পূজা, ধ্যান জপ, হোম, ভোগরাগ ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হইত নিখুঁত ভারতীয় প্রথায়।

দেবী পূজা সমাপ্ত করিয়া উডরফ ভাবাবেশে উঠিয়া দাঁড়াইতেন। গৌরকান্তি দীর্ঘবপু রক্তচন্দনে চর্চিত, পরনে রক্তবর্ণ ক্ষৌম বসন,

গলায় রুদ্রাক্ষের মালা জড়ানো, আর কেশের শিখায় ঝুলিত এক গুচ্ছ রক্তজবা। তন্ত্রধারক পণ্ডিত ও মণ্ডপের সহকারীরা এই বিদেশী কৌল সাধকের দিকে অবাক্ বিস্ময়ে চাহিয়া থাকিত।

এই সময় হইতে শিবচন্দ্র ও উডরফের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ গড়িয়া উঠে। সুযোগ পাইলেই উডরফ সম্ভ্রম ও সমাদরের সহিত গুরুদেবকে স্বগৃহে আনয়ন করিতেন, গ্রহণ করিতেন নূতন নূতন নিগূঢ় ক্রিয়ার উপদেশ। কখনো বা নিজেই কুমারখালি গ্রামে অথবা কাশীতে শিবচন্দ্রের ভবনে গিয়া উপস্থিত হইতেন। গুরু এবং গুরুপত্নী উভয়কেই তিনি ভূলুণ্ঠিত হইয়া প্রণাম করিতেন। গুরুর সন্নিধানে থাকার সময়ে সকলেরই চোখে পড়িত তাঁহার নগ্নপদ, কাষায় পরিহিত, রুদ্রাক্ষ শোভিত রূপ।

ভারতীয় ধর্ম সংস্কৃতির বহু অনুষ্ঠান বা সভায় উডরফ আমন্ত্রিত হইতেন। সেসব স্থানে ভাষণ দিবার সময় সর্বপ্রথমে তিনি সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করিয়া প্রণাম নিবেদন করিতেন সদ্‌গুরু শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণবের উদ্দেশে।

তন্ত্রশাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাতারূপে এবং তন্ত্র সাধনার সিদ্ধ সাধকরূপে সারা ভারতে তখন আচার্য শিবচন্দ্রের খ্যাতি প্রচারিত। বিশেষত কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি উডরফকে দীক্ষা দিবার পর হইতে তাঁহার খ্যাতি প্রতিপত্তি দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। তাঁহার ব্যক্তিত্ব, সাধনা ও সিদ্ধির তথ্য জানার জন্য অনেকেরই আগ্রহের অন্ত নাই। বহু স্থানে অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিরা উডরফকেও তাঁহার গুরুদেব সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করিতেন। তাই উডরফ মনে মনে স্থির করিলেন, গুরুদেবের একটি প্রামাণ্য জীবনী তিনি লিখিবেন।

কয়েকদিন পরেই শিবচন্দ্রের শুভাগমন হইল তাঁহার কলিকাতার ভবনে। কুশল প্রশ্নের পরে শিবচন্দ্র কহিলেন, "উডরফ, তোমার মুখ দেখে মনে হচ্ছে, তুমি একটা নূতন কাজ শুরু করার সংকল্প করেছো। ব্যাপারটা কি, খুলে বলতো?"

বুঝা গেল, অনেক কিছুই এই অন্তর্যামী সিদ্ধ পুরুষের দৃষ্টি এড়ায় না। উডরফ হাসিয়া কহিলেন, "আচার্যদেব, আপনি ঠিকই ধরেছেন। আমার মনে বাসনা জেগেছে, আপনার একটা প্রামাণ্য জীবনী রচনা করবার জন্য।"

"কেন ? তুমি কি ভেবেছো, একাজে আমি খুশী হবো ?"

"না, তা নয়।" আম্‌তা-আম্‌তা করিয়া বলেন স্যার জন উডরফ। "ভারতের এবং ইউরোপ আমেরিকার বহু জিজ্ঞাসু ব্যক্তি আপনার জীবন ও সাধনা সম্পর্কে আমায় প্রশ্ন করেন, অজস্র চিঠিপত্র লেখেন। তাই ভাবছি, এটা লিখবো।"

"শোন উডরফ, আমার জীবনী লিখলে আমি কিন্তু মোটেই খুশী হবো না। আমার জীবনী অতিশয় অকিঞ্চিৎকর। আমি সারা জীবন ধরে অনুসন্ধান ক'রে আসছি আমার মা মহামায়ার জীবনী, তাঁর সৃষ্ট সারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ছড়িয়ে আছে তাঁর জীবনকথা। সেই জীবনী বাদ দিয়ে তুমি আমার জীবনী নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছো ?"

"আমাদের মতো সামান্য লোক আপনার মতো মহাপুরুষের কথা ভাবতেই খেই হারিয়ে বসে। ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরীর কথা কি ক'রে তারা জানবে বা লিখবে ?" পাল্টা প্রশ্ন করেন উডরফ।

"না উডরফ, আমার শিষ্য যে হবে, সে যে মহামায়ার তত্ত্ব নিয়েই নিমগ্ন থাকবে দিন রাত। তুমি সেই তত্ত্বকথাই প্রচার করো। দীক্ষার অব্যবহিত পরেই তন্ত্রশাস্ত্র প্রচারের কথা তোমায় আমি বলেছি। এখন থেকে তাই হোক্ তোমার ধ্যান জ্ঞান।"

গুরুদেবের এই কথা উডরফ শিরোধার্য করিয়া নিলেন। সেই দিন হইতেই শুরু করিলেন আদিষ্ট তন্ত্রপ্রচারের কাজ। ইংরেজী ভাষায় শিবচন্দ্রের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'তন্ত্রতত্ত্ব'-এর অনুবাদ ও ব্যাখ্যা রচনায় তিনি ব্রতী হইয়া পড়িলেন। অসম্ভব ক্ষিপ্রতার সহিত এ গ্রন্থ রচিত হইল এবং ইহার নাম দেওয়া হইল—প্রিন্সিপল্‌স্ অব্ তন্ত্র। তারপর একে একে রচিত ও প্রকাশিত হইল আরও বহুতর তন্ত্রশাস্ত্রের গ্রন্থ।

ইংরেজী ভাষায় রচিত তন্ত্র সাহিত্য প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের শিক্ষিত

সমাজের সম্মুখে উন্মোচিত করিল সাধনা ও দর্শনের এক নবদিগন্ত।[১] শক্তি সাধনার অন্তর্নিহিত শক্তি, মাতৃতত্ত্বের দার্শনিকতা, এবং মন্ত্রের নিগূঢ় রহস্যের উপর ঘটিল নূতনতর আলোকপাত। গুরু শিবচন্দ্র তাঁহার তন্ত্রতত্ত্বে যে শুদ্ধতর বীরাচারী সাধনতত্ত্বের প্রচার করেন, শিষ্য উডরফ তাহাই তুলিয়া ধরেন সারা বিশ্বের অধ্যাত্মরস পিপাসু মানুষের কাছে।

শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণবের জীবনে দুইটি পর্যায় বিশেষভাবে লক্ষণীয়। প্রথম পর্যায়ে রহিয়াছে সাধনা ও সিদ্ধির নিরন্তর প্রয়াস, সারা ভারতের শ্রেষ্ঠ কৌল সাধকদের তিনি খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন, বাছিয়া বাছিয়া জাগ্রত শক্তিপীঠ ও শ্মশানে উপস্থিত হইতেছেন, সিদ্ধ মহাত্মাদের সাহায্যে উদ্‌যাপন করিতেন নিগূঢ় ক্রিয়া অনুষ্ঠান। এই সময়কার জীবনে তন্ত্রের প্রচার সম্পর্কে শিবচন্দ্রকে মোটেই উৎসাহী হইতে দেখা যায় নাই।

পরবর্তী পর্যায়ে আমরা দেখিতে পাই শিবচন্দ্রের আচার্য রূপ। এই সময়ে তন্ত্রতত্ত্বের প্রচার এবং প্রসারের জন্য তাঁহার তৎপরতার অবধি নাই। এজন্য প্রথমে কাশীধামে এবং পরে স্বগ্রাম কুমারখালিতে সর্বমঙ্গলা সভা তিনি প্রতিষ্ঠিত করেন। কামাখ্যা হইতে জ্বালামুখী, কেদারনাথ হইতে রামেশ্বর, সমগ্র ভারতের প্রধান প্রধান শক্তিপীঠের সাধক ও আচার্যদের সঙ্গে তিনি যোগাযোগ স্থাপন করেন, তন্ত্রের উজ্জীবনের জন্য কর্মতৎপর হন। বিশেষ করিয়া তাঁহার রচিত গ্রন্থাদির মাধ্যমে বাংলার শক্তি-সাধক ও আচার্যদের মধ্যে শিবচন্দ্র এক গভীর যোগসূত্র গড়িয়া তোলেন। তাঁহার 'তন্ত্রতত্ত্ব'

১ স্যার জন উডরফের গ্রন্থগুলির নাম: প্রিন্সিপল্‌স্ অব্ তন্ত্র, শক্তি অ্যাণ্ড শাক্ত, সারপেণ্ট পাওয়ার গারল্যাণ্ড্ অব লেটার্স, ক্রিয়েশান অ্যাজ্ এক্সপ্লেনড ইন তন্ত্র, ইনট্রোডাকশন টু তন্ত্র, ইজ্ ইণ্ডিয়া সিবিলাইজড্, ইত্যাদি। কোনো কোনো গ্রন্থে ছদ্মনাম, আর্থার আভালন, তিনি ব্যবহার করিয়াছেন।

বাংলার তন্ত্র সাধকদের মধ্যে নূতনতর সাড়া জাগাইয়া তোলে, তাঁহার বজ্রগর্ভ ভাষণে শক্তি সাধনায় আগ্রহী অগণিত নরনারী সে সময়ে নবভাবে উদ্দীপিত হইয়া উঠে।

গুরুদেবের অশেষ কৃপা এবং তাঁহার প্রদত্ত সাধনের কথা বলিতে গেলেই স্যার জন উডরফের দুই চোখ কৃতজ্ঞতায় সজল হইয়া উঠিত। ঘনিষ্ঠ মহলে কখনো কখনো গুরুদেব শিবচন্দ্রের নানা করুণার কথা বিবৃত করিবেন :

"কলিকাতায় একদিন তত্ত্ব ব্যাখ্যানের কালে হঠাৎ আমার ডাক পড়িল—উপস্থিত হইবামাত্র গুরুদেব বলিলেন, 'দেখ সাহেব, তুমি মাতৃসাধনায় রত। আমার ইচ্ছা একবার তুমি কোনো বিশিষ্টা মাতৃ-সাধিকার হস্ত হইতে একটি সিঞ্চন গ্রহণ করো। উত্তরে জানাইলাম, 'আপনি গুরু, পথ নির্দেশক। আপনার ইচ্ছা নিশ্চয়ই সর্বসময়ে সর্বোপরি বলবৎ হইবে। কিন্তু উক্ত কার্যে ক্রিয়াকুশলী যোগ্য দক্ষ সাধিকা কোথায় আছেন তাহা তো আমার জানা নাই। কাজেই আপনার ইচ্ছা পূর্ণ করিবার ব্যবস্থা তো এখন আপনাকেই করিতে হয়।'

"শিবচন্দ্র তদুত্তরে বলিলেন, 'তজ্জন্য তোমাকে ভাবিতে হইবে না। মায়ের ইচ্ছায় সময় পূর্ণ হইলে সকল সুযোগ আপনা হইতেই আসিয়া উপস্থিত হইবে। ইহার কিছুদিনের পর গুরুদেবেরই ব্যবস্থায় কাশীধামের জয়কালী দেবী নামে এক বাঙালী মাতৃসাধিকা কর্তৃক গুরুদেবের ইচ্ছানুযায়ী উক্ত 'সিঞ্চন' অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হইল। শিবচন্দ্র বিরাট রহস্যময় মহাপুরুষ, এরূপ লোকোত্তর চরিত্র মহাপুরুষের চরিত্রের রহস্য ভেদ করা তো সাধারণ মানববুদ্ধির অগম্য[১]।"

জীবনের শেষ কয়েকটি বৎসর শিবচন্দ্র প্রধানত কুমারখালিতেই অবস্থান করেন। দেবী সর্বমঙ্গলার সেবা ও আরাধনা হইয়া উঠে তাঁহার ধ্যান জ্ঞান। মাতৃসাধনায় সিদ্ধ মহাসাধক মাতৃক্রোড়ে বসিয়া মাতৃস্নেহের সুধারসেই বিভোর থাকিতেন দিন রাত।

১ তন্ত্রাচার্য : বসন্তকুমার পাল, হিমাদ্রি পত্রিকা ১৬ই অগ্রহায়ণ, ১৩৭৩

কলিকাতা এবং বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল হইতে শক্তি সাধনার অনুরাগী শত শত লোক এসময়ে দর্শন করিতে আসিতেন একপত্নী তন্ত্রশাস্ত্রবিদ্ শিবচন্দ্রকে। তন্ত্র সাধনার রহস্য, এবং দার্শনিক তত্ত্বের মীমাংসা তাঁহার পদপ্রান্তে বসিয়া তাঁহারা জানিয়া নিতেন।

প্রিয় শিষ্য স্যার জন উডরফ মাঝে মাঝে তাঁহার আচার্যদেবকে কলিকাতার বাসভবনে নিয়া আসিতেন, নিজের 'শক্তি' শ্রীমতী এলেন সহ ভক্তিভরে করিতেন সদ্‌গুরু শিবচন্দ্রের পাদপূজা। সাধনার নিগূঢ়তর ক্রিয়াগুলি উভয়ে হাতে-কলমে শিখিয়া নিতেন তাঁহার নিকট হইতে।

উডরফ তাঁহার সমধর্মী শক্তিসাধক বন্ধুদের নিয়া প্রায়ই উপস্থিত হইতেন কুমারখালিতে। নগ্নপদ, কাষায় পরিহিত, রুদ্রাক্ষ মালায় শোভিত এই ইংরেজ তন্ত্রসাধক শুধু তাঁহার গুরু শিবচন্দ্রেরই প্রিয় ছিলেন না, কুমারখালি গ্রামের বহু নরনারীর ভালোবাসা ও শুভেচ্ছা লাভেও তিনি সমর্থ হইয়াছিলেন।

সদ্‌গুরু শিবচন্দ্রের কৃপায় উডরফ রূপান্তরিত হইয়াছিলেন এক উচ্চকোটির শক্তিসাধকরূপে। গুরুর এই কৃপাপ্রসাদের কথা উডরফ সজলচক্ষে ভাবগদ্‌গদ ভাষায় প্রকাশ্যে সদাই সকলের সম্মুখে বর্ণনা করিতেন। শিবচন্দ্রের তিরোধানের পরেও সদ্‌গুরুর প্রতি তাঁহার এই শ্রদ্ধা, আস্থা ও কৃতজ্ঞতার এতটুকু তারতম্য দেখা যায় নাই। বসন্তকুমার পালমহাশয় উডরফের এই গুরুভক্তির একটি সুন্দর চিত্র দিয়াছেন।

স্যার জন উডরফ তখন ইংল্যাণ্ডে। কলিকাতা হাইকোর্টের অস্থায়ী প্রধান বিচারপতির পদ হইতে তিনি অবসর নিয়াছেন, লণ্ডনে অবস্থান করিয়া রত রহিয়াছেন আইন অধ্যাপনার কাজে। গুরুদেব শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব ইতিপূর্বে লোকান্তরে চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার স্মৃতির অনুধ্যান, আর তাঁহার শেখানো তন্ত্রোক্ত ক্রিয়া অনুষ্ঠান প্রভৃতিই তখন উডরফের সাধনজীবনের উপজীব্য।

রবীন্দ্রনাথ মিত্র উত্তরকালের বাংলার হোম সেক্রেটারী, উডরফের লণ্ডনস্থ বাসভবনে একবার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। এই সাক্ষাতের কাহিনী উত্তরকালে তিনি বর্ণনা করিয়াছিলেন প্রবীণ সাংবাদিক হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়ের কাছে।[১]

এসময়ে লণ্ডনে থাকিয়া শ্রীমিত্র আই. সি. এস পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। স্যার জন উডরফের কাছে তিনি আইন পড়িতেন। উডরফের স্মৃতিতে তাঁহার গুরুস্থান ভারতভূমির মাহাত্ম্য চির প্রোজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে। ভারতের প্রতিটি ধূলিকণা, প্রতিটি নরনারী তাঁহার অতি প্রিয়। উডরফ একদিন রবীন্দ্র মিত্রকে তাঁহার গৃহে আমন্ত্রণ জানাইলেন, উদ্দেশ্য—ভারতের স্মৃতি, গুরুদেবের স্মৃতি রোমন্থন করিয়া কিছুটা আনন্দ পাইবেন।

উডরফের ভবনে উপস্থিত হইয়াছে মিত্রমহাশয়। সেখানকার পরিবেশ দেখিয়া বিস্মিত ও আনন্দিত হইলেন। উডরফের ড্রয়িংরুমের চারদিকের দেওয়ালে টাঙানো কতকগুলি ভারতীয় দেবদেবীর চমৎকার চিত্র। ইঁহাদের মধ্যে রহিয়াছেন সিংহবাহিনী দশভুজা দুর্গা, গায়ত্রী দেবী, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব প্রভৃতি। আরও আছে উডরফের গুরু শিবচন্দ্র ও তাঁহার পত্নীর সুদৃশ্য ফ্রেমে আঁটা চিত্র এবং রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, চৈতন্য ও অন্যান্য মহাপুরুষদের বিস্তর ছবি।

মিত্রমহাশয় অবাক্ হইয়া এগুলি দেখিতেছেন আর তাঁহার মনে হইতেছে, এ যেন ইংল্যাণ্ডের কোনো স্থান নয়, ভারতের কোনো দেবালয়, আশ্রম বা ধর্মপ্রাণ নাগরিকের গৃহে তিনি আসিয়াছেন।

স্যার জন উডরফ শ্রীমিত্রকে সস্নেহে অভ্যর্থনা জানাইলেন। তারপর নানা কথাবার্তার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখাইতে লাগিলেন বিভিন্ন কক্ষের ফটো ও চিত্রসমূহ।

ভারতের কয়েকটি গুহাবাসী সিদ্ধ মহাত্মার ফটোও এইসব কক্ষে ঝুলানো ছিল। এগুলি দেখানোর সময় উডরফ শ্রদ্ধাভরে তাঁহার

১ তন্ত্রাচার্য শিবচন্দ্র : বসন্তকুমার পাল, হিমাদ্রি পত্রিকা, ৯ই অগ্রহায়ণ, ১৩৭৬

যুক্তকর কপালে ঠেকাইলেন, আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া কহিলেন, "এই সব পবিত্র, দুরধিগম্য সাধনগুহা এবং এইসব মহাত্মাদের আমি স্বচক্ষে দেখে এসেছি। এ পরম সৌভাগ্য আমার হয়েছিল গুরু-মহারাজ শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণবের কৃপা ও নির্দেশ পেয়ে।"

শিবচন্দ্রের কৃপায় তন্ত্রোক্ত নিগূঢ় সাধন পাইয়া জীবন তাঁহার ধন্য হইয়াছে, এবং এই সাধনার তত্ত্ব তাঁহার জীবনে দিনের পর দিন স্ফুরিত হইতেছে, একথা বলিতে গিয়া উডরফের দুই নয়ন অশ্রুসজল হইয়া উঠে, ভাবাবেগে সারা দেহ কম্পিত হইতে থাকে।

কিছুক্ষণ পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া আবার বলিতে থাকেন, "তন্ত্রসিদ্ধ, যোগসিদ্ধ আচার্যেরা প্রত্যক্ষ দর্শন ও উপলব্ধির যে সব কথা শাস্ত্রে লিখে গিয়েছেন, শিষ্য পরম্পরায় বলে গিয়েছেন, তার বাইরে আমাদের মতো সাধারণ স্তরের সাধকদের বলবার কিছুই নেই।"

গুরুদেব শিবচন্দ্রের প্রসঙ্গ আসিয়া পড়ায় আবার তাঁহার ভাবাবেগ দেখা দিল, গদ্‌গদ স্বরে কহিলেন:

"আমার মতো লোকের প্রতি গুরুদেবের ছিল অহেতুক কৃপা, তাঁর জীবিতকালে এবং তাঁর তিরোধানের পরে কত করুণালীলা আমি প্রত্যক্ষ করেছি! তাঁর যোগবিভূতির মাধ্যমে পেয়েছি কত গভীর স্নেহের স্পর্শ। কলকাতায় থাকতে যেমন তাঁর দর্শন ও সাহায্য পেয়েছি, তেমনি লণ্ডনে এসেও তা পেয়ে ধন্য হচ্ছি।

"গুরুদেব একবার স্বপ্নে আমায় দেখা দিয়ে কতকগুলো গুহ্য তান্ত্রিক রহস্য বুঝিয়ে দিলেন। বললেন,—'গুরুর মনুষ্যদেহের বিনাশ হলেও শিষ্যের ওপর গুরুশক্তির ক্রিয়া সমভাবেই বর্তমান থাকে, সকল অপবিত্রতা ও অমঙ্গল থেকে তাকে রক্ষা করে।'

"আমার জীবনে তখন এক বিরাট সংকট চলেছে, গুরুদেব নশ্বর দেহ ত্যাগ ক'রে আমার দৃষ্টির সম্মুখ থেকে অন্তর্হিত হয়েছেন। অন্তরে দিনরাত চলছে শোকের আর্তি। এ সময়ে একদিন কলকাতার হাইকোর্ট বেঞ্চে একটি গুরুতর এবং জটিল মামলা চলছে। আইনের বহু কূট তর্ক উঠেছে এবং বহু চেষ্টাতেও কোনো

স্থির সিদ্ধান্তে আমি পৌঁছুতে পারছিনে। দেহ মন ক্লান্তিতে নৈরাশ্যে মুহ্যমান, অসাড় হয়ে পড়েছে। এমন সময়ে দেখতে পেলাম বিদেহী গুরুমহারাজের আবির্ভাব। তাঁর আত্মিক স্পর্শে সঙ্গে সঙ্গে মন বুদ্ধি সতেজ ও স্বচ্ছ হয়ে উঠল, মামলাটির সম্পর্কে স্থির সিদ্ধান্তে এসে পড়লাম অচিরে।

"তাছাড়া, কলকাতায় ও লণ্ডনে বার বার তাঁর বিদেহী আত্মার স্নেহ স্পর্শ পেয়েছি ঘুমন্ত অবস্থায়, স্বপ্নযোগে। যখন যে সব দুশ্চিন্তা ও সংকটে মুষড়ে পড়তাম, তখনি স্বপ্নে প্রত্যাদেশ পেতাম তাঁর কাছ থেকে। কর্তব্য ও কর্মপন্থা সেই মুহূর্তে সহজ সরল হয়ে উঠতো।

"একবার কলকাতার হাইকোর্টে আমার এজলাসে প্রকাণ্ড ও একটি জটিল মামলা চলছে। প্রধান সাক্ষীরা সুচতুর এবং অতিমাত্রায় অসৎ। তারা বিভ্রান্ত করতে চাচ্ছিল বিচারপতিকে। তাঁদের কথা-বার্তা সতর্কভাবে শুনছি, চোখ মুখের ভাব তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে লক্ষ্য করছি। কিন্তু সত্য উদ্‌ঘাটনের কোনো পথই খুঁজে পাচ্ছিনে। একবার সন্দিগ্ধ মনে একটি সাক্ষীর দিকে তাকিয়ে তার কথার প্রকৃত সত্যতা অনুধাবন করতে চাচ্ছি, এমন সময়ে সহসা আমার দৃষ্টি পড়ল কোর্টের দেওয়ালের দিকে। দেখলাম—বিদেহী গুরুমহারাজের জ্যোতির্ময় মূর্তিটি আকারিত হয়ে উঠেছে সেখানে। গুরুমূর্তি দর্শনে তৎক্ষণাৎ মনে মনে নিবেদন করলাম আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম। গুরুদেবের চোখে মুখে প্রসন্নতা ফুটে উঠেছে। দক্ষিণ হাত উত্তোলন ক'রে অস্ফুটস্বরে বলে উঠলেন, 'কল্যাণমস্তু'। দিবালোকে প্রকাশ্য আদালত কক্ষের দেওয়ালে বিদেহী গুরুজীর এ এক মহনীয় এবং অকল্পনীয় আবির্ভাব। মন প্রাণ আমার আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে সাক্ষীদের জবানবন্দীর প্রকৃত অর্থ ও উদ্দেশ্যও স্বচ্ছ হয়ে উঠল আমার দৃষ্টিতে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলাম।

"শুধু ব্যবহারিক কাজকর্মেই নয়, আত্মিক সাধনার ক্ষেত্রেও বিদেহী সদ্‌গুরুর স্নেহময় হাতটিকে প্রসারিত দেখেছি বার বার। সেবার বাড়িতে বসে গভীর রাতে একটা বড় জটিল মামলার রায়

লিখছি। হঠাৎ দেখলাম, জ্যোতির্ময় তান্ত্রিক ভৈরবের বেশে, ত্রিশূল হস্তে, গুরুদেব কক্ষমধ্যে অদূরে দাঁড়িয়ে আছেন, নয়ন থেকে ঝরে পড়ছে দিব্য আনন্দের আভা। ঐ মূর্তির উদ্দেশে করজোড়ে প্রণাম নিবেদন করলাম। দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন ক'রে, বরাভয় দিয়ে, তিনি বললেন, 'কল্যাণমস্তু'। তৎক্ষণাৎ কক্ষমধ্যে ফুটে উঠল এক অত্যাশ্চর্য অতীন্দ্রিয় দৃশ্য। গুরুদেবের এ মূর্তিটি পরিণত হল অসংখ্য জ্যোতিঃঘন মূর্তিতে, সারা কক্ষটি তাতে একেবারে পূর্ণ হয়ে উঠল। বিস্ময় বিস্ফারিত নয়নে যেদিকে তাকাই, সেদিকেই দেখি ঐ মূর্তি। দিব্য আনন্দে আমি অধীর হয়ে উঠলাম, নয়ন বয়ে ঝরতে লাগল পুলকাশ্রু। নয়ন মুছে, ভাবাবেগ সংবরণ ক'রে, যখন কক্ষের চারদিকে তাকিয়ে দেখছিলাম, তখনো আমার চোখে পড়ছিল ঐসব দিব্যমূর্তি। এমনি অপার ও অহেতুকী ছিল আমার সদ্‌গুরু শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণবের করুণা।"

জীবনের শেষ তিনটি বৎসর শিবচন্দ্র কুমারখালিতেই অতিবাহিত করিয়াছেন ; সহজে এস্থান ত্যাগ করিতে চাহিতেন না। ইষ্টদেবী সর্বমঙ্গলার পূজা ও ধ্যানে অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হইত, এক-একদিন সারা রাত্রিই কাটিয়া যাইত দিব্য ভাবাবেশে। মাতৃসাধক রূপান্তরিত হইতেন মায়েরই এক শিশুরূপে।

অনেক সময় দেখা যাইত, ভাবাবিষ্ট শিবচন্দ্র নিবিষ্ট মনে মা-সর্বমঙ্গলার সহিত কত কথাবার্তা বলিতেছেন, কত আদর আব্‌দার করিতেছেন। ইষ্টদেবী ও ভক্তের এই লীলাখেলার মধ্যে হঠাৎ এক এক সময়ে শিবচন্দ্র ভাবাবেশে প্রমত্ত হইয়া উঠিতেন, পার্শ্বে উপবিষ্ট অন্তরঙ্গ ভক্ত সাধকদের ডাকিয়া বলিতেন, "ঐ ছাখো, মা আমার জ্যোতির ছটায় মণ্ডপ আলো ক'রে সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন আর প্রসন্ন মধুর হাসি হাসছেন। নাও, দেখে নাও তোমরা প্রাণভরে আমার মা'কে।"

শিবচন্দ্রের আহ্বানে জাগ্রতা হইয়া উঠিতেন ইষ্টদেবী সর্বমঙ্গলা।

শুধু তাঁহারই নয়ন সমক্ষেই মা দাঁড়াইতেন তাহা নয়, শিবচন্দ্রের স্নেহভাজন ভক্ত সাধকদের কাছেও হইতেন প্রত্যক্ষীভূত। এভাবে মাতৃদর্শনের দিব্য সুধা শিবচন্দ্র পরমানন্দে বিলাইয়া দিতেন স্বগণদের মধ্যে। তাই ভক্তদের অনেকে কৃপালু গুরুদেবকে অভিহিত করিতেন, 'সদাশিব' নামে।

কুমারখালির কাছাকাছি গ্রাম তেবাড়িয়া। এই গ্রামের নেপালচন্দ্র সাহা ছিলেন শিবচন্দ্রের অন্যতম ভক্ত। সেবার নেপালের ভ্রাতুষ্পুত্র নীরদ এক প্রাণঘাতী ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়াছে, শহর হইতে খ্যাতনামা ডাক্তারদের আনা হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহাদের চিকিৎসায় রোগী নিরাময় হয় নাই। সংকট দিন দিন ঘনাইয়া আসিতে লাগিল।

নেপাল শিবচন্দ্রের কাছে ছুটিয়া আসিলেন। কাঁদিয়া কহিলেন, "বাবা ঠাকুর, আমার ভাইপো নীরদের জীবনের কোনো আশা নেই। আপনি একবার চলুন, কৃপা ক'রে তার প্রাণ ভিক্ষা দিন।"

শিবচন্দ্র মা সর্বমঙ্গলার ধ্যানে আবিষ্ট। কহিলেন, "নেপাল, আমি তাঁর শরণ নিয়ে পড়ে আছি, তাঁর মুখ চেয়ে আছি, তুমি সেই বেটিকে ডাকো। সৃষ্টিস্থিতি লয়ের যে তিনিই কর্ত্রী।"

"বাবা, আমরা পাপী-তাপী মানুষ তাঁকে তো আমরা চিনিনে, চিনি শুধু আপনাকেই। যা করবার আপনি করুন, বা আপনার মাকে দিয়ে করান।"

"ব্রহ্মময়ীর সুধাসমুদ্রে ক্ষুদ্র সফরীর মতো আমি ভেসে বেড়াচ্ছি। আমার সামর্থ্য কতটুকু বল।"

"সে সব কথা আমি বুঝিনে, বাবা। এইতো সেদিন পাঁচুপুরের জমিদার নিকুঞ্জবাবু মারাত্মক অসুখে ভুগে মরতে বসেছিলেন, আপনিই তো কৃপা ক'রে তাঁর প্রাণরক্ষা করলেন।"

"ঠিকই বলেছো, নেপাল, কিন্তু সেটা আমি করি নি। করেছেন আমার ঐ মা বেটি। তাঁর প্রত্যাদেশ পেয়েছিলাম, তাই তো অসম্ভব সম্ভব হল, নিকুঞ্জ বেঁচে উঠল।"

"আপনি সংকল্প করলে মা তা সিদ্ধ করবেন না, তাকি কখনো

হতে পারে? না বাবাঠাকুর, আপনি আমার নীরদকে এবার বাঁচান। আমার ছোটভাই যখন মৃত্যুশয্যায় শুয়ে, তখন তার এই ছেলেকে আমার হাতে সঁপে দিয়েছিল। ছেলেটি আমার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়। একে যদি বাঁচাতে না পারি আপনার সর্বমঙ্গলা মায়ের দুয়ারে আমি আত্মঘাতী হবো।"

কথা কয়টি বলার সঙ্গে সঙ্গে নেপাল সাহা হাউমাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠেন, খড়মসহ আচার্যবর শিবচন্দ্রের পাদুটি সবলে জড়াইয়া ধরেন। নীরবে কিছুকাল দাঁড়াইয়া থাকার পর শিবচন্দ্র মৃদুস্বরে বলেন, "এ ছেলের বড় দুটি ভাইও তো এই একই বয়সে, একই রোগে মারা গিয়েছে। কি বল, নেপাল, তাই না?"

"আজ্ঞে হাঁ, আপনি অন্তর্যামী, আপনার অজানা তো কিছু নেই। ডাক্তারেরা বলছেন, এ রোগ কোনোমতে সারানো সম্ভব নয়। আর তাই শুনে বাড়ির মেয়েরা কান্নায় ভেঙে পড়েছে।"

"হুঁ, এ যে মহাকালের ডাক। এ রোগীকে ফিরিয়ে আনা বড়ই কঠিন।"

"বাবাঠাকুর, মা সর্বমঙ্গলার দোহাই, আপনি এ ছেলেকে প্রাণ ভিক্ষা দিন।"

নিঃশব্দে, গম্ভীর মুখে মায়ের পূজা-মণ্ডপে গিয়া শিবচন্দ্র দ্বার রুদ্ধ করেন। দীর্ঘ সময় ইষ্টদেবীর সম্মুখে বসিয়া হন ধ্যানস্থ। তারপর দুয়ার খুলিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়ান, বলেন, "চল নেপাল। মায়ের সঙ্গে আমি কথা বলে নিয়েছি, তোমার বাড়িতে গিয়ে করতে হবে পূজা, হোম ও তন্ত্রোক্ত অভিচার। কিন্তু, এ যে কালব্যাধি, এর অভিচারের ফল অভিচারকারীর পক্ষে ভালো হবে না। আমাকে এজন্য দণ্ড গ্রহণ করতে হবে, নেপাল। খণ্ডন করতে হবে নিজের আয়ু। যাক্, হতভাগ্য পিতৃহীন ছেলেটা তো বাঁচুক।"

রোগীর ভবনে পৌঁছিয়াই শিবচন্দ্র শুরু করিয়া দিলেন দেবীর পূজা, হোম ও অভিচারের ক্রিয়া। কক্ষের দ্বার বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। ভিতরে শুধু রহিলেন শিবচন্দ্র, তাঁহার তন্ত্রধার এবং মুমূর্ষু

রোগী নীরদ। শেষ রাত্রে সকল কিছু অনুষ্ঠান সমাপ্ত হইলে শিবচন্দ্র পরিবারস্থ সবাইকে নিকটে আহ্বান করিলেন। ভাবাবিষ্ট স্বরে কহিলেন, "তোমাদের আর কোনো ভয় নেই, মায়ের কৃপা হয়েছে। নীরদ এবার বেঁচে গেল।"

বলা বাহুল্য, সেই দিনই রোগীর সংকট কাটিয়া যায় এবং অল্প কয়েকদিনের মধ্যে সে সুস্থ হইয়া উঠে। ইহার পর দীর্ঘ পরমায়ু নিয়া সে সংসারধর্ম পালন করিতে থাকে।

তিন মাস পরের কথা। মা সর্বমঙ্গলার ভবনটির সংস্কার ও মেরামতের কাজ চলিতেছে। মিস্ত্রীরা নানা আবর্জনার সঙ্গে কয়েকটা তীক্ষ্ণ বাঁশের খণ্ড আঙিনায় ফেলিয়া গিয়াছে। শিবচন্দ্র নগ্নপদে সেখান দিয়া চলিতেছিলেন, হঠাৎ একটি তীক্ষ্ণ বাঁশের ফলা তাঁহার পায়ে বিদ্ধ হয়, প্রচুর রক্ত ক্ষরণ হইতে থাকে।

পরের দিনই গোটা পা ফুলিয়া উঠে এবং শুরু হয় অসহ্য যন্ত্রণা। স্থানীয় ডাক্তারেরা অভিমত দেন, ক্ষতস্থানটি বিষাক্ত হইয়া উঠিয়াছে, অবিলম্বে শিবচন্দ্রকে কলিকাতার হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা দরকার। আধুনিকতম ইনজেকশান ও ঔষধাদি ছাড়া এ রোগীকে বাঁচানো যাইবে না।

এ সংবাদ কলিকাতায় পৌঁছানো মাত্র উডরফ এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ভক্তেরা তৎক্ষণাৎ চিকিৎসার সব ব্যবস্থা করিয়া ফেলিলেন। স্থির হইল, একটি আধুনিক বড় হাসপাতালের ক্যাবিনে, কোনো খ্যাতনামা সার্জনের চিকিৎসাধীনে শিবচন্দ্রকে রাখা হইবে।

কিন্তু গোল বাধাইলেন শিবচন্দ্র নিজে। শান্ত দৃঢ় স্বরে তিনি কহিলেন, "তোমরা অনর্থক হৈ চৈ ক'রো না। ডাক এসে গিয়েছে, মায়ের কোলে এবার আমায় ফিরতে হবে। এ কটা দিন নিভৃতে, একান্তে বসে, মা সর্বমঙ্গলার শ্রীমুখ আমি দর্শন করবো, তাঁর নামসুধা রসে মত্ত হয়ে থাকবো। অন্তিম সময়ে কুমারখালির এই মাটি, মায়ের মন্দির আর সিদ্ধাসন ছেড়ে আমি কোথাও যাবো না।"

অগত্যা ভক্তগণ কুমারখালি গ্রামেই যথাসাধ্য সুচিকিৎসার বন্দোবস্ত করিলেন। পায়ে অস্ত্রোপচার করিতে হইবে, সার্জন ও তাঁহার সহকারীরা তৈরী হইলেন, এনাস্থেশিয়া দিয়া রোগীকে অচেতন করিবার জন্য। শিবচন্দ্র হাসিয়া বলিলেন, "এত হাঙ্গামায় কি দরকার? এমনিতেই অস্ত্রোপচার শেষ ক'রে ফেলুন।"

ঘণ্টাখানেক ধরিয়া কাটাকুটি ও ড্রেসিং চলিল, মহাপুরুষ দিব্য ভাবে আবিষ্ট হইয়া রহিলেন, মুখ দিয়া একটি কাতরোক্তিও বাহির হইল না।

কয়েক দিনের মধ্যেই দেখা দিল চরম সংকট, চিকিৎসক ও সেবকেরা বুঝিলেন, তাঁহাদের এত কিছু সেবা যত্ন সবই এবার ব্যর্থ হইতে যাইতেছে। রোগীকে আর বাঁচানো সম্ভবপর নয়। শুধু সর্বমঙ্গলার মন্দিরে নয় সারা কুমারখালি গ্রামে নামিয়া আসে আসন্ন শোকের কৃষ্ণছায়া।

১৩২০ সালের ১১ই চৈত্র। চতুর্দশীর তিথিটি পূর্বদিন অতিক্রান্ত হইয়াছে। শিবচন্দ্রের শয্যার পাশে পত্নী, পরিজন ও ভক্তশিষ্যেরা বিষন্ন বদনে দাঁড়াইয়া আছেন। অনেকেই অশ্রুমোচন করিতেছেন।

শিবচন্দ্র কহিলেন, "কাঁদবার সময় তোমরা অনেক পাবে, সে সব পরে হবে। অমাবস্যা পড়ে গিয়েছে, আর মোটেই দেরি ক'রো না, মা সর্বমঙ্গলার পুজো যথারীতি সম্পন্ন ক'রে ফেল।"

পূজা সাঙ্গ হইলে কহিলেন, "এবার সবাই মিলে আমায় ধরাধরি ক'রে বাইরে বিল্বমূলে নিয়ে শুইয়ে দাও।"

শিবচন্দ্রের নির্দেশ মতো, তাঁহার পরমপ্রিয় বানলিঙ্গটি আনিয়া রাখা হইল তাঁহার বক্ষোদেশে। আর ইষ্টবিগ্রহ সর্বমঙ্গলাকে স্থাপন করা হইল অদূরে, নয়ন সমক্ষে।

মা সর্বমঙ্গলার দিকে স্থির দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া মহাসাধক উচ্ছ্বসিত স্বরে ডাকিয়া উঠেন, "মা—মা, তারা, তারা—ব্রহ্মময়ী।" বজ্রকঠোর সিদ্ধকৌল শিবচন্দ্র এবার যেন মায়ের কোলের, আদরের শিশুটি হইয়া গিয়াছেন। মা সর্বমঙ্গলার মুখপদ্ম ধ্যান করিতে করিতে

তাঁহার বদনমণ্ডলে ছড়াইয়া পড়ে দিব্য জ্যোতির আভা। তারপর নয়ন দুটি ধীরে ধীরে নিমীলিত হইয়া আসে, ব্রহ্মময়ীর আদরের দুলাল, মাতৃমন্ত্রের সিদ্ধসাধক শিবচন্দ্র মরদেহ ত্যাগ করেন। ভারতের কৌল সাধনার আকাশ হইতে স্খলিত হয় একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক।

স্বামী অভেদানন্দ

স্বামী অভেদানন্দ ছিলেন ঠাকুর রামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ লীলা-পার্ষদ, তাঁহার তত্ত্বের ধারক বাহক এবং রামকৃষ্ণ মণ্ডলীর অন্যতম নেতা। অধ্যাত্ম-শিল্পী শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্য হস্তের স্পর্শে নূতন মানুষে রূপান্তরিত হন তিনি, ত্যাগ তিতিক্ষাময় তপস্যা, মনীষা, শাস্ত্রজ্ঞান ও তত্ত্বোজ্জ্বলা বুদ্ধির দীপ্তিতে ভাস্বর হইয়া উঠে তাঁহার সাধনজীবন। এই জীবনের আলোয় আলোকিত হইয়া উঠে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের শত শত মুমুক্ষু নরনারী

দীর্ঘ পঁচিশ বৎসরকাল বিস্ময়কর নিষ্ঠা ও কুশলতা নিয়া গুরু রামকৃষ্ণের বাণী ও বেদান্তের পরমতত্ত্ব প্রচার করেন অভেদানন্দ। পূর্বসূরী ও গুরুভ্রাতা বিবেকানন্দ আমেরিকা ও ইউরোপের জনমানসের সম্মুখে হিন্দুধর্মের শাশ্বত রূপটি তুলিয়া ধরেন, সৃষ্টি করেন অদ্বৈত বেদান্তের তত্ত্ব ও আদর্শের ভাবতরঙ্গ। অভেদানন্দ এই তরঙ্গকে আমেরিকার দিকে দিকে ছড়াইয়া দেন, নবসৃষ্ট আন্দোলনকে দাঁড় করান সুদৃঢ় ভিত্তিতে। মাতৃভূমি ভারতের ও ভারত-ধর্মের এক উজ্জ্বল ভাবমূর্তি তিনি সেখানে গড়িয়া তোলেন। ভারতের ধর্ম-সংস্কৃতির ইতিহাসের পক্ষে তাই প্রবর্তক ও আচার্য অভেদানন্দকে কোনোদিন বিস্মৃত হইবার উপায় নাই।

অভেদানন্দের পিতা রসিকলাল চন্দ্র ছিলেন প্রখ্যাত ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীর কৃতী শিক্ষক। সৎ এবং বিদ্বান্ বলিয়া লোকে তাঁহাকে সম্মান করিত। জননী নয়নতারার চরিত্রে ধর্মভাব খুব প্রবল ছিল, কালীঘাটের মন্দিরে প্রায়ই তিনি পূজা দিতে যাইতেন, দেবীর কাছে প্রার্থনা জানাইতেন একটি ধার্মিক পুত্রের জন্য। দেবী তাঁহার সে প্রার্থনা পূর্ণ করেন—১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের ২রা অক্টোবর তাঁহার অঙ্কে

আবির্ভূত হয় এক প্রিয়দর্শন শিশুপুত্র। দেবীর কৃপায় জন্ম, তাই এ শিশুর নাম রাখা হয়, কালীপ্রসাদ।

কিশোর বয়স হইতেই কালীপ্রসাদের জীবনে দেখা যায় বুদ্ধিমত্তা ও মেধা প্রতিভার বিকাশ। ক্লাসের পরীক্ষায় প্রায়ই ভালো ফল করিতেন, এবং পারিতোষিক ইত্যাদি পাইতেন। অল্প দিনের মধ্যেই বাংলা, সংস্কৃত ও ইংরেজীতে তাঁহার অধিকার জন্মে, জিজ্ঞাসু তরুণ বহুতর গ্রন্থ এসময়ে পড়িয়া ফেলেন।

উইলসনের রচিত ভারতের ইতিহাসে আচার্য শঙ্করের কথা পাঠ করিলেন কালীপ্রসাদ। অদ্বৈত বেদান্তে দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিত ছিলেন শঙ্কর। কালীপ্রসাদের মনে জাগিয়া উঠে উদ্দীপনা, ভাবেন, বড় হইয়া এমনি দুর্ধর্ষ পণ্ডিত ও দার্শনিক তিনি হইবেন।

অনুসন্ধিৎসা ও অধ্যয়নের উৎসাহ ছিল তাঁহার প্রচুর। তাই এই বয়সেই জন স্টুয়ার্ট মিলের রচনা, এবং হের্সেল, গ্যানো, লুইস হ্যামিলটন প্রভৃতির বইএর সহিত তাঁহার পরিচয় ঘটিয়াছে। এই সঙ্গে কালিদাসের রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, শকুন্তলা এবং ভট্টিকাব্যের অধ্যয়নও চলিয়াছে। বুঝুন আর না-ই বুঝুন গোপনে গীতা অধ্যয়ন করিতে থাকেন, এ গ্রন্থের তত্ত্ব আয়ত্ত করিতে প্রয়াসী হন।

বাংলার দিকে দিকে তখন প্রাণের স্পন্দন দেখা যাইতেছে। রাজনীতি, ধর্ম এবং সংস্কার আন্দোলনের প্রবক্তারা কলিকাতার পার্কে পার্কে জ্বালাময়ী ভাষণ দিয়া বেড়াইতেছেন। আর তরুণেরা সব মাতিয়া উঠিয়াছেন, দলে দলে যোগ দিতেছেন এই সব সভায়। কালীপ্রসাদও সুযোগ পাইলেই কোনো কোনোটিতে গিয়া উপস্থিত হন, তরুণ চিত্ত নূতন স্বপ্ন নূতন উদ্দীপনায় উচ্ছল হইয়া উঠে।

অ্যালবার্ট হলে এসময়ে প্রসিদ্ধ ধর্মবক্তা শশধর তর্কচূড়ামণি পাতঞ্জলির যোগসূত্র ও যোগসাধনা সম্বন্ধে ভাষণ দিতেছিলেন। কালীপ্রসাদ এই ভাষণ শুনিয়া উৎসাহিত হইয়া উঠেন। স্কুলের জলখাবারের পয়সা জমাইয়া কিনিয়া ফেলেন একখণ্ড পাতঞ্জল দর্শন। কিন্তু এবয়সে ঐ কঠিন দর্শনতত্ত্ব বুঝিবার ক্ষমতা তাঁহার কই?

ভাবিয়া চিন্তিয়া শশধর তর্কচূড়ামণির সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন, "কহিলেন, আপনি যদি দয়া ক'রে এ বইএর সূত্রগুলি আমায় বুঝিয়ে দেন, তবে আমি কৃতার্থ হই।"

তর্কচূড়ামণি খুশী হইয়া উঠেন, বলেন, "বাবা, এ বয়সে তোমার যোগসূত্র পাঠ করার ইচ্ছে হয়েছে, এতে আমি খুব আনন্দ বোধ করছি। আমার সময় থাকলে অবশ্যই তোমায় আমি সাহায্য করতাম। কিন্তু বক্তৃতার কাজ নিয়ে সদাই আমি ব্যস্ত, তার ওপর এত লোকজনের সঙ্গে দেখাশুনা করতে হচ্ছে। আমার হাতে যে সময় নেই।"

কালীপ্রসাদ ক্ষুণ্ণ মনে ফিরিয়া আসিতেছেন, এমন সময়ে শশধর তর্কচূড়ামণি কহিলেন, "বাবা, তুমি এক কাজ করো। কালীবর বেদান্তবাগীশের কাছে যাও। আমার নাম ক'রে তাঁকে বল, তিনি নিশ্চয় রাজী হবেন।"

কালীবরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলে তিনি কহিলেন, "তোমার মতো ছোট ছেলেদের এ ইচ্ছে হয়েছে, এতো খুব ভালো কথা। কিন্তু আমি যে এসময়ে পাতঞ্জল দর্শনের বাংলা অনুবাদ করছি। সময়ের বড় অভাব। তা হোক, বাবা, তুমি এক কাজ করো, স্নানের আগে রোজ একটি সেবক বেশ কিছুকাল আমায় তেল মাখায়। রোজ সে সময়ে তুমি এসো, কিছু কিছু সূত্র আমি তোমায় বুঝিয়ে দেবো।"

কালীপ্রসাদ তাহাতেই রাজী। কিছুদিন বেদান্তবাগীশের বাড়িতে যাতায়াত করিতে লাগিলেন।

ইতিমধ্যে 'শিবসংহিতা' তিনি পাঠ করিয়াছেন। হঠযোগ, প্রাণায়াম ও রাজযোগের পদ্ধতি এ গ্রন্থে বর্ণিত রয়েছে। কালী-প্রসাদ এসব আয়ত্ত করার জন্য মহাব্যগ্র। কিন্তু শুধু বই পড়িয়া তো কোনো কাজ হইবে না, এই ধরনের সব বইএতেই লেখা রহিয়াছে—সিদ্ধগুরুর সাহায্য ছাড়া যোগসাধন সম্ভব নয়।

যোগীগুরু কোথায় পাওয়া যায়? কালীপ্রসাদের অন্তরে

কেবলি উঁকিঝুঁকি মারিতে থাকে এই প্রশ্নটি। অনেকের কাছে এ সম্বন্ধে খোঁজখবরও নিতে থাকেন।

তাঁহার ব্যগ্রতা দেখিয়া সহপাঠী এক বন্ধু কহিলেন, "ভাই, আমি কিন্তু এক সিদ্ধপুরুষের কথা জানি। খুব বড় যোগী, দক্ষিণেশ্বরে রানী রাসমণির কালীবাড়িতে থাকেন। তাঁর কোনো ভণ্ডামী নেই। শুনেছি, শহরের গণ্যমান্য লোকেরা তাঁর কাছে যাতায়াত করেন। গেলে হয়তো তোমার মনের ইচ্ছা পূর্ণ হতে পারে।"

অতঃপর একদিন কালীপ্রসাদ পায়ে হাঁটিয়া দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে গিয়া উপস্থিত। ঠাকুর রামকৃষ্ণ তখন সেখানে নাই, কলিকাতায় এক ভক্তের গৃহে গিয়াছেন।

ঠাকুরের আর এক তরুণ ভক্ত শশী সেখানে উপস্থিত। পূর্বে সে আরো দুই-চারবার ঠাকুরের কাছে আসিয়াছে। কালীপ্রসাদকে সে উৎসাহিত করিয়া বলিল, "এসো, এবেলা এখানে মায়ের প্রসাদ খেয়ে আমরা অপেক্ষা করি। পরমহংসদেব রাত্তিরে ফিরবেন। তখন তুমি তাঁকে দর্শন ক'রো, তোমার মনের কথা খুলে ব'লো।

রাত্রে বাড়িতে ফেরা হইবে না, ফলে মা এবং বাবা দুশ্চিন্তায় থাকিবেন। কালীপ্রসাদ ভাবিত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু শশী তাঁহাকে সাহস দিল, "আমার তো এরকম মাঝে মাঝেই হয়, দক্ষিণেশ্বরে এসে আর কলকাতায় ফেরা হয় না। বাড়িতে সবাই ভেবে অস্থির হন। তা কি আর করা যাবে, বল। সাধু দর্শনে এসে, শেষদর্শন না ক'রে তো ফেরা ঠিক নয়।"

কালীপ্রসাদ অপেক্ষা করিল। গভীর রাত্রে পরমহংসদেব ফিরিয়া আসিলেন। গাড়ি হইতে নামিয়াই প্রবেশ করিলেন নিজের কক্ষে।

কিছুক্ষণের মধ্যে ঠাকুর কালীপ্রসাদকে কাছে ডাকাইয়া নিলেন। ভক্তিভরে প্রণাম সারিয়া নিয়া কালীপ্রসাদ সম্মুখস্থ একটি মাদুরের উপর বসিলেন নির্নিমেষে চাহিয়া রহিলেন গৌরকান্তি, সৌম্যদর্শন এই মহাপুরুষের দিকে।

স্নিগ্ধস্বরে ঠাকুর রামকৃষ্ণ প্রশ্ন করিলেন, "তুমি কতদূর পড়েছো?"

কালীপ্রসাদ উত্তর দিলেন, "আজ্ঞে, এণ্ট্রান্স ক্লাসে পড়ছি।"

"সংস্কৃত জানো? কোন্ কোন্ শাস্ত্র পড়েছো।"

"রঘুবংশ, কুমারসম্ভব এসব কাব্য, আর গীতা, পাতঞ্জল দর্শন, শিবসংহিতা পড়া হয়েছে।"

"বেশ, বেশ।" বলিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ কালীপ্রসাদকে আশীর্বাদ জানাইলেন। তারপর উত্তরের বারান্দায় ডাকিয়া নিয়া গিয়া নিভৃতে সম্পন্ন করিলেন একটি বিশেষ ধরনের অলৌকিক ক্রিয়া। উত্তরকালে স্বামী অভেদানন্দ এ ঘটনাটির প্রামাণ্য বিবরণ নিজের আত্মজীবনীতে লিখিয়া গিয়াছেন:

—আমি যোগাসনে উপবিষ্ট হইলে পরমহংসদেব আমায় জিহ্বা বাহির করিতে বলিলেন। আমি জিহ্বা বাহির করিলে তিনি তাঁহার দক্ষিণহস্তের মধ্যমাঙ্গুলির দ্বারা জিহ্বায় একটি মূলমন্ত্র লিখিয়া শক্তি সঞ্চার করিলেন এবং তাঁহার দক্ষিণহস্ত দ্বারা বক্ষঃস্থলের ঊর্ধ্বদিকে শক্তি আকর্ষণ করিয়া মা কালীর ধ্যান করিতে বলিলেন। আমি তাহাই করিলাম। গভীর ধ্যানে মগ্ন হইয়া সমাধিস্থ হইয়া কাষ্ঠবৎ অবস্থান করিতে লাগিলাম এবং এক অপূর্ব আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলাম। তখন জগতের সমস্ত বিষয় ভুল হইয়া গেল। এইভাবে কতক্ষণ ছিলাম জানি না।

—কিছুক্ষণ পরে পরমহংসদেব আমার বক্ষঃস্থলে হস্ত দিয়া কুণ্ডলিনীশক্তি নিম্নদিকে নামাইয়া আনিলেন। তখন আমার বাহ্য-চৈতন্য ফিরিয়া আসিল এবং অপূর্ব নির্মল এক আনন্দস্রোতে সমগ্র শরীর পূর্ণ হইয়া গেল।

—আমার সেই অবস্থা দেখিয়া পরে রামলালদাদা ও গোপালমা বলিয়াছিলেন: "কি আশ্চর্য! তোমাকে স্পর্শ করামাত্র তুমি কাষ্ঠবৎ ধ্যানমগ্ন হয়ে গিয়েছিলে।" যাহা হউক, আমি গভীর ধ্যানে কি অনুভব করিয়াছিলাম পরমহংসদেব সস্নেহে আমায় জিজ্ঞাসা করিলে

আমি সমস্তই তাঁহাকে বলিলাম। তিনি শুনিয়া আনন্দে হাসিতে লাগিলেন।

তাহার পর জিজ্ঞাসা করিলেন: "তোমার কি বিবাহ করবার ইচ্ছা আছে?" আমি বলিলাম: "না।" তখন পরমহংসদেব বলিলেন: "তুমি বিবাহ ক'রো না।" তাহার পর কিরূপে ধ্যান করিতে হয় তাহা তিনি শিক্ষা দিয়া বলিলেন:

শুচি অশুচিরে লয়ে দিব্য ঘরে কবে শুবি।
তুই সতীনে পিরীত হ'লে তবে শ্যামা মাকে পাবি॥"

উত্তরকালে অভেদানন্দ বলিতেন, "ঠাকুরের এই পদ দু'টির হেঁয়ালীর অর্থ সেদিন বুঝতে পারি নি, পরে বুঝেছিলাম। শুচি ও অশুচি, ভালো ও মন্দ এই দুইয়ের পার্থক্য জ্ঞান বজায় থাকিলে অভেদ জ্ঞান স্ফুরিত হয় না, মায়াতীত হইয়া সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের পূর্ণ উপলব্ধিও সম্ভব হয় না।"

এভাবে শক্তি সঞ্চারিত করার পর শ্রীরামকৃষ্ণ কহিলেন, "রোজ রাতে নিজের বিছানায় বসে ধ্যান করবে, ধ্যানে দর্শনাদি হবে। সে সব এখানে এসে আমায় বলে যেয়ো। এবার যাও কালীমন্দিরে গিয়ে ধ্যানে বসো।"

ধ্যান শেষে ফিরিয়া আসিলে ঠাকুর সস্নেহে কালীপ্রসাদকে কিছু মিষ্টান্ন প্রসাদ খাইতে দিলেন।

এবার তাঁহার কলিকাতায় ফেরার পালা। ঠাকুর মৃদুমধুর স্বরে কহিলেন, "আবার এখানে এসো।" এই সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে আসবার পথঘাট, শেয়ারে কি করিয়া আসা যায়, এসব সুন্দর রূপে বুঝাইয়া দিলেন।

কালীপ্রসাদ সরল তরুণ, প্রশ্ন করিলেন, "যদি ভাড়া যোগাড় না করতে পারি তবে কি হবে?"

ঠাকুর আশ্বাস দিয়া বলেন, "যাহোক ক'রে এসে পড়বে, তারপর এখান থেকে তোমার যাতায়াতের ভাড়াটা যোগাড় ক'রে দেওয়া যাবে।"

একটি ধনী ভক্ত এ সময়ে নিজের গাড়িতে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে আসিয়াছেন ঠাকুরকে দর্শনের জন্য। তিনি ফিরিবার সময় তাঁহারই গাড়িতে কালীপ্রসাদকে ঠাকুর উঠাইয়া দিলেন।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের এই স্নেহস্নিগ্ধ মূর্তি, এই সুধাময় বাক্যের স্মৃতি, বার বার উঁকি দিতে থাকে তরুণ ভক্ত কালীপ্রসাদের মনের দুয়ারে। এই স্মৃতির মধুর রসে সারা অস্তিত্ব তাঁহার রসায়িত হইয়া উঠে।

এদিকে কালীপ্রসাদের জনক-জননী দুশ্চিন্তায় অস্থির হইয়া উঠিয়াছেন। সারাটা দিন রাত কাটিয়া গেল, তবুও ছেলের কোনো খোঁজ নাই। তবে কি সে গঙ্গায় ডুবিয়া মরিয়াছে, অথবা কোনো দুর্ঘটনায় পড়িয়াছে? চারদিকে বহু খোঁজাখুঁজি করিয়াও পুত্রের সন্ধান পাওয়া গেল না।

পরদিন প্রভাতে হঠাৎ নয়নতারা দেবীর মনে পড়িয়া যায়, কয়েকদিন আগে কালীপ্রসাদ তো তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়াছিল দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ি কোথায়, কলিকাতা হইতে কতটা দূরে? ধর্মের দিকে যে পুত্রের প্রবল ঝোঁক, একথা জননীর অজানা নাই, ভাবিলেন হয়তো কাহারো সঙ্গে সে দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরেই গিয়াছে, কোনো কারণে ফিরিয়া আসিতে পারে নাই।

পত্নীর মুখে একথা শুনিয়া রসিক চন্দ্র তখনি দক্ষিণেশ্বরের দিকে ছুটিলেন। মন্দিরে পৌছিয়াই খোঁজ করিতে গেলেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে।

ঠাকুর কহিলেন, "সে তো কাল এখানেই ছিল। এখানেই খাওয়া-দাওয়া করেছে, শুয়ে থেকেছে। আজ একজনের সঙ্গে গাড়িতে তাকে কলকাতায় পাঠিয়ে দিয়েছি।"

এ সংবাদে রসিক চন্দ্র শান্ত হইলেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে পুত্রের জন্য দেখা দিল আর এক দুশ্চিন্তা। দক্ষিণেশ্বরের এই পাগলা ঠাকুরের কাছে সে আসা যাওয়া শুরু করিয়াছে, শেষটায় ঘর-সংসার ত্যাগ করিয়া না বসে।

ঠাকুরকে অনুনয়ের সুরে কহিলেন, "কালীপ্রসাদ আমার ছেলে। সে যাতে মন দিয়ে লেখাপড়া করে, ঘর-সংসার করে, আপনি দয়া ক'রে তাকে সেই উপদেশ দেবেন।"

মৌল এবং গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে ঠাকুর ধোঁয়াটে কথাবার্তা বলিতেন না। পরিষ্কারভাবে কহিলেন, "আপনার ছেলের ভেতর যোগীর লক্ষণ রয়েছে, যোগসাধনার জন্য অধীর হয়েও উঠেছে। এ অবস্থায় তাকে বিয়ে দিলে, তার ফল কি ভালো হবে?"

রসিক চন্দ্র উত্তর দিলেন, "আজ্ঞে, পিতামাতার সেবাই তো পরমধর্ম। তাই নয় কি?"

"তা বটে, তা বটে," বলিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ বার বার আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

উত্তরকালে অভেদানন্দ বলিতেন, "ঠাকুর যে আসলে পিতামাতার সেবা বলতে জগৎ-পিতা ও জগৎ-মাতার সেবা বুঝে নিয়েছিলেন এবং সেইজন্যই আনন্দ প্রকাশ করছিলেন, আমার বাবা তা তখন বুঝে উঠতে পারেন নি।"

প্রথম দর্শনের পর হইতেই কালীপ্রসাদের মন রামকৃষ্ণ চরণে বাঁধা পড়িয়া যায়। বাড়িতে বসিয়া দিনরাত তাঁহারই কথা, তাঁহার বিপুল স্নেহ ভালোবাসা ও কৃপার কথা ভাবিতে থাকেন। লেখাপড়ায় আজকাল আর তাঁহার মনোযোগ নাই, বাড়ির কোনো কিছুতেই নাই পূর্বেকার সেই আকর্ষণ।

শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দেশ মতো রুদ্ধদ্বার কক্ষে প্রতি রাত্রে শয্যায় বসিয়া ধ্যান করেন, কত বিচিত্র কত উদ্দীপনাময় অতীন্দ্রিয় দর্শনাদি তাঁহার হইতে থাকে। পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণ যেন কালীপ্রসাদের জীবনের ভিত্তিমূলে এক প্রচণ্ড নাড়া দিয়াছেন। ফলে বিরাট এক পাষাণপিণ্ড হইয়াছে অপসারিত, আর উন্মোচিত হইয়াছে দিব্যরসের অমৃত নির্ঝর।

তাঁহার এ ভাবান্তর পিতা ও মাতার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়াইতে পারে

নাই। উভয়ে তাঁহাকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন, দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুরের কাছে আর তাঁহার যাওয়া চলিবে না। কিন্তু কালীপ্রসাদকে নিরস্ত রাখা আর সম্ভব হয় নাই।

এক একদিন ঠাকুরকে দর্শনের জন্য কালীপ্রসাদ অধীর হইয়া উঠিতেন। যে কোনো উপায়ে উপস্থিত হইতেন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের চরণতলে।

যাতায়াতের ভাড়া ঠাকুরই প্রায় সময়ে সংগ্রহ করিয়া দিতেন। বিদায় কালে স্নেহপূর্ণ স্বরে কহিতেন, "তুই না এলে, তোকে না দেখলে আমার প্রাণ বড় ব্যাকুল হয়ে ওঠে। রোজই তোকে দেখতে ইচ্ছে হয়।"

মন্ত্রমুগ্ধের মতো কালীপ্রসাদ কহিতেন, "আমিও রোজই আপনার দর্শনের জন্য অস্থির হয়ে উঠি। কিন্তু বাবা মা আমায় কেবলই নিষেধ করেন।"

স্মিতহাস্যে ঠাকুর বলিতেন, "কাউকে জানাবি নে, গোপনে চলে আসবি হেথায়। হাতে পয়সা না থাকলে, এখান থেকে নিয়ে নিবি।"

দেবমানব ঠাকুরের প্রেমঘন মূর্তি আর মধুময় কণ্ঠস্বর। কালীপ্রসাদ কখনো ভুলিতে পারেন না। এ কি অদ্ভুত ধরনের ভালোবাসা স্নেহ প্রেম তাঁহার? এ ভালোবাসায় স্বার্থের লেশমাত্র নাই। ভালোবাসার একমাত্র লক্ষ্য কালীপ্রসাদের ধর্মজীবনকে গড়িয়া তোলা, মুক্তির অমৃতলোকে তাঁহাকে পৌঁছাইয়া দেওয়া। মর্তের মানুষের মধ্যে এ বস্তু কখনো খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।

একদিন কালীপ্রসাদের পিতা সারাদিন বাড়ির সদর দরজায় তালা লাগাইয়া রাখিলেন, পুত্র যাহাতে বাহিরে যাইতে না পারে। বিকালে তিনি ভাবিলেন, দিন প্রায় শেষ হইতে চলিল, আজ এমন অসময়ে কালীপ্রসাদ আর দূরের পথ দক্ষিণেশ্বরে যাইবে না। সদর দরজাটি তাই খুলিয়া দেওয়া হইল। সুযোগ পাওয়ামাত্র কালীপ্রসাদও উন্মাদের মতো ছুটিয়া বাহির হইলেন রাজপথে। দক্ষিণেশ্বরে

পৌঁছিয়া লুটাইয়া পড়িলেন ঠাকুরের চরণতলে। হৃদয় তাঁহার দিব্য আনন্দে ভরপুর হইয়া উঠিল।

ঠাকুর রামকৃষ্ণ স্মিতহাস্যে একদৃষ্টে এতক্ষণ নূতন ভক্তের দিকে চাহিয়া আছেন। এবার প্রসন্ন মধুর কণ্ঠে কহিলেন, "ঠিক হচ্ছে। ও'রকমই করবি। ঈশ্বরের জন্য এমনি ব্যাকুলতাই তো চাই। সুযোগ পেলেই এসে উপস্থিত হবি। যা কিছু দর্শন হবে, অনুভূতিতে আসবে, সব এখানে বলে যাবি।"

ধ্যানের সময় কালীপ্রসাদ প্রায়ই বহুতর দিব্যমূর্তি দর্শন করিতেন। একদিন দেখিলেন অনন্ত আকাশ জোড়া বিস্ফারিত রহিয়াছে এক দিব্যচক্ষু। আর একদিন দেখিলেন, তাঁহার আত্মা যেন দেহপিঞ্জর হইতে বাহির হইয়া মুক্ত বিহঙ্গের মতো মহাশূন্যে বিচরণ করিতেছে। নভোলোকে ঊর্ধ্বে উঠিতে উঠিতে একসময়ে ইহা এক পরম রম্য স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। অসংখ্য দেব-দেবী, অবতার ও সিদ্ধপুরুষ সেখানে বিরাজিত। এই দর্শনের কথা ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে জানাইলে তিনি কহিলেন, "তোর বৈকুণ্ঠ দর্শন হয়েছে।"

পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন সত্যকার ব্রহ্মরসিক। দিনের পর দিন নানা রস নানা ভাববৈচিত্র্য তাঁহার জীবনলীলায় প্রকট হইয়া উঠিত, আর তরুণ কালীপ্রসাদ আকণ্ঠ ভরিয়া পান করিতেন এই লীলার সুধারস। জীবন কথায় তিনি লিখিয়াছেন, "কখনও তিনি ভাবাবেশে হাসিতেন, কখনও কাঁদিতেন ও নাচিতেন এবং কখনও বা সমাধিস্থ হইয়া থাকিতেন। আবার কখনও বা মধুরকণ্ঠে রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত প্রভৃতি সাধকগণের রচিত গান করিতে করিতে বিহ্বল হইয়া থাকিতেন। কখনও কখনও তিনি রাধাকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা কীর্তন করিতেন। কখনও বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব মহাজন রচিত পদাবলী গান করিতেন এবং আপন ভাবে মাতোয়ারা হইয়া গানে নূতন নূতন আখর দিতেন। কখনও বা পরম

বৈষ্ণব তুলসীদাস যেইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন সেইরূপে রামসীতার লীলা বর্ণনা করিতে করিতে ভাবাবেশে পরমানন্দসাগরে মগ্ন হইয়া যাইতেন। সর্বধর্মসমন্বয়ের ভাব পরমহংসদেবের জীবনে প্রত্যহ প্রতিফলিত হইত এবং সকলকে তিনি 'যত মত তত পথ' এই উদার সার্বভৌমিক ভাবের উপদেশ দিতেন। আমি সেই সকল উপদেশ হৃদয়ঙ্গম করিয়া অপূর্ব আনন্দে মগ্ন থাকিতাম।"

দিনের পর দিন ঠাকুরের কত করুণালীলাই না উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে কালীপ্রসাদের নয়ন সমক্ষে। সে-দিন রাম দত্ত মহাশয়ের বাড়িতে শ্রীরামকৃষ্ণ পদার্পণ করিয়াছেন। অভ্যর্থনা করিয়া বৈঠকখানা ঘরে সসম্ভ্রমে তাঁহাকে বসানো হইল। ঠাকুর চারিদিকে একবার দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, "কই, নরেন কই, তাকে তো দেখছি না।"

রাম দত্ত কহিলেন, "নরেন খুব অসুস্থ তাই আসতে পারে নি। মাথায় খুব যন্ত্রণা, চোখ খুলতে পারছে না।"

ঠাকুর অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। তাঁহার নির্দেশে তখনি কালীপ্রসাদ প্রভৃতি নরেনের বাড়ি গিয়া হাজির। কহিলেন, "ঠাকুর তোমার প্রতীক্ষায় রয়েছেন, তাড়াতাড়ি সেখানে চল।"

নরেন একটি ভিজে গামছা মাথায় দিয়া নিচের ঘরে শুইয়া আছেন। কহিলেন, "স্থাখ আমার অবস্থা। কি ক'রে যাই? আলোয় চোখ মেললেই মাথায় দারুণ যন্ত্রণা হয়।"

কালীপ্রসাদ প্রভৃতির চাপে পড়িয়া নরেনকে অগত্যা যাইতে হইল। মাথায় একটি ভেজা গামছা চাপা দিয়া বন্ধুদের হাত ধরিয়া কোনোক্রমে উপস্থিত হইলেন রাম দত্তের ভবনে।

নরেন আসিয়াছে, শ্রীরামকৃষ্ণের আনন্দের অবধি নাই। কাছে ডাকিয়া মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিলেন, "কিরে, তোর মাথায় কি হয়েছে?"

কি আশ্চর্য, ঠাকুরের হস্তটি মাথায় রাখিবার সঙ্গে সঙ্গে নরেনের তীব্র যন্ত্রণা দূর হইয়া গেল। স্বাভাবিকভাবে চোখ মেলিতেও তিনি সক্ষম হইলেন।

নরেন সবিস্ময়ে কহিলেন, "মশায়, আপনি কি করলেন, আর আমার মাথার বেদনা হঠাৎ কোথায় চলে গেল।"

ঠাকুর তখন মিটিমিটি হাসিতেছেন। একটু পরে নরেনকে কহিলেন, "এবার গান গেয়ে শোনা দেখি।"

নরেন আনন্দে উচ্ছল হইয়া উঠিয়াছেন, তানপুরায় সুর দিয়া মধুর কণ্ঠে গান ধরিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ ধীরে ধীরে ডুবিয়া গেলেন ধ্যানের গভীরে। নরেন কিন্তু পরমানন্দে একের পর এক গান গাহিয়াই চলিয়াছেন। দেখিয়া কে বলিবে, একটু আগেই তিনি শয্যায় শুইয়া তীব্র যাতনায় ছটফট করিতেছিলেন?

নরেনের গানে শ্রীরামকৃষ্ণের দেহে মনে জাগিয়া উঠিল দিব্য-ভাবের প্রবল উদ্দীপনা। প্রত্যক্ষদর্শী তরুণ সাধক কালীপ্রসাদ সেদিনকার এই দৃশ্যটির চমৎকার বর্ণনা দিয়াছেন, "পদকীর্তন শুনিয়া পরমহংসদেব ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়িলেন। সমবেত ভক্তগণও ভাবে মুগ্ধ ও বিহ্বল হইয়া রহিলেন। পরমহংসদেবের মুখে অপূর্ব জ্যোতি ও প্রসন্ন হাসি বিরাজ করিতে লাগিল। তাহার পর যখন আবার 'নদে টলমল করে গৌরপ্রেমের হিল্লোলে' বলিয়া কীর্তন আরম্ভ হইল, তখন পরমহংসদেব দাঁড়াইয়া উঠিলেন এবং কোমরে কাপড় জড়াইয়া মত্ত সিংহের ন্যায় নাচিতে আরম্ভ করিলেন। উদ্দাম সেই নৃত্য, অথচ মুখে প্রসন্ন হাসি ও ভাব। ইহা দেখিয়া মনে পড়ে, শ্রীচৈতন্যের নৃত্য দেখিয়া তাঁহার ভক্তগণের কথা। তাঁহারা বলিয়াছিলেন, 'গোরা আমার মাতাহাতী।' সেইদিন আমরা সেই মত্তহস্তীর ন্যায় শ্রীরামকৃষ্ণের উদ্দাম নৃত্য দেখিয়া আনন্দে বিভোর হইয়াছিলাম।"

নরেন্দ্র প্রভৃতি তরুণ ভক্তদের প্রতি ঠাকুরের অহেতুক স্নেহ ও প্রেম, ইষ্টগোষ্ঠী ও কীর্তনানন্দ দিনের পর দিন কালীপ্রসাদ প্রত্যক্ষ করেন, আর অভিভূত হইয়া যান।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ যেমনি প্রতিভাধর নট ও নাট্যকার, তেমনি ছিলেন উদ্দাম প্রকৃতির। কালীপ্রসাদ শুনিয়াছেন, ইতিপূর্বে গিরিশ ঠাকুরকে তেমন পাত্তা দেন নাই, মদের ঘোরে কয়েকবার তাঁহাকে অশ্রাব্য ভাষায় গালাগালও দিয়াছেন। বীতরাগভয়ক্রোধ ঠাকুর রামকৃষ্ণ তাহাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হয় নাই। অন্তরঙ্গ ভক্তদের বরং বলিয়াছেন, "মদ খেয়ে অমন আবোল-তাবোল বলছে। থাক্ না শালা ক'দিন খাবে।"

ঠাকুরের অগাধ স্নেহ-প্রেমের আকর্ষণ অতঃপর গিরিশকে নরম করিয়া আনে পরিণত করে একনিষ্ঠ ভক্তরূপে।

সেদিন দুপুরবেলায় কালীপ্রসাদ দক্ষিণেশ্বরে গিয়াছেন। দেখিলেন, একটু পরেই গাড়ি করিয়া গিরিশ ঘোষ সেখানে আসিয়া উপস্থিত। কাতর কণ্ঠে কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন, "ঠাকুর আমায় কৃপা ক'রে উদ্ধার করুন।"

শ্রীরামকৃষ্ণ ইতিমধ্যে ভাবাবিষ্ট হইয়া গিয়াছেন, মা-ভবতারিণীর সহিত চলিতেছে তাঁহার অন্তরঙ্গ সংলাপ। মৃদুস্বরে ঠাকুর কহিতেছেন, "বীরভক্ত গিরিশ ওসব পারবে না মা।"

ক্রমে ঠাকুরের বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসে, স্নেহপূর্ণ স্বরে গিরিশকে বলেন, "মা তোমায় বললেন বকলমা দিতে। তাই করো। তুমি আমায় বকলমা দাও, সব ভার সঁপে দাও, আর কিছু তোমায় ভাবতে হবে না।"

সাশ্রুনয়নে ভক্ত গিরিশ তাহাই করিলেন, ঠাকুরের অভয় আশ্রয় গ্রহণ করিয়া পতিত হইলেন তাঁহার চরণতলে।

কালীপ্রসাদ দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যহ করেন এমনি সব বিস্ময়কর ঘটনা, ঠাকুর রামকৃষ্ণের কৃপা ও অধ্যাত্মশক্তির মাহাত্ম্য অনুভব করেন সারা মনপ্রাণ দিয়া।

তরুণ সাধক কালীপ্রসাদ স্বভাবতই খুব ধ্যানপরায়ণ ছিলেন। গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের অহেতুক কৃপা, আর সাধন সম্পর্কিত পুঙ্খানুপুঙ্খ নির্দেশ, তাঁহার এই ধ্যানপ্রবণতাকে চালিত করে উচ্চতর সিদ্ধি

ও উপলব্ধির দিকে। এসময়কার একটি স্মরণীয় অভিজ্ঞতার তথ্য তাঁহার আত্মচরিতে আমরা পাই। তিনি লিখিয়াছেন :

"দক্ষিণেশ্বরে পরমহংসদেব তাঁহার ছোট ঘরটিতে বসিয়া আছেন এবং আমি তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া পদসেবা করিতেছি। তিনি আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, 'ব্রহ্মজ্ঞান কি সহজে লাভ করা যায়।' আমি বলিলাম, 'পাতঞ্জলদর্শনে একটি সূত্র আছে : তীব্র সম্বেগনামাসন্ন:—অর্থাৎ যাহাদের অন্তরে তীব্র সংবেগ (শ্রদ্ধা, বীর্যাদি) থাকে তাহাদের শীঘ্র সমাধি হয়। তিনি আমাকে সহাস্যে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, 'তোর ব্রহ্মজ্ঞান হবে।' তাহার পর তিনি আমার কপালে নখদ্বারা জোরে চিমটি কাটিয়া বলিলেন, 'এ স্থানে মন স্থির করবি। ন্যাংটা (তোতাপুরী) আমার কপালে একটা কাঁচখণ্ড বিদ্ধ করে সেই বিন্দুতে মন স্থির করতে বলেছিল। আমি সে রকম করলে আমার নির্বিকল্প সমাধি হয়েছিল। সে অবস্থায় বাহ্যজ্ঞান থাকে না। আমিও তিনদিন আর তিনরাত্রি সমাধিস্থ হয়ে ছিলাম। আমার অবস্থা দেখে ন্যাংটা বলেছিল, 'ক্যা দেবী মায়া হ্যায়! চাল্লিশ বরষ সাধন করকে হামকো জো নির্বিকল্প সমাধি মিলা হ্যায়, তুম তিন রোজমে সিদ্ধ কর্ লিয়া ?—অর্থাৎ, কি দৈবী মায়া! আমি চল্লিশ বছর কঠোর সাধন ক'রেও যে সমাধি লাভ করতে পারি নি, রামকৃষ্ণ তা তিন দিনে লাভ করল।

"তাহার পর পরমহংসদেব আমাকে পঞ্চবটীর নিচে বসিয়া ধ্যান করিতে আদেশ দিলেন। তখন হরিশ নামক অপর একজন সেবক আসিল। আমি পরমহংসদেবের সেবার ভার তাকে দিলাম এবং পরমহংসদেবকে প্রণাম করিয়া পঞ্চবটীর তলায় ধ্যান করিতে অগ্রসর হইলাম। সেইখানে আমি ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে মনস্থির করিয়া ধ্যান করিতে করিতে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া কতক্ষণ সমাধিস্থ ছিলাম জানি না। তবে ধীরে ধীরে বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিলে আমি উঠিয়া আসিয়া পরমহংসদেবের চরণে প্রণাম করিলাম। তিনি সস্নেহে আমার মাথায় হস্ত রাখিয়া আশীর্বাদ করিলেন।"

সাধনার গোড়ার দিকে, বিশেষত সাধকদের তরুণ বয়সে, তত্ত্ব ও দর্শনের কত জটিল প্রশ্নই না মনে আসিয়া ভিড় করে। কালীপ্রসাদ স্বভাবতই মননশীল, তাই অনেক প্রশ্নই তাঁহার মনে তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিত। সব প্রশ্নেরই জবাব মিলিত শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে, নিতান্ত আপনার জনরূপে, পিতা ও সখারূপে সতত তিনি তাহাকে এই বিষয়ে সাহায্য করিতেন, জাগাইয়া তুলিতেন ঈশ্বর সম্বন্ধে নূতনতর উদ্দীপনা।

বেদান্তের তত্ত্ব, ব্রহ্ম ও মায়ার তত্ত্ব ঠাকুর তাঁহার নবীন ভক্ত-শিষ্যদের বুঝাইয়া দিতেন প্রাঞ্জল ভাষায়, অতি সহজভাবে কহিতেন, "ব্রহ্ম নির্গুণ এবং সগুণ। নির্গুণ ব্রহ্ম কেমন জানিস্? যেমন সাপ স্থির হয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুমুচ্ছে, আবার সেই সাপ যখন এঁকেবেঁকে চলছে, তখন সগুণব্রহ্ম। নির্গুণব্রহ্ম অখণ্ড স্থির সমুদ্র। তাতে তরঙ্গ অথবা ক্রিয়া নেই, অচল অটল ও সুমেরুবৎ। মায়াশক্তি ব্রহ্মে যেন সুপ্তাবস্থায় লীন হয়ে থাকে। সেই অবস্থায় বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জীবজগৎও মহাপ্রলয়ে লীন হয়ে থাকে। মায়াশক্তি জাগ্রত হয়ে উঠ্‌ল সেই সচ্চিদানন্দ সমুদ্রে তরঙ্গ হতে থাকে। সেই অবস্থাকে বেদান্তশাস্ত্রে সগুণব্রহ্ম বলা হয়েছে। তখন ত্রিগুণাত্মিকা মায়া বা প্রকৃতিতে গুণক্ষোভ হয় এবং সৃষ্টিকার্য আরম্ভ হয়। এই সগুণব্রহ্মই 'অর্ধনারীশ্বর' 'হরগৌরী' নামে শাস্ত্রে অভিহিত।"

কালীপ্রসাদ প্রভৃতি যুবক ভক্তদের উৎসাহিত করিতে গিয়া ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আরো বলিতেন, "অদ্বৈতজ্ঞান আঁচলে বেঁধে যা ইচ্ছা তাই কর।" অর্থাৎ, সাধকের পক্ষে দরকার আগে অদ্বৈতজ্ঞান লাভ করিতে হইবে। ইহার ফলে সংসারজীবনের কাজকর্মে থাকিয়াও মানুষ অবিদ্যা ও অজ্ঞানের হাত হইতে নিষ্কৃতি পায়, মুক্তি লাভ করিতে সমর্থ হয়।

কালীপ্রসাদ একদিন প্রশ্ন করিলেন ঠাকুরকে, "জীব আর ব্রহ্মে পার্থক্য কি?"

উত্তর হইল,—"নদীর স্রোতে জলের উপরে একটা লাঠি

এড়োভাবে ধরলে মনে হয় জল দু'ভাগ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু নিচের জল সেই একই জল রয়েছে। ঠিক সেই রকম, অহং লাঠিটা তুলে ধরার ফলে জীব ও ব্রহ্মকে পৃথক মনে হয়। কিন্তু আসলে কোনোই ভেদ নেই। ব্রহ্মজ্ঞান হলে, সব ভেদ দূর হয়ে যায়।"

আরও বলিতেন, "যিনি নিরাকার, তিনিই সাকার। ঈশ্বরের সাকার রূপও জানতে হবে। সাধক যে রূপ চিন্তা বা ধ্যান করে, সেই রূপই দর্শন করে। পরে অখণ্ড সচ্চিদানন্দে মিলিয়ে যায়। তখন সাকার নিরাকার হয়ে যায়।"

সর্বধর্ম সমন্বয়ের বীজটিও এই সময়ে ঠাকুর রোপণ করিয়া দেন। কালীপ্রসাদ এবং অন্যান্য তরুণ ভক্তদের সাধনজীবনে। বলেন, "যিনি সর্ব ধর্মমতের সমন্বয় করতে পারেন, তিনিই খাঁটি লোক। অন্য সবাই একঘেয়ে। বেদে যাঁকে 'ওঁ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম' বলেছে, তন্ত্রে তাকেই বলেছে, 'ওঁ সচ্চিদানন্দ শিব', আর পুরাণে বলেছে, 'ওঁ সচ্চিদানন্দ কৃষ্ণ'। যত মত, তত পথ। তাঁকে পাবার জন্য নানা মত ও নানা পথ, কিন্তু লক্ষ্য একটাই।"

বেদ বেদান্তের তত্ত্ব ও সিদ্ধ সাধকদের উপলব্ধ সত্য ঠাকুর অতি সহজ সরলভাবে ভক্তদের বুঝাইয়া দিতেন এবং এ তত্ত্বগুলি তাঁহাদের হৃদয়ে চিরদিনের জন্য অঙ্কিত হইয়া থাকিত।

অভেদানন্দ বলিয়াছেন, "শ্রীশ্রীঠাকুর মাঝে মাঝে জীবকোটি ও ঈশ্বরকোটির প্রসঙ্গ তুলিয়া আলোচনা করিতেন। কিন্তু তখন আমি বা আমরা কেহই তাহার যথার্থ অর্থ বুঝিতে পারিতাম না। আমরা বুঝিতাম, সচ্চিদানন্দব্রহ্ম সকলের মধ্যেই বিরাজমান, সুতরাং কেহ ছোট বা বড় এইরূপে চিন্তার কোনো অর্থ নাই। একদিন শ্রীশ্রীঠাকুরের পদসেবা করিতেছি। নিকটে কেহই ছিল না। আমি তাঁহাকে একাকী পাইয়া সেই জীবকোটি ও ঈশ্বরকোটির তত্ত্ব সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি প্রসন্ন হইয়া আমার প্রশ্নের উত্তর দিয়া বলিলেন, 'ব্রহ্ম সকলের মধ্যে আছেন সত্য, কিন্তু সবার শক্তির প্রকাশে তারতম্য আছে। এই প্রকাশের তারতম্যেই ঈশ্বরকোটি

ও জীবকোটি হয়। জীবকোটি নিজে মুক্তি পান, অপরকে মুক্তি দিতে বা উদ্ধার করতে তিনি পারেন না। কিন্তু যিনি নিজে উদ্ধার লাভ ক'রে অপরকে উদ্ধার করতে পারেন, তিনিই ঈশ্বরকোটি। জীবকোটি ও ঈশ্বরকোটির মধ্যে এই প্রভেদ। কেউ কেউ আবার ঐ শক্তি নিয়েই জন্মগ্রহণ করেন।'

"আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'জীবকোটি কি তাহলে ঐ শক্তি পায় না? জীবকোটি কি ঈশ্বরকোটির স্তরে কখনো উঠতে পারে না?'

"শ্রীশ্রীঠাকুর বলিলেন, 'হ্যাঁ পারে। জীবকোটি যদি জগন্মাতার নিকট অপরকে উদ্ধার করার জন্য শক্তি প্রার্থনা করে তবে মা তাকে তা দেন।' এই উপলক্ষে তিনি একটি দৃষ্টান্তও দিলেন। তিনি বলিলেন, 'বনের মধ্যে চারদিকে উঁচু দেওয়াল দিয়ে ঘেরা একটা জায়গা ছিল। কিন্তু কোনো লোক হয়তো ভিতরের দিকে লক্ষ্য করে এবং আনন্দে হা হা ক'রে হেসে পড়ে যায়। এ হল জীবকোটি। কিন্তু যার বিশেষ শক্তি আছে, সে দেওয়ালে উঠে ভিতরের জিনিস দেখে ফিরে আসে এবং আর আর সঙ্গীদের খবর দিয়ে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যায়। এ হল ঈশ্বরকোটি'[১]।"

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাস। এ সময়ে হঠাৎ একদিন ধরা পড়িল, শ্রীরামকৃষ্ণের গলদেশে ক্যান্সার হইয়াছে। শিষ্য, ভক্ত ও অনুরাগীদের উদ্বেগের অবধি রহিল না। কিছুদিন পরে চিকিৎসার সুব্যবস্থার জন্য তাঁহাকে শ্যামপুকুরের একটি বাড়িতে স্থানান্তরিত করা হয়। তাছাড়া, সেবা শুশ্রূষার জন্য দেবী সারদামণিকেও সেখানে নিয়া আসা হয়।

কালীপ্রসাদও এসময়ে চিরতরে গৃহত্যাগ করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের পদপ্রান্তে চলিয়া আসেন, প্রাণমন উৎসর্গ করেন তাঁহার সেবা পরিচর্যায়। নরেন প্রায় সময়েই ঠাকুরের শয্যার পার্শ্বে থাকিতেন।

১ আমার জীবনকথা: স্বামী অভেদানন্দ

এজন্য ভক্তেরা রসিকতা করিয়া এই দুই বিশিষ্ট সেবককে বলিতেন, —পার্সোনাল্ আতাসে টু হিজ্ হোলিনেস্ শ্রীরামকৃষ্ণ।

এসময়ে ঠাকুরের দিব্য ভাব এবং ভগবত্তার ভাবটি দিনের পর দিন দেদীপ্যমান্ হইয়া উঠিতে থাকে কালীপ্রসাদ এবং অন্যান্য অন্তরঙ্গ ভক্তদের দৃষ্টিতে।

কোয়েকার সম্প্রদায়ের এক খ্রীষ্টান ভদ্রলোক সেদিন ঠাকুর রামকৃষ্ণকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন। কথাপ্রসঙ্গে ঐ খ্রীষ্টানটি যীশুখ্রীষ্টের লীলা ও মাহাত্ম্য কিছু কিছু বর্ণনা করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের দেহে মনে জাগিয়া উঠিল দিব্যভাবের উদ্দীপনা, বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া ভাবাবেশে রোগশয্যা ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। খ্রীষ্টান ভদ্রলোকটি তখন ঠাকুরকে যেন দর্শন করিতেছেন তাঁহার ইষ্টদেব খ্রীষ্টরূপে। ভক্তিভরে তিনি স্তব শুরু করিয়া দিলেন।

তারপর তিনি কহিলেন, "আপনারা এঁকে চিনতে পারছেন না। ইনি আর আমাদের খ্রীষ্ট অভিন্ন। আজ এঁর যে ভাব দর্শন করলাম, প্রভু যীশু খ্রীষ্টেরও ঠিক এমনিতর ভাব হত। আমি এর আগে খ্রীষ্ট এবং পরমহংসদেব, এ দুজনকেই স্বপ্নে দেখেছি। ইনিই বর্তমান যুগের যীশুখ্রীষ্ট।"

শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত ও সেবকেরা একথা শুনিয়া বিস্ময়ে আনন্দে অভিভূত হইয়া পড়েন।

সেদিন বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী শ্যামপুকুরে শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখিতে আসিয়াছেন। কালীপ্রসাদ ঠাকুরের পাশে অদূরে উপবিষ্ট। এসময়ে উভয়ের মধ্যে যে কথাবার্তা হয় সে সম্পর্কে উত্তরকালে অভেদানন্দ লিখিয়াছেন, "বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী পরমহংসদেবকে বলিলেন, আমি আপনাকে ঢাকায় এই রকম স্থূল শরীরে দেখেছি। আপনি সেখানে গিয়েছিলেন কি?"

"পরমহংসদেব হাসিতে হাসিতে বলিলেন, 'আপনার ভক্তির জোরে আপনি আমায় দেখেছেন।' এই কথা বলিয়া পরমহংসদেব ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়িলেন এবং বিজয়কৃষ্ণের বক্ষে দক্ষিণপদ স্থাপন

করিলেন। তখন বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী তাঁহার পাদপদ্ম বক্ষে ধারণ করিয়া ভাবে, অশ্রুজলে, ভাসিতে লাগিলেন। আমরা সকলে অবাক্ হইয়া সেই অপূর্ব দৃশ্য দেখিতে লাগিলাম। ভাবিলাম তাহা দেবলীলাই বটে।"

সেদিন ছিল কালীপূজার দিন। ভক্তেরা ঠাকুরের পূর্বদিনের নির্দেশমতো পূজার উপচার সংগ্রহ করিয়া তাঁহার কক্ষে সাজাইয়া রাখিয়াছেন। পূজার লগ্ন উপস্থিত হইলে ঠাকুর আসনে আসিয়া বসিলেন, নিজদেহে বিরাজমানা জগন্মাতাকে উদ্দেশ করিয়া নিজেই অর্পণ করিলেন পুষ্পাঞ্জলি। সঙ্গে সঙ্গে হস্তে প্রকাশিত হইল বরাভয় মুদ্রা। উত্তরাস্য হইয়া বসিয়া তিনি সমাধিস্থ হইলেন।

প্রধান ভক্ত গিরিশ ঘোষ পাশেই বসিয়া ছিলেন, ঠাকুরের ভগবত্তা ভাবের উদ্দীপন দর্শনে বলিয়া উঠিলেন, "আমাদের সামনে আজ জীবন্ত মা কালী বিরাজ করছেন। এসো সবাই তাঁরই পূজা করি।"

মাল্য ও পুষ্পচন্দন নিয়া গিরিশ প্রথমে ঠাকুরকে অঞ্জলি দিলেন, উচ্চারণ করিলেন ঘন ঘন জয়-মা, জয়-মা রব।

কালীপ্রসাদ, নিরঞ্জন প্রভৃতি ভক্তসেবকেরা সবাই আনন্দে অধীর। সোৎসাহে দিলেন পুষ্পাঞ্জলি, ভক্তিভরে গ্রহণ করিলেন প্রসাদ। স্তবগানের ঝঙ্কারে সারা কক্ষটি মুখরিত হইয়া উঠিল।

উত্তরকালে ঠাকুরের এই ভগবত্তা ভাবের দৃশ্যটি বর্ণনা করিয়া স্বামী অভেদানন্দ বলিতেন, "সে অপূর্ব দৃশ্য এ জীবনে কোনোদিন আমরা ভুলতে পারবো না।"

চিকিৎসায় শ্রীরামকৃষ্ণের তেমন কিছু উপকার হইতেছে না দেখিয়া ডাক্তারেরা স্থান পরিবর্তনের পরামর্শ দিলেন। কাশীপুরে আশি টাকা ভাড়ায় একটি পুরাতন বাগানবাড়ি ভাড়া করা হইল।

ভক্ত সুরেশ মিত্রকে ডাকিয়া ঠাকুর কহিলেন, "এরা গরীব, প্রায়ই কেরানী, বেশী টাকা দেবার ক্ষমতা এদের কই? বাড়ি ভাড়াটা তুমি দিও। সুরেশ মিত্র তখনি রাজী হইয়া গেলেন।

এবার বলরাম বাবুকে কহিলেন, "ওগো তুমি আমার খরচটা দিও। চাঁদার খাওয়া আমি পছন্দ করিনে।" বলরাম সোৎসাহে এ নির্দেশ শিরোধার্য করিলেন।

ঠাকুরের দর্শনের জন্য, সেবা শুশ্রূষার তত্ত্বাবধানের জন্য, গৃহী ভক্তদের অনেকে এখানে আসা শুরু করিলেন। আর ত্যাগী তরুণ ভক্তেরা রহিলেন ঠাকুরের সেবা ও চিকিৎসার সকল কিছু দায়িত্ব নিয়া। একদিন কালীপ্রসাদ ও অন্যান্য সেবক ভক্তদের ঠাকুর কহিলেন, "ত্যাখ্, আমার এই গলার ঘা একটা উপলক্ষ মাত্র। এই সূত্রে তোরা সবাই একত্র হয়েছিস।"

এভাবে ঠাকুর তাঁহার নিজের অসুখটি উপলক্ষ করিয়া ঠাকুর উত্তরকালের রামকৃষ্ণমণ্ডলীর বীজটি রোপণ করিলেন। শুধু তাহাই নয়, যাহাতে এ বীজ অঙ্কুরিত ও পুষ্পিত হইয়া উঠে, সযতনে তাহার পরিবেশও রচনা করিয়া গেলেন।

নরেন্দ্রনাথ যুবক-ভক্তদের অগ্রণী, তাঁহার নেতৃত্বে সবাই পালা করিয়া গ্রহণ করিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের সেবাকার্যের ভার।

সবার অলক্ষ্যে, সেদিন সামান্য একটু মন্তব্য আর ইচ্ছা শক্তির প্রয়োগে, নরেন্দ্রনাথের জীবনকে ঠাকুর প্রবাহিত করিলেন বিধি-নির্দিষ্ট খাতে।

নরেন্দ্র রাত জাগিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের সেবা করেন। চিকিৎসার তত্ত্বাবধান করেন, আবার এই সঙ্গে অবসর সময়ে তৈরী হইতেছেন নিজের আইন পরীক্ষার জন্য।

কথা প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ সেদিন তাঁহাকে কহিলেন, "ত্যাখ্, তুই যদি উকিল হোস্, তবে তো তোর হাতের জল আর আমি খেতে পারবো না।" কালীপ্রসাদও সেদিন সেখানে উপস্থিত। দেখিলেন, নরেন্দ্র স্তব্ধ হইয়া কি যেন চিন্তা করিতেছেন, তারপর তখনি নিচের ঘরে গিয়া আইনের বইগুলি একধারে সরাইয়া রাখিলেন। কহিলেন, "আইন পরীক্ষটা দেওয়া আর হল না।"

যে কাজ করিলে প্রাণপ্রিয় ঠাকুর তাঁহার হাতের জলটুকু পর্যন্ত খাইবেন না, সে কাজ তিনি কি করিয়া করিবেন ?

নরেন্দ্র, কালীপ্রসাদ, শরৎ, নিরঞ্জন প্রভৃতি একসঙ্গে সেদিন বেড়াইতেছেন বাগানে। নরেন্দ্র কহিলেন, "ঠাকুর যে কঠিন ব্যাধি নিজ শরীরে নিয়েছেন, মনে হয় তিনি দেহরক্ষার সংকল্পই করেছেন। এসো, এখন আমরা প্রাণ ঢেলে তাঁর সেবাশুশ্রূষা করি, সঙ্গে সঙ্গে চালিয়ে চাই জপ ধ্যান ও সাধনভজন।"

অভেদানন্দ উত্তরকালে এ সময়কার জীবনের এবং বিশেষ করিয়া নরেন্দ্রনাথ ও তাঁহার নিবিড় অন্তরঙ্গতার বর্ণনা দিয়াছেন :

—রাত্রিতে আমরা আপন আপন পালা বা কর্তব্য শেষ করিয়া পূর্বের ন্যায় আগুন জ্বালাইয়া ধুনির পার্শ্বে বসিয়া ধ্যান, বেদান্ত বিচার, গীতাপাঠ, ও শাস্ত্রালাপ করিতে থাকিতাম। তাহার পর শঙ্করাচার্যের মোহমুদ্গর ও নির্বাণাষ্টকের স্তোত্রগুলি আবৃত্তি ও তাহাদের অর্থের ধ্যান করিতাম। সেই সময় হইতেই সত্য সত্য আমি ও শরৎ (সারদানন্দ) নরেন্দ্রনাথের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার সমস্ত আদেশ পালন করিতাম এবং তাঁহার ছায়ার ন্যায় সঙ্গে সঙ্গে থাকিতাম। নরেন্দ্রনাথ আমার ও শরতের নাম দিয়াছিল 'কেলুয়া' ও 'ভুলুয়া'। তখন কখনও অষ্টাবক্র সংহিতা, যোগবাশিষ্ট পাঠ করা হইত, কখনও বা ভাগবতের 'গোপী-গীতা' আবৃত্তি করা হইত। নরেন্দ্রনাথ সুমধুর কণ্ঠে রামপ্রসাদী গান, ব্রহ্মসংগীত এবং শ্রীশ্রীঠাকুর যে সমস্ত গান গাহিতেন সেই সমস্ত গাহিয়া আমাদের সকলকে মাতাইয়া রাখিত। আবার কখনও বা আমরা 'জয় রাধে' বলিয়া সংকীর্তনে মাতিয়া নৃত্য করিতাম।

—নরেন্দ্রনাথ আমার অপেক্ষা প্রায় চারি বৎসরের বড় ছিল। আমি নরেন্দ্রনাথকে সেই অবধি আপনার জ্যেষ্ঠভ্রাতার ন্যায় ভালো বাসিতাম। নরেন্দ্রনাথও আমায় আপনার সহোদরতুল্য ভালো-বাসিত। তাহা ছাড়া আমি যে তাহাকে শুধু ভালোবাসিতাম তাহা নহে, তাহার আজ্ঞানুবর্তী হইয়া সকল কাজই করিতাম।

বলিতে গেলে আমি নরেন্দ্রনাথের ছায়ার মতো সর্বদা সঙ্গে সঙ্গে থাকিতাম। এবং নরেন্দ্রনাথ যাহা করিত আমিও নির্বিবাদে তাহা করিতাম। নরেন্দ্রনাথ যাহা করিতে বলিত, অকুণ্ঠিত হৃদয়ে তৎক্ষণাৎ তাহা করিতাম।

—নরেন্দ্রনাথ ও আমি জ্ঞানমার্গের 'নেতি নেতি' বিচার করিতাম এবং অদ্বৈত বেদান্ত-মতের একান্ত পক্ষপাতী ছিলাম। নরেন্দ্রনাথ পাশ্চাত্য দর্শন ও ন্যায়, বিজ্ঞান প্রভৃতি শাস্ত্রে অভিজ্ঞ ছিল। ঐ সকল বিষয়ে তাহার সহিত আলোচনা করিতে করিতে আমার জ্ঞানপিপাসা দিন দিন আরও বর্ধিত হইতে লাগিল। তাহা ছাড়া এই সকল বিষয়ে নরেন্দ্রনাথকে আমি এত অধিক অনুকরণ করিতাম যে, যখন নরেন্দ্রনাথ ধ্যান করিতে বসিত তখন আমিও ধ্যান করিতাম। নরেন্দ্রনাথ যেমনটি ভাবে ও সুরে মোহমুদ্গর কৌপীন পঞ্চক বিবেকচূড়ামণি ও অষ্টাবক্র সংহিতা প্রভৃতি আবৃত্তি করিত আমিও তদনুরূপে করিতাম। আমাদের দুইজনের মধ্যে ছিল এক নিবিড় সম্পর্ক এবং সেই সম্পর্ক চিরদিন অটুট ছিল[১]।

নরেন্দ্রনাথ ছিলেন তরুণ ভক্তদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাণবন্ত এবং স্বাভাবিক নেতৃত্বের অধিকারী। ব্রাহ্মদের মতো জাতের বিচার পূর্ব হইতেই তিনি মানিতেন না, এবং সর্বদিক দিয়া ছিলেন অত্যন্ত উদারপন্থী। একদিন কালীপ্রসাদ প্রভৃতিকে কহিলেন, "চলো, তোমাদের কুসংস্কার ভেঙে আসি। পিরুর দোকানের ফাউলকারী রান্না খাইয়ে দিই।"

বন্ধুরা তখনি সায় দিলেন। চমৎকার মুসলমানী রান্না, নরেন্দ্রনাথ উৎসাহের সহিত প্লেটের সবটা উড়াইয়া দিলেন। কালীপ্রসাদ, শরৎ প্রভৃতি নিজেদের কুসংস্কার ভাঙার জন্য, ঘৃণা দূর করার জন্য, নামমাত্র আহার করিলেন।

এদিকে শ্রীরামকৃষ্ণ বার বার তাঁহাদের ডাকাডাকি করিতেছেন।

১ আমার জীবন কথা: স্বামী অভেদানন্দ

কালীপ্রসাদ তাঁহার সেবার জন্য শয্যার পাশে যাওয়া মাত্র প্রশ্ন করিলেন, "তোরা সবাই কোথায় গিয়েছিলি, বলতো।"

"বিডন স্ট্রীটে পীরুর হোটেলে।"

"কে কে গিছলি ?"

"নরেন, শরৎ, নিরঞ্জন আর আমি।"

"সেখানে কি খেলি ?"

"মুর্গির ঝোল।"

"ক্যামন লাগলো তোদের ?"

"আজ্ঞে, আমার আর শরতের তেমন ভালো লাগে নি। তাই একটুখানি মুখে দিয়ে কুসংস্কার ভাঙলাম।"

উচ্চস্বরে হাসিয়া উঠেন শ্রীরামকৃষ্ণ। বলেন, "বেশ করেছিস, ভালো হল, তোদের কুসংস্কার সব-দূর হয়ে গেল।"

এতক্ষণে কালীপ্রসাদের দুশ্চিন্তা দূর হইল, ঠাকুর তবে রাগ করেন নাই বরং বেশ কৌতুক বোধ করিতেছেন তাঁহাদের এই অভিযানের কথা শুনিয়া।

নরেন্দ্রনাথের উৎসাহে কাশীপুর বাগানের পুকুরে কয়েকদিন খুব মাছ ধরার কাজ শুরু হইয়া গেল। ঠাকুরের সেবা পরিচর্যার ফাঁকে ফাঁকে তরুণ ভক্তেরা পুকুরের ধারে আসিতেন, ছিপ হস্তে বসিয়া পাড়তেন। এই কাজে কালীপ্রসাদের দক্ষতা ছিল সব চাইতে বেশী, তাঁহার ছিপেই মাছ ধরা পড়িত বেশী সংখ্যায়।

ঠাকুর সেদিন কহিলেন, "কিরে তুই নাকি ছিপ দিয়ে খুব মাছ ধরেছিস্ ?"

বিনীত উত্তর হইল, "আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"ছিপ দিয়ে মাছ ধরা পাপ, ওতে জীব হত্যা হয়।"

কালীপ্রসাদ তর্ক তুলেন, "কেন, গীতার শ্লোকে তো রয়েছে, য এনং বেত্তি হন্তারং, ইত্যাদি। আত্মা হন্তা নয়, হতও হয় না কোনোদিন। তবে মাছ ধরায় পাপ কি ?"

ঠাকুরও যুক্তি দিয়া তাঁহাকে কিছুক্ষণ বুঝাইলেন, তারপর

কহিলেন, "ছাখ্ ঠিক ঠিক জ্ঞান হলে, তখন আর বেতালে পা পড়ে না। যারা তপস্যা ক'রে, গোড়ার দিকে তাদের অনেক কিছু ভালোমন্দ পাপপুণ্য বিচার ক'রে চলতে হয়।

একটু থামিয়া আবার বলিলেন, "আমি তোকে ছেলেদের মধ্যে বুদ্ধিমান বলে জানি। আমি যে কথাগুলো বললাম, তুই তা স্মরণে রেখে ধ্যান কর্, সব বুঝতে পারবি।"

তিন দিনের মধ্যে ধ্যানাবিষ্ট কালীপ্রসাদের উপলব্ধিতে আসিয়া গেল ঠাকুরের বক্তব্যের যথার্থতা। ঠাকুরের নিকট গিয়া বলিলেন, "এবার আমি বুঝতে পেরেছি, মাছ ধরা কেন অন্যায় কাজ। একাজ আর আমি করবো না। আমায় ক্ষমা করুন।"

শ্রীরামকৃষ্ণের মুখে ফুটিয়া উঠে প্রসন্নতার হাসি। ধীরকণ্ঠে বলেন, "মাছ ধরায় বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়। খাবারের লোভ দেখিয়ে বড়শী লুকিয়ে রাখা, আর অতিথি বা বন্ধুকে নিমন্ত্রণ ক'রে এনে খাবারের ভেতর বিষ লুকিয়ে রাখা, একই ধরনের পাপ।"

কথাগুলি তরুণ সাধক কালীপ্রসাদের মর্মে প্রবিষ্ট হইয়া গেল, ঠাকুরের করুণাঘন মূর্তির দিকে সজলনয়নে তিনি চাহিয়া রহিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ আবার কহিলেন, "আত্মা মরে না, অপরকে মারেও না বটে, কিন্তু এই জ্ঞান যার হয়েছে সে তো আত্মস্বরূপ। কাজেই অপর কাউকে হত্যা করার প্রবৃত্তি তার হবে কেন? যতক্ষণ হত্যার প্রবৃত্তি থাকে, ততক্ষণ তো সে আত্মস্বরূপ হতে পারে না, আত্মজ্ঞানও প্রকাশিত হয় না। তাই বলছি যে, ঠিক ঠিক জ্ঞান হলে মানুষের আর বেতালে পা পড়ে না। জানবি—আত্মা দেহ, ইন্দ্রিয়-মন, বুদ্ধির পারে ও সাক্ষীস্বরূপ।"

বিতর্কিত বিষয় সম্পর্কে কালীপ্রসাদের সর্ব সংশয় ইতিমধ্যে দূর হইয়াছে, আনন্দে অভিভূত হইয়া বার বার কেবলই ঠাকুরের কৃপার কথা ভাবিতেছেন।

কালীপ্রসাদ স্বভাবতই তীক্ষ্ণধী, মননশীল ও প্রতিভাধর। নূতন নূতন জ্ঞান বিজ্ঞানের তত্ত্ব শেখার জন্য তাঁহার কৌতূহল ও ঔৎসুক্যের

অবধি নাই। ঠাকুরের সেবা এবং ধ্যান জপের অবকাশে এ সময়ে প্রায়ই তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের জ্ঞানসমৃদ্ধ গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতেন।

একদিন সেবাকর্মের এক ফাঁকে শ্রীরামকৃষ্ণের পাশে বসিয়া জন স্টুয়ার্ট মিলের একখানি বই পড়িতেছেন। ঠাকুর প্রশ্ন করিলেন, "কিরে, কি বই এটা?"

"আজ্ঞে, ইংরেজী ন্যায়শাস্ত্র।"

"কি শেখায় ওতে?"

"এতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণের তর্ক, যুক্তি ও বিচার শেখায়।"

"তুই তো দেখছি এখানে ছেলেদের মধ্যে বইপড়া ঢোকালি। তবে কি জানিস্, বই পড়া বিদ্যে আসলে কিছু নয়। আপনাকে মারতে গেলে একটা নরুনই যথেষ্ট। কিন্তু অপরকে মারতে গেলে ঢাল তলোয়ার প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্রের দরকার হয়। অবশ্যি, যারা লোকশিক্ষা দেবে তাদের এসব পড়ার দরকার আছে।"

এ কথার পর শ্রীরামকৃষ্ণ নীরব হইয়া যান, কালীপ্রসাদের বই পড়া নিয়া আর উচ্চবাচ্য করেন নাই। তিনি অন্তর্যামী, তাই বুঝিয়াছিলেন, উত্তরকালে তাঁহার এই নবীন শিষ্য কালীপ্রসাদ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সভ্যতার কেন্দ্রগুলিতে ভারতীয় ধর্ম ও দর্শনের তত্ত্ব প্রচার করিবে। শ্রেষ্ঠ মনীষী ও ধর্মনেতাদের সম্মুখীন হইবে। তাই কালীপ্রসাদের বই পড়া নিষেধ করেন নাই। ভক্ত ও শিষ্যদের মধ্যে সেসময়ে প্রায়ই ধর্মীয় মতবাদ সম্পর্কে তর্কবিতর্ক হইত। কালীপ্রসাদের প্রতিভা যুক্তি, তর্ক ও পরিশীলিত বুদ্ধি সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। ঠাকুরের কানে সব সংবাদই যাইত। একদিন কালীপ্রসাদকে ডাকিয়া বেশ কিছুটা উৎসাহিতও করিলেন। কহিলেন, "ছেলেদের মধ্যে তুইও বুদ্ধিমান। নরেনের নিচেই তোর বুদ্ধি। নরেন যেমন একটা মত চালাতে পারে, তুইও সেরকম পারবি।"

প্রবীণ ভক্ত বুড়ো-গোপাল একদিন ঠাকুরকে জানাইলেন, "মশায়, কালী কিছুই মানে না। একেবারে নাস্তিক হয়ে গেছে।" শুনিয়া ঠাকুর শুধু একটু মুচকি হাসি হাসিলেন।

একদিন কালীপ্রসাদকে প্রশ্ন করিলেন, "হাঁরে, তুই নাকি নাস্তিক হয়ে গেছিস ?"

কালীপ্রসাদ নিরুত্তর। আবার ঠাকুরের জিজ্ঞাসা, "তুই ঈশ্বর মানিস ?"

সংক্ষিপ্ত একটি উত্তর হইল, "না।"

"অন্য কোনো সাধুর কাছে একথা বললে, সে তোর গালে চড় মারতো।"

"আপনিও মারুন। যতক্ষণ না ঈশ্বর আছেন এবং বেদ সত্য, একথা ঠিক বুঝতে না পারছি, ততক্ষণ আমি অন্ধবিশ্বাসে সে সকল মানবো কি ক'রে ? আপনি আমায় বুঝিয়ে দিন, আমার জ্ঞানচক্ষু খুলে দিন। তখন আমি সব মানবো।"

শ্রীরামকৃষ্ণের মুখে ফুটিয়া উঠে প্রসন্নতার হাসি। সস্নেহে বলেন, "একদিন তুই সব জানবি, আর সব মানবি। এই গ্যাখ্, নরেন আগে কিছুই মানতো না। কিন্তু এখন 'রাধে রাধে' বলে নাচে আর কীর্তনে নৃত্য করে। এর পর তুইও সব মানবি।"

"আমায় আপনি সব জানিয়ে দিন, তবে তো।"

"সময়ে তুই সব বুঝতে পারবি। একটা কথা মনে রাখিস্—কখনো একঘেয়ে হস্‌নি। আমি একঘেয়ে ভাব ভালোবাসিনে।"

উত্তরকালে আপ্তকাম সাধক স্বামী অভেদানন্দ লিখিয়াছেন, "ইহার কিছুদিন পরে শ্রীশ্রীঠাকুর আমার জ্ঞানচক্ষু খুলিয়া দিলেন। তখন আমি সাধন রহস্যের সকল কথাই জানিতে পারিলাম এবং সকল জিনিস তখন মানিতে লাগিলাম। আর শ্রীশ্রীঠাকুরের অশেষ কৃপার কথা ভাবিলে আজিও আমার দুই চক্ষু জলে ভরিয়া উঠে।"

কাশীপুরে কালীপ্রসাদ সেদিন শ্রীরামকৃষ্ণের পদসেবা করিতেছেন, ঠাকুর বলিলেন, "ওরে, তোর বাবা কাল এসেছিলেন, তোর মা তোর জন্য কেঁদে সারা হচ্ছেন। তাঁর ইচ্ছে, তুই যেন বাড়িতে গিয়ে তাদের সঙ্গে দেখা ক'রে আসিস্। আমি কথা দিয়েছি। তুই তোর মায়ের কাছে একবার যা।"

ঠাকুরের আজ্ঞা শিরোধার্য করিয়া কালীপ্রসাদ আহিরীটোলার বাড়িতে গিয়া উপস্থিত হন। কিন্তু সেখানে প্রায় আধঘণ্টা সময় কাটানোর পরই মন উচাটন হইয়া উঠিল। কাশীপুরে রোগশয্যায় শায়িত শ্রীরামকৃষ্ণের জন্য ছটফট করিতে লাগিলেন, তারপর পিতা মাতার কাছে বিদায় নিয়া তাড়াতাড়ি চলিয়া আসিলেন।

ঠাকুরের সহিত দেখা হইতেই কহিলেন, "কিরে তুই বাড়িতে যাস নি ?"

কালীপ্রসাদ উত্তর দিলেন, "আজ্ঞে গিয়েছিলাম।"

"মা বাবা নিশ্চয় থাকতে বলেছিলেন। তবে থাকলিনে কেন ?"

"ছিলুম তো।"

"কতক্ষণ ছিলি ?"

"আধ ঘণ্টা মাত্র"

"এত তাড়াতাড়ি ফিরে এলি কেন ?"

"মা বাবা খুব যত্ন করলেন, থাকবার জন্য পীড়াপীড়ি করলেন, কিন্তু আমার বোধ হল, আমি যেন অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে রয়েছি। প্রাণ ছটফট করতে লাগল। একটু মিষ্টি মুখে দিয়েই দৌড়ে পালিয়ে এসেছি। এখানে এসে প্রাণে শান্তি পেলাম।"

শ্রীরামকৃষ্ণ খুশী হইয়া উঠিলেন, স্নেহপূর্ণ স্বরে কহিলেন, "এখানে শান্তি পাবি বৈ কি।"

ঠাকুরের স্নেহ মমতার পিছনে ছিল, আত্মিক শান্তি ও আত্মিক আনন্দের স্পর্শ, এই স্পর্শ কালীপ্রসাদ প্রভৃতি তরুণ সাধকদের রূপান্তরিত করিয়াছিল নূতন মানুষে। তাই সংসার জীবন ও পিতা মাতার স্নেহ মমতা তাহাদের কাছে সে সময়ে তুচ্ছ ও অকিঞ্চিৎকর মনে হইত।

পৌষ সংক্রান্তি প্রায় আসন্ন। গঙ্গাসাগরের মেলায় যাওয়ার জন্য কলিকাতার জগন্নাথ ঘাটে সাধু সন্ন্যাসীরা ভিড় করিতেছে। বুড়ো গোপালের ইচ্ছা, সন্ন্যাসীদের একখানি করিয়া গৈরিক বস্ত্র ও রুদ্রাক্ষ-মালা দান করিবেন। শ্রীরামকৃষ্ণের কানে একথা গেল।

বুড়ো গোপালকে ডাকিয়া কহিলেন, "গঙ্গাসাগর যাত্রী সন্ন্যাসীদের গেরুয়া কাপড় দিলে যে ফল পাবি, তার হাজার গুণ বেশী ফল হবে যদি তুই আমার এই ছেলেদের দিস্। এদের মতো ত্যাগী সাধু আর কোথায় পাবি? এদের এক একজন হাজার সাধুর সমান। হাজারী সাধু। বুঝলি?"

বুড়ো গোপালের মত তখনি পরিবর্তিত হইয়া গেল। ঠাকুরের ত্যাগী ভক্তদেরই তিনি ঐ বস্ত্র ও মালা দান করিলেন।

"নরেন্দ্র, কালীপ্রসাদ প্রভৃতি অনেকেই পরমহংসদেবের আদেশে এক একখানি গৈরিক বস্ত্র ও রুদ্রাক্ষের মালা পরিধান করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিতে গমন করিলেন। তাঁহাদিগকে নবীন সন্ন্যাসীর বেশে দর্শন করিয়া পরমহংসদেব আনন্দ সাগরে ভাসিতে লাগিলেন। তাঁহারা একে একে প্রণাম করিতে লাগিলেন এবং পরমহংসদেব তাঁহাদিগকে 'ইষ্ট লাভ হোক' বলিয়া আশীর্বাদ করিতে লাগিলেন। তিনি একটি ক্ষুদ্র শিশিতে রক্ষিত কারণবারি সকলকে আঘ্রাণ করাইয়া এবং সিঞ্চন করিয়া তাঁহাদিগকে সন্ন্যাস আশ্রমের অধিকারী করিলেন। একখানি বস্ত্র অতিরিক্ত ছিল, তাহা গিরিশচন্দ্র ঘোষের জন্য রাখিয়া দেওয়া হইল[১]।"

দশনামী সম্প্রদায়ের চিরাচরিত সন্ন্যাস অথবা তান্ত্রিক বা বৈষ্ণবীয় সন্ন্যাস দানের প্রথা হইতে ঠাকুর রামকৃষ্ণের আচরিত এই প্রথাটি স্বতন্ত্র রকমের। তবুও নরেন, রাখাল, কালীপ্রসাদ প্রভৃতি এগার জন ত্যাগী ভক্ত এখন হইতে ঠাকুরের প্রদত্ত এই সন্ন্যাসকেই মনে প্রাণে গ্রহণ করিলেন, এবং সাদা কাপড় ত্যাগ করিয়া পরিতে শুরু করিলেন গৈরিক কাপড়।

কাশীপুর বাগানে রোগশয্যায় শায়িত শ্রীরামকৃষ্ণের সেবকের সংখ্যা যেমন দিন দিন বাড়িতেছে, তেমনি অজস্র গৃহস্থ ভক্তও আসিতেছেন তাঁহাকে দর্শনের জন্য। অনেকে এখানেই খাওয়া-দাওয়া করিতেছেন। ফলে ব্যয় যথেষ্ট বাড়িয়া গিয়াছে।

---

১ স্বামী অভেদানন্দের জীবন কথা: শঙ্করানন্দ

প্রবীণ গৃহস্থ ভক্তদের মধ্যে কেউ কেউ ব্যয় সংকোচের জন্য অতিমাত্রায় উৎসাহী। তাঁহারা প্রস্তাব দেন, ঠাকুরের সেবার জন্য দুইজন ভক্ত বাগানে স্থায়ীভাবে থাকুক। আর সবাই যার যার বাড়ি হইতে এখানে আসা যাওয়া করুক।

একথা শুনিয়া ঠাকুর বিরক্ত হইলেন। নরেন্দ্র, কালীপ্রসাদ প্রভৃতিকে ডাকিয়া কহিলেন, "আমার আর এখানে থাকার ইচ্ছে নেই। এত খরচ চলবে কে ক'রে? ভাবছি, ইন্দ্রনারায়ণ জমিদারকে টানবো নাকি? না, তোরা বড় বাজারের সেই ভক্ত মাড়োয়ারীটাকে ডেকে আন্।"

অতঃপর ঐ মাড়োয়ারী ভক্তটি কিন্তু কিছুদিন পরে প্রচুর অর্থ ভেট নিয়া নিজে হইতেই ঠাকুরের কাছে আসিয়া উপস্থিত হন। তিনি টাকার মোড়কের দিকে কিছুক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া বলেন, "নাঃ, তোমার কাঞ্চন আমি গ্রহণ করবো না।"

ভক্তেরা শ্রীরামকৃষ্ণের সুস্পষ্ট নির্দেশের প্রতীক্ষায় তাঁহার দিকে তাকাইয়া আছেন। তিনি কহিলেন, "তোরা আমায় অন্য কোথাও নিয়ে চল। আমার জন্য তোরা ভিক্ষে করতে পারবি? তোরা যেখানে আমায় নিয়ে যাবি, সেখানেই যাবো। আচ্ছা, তোরা কেমন ভিক্ষে করতে পারিস্, দেখা দেখি। ভিক্ষার অন্ন শুদ্ধ অন্ন। গৃহস্থের অন্ন খাবার ইচ্ছে আমার নেই।"

ভক্তেরা সমস্বরে জানান, "আপনার জন্য নিশ্চয় আমরা ভিক্ষেয় বেরুবো।"

পরদিন প্রভাতে মা-সারদামণির নিকট হইতে ছেলেরা প্রথম মুষ্টি ভিক্ষা গ্রহণ করেন। তারপর ভিক্ষার জন্য বাহির হন পথে-পথে গৃহস্থ বাড়িতে। কেউ দু'মুষ্টি দেয়, কেউবা শ্লেষোক্তি করে, তাড়া করিয়া আসে। কোনো কোনো মহিলা তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলেন, হোৎকা জোয়ান সব মিন্‌সেরা, গতর খেটে খেতে পারে না, ভিক্ষের দোরে দোরে ঘুরে বেড়ায়। দূর হয়ে যা এখান থেকে।"

ত্যাগ তিতিক্ষার পথে বাহির হইবার পর নবীন ভক্তদের এ এক

কঠোর বাস্তব অভিজ্ঞতা। সংগৃহীত ভিক্ষাদ্রব্য ঠাকুরের চরণতলে রাখিয়া একে একে তাঁহারা প্রণাম নিবেদন করেন।

সারদামণি সেদিন ঐ ভিক্ষান্ন হইতেই ঠাকুরের জন্য প্রস্তুত করেন চালের মণ্ড। খাইতে খাইতে ঠাকুর বলেন, "ভিক্ষান্ন বড় পবিত্র। এতে কারুর কোনো কামনা নেই। আজ ভিক্ষান্ন খেয়ে আমি পরম আনন্দ লাভ করলাম।"

নিজের মরদেহ ত্যাগের পূর্বে, ত্যাগী তরুণ ভক্তদের সন্ন্যাস-বেশ ধারণের পর, ঠাকুর রামকৃষ্ণ ভিক্ষা গ্রহণের কর্তব্যটিও তাঁহাদের শিখাইয়া দিয়া গেলেন।

তরুণ সাধকেরা প্রায়ই বুদ্ধদেবের জীবনী ও আদর্শ সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন। একবার নরেন্দ্র, তারক এবং কালীপ্রসাদ ঠাকুরকে কিছু না জানাইয়া বুদ্ধ গয়ায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। উদ্দেশ্য, বুদ্ধের পুণ্যময় সাধনস্থলীতে বসিয়া কিছুটা তপস্যা করা। এইস্থানে ধ্যানাসনে বসিয়া নরেন্দ্রনাথের জ্যোতি দর্শন হয় এবং তারক ও কালীপ্রসাদের অন্তরে দিব্য আনন্দ ও শান্তির প্রবাহ সঞ্চারিত হয়।

অতঃপর উৎসাহী তরুণ তাপসদের মনে অনুতাপ জন্মে, অসুস্থ ঠাকুরকে ওভাবে ফেলিয়া আসা তাঁহাদের উচিত হয় নাই। আর কালবিলম্ব না করিয়া তাঁহারা কাশীপুরে ফিরিয়া আসিলেন। এ কয়দিন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাদের জন্য উদ্বিগ্ন ছিলেন, তাঁহাদের প্রত্যাবর্তনের পরে তীর্থস্থানের তপস্যা, মাধুকরী প্রভৃতির কাহিনী শুনিয়া তিনি খুশী হইয়া উঠিলেন।

সেদিন বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন। কথা প্রসঙ্গে কহিলেন, কিছুদিন আগে গয়ার বরাবর পাহাড়ে এক প্রসিদ্ধ হঠযোগীকে তিনি দর্শন করিয়া আসিয়াছেন। গোস্বামীজী তাঁহার সুখ্যাতি করিতে লাগিলেন।

কালীপ্রসাদ মনে মনে সংকল্প করিলেন, এই হঠযোগীকে একবার দর্শন করিবেন এবং সম্ভব হইলে তাঁহার নিকট হইতে কিছু কিছু সাধন প্রক্রিয়া শিখিয়া নিবেন।

একদিন কাহাকেও কিছু না জানাইয়া গোপনে রওনা দিলেন, ট্রেনযোগে উপস্থিত হইলেন গয়াধামে। বরাবর পাহাড়ের নিচেই রহিয়াছে একটি ছোট গ্রাম, এই গ্রামের ধর্মশালাতে নিলেন সে রাত্রির মতো আশ্রয়।

একজন দশনামী পুরী সন্ন্যাসী তখন এই ধর্মশালায় অবস্থান করিতেছেন। কালীপ্রসাদ তাঁহার সহিত ভাব জমাইয়া ফেলিলেন। কথা প্রসঙ্গে জানা গেল, সন্ন্যাসীর নিকট সন্ন্যাস-পদ্ধতি এবং বিরজাহোমের তথ্য সমন্বিত একটি ছোট পুঁথি আছে। কালীপ্রসাদ তো এসংবাদে মহা উল্লসিত। তখনি তাড়াতাড়ি সেটি হইতে বিরজাহোমের প্রেষমন্ত্র, মঠ, মড়ি, যোগপট্ট ইত্যাদি সন্ন্যাস মন্ত্র লিখিয়া লইলেন।

পরের দিন রওনা হইলেন পাহাড়ের চড়াইয়ের পথে, হঠযোগীর গুহার দিকে। গ্রামের লোকেরা আগে হইতেই কালীপ্রসাদকে সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন, হঠযোগীর গুহায় যাওয়া তেমন নিরাপদ নয়। কাহাকেও সেদিকে অগ্রসর হইতে দেখিলে তাঁহার চেলারা বড় বড় পাথর ছুঁড়িতে থাকে, কেহ তাঁহাদের সাধনা বা ক্রিয়াকলাপে বিঘ্ন জন্মায় ইহা তাহাদের অভিপ্রেত নয়।

গুহার নিকট পৌছিলে কালীপ্রসাদের উপরও প্রস্তর-খণ্ড বর্ষিত হইতে থাকে। তিনি তখন এক চাতুরীর আশ্রয় নেন। দূর হইতে হঠযোগী ও তাঁহার চেলাদের প্রণাম জানাইয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠেন, 'ওঁ নমো নারায়ণায়'

এবার সাধুরা শান্ত হয়, প্রস্তর বর্ষণ স্থগিত রাখে। তাহাদের ধারণা হয়, কালীপ্রসাদ একজন সন্ন্যাসী তাহা দ্বারা কোনো অনিষ্ট হওয়ার আশঙ্কা নাই। কিন্তু নিকটে যাওয়া মাত্র কালীপ্রসাদকে মঠাম্নায়, সন্ন্যাস মন্ত্র ইত্যাদি সম্পর্কে বার বার জেরা করিতে থাকে।

কালীপ্রসাদ সদ্য সদ্য এসব তথ্য জানিয়া আসিয়াছেন, তাই তাঁহার উত্তরে হঠযোগীর চেলারা শান্ত হইল।

আলাপ আলোচনার পর কালীপ্রসাদ বুঝিলেন, আসলে এই সাধুটি হঠযোগী নয়, অঘোরপন্থী। অধ্যাত্ম-সাধন সম্পর্কেও তাঁহার কোনো সুস্পষ্ট ধারণা নাই। স্থির করিলেন, আর কাল-ক্ষেপণ না করিয়া এখান হইতে সরিয়া পড়িবেন।

কিন্তু এই হঠযোগীর খপ্পর হইতে পলায়ন করা বড় সহজ নয়। হঠযোগী ইতিমধ্যে কালীপ্রসাদের প্রতি অত্যন্ত আকৃষ্ট হইয়াছেন। স্থির করিয়াছেন, তাঁহাকে চেলার দলে ভর্তি করিয়া নিবেন। প্রস্তাব জানাইয়া স্পষ্ট ভাষায় তিনি বলিয়াই ফেলিলেন, 'তুমহারা মাফিক চেলা বহুত ভাগ্‌সে মিলতা হ্যায়।'

কালীপ্রসাদ পলায়নের সুযোগ খুঁজিতেছিলেন, হঠাৎ এক ফাঁকে হঠযোগীর গুহা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া দিলেন এক দৌড়। হাঁফাইতে হাঁফাইতে নামিয়া আসিলেন বরাবর পাহাড়ে নিচে।

কাশীপুরে ফিরিয়া আসিলে শ্রীরামকৃষ্ণ কহিলেন, "এতদিন কোথায় গিয়েছিলি তুই, বলতো?"

কালীপ্রসাদ ঠাকুরের তাঁহার হঠযোগী সন্দর্শনের সব ঘটনা বিবৃত করিলেন। তারপর কহিলেন, "হঠযোগীকে আমার ভালো লাগল না। আপনার তুলনায় সে কিছুই নয়। তাই তো আপনার চরণতলে আবার ছুটে এলাম।"

ঠাকুর প্রশান্ত স্বরে কহিলেন, "যত বড় সাধু বা সিদ্ধযোগী যে যেখানে আছে, আমি সব জানি। চারখুঁট ঘুরে পায়, কিন্তু এখানে (নিজের বুকে হাত দিয়া) যা দেখছিস্, এমনটি আর কোথাও পাবি নি।" বলিতে বলিতে শায়িত অবস্থায় নিজের চরণটি কালীপ্রসাদের বুকে স্থাপন করিলেন, কালীপ্রসাদ নিমজ্জিত হইলেন অপার আনন্দ সাগরে।

ইতিমধ্যে একদিন কালীপ্রসাদের পিতা শ্রীরামকৃষ্ণের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হন। অনুরোধ জানান, "আপনি কালীপ্রসাদকে

এত ভালোবাসেন, আপনি তাঁর সত্যকার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, তাকে বুঝিয়ে শুনিয়ে বাড়িতে পাঠিয়ে দিন। ঘরের ছেলে ভালোয় ভালোয় ঘরে ফিরে যাক্।

ঠাকুর এবার স্পষ্ট ভাষায় জানাইয়া দিলেন তাঁহাকে, কহিলেন, "তোমার ছেলেকে আমি খেয়ে ফেলেছি। সে এখন আর তোমার নয়। এখান থেকে আর সে ফিরবে না।"

গুরুর কৃপার স্পর্শে, বৈরাগ্যময় সাধনার মধ্য দিয়া কালীপ্রসাদ নূতন মানুষে রূপান্তরিত হইয়াছেন—এ সত্যটি তাঁহার পিতাকে ঠাকুর সেদিন বুঝাইয়া দিলেন দ্ব্যর্থহীন ভাষায়।

আর একদিন সেবারত কালীপ্রসাদকে কহিলেন, "তোদের সঙ্গে আত্মায় আত্মায় সম্বন্ধ—এটা পূর্ব জন্মের জানবি। তোরা যেন বাঁদর, আর আমি বাঁদরওয়ালা। বাঁদর যখন দুষ্টুমি করে, বাঁদরওয়ালা দড়িটা একটু টেনে ধরে, তখন বাঁদর ঠিক হয়ে যায়।"

১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই আগস্ট। কালীপ্রসাদ এবং তাঁহার গুরু-ভাইদের শোকসাগরে ভাসাইয়া ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ নরলীলা সংবরণ করিলেন। ঘর-সংসার ত্যাগ করিয়া তরুণ ভক্তেরা একান্তভাবে ঠাকুরেরই পদপ্রান্তে আশ্রয় নিয়াছিলেন, সে আশ্রয়টি সেদিন অন্তর্হিত হইয়া গেল।

কিছুদিন পরে মা সারদামণি অযোধ্যা, বৃন্দাবন প্রভৃতি স্থানে তীর্থ দর্শন করিতে যান। এ সময়ে কালীপ্রসাদও তাঁহার সঙ্গী হন।

বৃন্দাবনে উপনীত হইবার পর তাঁহার অন্তরে ইচ্ছা জাগে, ব্রজমণ্ডল পরিক্রমায় বহির্গত হইবেন। সুযোগ পাইয়া বৈষ্ণব বাবাজীদের একটি দলের সঙ্গে তিনি জুটিয়া যান, পরমানন্দে শুরু করেন পরিক্রমা।

পথে যেখানে বিশ্রামের ছাউনি পড়ে, কালীপ্রসাদ 'নারায়ণ হরি' বলিয়া ব্রজমায়ীদের দরজায় গিয়া মাধুকরী করেন, দুই এক টুকরা মড়ুয়ার রুটি যাহা মিলে তাহা দিয়াই কোনোমতে করেন জীবন

ধারণ। এ সময়ে তিনি গৈরিক পরিতেন তাই বাবাজীরা তাঁহাকে সোঽহংবাদী সন্ন্যাসী জ্ঞানে যথাসম্ভব পরিহার করিয়াই চলিতেন। ভাবিতেন, কৃষ্ণের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা নাই। শীঘ্রই একদিন তাঁহাদের ভুল ভাঙিয়া গেল। ভাগবতের গোপীগীতা কালীপ্রসাদের মুখস্থ ছিল। একদিন কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর হইয়া আপন মনে উহার শ্লোক তিনি আবৃত্তি করিতেছিলেন, বাবাজীরা মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইলেন। উৎফুল্ল কণ্ঠে কহিলেন, "আপনি যে কৃষ্ণের পরম ভক্ত, এতদিন আমরা তা বুঝতে পারি নি—আপনাকে দূরে সরিয়ে রেখেছিলাম। এখন দেখছি, আপনি আমাদের অতি আপনার জন। আর আপনাকে আমরা মাধুকরী করতে দেবো না। আপনার সেবার ব্যবস্থা আমরাই করবো।"

পরিক্রমার কালে কৃষ্ণলীলাস্থলগুলি দর্শন করিয়া কালীপ্রসাদের প্রাণ মন আনন্দে পূর্ণ হইয়া উঠিল।

বৃন্দাবনে ফিরিয়া শুনিলেন, বরানগরে রামকৃষ্ণ সন্তানেরা একটি ক্ষুদ্র মঠবাড়ি স্থাপন করিয়াছেন। এ অতিশয় সুসংবাদ। মা-সারদামণির সম্মতি নিয়া কালীপ্রসাদ অচিরে বরানগরের মঠে চলিয়া আসিলেন।

মুন্সীবাবুদের একটি ভুতুড়ে পড়ো বাগানবাড়ি ভাড়া নেওয়া হইয়াছে মঠের জন্য। ভাড়া এগার টাকা, ভক্ত সুরেশ মিত্র ভাড়া চালানোর ভার নিয়াছেন। চরম কৃচ্ছ্রের মধ্যে তিনজন ত্যাগী ভক্ত,—তারক—ছুটকো গোপাল ও বুড়ো গোপাল রামকৃষ্ণের স্মৃতি বুকে ধারণ করিয়া এখানে বাস করিতেছেন। কালীপ্রসাদ হইলেন মঠের চতুর্থ স্থায়ী বাসিন্দা।

এই সময় নরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বশক্তি অসম্ভবকেও সম্ভব করিয়া তোলে। শ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শকে কেন্দ্র করিয়া ত্যাগী ভক্তদের একটি মঠ ও মণ্ডলী স্থাপনে তিনি বদ্ধপরিকর হন। নিজেও সিদ্ধান্ত নেন সংসার ত্যাগ করিয়া স্থায়ীভাবে মঠে যোগ দিবার।

নরেন্দ্র এবং কালীপ্রসাদের যুগ্ম প্রচেষ্টায় মঠ স্থাপনার প্রকৃত ভিত্তিভূমি রচিত হয় এই সময়ে। স্বামী শঙ্করানন্দ এ সময়কার অবস্থার এক চিত্র দিয়াছেন, "শ্রীশ্রীঠাকুরের বিছানার সম্মুখে বসিয়াই সকলে ধ্যান জপ করিতেন। ভিক্ষা করিয়া যখন যাহা জুটিত তাহাই পালা ক্রমে রন্ধন করিয়া সকলে আহার করিতেন। আহারের খুবই কষ্ট ছিল। চাল জুটিত তো নুন জুটিত না—এমন অভাব। কোনো দিন বা শুধু ভাত, কোনো দিন বা তেলাকুচা পাতা-সিদ্ধ ও ভাত আহার করিয়া সকলকে থাকিতে হইত। কালীপ্রসাদ আসিবার সঙ্গে সঙ্গেই আবার নূতন উত্তেজনার সৃষ্টি হইল। নরেন্দ্রনাথ, শরৎ, শশী, রাখাল সকলেই বাড়িতে ফিরিয়া গিয়াছিলেন এবং নিজ নিজ পড়াশুনায় মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। কালীপ্রসাদ আসিয়াই নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করিলেন। তাঁহারা দুইজনে মিলিয়া ভাবী কর্মপদ্ধতির কথা আলোচনা করিতে লাগিলেন। ছেলেদিগকে একত্র রাখিতে হইবে—শ্রীশ্রীঠাকুরের এই আদেশ পালন করিতে না পারিলে নরেন্দ্রনাথ মনে অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছিলেন। এক্ষণে কালীপ্রসাদকে সহায় রূপে প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার উৎসাহ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। দুইজনে মিলিয়া তাঁহারা বালক ভক্তগণের বাড়ি গমন করিতে লাগিলেন এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের আদেশ ও তীব্র বৈরাগ্যোদ্দীপক বাক্য দ্বারা তাঁহাদিগকে সংসার ত্যাগ করিতে প্ররোচিত করিতে লাগিলেন।

"শেষে বালকভক্তগণের মনে এমন আতঙ্কের সৃজন হইল যে, নরেন্দ্রনাথ ও কালীপ্রসাদকে দেখিতে পাইলে তাঁহারা অনেকেই দ্বার বন্ধ করিয়া সরিয়া পড়িবার চেষ্টা করিতেন। নরেন্দ্রনাথও ছিলেন নাছোড়বান্দা। তিনি দরজাতে লাথি ও কিল দিয়া এমনই অবস্থার সৃষ্টি করিতেন যে, তাঁহারা কিংকর্তব্যবিমূঢ় ও ভীত হইয়া দ্বার খুলিয়া দিতে বাধ্য হইতেন। বালকগণের অভিভাবকেরা ইহা ভালো চক্ষে দেখিতেন না। সুতরাং তাহাদের অনুপস্থিতিতেই এই কার্য সকল করিতে হইত। তৎকালে অভিভাবকগণ নরেন্দ্রনাথ ও

কালীপ্রসাদের এই প্রকার আচরণের সংবাদে অত্যন্ত সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। একদিন তাহারা দুইজন ও হুট্‌কো গোপাল, শরৎ ও শশীর বাড়িতে উপস্থিত হইয়া দরজায় ধাক্কা দিতে লাগিলেন। শরৎ দরজা খুলিবেন না, আর নরেনও ছাড়িবেন না। অবশেষে নরেন্দ্রনাথ দরজায় আরও জোরে করাঘাত করিয়া শরৎকে দরজা খুলিতে বাধ্য করিলেন। ঘরে প্রবেশ করিয়াই নরেন্দ্রনাথ অবিরত তীব্র বৈরাগ্য ও ভগবদ্ লাভের প্রসঙ্গ তুলিয়া এক অপূর্ব আধ্যাত্মিক আবেষ্টনীর সৃষ্টি করিলেন। শরৎ ও শশী তাঁহার সেই আবেগময়ী বাক্যস্রোতে সত্যই ভাসিয়া গেলেন। অবশেষে নরেন্দ্রনাথ যখন বলিলেন: 'চল্ বরানগর মঠে যাই', তখন আর তাঁহারা আপত্তি করিতে পারিলেন না। শরৎ ও শশী গায়ে চাদর ফেলিয়া তখনই তাহাদের সহিত বরাহনগরে রওনা হইলেন।"

বরানগর মঠে নবীন সাধকদের ত্যাগ বৈরাগ্য ও কৃচ্ছ্রসাধন চরমে উঠিয়াছিল। কিন্তু নরেন্দ্রনাথের প্রেরণা ও নেতৃত্বের এমনই প্রভাব ছিল যে, এই কঠোর জীবনের দুঃখ কষ্টকে কেহ গায়ে মাখিতেন না। এ সময়কার স্মৃতিচারণ করিতে গিয়া উত্তরকালে স্বামী অভেদানন্দ বলিয়াছেন: "মহা সমাধির পূর্বে একদিন রাত্রে শ্রীশ্রীঠাকুর নরেন্দ্রনাথকে কাছে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন: 'তুই ছেলেদের একত্রে রাখিস্ ও তাদের ছাখাশোনা করিস্।' আমরা শ্রীশ্রীঠাকুরের সেই নির্দেশ স্মরণ করাইয়া নরেন্দ্রনাথকেই সকলের প্রধান করিয়া তাহার নির্দেশ অনুসারে চলিতাম এবং মঠে নিয়মিত-ভাবে ধ্যান-ধারণা, পূজা-পাঠ, কীর্তনাদি করিয়া দিন অতিবাহিত করিতাম। প্রকৃতপক্ষে নরেন্দ্রনাথই ছিল আমাদের সকল সময়ের আশা-ভরসা ও সুখ-সান্ত্বনার স্থল। তখন সকলের জীবন অতিশয় দুঃখ-কষ্ট ও দারিদ্র্যের মধ্য দিয়া অতিবাহিত হইলেও একমাত্র শ্রীশ্রীঠাকুরকে জীবনে সহায়সম্বল করিয়া মনের আনন্দেই দিন-যাপন করিতাম। অবশ্য খাওয়াপরার তখন অত্যন্ত কষ্ট ছিল।

"তারকদাদা, আমি, লাটু, গোপালদাদা প্রভৃতি সকলে ভিক্ষায়

বাহির হইয়া সামান্যভাবে যে চাল প্রভৃতি পাইতাম তাহাই সকলে পালা করিয়া রান্না করিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতাম। কোনো কোনো দিন শাক্-সব্জী কোনোরূপ না পাইয়া তেলাকুচার পাতা আনিয়া সিদ্ধ করিতাম ও তাহা দিয়া ভাত খাইতাম। অবশ্য আহার আমাদের একবেলাই জুটিত। সকলের পরনে কাপড় ছিল না। একখানি কাপড় ছিঁড়িয়া কৌপীন করিয়া আমরা তাহাই পরিতাম এবং আর একখানি মাত্র কাপড় আমরা রাখিয়া দিতাম, কেহ কোথাও গেলে সেইখানি পরিয়াই বাহির হইত। সেই সব দুঃখ কষ্টের দিনের কথা আর কি বলিব! তবে এখন সেই সব দিনের কথা মনে হইলে মন আনন্দে ভরিয়া ওঠে!”

এই সময়ে তরুণ রামকৃষ্ণ তনয়দের মধ্যে কৃচ্ছ্র, ধ্যান ও শাস্ত্র-পাঠের উৎসাহ চরমে উঠে। কালীপ্রসাদের একটি ক্ষুদ্র নিজস্ব ঘর ছিল, সেখানে দিনের পর দিন তিনি তপস্যা ও স্বধ্যায়ে মগ্ন থাকিতেন, দেহের দিকে দৃষ্টি দিবার অবসর ছিল না। তাঁহার ঐ ঘরটিকে গুরু ভাইরা বলিতেন, কালীতপস্বীর ঘর।

একদিন মঠের বারান্দায় শুইয়া কালীপ্রসাদ ধ্যান করিতেছিলেন, ক্রমে বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া ফেলিলেন। মধ্যাহ্নের সূর্যকরে বারান্দার ধূলিরাশি উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে, উহারই উপর তিনি শুইয়া আছেন। এসময়ে স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যম ভ্রাতা মহেন্দ্রনাথ দত্ত মঠে বেড়াইতে আসিয়াছেন। কালীপ্রসাদকে অসাড় অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া তাঁহার কাছে গেলেন। হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিয়া দেখিলেন, রৌদ্রে দেহটি তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে, জীবনের কোনো লক্ষণ নাই। মহেন্দ্রনাথ চমকিয়া উঠিলেন, ভাবিলেন, অত্যধিক কঠোর তপস্যা করিতে গিয়া কালীপ্রসাদের মৃত্যু ঘটিয়াছে।

মঠের অভ্যন্তরে গিয়া বিষণ্ন স্বরে একথা জানানোর সঙ্গে সঙ্গে যোগানন্দ হাসিতে হাসিতে বলিলেন, “ও কি মরে? ও শালা অমনি ক’রেই ধ্যান করে।” কালীপ্রসাদের ধ্যাননিষ্ঠা সম্পর্কে সে সময়ে সকল গুরুভাইই উচ্চ ধারণা পোষণ করিতেন।

মঠের গুরু-ভাইদের মধ্যে এসময়ে যে অচ্ছেদ্য বন্ধুত্ব ও অন্তরঙ্গতা গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহার তুলনা সত্যই বিরল। একদিন নরেন ও কালীপ্রসাদ কোনো কাজ উপলক্ষে কলিকাতায় গিয়াছেন। গৃহী ভক্তদের বাড়িতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া আলাপ আলোচনাদি করিলেন, কিন্তু কোথাও কেহ আহারাদি করার কথা বলিলেন না। ক্রমে বেশ রাত্রি হইয়া আসিল। নরেন্দ্র ও কালীপ্রসাদ এবার নরেন্দ্রের পৈত্রিক বাড়িতে উপস্থিত হইলেন। বাড়িতে তখন চরম আর্থিক দুর্গতি চলিতেছে, জ্ঞাতিদের সহিত মোকদ্দমায় তাঁহারা সর্বস্বান্ত হইয়াছেন, দু-মুঠো অন্নেরও সংস্থান নাই। অবস্থাটি উভয়েরই জানা ছিল, তাই বাড়িতেও আহারের কথা তাঁহারা বলিলেন না।

সারাদিন একেবারে অনাহারে গিয়াছে, রাত্রিতে খাবার মিলিবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু সব চাইতে বড় বিপদ পৌষের প্রচণ্ড শীত। নরেন বা কালীপ্রসাদ কাহারও একটুকরা গাত্রবস্ত্র নাই।

এ অবস্থায় কি করা যায়? কোঁচার কাপড় কোনোমতে গায়ে জড়াইয়া দুইজনে পিঠাপিঠি করিয়া শুইয়া রহিলেন। তামাক খাওয়া, বেদান্তের আলোচনা সবই চলিতে লাগিল, কিন্তু শীত কিছুতেই যাইতেছে না। অনাহারে শরীরও অবসন্ন।

কালীপ্রসাদ কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন, "ভাই নরেন, শীতের দাপটে যে আর ঘুমুতে পারছিনে।"

নরেন উত্তর দিলেন, "দূর শালা, ভেবে কি হবে, আরও একটু ঠাসাঠাসি ক'রে শো।"

অতঃপর কালীপ্রসাদের খুব কষ্ট হইতেছে বুঝিয়া নরেন উঠিয়া বসিলেন। কহিলেন, "থাম্ শালা, উঠে ব'স, দেখি তো তোর জন্য চায়ের যোগাড় করতে পারি কিনা। খুঁজিয়া পাতিয়া কিছু চা চিনি ও কেটলী সংগ্রহ করা গেল।

চা তৈরি হইলে নরেন কহিলেন, "কিরে শালা, জেগে আছিস্?"

কালীপ্রসাদ তখনো শীতে কাঁপিতেছেন, "কহিলেন এ অবস্থায়

জেগে থাকবো না তো কি? ঘুম আর হল কোথায়। শীতে যে আমার গা কালিয়ে যাচ্ছে।"

"লে শালা, চা খা, একটু গরম হয়ে নে।" বলিয়া নরেন চায়ের বাটিটি কালীপ্রসাদের হাতে দিলেন।

কিছুক্ষণ পরেই রাত্রি প্রভাত হইল, উভয়ে তাড়াতাড়ি চলিয়া গেলেন বরানগরের দিকে।

সুখে দুঃখে, আপদে বিপদে তরুণ রামকৃষ্ণ-তনয়েরা এমনিভাবে দিনের পর দিন একত্রে দিন কাটাইয়াছেন, নিজেদের মধ্যে গড়িয়া তুলিয়াছেন এক অচ্ছেদ্য আত্মিক বন্ধন।

মঠে তরুণ সাধকেরা শাস্ত্রপাঠ, জপধ্যান ও কীর্তনে মাতিয়া রহিয়াছেন। এ সময়ে হঠাৎ একদিন নরেন্দ্রনাথ বলেন, "আমি ভাবছি, সবাই মিলে এবার আমরা শাস্ত্রমতে সন্ন্যাস নিই। তোমাদের কি মত?"

কালীপ্রসাদ মন্তব্য করেন, "শাস্ত্রমতে সন্ন্যাস নিলে আমাদের বিরজা হোম করতে হবে। বিরজা হোমের মন্ত্র কিন্তু আমার কাছে রয়েছে।"

নরেন্দ্রনাথ কৌতূহলী হইয়া প্রশ্ন করেন, "তাই নাকি? তুমি ঐ মন্ত্র কি ক'রে পেলে?"

কালীপ্রসাদ জানাইলেন, "বরাবর পাহাড়ে সে-বার হঠযোগীর সন্ধানে গিয়েছিলাম, জান তো? তখন পাহাড়ের নিচেকার ধর্মশালায় এক সন্ন্যাসীর খাতা থেকে এগুলো টুকে রেখেছিলাম।"

নরেন্দ্রনাথ তো মহা আনন্দিত। বলেন, "তাহলে, এসব ঠাকুরেরই কৃপা। কেমন শুভ যোগাযোগ ছাখো। এসো, আমরা বিরজাহোম সম্পন্ন ক'রে শাস্ত্রীয় মতে পুরোপরি সন্ন্যাসী হই।" সকলে সোৎসাহে একথা সমর্থন করিলেন।

কালীপ্রসাদ এই অনুষ্ঠানের বিবরণ দিতে গিয়া লিখিয়াছেন, "একদিন প্রাতঃকালে সকলে গঙ্গায় স্নান করিয়া বরাহনগরে

মঠে ঠাকুরঘরে শ্রীশ্রীঠাকুরের পবিত্র পাতুকার সম্মুখে উপবেশন করিলাম। শশী বিধিমতো শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজা সমাপ্ত করিল। হোমের জন্য কিছু বিল্বকাষ্ঠ, বারোটি বিল্বদণ্ড ও গব্যঘৃত সংগ্রহ করা হইয়াছিল, অগ্নি প্রজ্বলিত করা হইল। নরেন্দ্রনাথের আদেশে আমি তন্ত্রধারকরূপে, আমার খাতা হইতে সন্ন্যাসের প্রেষমন্ত্র পাঠ করিতে লাগিলাম। প্রথমে নরেন্দ্রনাথ ও পরে রাখাল, নিরঞ্জন, শরৎ, শশী, সারদা, প্রভৃতি সকলে আমার পাঠের সঙ্গে সঙ্গে প্রেষমন্ত্র পড়িতে পড়িতে প্রজ্বলিত অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিল। পরে আমি নিজেই প্রেষমন্ত্র পড়িয়া অগ্নিতে আহুতি দিলাম। অবশ্য সন্ন্যাসদীক্ষা আমরা পূর্বেই শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকটে পাইয়াছিলাম। পূর্বে গোপালদাদা কর্তৃক গঙ্গাসাগর মেলায় আগত সাধুদের উদ্দেশ্যে দান করার জন্য বারোখানি গৈরিক বস্ত্র ও রুদ্রাক্ষের মালা আমরা শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট হইতে পাইয়াছিলাম, তবে শাস্ত্রমতে সন্ন্যাসানুষ্ঠান আমাদের বরাহনগরের মঠে হইয়াছিল।"

সন্ন্যাস গ্রহণের পর নরেন্দ্র নাম গ্রহণ করিলেন বিবিদিষানন্দ,[১] রাখাল—ব্রহ্মানন্দ আর কালীপ্রসাদ—অভেদানন্দ। অপর সকলেও নরেন্দ্রনাথের পরামর্শ মতো নাম গ্রহণ করিলেন।

কিছুদিন পরে মা সারদামণির আশীর্বাদ নিয়া স্বামী অভেদানন্দ তীর্থ ভ্রমণের জন্য বহির্গত হন। প্রথমে উত্তরাখণ্ডের হরিদ্বার, হৃষিকেশ, বদরী, কেদার প্রভৃতি এসময়ে তিনি পরিভ্রমণ করেন।

পরিব্রাজক অভেদানন্দ এসময়ে সংকল্প গ্রহণ করেন, টাকা-পয়সা তিনি স্পর্শ করিবেন না, রন্ধন করিবেন না, জামা পরিধান করিবেন না এবং কাহারও গৃহে শয়ন করিবেন না। তাছাড়া,

১ পরবর্তীকালে নরেন্দ্রনাথ এই বিবিদিষানন্দ নাম পরিবর্তন করিয়া বিবেকানন্দ নাম গ্রহণ করেন। তাঁহার শিষ্য ক্ষেত্রীর রাজা অজিত সিং-এর পরামর্শমতো এই নাম নিয়া তিনি আমেরিকা যান। দ্রঃ স্বামী বিবেকানন্দ : এ ফরগটন্ চ্যাপ্‌টার অব হিজ লাইফ—বি, এস, শর্মা

মাধুকরী করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিবেন, আর রাত্রিকালে আশ্রয় নিবেন কোনো বৃক্ষতলে।

এই পরিব্রাজনের সময় বহু বিপদে ও সংকটে তিনি পড়িয়াছেন, কিন্তু প্রতিবারই উদ্ধার পাইয়াছেন সদ্‌গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপা বলে। নির্জন অরণ্যে, পথে প্রান্তরে, নিভৃত ধ্যানগুহায় সর্বত্র অলক্ষ্যে থাকিয়া সদ্‌গুরুই জুটাইয়া দিয়াছেন আহার এবং আশ্রয়, প্রতিপদে তাঁহাকে রক্ষা করিয়া চলিয়াছেন।

এই পরিব্রাজনের সময়ে দীর্ঘদিন তিনি হৃষিকেশে অবস্থান করেন। ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বেদান্তী ধনরাজ গিরির আশ্রম ছিল এই স্থানে। অভেদানন্দ তাঁহার নিকট থাকিয়া বেদান্ত অধ্যয়ন করেন এবং জ্ঞানমার্গের উচ্চতম তত্ত্বসমূহে পারঙ্গম হইয়া উঠেন।

ইহার কিছুকাল পরে স্বামী বিবেকানন্দের সহিত হৃষিকেশে ধনরাজ গিরির সাক্ষাৎ ঘটে। স্বামীজী অভেদানন্দ সম্পর্কে প্রশ্ন করিলে গিরি মহারাজ মন্তব্য করেন, "অভেদানন্দ? উসকো তো অলৌকিকী প্রজ্ঞা থে।"

অতঃপর পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতের তীর্থ সম্পর্কে পরিব্রাজন করিয়া অভেদানন্দ কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিলেন। মঠ তখন আলম বাজারে স্থানান্তরিত হইয়াছে। সেখানে পৌঁছিয়া তিনি খুশী হইয়া উঠিলেন। পূর্বেকার মতো আর্থিক দুরবস্থা আর নাই। এখন কিছুটা সচ্ছলতার মুখ দেখিতেছেন তরুণ তাপসেরা। গৃহস্থ ভক্তেরা নানারকমের ভেট পাঠাইতেছেন, ঠাকুরের পূজা ও ভোগরাগের এ সময়ে আর কোনো অসুবিধা নাই।

১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে পাওয়া গেল এক অপ্রত্যাশিত সংবাদ। চিকাগো ধর্ম-মহাসভায় স্বামী বিবেকানন্দ হিন্দুধর্মের প্রতিনিধিরূপে এক ঐতিহাসিক ভাষণ দিয়াছেন, সারা আমেরিকায় তুলিয়াছেন বিপুল আলোড়ন।

কিছুদিনের মধ্যে মঠে স্বামী বিবেকানন্দের এক পত্র আসিল। তিনি লিখিয়াছেন, তাঁহার বিরুদ্ধে অভিসন্ধিমূলক প্রচার চলিয়াছে

এবং বলা হইতেছে, তিনি হিন্দুধর্মের কোনো প্রতিনিধি নহেন এবং আসলে একটি ভ্যাগাবণ্ড মাত্র। তাই অবিলম্বে কলিকাতায় একটি সর্বজনীন সভা আহ্বান করা প্রয়োজন। এই সভার প্রস্তাবে বলিতে হইবে যে স্বামী বিবেকানন্দ হিন্দুধর্মের প্রতিনিধি এবং তাঁহার প্রচার-কর্মে ভারতের জনগণের বিপুল সমর্থন রহিয়াছে।

অভেদানন্দ সারদানন্দ প্রভৃতি গুরুভাইরা এই কার্য সাধনে তৎপর হইয়া উঠিলেন। কলিকাতায় এক বিরাট সভা অনুষ্ঠিত হইল এবং গৃহীত প্রস্তাব প্রেরিত হইল আমেরিকায়।

কলিকাতার এই সময়কার কর্মতৎপরতা সম্পর্কে বিবেকানন্দের ভ্রাতা মহেন্দ্র দত্ত মহাশয় লিখিয়াছেন, "কালী বেদান্তী এই সময়ে প্রাণপণে খাটিয়াছিলেন। উন্মাদের মতো দিবারাত্র কাজ করিয়া টাউনহলের সভা করিয়াছিলেন। তাঁহার পরিচিত ব্যক্তিদিগের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া সভার কার্যপ্রণালী মুদ্রিত করা এবং এই রিপোর্টগুলি নানা প্রেসে পাঠানো প্রভৃতি সমস্ত কার্য তিনি সাধনার মতো করিয়াছিলেন।"

১৮৯৬ সালে স্বামী অভেদানন্দের জীবনে সংযোজিত হয় এক নূতন অধ্যায়। 'কালীবেদান্তীর' অভ্যুদয় দেখা দেয় আধুনিক যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বেদান্ত-প্রচারক সন্ন্যাসীরূপে প্রথমে ইংল্যাণ্ডে পরে আমেরিকায় গিয়া তিনি অদ্বৈত বেদান্ত ও শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবধারা প্রচার করেন। বিশেষত আমেরিকায় প্রায় পঁচিশ বৎসর কাল অবস্থান করিয়া বিবেকানন্দের প্রচারিত ভাবধারাকে বিস্তারিত করেন এবং গড়িয়া তোলেন একটি দৃঢ়সম্বদ্ধ সংগঠন।

বিবেকানন্দ সে-বার আমেরিকা হইতে লণ্ডনে আসিয়াছেন। সেখানকার বেদান্তের প্রচারে প্রয়োজন এক সুযোগ্য গুরুভ্রাতার। এজন্য আহ্বান করিয়া নিলেন স্বামী অভেদানন্দকে।

প্রায় মাসখানেক যাবৎ অভেদানন্দ লণ্ডন শহরে আসিয়াছেন, সেখানকার রীতিনীতি ধীরে ধীরে আয়ত্ত করিয়া নিতেছেন। এ

সময়ে বিবেকানন্দ নানা স্থানে বক্তৃতা দিয়া বেড়াইতেছিলেন। সেদিন হঠাৎ তিনি অভেদানন্দকে ডাকিয়া কহিলেন, "এখানকার ক্রাইস্ট থিয়োসফিক্যাল সোসাইটিতে তোমায় বক্তৃতা দিতে হবে। বক্তা হিসাবে তোমার নাম ওরা ছাপিয়ে দিয়েছে।"

অভেদানন্দ তো আকাশ হইতে পড়িলেন। উদ্বিগ্ন স্বরে কহিলেন, "সে কি কথা। আমি কি ক'রে বক্তৃতা দেব? আমি তো বক্তৃতা করতে জানি নে।"

"ও কথা শুনবো না, বক্তৃতা তোমায় দিতেই হবে।"

"আমার সে ক্ষমতা একেবারেই নেই, আমি কিছুতেই করতে পারবো না।"

"তবে এখানে এলে কেন?" উত্তেজিত স্বরে বলেন বিবেকানন্দ।

"তুমি ডেকেছিলে তাই। বলতো আবার ফিরে যাচ্ছি। বক্তৃতা দিতে হবে এ কথা জানালে কখনই আমি আসতুম না।"

এবার বিবেকানন্দ দৃঢ়স্বরে বলেন, "তা হবে না। এখানেই তোমায় থাকতে হবে, আর বক্তৃতা দেওয়া শিখতেও হবে।"

"আমি পারব না।"

"তুমি কি তা'হলে আমায় অপদস্থ করতে চাও?"

"কেন অপদস্থ হবে?"

"এ সভায় বক্তৃতা দিতে আমাকেই নিমন্ত্রণ করেছিল। আমি বলেছি এবার আমি বক্তৃতা করবো না, আমার এক গুরুভ্রাতা এখানে এসেছেন, তিনি মহাপণ্ডিত, তিনিই বক্তৃতা করবেন। তাঁরা শুনে খুব খুশী হলেন এবং নোটিশ ছাপাতে দিলেন।"

"তুমি আমায় আগে কিছু না জানিয়ে ও রকম নিমন্ত্রণ নিলে কেন?"

"নিয়ে ফেলেছি এখন আর কি হবে?"

এতক্ষণে অভেদানন্দ কিছুটা নরম হইলেন। কহিলেন, "তবে বক্তৃতা কি ক'রে আরম্ভ ও শেষ করতে হয় আমায় বলে দাও।"

"আমাকে কে কবে বলে দিয়েছিল? তোমার অন্তর যে ভাবে,

যে রসে, পূর্ণ হয়ে রয়েছে, তাই দাঁড়িয়ে উঠে ঢেলে দেবে। তুমি তো কালী-বেদান্তী, এতদিন বেদান্তের কত আলোচনা করলে, সেই সম্বন্ধে বলবে। এই তো পঞ্চদশী একখানি বেদান্ত গ্রন্থ—এতে যা শিক্ষা দেয় তা ইংরেজীতে লেখ। লিখে কয়েকবার তা পড়ে ফেল। পরে সভায় দাঁড়িয়ে তাই বলবে।"

"ইংরেজীতে লেখা যে আমার অভ্যাস নেই।"

"চেষ্টা কর, ট্রাই ট্রাই ট্রাই এগেন। প্র্যাকটিস্ কর। প্র্যাকটিস্ মেক্স্ এ ম্যান পারফেক্ট।"

অভেদানন্দ মহা সমস্যায় পড়িলেন। নিজের অক্ষমতার কথা ভাবিতে গেলেই হতাশ হইয়া পড়েন। সত্যিই তো, নোটিশ দেওয়া হইয়া গিয়াছে, এখন বক্তৃতা না করিলে স্বামী বিবেকানন্দকে যে এখানকার সমাজে অপদস্থ হইতে হইবে। ইহা তো অভেদানন্দ প্রাণ থাকিতে ঘটিতে দিতে পারেন না।

অগত্যা সাহসে বুক বাঁধিয়া বক্তৃতা দিবার জন্য তিনি প্রস্তুত হইলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীমাকে ভক্তিভরে স্মরণ করিয়া 'পঞ্চদশী' অবলম্বন করিয়া লিখিয়া ফেলিলেন এক দীর্ঘ প্রবন্ধ। তারপর বার বার সেটি পাঠ করিয়া আয়ত্ত করিয়া নিলেন।

ইষ্ট স্মরণ করিয়া অভেদানন্দ বক্তৃতামঞ্চে দণ্ডায়মান হইলেন। কোনো জনসভাতেই ইতিপূর্বে কখনো ভাষণ দেন নাই, তাছাড়া এ সভা যে ইংল্যাণ্ডের মতো প্রাগ্রসর দেশের এমন একটি সভা যেখানে শিক্ষিত ও সংস্কৃতিবান্ শ্রোতারা সমবেত হইয়াছেন। আর সম্মুখে বসিয়া আছেন স্বামী বিবেকানন্দ। তাই মনে কিছুটা আতঙ্ক ও দৌর্বল্যের সঞ্চার হইল। কিন্তু ধৈর্য সহকারে নিজেকে শক্ত ও দৃঢ় করিয়া নিলেন, শ্রোতারা তাঁহার দৌর্বল্য বা চাঞ্চল্যের কথা জানিতে পারিলেন না। ক্রমে আত্মস্থ হইয়া বিশুদ্ধ ইংরেজী ভাষায় অনর্গলভাবে বেদান্তের উচ্চতম তত্ত্বগুলি তিনি চমৎকার ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। দেবী সরস্বতী সেদিন যেন তাঁহার কণ্ঠে

। মা সারদামণি এক সময়ে অভেদানন্দকে আশীর্বাদ

করিয়াছিলেন, 'বাবা, সরস্বতী তোমার কণ্ঠে অধিষ্ঠাত্রী হোন্', সে কথা এবার সর্বসমক্ষে ফলিয়া গেল।

লণ্ডনে দুই গুরুভ্রাতা যে অন্তরঙ্গ পরিবেশে বাস করিতেন, শঙ্করানন্দজী তাঁহার কিছুটা বর্ণনা দিয়াছেন, "নূতন বাড়িতে স্বামীজী, গুড্উইন এবং অভেদানন্দ বাস করিতে লাগিলেন। গুড্উইন স্বামীজীর বক্তৃতা সাঙ্কেতিক লিপিদ্বারা লিখিয়া লইতেন ও বাজার করিতেন। অভেদানন্দ বাড়ির কাজকর্ম ও রন্ধনাদি করিতেন। বাড়িতে দাসদাসী ছিল না। স্বামীজীও মাঝে মাঝে রাঁধিতেন এবং ইংরেজ বন্ধুগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া খিচুড়ী, নিরামিষ ডালনা প্রভৃতি ভারতীয় খাদ্য আহার করাইতেন। গুড্উইন রান্না করিবার চেষ্টা করিতেন কিন্তু কিছুই করিতে পারিতেন না।

"স্বামীজী যেদিন সন্ধ্যার পর সুদীর্ঘ বক্তৃতা দিতেন সেদিন তাঁহার সুনিদ্রা হইত না। মস্তকে রক্ত উঠিয়া মস্তিষ্ক গরম হইয়া যাইত। অভেদানন্দ রাত্রি জাগিয়া তাঁহার মাথায় হাত বুলাইয়া দেওয়া প্রভৃতি সেবাকার্য করিতেন। স্বামীজীর আহার সম্বন্ধে কোনো নিয়ম ছিল না। কোনো দিন খুব পেট ভরিয়া মৎস্যাদি আহার করিতেন, আবার কোনো দিন ফলাহার, কোনো দিন উপবাস বা অর্ধ উপবাস করিয়া থাকিতেন। এইরূপ অনিয়মের জন্য তিনি প্রায়ই পেটের অসুখে ভুগিতেন। অভেদানন্দ তাঁহাকে আহার সুনিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য বার বার অনুরোধ করিতেন।"

লণ্ডনের বেদান্ত সমিতির সভাপতিরূপে স্বামী অভেদানন্দ প্রায় বৎসরখানেক কৃতিত্বের সহিত কাজ করেন। তারপর স্বামী বিবেকানন্দের আহ্বানে তিনি আমেরিকায় গিয়া উপস্থিত হন।

বেদান্ত আন্দোলনের মধ্য দিয়া স্বামী বিবেকানন্দ তখন সারা আমেরিকাতে এক বিরাট চাঞ্চল্য সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সেখানকার শিক্ষিত সমাজে ভারতের ধর্ম ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে জাগিয়া উঠিয়াছিল বিস্ময়কর শ্রদ্ধা। স্বামী বিবেকানন্দের ঐ আন্দোলন সীমাবদ্ধ ছিল

একটি ক্ষুদ্র উদারপন্থী দলের মধ্যে। পরে স্বামী অভেদানন্দ ঐ আন্দোলনকে স্থায়িত্ব দেন, এবং আরো বিস্তারিত করিয়া তোলেন।

প্রায় পঁচিশ বৎসর তিনি আমেরিকায় বসবাস করেন এবং নিজের প্রতিভা কর্মকুশলতার গুণে সে দেশের শ্রেষ্ঠ মনীষী ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিদের শ্রদ্ধা অর্জন করিতে সমর্থ হন।

সেদেশে গোড়ার দিকে অভেদানন্দকে দারিদ্র্য ও প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে তীব্র সংগ্রাম করিতে হয়। নিজের স্মৃতিচারণে তিনি লিখিয়াছেন[১], "স্বামী বিবেকানন্দ বেদান্ত প্রচারের যতটুকু সূত্রপাত করেছিলেন আমেরিকায়, তা সফল ক'রে তুলতে আমি উপায় খুঁজতে লাগলাম। কাজ চালাবার জন্য আমার কাছে তখন টাকা পয়সা কিছুই ছিল না বা কোনোরকম দানও ছিল না। কাজেই নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে আমাকে একাই ঘরভাড়া ও হোটেলের খরচ-পত্র, লেকচার হলের ভাড়া, নিজের পকেট খরচা, বিভিন্ন সাপ্তাহিক ও অন্যান্য খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়ার টাকা-পয়সা সবই সংগ্রহ করতে হয়েছিল। ক্লাস ও সাধারণ বক্তৃতার পর শ্রোতারা স্বেচ্ছায় যে যা দিত তা' ছাড়া টাকা-পয়সা পাবার আর কোনো উপায় ছিল না। কিন্তু আমার যা খরচ, তার তুলনায় আয় খুব সামান্য ছিল। কাজেই নিজের সকল কিছু সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জন দিয়ে সে সময়ে ছাত্রদের কাছেই আতিথ্য গ্রহণ ক'রে আমায় অনেকদিন খরচ সংকুলান করতে হয়েছে। এটা ছিল একরকম ভারতের সন্ন্যাসীদেরই ভিক্ষাবৃত্তির মতো।"

ক্রমে এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটে, স্বামী অভেদানন্দের মনীষা, প্রতিভাদীপ্ত ভাষণ, বাগ্মিতা এবং পুত চরিত্রে আকৃষ্ট হইতে থাকেন আমেরিকার একদল বুদ্ধিজীবী ও মুমুক্ষু নরনারী। সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় ছিল তাঁহার ধর্মতত্ত্ব ব্যাখ্যানের কৌশল। আবেগ ও ভাবময়তা অপেক্ষা যুক্তিতর্কের সাহায্যই তিনি বেশী পরিমাণে নিতেন। বেদান্তের পরম তত্ত্বের সঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞান ও পাশ্চাত্য

১ লীভস্ অব্ মাই ডায়েরী: অভেদানন্দ (অনুবাদ: প্রজ্ঞানানন্দ)

জীবনধারার কোনো বিরোধ নাই, এ কথাটি সর্বদাই তিনি জোর দিয়া বলিতেন।

'হিন্দুইজ্‌ম ইন্‌ভেডস আমেরিকা'র লেখক মিঃ ওয়েলডন টমাস অভেদানন্দের জনপ্রিয়তা প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন,[১] "স্বামী অভেদানন্দের মধ্যে আপন ক'রে নেবার শক্তি বিশেষভাবে আমাদের নজরে পড়েছে। মার্কিন দেশের প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে তাঁর বাণী এবং জীবনধারাকে তিনি মিশিয়ে নিয়েছিলেন।·· ঐতিহাসিক ঘটনাসমূহ এবং কর্মপরিধির দিকে দৃষ্টিপাত করলে আমরা দেখি—স্বামী অভেদানন্দ তাঁর বিশ্ববরেণ্য নেতার চেয়ে প্রাচ্যের বেদান্ততত্ত্বকে পাশ্চাত্যের সংস্কৃতির সঙ্গে বরং অধিকতররূপে খাপ খাওয়াতে পেরেছিলেন। জ্বলন্ত ও অনর্গল ভাষা-নিঃসারী বাগ্মিতা দিয়ে অভিভূত না ক'রে, সত্যকার যুক্তিতর্ক এবং নূতন নূতন আকর্ষণীয় তথ্যের সাহায্যে শ্রোতার মন জয় করার দিকে তিনি বেশী নজর দিয়েছিলেন।"

যীশুখ্রীষ্ট ও খ্রীষ্টান ধর্মসম্পর্কে অভেদানন্দ তাঁহার বক্তৃতায় যে নূতন মূল্যায়ন করেন তাহা আমেরিকার মনীষীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অধ্যাপক কর্সন এ প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, "আপনার বক্তৃতা যীশুখ্রীষ্ট সম্বন্ধে আমার ধারণার জগতে একটা যুগান্তর এনে দিয়েছে। ...যীশুখ্রীষ্ট সম্বন্ধে এমনি এক চূড়ান্ত মীমাংসা আপনি করেছেন যাতে গোঁড়ামী ভাবাপন্ন খ্রীষ্টান মতকেও পরিশেষে আপনার সিদ্ধান্তের কাছে মাথা নোয়াতে হয়েছে।

অদ্বৈততত্ত্ব নিয়া অভেদানন্দের সঙ্গে আমেরিকার প্রসিদ্ধ দার্শনিক অধ্যাপক উইলিয়াম জেমস-এর দীর্ঘ বিতর্ক হয়। অধ্যাপক জেমস অবশেষে বলেন, স্বামীজীর দৃষ্টিকোণ ও যুক্তিতর্কের দিক হইতে বিচার করিলে অদ্বৈত তত্ত্ব অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাঁহার নিজের দিক হইতে ইহা গ্রহণ করা সম্ভব নয়। এই বিতর্কের সময় রয়েস, লানমান, শেলার, লুই জেমস প্রভৃতি প্রখ্যাত

১ মন ও মানুষ: স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ; ২ ঐ-ঐ।

অধ্যাপকেরা উপস্থিত ছিলেন, সবাই স্বামী অভেদানন্দের মনীষা ও পাণ্ডিত্য দেখিয়া মুগ্ধ হন।

১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে স্বামী বিবেকানন্দ দ্বিতীয় বারের প্রচারকর্মে আমেরিকায় উপস্থিত হন। স্বামী অভেদানন্দ ইতিমধ্যে বেশ কিছুটা জাঁকাইয়া বসিয়াছেন, নিউইয়র্কেও বেদান্ত সমিতি তিনি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তাঁহার সাফল্য দেখিয়া বিবেকানন্দ সোল্লাসে কহিলেন, "নিউইয়র্কের দ্বারে আমি তিন তিনবার আঘাত করেছিলাম, কোনো সাড়া পাই নি। আমার খুব আনন্দ হয়েছে, দেখছি তুমি একটি স্থায়ী কেন্দ্র স্থাপন করেছো, নিউইয়র্কে এই প্রথম আমাদের সমিতির নিজস্ব গৃহ হল।"

আমেরিকায় স্বামী অভেদানন্দের পঁচিশ বৎসরের প্রচারের ফল হয় সুদূরপ্রসারী। এ সম্পর্কে নিজের এক ভাষণে তিনি বলিয়াছেন :

"আমার বেদান্ত প্রচারের ফলে আমেরিকায় অনেক খ্রীষ্টান ধর্ম-যাজকের চোখ খুলিয়া গিয়াছে এবং গীর্জায় উপাসনার সময় তাঁহারা বেদান্তের ভাব গ্রহণ করিয়া ঈশাহী ধর্মের মূলতত্ত্বগুলি নূতনভাবে ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। সত্যান্বেষী ও চিন্তাশীল লোক আর ঈশাহী ধর্মের গোঁড়ামীপূর্ণ ক্রিয়াকাণ্ডে বিশ্বাস করেন না। এখন আমেরিকাতে নূতন নূতন ধর্ম আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে। 'নিউ থট্', খ্রীষ্টান সায়েন্স', 'স্পিরিচুয়্যালিস্ট সোসাইটী' প্রভৃতি নব ধর্মমত প্রচারিত হইতেছে। আর এই সকলগুলিই হইতেছে মুখ্য গৌণভাবে আমাদের পঁচিশ বৎসর বেদান্ত প্রচারের ফল। খ্রীষ্টান সায়েন্স-এর প্রতিষ্ঠাত্রী মেরী বেকার এডি গীতার কয়েকটি শ্লোকের উপর তাঁহার সম্প্রদায়ের বনিয়াদ খাড়া করিয়াছেন। 'নিউ থট্' সম্প্রদায়ের সকলেই স্বামী বিবেকানন্দের ছাত্র এবং তাঁহারা বলেন যে, ঈশ্বর সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত হইয়া আছেন, তিনিই সব হইয়াছেন এবং তাঁহার আর দ্বিতীয় নাই। যীশুখ্রীষ্ট বলিয়া কোনো ব্যক্তিকে তাঁহারা বিশ্বাস করেন না, তবে তাঁহারা 'খ্রীষ্টত্ব' নামক আধ্যাত্মিক আদর্শকে স্বীকার করেন। আর 'খ্রীষ্টত্ব' সর্বব্যাপী; ইহা আমাদের

অন্তরেই বিরাজমান। সত্য কথা বলিতে কি তাঁহারা মনে করেন—প্রত্যেক জীবাত্মাই স্বরূপতঃ 'খ্রীষ্ট'। এই উদার মতবাদ গোঁড়ামী-পূর্ণ খ্রীষ্টধর্মের গোড়ায় কুঠারাঘাত করিয়াছে। কারণ গোঁড়া খ্রীষ্টানগণ যীশুখ্রীষ্ট নামক এক ব্যক্তিতে বিশ্বাসী এবং মনে করেন যে, খ্রীষ্ট তাঁহার রক্ত দিয়া পাপী-তাপীদের পাপতাপ দূর করিয়াছেন। চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ এই প্রকারের পাপ হইতে মুক্তি বিশ্বাস করেন না। শিক্ষিত ব্যক্তিগণ বিশেষত যাহারা বিজ্ঞান ও দর্শন আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারা আর 'অনন্ত নরকে'র মতবাদে আস্থা স্থাপন করেন না। এই সমস্ত ভ্রান্ত ধারণা এখন প্রায় লোপ পাইতে বসিয়াছে।

"পৃথিবী ছয় হাজার বৎসর পূর্বে সৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া আর তাহারা বিশ্বাস করেন না। আর ইহাও বিশ্বাস করেন না যে, যীশুখ্রীষ্টের রক্তই সমস্ত পাপ দূর করিবে। তবে তাঁহারা 'খ্রীষ্ট' শব্দের আধ্যাত্মিক অর্থ গ্রহণ করেন। ইহাকে তাহারা 'খ্রীষ্ট' বলেন এবং তাঁহারা আরও বলেন যে, এই 'খ্রীষ্টত্ব' প্রত্যেক জীবাত্মাতে সুপ্ত অবস্থায় আছে এবং তাহা জাগরিত হইবে। ইহা সুপ্ত অবস্থায় আছে এবং তাহা জাগরিত হইলে প্রত্যেকেই এক একজন 'খ্রীষ্ট' হইবে। তাঁহারা খ্রীষ্টত্বের এই প্রকারেই ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। পঁচিশ বৎসর পূর্বের খ্রীষ্টধর্ম ও আমেরিকার বর্তমান খ্রীষ্টধর্ম এক নহে। বর্তমানে বেদান্তে প্রচারিত এক অনন্ত ও সত্য সত্তার উপরেই খ্রীষ্ট-ধর্মকে দাঁড় করানোর চেষ্টা হইতেছে। বেদের 'একমেবাদ্বিতীয়ম্', 'একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি' প্রভৃতি বাণী আজ খ্রীষ্টান সায়েন্স, নিউ থট্ ও স্পিরিচুয়েলিজম্ গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা যে নূতন ভাব প্রবাহ সৃষ্টি করিয়াছি তাহা দ্বারা তাঁহারা খুবই অনুপ্রাণিত হইয়াছেন।

"ইউরোপেও ধীরে ধীরে এবং নিশ্চিতরূপে তাঁহার ধাক্কা লাগিয়াছে। তাই ইংলণ্ডেও আজ অসংখ্য 'খ্রীষ্টান সায়েন্স'-এর চার্চ এবং বহু 'নিউ থট্' মন্দির গড়িয়া উঠিয়াছে। স্যার অর্থার কনান

ডয়েল, স্যার অলিভার লজ প্রভৃতি প্রেততত্ত্ববিদ্‌গণ বেদান্তের ভাবেই অনুপ্রাণিত হইয়াছেন। বর্তমানে প্রেততত্ত্ব অনুশীলন করিয়া আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, আত্মা নিত্য ও অবিনশ্বর, মৃত্যুর পরে আমাদের অনন্ত নরকে যাইতে হয় না। স্যার অলিভার লজের কথাই ধরুন। তিনি একজন প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক এবং তিনি তাঁহার 'রেমণ্ড' নামক পুস্তকে স্পষ্টই স্বীকার করিয়াছেন যে, আমরা মৃত আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে কথাবার্তা চালাইতে পারি।

দীর্ঘ গবেষণা, ভাষণ এবং লেখার মধ্য দিয়া মনীষী অভেদানন্দ আমেরিকার শিক্ষিত মহলে ভারতের প্রাচীন গৌরবময় ঐতিহ্যটিও তুলিয়া ধরিয়াছিলেন। ইহার ফলে ভারতের একটি অপরূপ ভাবমূর্তি গড়িয়া উঠে। তিনি বলিয়াছিলেন। "আর্য সভ্যতার অরুণালোকে ভারতের দিকচক্রবাল উদ্ভাসিত হয়েছিল প্রথমে। গ্রীসে রোমে আরবে বা পারস্যে নয়; ভারতবর্ষই সকল কিছু অধ্যাত্মশাস্ত্র, দর্শন ন্যায়, জ্যোতিষ, বিজ্ঞান, কলাবিদ্যা, সংগীত, চিকিৎসাশাস্ত্র ও সত্যিকারের নৈতিক ধর্মের আদিভূমি।

"হিন্দুরাই প্রথমে বৈদিক ঋক্‌ছন্দ থেকে সংগীতকলার বিকাশ সাধন করেছিলেন। বিশেষ ক'রে সামবেদ তো গানের জন্যই নির্দিষ্ট ছিল। গ্রীকদের বহুশত বৎসর পূর্বে সপ্তস্বর ও তিনগ্রামের প্রচলন ভারতবাসীরা জানতেন। সম্ভবত গ্রীকরাই ভারতবর্ষের কাছ থেকে ঐ সমস্ত জিনিস শিক্ষা করেছিলেন। তোমাদের একথা জেনে কৌতূহল হবে যে, পাশ্চাত্যের বিখ্যাত সংগীতবিদ্‌ ওয়াগ্‌নারও হিন্দু-সংগীতের কাছে—বিশেষ ক'রে তাঁর 'লিডিং মোটিভ'-এর জন্য ঋণী ছিলেন। ভারতীয় সংগীতের সঙ্গে ওয়াগ্‌নারের সংগীত পদ্ধতির অনেক মিল আছে। এইজন্যই বোধহয় পাশ্চাত্য সংগীতশিক্ষার্থীদের পক্ষে তাঁর সংগীত তত সহজবোধ্য ছিল না। ওয়াগ্‌নার কয়েকটি ভারতীয় সংগীতশাস্ত্রের ল্যাটিন অনুবাদ পড়েছিলেন এবং জার্মান দার্শনিক সোপেন হাওয়ারের সঙ্গে তিনি ঐ সম্বন্ধে আলোচনাও করেছিলেন।"

স্বামী অভেদানন্দ আরও বলিয়াছেন, "পীথাগোরাস যে ভারতবর্ষে এসেছিলেন—এ'কথা বেশীর ভাগ ঐতিহাসিক স্বীকার করেন। পীথাগোরাস হিন্দুদের কাছে থেকে জ্যামিতি ও অঙ্কশাস্ত্র, জন্মান্তর ও পরলোকবাদ, নিরামিষ আহার ও পঞ্চভূতের তত্ত্ব প্রভৃতি শিক্ষা করেছিলেন এবং গ্রীসে ফিরে গিয়ে সেখানকার লোকেদের ভেতর সেগুলি প্রচার করেছিলেন। ইহুদীদের এসেনী সম্প্রদায়ের মধ্যেও এই সব ভাবধারার প্রচলন ছিল। মনে হয় এসেনীরা গ্রীকদের কাছ থেকে পরে ঐ সমস্ত ভাব গ্রহণ করেছিল। ইজিপ্ট ও গ্রীসের লোকেরা চারটি ভূততত্ত্ব (উপাদান বা এলিমেণ্ট) স্বীকার করত, তবে আকাশতত্ত্ব তাঁদের কাছে অজ্ঞাত ছিল। পরে হিন্দুদের কাছ থেকে ঐ দু'টি দেশ আকাশতত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করেছিল।"

আমেরিকায় বিবেকানন্দ ও অভেদানন্দের প্রচারের পূর্বেও বেদান্তের ভাবধারা কোনো কোনো আমেরিকান মনীষীর মাধ্যমে প্রচারিত হইয়াছিল। তবে এ ভাবধারা ছিল অতিশয় ক্ষীণ। এ সম্পর্কে স্বামী অভেদানন্দ বলিয়াছেন: "রাল্‌ফ ওয়াল্‌ডো এমার্সন আমেরিকার একজন জগদ্বিখ্যাত মনীষী। তিনিই সর্বপ্রথমে আমেরিকায় বেদান্ত প্রচার করেন। তাঁর বইয়ের মধ্যে এসব ভাব আছে। এই তো তাঁর 'এস্‌সেঅন্ ইম্‌মর্টালিটি'-র (আত্মার অমরত্ব প্রবন্ধের) ভিতর নচিকেতার গল্প আছে। তাঁর 'ব্রহ্ম' বলে একটি কবিতা আছে। গীতায় যে আছে,—য এনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতম্। উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে— এই ভাব সে কবিতায় রয়েছে—এরই স্বচ্ছন্দ অনুবাদ। তখন চার্লস উইল্‌কিন্স্ সাহেবের গীতার ইংরেজী অনুবাদ ছিল। এই অনুবাদ ওয়ারেন হেস্টিংস-এর সময় হয়। এমার্সন আর কার্লাইল দুজনে বন্ধু ছিলেন। কার্লাইলের সঙ্গে এমার্সনের দেখা হলে তিনি এমার্সনকে গীতা উপহার দিয়ে বলেছিলেন—'এ একখানা আশ্চর্য বই। এতে আমার সব সন্দেহের উত্তর পেয়েছি এবং আমার মনে

হয়, আমার ন্যায় আপনিও গীতার উপদেশ থেকে যথেষ্ট প্রেরণা পাবেন।' এমার্সন এই গীতা পড়েই 'ব্রহ্ম' সম্বন্ধে তাঁর ঐ কবিতা লিখেছিলেন।

"এমার্সন ক্লাবের প্রেসিডেণ্ট মিঃ ম্যালয় আমায় ওই 'ব্রহ্ম' কবিতাটির মানে জিজ্ঞাসা ক'রে বললেন, এসব এমার্সন কোথা থেকে পেয়েছিলেন? আমি তাঁকে গীতার ওই কথা বললুম।

"আমি এমার্সনের লাইব্রেরী দেখেছি। সেখানে গীতা, মনু-সংহিতা, বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতির ইংরেজী অনুবাদ আছে[১]।"

আমেরিকায় কৃশ্চিয়ান সায়েন্স নামক তত্ত্ববাদের প্রভাব যথেষ্ট। স্বামী অভেদানন্দ বলিতেন, আমেরিকায় কৃশ্চিয়ান সায়েন্সের খুব প্রভাব। এই তত্ত্ব যে ভারতীয় দর্শন ও ধর্মবিজ্ঞানের কাছে ঋণী তা এই মতাবলম্বীরা স্বীকার করিতে চান না।

এই মতবাদ প্রবর্তন করিয়াছিলেন মিসেস এডি। তাঁহার রচিত 'সায়েন্স অ্যাণ্ড হেল্‌থ' গ্রন্থের অনেকগুলি সংস্করণ আমেরিকায় হইয়াছে। এই গ্রন্থের চতুর্বিংশ সংস্করণ এমন দুষ্প্রাপ্য, ঐ সংস্করণের অষ্টম অধ্যায়ে গীতা হইতে স্পষ্ট উদ্ধৃত বাণী ছিল। কিন্তু বর্তমানে তাহা তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। স্বামী অভেদানন্দ বহু শ্রম স্বীকার করিয়া এই সব তথ্য আমেরিকায় বাস করার কালে উদ্‌ঘাটন করেন এবং চোখে আঙুল দিয়া আমেরিকানদের দেখাইয়া দেন যে তাঁহাদের জনপ্রিয় কৃশ্চিয়ান সায়েন্স মতবাদ ভারতীয় দর্শনের দ্বারা কতটা প্রভাবিত হইয়াছে।

আমেরিকার নানা প্রতিকুল অবস্থায় পড়িয়া এবং ঘাত প্রতি-ঘাতে ক্লান্ত হইয়াও অভেদানন্দ কোনো দিন মানসিক স্থৈর্য হারান নাই। মাঝে মাঝে সহকর্মীদের বলিতেন, শুধু শ্রীশ্রীঠাকুরের দিকে তাকাইয়া আর বিবেকানন্দের অপার স্নেহ প্রীতির কথা স্মরণ করিয়াই এই দীর্ঘ সংগ্রামে তিনি যুঝিতে পারিয়াছেন।

এই সময়ে রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘজননী সারদামণির স্নেহাশিসও তাঁহাকে

১ মহারাজের কথা : স্বামী চিৎস্বরূপানন্দ

যথেষ্ট প্রেরণা যোগাইয়াছে। মা সারদামণির একটি পত্রে তাঁহার কিছুটা পরিচয় মিলে। তিনি লিখিয়াছেন, "কল্যাণীয়েষু, গতকল্য তোমার কুশলসহ এক পত্র পাইয়া আনন্দিত হইলাম। তোমার প্রেরিত পার্শেল পাইয়াছি। তুমি শারীরিক ও মানসিক ভালো আছ জানিয়া বড়ই সন্তোষ লাভ করিলাম। তোমার কার্য ভালোরূপ হইতেছে জানিয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম। তোমরাই শ্রীশ্রীঠাকুরের মুখোজ্জ্বল করিতেছ। শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট সর্বদা প্রার্থনা করি এবং আশীর্বাদ করিতেছি, তোমার কার্য যেন সফল হয়। তিনি তোমার এই মহৎ কার্যে সহায় হইবেন তাহাতে আর সন্দেহ কি? আহারাদি সম্বন্ধে আর তাদৃশ কঠোরতা করিবে না। তুমি সেখানে একদম নিরামিষ আহার না করিয়া উত্তম মৎস্যাদ আহার করিবে। তাহাতে তোমার কোনো দোষ হইবে না। আমি তোমাকে অনুমতি দিতেছি, তুমি স্বচ্ছন্দে উহা খাইবে। সর্বদা শরীরের দিকে নজর রাখিবে। মধ্যে মধ্যে নির্জন স্থানে বাস করিবে। মধ্যে মধ্যে তোমার কুশল লিখিয়া সুখী করিবে। তুমি আমার আশীর্বাদ জানিবে। ইতি। তোমাদের মা"

শ্রীমার উদ্দেশে প্রণতি জানাইয়া অভেদানন্দ তাঁহার ভক্তদের মাঝে মাঝে বলিতেন, "আলমবাজার মঠে থাকতে 'শ্রীমার স্তোত্র' রচনা ক'রে শ্রীমাকেই প্রথম শোনালাম। তিনি শুনে আশীর্বাদ ক'রে বললেন; তোমার মুখে সরস্বতী বসুক'। 'মূকং করোতি বাচালং,' সত্যই আমার মতো মূককে তিনি বাচাল করেছিলেন। নইলে ইংল্যাণ্ড আমেরিকার মতো দেশে, ধুরন্ধর সব পণ্ডিত ও পাদরীদের কাছ থেকে আমার মতো নগণ্য একজন ভারতবাসী কি জয়টীকা নিতে পারে? সবই শ্রীমা ও শ্রীঠাকুরের কৃপা।"

একনিষ্ঠভাবে, সমগ্র মনপ্রাণ দিয়া, সমগ্র সত্তা দিয়া অভেদানন্দ আঁকড়িয়া ধরিয়াছিলেন সদ্‌গুরু শ্রীরামকৃষ্ণকে। কি পরিব্রাজক জীবনে, কি প্রচারক ও আচার্য জীবনে, সর্বত্র সর্বসময়ে তিনি বিশ্বাস

করিতেন, ঠাকুর রামকৃষ্ণ তাঁহাকে রক্ষা করিতেছেন, ঐশ্বরীয় কর্মসাধনায় যোগাইতেছেন দিব্য প্রেরণা।

উত্তরকালে কথা প্রসঙ্গে নিজ ভক্তদের কাছে ঠাকুরের এক করুণালীলার কথা তিনি প্রকাশ করিয়াছেন: "তিনি যে সব সময়েই পিছনে থেকে আমাদের (তাঁর সন্তানদের) সাহায্য ও রক্ষা করতেন ও এখনও সদা সর্বদা করেন তার জলন্ত নিদর্শন আমি ভূরি ভূরি পেয়েছি। তাঁর উপস্থিতি জীবনে অনুভব করেছি বহুবার। তিনি যে অশেষ করুণাময়, আমাদের হাত ধরেই সর্বদা চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন—একথা মর্মে মর্মে আমি বুঝেছি।

"লণ্ডন থেকে সেবারে আমেরিকায় যাব। জাহাজের টিকিট কেনার সব ঠিক। ইংলণ্ডের বন্দর থেকে যে জাহাজ ছাড়বে তার নাম ছিল লুসিটেনিয়া। টিকিট কিনতে গিয়ে (৬ই মে ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে) এক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটল। টিকিট কিনবো এমন সময় শুনতে পেলাম কে যেন টিকিট কাটতে আমায় স্পষ্ট নিষেধ করল। আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম। ভাবলাম মনের ভুল। এদিকে সেদিকে তাকালাম, কাকেও দেখতে পেলাম না। সুতরাং আবার গেলাম টিকিট কিনতে কিন্তু সেবারেও ঠিক সে' রকম। তখন টিকিট কেনা আর হল না। বাসায় ফিরে আসাই ঠিক করলাম। ভাবলাম কালই না হয় যাওয়া যাবে। কিন্তু পরের দিন সকালে খবরের কাগজ খুলে দেখি বড় বড় হরফে লেখা S. S. Lusitania is no more, অর্থাৎ লুসিটেনিয়া আটলান্টিক মহাসাগরের বুকে কাল রাত্রে ডুবে গেছে। আমি অভিভূত হ'য়ে পড়লাম। চোখে জল এল। বুঝলাম শ্রীশ্রীঠাকুরই আমায় রক্ষা করেছেন[১]।"

কুসুমের মতো মৃদু এবং বজ্রের মতো কঠোর ছিলেন অভেদানন্দ। অন্তরঙ্গ ভক্তেরা বলিতেন, তাঁহার অন্তর ছিল শিশুর সরলতায় পূর্ণ। বহিরঙ্গ জীবনের যে কোনো কাজে যে কোনো ব্যক্তি তাঁহাকে ভুল

১ মন ও মানুষ: স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

বুঝাইতে সক্ষম হইত। আবার তাত্ত্বিক বিচারের সময় এই মানুষটির ভিতরেই দেখা যাইত বিস্ময়কর বিশ্লেষণ শক্তি, ক্ষুরধার তত্ত্বোজ্জ্বলা বুদ্ধি এবং সিদ্ধান্ত স্থাপনের দৃঢ়তা।

অভেদানন্দের আমেরিকান শিষ্যা সিস্টার শিবানী (মেরী ল' পেজ) দুই একটি ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন, যাহা তাঁহার এই জীবন-বৈশিষ্ট্যের পরিচয় বহন করে।[১] শিবানী লিখিতেছেন, "আমাদের বর্ষীয়সী বান্ধবী মিসেস কেপ একদিন আমাদের মতো কয়েকটি তরুণ ছাত্রীকে বললেন, "ছাখো, যে কোনো সামান্য ঘটনা সম্পর্কে তোমাদের সন্দেহ উপস্থিত হবে, সে সম্পর্কে স্বামীজীর বক্তব্য অবশ্যই শুনে নিতে চেষ্টা করবে। আমি একটা সামান্য ঘটনার কথা বলছি। সেদিন এখানে ছিল রামকৃষ্ণ উৎসব। বেশী টাকা খরচ ক'রে একটি মনোরম পুষ্পস্তবক আমি কিনে নিয়েছিলাম। স্বামীজী তখন ভজনালয়ের বেদীর কাছে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে রয়েছেন, আমি সোৎসাহে তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে স্তবকটি দেখিয়ে বললাম, 'স্বামীজী, দেখুন কি চমৎকার আমার এই পুষ্পার্ঘ, আপনি কি এটি পছন্দ করছেন না?' মুহূর্তে স্বামীজী তাঁর মুখটি ঘুরিয়ে নিলেন, একটি কথাও আমায় বললেন না, মনোরম পুষ্পগুচ্ছটি সম্পর্কেও করলেন না সামান্যতম মন্তব্য। আমি স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। কখনো তো এমন রূঢ় আচরণ স্বামীজী আমাদের সঙ্গে করেন না। শুধু তাই না, তাঁর মতো এমন ভদ্র ও কোমল আচরণ খুব কম লোকেরই আমরা দেখতে পাই। তবে কেন এমনটি আজ করলেন? আমি অন্তরে তীব্র আঘাত পেলাম, বিভ্রান্ত এবং হতবুদ্ধি হয়ে পড়লাম। সমিতির ভবন ত্যাগ করার আগে স্বামীজীকে এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করলাম আমি, কিন্তু তিনি তা এড়িয়ে একপাশে সরে পড়লেন।

"আমি সব ব্যাপারই বেশ তলিয়ে দেখতে চাই, এটা আমার চিরদিনের অভ্যাস। কয়েক দিন পরে আবার স্বামীজীকে আমি

১ স্বামী অভেদানন্দ ইন্ আমেরিকা (অ্যান্ অ্যাপোসল্ অব্ মনিজম্): সিস্টার শিবানী

চেপে ধরলাম। বললাম, 'সেদিন আপনি নিশ্চয়ই ঐ রূঢ় আচরণের মধ্য দিয়ে আমায় কোনো শিক্ষা দিতে চেয়েছেন। কি সে শিক্ষা তা আমায় খুলে বলুন।' উত্তরে তিনি শুধু বললেন, 'সেদিন ঐ ফুলের গুচ্ছটি কি তুমি আমার জন্য এনেছিলে, না আমার শ্রদ্ধেয় গুরুদেবের জন্য এনেছিলে?'"

মিসেস কেপ তৎক্ষণাৎ এ কথার তাৎপর্য বুঝিয়া নিলেন। যে পুষ্পার্ঘ প্রভু শ্রীরামকৃষ্ণের জন্য আনা হইয়াছে, তাহা দিয়া প্রভুর দাস অভেদানন্দের মন ভুলাইবার চেষ্টা তাঁহার পক্ষে সমীচীন হয় নাই।

সিস্টার শিবানীর কথিত আর একটি ঘটনায় অভেদানন্দের পুরুষ-সিংহ মূর্তিটির পরিচয় পাই। "সেদিন আশ্রমের লাইব্রেরীতে বসে কাজ করছেন আমাদের প্রিয়দর্শিনী সেক্রেটারী এবং অপর একজন ছাত্রী। হাউসকীপার এ সময়ে একটি অপরিচিত ব্যক্তিকে সেই কক্ষে নিয়ে এল। আশ্রম সম্বন্ধে দু'চারটি প্রশ্ন করার পরই লোকটি নেমে এল ব্যক্তিগত স্তরে। উচ্চ স্বরে শুরু করল স্বামীজী সম্পর্কে অপমান পূর্বক মন্তব্য এবং গালিগালাজ। জানতে চাইল, কেন এই সব কৃষ্ণকায় হিন্দুদের সঙ্গে পাশ্চাত্য দেশের ভদ্রমহিলারা সামাজিকভাবে মেলামেশা করছেন?

"লাইব্রেরীতে উপবিষ্ট মহিলাদ্বয় উত্তেজিত স্বরে ঐ লোকটির কথার প্রতিবাদ জানাচ্ছিলেন। এমন সময়ে সিঁড়িতে শোনা গেল ভারী জুতোর পদধ্বনি। মুহূর্ত মধ্যে দেখা গেল, স্বামীজী ঐ অপরিচিত অভদ্র লোকটিকে সবলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন বাইরে। সিঁড়ির ওপারে রাস্তার ধারে পড়ে রয়েছে তাঁর দেহ। প্রয়োজন-বোধে স্বামীজীকে নির্দ্বিধায় এ ধরনের বীর্যবত্তা প্রকাশ করতে দেখেছি। এবং তখন কেউ তাঁর গতিরোধ বা প্রতিবাদ করতে সাহসী হতো না। এই ঘটনার কথা আশ্রম মণ্ডলীতে অচিরে ছড়িয়ে পড়ল। ভক্তেরা সবাই আনন্দিত হল এ ঘটনার কথা শুনে, স্বামীজীর প্রতি আস্থা তাদের বহুগুণ বেড়ে গেল, তাঁর ভাবমূর্তি আরো প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠল। গুরু হিসাবে এবং সামাজিক ব্যক্তি

হিসাবে স্বামী অভেদান্দর জুড়ি নেই, এ উপলব্ধিটি সেদিন এসে গেল অনেকেরই মনে।"

সিস্টার শিবানী বলিয়াছেন, "স্বামী অভেদানন্দের যোগশক্তি, রোগনিরাময়ের শক্তি সম্পর্কে অনেকেরই আস্থা ছিল। কিন্তু স্বামীজী নিজে কখনো এ সম্বন্ধে হাঁ বা না, কিছুই বলিতেন না। আমার কাছে সব চাইতে বিস্ময়কর মনে হয়েছে স্বামীজীর একটি যোগবিভূতির প্রয়োগ। আশ্রমের এক ছাত্রীর তরুণী বোনটির মাথা খারাপ হয়ে যায়। আশ্রমে প্রায়ই সে আনাগোনা করতো, স্বামীজীর সঙ্গেও তার বেশ জানাশুনা ছিল। ঐ রুগ্না মেয়েটিকে উন্মাদ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল এবং ডাক্তারেরা শেষটায় বলে দিলেন, চিকিৎসায় আর কোনো ফল হবে না।

"এবার ঐ পাগল মেয়েটির দিদি, আমাদের আশ্রমের ছাত্রীটি শরণ নিল স্বামী অভেদানন্দের। বলল, 'আপনি মহাত্মা, আপনার যোগশক্তির ওপর আমার অগাধ বিশ্বাস। আমার বোনের উন্মাদ-রোগ ভালো করুন, তাকে বাঁচিয়ে তুলুন।' অভেদানন্দ যতই বলেন, তিনি যোগী নন, যোগবলে রোগ আরোগ্য করার পদ্ধতি তিনি জানেন না, ছাত্রীটি ততই হয় নাছোড়বান্দা, অবশেষে তাকে সেখান থেকে সরাতে না পেরে স্বামীজী বললেন, 'আচ্ছা, তুমি তিন দিন পরে আমার কাছে এসো, তখন আমি তোমার এ প্রার্থনার জবাব দেবো।'

"ছাত্রীটি তাই করল, তিন দিন পরে উপস্থিত হল আশ্রমে। অভেদানন্দ তাঁর সঙ্গে চলে গেলেন সেই উন্মাদাগারে। সেখানে গিয়ে রোগিণীর পাশে প্রশান্ত বদনে তিনি উপবিষ্ট হলেন, স্নেহভরে তার হাতটি ধরে রইলেন, আর মাঝে মাঝে দু একটি টোকা দিতে থাকলেন। কথা কিন্তু তিনি বেশী বললেন না, বেশীর ভাগ সময়ই রইলেন অন্তর্লীন অবস্থায়, কোনো চাঞ্চল্যকর ম্যাজিকের ব্যাপার নেই, হৈ-চৈ নেই। প্রশান্ত ও নির্বিকারভাবে বসে একান্তভাবে শুধু তিনি তাকিয়ে রইলেন খানিকটা সময়।

"এর কয়েকদিন পরেই উন্মাদ মেয়েটি আরোগ্য লাভ করল, শুধু তাই নয়, হাসপাতাল থেকে ডাক্তারেরা সানন্দে তাকে ছেড়ে দিল। তখন সে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসেছে, মনের বল ও আস্থা বিস্ময়কররূপে আবার ফিরে পেয়েছে। কৃতজ্ঞ ছাত্রীটি তার বোনের এই আরোগ্য লাভের পর স্বামীজীর কাছে এসে উপস্থিত হয় তাঁকে কিছু অর্থ ও সোনা গয়না ভেটস্বরূপ দিতে। তার কথা শুনে দৃঢ়স্বরে স্বামী অভেদানন্দ বলে ওঠেন, সত্য কখনো বিক্রি করা যায় না, তা কেনাও যায় না। এক্ষেত্রে আমি কিছুই করি নি। আসলে রোগমুক্তি সম্পর্কে যা কিছু করবার করেছেন আমার পরম কৃপালু গুরুদেব।"

আর একটি কাহিনীও পাওয়া যায় সিস্টার শিবানীর লেখায়। তাঁহার এক নিকট আত্মীয়ের একজন তরুণী বান্ধবী ছিল। এই মেয়েটি কিরূপে অলৌকিকভাবে অভেদানন্দের কৃপাপ্রাপ্ত হয় তাঁহার বর্ণনা দিয়াছেন সিস্টার শিবানী। "মেয়েটি সেদিন তার অফিসে মধ্যাহ্ন ভোজনের সময় অতর্কিতে একটা প্রচণ্ড মানসিক আঘাতে মুষড়ে পড়ে এবং আমার বাসকক্ষে ছুটে চলে আসে। আমি তখন বাহিরে ছিলাম। আমার অবর্তমানে মেয়েটি সেখানে আত্মহত্যার চেষ্টা করে এবং আমাদের হাউসকীপারের সাবধানতার ফলে তার সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। তারপর আমি ঘরে ফিরে আসি এবং সারা বিকেল বেলাটা মেয়েটির ঝঞ্ঝাট আমাদের পোহাতে হয়।

"মেয়েটি স্বামীজীর কথা আমাদের কাছে আগে শুনেছিল। সন্ধ্যেবেলায় নিজেই বললে, স্বামীজীর বক্তৃতা শুনতে সে আশ্রমে যাবে। নির্ধারিত সময়ে আমরা সবাই হলঘরে উপস্থিত হলাম। আশ্চর্যের কথা, বক্তৃতা প্রসঙ্গে স্বামী অভেদানন্দ হঠাৎ বলা শুরু করলেন আত্মহত্যার প্রবণতার কথা। বললেন, এই প্রবণতার ফল মানুষের দেহ আত্মার পক্ষে বিপর্যয়কর। এই প্রবণতায় যারা ভুগছে তাদের নানা রকমের আশা ও আশ্বাসের বাণীও তিনি এসময়ে শোনালেন।

"বক্তৃতা শোনার পর আমাদের ঐ মানসিক দৌর্বল্যের রোগীটি বলে উঠল, সে স্বামীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে। সাক্ষাতের সময় সে স্বামীজীকে কৃতজ্ঞতার সুরে ধন্যবাদ জানালেন, তাঁকে খুলে বলল নিজের মানসিক দুরবস্থার কথা। খুব আশ্চর্যের কথা, স্বামী অভেদানন্দের সঙ্গে দেখা করার তিন সপ্তাহের মধ্যে ঐ মেয়েটি সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হয়ে উঠল। এবার কেউ যদি আমায় প্রশ্ন করে, কি ক'রে স্বামীজী সেদিন ঐ মেয়েটির মনের সংকটের কথা জানতে পেরেছিলেন, কেনই বা আত্মহত্যার প্রসঙ্গ তুলে আশ্বাসবাণী উচ্চারণ করেছিলেন, তার উত্তরে আমি বলবো, স্বামীজী যথার্থই ছিলেন একজন অন্তর্যামী মহাপুরুষ।"

আমেরিকায় প্রায় পঁচিশ বৎসরকাল অভেদানন্দ অবস্থান করেন এবং ঐ সময়ের মধ্যে সতেরবার তাঁহাকে আটলান্টিক মহাসাগর অতিক্রম করিতে হয়। এই দীর্ঘ সময়ের অক্লান্ত একনিষ্ঠ কর্মসাধনার ফলে আমেরিকায় স্বামী বিবেকানন্দের ঈপ্সিত কর্ম তিনি উদ্‌যাপন করেন। বেদান্তের বাণী আমেরিকায় ও বিশ্বের অগ্রসর দেশগুলিতে ধীরে ধীরে ছড়াইয়া পড়ে। এই সময়ের মধ্যে আমেরিকার বেদান্ত সমিতিও সুসম্বদ্ধ রূপে সংগঠিত হইয়া উঠে।

এবার অভেদানন্দ সংকল্প করেন জন্মভূমি ভারতে প্রত্যাবর্তনের জন্য। জাপান, চীন ও দূর প্রাচ্যের বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে তিনি কলিকাতায় উপনীত হন।

আমেরিকায় থাকিতে অভেদানন্দ রুশ পর্যটক নিকোলাস নটোভিচের রচিত 'দ্য আন্‌নোন্ লাইফ অব জেসাস্ খ্রাইস্ট', পাঠ করিয়াছিলেন, নটোভিচ তাঁহার এ বইয়ে তিব্বতের হিমিস মঠে রক্ষিত একটি পুঁথির বিবরণ উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাহাতে যীশুখ্রীষ্টের তিব্বত ও ভারতে আসার বিবরণ আছে। তত্ত্ব ও তথ্য সম্পর্কে অভেদানন্দের কৌতূহল ও গবেষণা-নিষ্ঠা ছিল অসাধারণ। তাই ভারতে ফিরিয়া তিনি তিব্বতে উপস্থিত হন এবং হিমিস মঠে গিয়া প্রধান লামার নিকট হইতে নটোভিচ প্রদত্ত তথ্যাদি সম্বন্ধে নানা

অনুসন্ধান করেন। সেই অনুসন্ধানের চাঞ্চল্যকর তথ্য তিনি তাঁহার 'কাশ্মীর ও তিব্বতে' নামক গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন।

১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার নিজস্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী অদ্বৈতবাদ ও রামকৃষ্ণতত্ত্ব প্রচারে অভেদানন্দ আগ্রহী হন। তদনুসারে কলিকাতায় ও দার্জিলিং-এ রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ তিনি প্রতিষ্ঠা করেন। তখন হইতে নূতন প্রতিষ্ঠানটিকে কেন্দ্র করিয়াই তাঁহার জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি অতিবাহিত হইতে থাকে।[১]

কলিকাতায় ও দার্জিলিং-এর মঠ ভবনে বহু মুমুক্ষু ভক্ত, বহু দেশনেতা ও কর্মী তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতেন। কর্মযোগ, মনীষা ও তত্ত্বজ্ঞানের মিলিত মূর্ত বিগ্রহ এই মহাপুরুষের বাণী ও পূত চরিত্র তাঁহাদের জীবনে জাগাইয়া তুলিত আত্মিক সাধনার প্রেরণা।

আচার্য হিসাবে স্বামী অভেদানন্দ ছিলেন এক অসামান্য দিক্-দিশারী, প্রাচ্যে ও প্রতীচ্যে বহু ভাগ্যবান্ ভক্ত সাধক তাঁহার সান্নিধ্যে আসিয়াছেন, তাঁহার অমৃতোপম উপদেশ শ্রবণ করিয়া নিজেদের জীবন গড়িয়া তুলিয়াছেন।

ব্রহ্মানন্দ ও ব্রহ্মসাক্ষাৎকার সম্পর্কে তিনি একদিন বলিলেন, "ব্রহ্মানন্দে ছোট ছোট সমস্ত সুখই অন্তর্নিহিত আছে, আর ছোট ছোট সুখ সমস্ত এই ব্রহ্মানন্দের এক এক কণা মাত্র। বৃহদারণ্যকে আছে—এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি। যারা এই ব্রহ্মানন্দের আস্বাদ পেয়েছে তারা টুকরো টুকরো আনন্দ চায় না। তারা আনন্দময় হয়ে আছে। সংসারসুখের অভাববোধ কখনো তাদের হয় না। ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারের পর এ সংসার তুচ্ছ হয়ে যায়।

১ অজস্র সংখ্যক বক্তৃতাদানের সঙ্গে সঙ্গে স্বামী অভেদানন্দ বহুতর গ্রন্থও রচনা করিয়াছেন। তাঁহার সংগঠিত রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ হইতে স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের ব্যবস্থাপনায় তাঁহার রচনাবলী প্রকাশিত হইয়াছে। অভেদানন্দজীর প্রবর্তিত বিশ্ববাণী পত্রিকা এই মঠের মুখপত্র।

আর এ সুখ তো ক্ষণস্থায়ী। একটু বিচার করলে দুঃখই তো বেশী দেখা যায়।

অপরদিকে ব্রহ্মবিৎ পুরুষের সুখ নিত্য। তিনি যে আনন্দ উপভোগ করেন তা নিরপেক্ষ, অর্থাৎ অন্য কোনো জিনিসের অপেক্ষা করে না।

গীতার 'কর্মণ্যেবাধিকারাস্তে মা ফলেষু কদাচন' শ্লোকটি নিয়া আলোচনা চলিতেছিল। এ প্রসঙ্গে তিনি বলিলেন, "ঈশ্বর ঈশ্বর করছ; কে ঈশ্বর? আকাশে কি বসে আছেন? তাঁকে কি ক'রে সেবা করবে? এই সমস্ত মনুষ্য সমষ্টির মধ্যে তাঁকে দেখ। তাকে বলা হয় বিরাট পুরুষ। এইভাবে তোমার সংসারে স্ত্রী-পুত্রের ভিতর, পাড়াপ্রতিবেশীর ভিতর—নমঃশূদ্র, চণ্ডাল, ব্রাহ্মণ এই সবার ভিতর যে নারায়ণ আছেন তাকে দেখ। আর এই ঈশ্বরবুদ্ধি ক'রে নাম যশ কি স্বার্থসিদ্ধি কিছুর দিকে লক্ষ্য না রেখে তাদের দুঃখে কাতর হয়ে তাদের সেবা ক'রে যাও।

"তোমরা কি মনে কর—যে কাজ তোমরা করছ ভগবান্ অমনি তা বসে বসে লিখছেন আর তাই খতিয়ে খতিয়ে তিনি ফল ঢেলে দিচ্ছেন? তা নয়। তাঁর সব কিছুর আইন আছে। তিনি নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত। নিত্য কি—না অনাদি অনন্ত। শুদ্ধ অর্থাৎ তাতে কিছুমাত্র মলিনতা নেই। তারপর তিনি জ্ঞান-চৈতন্যস্বরূপ। তা ভগবান্ লাভ করতে হলে আমাদের সেই অবস্থা পেতে হবে। যেটা অনিত্য, অশুদ্ধ, অজ্ঞান কি বন্ধন, তা ত্যাগ করতে হবে। প্রতিদিন রাত্রিবেলা ভালোই হোক আর মন্দই হোক, পাপ পুণ্য সব ভগবানেই অর্পণ করবে। ঠাকুর একটি ফুল নিয়ে মা'র পায়ে দিয়ে বললেন—'মা, এই নে তোর পাপ, এই নে তোর পুণ্য; এই নে তোর অবিদ্যে; এই নে তোর ভালো, এই নে তোর মন্দ; আমায় শুদ্ধা ভক্তি দে।' উপাসনার এই আদর্শ। ভগবানের চোখে ভালোমন্দ নেই। এই ধর আগুন। এতে যেমন রান্নাও হয়, শীতকালে বেশ গা গরমও রাখে। আবার ছেলেটি হয়তো পুড়ে

গেল কি সর্বস্বান্ত হয়ে গেল, তখন বললে—ঈশ্বরের অভিশাপ। স্বার্থের হানি হলেই আমাদের মনে মন্দ হল। তা বলে আগুনের কি দোষ আছে, বলতো? এই ধর বিদ্যুৎ। দিব্যি ট্রাম চলছে, কিন্তু তার ছিঁড়ে মাথায় পড়লেই মন্দ হয়ে গেল। একই জিনিস ভালো মন্দ দুই-ই। তা ভালোটা নিতে গেলে মন্দটাও নিতে হবে।' "সর্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ।" আগুন জ্বাললে ধোঁয়াটাও নিতে হবে বৈ কি। অ্যাব্‌সোল্যুট্ গুড্ বা নিছক ভালো এখানে নেই। মনে করতে হবে, এ সংসার ভগবানের। 'আমি আমার' বললেই ফলভোগ। বাসনাবর্জিত হয়ে কাজ করা অভ্যাস করতে হবে[১]।"

আর একদিন স্বামীজী বুঝাইতেছিলেন, দেহের ভোগেচ্ছা ছাড়িয়া ব্রহ্মানন্দের দিকে মনকে চালিত করিতে হয়, এজন্য দেহ হইতে আত্মাকে পৃথক বলিয়া ভাবার অভ্যাস করা দরকার। এ প্রসঙ্গে বলিলেন, "দেহ থেকে আত্মাকে আলাদা ক'রে নিলে বাহ্যজ্ঞান শূন্য হয়ে যেতে হয়। এ আমরা ঠাকুরের হতে দেখেছি। চোখ হয়তো খোলা আছে তাতে আঙুল দিলেও পাতা নড়ে না। মন নিশ্চল হলেই শরীর জড় হয়ে গেল। এই যে সব ব্যাপার, এ ঠাকুর দেখিয়ে শেখালেন—ব্যাখ্যা করেন নি। প্রত্যক্ষ দেখেছি হাত অসাড় হয়ে গেছে—সব যেন স্টিফ্, অনড়। কি কঠোর তপস্যাই না তিনি করেছিলেন। সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত খাওয়া দাওয়া নেই, স্থিরভাবে সূর্যের দিকে তাকিয়ে থাকতেন। এই রকম কত সাধনই তিনি করেছিলেন।

"ক্রমে ক্রমে এমন অবস্থা হয়ে গেল যে দিনরাতই ভাবের ঘোরে থাকতেন। তখন এক সাধু তাঁকে রুল দিয়ে খুব মেরে মেরে একটু জ্ঞান করাতো। আর সেই অবসরে হৃদয় জোর ক'রে কিছু খাইয়ে দিত। আঘাত বন্ধ হলেই আবার তাঁর সেই অবস্থা। সে যে কী—বারো বছর তিনি ঘুমান নি, চোখের পাতা পড়ে নি। এ

[১] মহারাজের কথা : চিৎস্বরূপানন্দ

অবস্থায় খুব কম সাধকই যেতে পারে। পরে তিনি বলতেন, 'ওরে, সে একটা ঝড় ব'য়ে গেছে। দিগ্বিদিক জ্ঞান ছিল না।' তখন আমরা বুঝতে পারতুম না—অবাক হয়ে থাকতুম। এখন সব বুঝতে পারছি। দেহ থেকে আত্মা একেবারে আলাদা ক'রে ফেলেছিলেন, তাই এই বিদেহ অবস্থাতেও যাঁদের দেহ থাকে এমন মহাপুরুষ খুব কম।"

প্রণব তত্ত্বের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া অভেদানন্দ সোৎসাহে বলিতেন, তস্য বাচকঃ প্রণবঃ—যত নাম তুমি চিন্তা করতে পার, যা-ই কিছু পড় বা শোন, বিষ্ণুর সহস্র নামই হোক বা শিবের লক্ষ নামই বল না কেন—সবই ওই এক প্রণবেতে আছে। এই হচ্ছে যথার্থ তত্ত্ব। মাণ্ডুক্য উপনিষদ্ তো ওঙ্কারেরই ব্যাখ্যা। অকার জাগ্রত অবস্থা, উকার স্বপ্নাবস্থা, মকার সুষুপ্তি এবং নাদ তুরীয় অবস্থা। কণ্ঠ, তালু প্রভৃতি শব্দের এক একটি স্থান। 'অ'-এর কণ্ঠ থেকে উৎপত্তি। এর উচ্চারণে কোনো খিচ্ নেই, বেশ সরল। 'অ'-কারই বেদের মূল। 'ম' শেষ বর্গীয় বর্ণ, ওষ্ঠদ্বয় বন্ধ ক'রে উচ্চারণ করতে হয়, আর 'উ' মাঝামাঝি। তা তুমি যত রকম শব্দই উচ্চারণ কর না কেন সব এই এক ওঙ্কারেই আছে। খ্রীষ্টানেরা প্রার্থনার শেষে যে 'আমেন' বলে সে এরই অপভ্রংশ।'

"তজ্জপস্তদর্থভাবনম্। এই ওঙ্কার জপ করতে হবে। পাথরেও এক এক ফোঁটা জল ক্রমাগত পড়লে এ একটা জায়গা ঠিক ক'রে নেবে। সেই রকম ক্রমাগত এক চিন্তা করতে হবে। মন অন্য জায়গায় গেলে হবে না। হাতে হরিনামের মালা ওদিকে কার সর্বনাশ করবে মনে ভাবছে—এতে কিছুই হবে না। আর জপের সঙ্গে সঙ্গে তার অর্থ চিন্তা করতে হবে। এতে মনের মলিনতা, কলুষ প্রভৃতি দূর হয়ে যাবে—চিত্ত শুদ্ধ হবে। সংসারী মন বড় পাজী। তাই ভগবান্ কি শুধু ফুল মধু ছড়িয়ে শিক্ষা দেন? তা নয়। মাথায় ঘা দিয়েও শিক্ষা দিয়ে থাকেন। আত্মীয় স্বজনের মৃত্যু—এই রকম বারে বারে কত ঘা খেয়ে মনের শিক্ষা হচ্ছে।

সংসারীর দিক থেকে এসব মহা অশান্তির কারণ বলে মনে হলেও ভগবানের দিক থেকে এ যথার্থ কল্যাণকর। তাই তো কুন্তী বলেছিলেন—হে ভগবান্, আমায় দুঃখ দাও। বল দিখিনি এভাবে প্রার্থনা জগতে আর কে করতে পারে? ওই যে আছে না—যে করে আমার আমার আশ, আমি করি তার সর্বনাশ। সব শ্মশান হয়ে গেলে মন নিরালম্ব হয়—আর তখনই ভগবান্ আসেন।"

আর একদিন ভক্তদের বলিতেছিলেন,[১] "ব্রহ্ম বা ভগবান্ জ্ঞানস্বরূপ। তুমিও তাই। জ্ঞান স্বতঃপ্রকাশ। জ্ঞান তার প্রকাশের জন্য অন্য কিছু সাহায্যের অপেক্ষা রাখে না। আলোকে জানার জন্য আর আলোর দরকার হয় না। তাই সাধন-ভজন ক'রে যেতে হয়, কবে জ্ঞান লাভ করবে ঐ রকম ক'রে খতিয়ে দেখতে নেই। সাধন-ভজন তো আর আলু বেগুনের ব্যবসা নয় যে খতিয়ে দেখবে লাভ হল—কি লোকসান হল।

"সাধনভজনের বেলায় লাভ লোকসান যদি হয় তো তা একমাত্র সাধকের নিজের দোষের বা গুণের জন্য হয়। নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সঙ্গে চেষ্টা করলে সিদ্ধিলাভ নিশ্চয়ই হবে, আর লোক দেখানো জপ-ধ্যান করতো নিজে ফাঁকিতে পড়বে। আসলে সাধন-ভজন ক'রে যেতে হয়, আর চিন্তা করতে হয়, কতটুকু আন্তরিকতার সঙ্গে করছ, কতটুকু তোমার মন উদার ও সংস্কারমুক্ত হয়েছে, পরের দোষদর্শন না ক'রে কতটুকু সকলের গুণের দিকে তোমার দৃষ্টি যাচ্ছে, নিজেকে যেমন ভালোবাস তেমনি কতটুকু অপর সকলকে তুমি ভালোবাস, কতটুকু স্বার্থবুদ্ধি ও কামভাব তোমার ভেতর থেকে দূর হয়ে গেছে—এই সব। এগুলোই তো খতিয়ে দেখার এবং বিচার করার জিনিস। নইলে সাধন-ভজনও করছ, আর মনের মধ্যে কুসংস্কারগুলোকে জাগিয়েও রাখছ, এতে কিছু হবে না।

"তাই সাধন-ভজন করার সময় একান্তই যদি জানতে চাও যে কবে তোমার সিদ্ধিলাভ হবে, তা হলে একথাই মনে রাখবে যে,

১ মন ও মানুষ: স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

মনের সকল সংস্কার যেদিন দূর হবে সে'দিনই তোমার সিদ্ধিলাভ হবে। মনে সংকীর্ণতা থাকবে আর ভগবান্ লাভ করবে—এতো আর হয় না। শঙ্করাচার্য ঠিক এ ধরনের কথাই বলেছেন যে, জ্ঞানলাভ করা মানে অজ্ঞান দূর করা। আলোর প্রকাশ চিরকালই আছে, অজ্ঞান-রূপ আবরণের জন্যই অন্ধকার। তাই অন্ধকার দূর করার জন্য যেমন আলোর দরকার, অজ্ঞান দূর করার জন্য তেমনি সাধন-ভজন অর্থাৎ আত্মতত্ত্ব বিচার দরকার। ব্রহ্মজ্ঞান সর্বদাই আছে, সুতরাং তাকে সাধন-ভজন দিয়ে আর কি লাভ করবে বলো? যা নেই তাকে পাবার জন্যই চেষ্টা, কিন্তু যা সর্বদাই আছে তাকে পাবার জন্য কি আর চেষ্টা করবে, বলো? অজ্ঞান নাশের সঙ্গে সঙ্গেই জ্ঞানের প্রকাশ হয়।"

তরুণ ভক্ত সাধকেরা নিবিষ্ট হইয়া তাঁহার কথা শুনিতেছিলেন, তাঁহারা কহিলেন, "ওসবের ধারণা করা বড় শক্ত মহারাজ।"

উত্তর হইল, "এসবের ঠিক ঠিক ধারণা করতে গেলে চাবিকাটি দরকার।"

'এই চাবিকাঠিটি কি?'—এ প্রশ্নের উত্তরে অভেদানন্দজী কহিলেন, "ঐকান্তিকতা একনিষ্ঠা ভক্তি বিশ্বাস ব্যাকুলতা এ'গুলোই চাবিকাটি। উদ্দেশ্যের প্রতি মনের একমুখিতা থাকা চাই। তোমার মন কেবল ইষ্টকেই চাইবে দুনিয়ার আর কিছু চাইবে না। পার্থিব সব কিছু পড়ে থাকবে মনের বাইরে, তোমার মন থাকবে আত্মনিষ্ঠ হ'য়ে। মনের তখন আর আলাদা অস্তিত্ব কিছুই থাকবে না। মনকে এই আত্মনিষ্ঠ বা ব্রহ্মাবগাহী করার কৌশল জানার নামই চাবিকাঠি। 'গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং বরেণ্যং'—আত্মা হৃদয়গুহায় অবরুদ্ধ কি—না লুকিয়ে আছেন। সেই গুহার দরজা খুলতে গেলে এই চাবিকাটি চাই।"

ঈশ্বরপ্রেম ও ঈশ্বরভাবনা কি করিয়া আত্মজ্ঞান ও অদ্বৈতবোধে প্রতিষ্ঠিত হয় তাহার একটি উদাহরণ অভেদানন্দজী প্রায়ই দিতেন। বলিতেন: "একজন সুফী তার বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে দরজায় আঘাত

করলে। ভেতর থেকে প্রশ্ন এল, 'বাইরে কে?' সুফী বললে, 'আমি তোমার বন্ধু।' বন্ধু গম্ভীরভাবে উত্তর দিলে, 'যাও বন্ধু, আমার টেবিলে দু'জনের স্থান হবে না।' সুফী বন্ধু তখন মনে গভীর দুঃখ নিয়ে ফিরতে বাধ্য হল, কিন্তু বিরহের আগুন তার হৃদয়কে পুড়িয়ে দিচ্ছিল। সে তাই ফিরল, ভয় ও শ্রদ্ধা নিয়ে তার বন্ধুর দ্বারে এসে আবার আঘাত করলে। ভেতর থেকে আগের মতোই উত্তর এল, 'বাইরে কে?' এবার সুফী বন্ধু উত্তর দিলে, 'হে প্রিয়তম, তুমি।' তখন দরজা খুলে গেল ও তার বন্ধু বললে, 'তোমার আমিত্ব যখন ঘুচে গেছে তখন ভেতরে এসো, কেন না আমার ঘরে দুজন আমির স্থান নেই।'

একদিন মন সম্পর্কে ভক্ত সাধকদের কহিলেন, "মানুষের মন আর কি না পাবে বলো। মন এত বলীয়ান্ কেন? তার পিছনে সর্বশক্তিময় আত্মা আছেন বলে? চন্দ্র যেমন সূর্যের কাছ থেকে আলো ধার ক'রে জ্যোতিষ্মান্, মনও তেমনি। নইলে মন তো আসলে জড় একটা যন্ত্র, আত্মচৈতন্য তার পিছনে থেকে তাকে নিয়ন্ত্রণ করে বলেই সে কাজ করে। মন সব কিছু করে মানে আত্মাই মনকে প্রেরণা দেয়। মন তাই মাধ্যম বা যন্ত্র। কিন্তু আত্মাতে কোনো কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব প্রভৃতি গুণ বা অভিমান নেই, অথচ 'তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি', তাঁরই আলোকে দুনিয়ার সব কিছু আলোকিত। জীবজন্তু সবই তাঁর কাছ থেকে শক্তি ও প্রেরণা পেয়ে কাজ করে। দেদীপ্যমান সূর্য সকলের ওপর সমান ভাবে কিরণ দেয়। পক্ষপাতিত্ব তাতে কিছুমাত্র নেই। সূর্য কিরণ না দিলে আলোর অস্তিত্ব থাকতো না। আগুনই কি পেতে? আত্মাও তেমনি। মন আত্মার দ্বারী, সাধারণ লোক কিন্তু মনকেই কর্তা ভাবে, আর তখনি সে মনের বশীভূত হয় ও সৃষ্টি হয় যত কিছু অনর্থ।

"সাধনা মানেই মনের 'অহং' কর্তৃত্বাভিমানকে নষ্ট করা, মনকে বুঝিয়ে দেওয়া যে, তুমি কর্তা নও, কর্তা হলেন শরীরী আত্মা—যিনি

শরীরে আছেন আবার জগতের সর্বত্র আছেন। যখন এই রকম ভাবতে পারবে তখনি তোমার মন বশীভূত হবে, তুমি মনের পারে যাবে। মনই মুক্তির অন্তরায়, আবার মনই মুক্তির সহায়ক। অন্তরায়—কেননা মনই কর্তা সেজে নিজে আত্মা থেকে পৃথক এ কথা মানুষকে জানিয়ে দেয়, আর সহায়ক—কেন না মনই—বুদ্ধিরূপে আত্মাকে জানিয়ে দেয়। বুদ্ধিবৃত্তিতে ব্রহ্মচৈতন্য প্রতিবিম্বিত হন, আর তাতে ক'রে বৃত্তির মধ্যে যে অজ্ঞান তা' নষ্ট হয়ে জ্ঞান স্বতঃ প্রকাশিত হয়। এই জ্ঞানই শুদ্ধজ্ঞান বা আত্মজ্ঞান—ইংরেজীতে যাকে বলে, সেল্‌ফ নলেজ বা গড্‌কনশাসনেস্‌। শ্রীশ্রীঠাকুর এই কথাকেই একটু ভিন্নভাবে বলেছেন। তিনি বলেছেন, মহামায়া অন্তঃপুর পর্যন্ত যেতে পারেন না, তিনি ব্রহ্মকে দূর থেকে দেখিয়ে দিয়ে অদৃশ্য হন। এই দেখিয়ে দেওয়ার কৃতিত্ব কিন্তু মনের, অর্থাৎ বুদ্ধির, মন বা বুদ্ধিই আবার মায়া বা মহামায়া। মহামায়ার সঙ্গে ব্রহ্মের ভেদ কেবল পার্থিব দৃষ্টিতে, পারমার্থিক দৃষ্টিতে দুইই এক[১]।"

ভক্তেরা প্রশ্ন করেন, "মহারাজ, শ্রীশ্রীঠাকুর বলেছেন মন প্রসন্ন হলে তা আত্মজ্ঞানও দিতে পারে। ব্রহ্ম মন-বুদ্ধির অগোচর, কিন্তু শুদ্ধ মনের গোচর, তাই কি ?"

অভেদানন্দজী উত্তর দেন, "হ্যাঁ, তাই বৈ কি। মন প্রসন্ন হওয়া মানে মন শুদ্ধ হওয়া। মনের সংকল্প-বিকল্প বৃত্তি-দুটো চলে গেলেই মন শুদ্ধ হয়। সাধকের মন শুদ্ধ হলে আর মন থাকে না; তখন তা শুদ্ধচৈতন্যরূপে প্রতিভাত হয়। এটাকেই ভিন্নভাবে বলা হয়েছে যে, মন প্রসন্ন হ'লে তা-ই আত্মজ্ঞান দিতে পারে। একই কথা।"

অভেদানন্দজীর সকল কিছু তত্ত্ব উপদেশের মধ্যে জ্ঞানচর্চা ও আত্মজ্ঞান লাভের কথা শুনা যায়। কিন্তু তাঁহার সব কিছু বক্তব্যের পশ্চাৎপটে রহিয়াছে, মানবপ্রেম, জীবের জন্য অফুরন্ত ভালোবাসা।

"তিনি বলিতেন, এ যুগে বিবেকানন্দই জ্ঞানচর্চার জন্যে চেষ্টা করেছিলেন। দেশ অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছে এখন বেদান্ত উপনিষদের

১ মন ও মানুষ : স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

চর্চা চাই। আত্মজ্ঞান লাভ করতে হবে। তবেই মৃত্যুভয় থাকবে না—জগৎকে ভালোবাসতে পারবে। তা নয় খালি নিজে নিজের বউটি আর ছেলেটি। ছুনিয়া ডুবুক আমার কি ? এর ওষুধ হচ্ছে ভালোবাসা—তোমার নিজের মতো ক'রে ভালোবাসো তোমার প্রতিবেশীকে—এই ভালোবাসা এখন সন্ন্যাসীদের ভিতরেও নেই। তাই তো বেদান্ত চর্চা করতে হবে—গাছতলায় ব'সে নয়। এবং এ শুধু সন্ন্যাসীদের জন্যেও নয়। বাড়িতে, স্ত্রীপুত্রের ভিতর, পাড়া-প্রতিবেশীর মধ্যে প্রচার করতে হবে। প্রত্যেক মা প্রত্যেক ছেলেকে এই শেখাবে, তবে আমাদের দেশের মঙ্গল হবে।

ভক্তপ্রবর চিৎস্বরূপানন্দের মতে, অভেদানন্দের চরিত্রের ভিত্তি হইতেছে তাঁহার অপার মানবপ্রেম। এই দৃষ্টিকোণ হইতে স্বামীজীর মূল্যায়ন করিতে গিয়া তিনি বলিয়াছেন : এই মনীষা, এই প্রতিভা, এই সাহস, এই ক্ষুরধার বিচারবুদ্ধি, সুনিবিড় দার্শনিকতা, সুগভীর জ্ঞান যা তাঁর জীবনে সুনিহিত, সুবিহিত, সুষমাযুক্ত ঐক্যে পুষ্পিত হয়েছিল, এসবের উপরেও তাঁর চরিত্রের যে পরম মাধুর্য ছিল সেটি হচ্ছে তাঁর আশ্চর্য সরলতা, আর অকারণে সবাইকে ভালোবাসা। আজ যখন সে সব কথা ভাবি তখন মনে হয় তিনি যে কি ছিলেন তা জানি না। কেবল জানি, আমাদের সঙ্গে তাঁর ছিল একটি গভীর অন্তরের টান। তিনি ছিলেন প্রেমিক, সত্যিকার দরদী, তাই যা কিছু প্রাণবান্ তার প্রেরণা পাই তাঁর কাছ থেকে। বিশ্বের দরবারে প্রচার করতে গিয়ে ভোলেননি তিনি স্বদেশের ছুঃখ, স্বজাতির ব্যথা। স্বল্প কথায় 'ইণ্ডিয়া অ্যাণ্ড হার পিপল, এ যা বলেছেন সেখানে চাপা থাকে নি দেশের ছুঃখে কেমন ক'রে কেঁদেছিল তাঁর প্রাণ। তাঁর প্রেম জলধি ভৌগোলিক গণ্ডীতে আবদ্ধ করা যায় না। তিনি শুধু বাংলার নয় ভারতের নয়—নিখিল মানবের অন্তর-বেদীর নিরালায় যুগে যুগে পাতা তাঁর কালজয়ী সিংহাসন।

"মানুষ যে এত সরল হতে পারে তাঁকে না দেখলে তা কখনো বিশ্বাস করতুম না। কতবার তাঁকে দেখেছি। ক্ষমার ঠাকুররূপে তাকিয়ে

আছেন ক্ষমাসুন্দর চক্ষে কত লোক এসেছে। ভক্তি জানিয়েছে, প্রণাম করেছে, কৃতকৃতার্থ হয়ে চলে গেছে। আবার কতজনে এ সোনার আদর্শ নির্মমভাবে অস্বীকার ক'রে গেছে। কিন্তু যাঁর সামনে এসব ঘটেছে, তাঁর হাসি—সেই দেবদুর্লভ হাসি কেউ ম্লান করতে পারে নি[১]।

স্বামী অভেদানন্দের দীর্ঘ কর্মময় জীবনে এবার ধীরে ধীরে আসিয়া পড়ে বিরতির পালা। এ সময়ে মাঝে মাঝে স্মিতহাস্যে অন্তরঙ্গ ভক্তদের দিকে তাকাইয়া কহিতেন, "জানো, এবার ঠাকুর আমায় পেনসন দিচ্ছেন। অনেক খেটেছে এই দেহটা, এবার একটু বিশ্রাম করে নিক্ কি বল ?"

দেহান্তের প্রায় বৎসর দেড়েক আগে হইতেই স্বামীজী নানা অসুখে ভুগিতে থাকেন। অন্তরঙ্গ ভক্ত ও সেবকেরা প্রাণপণ প্রয়াসে তাঁহার চিকিৎসা ও সেবা পরিচর্যার ব্যবস্থা করেন।

রোগশয্যায় শায়িত থাকিয়াও অভেদানন্দ তরুণ সাধনার্থীদের উপদেশ দানে বিরত হন নাই। যে কেহ তাঁহার নিকট জিজ্ঞাসু হইয়া উপস্থিত হইত, লাভ করিত সাধন উপদেশ, রামকৃষ্ণ-তনয়ের মুখে রামকৃষ্ণের স্মৃতিচারণ শুনিয়া জীবন সার্থক করিত।

এ সময়ে একদিন স্বামীজী বালকের মতো হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, —"দেশের সর্বত্যাগী নায়ক সুভাষ, তাকে দেখতে আমার বড় ইচ্ছে হয়েছে।"

এ সংবাদ পাওয়া মাত্র সুভাষচন্দ্র স্বামীজীর বেদান্ত মঠে আসিয়া উপনীত হন, নিবেদন করেন সশ্রদ্ধ প্রণাম। স্বামীজী তখন অত্যন্ত অসুস্থ, উঠিয়া বসিতে পারেন না। কিন্তু দেশের মুক্তি-সংগ্রামের পুরোধা পুরুষ সিংহ সুভাষচন্দ্রকে দেখিয়া তিনি আনন্দে বিহ্বল হইয়া উঠিয়াছেন। সোৎসাহে বলিলেন, "এসো, এসো সুভাষ। তোমায় একবার আলিঙ্গন করি।"

কোনোমতে উঠিয়া সস্নেহে সুভাষচন্দ্রকে দুই হাতে বুকে জড়াইয়া

১ মহারাজের কথা : চিৎস্বরূপানন্দ

ধরিলেন। গদ্‌গদ স্বরে কহিলেন, "আশীর্বাদ করি, তুমি বিজয়ী হও।" অপরিসীম শ্রদ্ধা নিয়া নম্র কিশোর বালকের মতো সুভাষচন্দ্র স্বামীজীর শয্যার পাশে বসিয়া রহিলেন, মাঝে মাঝে দেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে উভয়ের বাক্যালাপ হইতে লাগিল। ঘণ্টাখানেক পরে সুভাষচন্দ্র স্বামীজীকে প্রণাম করিয়া বিদায় নিলেন।

দেহান্তের আর বেশী দেরি নাই, এ কথা অভেদানন্দ নিজে ভালোভাবেই জানেন। মাঝে মাঝে অন্তরঙ্গ ভক্তদের বলেন, "কি গো, তোমরা আমার শেষ কৃত্য কোথায় করবে ?"

এটা ওটা নানা কথা বলার পর নিজেই নির্দেশ দেন, "সব চাইতে ভালো, ঠাকুরের চরণতলে শুয়ে থাকা।" ভক্তেরা বুঝিলেন, তিনি কাশীপুর শ্মশানে, ঠাকুর রামকৃষ্ণের সৎকার স্থলের কথাটিই উল্লেখ করিতেছেন।

অবশেষে নির্ধারিত চিরবিদায়ের লগ্নটি আসিয়া যায়। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই সেপ্টেম্বর সমাধিযোগে মহাপ্রয়াণ করেন আত্মকাম সাধক স্বামী অভেদানন্দ।

অধ্যাত্মশিল্পী শ্রীরামকৃষ্ণ সযত্নে রচনা করিয়াছিলেন তাঁহার সাধক তনয়দের একটি মণিময় হার। সে হার হইতে একটি উজ্জ্বল মণি সেদিন খসিয়া পড়িল।

বেলুড় মঠের সন্ন্যাসীরা তাঁহাদের এই গুরুভাই সম্বন্ধে আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া তাই লিখিয়াছেন,[১] "তিনি (অভেদানন্দ স্বামী) ছিলেন বহির্ভারতে আমাদের জন্মভূমি ও তাহার ধর্ম সংস্কৃতির একজন প্রখ্যাত প্রবক্তা। তাঁর জীবনে সম্মিলিত হয়েছিল সুগভীর অধ্যাত্মশক্তি-এবং সেবানিষ্ঠা—এবং তার পুণ্যময় মহাজীবন নিঃশেষে নিবেদিত হয়েছিল মানবের পরম কল্যাণে। ঈশ্বরের ইচ্ছাক্রমে, তাঁর সদ্‌গুরুর কর্মব্রত উদ্‌যাপনের জন্য আবির্ভূত হয়েছিলেন স্বামী অভেদানন্দ। তারপর সে ব্রত সমাপ্ত ক'রে তিনি অন্তর্ধান করেছেন সেই আলোকেরই উৎসস্থলে যেখান থেকে তিনি নেমে এসেছিলেন এই ধরণীতে।"

১ দ্য ডিসাইপল্‌স অব রামকৃষ্ণ: অদ্বৈত আশ্রম

কৃষ্ণপ্রেম

সারা ইয়োরোপে তখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের তাণ্ডব শুরু হইয়াছে। ট্যাংক ও হাউইৎজের কামান নিয়া দুর্ধর্ষ জার্মান সেনা বেলজিয়াম ও ফ্রান্সের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে। বম্বার ও ফাইটার বিমান হইতে চালাইতেছে অশ্রান্ত গোলাবর্ষণ।

জলে স্থলে আকাশে ইংরেজ ও ফরাসী বাহিনীও মরণপণ করিয়া রুখিয়া দাঁড়াইয়াছে। শত্রুর উপর হানিতেছে প্রচণ্ড আঘাত।

দেশের অন্যান্য তরুণের মতো কেমব্রিজের প্রতিভাধর ছাত্র রোনাল্ড নিক্সনও সেদিন দেশরক্ষার জন্য উদ্বুদ্ধ। ইউনিভার্সিটির পড়া ছাড়িয়া দিয়া সোৎসাহে যোগ দিয়াছেন রয়েল এয়ার কোর্সে। জার্মানীর ভয়াবহ আক্রমণ রোধ করার জন্য ইংরেজেরা সবেমাত্র একটি ক্ষুদ্র বিমান বাহিনী গড়িয়া তুলিয়াছেন। নিক্সন সেই বাহিনীরই অন্যতম বিমানচালক। দক্ষ ও দুঃসাহসী পাইলট রূপে অল্প দিনের মধ্যে সম্মানজনক একটি 'এইস'-ও তিনি লাভ করিয়াছেন।

হঠাৎ সেদিন কর্তৃপক্ষের গোপন নির্দেশ আসিল, জার্মান অধিকৃত বেলজিয়ামের একটা সমর ঘাঁটিতে শত্রু নূতন আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হইয়াছে, জড়ো করিয়াছে বিপুল সমর সম্ভার। অবিলম্বে ঐ ঘাঁটির উপর প্রচণ্ড আঘাত হানিতে হইবে।

গুটিকয়েক বম্বার প্লেন তৎক্ষণাৎ ক্ষিপ্রবেগে উড়িয়া চলিল সেই লক্ষ্যের দিকে। চালকরূপে রোনাল্ড নিক্সনও রহিলেন তাহার একটিতে।

বেলজিয়ামের আকাশে ঢুকিবার আগেই একটি গুপ্ত ঘাঁটি হইতে উড়িয়া আসে একদল জার্মান ফাইটার বিমান, ক্ষিপ্রবেগে করে নিক্সনের পশ্চাৎ-ধাবন। এতক্ষণ সেদিকে তিনি লক্ষ্যই করেন নাই। একমনে লক্ষ্যস্থলের দিকে উড়িয়া চলিয়াছেন, ককপিট-এ বসিয়া

দৃঢ় হস্তে থ্রটল ঠেলিয়া দিতেছেন বার বার, বিমানের গতি আরো তীব্র হইয়া উঠিতেছে।

হঠাৎ তাঁহার নজর পড়িল দূরে আকাশের কোণে, দুর্ধর্ষ জার্মান ফাইটারগুলি তাঁহাকে ঘেরাও করার জন্য ছুটিয়া আসিতেছে। একাকী এতগুলি শত্রুবিমানের সঙ্গে যুঝিয়া উঠা সম্ভব নয়। নিক্‌সন প্রমাদ গণিলেন।

মুহূর্ত মধ্যে এই সংকটকালে তাঁহার নয়ন সমক্ষে ভাসিয়া উঠে এক অতীন্দ্রিয় দৃশ্য। তুষারমৌলী এক উত্তুঙ্গ পর্বত সূর্যের রূপালী আলোয় ঝলমল করিতেছে, আর সেই পর্বতের কন্দর হইতে নির্গত হইতেছে শুভ্র-উজ্জ্বল স্বর্গীয় আলোকধারা। এই আলোকের তরঙ্গে ডুবিয়া যাইতেছে রোনাল্ড নিক্‌সনের সারা অস্তিত্ব।

ক্ষণপরেই এক দিব্য ভাবাবেশে আবিষ্ট হইয়া পড়েন তিনি। অর্ধ-বাহ্য অবস্থায় অনুভব করিতে থাকেন, কোথা হইতে একটা অজানা শক্তি তাঁহার দেহের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, অধিকার করিয়া বসিয়াছে তাঁহার ইচ্ছাশক্তি ও হস্তপদের ক্রিয়া।

ঐ শক্তি-ই এবার চালাইয়া নিতে থাকে নিক্‌সনের বম্বার প্লেনটিকে। ঊর্ধ্বে আরো ঊর্ধ্বে দূর আকাশে সেটি উঠিয়া যায়। তারপর ঘুরিয়া চলিতে থাকে বিপরীত দিকে।

বাহ্য জ্ঞান ফিরিয়া আসিলে নিক্‌সন চাহিয়া দেখেন। বিমানের ককপিটে তিনি আর বসিয়া নাই। রহিয়াছেন লণ্ডনের কাছাকাছি একটি সামরিক হাসপাতালে।

তাঁহার বিমানটি ইংল্যাণ্ডে নিজস্ব বিমান ঘাঁটিতে নিরাপদে অবতরণ করে। কিন্তু অবতরণ করার পর দেখা যায়, পাইলট নিক্‌সন মূর্ছিত অবস্থায় ককপিটের মধ্যে ঢলিয়া পড়িয়া আছেন। অতঃপর তাড়াতাড়ি তাঁহার চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়।

সেদিনকার অভিযানের সঙ্গী পাইলটদের অনেকেই হত বা নিহত হইয়াছে। কয়েকটি বৃটিশ বিমান হইয়াছে একেবারে বিধ্বস্ত। পাইলট নিক্‌সন কি করিয়া শত্রু ব্যূহের কাছাকাছি গিয়াও নিরাপদে

ফিরিয়া আসিলেন, এ এক পরম বিস্ময়। সঙ্গী পাইলটেরা কেউ কেউ দেখিয়াছিলেন, নিক্‌সনের বম্বার প্লেনটি আকাশে বহু উঁচুতে উঠিয়া কোথায় উধাও হইয়া গেল। তারপর দেখা গেল, সেটি বৃটিশ বিমান ঘাঁটিতে ফিরিয়া আসিয়াছে, আর নিক্‌সন পড়িয়া আছেন অচেতন অবস্থায়।

এয়ার মার্শাল নিজে সেদিন হাসপাতালে আসিয়া উপস্থিত, নিক্‌সনের শয্যায় পাশে বসিয়া করেন প্রশ্নের পর প্রশ্ন। সেদিনকার অভিযানে বৃটিশ বিমান বহর ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, তাই এ সম্পর্কিত তথ্য তিনি সংগ্রহ করিতে চান।

"তোমার বম্বার বিমান কি ক'রে ফিরে আসতে পারল দুর্ধর্ষ জার্মান ফাইটারগুলোর প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে"—প্রশ্ন করা হইল রোনাল্ড নিক্‌সনকে।

সরলভাবে নিক্‌সন খুলিয়া বলিলেন সেদিনের সকল কথা, একটা বিস্ময়কর দৈবী শক্তি হঠাৎ কি জানি কেন, আমায় অধিকার ক'রে বসেছিল। শুধু তাই নয়, আমায় পর্যুদস্ত ক'রে, হাতদুটিকে বাধ্য করেছিল ঘুরপথে পালিয়ে আসার জন্য।"

"দৈবী শক্তি? যতো সব অর্থহীন বাজে কথা।" তাচ্ছিল্যের সুরে মন্তব্য করেন এয়ার মার্শাল। যাইবার সময় ডাক্তারকে বলিয়া গেলেন, পাইলট রোনাল্ড নিক্‌সনের স্নায়বিক চাঞ্চল্যের দিকে যেন সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়।"

নিক্‌সন কিন্তু মনে মনে হাসিলেন। তিনি যে নিশ্চিতরূপে জানেন, অযথা কোনো অলৌকিকত্বের অবতারণা তিনি করেন নাই। যে দিব্য ভাবাবেশে বেলজিয়ামের আকাশে উড়ন্ত অবস্থায় তিনি আবিষ্ট হইয়াছিলেন, সেই ধরনের ভাবাবেশ আরো কয়েকবার এই হাসপাতালে আসার পর তাঁহার হইয়াছে। স্পষ্টরূপে একাধিকবার তিনি দেখিয়াছেন সেই অলৌকিক দৃশ্য—সূর্য-করোজ্জ্বল সেই অভ্রভেদী পাহাড়ের চূড়া, আর সেই পাহাড় চূড়া হইতে নির্গত হইতেছে শুভ্র জ্যোতির প্রবাহ। শুধু তাহাই নয়, এখানে আসার

পর ঐ পাহাড়ের পরিচয়ও উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে তাঁহার কাছে। অন্তরাত্মা হইতে কে যেন বারে বারেই অস্ফুটস্বরে বলিয়া উঠিতেছে, "হিমালয় দেখেছো তুমি সেদিনকার অলৌকিক দর্শনের মধ্যে। পবিত্র হিমালয়ের কন্দরে থাকেন যে সব যোগী ঋষি, তাঁদের কৃপা তুমি পেয়েছ। সেই কৃপাই সেদিন উদ্ধার করেছে তোমায় নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে।'

'হিমালয়', আর 'ভারতবর্ষ' এই দুইটি নাম ঘুরিয়া ঘুরিয়া উপস্থিত হইতেছে নিক্‌সনের মানসপটে। অব্যক্ত আনন্দের রোমাঞ্চ শিহরণ ঘটিতে থাকে বার বার। ভারত সম্পর্কে তেমন বিশেষ কিছু জানা নাই তাঁহার। কলেজ লাইব্রেরী হইতে বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কিত দুই একটি গ্রন্থ পড়িয়াছেন, আর পড়িয়াছেন থিয়োসফিস্ট অ্যালকট্ ও ব্লাভাৎস্কির কয়েকটি রচনা। হিমালয়ের শক্তিধর মহাত্মাদের কাহিনী অল্পস্বল্প তিনি জানেন বটে কিন্তু ইহা নিয়া কোনো দিনই মাথা ঘামান নাই। ইউনিভার্সিটির মেধাবী ছাত্র রোনাল্ড নিক্‌সন, ইংরেজী সাহিত্যের উপর বরাবরই তাঁহার প্রবল অনুরাগ। এই সাহিত্যেই তিনি ব্যুৎপন্ন হইয়াছেন, অনার্স নিয়া পাস করিয়াছেন। আপন খেয়াল খুশীমতো দুই চারিটি ধর্ম দর্শনের বই পড়িয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাতে তেমন কোনো আকর্ষণ বোধ করেন নাই। এবারকার এই অলৌকিক অভিজ্ঞতা কিন্তু নিক্‌সনের মানসিক স্তরে ঘটাইয়া দিল এক বিপর্যয়। ভারতবর্ষ, ভারতবর্ষের ধর্ম দর্শন ও সাধু মহাত্মাদের সম্বন্ধে জাগিয়া উঠিল এক নূতনতর মূল্যবোধ।

অলৌকিক অনুভূতি আজ আর তাঁহার কাছে ধোঁয়াটে কোনো বস্তু নয়। অলৌকিক কৃপা ও শক্তির অভিজ্ঞতা তাঁহার নিজ জীবনে স্পষ্টরূপে ধরা দিয়াছে। এই কৃপা এবং এই শক্তি শুধু তাঁহার প্রাণ রক্ষাই করে নাই, নূতনতর আত্মিক চেতনা জাগ্রত করিয়াছে তাঁহার জীবনে, উদ্বোধিত করিয়াছে নূতনতর বিশ্বাস ও মূল্যবোধ।

বার বারই রোনাল্ড নিক্‌সনের অন্তরে জাগে আলোড়ন, উদগ্র হইয়া উঠে প্রশ্নের পর প্রশ্ন,—'অলক্ষ্যে থেকে কেন ঐ কল্যাণময়

শক্তি এগিয়ে এসেছিলেন তাঁর প্রাণ বাঁচানোর জন্য? কে রয়েছেন ঐ শক্তির পেছনে? কি তাঁর প্রকৃত স্বরূপ? কোথায়, কোন্ পথে পাওয়া যাবে তার প্রত্যক্ষ পরিচয়?'

নাঃ, এসব প্রশ্নের উত্তর তাঁহাকে পাইতেই হইবে, করিতে হইবে সেদিনকার অলৌকিক অভিজ্ঞতার রহস্যভেদ। যুদ্ধের কাজে আর তাঁহার মন বসিল না, রয়েল এয়ার ফোর্সের কর্ম পরিত্যাগ করিয়া ফিরিয়া আসিলেন কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটিতে। বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ দুই জীবনের মোড়ই এবার ফিরিয়া গেল।

পড়াশুনার কাজে কিছুদিন তিনি ব্যাপৃত রহিলেন বটে, কিন্তু বেলজিয়ামের আকাশের সেই অলৌকিক ঘটনার স্মৃতি সতত জাগরূক রহিল তাঁহার অন্তরে। সেই সঙ্গে চলিল অন্তরের অন্তস্তলে বারংবার অবগাহন। দুর্জ্ঞেয় দিব্যলোকের হাতছানি কেবলই চঞ্চল করিয়া তোলে নিক্‌সনকে, একটা নূতনতর আত্মিক আস্বাদের জন্য সারা মনপ্রাণ তাঁহার ব্যাকুল হইয়া উঠিতে থাকে।

এই ব্যাকুলতা এবং ভাবান্তরের ভিতর দিয়া ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করে অধ্যাত্ম-জীবনের আকাজ্ক্ষা। পূর্বে যাহা ছিল নিছক কৌতূহলের বস্তু, এবার তাহা আবির্ভূত হয় জীবনের প্রধান লক্ষ্যরূপে। অনির্দেশ্য নিয়তি নিক্‌সনকে অনিবার্যরূপে ঠেলিয়া নিয়া যায় তাঁহার পরম সম্ভাবনার দিকে। এ পথে অগ্রসর না হইয়া আর কোনো উপায়ান্তর নাই।

এই সময়ে একাগ্র চিত্তে ধর্ম সংস্কৃতির বহুতর গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে থাকেন নিক্‌সন। বিশেষ করিয়া ভারতের ধর্ম সাধনা ও সাধকজীবনের দিকে তাঁহার মন আরো গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়। থিয়োসফিস্টদের চাঞ্চল্যকর বহু গ্রন্থ পাঠ করেন, কিন্তু তাহাতে কৌতূহলের নিবৃত্তি যতটা হয় মন প্রাণ ততটা ভরিয়া উঠে না। বরং বৌদ্ধ দার্শনিকতা ও বৌদ্ধ সাধন সম্পর্কে তিনি বেশ কিছুকাল ব্যাপকভাবে পড়াশুনা করেন। লণ্ডনের এক প্রবীণ বৌদ্ধ সাধকের নির্দেশ নিয়া ধ্যান জপেও কিছুকাল নিবিষ্ট হন। কিন্তু ইহাতে

অধ্যাত্মজীবনের তৃষ্ণা তো তাঁহার মিটে না। আরো নিবিড় করিয়া পরম তত্ত্বকে যে তিনি আঁকড়িয়া ধরিতে চান। সূক্ষ্মতর আত্মিক উপলব্ধির জন্য, মুক্তির আস্বাদের জন্য রোনাল্ড নিক্সন অধীর হইয়া উঠেন।

অবশেষে তিনি স্থির করেন। ভারতে গিয়াই স্থায়ীভাবে এবার বসবাস করিবেন, সাক্ষাৎভাবে আসিবেন সেখানকার সিদ্ধ মহা-পুরুষদের সান্নিধ্যে। ধর্ম ও দর্শনের তত্ত্ব আয়ত্ত করার সঙ্গে সঙ্গে শুরু করিবেন অধ্যাত্ম জীবনের নিগূঢ় সাধনা।

নিক্সন অচিরে উপস্থিত হন তাঁহার ধ্যানের ভারতে, খুঁজিয়া পান তাঁহার নিজস্ব সাধনার পথ। তাঁহার সেই পথ—বৃন্দাবনের গুরুপরম্পরা-ধৃত এক বিশিষ্ট বৈষ্ণবীয় পথ। সাধনজীবনে সন্ন্যাস নিয়া নিক্সন পরিগ্রহ করেন নূতন নাম—'কৃষ্ণপ্রেম।' উত্তরকালে এ নাম তাঁহার সার্থক হইয়া উঠে কৃষ্ণপ্রেমের সিদ্ধ সাধকরূপে ঘটে তাঁহার মহারূপান্তর। ভারত এবং ইয়োরোপ আমেরিকার বহু মুমুক্ষু ও সাধনকামী নরনারীর পরমাশ্রয়রূপে তিনি খ্যাত হইয়া উঠেন।

রোনাল্ড নিক্সন, উত্তরকালের বহুজনবন্দিত বৈষ্ণব সাধক কৃষ্ণপ্রেম, ভূমিষ্ঠ হন ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই মে। ইংল্যাণ্ডের একটি শিক্ষিত, ধর্মপরায়ণ মধ্যবিত্ত পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন।

বালককাল হইতেই নিক্সনের মধ্যে দেখা যায় অসাধারণ মেধা ও প্রতিভার স্ফুরণ। যৌবনে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি অধ্যয়ন করেন এবং ইংরেজী সাহিত্যের স্নাতক পরীক্ষায় উচ্চতর সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হন।

কলেজে পড়াশুনা করার সময় হইতেই ধর্ম ও দর্শন সম্পর্কে তাঁহার কৌতূহল জাগিয়া উঠে এবং এ সময়ে খ্রীষ্টীয় ধর্ম, বৌদ্ধবাদ এবং থিয়োসফির কিছু কিছু গ্রন্থ তিনি পড়িয়া ফেলেন। আত্মিক

জীবনের যে সংস্কার এতদিন সুপ্ত ছিল, এবার তাহা ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করিতে থাকে। দুর্জ্ঞেয় লোকের রহস্য জানার জন্য নিক্সন চঞ্চল হইয়া উঠেন।

ঠিক এই সময়ে জার্মানীর আক্রমণের ফলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের দামামা বাজিয়া উঠে; বৃটেনের অন্যান্য দেশপ্রেমিক যুবকদের মতো রোনাল্ড নিক্সনও যোগদান করেন প্রতিরক্ষা বাহিনীতে। রয়েল এয়ার ফোর্সে তিনি কমিশন প্রাপ্ত হন এবং অল্পকাল মধ্যে বিমান চালনায় দক্ষ হইয়া গ্রহণ করেন বোমারু বিমান চালনার গুরু-দায়িত্ব। এই সময়ে একদিনকার আকাশ অভিযানের সময় যে চাঞ্চল্যকর অলৌকিক অভিজ্ঞতা নিক্সনের ঘটে, তাহাই উন্মোচিত করে তাঁহার জীবনের নূতনতর অধ্যায়। ভারতীয় অধ্যাত্ম সাধনার রহস্য জানিবার জন্য তিনি ব্যগ্র হইয়া উঠেন।

ইংল্যাণ্ডে থাকিতে ভারতে বসবাসের যে সংকল্প রোনাল্ড নিক্সন করিয়াছিলেন, শীঘ্রই তাহা সিদ্ধ হইয়া উঠে। লখনৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী তখন লণ্ডনে উপস্থিত। এ সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগের জন্য তিনি একটি সুযোগ্য অধ্যাপকের খোঁজ করিতেছিলেন। এক মধ্যবর্তী বন্ধুর সাহায্যে নিক্সন ডঃ চক্রবর্তীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, প্রকাশ করিলেন মনের গোপন বাসনা। তিনি প্রতিভাধর তরুণ ইংরেজ অধ্যাপক তদুপরি ভারতের প্রতি, ভারতের ধর্ম সংস্কৃতির প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা অপরিসীম। উপাচার্য শ্রীচক্রবর্তী সানন্দে তাঁহাকে নিযুক্ত করিলেন ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপকের পদে।

অল্পদিনের মধ্যেই লখনৌতে পৌঁছিয়া রোনাল্ড নিক্সন যোগ দিলেন তাহার নূতন কাজে। নূতন অধ্যাপকের জন্য তাড়াতাড়ি কোনো ভালো বাসস্থানের ব্যবস্থা করা যাইতেছে না, উপাচার্য কহিলেন, "তুমি অবিবাহিত, একটিমাত্র লোক। তুমি আমার বাড়িতেই তো থাকতে পারো। যতদিন স্টাফ কোয়ার্টার তৈরি না

হয়, আমার এখানেই থাকো। অবশ্যি যদি তোমার নিজের দিক দিয়ে কোনো আপত্তি না থাকে।"

নিক্‌সন উত্তরে বলিলেন, "আপত্তি তো আমার নেই-ই বরং উৎসাহ আছে। আপনার বাড়িতে বাস করলে ভারতীয় জীবনযাত্রা সম্বন্ধে আমি জ্ঞান লাভ করতে পারবো এবং এখানকার রীতিনীতিও আয়ত্ত করা যাবে সহজে। এ তো আমার সৌভাগ্যের কথা।"

নিক্‌সনের বাসস্থান সম্পর্কে সেই ব্যবস্থাই করা হইল এবং ইহার মধ্য দিয়া অলক্ষ্যে তাহার জীবনধারায় ঘটিল এক দূরপ্রসারী পরিবর্তনের সূত্রপাত।

উপাচার্য ডঃ জ্ঞানেন্দ্র চক্রবর্তীর স্ত্রী মণিকাদেবী রোনাল্ড নিক্‌সনকে গ্রহণ করিলেন পরম স্নেহে এবং পুত্রজ্ঞানে। মণিকাদেবীর মধ্যে নিক্‌সন কি দেখিলেন তাহা তিনিই জানেন, কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যেই দেখা গেল তিনি তাহাকে 'মা' বলিয়া ডাকিতে শুরু করিয়াছেন। আনন্দরূপিণী, সদা হাস্যময়ী, এই বর্ষীয়সী মহিলা ছিলেন সহজ নেতৃত্বের অধিকারিণী। এই অধিকার নিক্‌সনও সেদিন নিজের অলক্ষ্যে মানিয়া নিলেন।

মণিকাদেবী কহিলেন, "না বাবা, তোমার ঐ নিক্‌সন নামে আমি আর তোমায় ডাকছিনে। ভারতে এসেছো, ভারতের সব কিছুকে ভালোবেসে, তাই একটা ভারতীয় নামই তোমায় দেওয়া যাক্, কি বল ?

"বেশ তো মা, আপনার খুশী মতো, নূতন নামই তা হলে একটা দিন।" আনন্দে গদ্‌গদ হইয়া উত্তর দেন নিক্‌সন।

"হ্যাঁ, বাবা, আজ থেকে তোমায় আমি গোপাল বলে ডাকবো। 'গোপাল' এদেশের মায়েদের অন্তরের ধন। এমনটি পৃথিবীর আর কোথাও নেই।"

"মা, আমি আপনার গোপাল হয়েই থাকবো।" সোৎসাহে সম্মতি জ্ঞাপন করেন নিক্‌সন।

মণিকাদেবীর দুইটি কন্যা, কোনো পুত্রসন্তান নাই। এখন হইতে

এই তরুণ সুদর্শন ইংরেজ তনয়ের উপরই বর্ষিত হইতে থাকে তাঁহার মাতৃহৃদয়ের উদার অফুরন্ত অপত্যস্নেহ।

অধ্যাপনার কাজ শুরু করিয়া দেন রোনাল্ড নিক্‌সন, এই সঙ্গে তৎপর হইয়া উঠেন ভারতের ধর্ম ও সংস্কৃতির জ্ঞান আহরণে। বুদ্ধের জীবন ও বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে পূর্ব হইতেই তাঁহার একটা আকর্ষণ ছিল, এবার বৌদ্ধ সাহিত্যের অধ্যয়ন ও ধ্যান ধারণায় নিবিষ্ট হইলেন। কিছুদিনের মধ্যে উপলব্ধি করিলেন, মূল বৌদ্ধশাস্ত্র পালি ভাষায় লেখা, ইহার মর্মে প্রবেশ করিতে হইলে পালি শিক্ষা করা দরকার। বহু পরিশ্রম করিয়া, অল্প সময়ের মধ্যে ঐ ভাষা তিনি আয়ত্ত করিয়া ফেলেন। তারপর একে একে শেষ করেন বৌদ্ধবাদের প্রধান গ্রন্থগুলি। কিন্তু এই তত্ত্ব ও সাধনায় নিক্‌সন তৃপ্ত হইতে পারেন কই? সমগ্র জীবনের মূলে তাঁহার প্রচণ্ড নাড়া পড়িয়া গিয়াছে, আধ্যাত্মিক চেতনা জাগিয়া উঠিয়াছে প্রবলভাবে। নিক্‌সন এবার ভারতের সনাতন ধর্ম দর্শন ও সাধনার অনুধাবন করিতে চান, প্রবেশ করিতে চাহেন মর্মমূলে।

এখন হইতে বেদ উপনিষদ, গীতা অধ্যয়নে তিনি নিবিষ্ট হইয়া পড়েন। একাগ্রতা ও নিষ্ঠা তাঁহার জন্মগত বৈশিষ্ট্য, তাই সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপন্ন হইয়া মূল শাস্ত্রগ্রন্থগুলির তত্ত্ব তিনি উদ্‌ঘাটন করিতে থাকেন।

রোনাল্ড নিক্‌সন তখন শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃতী অধ্যাপকরূপেই সুপরিচিত নন, লখনৌর সমাজজীবন ও অভিজাত-চক্রের তিনি তখন এক বড় আকর্ষণ। সুগৌরকান্তি, দীর্ঘ সুঠাম দেহ, আয়ত নীল নয়ন দুটি অসামান্য বুদ্ধির দীপ্তিতে সদাই ঝক্‌ঝক্ করিতেছে। সাহিত্য, সংস্কৃতি, দর্শন, রাজনীতি যে কোনো বিতর্কে ফুটিয়া উঠে তাঁহার একটা নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী। তীক্ষ্ণোজ্জ্বল বুদ্ধি মুহূর্তে যে কোনো সমস্যার মূলদেশে গিয়া প্রবেশ করে।

শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা প্রতিভাধর তরুণ অধ্যাপক নিক্‌সনকে ভালোবাসেন, সমীহ করেন। ছাত্র ছাত্রীরা তাঁহার ব্যক্তিত্বে ও

পাণ্ডিত্যের ঔজ্জ্বল্যে মুগ্ধ। আর অভিজাত পরিবারের কন্যার মাতারা অনেকেই তখন লুব্ধ নেত্রে তাকাইয়া আছেন এই প্রিয়দর্শন তরুণ অধ্যাপকের দিকে।

বহিরঙ্গ জীবনে, সামাজিক উৎসব, নিমন্ত্রণ ও চা-চক্রে নিক্‌সনকে সদাই দেখা যায় হাস্যময় এবং প্রাণচঞ্চল। কিন্তু অন্তরের গোপন মর্মকোষে একটু নাড়া দিলেই বাহির হইয়া আসে তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ। একটু লক্ষ্য করিলেই বুঝা যায়, জীবনের গভীরতর স্তরে ডুবুরীর মতো কোন পরম ধন যেন তিনি হাতড়াইয়া ফিরিতেছেন, যা কিছু শাশ্বত, যা কিছু অমৃতময় তাহার জন্য সমগ্র জীবনচেতনা তাঁহার হইয়া রহিয়াছে কেন্দ্রীভূত। ভারতীয় সাধনা ও আত্মিক জীবনের সংস্কারের প্রতি একটা সহজ মমত্ব ও ঐক্যবোধ ধীরে ধীরে তাঁহার মধ্যে জাগিয়া উঠিতেছে।

উপাচার্য জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ছিলেন লখনৌর শিক্ষিত ও অভি জাত সমাজে শীর্ষ স্থানীয়, আর তাঁহার পত্নী, বর্ষীয়সী রূপসী মহিল মণিকাদেবী ছিলেন সেই সমাজের মধ্যমণি। যে কোনো পার্টি, অ্যাট্ হোম এবং উৎসবের প্রাণ ছিলেন মণিকাদেবী। ভারতীয় খানদানি রীতিনীতি যেমন তিনি জানিতেন, তেমনি রপ্ত ছিলেন ইয়োরোপ ' আমেরিকার আধুনিক আদব কায়দায়। স্বামীর সঙ্গে বিশ্বের বহু স্থানে তিনি ঘোরাফেরা করিয়াছেন, শিক্ষা দীক্ষা ও সংস্কৃতির অনেক কিছু করিয়াছেন আহরণ।, তাই পার্টি বা মজলিসে মণিকাদেবীর জুড়ি তখনকার লখনৌ শহরে আর ছিল না। যে কোনো মিলন সভা বা উৎসবে হাসি আনন্দের ফোয়ারা তিনি খুলিয়া দিতেন, গল্পগুজবে মাতাইয়া রাখিতেন সবাইকে।

এই সব উৎসবে রোনাল্ড নিক্‌সনও যোগ দিতেন সোৎসাহে সবার সঙ্গে উপভোগ করিতেন সামাজিক জীবনের আনন্দ রঙ্গ। কিন্তু আসলে তাঁহার সবটা মন এবং সবটা দৃষ্টি পড়িয়া থাকিত হাস্যলাস্যময়ী মণিকাদেবীর উপর। নিক্‌সন লক্ষ্য করিয়াছেন,

মণিকাদেবীর বহিরঙ্গ জীবনের এই হৈ-হুল্লোড় ও হাসি উচ্ছ্বাসটাই তাঁহার বড় পরিচয় নয়, এই উচ্ছ্বাসের ভিতরকার স্তরে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে আর একটা রহস্যঘন জীবন, সে জীবন—আত্মিক চেতনায় প্রোজ্জ্বল, প্রেমভক্তির মাধুর্যে রসায়িত।

বেশ কিছুদিন যাবৎ, নিক্‌সনের অন্তর্দৃষ্টিতে এ বৈশিষ্ট্যটি ধরা পড়িয়াছে। আধুনিক ধরনের ফ্যাসানে সাজসজ্জা করেন মণিকাদেবী, মুখে স্থগন্ধ পাউডার, ঠোঁটে লিপস্টিক মাখানো। সিগারেটের ধোঁয়া ছড়াইয়া এ টেবিলে হইতে ও টেবিলে ঘুরিতেছেন, আর হাসি গল্পে মাতাইয়া তুলিতেছেন বন্ধু বান্ধবী ও অভ্যাগতদের। কিন্তু এই রসরঙ্গের মধ্যে হঠাৎ এক সময়ে ঘটে ছন্দপতন। অদ্ভুত ভাবান্তর দেখা যায় তাঁহার চোখে মুখে, দ্রুতপদে হল্‌ঘর হইতে বাহির হইয়া আসেন, সরাসরি আপন কক্ষের এক কোণে গিয়া নিভৃতে করেন আত্মগোপন।

কি এই ভাবান্তরের রহস্য? কেনই বা হঠাৎ এমনভাবে বন্ধু বান্ধবীদের হইতে নিজেকে তিনি বিচ্ছিন্ন করিয়া নেন? নানা চিন্তা ও দুশ্চিন্তা খেলিয়া যায় নিক্‌সনের মনে। একি মণিকাদেবীর কোনো শারীরিক অসুস্থতা? স্নায়বিক দৌর্বল্যের কোনো উপসর্গ? যদি এসব কিছু না ঘটিয়া থাকে তবে হয়তো ইহার পিছনে রহিয়াছে কোনো অলৌকিক রহস্য। দুর্জ্ঞেয় অপার্থিব লোকের হাতছানি হঠাৎ কখন আসিয়া পড়ে, আর অমনি তিনি সরিয়া পড়েন লোকলোচনের সম্মুখ হইতে, একান্তভাবে নিজেকে গুটাইয়া নেন নিজস্ব গণ্ডীর মধ্যে।

নিক্‌সন মনে মনে স্থির করিলেন, মায়ের এই আকস্মিক অন্তর্ধানের রহস্য তাহাকে ভেদ করিতে হইবে, নতুবা তাঁহার নিজের মনের অশান্তি দূর হইবে না।

চক্রবর্তী ভবনে সেদিন এক বড় মজলিস বসিয়াছে। হাসি আনন্দ গানে গল্পে সবাই মশগুল, নিক্‌সন লক্ষ্য করিলেন, মণিকাদেবী হঠাৎ কেমন যেন উন্মনা হইয়া পড়িলেন। তারপর নীরবে সবার পাশ কাটাইয়া তাড়াতাড়ি চলিয়া গেলেন নিজের কক্ষে।

তাঃ

মজলিস তখনো জমজমাট। কিছুক্ষণ বাদে নিক্‌সনও বিদায় নিলেন, সেখান হইতে ছুটিয়া আসিলেন তাঁহার মায়ের কাছে। দুয়ারে দাঁড়াইয়া দেখিলেন এক অদ্ভুত দৃশ্য। সুসজ্জিত কক্ষের এক কোণে মা ঋজুভঙ্গীতে ধ্যানস্থ হইয়া বসিয়া আছেন, নয়ন দুটি নিমীলিত, দেহ নিস্পন্দ, বাহ্যচৈতন্য নাই।

নির্নিমেষে অবাক্ বিস্ময়ে এই ধ্যানাবিষ্টা মাতৃমূর্তির দিকে চাহিয়া আছেন রোনাল্ড নিক্‌সন। ভাবিতেছেন, এ কোন্ দৈবীলীলা? লখনৌর অভিজাত মহলের মক্ষীরানী মণিকাদেবীর একি অভাবনীয় নূতন. রূপ। সব চাইতে আশ্চর্যের কথা, যে মাকে নিক্‌সন এমন প্রগাঢ়ভাবে শ্রদ্ধা করেন, ভালোবাসেন, তাঁহার এই মহিমময়ী রূপটি আজ অবধি তাঁহার কাছে ধরা পড়ে নাই! আত্মিক জীবনের অন্তঃসঞ্চারী ফল্গুধারাটি গোপনেই এতদিন বহিয়া চলিয়াছে, বাহিরের লোক ঘুণাক্ষরেও তাহা জানিতে পারে নাই।

ধ্যানাবস্থা হইতে ব্যুত্থিত হইলেন মণিকাদেবী, বাহ্যচেতনা এবার ধীরে ধীরে ফিরিয়া আসিল, আর কপোল বাহিয়া ঝরিতে লাগিল পুলকাশ্রুর ধারা। অতীন্দ্রিয়লোকের মধুময় দৃশ্য মণিকাদেবী এতক্ষণ সম্ভোগ করিয়াছেন, তাহারই আনন্দ শিহরণে কম্পিত হইতেছে সর্বদেহ, নয়নে বহিতেছে দরবিগলিত ধারা।

খানিক বাদেই সুস্থ ও স্বাভাবিক হইয়া উঠেন মণিকাদেবী। তাড়াতাড়ি উপস্থিত হন ড্রেসিং টেবিলের সম্মুখে, অশ্রুসিক্ত কপোল মুছিয়া ফেলেন, নূতন করিয়া রুজ্ পাউডার লাগাইয়া আসিয়া দাঁড়ান ঘরের দুয়ারে।

নিক্‌সন তখনো সেখানে নীরবে নিস্পন্দভাবে দণ্ডায়মান। মা বাহিরে আসিতেই ঝটিতি অগ্রসর হইয়া নিবেদন করেন সশ্রদ্ধ প্রণাম, গদ্‌গদ স্বরে বলেন, "মা, তোমার অনুমতি না নিয়েই তোমার এই স্বর্গীয় দৃশ্য এতক্ষণ দেখছিলুম। আর ভাবছিলুম, মা হয়ে ছেলেকে কি ফাঁকিই তুমি এতদিন দিয়ে এসেছো। মায়ের ধনে ছেলেরই তো অধিকার। তাই না মা?"

সস্নেহে নিক্‌সনের চিবুকটি স্পর্শ করিয়া বলেন মণিকাদেবী, "গোপাল, তুমি তাহলে এসব দেখে ফেলেছো! ভালোই হল। সব কথা তোমায় খুলে বলবো, বাবা। কিন্তু আজ নয়, কাল বলবো সব খুলে। পার্টি চলছে আজ বাড়িতে। চলো তাড়াতাড়ি ওদের কাছে যাওয়া যাক্। সত্যি, বড্ডো অভদ্রতা হয়েছে আমার দিক থেকে। আমার বাড়িতে রিসেপশান, আর আমি এড়িয়ে রয়েছি ওদের, ছি-ছি।"

আবার অভ্যাগতদের মধ্যে আসিয়া হাজির হন মণিকাদেবী। হাস্যে লাস্যে ও সরস বাচন ভঙ্গীতে মাতাইয়া তোলেন বন্ধু বান্ধবীদের। তারপর অতিথিরা তৃপ্তমনে একের পর এক তাঁহার ভবন হইতে বিদায় নেন।

পরের দিন প্রাতরাশের পর নিক্‌সনকে একান্তে ডাকিয়া নেন মণিকাদেবী। বলেন, "গোপাল, এবার তোমায় সব কথা খুলে বলছি। তুমি ঠিকই ধরেছো, বেশ কিছুদিন যাবৎ বড়ো বদলে গেছি আমি। পুরোনো জীবনধারায় ছেদ পড়ে গিয়েছে।"

"তাই তো মা, এত কাছে থেকেও আমি তোমার খোঁজ পাচ্ছিনে।"—মন্তব্য করেন নিক্‌সন।

"গোপাল, আমাদের এই বহিরঙ্গ জীবনটা আসলে কিছু নয়। দেহ আর মনের আড়ালে রয়েছে—আত্মা। সেই আত্মিক স্তরে যখন তরঙ্গ ওঠে মানুষ তখন বদলে যায়; পরম আত্মা যিনি, ভগবান্ যিনি, তাঁর চরণে গিয়ে সে আছড়ে পড়ে। আমার জীবনে তাই ঘটতে শুরু করেছে।"

"মা, এটা কি ঘটেছে তোমার সঙ্গে আমার সাক্ষাতের পরে, না আগে? প্রশ্ন করেন নিক্‌সন।

"আগে থেকেই গোপাল। জানতো, আমার স্বামী শুধু এদেশের একজন শ্রেষ্ঠ শিক্ষাবিদ্ই নন, থিয়োসফি আন্দোলনের অন্যতম নেতা এবং একজন বড় দার্শনিক তিনি। তাঁর সঙ্গে থিয়োসফি নিয়ে

আমিও মেতে ছিলাম বহুদিন। এ নিয়ে ইয়োরোপ আমেরিকায় কম ঘোরাঘুরিও করি নি। কিন্তু থিয়োসফির তত্ত্ব আর অলৌকিক কাহিনীতে আত্মার ক্ষুধা মিটল না, জীবনে এল না পরম শান্তি। স্বামী তাই ঝুঁকলেন বৈষ্ণব দর্শন ও ধ্যান ধারণার দিকে। আর আমি? ঝুঁকে পড়তে গিয়ে, আমি গেলাম একেবারে ডুবে। জন্মগত সংস্কার ছিল ভক্তিপ্রেমের, তাই কে যেন আমায় হিড়হিড় ক'রে টেনে নিয়ে গেল প্রেমের ঠাকুর শ্রীকৃষ্ণের চরণতলে। দীক্ষা নিলাম বৃন্দাবনে গিয়ে, রাধারমণজীউ মন্দিরের বালকৃষ্ণ দাস গোস্বামীর কাছ থেকে।"

"তা হলে, মা, তুমি এতদিন গোপনেই চালিয়ে যাচ্ছো তোমার সাধনভজন?"

"হ্যাঁ গোপাল, আমার এ ভজনময় জীবন বাইরে আমি প্রকাশ করিনে। কিন্তু বাবা, আমার ঠাকুর যে বড়ো দুষ্টু, বড়ো লীলা-চপল। স্থান নেই অস্থান নেই, সময় নেই অসময় নেই, হঠাৎ ডেকে নেন তাঁর কাছে। কৃষ্ণের চরণ থেকে নেমে আসে আলোর ধারা, আমার সবকিছু ওলোটপালোট হয়ে যায়, বাহ্যচৈতন্য হারিয়ে ফেলি। আমার দিক থেকে তেমন কিছুই করিনে আমি, আমার কৃষ্ণ নিজেই আমায় আকর্ষণ ক'রে নিচ্ছেন, বার বার অবগাহন করাচ্ছেন তাঁর অমৃত সায়রে।"

একি অদ্ভুত লীলাকাহিনী নিক্‌সন শুনিতেছেন তাঁহার মায়ের মুখে? আনন্দে বিস্ময়ে তিনি অভিভূত।

মা'কে প্রণাম করেন ভক্তিভরে, করজোড়ে বলেন, "মা, যে পথে তুমি অগ্রসর হয়েছো, সেই কৃষ্ণপথে আমায় নিয়ে যাও। মায়ের সম্পদেই তো ছেলের অধিকার।"

"গোপাল, তুমি ঠিকই বলেছো, কিন্তু এজন্য তো প্রস্তুতি চাই, বাবা। আমি এতদিন লক্ষ্য করেছি, বৌদ্ধ ধর্মসাহিত্য পড়ার ঝোঁক তোমার চলে গিয়েছে। এ দুটো বৎসর উপনিষদ আর গীতা তুমি গভীরভাবে পড়েছো। ভালোই হয়েছে, হিন্দুধর্মের মূল তত্ত্বটি

তোমার জানা হয়েছে। এবার তুমি প্রেম ভক্তি-ধর্মের শাস্ত্র পাঠ করো, স্মৃতি পুরাণের কাহিনী জেনে নাও। সেই সঙ্গে শুরু করো রাধা কৃষ্ণের ধ্যান জপ ও ভজন। কৃষ্ণের কৃপা তোমার ওপর হবে, বাবা।"

রোনাল্ড নিক্‌সনের জীবনে এবার আসে এক নূতনতর ভাবের জোয়ার, এ জোয়ারে ভাসিয়া যায় তাঁহার বিগত জীবনের সকল কিছু সংস্কার ও ধ্যান ধারণা। কৃষ্ণতত্ত্ব ও কৃষ্ণ কাহিনী অনুধাবন করিতে থাকেন গভীরভাবে, কৃষ্ণপ্রেমের আলোকে আলোকিত হইয়া উঠে তাঁহার সমগ্র জীবন।

এ সময়ে লখনৌর জীবনে হঠাৎ ছেদ পড়িয়া যায়। মণিকা-দেবীর স্বামী জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদ গ্রহণ করেন। সপরিবারে তিনি চলিয়া আসেন বারাণসীতে। রোনাল্ড নিক্‌সন শুধু চক্রবর্তী পরিবারভুক্তই নন, জ্ঞানেন্দ্রনাথ ও মণিকাদেবীর তিনি পুত্রস্বরূপ। তাই নিক্‌সনও এই সময়ে লখনৌর কাজ ছাড়িয়া দিয়া গ্রহণ করেন বারাণসী বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ইংরেজী অধ্যাপকের পদ।

লখনৌর বন্ধু ও শুভানুধ্যায়ীরা উদ্বিগ্ন হইয়া উঠেন নিক্‌সনের জন্য। তাঁহারা চাপিয়া ধরেন, বলেন, কি অদ্ভুত খেয়ালীপনা তোমার বলতো? এখানকার ইউনিভার্সিটিতে যে সম্মান, যে টাকা পাচ্ছো বেনারসে গেলে তার অর্ধেকও তো তুমি পাবে না। এখানে পাচ্ছো আটশো টাকা, ওখানে তিনশোর বেশী তোমায় দেবে না। কি ক'রে চলবে তোমার?"

নিক্‌সন হাসিয়া উত্তর দেন, "একটা লোকের তিনশো টাকার বেশী কেনই বা দরকার হবে, বলতো? কোনো বিলাসিতা আমার নেই, সামান্য নিরামিষ আহার করি, কম্বলে শুয়ে থাকি। ঐ টাকাটাই তো আমার পক্ষে বেশী।"

"লখনৌতে থাকলে অদূর ভবিষ্যতে এখানকার ভাইস-চ্যান্সেলার হতে পারবে তুমি, সে কথাটা কি একবার ভেবে দেখেছো?"

সকৌতুকে বন্ধুদের কথা শুনিতেছেন নিক্‌সন, আর পাইপ টানিতেছেন। একরাশ ধোঁয়া ছাড়িয়া সহাস্যে কহিলেন, "তোমরা কি ভেবেছো, নিজের দেশ ছেড়ে আত্মীয় স্বজনদের মায়া কাটিয়ে সাত সমুদ্রের এপারে এদেশে আমি এসেছি শুধু একটা মোটা মাইনের চাক্‌রি নিতে, আর ভাইস-চ্যান্সেলার হতে? যে পরম পথের সন্ধানে ঘর ছেড়ে বেরিয়েছিলাম একদিন, সে পথ আমি পেয়ে গিয়েছি। আর তো আমার ফেরবার কথা ওঠে না।" একথা বলিয়া সকল বিতর্কের অবসান ঘটাইয়া দিলেন রোনাল্ড নিক্‌সন।

বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্বদিকে, লংকা পল্লীর অনতিদূরে, গঙ্গার তীরে, রাধাবাগ নামে এক বিরাট ভবন নির্মাণ করিলেন মণিকাদেবী ও উপচার্য জ্ঞানেন্দ্রনাথ। এখন হইতে এই ভবনটিকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠে একটা চমৎকার পরিবেশ। এই রাধাবাগে আরো কয়েকটি পাশ্চাত্য দেশের ভক্ত মণিকাদেবীর আশ্রয় গ্রহণ করেন, প্রেমভক্তি সাধনার পথে তাঁহারা অগ্রসর হন।

নিক্‌সনের জীবনে এবার আসে সাধনভজনের তীব্র আবেগ। আহার বিহারে শুরু করেন তীব্র কঠোরতা, রাধাকৃষ্ণের ভজন ও লীলা অনুধ্যানে দিন রাতের অধিকাংশ সময় কোথা দিয়া কাটিয়া যায়, তাহার হুঁশ থাকে না। কখনো গঙ্গাতীরের মৃত্তিকা গোফায় কখনো বা রাধাবাগের ছাদের নিভৃত কোণে ধ্যান ভজনে তিনি নিমগ্ন থাকেন। এ সময়ে কাশীর যেসব জিজ্ঞাসু ভক্তেরা রাধাবাগে যাইতেন, বিস্মিত হইতেন বিদেশী ভক্ত রোনাল্ড নিক্‌সনের সাধনার কঠোরতা ও নিষ্ঠা দর্শনে।

নিক্‌সনের সাধনভজন দিন দিন যত গভীর হইতেছে, মা মণিকাদেবীর সহিতও তেমনি গড়িয়া উঠিতেছে নিবিড় অন্তরঙ্গতা ও একাত্মতা। বৈষ্ণবীয় শাস্ত্রতত্ত্ব ও সাধনভজনের যে কোনো কূট প্রশ্ন বা রহস্যের সম্মুখীন হন, নিক্‌সন অমনি ছুটিয়া যান তাঁহার মায়ের কাছে। আর মায়ের এক একটি সংক্ষিপ্ত উক্তির মাধ্যমে মীমাংসা

হইয়া যায় সকল প্রশ্নের, সর্ব সংশয় তাঁহার ছিন্ন হয়। মায়ের এই অদ্ভুত অন্তর্দৃষ্টি দেখিয়া দিনের পর দিন তিনি বিস্মিত হন, তাঁহার তত্ত্বোজ্জ্বলা বুদ্ধির আলোকে সাধনপথে চলিতে অভ্যস্ত হইয়া পড়েন নিক্সন।

সেদিন মা কহিলেন, "গোপাল, এবার তুমি ভাগবত পড়ো, আর প্রতিদিন আমার সঙ্গে বসেই তা পড়ো।"

নিক্সনের আনন্দের আর অবধি নাই। মায়ের কাছে ভাগবত অধ্যয়ন করিবেন, কৃষ্ণলীলার গূঢ় রহস্য জানিয়া নিবেন তাঁহার সাধনজাত প্রজ্ঞার আলোকে। মণিকাদেবীর নির্দেশে একখণ্ড হিন্দি ভাষায় লিখিত ভাগবত কিনিয়া আনা হইল, শুরু হইল নিত্যকার পাঠ ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ।

উত্তরকালে কৃষ্ণপ্রেম বলিতেন, "মায়ের কাছে বসে ভাগবত পড়েছি, আর শুনেছি তাঁর মুখ থেকে নিগূঢ় লীলারসের ব্যাখ্যান। তার ওপরেই তো গড়ে উঠেছে আমার সমস্ত কিছু সাধনভজন।

১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিক। রাসপূর্ণিমার আর বেশী দেরি নাই। চক্রবর্তীদের রাধাবাগ ভবনে এ সময়ে আনন্দের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। রাস উৎসব এবার সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হইবে, তাহার প্রস্তুতির জন্য সবাই ব্যস্ত।

সেদিন নিত্যকার ভজন সারিয়া আসিয়া নিক্সন মাকে প্রণাম করিলেন, যুক্তকরে নিবেদন করিলেন তাঁহার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা। কহিলেন, "মা, আমি সংকল্প করেছি, বৈষ্ণব-মন্ত্রে সন্ন্যাস দীক্ষা নেবো।"

"বেশ তো গোপাল, এ তো খুব ভালো সংকল্প।" প্রসন্ন কণ্ঠে বলেন মা।

"হ্যাঁ, আরো স্থির করেছি, তোমার কাছ থেকেই আমি এ সন্ন্যাস নেবো।"

"তা কি ক'রে হয়, বাবা? আমি মন্ত্র দিতে পারি, কিন্তু সন্ন্যাস তো আমায় দিয়ে হবে না। আমি গৃহী, সন্ন্যাসী নই। শুধু সন্ন্যাসীই পারেন সন্ন্যাস দীক্ষা দিতে।"

"এত সব আমি জানিনে মা, জানতেও চাইনে। কিন্তু এটা স্থির, তোমার কাছ থেকে ছাড়া আর কারুর কাছে আমি সন্ন্যাস নেবো না।"

মা বুঝিলেন, গোপাল তাঁহার সংকল্পে অটল। দৃঢ়, ঋজু ও একনিষ্ঠ স্বভাব তাঁহার, মনে প্রাণে যে সংকল্প একবার স্থির করিয়াছে, তাহা হইতে তাঁহাকে বিচ্যুত করা কঠিন।

বেশ কিছুক্ষণ নীরবে নিমীলিত নয়নে মা বসিয়া রহিলেন, আননখানি এক দিব্য আভায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। অতঃপর কহিলেন, "গোপাল, তাই হবে। তোমার সংকল্প যাতে সিদ্ধ হয়, পরমপ্রাপ্তি যাতে সহজে ঘটে, তা-ই করবো। রাধারানীর অনুমতি এই মাত্র পেলাম। তবে সর্বাগ্রে আমায় যেতে হবে বৃন্দাবনে, সেখানে প্রভু বালকৃষ্ণ দাস গোস্বামীর কাছ থেকে আমি সন্ন্যাস নেবো। তারপর তোমায় সন্ন্যাস দেবার অধিকার আমি পাবো।"

সন্ন্যাস গ্রহণের পর মণিকাদেবীর নূতন নাম গ্রহণ করিলেন—যশোদা মাঈ। আর নিক্‌সনকে সন্ন্যাস দান করিয়া তিনি তাঁহার নামকরণ করিলেন—কৃষ্ণপ্রেম।

ইতিমধ্যে মনীষী শিক্ষাবিদ্ জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। তাঁহার তিরোধানের পর হইতে সাধিকা যশোদা মাঈর জীবনে শুরু হয় এক নূতনতর অধ্যায়। রাধাবাগের প্রাসাদোপম ভবন ত্যাগ করিয়া তিনি আশ্রয় নেন হিমালয়ের কোলে। আলমোড়ার চৌদ্দ মাইল দূরে মির্তোলায়, যাগেশ্বর শিবস্থানের কাছাকাছি অঞ্চলে ক্রয় করা হয় একটি নাতিবৃহৎ পাহাড়। এই পাহাড়ের উপর স্থাপিত হয় রাধাকৃষ্ণের একটি ক্ষুদ্র মন্দির এবং মন্দির ও সন্নিহিত আশ্রম-ভূমির নাম দেওয়া হয় উত্তর বৃন্দাবন।

আশ্রম এবং মন্দির নির্মাণের আগে কিছুদিন যশোদা মাঈ আলমোড়ায় বাস করিতে থাকেন। ধর্মপুত্র এবং শিষ্য কৃষ্ণপ্রেম সর্বদা ছায়ার মতো রহিয়াছেন তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে। একদিন যশোদা মাঈ কহিলেন, "গোপাল, ভিক্ষার বড় শুদ্ধ অন্ন। তাছাড়া, সন্ন্যাস নেবার

পর ভিক্ষান্ন দিয়ে দেহ ধারণ করতে হয়। আমি চাই এখানে কিছুদিন তুমি ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন ক'রে থাকো।"

মায়ের আদেশ শুনিয়া কৃষ্ণপ্রেম মহা আনন্দিত। ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে নিয়া ভিক্ষা শুরু করিয়া দিলেন আলমোড়া শহরের গৃহস্থদের ঘরে। মুণ্ডিত মস্তক, গৈরিকধারী, সুগৌরকান্তি সন্ন্যাসীর গলায় বিলম্বিত পবিত্র তুলসীর মালা। প্রশস্ত ললাটে অঙ্কিত মধ্ব বৈষ্ণবদের দীর্ঘ ত্রিপুণ্ড্রক, মাঝখানে তার কৃষ্ণবর্ণ এক সরলরেখা। ঘননীল নয়ন দুটির দিকে পথচারীরা অবাক্ বিস্ময়ে চাহিয়া থাকে। ইংরেজ বৈষ্ণব সন্ন্যাসীর এই ভিক্ষাবৃত্তি আলমোড়ার ছোট শহরটিতে চাঞ্চল্য তুলিয়া দেয়।

অল্প দিনের মধ্যেই আলমোড়ার নরনারী যশোদা মাঈ এবং তাঁহার বিদেশী শিষ্য কৃষ্ণপ্রেমের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়ে। পাহাড়ের ঢালুতে অবস্থিত কুটিরটি পরিণত হয় ভক্ত মানুষ ও দীন দুঃখীজনের আশ্রয়স্থলরূপে।

প্রায় বৎসর খানেক বাদে মির্তোলার উত্তর বৃন্দাবন আশ্রম ও মন্দিরের নির্মাণ কার্য সম্পন্ন হয়। এবার গুরু যশোদা মাঈকে নিয়া কৃষ্ণপ্রেম স্থায়ীভাবে সেখানেই বসবাস করিতে থাকেন।

পাহাড়ের কোলে স্নিগ্ধ-মধুর শান্তিময় পরিবেশে রচিত এই পবিত্র আশ্রম। ঘন সবুজ বৃক্ষরাজির পটভূমিকা, তাহার সম্মুখে নির্মিত হইয়াছে একটি নাতিবৃহৎ মন্দির। মন্দিরের পূজা-কক্ষে শ্বেত প্রস্তরের বেদীতে বিরাজিত রাধাকৃষ্ণের নয়ন ভুলানো যুগলমূর্তি। এই যুগলমূর্তি এবং তাঁহাদের পূজা অর্চনা, আরাত্র ও ভোগরাগ প্রতিদিন অনুষ্ঠিত হয় পরম নিষ্ঠায়। শঙ্খ, ঘণ্টা ও ঝাঁঝর করতালের ধ্বনিতে সারা পাহাড় মুখরিত হইতে থাকে।

গোড়ার দিকে একটি পূজারী নিয়োগ করা হয় মন্দিরের পূজা ও বিগ্রহ সেবার জন্য। কিছুদিন পরে কৃষ্ণপ্রেম নিজেই পরম আগ্রহ ভরে এ কাজ নিজের স্কন্ধে তুলিয়া নেন। ঠাকুরের ভোগ রন্ধনের

ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিটি একসময়ে হঠাৎ অসুস্থ হইয়া পড়ে। এ অবস্থায় কৃষ্ণপ্রেমই গ্রহণ করেন ভোগ-প্রসাদ রান্নার সকল কিছু দায়িত্ব। কিছুদিন এমন নিষ্ঠা ও দক্ষতা নিয়া একাজ তিনি সম্পন্ন করেন যে সকলেই তাঁহার রান্না-করা প্রসাদের গুণগানে পঞ্চমুখ হইয়া উঠেন। ফলে ঠাকুরের ভোগ রন্ধনের কাজে কৃষ্ণপ্রেমই পাকাপাকিরূপে নিযুক্ত হইয়া পড়েন।

সাধিকা যশোদা মাঈ মাধ্ব বৈষ্ণব শাখার অন্তর্ভুক্ত, তদুপরি গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচারের প্রতি তাঁহার আকর্ষণ ছিল অত্যধিক। তাই ঠাকুর পূজা ও ঠাকুর সেবার প্রতিটি কাজ পবিত্রভাবে ও নিষ্ঠা সহকারে করার দিকে তাঁহার দৃষ্টি ছিল সদা জাগ্রত। মায়ের এই মনোভাব এবং এই নৈষ্ঠিকতার কথা কৃষ্ণপ্রেম জানিতেন। তাই এ বিষয়ে কোনো ত্রুটি বা স্খলন পতন প্রাণ থাকিতে তিনি ঘটিতে দিতেন না।

দোতলা মন্দিরের চারদিকে বিস্তারিত রহিয়াছে আশ্রম প্রাঙ্গণ। ঠাকুরের নিত্যপূজার জন্য ফুলের বাগান রচিত হইয়াছে সেখানে। মন্দিরের নিচতলায় আশ্রমিক সাধকদের বাসস্থান। আশেপাশে নির্মিত তিনটি কুটির। একটিতে স্থাপিত ক্ষুদ্র একটি পাঠাগার, আবার সেটিকে নবাগত অতিথিদের আশ্রয়কক্ষরূপেও ব্যবহার করা হয়। আর একটি ক্ষুদ্র কুটিরে রহিয়াছে স্থানীয় গরীব ছেলেমেয়েদের পড়ানোর ব্যবস্থা। গোড়ার দিকে, শরীর অসুস্থ না হওয়া অবধি, যশোদা মাঈ নিজেই ছেলেমেয়েদের পড়াইতে বসিতেন। স্নেহময়ী মায়ের ধর্মপুত্রদের মধ্যে ইউরোপ আমেরিকার সুশিক্ষিত ব্যক্তিরা যেমন ছিল, তেমনি ছিল মির্তোলা ও যাগেশ্বরের দীন দুঃখী ছেলে মেয়েরা। সবারই জন্য সদা উন্মুক্ত ছিল এই মহীয়সী জননী যশোদা মাঈর হৃদয়দ্বার।

আশ্রমের একপাশে স্বল্পব্যয়ে সাধুদের জন্য একটি ধর্মশালা তৈরি করা হয়। কৈলাস ও যাগেশ্বরের যাত্রী যে সাধু সন্ন্যাসীরা এ অঞ্চলে আসিতেন, তাঁহাদের অনেকে আশ্রয় নিতেন এখানে।

উত্তরকালে পাহাড়ের আরো একটু উঁচুতে একটি ছোট ডিসপেনসারীও স্থাপন করা হয়। রোগক্লিষ্ট দরিদ্র পাহাড়ীদের প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য এটি ব্যবহৃত হইতে থাকে।

আশ্রমের সন্নিহিত ঢালু জায়গার খাঁজে খাঁজে কিছুটা চাষের ব্যবস্থা হয়। স্থানীয় লোকদের নিয়া কৃষ্ণপ্রেম ও তাঁহার সহকর্মীরা ঐসব চাষের ক্ষেতে ফসল ফলাইতেন, আর একাজকে সবাই গণ্য করিতেন ঠাকুরের সেবারূপে।

ডাক্তার আর. ডি. আলেকজাণ্ডার ছিলেন কৃষ্ণপ্রেমের কেমব্রিজ-জীবনের বন্ধু। কৃষ্ণপ্রেমের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হইয়া তিনিও ভারতের ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতি আকৃষ্ট হন, স্বদেশ ছাড়িয়া এখানে উপস্থিত হন। কৃষ্ণপ্রেম কিন্তু এদেশে আসা মাত্রই বন্ধুকে তাঁহার পথ অনুসরণ করিতে দেন নাই। তাঁহাকে বলিয়াছেন, "অ্যালেক্, হঠাৎ ঝোঁকের বশে বা ভাবালুতার বশে, তুমি কিছু ক'রে বসো না। কিছুদিন অপেক্ষা করো, তোমার নিজের মতামতকে যাচাই করো, তারপর নাও স্থির সিদ্ধান্ত।"

আলেকজাণ্ডার একথায় রাজী হইলেন। উচ্চতর ডাক্তারী ডিগ্রি এবং চিকিৎসার দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা তাঁহার ছিল। লখনৌর এক বড় হাসপাতালে তিনি চাকুরী নিলেন, বেশ কিছুদিন সুনাম ও কৃতিত্বের সহিত কাজ চালাইয়া গেলেন। তারপর সে কাজে আর মন বসিল না, ভবিষ্যতের সকল কিছু উজ্জ্বল সম্ভাবনায় জলাঞ্জলি দিয়া শরণ নিলেন কৃষ্ণপ্রেমের কাছে, তাঁহার কাছ হইতে নিলেন বৈষ্ণবীয় মন্ত্র ও সন্ন্যাস দীক্ষা। নূতন নাম হইল—হরিদাস। মির্তোলা আশ্রমের চাষবাস আর ডিসপেনসারীর কাজ দেখাশুনার পর বাকিটা সময় হরিদাস অতিবাহিত করিতেন ঠাকুরের ধ্যান ভজনে। এই প্রতিভাধর নূতন শিষ্যের জীবনে কৃষ্ণপ্রেমের ত্যাগ তিতিক্ষা, সেবানিষ্ঠা ও ভক্তিপ্রেমের আদর্শ মূর্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

উত্তর বৃন্দাবনের অপর আশ্রমিক ছিলেন মাধব-আশীষ তাঁহার দীক্ষা গ্রহণের কাহিনীও বড় অদ্ভুত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এই

তরুণ ইংরেজ তনয় পশ্চিম বাংলায় আসেন সামরিক বিমানক্ষেত্রের গ্রাউণ্ড ইঞ্জিনিয়ার রূপে। তারপর একবার ছুটির সময় বেড়াইতে যান হিমালয় অঞ্চলে। সেখানে কৃষ্ণপ্রেমের জীবন-কথা শুনিতে পাইয়া ব্যাকুল হইয়া উঠেন, মির্তোলায় আসিয়া উপস্থিত হন কৃষ্ণপ্রেমকে দর্শন করার জন্য। এই প্রথম দর্শন পরিণত হয় প্রগাঢ় শ্রদ্ধায় ও প্রেমে। অতঃপর আনুষ্ঠানিকভাবে শিষ্যত্ব ও সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া গুরুসেবা ও কৃষ্ণসেবায় উৎসর্গ করেন তনুমনপ্রাণ।

যশোদা মাঈর কনিষ্ঠা কন্যা মতিরানীও বাস করিতেন মির্তোলার আশ্রমে। যশোদা মাঈ তিরোধানের পরে কৃষ্ণপ্রেমের কাছ হইতেই তিনি গ্রহণ করেন মন্ত্রদীক্ষা ও সন্ন্যাস। মতিরানী যতদিন বাঁচিয়া ছিলেন কৃষ্ণপ্রেমকে ডাকিতেন 'ছোট-বা', অর্থাৎ ছোটবাবা বলিয়া। আনন্দ চঞ্চল মতিরানী সকল সাধুদেরই ছিলেন স্নেহভাজন, মির্তোলার আশ্রমের দিকে দিকে সদাই তিনি ঘুরিয়া বেড়াইতেন মুক্ত বিহঙ্গিনীর মতো। কৃষ্ণপ্রেমের এই শিষ্যা ও স্নেহের দুলালী বেশীদিন জীবিত থাকেন নাই, অকালে লোকান্তরে চলিয়া যান।

গুরু সেবা আর কৃষ্ণবিগ্রহের সেবা—এই দুইটি কৃত্যের উপর সিদ্ধ সাধিকা যশোদা মাঈ আরোপ করিতেন সর্বাধিক গুরুত্ব। তাই সেবা মাহাত্ম্যের এই তত্ত্বটি ছিল কৃষ্ণপ্রেমের জীবন সাধনার ভিত্তি। দীর্ঘকালের ত্যাগ তিতিক্ষা ও একৈকনিষ্ঠার মধ্য দিয়া এই সেবাকর্মে তিনি সিদ্ধ হইয়াছিলেন, গুরুকৃপায় লাভ করিয়াছিলেন পরমপ্রভু কৃষ্ণকে, জীবন হইয়াছিল কৃতকৃতার্থ।

কৃষ্ণপ্রেমের কাছে যশোদা মাঈর প্রতিটি কথা, প্রতিটি নির্দেশ ছিল বেদবাক্যের মতো। গুরুর প্রতিটি পদক্ষেপের দিকে, নিমেষপাতের দিকে, অনন্য নিষ্ঠা নিয়া তাকাইয়া থাকিতেন, আর নিজের সাধনজীবনকে গড়িয়া তুলিতেন, নিয়ন্ত্রিত করিতেন তাঁহারই ইচ্ছা অনুসারে। গুরুর সহিত একাত্মক হইয়া গিয়াছিলেন তিনি, ফলে সাধিকা যশোদা মাঈর জীবনে যে ইষ্টকৃপা ও সিদ্ধি স্ফুরিত

হইয়াছিল, অতিশয় সহজ ও স্বাভাবিকভাবে তাহাই আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল কৃষ্ণপ্রেমের জীবনে।

গুরুর কাছে তাঁহার এই আত্মসমর্পণ এবং গুরুর সঙ্গে তাঁহার এই একাত্মকতা সম্ভব হইয়াছিল কৃষ্ণপ্রেমের নিজস্ব বিশ্বাসের শক্তি ও একনিষ্ঠা ভক্তির ফলে। চরিত্রের এই দুইটি বৈশিষ্ট্যই কৃষ্ণপ্রেমকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল চরম ত্যাগের পথে। নিজের দেশ, আত্মপরিজন ও ধর্ম সংস্কৃতি ছাড়িয়া এই মহাবৈরাগী ঝাঁপ দিয়াছিলেন কৃষ্ণ-অনুরাগের সাগরে। সারা জীবনে আর পিছন ফিরিয়া তাকান নাই।

কৃষ্ণপ্রেম সম্পর্কে শ্রীঅরবিন্দ একবার তাঁহার শিষ্য স্যাডউইক্-কে এক পত্রে লিখিয়াছিলেন: "কৃষ্ণপ্রেমের মধ্যে একটা শক্তি ছিল যার বলে তিনি বহিরঙ্গ জীবনের চিন্তাস্রোত এবং ভাবাবেগ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে রাখতে পারতেন, পৌঁছুতে পারতেন শাশ্বত জ্ঞানের উৎসস্থলে। তাঁর এ শক্তি সত্যিই বড় প্রশংসার্হ। যদি তিনি জাগতিক চিন্তাস্রোতের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলতেন তাহলে হয়তো রমঁ্যা রলঁ্যা বা এই ধরনের সংস্কৃতিবান্ মনীষীদের স্তরেই তাকে পড়ে থাকতে হতো। কিন্তু কৃষ্ণপ্রেম আসলে জীবনকে দেখেছিলেন যোগদৃষ্টির দিক থেকে, সম্যক্ দৃষ্টির দিক থেকে, এবং তাঁর জীবনসাধনায় যে প্রস্তুতি নিয়ে তিনি অগ্রসর হয়েছিলেন তা সত্যিই বিস্ময়কর। ভক্ত এবং শিষ্যের প্রকৃত আত্মসমর্পণের ভাবটি দ্রুততার সহিত এবং পরিপূর্ণরূপে তিনি গ্রহণ করেছেন। তাই তাঁর সাধনা হয়েছে এমন সাফল্যমণ্ডিত। একটি আধুনিক মানুষের পক্ষে, তা সে শিক্ষিত ইয়োরোপীয়ই হোক আর ভারতীয়ই হোক, এ সাফল্য অর্জন করা অতি কঠিন। তার কারণ, আধুনিক মানুষের মধ্যে রয়েছে অত্যধিক বিচার বিশ্লেষণ, সংশয় এবং ছন্নছাড়া ভাব, ইচ্ছে থাকলেও এ থেকে সে মুক্ত হতে পারে না। ফলে সাধন জীবনে যে আলো, যে শক্তি এগিয়ে আসছে, তা দেখে সে পিছু হটতে থাকে, তার ভেতরে সে দুর্বার বেগে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে না,

বলতে পারে না—যদি আমায় তোমার ভেতরে প্রবেশ করতে দাও, তবে এখনি আমি দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারি আমার নিজের বলতে যা আছে তার সব কিছুকে, আমার চৈতন্যকে নিয়ে যাও তোমার পরম পথ দিয়ে তোমার পরম সত্যে, তোমার ভাগবত সত্তায়। আমাদের ভেতর এ মনোভাব এবং এ প্রস্তুতি ঠিকই রয়েছে, কিন্তু সংশয় ও দৌর্বল্য করছে তার পথরোধ, একটা যবনিকা রচনা ক'রে আছে অন্তরাল। আমি আমার নিজের অভিজ্ঞতা এবং অন্যান্য সাধকদের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, সত্য উপলব্ধির পথ কখনোই এত দীর্ঘ হতে পারে না, সাধনার পথে এত ঘুরপাকও খেতে হয় না, যদি অত্যধিক বিচার বিশ্লেষণ ও সংশয়ের বাধা থেকে মুক্ত থাকা যায়। কৃষ্ণপ্রেমকে আমি প্রশংসা জানাই, তিনি অবলীলায় এবং অতি সহজে ঐ বাধা অতিক্রম করেছেন[১]।"

গুরুকৃপা এবং মাতৃস্নেহ এই দুই-ই কৃষ্ণপ্রেম লাভ করিয়াছিলেন যশোদা মাঈর নিকট হইতে। সন্ন্যাস দীক্ষা নিবার পূর্বে এবং পরে, বিভিন্ন সময়ে মায়ের মাধ্যমে বহুতর অলৌকিক লীলা তিনি দর্শন করিয়াছিলেন। ফলে কৃষ্ণ ভজনের আস্থা ও কৃষ্ণরতি তাঁহার হইয়াছিল গভীরতর। পরবর্তীকালে সিদ্ধপুরুষ কৃষ্ণপ্রেমের কৃপায় তাঁহার ভক্ত শিষ্যেরা ঐ ধরনের নানা অলৌকিক ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

যশোদা মাঈর নৈষ্ঠিক বৈষ্ণবজীবনের খুঁটিনাটি সতর্কভাবে অনুসরণ করিতেন কৃষ্ণপ্রেম। এ সম্পর্কে কোনো শৈথিল্য বা আপোস রফার স্থান তাঁহার মনে স্থান পাইত না।

বিজ্ঞানী বশী সেন এবং তাঁহার স্ত্রী জারট্রুড এমারসন সেনের সঙ্গে যশোদা মাঈ ও কৃষ্ণপ্রেমের ঘনিষ্ঠতা ছিল। মির্তোলায় আসা যাওয়ার পথে মাঝে মাঝে তাঁহারা আলমোড়া শহরে মিঃ সেনের বাংলোতে অবস্থান করিতেন। সাধুদের নৈষ্ঠিকতার কথা শ্রীমতী

১ যোগী কৃষ্ণপ্রেম : দিলীপকুমার রায়

সেনের জানা ছিল। তাঁহারা আসিলেই বাংলোর বারান্দা ধুইয়া পুঁছিয়া নূতন রন্ধন পাত্র কিনিয়া যথাযোগ্য ব্যবস্থা করিয়া দিতেন। কৃষ্ণপ্রেম এবং যশোদা মাঈ স্বহস্তে রান্না করিতেন এবং ঠাকুরের ভোগ চড়াইয়া নিজেরা করিতেন প্রসাদ গ্রহণ। এ সময়ে বশী সেন মহাশয় কৃষ্ণপ্রেমের সঙ্গে সপ্রেম ভঙ্গীতে নানা ধরনের রঙ্গ রসিকতা করিতেন।

শ্রীমতী জারট্রুড সেন লিখিয়াছেন,[১] "সেদিন আমার স্বামী কৃষ্ণপ্রেমকে ঠাট্টার সুরে বললেন, ভোগ রান্নার এসব ছ্যুৎমার্গী কাণ্ড যদি আমার বিধবা বৃদ্ধা ঠাকু'মা করতেন, তাহলে না হয় বুঝতাম। কিন্তু আপনি কেন এসব করতে যাবেন? আপনার আগেকার জীবনের পরিবেশ যে ছিল একেবারে পৃথক ধরনের। কেমব্রিজে পড়ার সময়, ছাত্রাবস্থায় নিশ্চয় প্রচুর গোমাংস আপনি খেয়েছেন, তবে আর এত সব গোঁড়ামী আর বাধানিষেধের মধ্যে আছেন কেন, বলুন তো?

"গোপাল কিন্তু একটুও বিরক্ত হলেন না এই ঠাট্টা শুনে। হেসে উঠলেন সঙ্গে সঙ্গে, আর এমন একটি উত্তর দিলেন, যা প্রত্যেকটি শ্রোতার অন্তরে জাগিয়ে তুলল প্রগাঢ় শ্রদ্ধা। এর পর আমার স্বামী আর কখনো এসব নিয়ে ঠাট্টা অথবা রসিকতা করেন নি। গোপাল বললেন, "এ যুগে ব্যক্তিগত এবং সামাজিক জীবনের সব কিছু সংযম আর নিয়ন্ত্রণই তো জানালা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হচ্ছে, আমার তো মনে হয়, এমন দুঃসময়ে নিজের ওপরে এ ধরনের সংযমের বাঁধ কিছুটা চাপিয়ে রাখা ভালো। তাছাড়া, আমার আগে যাঁরা এ পথ ধরে এগিয়েছেন, তাঁরা লক্ষ্যস্থলে ঠিকই পৌঁছে গেছেন। তাহলে আমার মতো লোক, যে সবায় এ পথে যাত্রা শুরু করেছে, তার পক্ষে কি বলা শোভা পায়—আমি এটা ক'রবো, ওটা ক'রবো না, এ নিয়ম মানবো, আর ওটা মানবো না? আমি তাই এ পথের সবটাই মেনে চলেছি।"

---

১ যোগী কৃষ্ণপ্রেম, ভূমিকা: জারট্রুড ইমারসন সেন

মির্তোলার আশ্রমে কোনো রেডিও বা খবরের কাগজ রাখা হইত না। কৃষ্ণ ও কৃষ্ণের আশ্রম নিয়া এককেন্দ্রিক জীবনযাপন করিতেন কৃষ্ণপ্রেম, সেখানে অবান্তর কোনো কিছুর প্রবেশাধিকার ছিল না। দেশ বিদেশের সমস্যা ও তৎসম্বন্ধীয় আলোচনার কোনো প্রয়োজন-বোধই তাঁহার ছিল না। তাছাড়া, কেনই বা থাকিবে? নিজে হইতে যে জীবনের উপর যবনিকা টানিয়া দিয়াছেন, সে সম্বন্ধে কোনো কৌতূহল বা অনুসন্ধিৎসা জাগ্রত থাকার তো কোনো কারণ নাই। শাশ্বত পরম সত্য, কৃষ্ণ, তাঁহার লক্ষ্যবস্তু। সেই লক্ষ্যে পৌঁছিতে হইলে সমগ্র জীবনটাকে পরিণত করিতে হইবে একটি ঋজু ক্ষিপ্রগতি ধনুঃশররূপে। আর সেই শরকে তীক্ষ্ণতর করিয়া তুলিতে হইবে পূজা অর্চনা ও ধ্যান ভজনের মধ্য দিয়া।

আলমোড়ায় সেনেদের বাংলোয় বসিয়া চা-পানের পর নানা কথাবার্তা হইতেছিল। জাতি বর্ণের প্রসঙ্গ উঠিলে কৃষ্ণপ্রেম কহিলেন, প্রাচীন যুগের জাতি বিভাগ প্রাচীন ভারতের অনেক কল্যাণসাধন করেছে, তাতে সন্দেহ নেই। আবার এটাও ঠিক যে, যে ধরনের জাতিবর্ণ বিভাগ আজকের দিনে রয়েছে তা আর টিঁকবে না, যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাকে বিদায় নিতে হবে। কিন্তু আমি জিজ্ঞেস করি, আজকাল অত্যধিক সংস্কার সাধন, শিল্পের প্রসার, পরিসংখ্যান এসব নিয়ে যে বাড়াবাড়ি আর পাগলামী চলছে, এর ফল শেষটায় কি কল্যাণকর হবে? মানুষকে কি শুধু সংখ্যাতত্ত্বে পরিণত করা হচ্ছে না? আত্মিক উন্নয়নের মূল্য কি ক্রমেই কমে আসছে না? ভারতের পক্ষে কি নিজের ঐতিহ্যের শেকড় আঁকড়ে ধরে প্রভূত কল্যাণের দিকে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়? পাশ্চাত্যের দ্বিতীয় শ্রেণীর নকলরূপেই কি তাকে গড়ে উঠতে হবে? হ্যাঁ, তবে এটা ঠিক, আমরা যে যা-ই বলি, পেছন থেকে ঠাকুরই যে টেনে চলেছেন তাঁর সুতো। তিনি যেমনি আমাদের চালাচ্ছেন, তেমনি চলছি আমরা। তিনি নাচান, আর আমরা নাচি—এইটেই হচ্ছে প্রকৃত কথা।”

চীন তখন ভারত আক্রমণ করিয়াছে। এ আক্রমণের ফল কি দাঁড়াইবে, একথা ভাবিয়া সবাই উদ্বিগ্ন। মিসেস সেনও এ সম্পর্কে তাঁহার দুশ্চিন্তা প্রকাশ করিতেছিলেন।

কৃষ্ণপ্রেম কিছুকাল নীরবে কি ভাবিতে লাগিলেন। তারপর প্রশান্ত কণ্ঠে আত্মবিশ্বাসের সুরে কহিলেন, "আপনাদের তো নিশ্চয় মনে আছে, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অর্জুনকে বধ করার জন্য অশ্বত্থামা হেনেছিলেন অমোঘ বাণ। সে বাণ ছিল ব্রহ্মাস্ত্র, কোনো কিছু দিয়েই তার প্রতিরোধ সম্ভবপর ছিল না। সেই সংকটে সারথীরূপী কৃষ্ণ তাঁর চরণ দিয়ে রথটি চেপে ধরলেন, সঙ্গে সঙ্গে রথের চাকা গেল বসে। গোটা রথটা নীচু হ'য়ে গেল, আর ঐ মারাত্মক বাণ উড়ে চলে গেল অর্জুনের মাথার ওপর দিয়ে। আমি বিশ্বাস করি, ভারতের যে-কোনো সংকটে কৃষ্ণ তেমনিভাবে তাঁর চরণ দিয়ে আমাদের চেপে ধরবেন—এদেশ রক্ষা পাবে। ভারতের আত্মা কখনো বিনষ্ট হতে পারে না।"

কৃষ্ণপ্রেম আরো বলিতেন, "ভারত হচ্ছে বিশ্বের একমাত্র দেশ যা পাশ্চাত্যের জড়বাদী সভ্যতার কাছে পরাজিত হয় নি, তলিয়ে যায় নি। কারণ, আজ অবধি তাকে বর্মের মতো ঘিরে রেখেছে, সদাই রক্ষা ক'রে চলেছে তাঁর অগণিত সিদ্ধ মহাপুরুষদের আত্মিক জ্যোতির কল্যাণ-বলয়।"

তাই আধুনিক তার্কিকেরা এ দেশের সাধু-সন্তদের পরগাছা বলিয়া অভিহিত করিলে তিনি শ্লেষের হাসি হাসিতেন, মন্তব্য করিতেন, "ভগবানের কৃপায় পাশ্চাত্য দেশে যদি এ ধরনের পরগাছা বেশী ক'রে জন্মাতো, তাহলে বোধহয় দু' দুটো বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ ধ্বংস থেকে ওদেশ রক্ষা পেতো।"

বারাণসীতে থাকার সময়ে কৃষ্ণপ্রেম একদিন বারাণসীর মাহাত্ম্য এবং শিবের জ্যোতির কথা বর্ণনা করিতেছিলেন। অতি আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত উন্নাসিক এক শ্রোতা কৃষ্ণপ্রেমকে প্রশ্ন করেন, "আচ্ছা বলুন দেখি, এই ধুলো কাঁকরময় বিশ্রী শহরে আপনি শ্রদ্ধা কররার মতো সত্যই কি কিছু পেয়েছেন?"

কৃষ্ণপ্রেমের চোখ মুখ দিব্য আভায় উদ্‌ভাসিত হইয়া উঠে। প্রসন্ন মধুর কণ্ঠে বলেন, "পেয়েছি বই কি, বন্ধু। পেয়েছি এখানে সোনার ধুলো কাঁকর, আর গঙ্গার স্বর্গীয় সংগীত।" প্রত্যয়-সমুজ্জ্বল সাধকের চোখ মুখের ভাব আর শ্রদ্ধাপূর্ণ উক্তি শুনিয়া প্রশ্নকর্তার মুখে কোনো কথা সরিল না।

গুরু যশোদা মাঈ সম্পর্কে একবার আমরা কৃষ্ণপ্রেমকে প্রশ্ন করিয়াছিলাম। কি তিনি পাইয়াছেন তাঁহার মায়ের কাছে, কিভাবে পাইয়াছেন, তাহাও জানিতে চাওয়া হইয়াছিল। প্রশান্ত কণ্ঠে তিনি উত্তর দিলেন, "আমার একটা বড়ো সুবিধে—মা, গুরু আর কৃষ্ণ, একই পথের ধাপ বেয়ে আমার কাছে এসে গেছেন। মা কি কোনোদিন সন্তানকে বর্জন করতে পারে? যত দুর্বল যত দুষ্কৃতই হোক না কেন, মা তাকে দু'হাত দিয়ে আগলে রাখবেন। আমার এই মা-ই আবার আমায় দিয়েছেন সাধন-আশ্রয়। তারপর সিদ্ধা মাতা আর সিদ্ধা গুরুর মাধ্যমে পরম প্রভু কৃষ্ণও এসেছেন আমায় কৃপা করতে। মার থেকে স্নেহরস ধারা যেমনি স্বাভাবিকভাবে এসেছে, আমিও তা পান করেছি স্বাভাবিকভাবে। জীবন আমার কৃতার্থ হয়ে উঠেছে। সর্বদাই ভেবে এসেছি, কৃষ্ণও যদি আমায় ত্যাগ করেন, মা—সদ্‌গুরুরূপী মা, আমায় কখনো ফেলে দেবেন না তাঁর আশ্রয় থেকে।"

১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে যশোদা মাঈর তিরোধানের পরে মির্তোলার আশ্রমে নামিয়া আসে শোকের কৃষ্ণচ্ছায়া। আর এ শোক তীক্ষ্ণ শায়কের মতো বিদ্ধ হয় গুরুগতপ্রাণ কৃষ্ণপ্রেমের বক্ষে। জীবনে এমন দুঃসহ আঘাত আর কখনো তিনি পান নাই।

এইসময়ে শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায়ের কাছে শোকসংবাদ জ্ঞাপন করিয়া তিনি লিখিয়াছিলেন, "...গলস্টোনের ব্যাধিতে মা মরদেহ ত্যাগ ক'রে চলে গেছেন। দেহান্তের সময় যে পরিপূর্ণ শান্তি বিরাজ করছিল তাঁর ভেতরে তা অবর্ণনীয়। কৃষ্ণ দর্শনের পরিতৃপ্তির আভা ছড়িয়ে পড়েছিল তাঁর চোখে মুখে, মনে হচ্ছিল

বিগত জীবনের বৎসরগুলো সব যেন ঝরে পড়ে গেছে তাঁর দেহ থেকে। আমি ঠিক জানি, তিনি এখনো আমাদের মধ্যে বিরাজ করছেন, এবং আগের চাইতে আরো ঘনিষ্ঠতর রূপেই রয়েছেন, তবু তাঁর দৈহিক সান্নিধ্য হারিয়ে ফেলার ক্ষতি যেন আমি সহ্য করতে পারছিনে। যদিও আমি জানি কৃষ্ণের অবিস্মরণীয় কথা—বৃন্দাবনের ব্রাহ্মণ পত্নীদের তিনি বলেছিলেন—দৈহিক সান্নিধ্য দিয়ে তো শ্রীভগবান্‌কে কখনো লাভ করা যায় না। মা আমাদের আগে থেকেই বলেছিলেন, তাঁর শেষ সময় আসন্ন। কিন্তু এত শীঘ্র যে তিনি চলে যাবেন তা ভাবতে পারি নি। তুমি তো জানো, মা আমার কাছে কোন্ পরমবস্তু ছিলেন—বিশ বছরের অধিক কাল তিনি ছিলেন আমার—সদ্‌গুরু, আর ছিলেন আমার মা। তিনি ছিলেন সেই কেন্দ্রটি, যার চারদিকে আমার সমগ্র জগৎ এতকাল আবর্তিত হয়েছে। এখনো তিনি সেই কেন্দ্ররূপেই বিরাজিতা রয়েছেন, কিন্তু দেহে তাঁকে দর্শন করতে পারছি না, এটাই হয়ে উঠেছে অসহনীয়।"

গুরু এবং গুরুতত্ত্বের আদর্শ সম্পর্কে কৃষ্ণপ্রেমের নিষ্ঠা ছিল অতুলনীয়। এ প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায় একটি মনোজ্ঞ বিবরণ দিয়াছেন। যশোদা মাঈ তখনো জীবিত, সে-বার তাঁহাকে নিয়া কৃষ্ণপ্রেম এলাহাবাদে অবস্থান করিতেছেন। দিলীপকুমারও তখন সেখানে, যশোদা মাঈ এবং অন্যান্য অভ্যাগতদের সম্মুখে বসিয়া সেদিন তিনি গাহিতেছিলেন শঙ্করাচার্যের রচিত প্রসিদ্ধ এক গুরুস্তোত্র। কৃষ্ণপ্রেম এই স্তোত্রসংগীত শুনিতে শুনিতে ভাবতন্ময় হইয়া গিয়াছেন।

সংগীত থামিলে, একজন ভক্ত শ্রোতা কৃষ্ণপ্রেমকে প্রশ্ন করিলেন, "গুরুর কৃপা লাভের প্রধান উপায় কি?"

উত্তর হইল, "গুরুর প্রতি একাগ্রতা ও ভক্তিনিষ্ঠা।"

"প্রার্থনা ও ধ্যান ধারণা কি গুরুকে উদ্দেশ ক'রে করতে হবে, না শ্রীভগবান্‌কে ভেবে করতে হবে?"

"দুই-ই করতে পারেন, ফল হবে একই। আসলে, দুই-ই যে এক বস্তু।"

এক কূটতার্কিক অধ্যাপক সেখানে উপবিষ্ট। কহিলেন, "তা কি ক'রে হবে? ভগবান্ একমেবাদ্বিতীয়ম্, তাঁর দ্বিতীয় কেউ নেই, আর গুরু আজকাল গজাচ্ছে পাড়ায় পাড়ায়। তাছাড়া, তন্ত্রসার তো সোজা বলে দিয়েছেন,—মধুলুব্ধ ভৃঙ্গ যেমন পুষ্প থেকে পুষ্পান্তরে ঘুরে ঘুরে মধু সংগ্রহ করে, তেমনি জ্ঞানলুব্ধ শিষ্যও এক গুরু থেকে আর এক গুরুর কাছে যাবে, আহরণ করবে জ্ঞান।"

কৃষ্ণপ্রেম বলিয়া উঠিলেন, "জানি মশাই, ও শ্লোকের কথা জানি। স্যর জন উডরফের তন্ত্রের বই-এ ঐ উদ্ধৃতি বারো বৎসর আগে আমি পড়েছি। কিন্তু উডরফ নিজেই বলেছেন, তান্ত্রিকদের মধ্যে উচ্চকোটি এবং সাধারণ, নানা স্তরের সাধক রয়েছেন। তাছাড়া, এ শ্লোকটিও তিনি সংকলন করেছেন—গুরৌ তুষ্টে শিবস্তুষ্টঃ, গুরুকে তুষ্ট করলেই শিবকে তুষ্ট করা হয়।"

তার্কিক অধ্যাপক তাঁহার খুঁটি কিছুতেই ছাড়িবেন না। বলিলেন, "আসল প্রশ্ন হচ্ছে, জ্ঞানান্বেষী সাধক বিভিন্ন গুরু থেকে জ্ঞান আহরণ করতে পারে কিনা?"

কৃষ্ণপ্রেম দৃঢ়স্বরে বলিয়া উঠিলেন, "মশাই, আপনার কিন্তু গোড়াতেই গলদ রয়েছে। শিক্ষক আর গুরুতে আপনি গোল পাকিয়ে ফেলেছেন। যে সাধক গুরুকে শুধু শিক্ষক বলে মনে করে, সে বহুগুরুর কাছে অবশ্য যেতে পারে। কিন্তু যে গুরুকে গুরুর দেহের বাইরে, সূক্ষ্মতর সত্তায় পেয়েছে, নিজের হৃদয়ের ভেতরে স্থাপন করেছে, সে কখনো স্বপ্নেও ভাবতে পারে না গুরুকে ত্যাগ করার কথা।"

যশোদা মাঈ এবার মুখ খুলিলেন। কহিলেন, "গোপাল, তুমি ঠিকই বলেছো। যে সাধ্বী স্ত্রী তার স্বামীকে সারা মনপ্রাণ দিয়ে ভালোবেসেছে, সত্যিকার ভালোবাসার স্বাদ পেয়েছে, ভালোবাসার তৃষ্ণা মেটাতে সে কি কখনো অপর কোথাও যায়, না যেতে পারে?"

সংশয়ী, তার্কিক অধ্যাপক একথার পর তাড়াতাড়ি সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন।

তিরোধানের পরও গুরু যশোদা মাঈর দৃষ্টি তাঁহার অধ্যাত্ম-তনয় কৃষ্ণপ্রেম হইতে সরিয়া যায় নাই। অন্তরঙ্গ ভক্ত ও বন্ধুদের কাছে কৃষ্ণপ্রেম এ সম্পর্কিত কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন।

সেদিন দণ্ডেশ্বরের ঝর্ণার পাশে যশোদা মাঈর মরদেহ ভস্মীভূত হইবার পর কৃষ্ণপ্রেম ও অন্যান্য ভক্তেরা আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন। সারা দিন দুশ্চিন্তা ও ছুটাছুটিতে কাটিয়াছে, দেহ অতিশয় পরিশ্রান্ত। শয্যায় শয়ন করার পর আসিল গভীর নিদ্রা। অভ্যাসমতো শেষ রাত্রে উঠিয়া প্রত্যহ তিনি ধ্যান ভজন করেন, কিন্তু সেদিন দেহ অবসন্ন, তাই যথাসময়ে নিদ্রা ভাঙে নাই। হঠাৎ এসময়ে তিনি শুনিতে পান বিদেহী যশোদা মাঈর কণ্ঠস্বর, "গোপাল, একি, এখনো ঘুমিয়ে আছো? ভজনে বসবার সময় যে চলে যাচ্ছে" একটু থামিয়া, আশ্বাসের সুরে মা আবার বলিলেন, "গোপাল, আমি কিন্তু এখনো আগের মতো তোমার পাশে রয়েছি।"

কৃষ্ণপ্রেম ধড়মড় করিয়া উঠিয়া পড়েন। মায়ের কণ্ঠস্বর শুনিয়া দুইচোখ সজল হইয়া উঠে, কাতর স্বরে বলিয়া উঠেন,"মা, যদি তুমি আমার পাশেই রয়েছো, তবে তোমায় দেখতে পাচ্ছিনে কেন? আর কি আমায় দেখা দেবে না?"

"না বাবা, ধাপের পর ধাপ এগিয়ে, তোমারই যে আসতে হবে আমার কাছে। তোমার সাধনা ঠিক মতো চালিয়ে যাও, এখানে এই লোকে এসে আমার দেখা পাবে।" অদৃশ্যলোকের ঐ বিশেষ চৈতন্য-স্তর হইতে যশোদা মাঈ ইহার পর আরো কিছুকাল তাঁহার গোপালকে নির্দেশাদি দিয়াছেন।. পরবর্তীকালে, এই দৈবী কণ্ঠস্বর আর শোনা যায় নাই।

আমাদের প্রীতিভাজন ডঃ গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় তাঁহার একবারকার একটি অভিজ্ঞতার কথা প্রকাশ করিয়াছেন। কৃষ্ণপ্রেম

ও মতিরানী সে সময়ে বৃন্দাবনে গিয়াছেন। তাঁহাদের আহ্বান পাইয়া কাশী হইতে গোবিন্দগোপালও সেখানে গিয়া উপস্থিত হন। সবাই মিলিয়া কুঞ্জে কুঞ্জে ঘুরিতেছেন, ঠাকুর দর্শন করিতেছেন; ভজন কীর্তন ও অন্তরঙ্গ কথাবার্তায় দিন বেশ আনন্দে কাটিতেছে।

ইতিমধ্যে গোবিন্দগোপালের দাদার এক টেলিগ্রাম সেখানে হাজির। কৃষ্ণপ্রেমের সহিত তাঁহার দীর্ঘদিনের বন্ধুত্ব, তিনি সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইয়াছেন, মির্তোলায় ফিরিবার আগে কৃষ্ণপ্রেম যেন তাঁহার কাছে বৈদ্যনাথধামে একবার অবশ্য যান।

সেখানে যাওয়া সম্পর্কে সোৎসাহে আলাপ আলোচনা চলিতেছে, এসময়ে কৃষ্ণপ্রেম হঠাৎ কহিলেন, "তোমরা একটু অপেক্ষা করো, আমি ভেতর থেকে আসছি।"

কিছুক্ষণ পরে নিজকক্ষ হইতে বাহির হইয়া আসিয়া গম্ভীরকণ্ঠে তিনি কহিলেন, "মায়ের নির্দেশ এইমাত্র আমি পেলাম। বললেন, 'সরাসরি মির্তোলায় চলে যাও। সেখানে তোমাদের উপস্থিতির প্রয়োজন আছে। ব্যাপারটা খুব জরুরী।"

ত্রস্তব্যস্ত হইয়া কৃষ্ণপ্রেম মির্তোলায় গিয়া উপস্থিত হন। দেখেন, আগের দিন ভারপ্রাপ্ত পূজারীটি আশ্রম হইতে পলায়ন করিয়াছে। সেদিন তাঁহারা মির্তোলায় না পৌছিলে ঠাকুরের পূজা অর্চনা হইত না, এবং তাঁহাকে উপবাসীও থাকিতে হইত।

রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহের নানা লীলা বৈচিত্র্য উত্তর বৃন্দাবন আশ্রমের ভক্তেরা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

অধিকাংশ দিন ঠাকুরের ভোগ কৃষ্ণপ্রেম নিজেই অতিশয় শ্রদ্ধা সহকারে প্রস্তুত করিতেন। একদিন আশ্রমে খুব ভালো ঘৃত সংগৃহীত হইয়াছে। কৃষ্ণপ্রেম সযত্নে ইহা দিয়া হালুয়া তৈরি করিলেন। ভোগ নিবেদন করার পর দরজা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল, প্রাঙ্গণে বসিয়া সবাই শুরু করিলেন জপধ্যান। কিছুক্ষণ পরে কৃষ্ণপ্রেম হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইলেন, কহিলেন, "মনে হচ্ছে, ঠাকুর আজ ভোগ

আস্বাদন ক'রে খুশী হয়েছেন। চলতো, সবাই গিয়ে দেখি প্রসাদের অবস্থা কি। সত্য সত্যই আজ কিছুটা খেয়েছেন কিনা।"

যশোদা মাঈ পাশেই বসিয়াছিলেন। গোপালের কথা শুনিয়া তিনি নীরবে শুধু মুচকি হাসিলেন। অতঃপর আশ্রমিকেরা মন্দির কক্ষে ঢুকিয়া দেখেন, ঠাকুর স্থূল দেহীর মতো সত্য সত্যই সেদিন ভোগ গ্রহণ করিয়াছেন, শুধু তাই নয়, হালুয়ার বেশীটা অংশই প্রভু উড়াইয়া ফেলিয়াছেন, বালগোপালের কচি আঙুলের ছাপটি দেখা যাইতেছে স্পষ্টরূপে। এই দৃশ্য দেখিয়া সবাই মহা আনন্দিত। সোৎসাহে তাঁহারা শুরু করিলেন ভজন ও কীর্তন।

ঠাকুর এবং ঠাকুরানীর প্রেমলীলার বৈচিত্র্যও মাঝে মাঝে দেখা যাইত। একদিন প্রত্যূষে মন্দিরের দ্বার খুলিয়া কৃষ্ণপ্রেম ঘরে ঢুকিয়াছেন। শ্রীমূর্তির দিকে নজর পড়িতেই চমকিয়া উঠিলেন। একি অদ্ভুত দৃশ্য! কৃষ্ণের পায়ের সোনার নূপুর দুটি স্থানান্তরিত হইয়াছে রাধারানীর পায়ে, আর রাধারানীর সোনার হারটি চলিয়া আসিয়াছে কৃষ্ণের গলায়।

কৃষ্ণপ্রেম উচ্চ স্বরে সবাইকে ডাকিয়া আশ্রমের মন্দিরে জড়ো করিলেন। আগের রাত্রে আরতির পরে সর্বসমক্ষে শ্রীবিগ্রহের শয়ান দেওয়া হইয়াছে। তারপর সারা রাত তো মন্দিরের দুয়ার ছিল তালাবদ্ধ। ভক্তেরা মহা উল্লসিত, শ্রীবিগ্রহের এই মানুষী লীলার কথা নিয়া তাঁহারা সোৎসাহে আলোচনা করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণপ্রেমের চোখে মুখে দিব্য আনন্দের আভা। কহিলেন, "দ্যাখো দেখি ঠাকুর ঠাকুরানীর কি কাণ্ড! ভক্তের হৃদয় মঞ্চে, মন্দিরের বেদীতে, আর অপ্রাকৃত ব্রজধামে সবখানেই সেই একই লীলা-বিলাস।"

কৃষ্ণপ্রেমের সাধনার একটা বড় ধাপ—রাধারানীর কৃপাপ্রাপ্তি। এই কৃপা দিনের পর দিন তাঁহার সাধনজীবনের নানা প্রশ্নের মীমাংসা যেমন করিয়া দিত, তেমনি করিত আশ্রম জীবনের এবং বহিরঙ্গ জীবনের নানা কর্মের দিক্‌দর্শন।

কোনো ভক্ত কখনো দীক্ষাপ্রার্থী হইলে অথবা কোনো ভগবৎ-তত্ত্বের দিক্‌দর্শন প্রার্থনা করিলে কৃষ্ণপ্রেম বলিয়া উঠিতেন, "অপেক্ষা করো, রাধারানীর অনুমতি আগে নিয়ে নিই।" তারপর প্রবেশ করিতেন মন্দিরে, কিছুকাল ধ্যানাবিষ্ট থাকার পর ফিরিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসু ভক্তকে দিতেন তাঁহার প্রার্থিত সাহায্য।

জীবনের শেষ পর্যায়ে যাঁহারা তাঁহাকে দেখিয়াছেন, লক্ষ্য করিয়াছেন, তাঁহার জীবন যেন শ্রীরাধার ভাবেই আবিষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। কীর্তনে রাধার নাম, ভাষণে রাধা, আবার কাহাকেও অভিবাদন বা সম্বোধন করিতে হইলেও 'জয় রাধে'।

বন্ধুবর হেরম্ব মুখোপাধ্যায় একবার কয়েক মাস মির্তোলায় কৃষ্ণপ্রেমের অতিথিরূপে আহ্বান করেন এবং তাঁহার অশেষ স্নেহ ও কৃপালাভ করেন। এ সময়ে কৃষ্ণপ্রেমের প্রমুখাৎ রাধারানীর এক মনোজ্ঞ লীলা কাহিনী তিনি শুনিয়াছিলেন।

ভক্ত সুনীল এবং তাঁহার স্ত্রী আরতি দেবী মির্তোলার আশ্রমের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। কৃষ্ণপ্রেমের কাছে দীক্ষা প্রাপ্ত হইয়া তাঁহারা সাধনভজন করিতেন। সুনীল থাকিতেন এলাহাবাদে, আর মাঝে মাঝে অফিসের কাজে ছুটি নিয়া সপরিবারে উপস্থিত হইতেন গুরুর সকাশে।

সেবার উভয়েরই মনে প্রবল ইচ্ছা জাগিয়াছে, মির্তোলা আশ্রমে গিয়া কয়েকদিন কাটাইয়া আসিবেন। মাসের শেষ, হাতে তখন তেমন টাকাকড়ি নাই, পাথেয় কি করিয়া যোগাড় করা যায়?

ভক্তিমতী স্ত্রী আরতি এ সমস্যার সমাধান করিয়া দিলেন। হাতের সোনার বালা-জোড়া বিক্রয় করিয়া সংগ্রহ করিলেন রেল ভাড়ার টাকা। অতঃপর পরমানন্দে তাঁহারা মির্তোলার আশ্রমে চলিয়া আসিলেন।

কয়েকদিন পরের কথা। ঠাকুরের সেবা পূজা ও ভজনাদি শেষ হওয়া মাত্র কৃষ্ণপ্রেম আঙিনায় আসিয়া দাঁড়ান। হাতে তাঁহার এক জোড়া সোনার বালা। সুনীল ও আরতি কাছে আসিতেই স্নিগ্ধ

স্বরে কহিলেন, "আচ্ছা আরতি, তোমার বালা দু'গাছা কি করেছো বলতো? সত্যি ক'রে বলো।"

আরতির মুখে কোনো কথা নাই, সসংকোচে তিনি দাঁড়াইয়া আছেন।

স্মিতহাস্যে কৃষ্ণপ্রেম এবার কহিলেন, "ত্যাখো, রাধারানী এই মাত্র আমায় সব কথা জানিয়ে দিলেন। মির্তোলায় আসবার খরচ-পত্র তোমরা তাড়াতাড়ি জোটাতে পারছিলে না, তাই শেষটায় আরতির সোনার বালা বিক্রি করতে হয়েছে। তাইতো রাধারানী বললেন, 'আমার হাতের বালা জোড়া খুলে নাও, আরতিকে দিয়ে দাও। ওর হাত বড্ডো খালি দেখাচ্ছে।"

রাধারানীর নির্দেশমতো তাঁর ঐ অলংকার আরতি দেবীকে দিয়ে দেওয়া হল। ভক্তের তপস্যায় জাগ্রত উত্তর বৃন্দাবনের রাধারানী বিগ্রহ আরো বহুতর লীলা উত্তরকালে প্রকটিত করিয়াছেন।

১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের কথা। দাক্ষিণাত্যের কয়েকটি তীর্থ ভ্রমণের উদ্দেশ্যে কৃষ্ণপ্রেম সেবার মির্তোলা হইতে বাহির হইয়াছেন। প্রথমে মাদ্রাজ ও পণ্ডিচেরী হইয়া পৌঁছিলেন তিরুভন্নামালাই-এ মহর্ষি রমণের আশ্রমে। মহর্ষির জ্ঞানময় সাধন পথ এবং যশোদা মাঈর প্রেমের পথে পার্থক্য প্রচুর, তবুও এই আত্মজ্ঞানী মহাপুরুষের উপর চিরদিনই কৃষ্ণপ্রেমের অগাধ শ্রদ্ধা ছিল। মহর্ষিকে প্রণাম করিয়া দুই চারিটি প্রধান বিগ্রহ দর্শন করিয়া মির্তোলায় ফিরবেন, ইহাই তাঁহার মনোগত ইচ্ছা। মহর্ষি সন্দর্শনের মনোজ্ঞ অভিজ্ঞতার কাহিনীটি বিভিন্ন সময়ে অন্তরঙ্গ ভক্তদের কাছে কৃষ্ণপ্রেম বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার ঐ দর্শনের অব্যবহিত পরেই আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু, 'দাদাজী' ভুরাই স্বামী আইয়ার, তিরুভন্নামালাই-এ উপস্থিত হন। মহর্ষির ঘনিষ্ঠ মহল হইতে কৃষ্ণপ্রেমের দিব্য অনুভূতিময় অভিজ্ঞতার কথা তিনি শুনিয়াছিলেন। মহর্ষি এবং কৃষ্ণপ্রেমের তখনকার সাক্ষাৎকারের ঘটনাটি এইরূপ :

আহার ও বিশ্রামের পর কৃষ্ণপ্রেম মহর্ষির হলঘরে গিয়া তাঁহাকে প্রণাম নিবেদন করেন, নিচে একপাশে উপবিষ্ট হইয়া শুরু করেন ধ্যান মনন। মহর্ষি তাঁহার কৌচটিতে হেলান দিয়া শুইয়া আছেন। আয়ত নয়ন দুটির দৃষ্টি কোন্ দুর্জ্ঞেয় রহস্যলোকে উধাও হইয়া গিয়াছে। ঠোঁটের কোণে অর্ধস্ফুট প্রসন্নতার হাসি। ত্রিশ চল্লিশটি ভক্ত ও দর্শনার্থী তাঁহার সম্মুখে উপবিষ্ট। কেহ অবাক্ বিস্ময়ে এই আত্মজ্ঞানী মহাত্মার দিকে নির্নিমেষে চাহিয়া আছেন, কেহবা রত রহিয়াছেন প্রাত্যহিক এবং নিয়মিত ধ্যান জপে।

অল্পক্ষণের মধ্যেই কৃষ্ণপ্রেম দিব্য ভাবে আবিষ্ট হইয়া পড়েন। সঙ্গে সঙ্গে অন্তরের অন্তস্তল হইতে বার বার ধ্বনিত হইতে থাকে একটি অস্ফুট স্বরের প্রশ্ন—'কে তুমি? কে তুমি? কি তোমার প্রকৃত স্বরূপ?'

রাধাকৃষ্ণের প্রেমের একনিষ্ঠ সাধক কৃষ্ণপ্রেম, ভক্তিপ্রেম আর বিগ্রহ সেবায় দিনরাত থাকেন মশগুল। অন্তর্লোক হইতে উত্থিত ঐ প্রশ্ন শুনিয়া চমকিয়া উঠিয়াছেন বটে, কিন্তু গোড়ার দিকে তেমন আমল দেন নাই। কিন্তু তিনি এড়াইতে চাহিলেও, এ প্রশ্ন এবং নেপথ্যচারী প্রশ্নকর্তা তো তাঁহাকে ছাড়িতে চাহে না। আবার তাঁহার চৈতন্যের দ্বারে বার বার আসে করাঘাত। কে যেন বলিতে থাকে—কে তুমি, কে তুমি, কি তোমার স্বরূপ?

ভাবাবিষ্ট অবস্থাতেই উত্তর দিতে চেষ্টা করেন কৃষ্ণপ্রেম বলেন, "আমি কৃষ্ণের নগণ্য দাস মাত্র।"

আবার ধ্বনিত হয় দৈবী প্রশ্ন—"কে কৃষ্ণ, কে কৃষ্ণ?"

"কৃষ্ণ শ্রীনন্দের নন্দন। বংশীধর, রসময়, ভক্তের প্রাণধন।"

তবুও বিরাম নাই অন্তরাত্মা হইতে উত্থিত সেই দৈবী প্রশ্নের। এবার কৃষ্ণপ্রেম কৃষ্ণের স্বরূপ ও পরিচিতির পরিধি বাড়াইতে থাকেন, বলেন, "কৃষ্ণ অবতার, পরাৎপর, সারাৎসার। তবুও দৈবী প্রশ্নকর্তার নিরস্ত হইবার লক্ষণ নাই। অতঃপর অনন্যোপায় হইয়া কৃপাময়ী রাধারানীর শরণ নেন কৃষ্ণপ্রেম। রাধারানী বলিয়া দেন 'কৃষ্ণ

বিশ্ব সৃষ্টিতে দ্বিতীয় কোনো বস্তুর অস্তিত্ব নেই। তবে কৃষ্ণের পরিচয় কে দেবে? কে জ্ঞাপন করবে তাঁহার স্বরূপ আর মাহাত্ম্য? শুধু কৃষ্ণই যে বলতে পারেন কৃষ্ণের কথা। যতো বাচা নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসাসহ—মানুষের সাধ্য কি যে তাঁর সম্বন্ধে বলবে?"

পরের দিন প্রভাতে কৃষ্ণপ্রেম আশ্রমের হলঘরে মহর্ষির পায়ের কাছাকাছি বসিয়া আছেন। মহর্ষি একটু ঘুরিয়া বসিয়া তাঁহার দিকে করিলেন প্রসন্নমধুর দৃষ্টিপাত—অগাধ অতলস্পর্শী দৃষ্টি হইতে স্বর্গের সুধা যেন অঝোর ঝরিয়া পড়িতেছে। নীরবে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া মহর্ষি মুচকি হাসি হাসিলেন। সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণপ্রেমের কাছে মহর্ষির লীলা খেলাটি পরিষ্কার হইয়া উঠিল। উপলব্ধি করিলেন, গতকাল যে দৈবী প্রশ্ন বার বার তাঁহার অন্তস্তল হইতে উত্থিত হইয়াছে, মহর্ষিই ছিলেন তাহার পিছনে।

প্রসন্ন মনে, নয়ন নিমীলিত করিয়া, কৃষ্ণপ্রেম ধ্যানে বসিলেন। অল্পক্ষণের মধ্যে অনাস্বাদিতপূর্ব দিব্য আনন্দে তাঁহার সারা দেহমন-প্রাণ প্লাবিত হইয়া গেল।

এই আনন্দের আবেশ কিছুটা কাটিয়া যাইতেই মহর্ষির দিকে তাকাইয়া কৃষ্ণপ্রেম মনে মনে প্রশ্ন করিলেন, 'যদি এতটা কৃপাই আমায় করেছেন, হে মহাত্মন্, তবে এবার আমায় জানিয়ে দিন কে আপনি, কি আপনার স্বরূপ, কি আপনার তত্ত্ব?'

এই নীরব প্রশ্নটি করার পর মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখেন, এ কি অদ্ভুত কাণ্ড, মহর্ষি তাঁহার কৌচে নাই! এতগুলি ভক্ত ও দর্শনার্থীর দৃষ্টির সম্মুখ হইতে মুহূর্ত মধ্যে স্থূলদেহটি কোথায় উড়িয়া গেল? কোথায় তিনি অন্তর্হিত হইলেন? এ কি কৃষ্ণপ্রেমের দৃষ্টি বিভ্রম না মহর্ষিরই অলৌকিক লীলা?

নিজের চোখ দুইটি ক্ষণতরে নিমীলিত করিয়া কৃষ্ণপ্রেম আবার তাকাইলেন কৌচের দিকে। এ কি! এবার যে মহর্ষি সশরীরে জীবন্ত শিবের মতো সেখানেই উপবিষ্ট রহিয়াছেন। শুধু তাহাই নয়, কৃষ্ণপ্রেমের দিকে অপাঙ্গে স্মিতহাস্যে একটু তাকাইয়া মুখটি

ফিরাইয়া নিলেন অন্যদিকে। স্থূল শরীরের এই চকিত আবির্ভাব আর অন্তর্ধান, এই 'ঝাঁকি দর্শন', সেদিন কৃষ্ণপ্রেমকে কোন্ তত্ত্ব জানাইয়া দিয়া গেল? শ্রদ্ধায় বিস্ময়ে অভিভূত কৃষ্ণপ্রেম এ সময়ে অস্ফুট স্বরে আপন মনে কহিতে লাগিলেন, "মহর্ষি, আপনার কৃপায় আমি বুঝেছি ;—স্থূল সূক্ষ্মের গণ্ডীর বাইরে, দ্বন্দ্বাতীতলোকে, আপনি রয়েছেন সদা বিরাজিত। আত্মজ্ঞানী হে মহাসাধক আপনাকে প্রণাম, বার বার প্রণাম।"

আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু, উচ্চকোটির গুপ্ত সাধক শ্রীএস, ডুরাইস্বামী আ'য়ারের সহিত মহর্ষি রমণের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল।[1] কৃষ্ণপ্রেমের তিরুভন্নামালাই-এ যাওয়ার কিছুদিন পরে ডুরাইস্বামী মহর্ষি রমণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যান। সে সময়ে মহর্ষি কথা প্রসঙ্গে তাঁহাকে বলেন, "তুমি কি কৃষ্ণপ্রেমকে জানো? এবার সে এখানে এসেছিল।"

ডুরাইস্বামী উত্তরে বলেন, "আমি তাঁর কথা, তাঁর ত্যাগ তিতিক্ষার কথা, অনেক শুনেছি। আমার কয়েকটি বন্ধু কৃষ্ণপ্রেমকে অন্তরঙ্গ ভাবে জানেন। তবে আমার সঙ্গে তাঁর দেখা হয় নি কখনো।"

মহর্ষি রমণ কহিলেন, "দেখা ক'রো তার সঙ্গে। ত্যাগী, প্রাণ-সুন্দর পুরুষ—জ্ঞানী আর ভক্ত একাধারে সে দুই-ই।"

কয়েক বৎসর পরে ডুরাইস্বামীর সহিত কৃষ্ণপ্রেমের সাক্ষাৎ ঘটে কলিকাতায়, হিমাদ্রি পত্রিকার অফিসে। সে সময়ে উভয়ে উভয়কে ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে পাইয়া আনন্দে উচ্ছল হইয়া উঠেন।

তিরুভন্নামালাইর পর ত্রিচিনপল্লী হইয়া কৃষ্ণপ্রেম শ্রীরঙ্গমে উপনীত হন। এ স্থানে প্রভু রঙ্গনাথের সম্মুখে যে অলৌকিক দর্শন

---

১ এস ডুরাইস্বামী আইয়ার কর্মজীবনে ছিলেন মাদ্রাজ হাইকোর্টের শ্রেষ্ঠ অ্যাডভোকেট। শ্রীঅরবিন্দের অধ্যাত্ম-জীবনের অন্তরঙ্গ সহচর ছিলেন তিনি, আর ছিলেন মহর্ষি রমণের স্নেহধন্য, কৃপাধন্য। পরবর্তীকালে ডুরাইস্বামী যোগীশ্বর কালীপদ গুহরায়ের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসেন এবং তাঁহার কৃপাপ্রাপ্ত হন।

ও দিব্য অনুভূতি তিনি লাভ করেন, তাহার স্মৃতি জীবনে কোনো দিন তিনি ভুলিতে পারেন নাই। হঠাৎ কখনো কখনো মনের দুয়ার খুলিয়া গেলে, কৃষ্ণপ্রেম অন্তরঙ্গ মহলে এই অধ্যাত্ম-অভিজ্ঞতার কথা বিবৃত করিতেন।

পুণ্যতোয়া কাবেরীতে স্নান সমাপন করিয়া কৃষ্ণপ্রেম শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করিয়াছেন। শেষশায়ীপ্রভু রঙ্গনাথের মূর্তির দিকে কিছুক্ষণ মুগ্ধনেত্রে তাকাইয়া থাকার পর তাঁহার ধ্যাননেত্রে উদ্‌ভাসিত হইয়া উঠে এক অলৌকিক দৃশ্য। দেখেন, দিব্যালোকের তরল জ্যোতির ধারা সারা বিশ্ব সৃষ্টিতে ওতপ্রোত রহিয়াছে আর ঐ জ্যোতির সাগরে বিরাজিত রহিয়াছেন পরম প্রভু শ্রীকৃষ্ণ এবং রাধারানী। ঠাকুর আর ঠাকুরানীর চরণপদ্ম হইতে নিঃসৃত হইতেছে দিব্যপ্রেমের অনন্ত প্রবাহ—আর এই প্রবাহে সমস্ত বিশ্বসংসার হইয়া উঠিয়াছে প্রেমময় চৈতন্যময়।

উত্তরকালে যখনি কৃষ্ণপ্রেম এই দিনকার দিব্য উপলব্ধির কথা বলিতেন, তখনি মন্তব্য করিতেন, "ভারতের মন্দির ও সিদ্ধপীঠগুলো আধ্যাত্মিকতার এক একটি শক্তি-কেন্দ্র। নিষ্ঠা নিয়ে, অহংবোধ বিবর্জিত হয়ে, এসব পুণ্যস্থলীতে গিয়ে তপস্যা করলে পরম বস্তু পাওয়া যায় বৈ কি।"

নির্মোহ, অভিমানহীন, প্রেমিক মহাপুরুষ ছিলেন কৃষ্ণপ্রেম। তাঁহার চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্য সাক্ষাৎভাবে দেখার সুযোগ আমরা একবার পাইয়াছি এলাহাবাদে থাকার সময়ে কৃষ্ণপ্রেমের (তৎকালীন রোনাল্ড নিক্‌সন) সহিত শ্রীযুক্ত বীরেন ব্যানার্জির ঘনিষ্ঠতা জন্মে। এই ঘনিষ্ঠতা উত্তরকালে পরিণত হয় শ্রদ্ধায় ও ভালোবাসায়। বীরেন ব্যানার্জি মহাশয় কলিকাতার একটি প্রতিষ্ঠানের অফিসার ছিলেন। দূরে থাকেন বলিয়া কৃষ্ণপ্রেমের হিমালয় আশ্রমে সব সময়ে যাওয়া ঘটিত না, কিন্তু পত্রের মাধ্যমে সর্বদা যোগাযোগ রাখিতেন।

কলিকাতায় যোগীশ্বর কালীপদ গুহরায়কে বীরেনবাবু ভক্তি-

শ্রদ্ধা করিতেন এবং নিয়তই হিমাদ্রি পত্রিকার অফিসে, তাঁহার নিভৃত কক্ষে আসিয়া তাঁহার পুণ্যসঙ্গ লাভ করিতেন।

একদিন শ্রীগুহরায়ের কক্ষে বসিয়া লেখক দুই একটি ব্যক্তিগত কথা বলিতেছেন এমন সময়ে বীরেনবাবু সেখানে ঢুকিলেন। চেয়ারে বসার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীযুক্ত গুহরায় বলিলেন, "কি ব্যাপার? কয়েকদিন দেখি নি কেন? আপনাকে যেন এক নূতন মানুষ দেখ্‌ছি?"

"না-না নূতন আর কি হবো, যথা পূর্বং পরং", বলিয়া ব্যানার্জি মহাশয় ঢোক গিলিতেছেন।

"ফাঁস ক'রে দেবো নাকি আপনার গোপন প্রেমের কথা? এখানে বাইরের কেউ নেই।"

"কি যে বলছেন—" বলিয়া ব্যানার্জি মহাশয় তখন বিপন্নভাবে আমতা-আমতা করিতেছেন।

শ্রীযুক্ত গুহরায় উচ্চরবে হাসিয়া কহিলেন, "আরে, ভালো সন্দেশ, সবাইকে তা বেঁটে দিতে হয়। লুকোচ্ছেন কেন? কৃষ্ণপ্রেমের কাছে দীক্ষা নিয়েছেন, এতো ভালো কথা। কোথায় কিভাবে কোন্ ভঙ্গীতে বসে, কি মন্ত্র নিয়েছেন, সব যে আমার জানা।"

"আপনার কাছে, দাদা, কিছুই লুকোনা যায় না, তা দেখেছি। সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান্ যোগী আপনি। তা আমাদের মতো চুনোপুঁটিকে নিয়ে টানা-হ্যাচড়া করা কেন?"

"আপনি বুঝি ভাব্‌ছিলেন, লোকে বলবে—বীরেন ব্যানার্জি অনেক দিন বিলেতে ছিলেন, এখানে এসেও সাহেব-গুরু ছাড়া আর কাউকে পছন্দ করলেন না—এই তো? এ জন্যই তো এতো গোপনতা।" কৌতুকের সুরে বলেন শ্রীযুক্ত গুহরায়।

"না না, তা নয়। ভাবছিলুম, আমার মতো লোকের দীক্ষা, এ আর আপনাকে জানাবার মতো কি সংবাদ।"

"না না, এ খুব সুসংবাদ। আমি আপনাকে ভালোবাসি, তাই বিশেষ ক'রে খুশী হয়েছি এই দেখে যে আপনি উপযুক্ত গুরু পেয়েছেন। কৃষ্ণপ্রেম খাঁটি বস্তু।"

বীরেন ব্যানার্জি মহাশয়ের বয়স হইয়াছে, শরীরও তেমন ভালো নয়, গুরুর কাছে সব সময়ে যাওয়া আসা করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব নয়। যোগীশ্বর কালীপদ গুহরায়ের প্রতি তাঁহার প্রচুর শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস, নির্ভরতাও ছিল। গুরুকে তিনি সব সময়ে কাছে পান না, তাই অনন্যোপায় হইয়া একদিন নিজের সাধন সম্পর্কিত একটি সমস্যায় গুহরায় মহাশয়ের পরামর্শ চাহিলেন।

শ্রীযুক্ত গুহরায় বলিলেন, "তা তো হয় না। আপনার গুরু কৃষ্ণ-প্রেমের কাছ থেকে তাঁর অনুমতি আনিয়ে নিন, নইলে আপনাকে আমি সাহায্য করি কি ক'রে ?"

কয়েকদিন পরে ব্যানার্জি মহাশয় বলিলেন, "গোপাল-দা'র (কৃষ্ণপ্রেমের) কাছে চিঠি দিয়েছিলাম, তিনি লিখেছেন,—বীরেন, তুমি যোগীবরের কাছ থেকে উপদেশ অবশ্যই নিতে পারো। তোমার কথা রাধারানীর কাছে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, তিনি জানালেন, এতে তোমার কল্যাণই হবে।"

শ্রীযুক্ত গুহরায় একথা শুনিয়া সহাস্যে কহিলেন, "এই দেখুন গুরু আপনার কৃষ্ণপ্রেমের প্রকৃত মহত্ত্ব! আমার কাছ থেকে আপনি নির্দেশ নিলে গুরু হিসেবে তাঁর আপত্তির কারণ নেই। আচ্ছা, সারা ভারতবর্ষে ক'জন গুরু এমন কথা, এমন মন খুলে বলতে পারেন ?"

বীরেন ব্যানার্জি মহাশয়ের সম্পর্কিত এই ঘটনাটি হইতে বুঝা যায়, প্রেমসাধনার কোন্ উত্তুঙ্গ স্তরে কৃষ্ণপ্রেম বিরাজিত ছিলেন, আর ভারতের উচ্চকোটির মহাত্মাদের সহিত তাঁহার যোগাযোগ ছিল কত ঘনিষ্ঠ।

সে-বার কিছুদিনের জন্য কৃষ্ণপ্রেম কলিকাতায় আসিয়াছেন। যোগীশ্বর কালীপদ গুহরায় এবং কৃষ্ণপ্রেম উভয়েরই উভয়কে দেখার প্রবল ইচ্ছা। হিমাদ্রি পত্রিকার অফিসে সাক্ষাতের ব্যবস্থা হইল, আমরা পূর্বাহ্ণেই জানাইয়া দিলাম, কৃষ্ণপ্রেমের ভজন কীর্তন আমরা শুনিব। কয়েকটি ভক্ত শিষ্য নিয়া, সন্ধ্যার পর 'জয় রাধে' বলিয়া

কৃষ্ণপ্রেম সেখানে উপস্থিত হইলেন। ন, দুই মহাত্মার মিলনে আনন্দের জোয়ার বহিয়া গেল।

কীর্তন শুরু হইয়াছে। ভাবাকুল নেত্রে কৃষ্ণপ্রেম গাহিতেছেন, আর তরুণ ভক্ত মাধবাশীষ বাজাইতেছেন মৃদঙ্গ। সারা দেহ-মন-প্রাণ দিয়া যে কীর্তন গাওয়া হয়, ভক্তের অন্তস্তল হইতে উৎসারিত হইয়া যে কীর্তন সারাসরি পৌঁছে গিয়া ইষ্টদেবের চরণ-কমলে, এ সেই প্রাণময় চৈতন্যময় কীর্তন। মরমী শ্রোতারা উপলব্ধি করিলেন, এই ভজন কীর্তন কৃষ্ণপ্রেমের ঠাকুর-সেবা ও ঠাকুর-পূজার এক প্রধান অন্যতম উপচার।

নয়ন মুদিয়া, গদ্‌গদ কণ্ঠে, করতাল জোড়া বাজাইয়া কৃষ্ণপ্রেম গাহিয়া চলিয়াছেন:

সুন্দরী রাধে আওয়ে ধনি।
ব্রজ রমণীগণ মুকুটমণি।

সারা হলঘরটি সুধী ভক্ত শ্রোতাদের সমাগমে ভরিয়া উঠিয়াছে। কোথাও তিলধারণের স্থান নাই, কাহারো মুখে একটি শব্দ নাই। ভাবতন্ময়, দীর্ঘবপু, শালপ্রাংশু মহাভুজ এই ইংরেজ বৈষ্ণবের দিকে নির্নিমেষে অবাক্ বিস্ময়ে শ্রোতারা সবাই চাহিয়া আছেন, আর ভাবিতেছেন রাধারানী এবং কৃষ্ণের কৃপা কি অঝোর ধারেই না ঝরিয়াছে এই মহাবৈষ্ণবের আধারে। এ গান শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ধরিলেন রাধা-প্রেমের ভিখারী কৃষ্ণের আর এক মর্মস্পর্শী গান:

কিশোরীর দাস আমি পীতবাস
ইহাতে সন্দেহ যার।
কোটিযুগ যদি আমারে ভজয়ে
বৃথাই সাধনা তার।

প্রায় রাত একটা অবধি ভজন কীর্তন চলিল। শ্রোতারা সবাই মন্ত্রমুগ্ধ, সার্থকনামা সাধকের চৈতন্যময় সংগীত তাঁহাদের পৌঁছাইয়া দিয়াছে রাধাকৃষ্ণ-প্রেমের দিব্যলোকে।

কীর্তনের শেষে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিলেন কৃষ্ণপ্রেম। একজন শ্রোতা কহিলেন, "রাধারানীর উদ্দেশে নিবেদিত আপনার গানগুলি অনেকেরই চোখে জল এনে দিয়েছে। আজকাল আপনি দেখছি, রাধাপ্রেমেই বেশী বিভাবিত।"

"রাধা কৃষ্ণশক্তি। রাধা আর কৃষ্ণে তফাত কোথায়? কৃপাময়ীর কৃপার বলেই যে কৃষ্ণকে ধরা ছোঁয়া যায়। আজকাল রাধারানীই চালাচ্ছেন আমায়, যা কিছু পাবার পাচ্ছি তাঁর কাছ থেকেই।"

আবার একজন শ্রোতা কৃষ্ণপ্রেমকে অনুরোধ করিলেন "কৃষ্ণ ভজনের পথ কি, সংক্ষেপে আমাদের একটু বলুন।"

তিনি উত্তর দিলেন, "পথ তো একটাই। সেটি হচ্ছে ঠাকুরের রাজপথ, সবারই তা চেনা। সব দিয়ে, সর্বময়কে পেতে হবে। তবে কে কিভাবে সে পথে এগুবে, সেইটাই প্রশ্ন। গীতায় ভগবান্ কৃষ্ণ তো নিজেই তাঁর কথাটি সহজ ক'রে পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছেন—

মন্মনা ভব মদ্‌ভক্তো মদ্‌যাজী মাম্ নমস্কুরু।
মামেবৈশ্যসি সত্যম তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে।

—মনকে একাগ্র করো আমার দিকে, তোমার ভক্তি দাও আমায়, সব কিছু কর্ম অর্পণ করো আমার সেবা পূজায়, তাহলেই তুমি আসবে আমার কাছে, আমার প্রিয় হবে, এ প্রতিশ্রুতি তোমায় আমি দিচ্ছি।

আরো কয়েকবার দেখা হইয়াছিল কৃষ্ণপ্রেমের সঙ্গে। একদিন ভজন ও তত্ত্বোলোচনা শুনিতে অনেকে সেখানে জড়ো হইয়াছেন। প্রসঙ্গক্রমে কৃষ্ণপ্রেমকে বলিলাম, "বেশ আছেন আপনারা হিমালয়ের কোলে মির্তোলায়। সমস্যা-জর্জর আধুনিক সমাজের ছোঁয়া সেখানে পৌঁছে না, কানে আসে না হিংসা ও আর্তির কণ্ঠস্বর। কৃষ্ণ আর রাধারানীকে নিয়ে পরমানন্দে রয়েছেন উত্তর বৃন্দাবনের আশ্রমিকেরা।"

সাধক কৃষ্ণপ্রেমের দৃষ্টি সদাই ছিল স্বচ্ছ, নির্মোহ এবং একাগ্র। ভাবালুতা আর সংশয়ী কূটতার্কিকতা দুইয়েরই উর্ধ্বে ছিলেন তিনি,

আর সাধনজাত সূক্ষ্ম অনুভূতির বলে যে কোনো প্রশ্নের মর্মমূলে পৌঁছিতে পারিতেন মুহূর্তমধ্যে। উত্তরে কহিলেন "এই পাগ্‌লাটে পৃথিবী থেকে দূরে আমরা রয়েছি, মানুষের হানাহানি আর হিংস্র কলরব সেখানে নেই, তা ঠিক। সাধনজীবনের পক্ষে সে পরিবেশ অনুকুল তা স্বীকার করতেই হবে। কিন্তু সেইটেই তো বড় কথা নয়। বড় কথা হচ্ছে, মনকে কেন্দ্রীভূত করে কৃষ্ণচরণে স্থায়ীভাবে ন্যস্ত করা, মিলিয়ে দেওয়া। ঐকৈকনিষ্ঠা আর একাগ্রতা নিয়ে 'এক'-কে ধরতে হবে, তাছাড়া তো অন্য পথ নেই। মাণ্ডুক্য উপনিষদের উপমাটি সব সাধকেরই মনে রাখা উচিত। 'ওম' হচ্ছে ধনু, আত্মা—শর, আর লক্ষ্য হচ্ছেন ভগবান্, ব্রহ্ম—যাঁর ভেতরে বিদ্ধ করতে হবে ঐ শর, মিশিয়ে দিতে হবে সম্পূর্ণরূপে। শরবৎ তন্ময়ো ভবেৎ—তা নইলে কিছুই হবে না। উত্তর বৃন্দাবন আর বৃন্দাবন বড় কথা নয়, বড় কথা তাঁর চরণে আত্মার আহুতি—পূর্ণাহুতি।"

সমাগত সবাইকে লক্ষ্য ক'রে প্রসন্ন মধুর স্বরে বলিলেন, "কৃষ্ণ আমাদের সবটা নিতে চান, আর দিতে চান নিজের সবটা একেবারে পুরোপুরি। আংশিক দেওয়া নেওয়া তাঁর ধাতে নেই। অখণ্ড পরম বস্তু কিনা, তাই। কৃষ্ণকে পেতে হলে, দুহাত দিয়ে তাঁর চরণ ধরতে হবে, একহাত কৃষ্ণের চরণে আর এক হাত নিজের দিকে—বিষয়ের দিকে, তা হলে কৃষ্ণপ্রাপ্তি কখনো হবে না।"

আবার প্রশ্ন করিয়াছিলাম কৃষ্ণপ্রেমকে, "কোন শাস্ত্র পাঠ ক'রে কৃষ্ণতত্ত্বের প্রকৃত সন্ধান আপনি পেয়েছেন ?"

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন, 'শ্রীমদ্‌ভাগবত'। এই মহান্ গ্রন্থ প্রথমে পড়েছি গুরুমায়ের কাছে, শেষেও পড়েছি তাঁরই কাছে। তাঁর সঙ্গে আমি এই পুরাণের প্রতিটি লাইন বার ক'রে বার পড়েছি, তাঁর শ্রীমুখ থেকে তত্ত্বোজ্জ্বলা ব্যাখ্যা শুনে উপলব্ধি করেছি কৃষ্ণের জীবন ও বাণীর রহস্য। আমি তো মনে করি, উপনিষদের হৃদয় হচ্ছে ভাগবত, আর উপনিষদের জ্ঞান-সায়রে ভাগবত যেন মধুময় শতদলের মতো ফুটে রয়েছে যুগযুগান্তের ভক্তদের কল্যাণে।"

ভারতের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য সম্পর্কে কৃষ্ণপ্রেম যেমন শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন, তেমনি তিনি বিশ্বাস করিতেন, এ যুগেও ভারতের মানুষ আধ্যাত্মিক সত্যের মূল্য বেশী দেয়।

শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায়কে একদিন তাই তিনি বলিয়াছিলেন, "গোড়ার দিকে ভারতের অন্তর্জীবন সম্বন্ধে সংশয় ও সন্দেহ কিছুটা ছিল। কিন্তু দীক্ষা নেবার পর সে সব দূরীভূত হল, দৃষ্টি আমার স্বচ্ছ হয়ে এল। দেখলাম, ভারতই বিশ্বের একমাত্র দেশ যেখানে দীর্ঘকাল যাবৎ বজায় রয়েছে সিদ্ধ সাধকদের রাজত্ব, কখনো সে রাজত্বে ছেদ পড়ে নি, আর এদেশের কোটি কোটি মানুষ তাকে শ্রদ্ধা ও সম্মান দিয়ে আসছে। প্রায় এক শতক আগে মানসিকতার কিছুটা পরিবর্তন ঘটেছে। যদিও অধিকাংশ ভারতবাসী আজ অবধি প্রাচীন যুগের ধ্যান ধারণা ও আধ্যাত্মিক আদর্শের প্রতি অনুরক্ত, কিন্তু একদল আধুনিক শিক্ষিত লোক হঠকারী মনোবৃত্তি নিয়ে পাশ্চাত্যের লোকদের অনুসরণ ক'রে বলতে শুরু করেছে— হিন্দুধর্ম মধ্যযুগীয়, হিন্দুর দেবদেবীর পূজা আসলে গাছ পাথরের পূজা, হিন্দু সাধুরা সমাজের পরগাছা, আর হিন্দুর অবতারগণ শূন্যগর্ভ ধর্মনেতা। যারা এসব কথা বলছে, তারা পাশ্চাত্যের চোখ ঝলসানো মেকি বৈষয়িক সাফল্য দেখে মোহাবিষ্ট হয়েছে, তাদের আমি অনুকম্পার চোখে দেখি। কিন্তু সুখের কথা, সে সব লোকের সংখ্যা নিতান্ত মুষ্টিমেয়, ভারতের আত্মার স্পন্দন তাঁদের কানে কোনো দিন পৌঁছায় নি, অথচ একটু স্থির হয়ে কান পেতে শুনলে আজো ভারতের জনজীবনে তার সন্ধান মেলে। তাই দেখতে পাই, এক টুকরো গৈরিক-পরা যে কোনো সাধু এদেশের সাধারণ মানুষের কাছে পায় রাজোচিত সম্মান, শুধু পাশ্চাত্যের গোলামীতে অভ্যস্ত যারা, সংখ্যায় যারা খুবই কম, তারাই এঁদের অবজ্ঞা করে। আসল কথা, ভারতের সাধারণ মানুষ আজো সাধু-জীবনের পবিত্রতাকে সম্মান দেয়, ভক্তি ও জ্ঞানকে শ্রদ্ধা জানায়। যদি নিজে সে ভজন

১ যোগী কৃষ্ণপ্রেম ; রেমিনিসেন্সেস্ : দিলীপকুমার রায়

সাধন কিছু নাও করে, তবুও ভগবানের প্রতিনিধিরূপে যে সব সিদ্ধপুরুষ হাজার হাজার বছরের পুরাতন আত্মিক ঐশ্বর্য বহন ক'রে চলেছেন তাদের চরণে প্রণত হয়।

"কুম্ভমেলায় কি দেখ? লক্ষ লক্ষ নিরক্ষর দীন দরিদ্র লোক মাঘের প্রচণ্ড শীতে গঙ্গায় অবগাহন করছে, ছিন্নবাস পরিহিত সাধুদের পায়ে প্রণাম ক'রে নিজেদের ধন্য মনে করছে। শুধু কুম্ভ-মেলা কেন, যে কোনো হিন্দু পূজা পার্বণের পেছনে রয়েছেন ভগবান্ আর তার প্রতীক দেবদেবীর প্রেরণা।"

ভারতবর্ষে থাকিয়া ভারতের বৈরাগ্যময় তপস্যায় ব্রতী হইয়া কৃষ্ণপ্রেমকে মাঝে মাঝে কটুবাক্য শুনিতে হইয়াছে, নিগ্রহও ভোগ করিতে হইয়াছে।

একবার তিনি ট্রেনে চড়িয়া মাদ্রাজের দিকে যাইতেছিলেন। কামরায় এক পাশে বসিয়া একটি অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মহিলা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে তাকাইয়া আছেন। কৃষ্ণপ্রেমের পরনে গৈরিক বহির্বাস, মুণ্ডিত মস্তকে দীর্ঘ শিখা, গলায় তুলসীর মালা, আর হস্তের ঝুলিতে রহিয়াছেন ঠাকুরের বিগ্রহ—এটি তাঁহার নিত্যকার পূজার বিগ্রহ।

কৃষ্ণপ্রেমের কথাবার্তা শুনিয়া মহিলাটি বুঝিলেন ইনি একজন খাঁটি ইংরেজ। একটু বাদেই কৃষ্ণপ্রেমের দিকে রোষভরে তাকাইয়া তিনি গালাগালি শুরু করিলেন, "ধর্মত্যাগী অপদার্থ কোথাকার। তোমার কি লজ্জা নেই একটুও? কোন্‌মুখে পবিত্র খ্রীষ্টধর্ম ছেড়ে, নিজের আত্মীয়স্বজন ও দেশ ছেড়ে, এই সব বাজে দলে ঢুকেছো?"

মনে হইল মহিলাটি যেন ক্রোধে ক্ষেপিয়া গিয়াছেন। সঙ্গীয় সহযাত্রীরা চঞ্চল হইয়া এ উহার মুখের দিকে চাহিতেছেন। কৃষ্ণপ্রেম কিন্তু নীরব রহিয়াছেন, আর মিটিমিটি হাসিতেছেন।

মহিলাটি এবার আরো উত্তেজিত স্বরে কহিলেন, "আমি জিজ্ঞেস করি, কি পেয়েছো তুমি? কি পেয়েছো তোমার নিজের দেশ, ধর্ম, সংস্কৃতি সব কিছু ছেড়ে এসে?"

কৃষ্ণপ্রেম প্রশান্তভাবে ঝুলি হইতে ঠাকুরের শ্রীবিগ্রহটি বাহির করিলেন, তারপর সেটি হাতে নিয়া প্রাণখোলা হাসি হাসিয়া কহিলেন, "ম্যাডাম, পেয়েছি এটিকে —আমার কৃষ্ণকে আমি পেয়েছি এখানে এসে।"

মহিলাটির আর বাক্স্ফূর্তি হইল না, ঘাড় বাঁকাইয়া জানালার বাহিরে তাকাইয়া রহিলেন।

নিজের সাধ্য ও সাধনা বিষয়ে কৃষ্ণপ্রেম বলিয়াছেন, "আমার আদর্শ বা তত্ত্বকে চারটি কথায় প্রকাশ করা যায়,—'কিছুই চেয়ো না, দাও সর্বস্ব।' একসময়ে অধ্যাত্ম-জীবনের অনুভূতি ও দর্শনাদির জন্য মন বড় ব্যাকুল হতো। তারপর বুঝতে পারলাম, এসব চাইলে কৃষ্ণ বড় কৃপণ হয়ে পড়েন, পিছিয়ে যান। আরো উপলব্ধি করলাম, কৃষ্ণকে যখন ভালোবাসা দিচ্ছি, তখন তার মধ্যে দিব্য অনুভূতি লাভ করার লোভ জড়িত থাকবে কেন? কৃষ্ণ তাঁর ইচ্ছে মতো, আর আমার প্রয়োজন বুঝে, সেসব দেবেন। আলো হাওয়ার মতো সহজ ও মুক্ত হবে আমাদের ভালোবাসা।

"কেউ তাঁকে বলে নিরাকার, কেউ বলে সহস্রপাদ। আমার কাছে পর্যাপ্ত তাঁর ঐ দু'টি চরণ। কী অপূর্ব কী মধুময় তাঁর চরণ। ঐ চরণ দুটি হারিয়ে গেলে, তার বদলে ব্রহ্মানন্দ বা মুক্তিও আমার কাম্য নয়। পরম বস্তু বিশ্বসৃষ্টির বস্তুতেই রয়েছেন। কৃষ্ণ আনন্দময় না হলে এই বিশ্বে আনন্দে ওতপ্রোত থাকতো না, একথা যদি সত্য হয়, তবে আমি বলবো, কৃষ্ণ বস্তুময় এবং বাস্তব না হলে এই বিশ্বপ্রপঞ্চে বাস্তব বলে কোনো কিছু থাকতো না, অনুভবেও তা আসতো না। কৃষ্ণের বিগ্রহ কৃষ্ণের জ্যোতি, কৃষ্ণের মাধুর্য সবই আমার কাছে বাস্তব[১]।"

অনেক স্থলে, অনেকের কাছে, কৃষ্ণপ্রেম বার বার বলিয়াছেন, "কৃষ্ণ প্রাপ্তি হলে, কৃষ্ণের দেখা পেলে, মায়া প্রপঞ্চ বলে আর কিছু

১ যোগী কৃষ্ণপ্রেম: দিলীপকুমার রায় (পত্রাবলী)

থাকে না, যা কিছু চোখে পড়ে, যা কিছু অনুভবে আসে, অনুভবের বাহিরেও যা কিছু থাকে, সবই হয়ে যায় কৃষ্ণময়। কৃষ্ণের ভেতরেই সব কিছু রয়েছে, কৃষ্ণই বিরাজ করছেন সব কিছুকে নিয়ে। তিনিই ব্রহ্মানন্দ তিনিই নন্দ-নন্দন. তিনিই গোপীবল্লভ, আবার তিনিই কুরুক্ষেত্রের সারথী—তিনিই একাধারে সব কিছু[১]।"

সাধনা সম্পর্কে কৃষ্ণপ্রেমের ধারণা ছিল অতি স্বচ্ছ ও সুস্পষ্ট। সাধক-কবি দিলীপকুমার রায়কে এক পত্রে তিনি লিখিয়াছেন: "ধর্ম অথবা যোগ, যে নামেই আত্মিক সাধনাকে অভিহিত করা হোক না কেন, তার অর্থ কিন্তু শুধু একটিই। শক্তি লাভের জন্য কোনো কোনো সাধক বিশেষ ধরনের জ্ঞান আহরণে প্রয়াসী হয়, কখনো বা শুধু জ্ঞান লাভের জন্যই সচেষ্ট হন। এ কিন্তু যোগ নয়। সাধকের ভাবময়তা অনেক সময় মনোরম স্বর্গীয় সৌন্দর্যময় দৃশ্যের সৃষ্টি করে, এটাও যোগ নয়। কোনো কোনো সাধক তাঁদের ধ্যান ধারণার বলে অতীন্দ্রিয়, ধোঁয়াটে ধরনের চিন্তারাশিকে ফুটিয়ে তোলেন, তাও যোগের পর্যায়ে পড়ে না। দুর্গত মানবের সেবাকে যোগ বলে আমি অভিহিত করবো না, যদিও সিদ্ধ সাধকেরা বিশ্বের সর্বজীবকে এমন ভালোবাসার দৃষ্টিতে দেখে থাকেন, বুদ্ধের মতে—যে ভালোবাসা শুধু মায়ের বুক থেকে ঝরে পড়ে তাঁর একমাত্র সন্তানের জন্য। হঠযোগীর আসন মুদ্রা প্রাণায়ামের ফলে ব্যাঙের মতো বিস্ফারিত হওয়া আর ফেটে পড়া, তাকে তো প্রকৃত যোগের পর্যায়ে ফেলা যায়ই না। আসলে যোগের স্বরূপ হচ্ছে, কৃষ্ণে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ —এ সমর্পণে কোনো দাবি নেই, আকাঙ্ক্ষা নেই, কোনো বাসনার লেশমাত্র নেই, আছে কেবল নিজেকে নিঃশেষে বিলিয়ে দেওয়া।

১ কৃষ্ণপ্রেমের ব্যাখ্যাত তত্ত্বের পরিচয় মিলে প্রধানত তাঁহার রচিত তিনটি গ্রন্থে। এগুলির নাম—সার্চ ফর ট্রুথ, যোগ অব্ ভগবৎ-গীতা, যোগ অব্ কঠোপনিষদ্। ইহা ছাড়া 'এরিয়ান পাথ্' সাময়িকীতে বিভিন্ন সময়ে বহু প্রবন্ধাদি তিনি লিখিয়াছেন। মুমুক্ষুদের কাছে লেখা তাঁহার মূল্যবান চিঠির সংখ্যাও কম নয়।

যেসব কাজ বা চিন্তা এই পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণকে সম্ভব ক'রে তোলে তাই হচ্ছে, সাধনা। আর এই পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণের ফলশ্রুতি হিসেবে যে আত্মিক বস্তু এগিয়ে আসে সাধকের সামনে, তাই হচ্ছে ভাগবতী লীলা।"

কৃষ্ণপ্রেমকে একবার প্রশ্ন করা হইয়াছিল, ভগবৎ-কৃপা বলিয়া কোনো বস্তু আছে কিনা এবং সে কৃপার প্রকৃত স্বরূপ কি ?

তিনি উত্তর দিলেন, "আমি দ্ব্যর্থহীন সুস্পষ্ট দৃঢ় ভাষায় বলবো, ভগবৎ-কৃপা বিরাজ করছে সারা সৃষ্টি জুড়ে, আর সেই কৃপার মাধ্যমেই মানুষ পৌঁছুতে পারে কৃষ্ণের চরণে। মহাভারতের উদ্যোগ-পর্বে কৃষ্ণ পুরুষকার আর দৈবের মানুষের ইচ্ছাশক্তি আর ঐশ্বরীয় বিধানের কথা বলেছেন, পুরুষকার যেন ক্ষেত্রকর্ষণ, আর দৈব—আকাশের বৃষ্টি-ধারা। এ তুলনাটি পড়বার সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে হল, তাহলে তপস্যা হচ্ছে—বীজবপন, যে বীজ সাধক তার অভীপ্সা অনুযায়ী বপন করে থাকে। আর সেই বীজের ওপর যে বৃষ্টিধারা ঝরে পড়ে তা আসে ভগবানের কাছ থেকে।"

এই ভগবৎ কৃপাপ্রসঙ্গে বিশদভাবে আরো তিনি কহিলেন, "এই ধূলিধূসর কোলাহলময় পৃথিবীতে যখনই কেউ আত্মাহুতি দেয়, নিজেকে উজাড় ক'রে ঢেলে দেয় ভগবৎ প্রেমের আগুনে, তখনই ঘটে একটা অলৌকিক বিস্ফোরণ। তাই হচ্ছে ভগবৎ-কৃপার প্রকৃত স্বরূপ।

হরিদাস (ডাঃ আলেকজেণ্ডার) ছিলেন একবার অন্যতম শ্রোতা। রসিকতার সুরে তিনি কহিলেন, "উপমাটি চমৎকার সন্দেহ নেই। কিন্তু একজন শুধু শুধু ঐ আগুনের ভেতর নিজেকে নিঃশেষ ক'রে দেবে কেন ? আমরা সবাই ঐ আগুনে ভস্ম হতে যাবো কেন ?"

স্মিতহাস্যে কৃষ্ণপ্রেম বলিলেন, "এ মন্তব্যের উত্তর আমি অবশ্যই দিতে পারি। সূর্যের ভেতর যখনই যে কোনো জ্যোতিষ্ক প্রবেশ ক'রে বিলীন হয়ে যায়, তখনই তা বিশ্বজগতে সৃষ্টি ক'রে এক নূতন প্রাণদায়িনী শক্তি ও উত্তাপ। প্রকৃতপক্ষে, কোনো আত্মাহুতিই তো এই পৃথিবীতে ব্যর্থ হয়ে যায় না।

লোকচক্ষুর অন্তরালে, হিমালয় অঞ্চলের নিভৃত অঞ্চলে, প্রেম-ভক্তির সাধনায় দীর্ঘকাল নিরত ছিলেন কৃষ্ণপ্রেম। অতিমাত্রায় প্রচারবিমুখ ছিলেন এই বৈরাগী মহাপুরুষ, সহসা কাহাকেও শিষ্য করার সম্মতি তিনি দিতেন না। শহর বন্দর ও জনসংঘট্ট সতর্কভাবে এড়াইয়া চলা ছিল তাঁহার চিরন্তন অভ্যাস। কিন্তু ফুল ফুটিলে ভ্রমর আসিয়া জুটিবেই। তেমনি সাধক কৃষ্ণপ্রেমের সিদ্ধিময় জীবনের সৌগন্ধ আকর্ষণ করিয়া আনিয়াছিল শত শত ভক্ত ও মুমুক্ষুকে। ইউরোপ ও আমেরিকার বহু জিজ্ঞাসু শরণ নিয়াছিলেন তাঁহার কাছে। যুদ্ধোত্তর সমাজের হিংসা দ্বেষ ও অশান্তিতে উত্যক্ত হইয়া অনেকে আসিতেন, অনেকে আসিতেন জড়বাদী আধুনিক সভ্যতার বন্ধ্যা জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া। ভাবুক ও স্বপ্নবিলাসী একদল বিদেশী আসিতেন রহস্যময় হিমালয়ের আশ্রমে সাধনভজন করার জন্য। ইঁহাদের অনেকেই হয়তো শেষ অবধি স্থায়ীভাবে এদেশে থাকিতে পারেন নাই কিন্তু কৃষ্ণপ্রেমের সান্নিধ্য ও উপদেশ তাঁহাদের জীবনে প্রেরণা যোগাইয়াছে, সাধনজীবনের দুয়ার খুলিয়া দিয়াছে।

সব চাইতে বিস্ময়কর, কৃষ্ণপ্রেমের প্রতি ভারতীয় ভক্ত ও মুমুক্ষুদের আকর্ষণ। সংখ্যায় ইঁহারা বিদেশী ভক্তদের চাইতে বেশী। সত্যকার বিশ্বাস ও নিষ্ঠা নিয়া ইঁহাদের অনেকেই কৃষ্ণপ্রেমকে আঁকড়িয়া ধরিয়াছিলেন, অগ্রসর হইয়াছিলেন প্রেম ভক্তিময় সাধন-পথে। এ প্রসঙ্গে লক্ষণীয়, ভারতের বহু আশ্রমেই ভারতীয় সাধকদের কাছে বিদেশী ভক্তদের ভিড় করিতে দেখা যায়, কিন্তু কোনো বিদেশী গুরুর কাছে ভারতীয় ভক্ত ও মুমুক্ষুরা শরণ নিতেছে, এমন দৃশ্য সহসা দৃষ্টিগোচর হয় না। কৃষ্ণপ্রেমের বেলায় এই ব্যতিক্রমটি দেখা গিয়াছে। শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ধনী নির্ধন, ব্রাহ্মণ শূদ্র, সর্বশ্রেণীর ভারতীয় ভক্তকে নির্বিচারে আশ্রয় দিয়াছেন কৃষ্ণপ্রেম, গড়িয়া তুলিয়াছেন তাঁহাদের অধ্যাত্মজীবন।

সাধনা ও সিদ্ধিময় জীবন এবার ধীরে ধীরে তাহার শেষ পর্যায়ে

আসিয়া পড়ে। কৃষ্ণপ্রেম এবার প্রস্তুত হইয়া বসিয়া আছেন চিরবিদায়ের প্রতীক্ষায়।

বহুদিনের পুরানো হুক্-ওয়ার্ম রোগ আবার সেদিন আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। শরীর হইতেছে জীর্ণ ও বিধ্বস্ত। চিকিৎসার কথা উঠিলেই সহাস্যে কৃষ্ণপ্রেম বলেন, "চিরদিন ঠাকুরই তো আমার ডাক্তার। আর কার কাছে যাবো, বলতো ?"

অন্তরঙ্গ শিষ্য মাধবাশীষ ও অন্যান্য ভক্তেরা পীড়াপীড়ি করিয়া নাইনিতালের বড় ডাক্তারের কাছে তাঁহাকে নিয়া গেলেন, কিন্তু তেমন কিছু উন্নতি দেখা গেল না।

ভক্তেরা অনুনয় করিয়া কহিলেন, "গোপালদা, ঠাকুর ও রাধারানীর কাছে কত কথাই তো আপনি নিবেদন করেন, কখনো তাঁরা তা প্রত্যাখ্যান করেন না। এবার বলুন, আপনি যাতে ভালো হয়ে ওঠেন।"

স্মিতহাস্যে উত্তর দেন, "আয়ু বাড়ানোর কথা বলছো ? একবার তো ঠাকুর বাড়িয়ে দিয়েছেন, সেই বাড়ানো মেয়াদই এখন চলছে।"

এ সময়ে দেহ সম্পর্কে একেবারে নির্বিকার হইয়া উঠিয়াছেন কৃষ্ণপ্রেম। কথাবার্তায় সদাই দেখা যায় আত্মস্থ ও নৈর্বাক্তক ভাব। ভক্ত শিষ্যেরা আপ্রাণ চেষ্টায় সেবা পরিচর্যা করিয়া চলিয়াছেন। সকলেরই চোখে মুখে প্রবল উৎকণ্ঠার ছাপ। তাঁহাদের প্রশ্নের উত্তরে কৃষ্ণপ্রেম বলেন, "জানতো, ঠাকুরের হাতে দুটো ডোর রয়েছে, একটা ওপরের দিকে টানেন, আর একটা নিচের দিকে। এবার নিচেরটা টানবার পালা।"

যামুনাচার্য

দশম শতাব্দীর তৃতীয় পাদ। দাক্ষিণাত্যে পাণ্ড্যরাজের সভায় এ সময়ে আচার্য বিদ্বজ্জন-কোলাহলের প্রবল প্রতাপ। রাজা এই পণ্ডিত শিরোমণিকে গভীরভাবে শ্রদ্ধা করেন, মান্য করেন গুরুর মতো। দেশের শ্রেষ্ঠ শাস্ত্রবিদ্‌দের প্রায়ই আহ্বান করিয়া আনা হয়, রাজসভায় আচার্য কোলাহলের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয় তাঁহাদের তর্কদ্বন্দ্ব। এইসব তর্কসভার পরিচালনায় পাণ্ড্যরাজের উৎসাহ উদ্দীপনার অবধি নাই। রাজ্যের জ্ঞানীগুণীরা সেখানে আমন্ত্রিত হইয়া আসেন, আর তাঁহাদের সমক্ষে, তুমুল উত্তেজনার মধ্যে, তর্কশূরেরা একে অন্যকে আক্রমণ করিতে থাকেন।

প্রতি ক্ষেত্রেই জয়ী হইতে দেখা যায় শক্তিমান ক্ষুরধারবুদ্ধি আচার্য কোলাহলকেই। সভার শেষে রাজা পরম সমাদরে তাঁর সভা-পণ্ডিতের গলায় অর্পণ করেন পুষ্পমালা, রাজকোষ হইতে দান করেন প্রচুর অর্থ। শুধু তাহাই নয়, রাজার বিধান অনুসারে তর্কে পরাজিত পণ্ডিতেরা পরিণত হন আচার্য কোলাহলের সামন্ত পণ্ডিত রূপে এবং এই পণ্ডিত সম্রাটকে প্রতি বৎসর তাঁহারা প্রেরণ করেন সম্মান-দক্ষিণা।

সেদিন নিজের ভবনে বসিয়া আচার্য কোলাহল তাঁহার হিসাবের খাতাটি দেখিতেছিলেন। হঠাৎ তিনি বড় গম্ভীর হইয়া পড়েন, তখনি ভারপ্রাপ্ত শিষ্য বনজিকে সেখানে ডাকাইয়া আনেন।

রুষ্টস্বরে আচার্য বলেন, "বনজি, তুমি যে এতটা অকর্মণ্য তা আমার জানা ছিল না। আজ তিন বৎসর যাবৎ পণ্ডিত ভাষ্যাচার্য আমার বাৎসরিক সামন্ত-কর দেয় নি, তা তুমি জানো?"

হিসাবের খাতাটির দিকে একবার তাকাইয়া শিষ্য বনজি নিরুপায়ভাবে তখন মাথা চুলকাইতেছেন। আচার্য এবার ক্রুদ্ধস্বরে

বলিয়া উঠেন, "শোন, কালই তুমি ভাষ্যাচার্যের গৃহে যাও। বকেয়া পাওনা কড়ায় গণ্ডায় আদায় ক'রে নিয়ে এসো। নতুবা আমার এখানে তোমার স্থান নেই।"

"আজ্ঞে, কয়েক বৎসর ক্ষেতে শস্য হয় নি বলে ভাষ্যাচার্য আপনার পাওনা টাকা বাকী ফেলেছেন। বার বার তাগাদা দিয়েছি আমি, কিন্তু কোনো ফল হয় নি।"

"একটা ফল অবশ্যই হয়েছে। দেখে এসো গিয়ে, ঐ তল্লাটের লোকেরা ইতিমধ্যেই বলাবলি শুরু ক'রে দিয়েছে, 'ভাষ্যাচার্য আর আজকাল সামন্ত-কর দিচ্ছেন না, হয়তো রাজপণ্ডিত্ দিগ্‌বিজয়ী কোলাহলের বশ্যতা থেকে তিনি মুক্ত হয়েছেন।' আর তারা এটা বলতে পারছে, বন্‌জি, তোমারই মূর্খামির জন্যে।"

পরের দিনই গুরুর প্রতিনিধি হিসাবে বন্‌জি ভাষ্যাচার্যের চতুষ্পাঠীতে গিয়া উপস্থিত। আচার্য গ্রামান্তরে এক শিষ্যের বাড়িতে গিয়াছেন, কাল ফিরিবেন। প্রবীণ পড়ুয়ারা কোথায় বেড়াইতে গিয়াছে। চতুষ্পাঠীতে আচার্যের আসনের কাছে বসিয়া শাস্ত্র পাঠে রত শুধু দ্বাদশ বৎসরের পড়ুয়া বালক যামুন।

বন্‌জী ঘরে ঢুকিয়াই রুক্ষস্বরে প্রশ্ন করে, "ওরে ছোক্‌রা, তোদের আচার্য কোথায় পালিয়েছেন, বল্‌তো ?"

"কে আপনি ? এত বাজে বকছেন কেন ? আচার্য পালাতে যাবেন কেন ? কার ভয়ে ?" ক্রুদ্ধস্বরে উত্তর দেয় যামুন।

"আমি পণ্ডিত বন্‌জি, রাজপণ্ডিত বিদ্বজ্জন-কোলাহলের শিষ্য। তোর গুরুর সামন্ত-কর তিন বৎসরের বাকী পড়েছে, তিনি তা খেয়ে বসে আছেন। জানিস তো, এ টাকা আদায় না দিলে রাজার আদেশে তোদের চতুষ্পাঠী উঠে যাবে।"

ক্রোধে উত্তেজনায় বালক পড়ুয়া যামুনের শরীর তখন থর্‌থর করিয়া কাঁপিতেছে। দৃঢ়স্বরে সে উত্তর দেয়, "ত্যাখো বন্‌জি, আমার বুঝতে বাকী নেই, তোমার আচার্য দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিত হতে পারেন, বিদ্বজ্জন-কোলাহল উপাধি তাঁর থাকতে পারে, কিন্তু বিদ্যা বস্তুটি

তাঁর ভেতরে আদৌ নেই। আর তাঁর ছাত্র তুমি যে একটি গণ্ডমূর্খ, তা তোমার বচন ও বাচন ভঙ্গীতেই প্রকাশ পাচ্ছে।"

"এতবড় স্পর্ধা তোর, ছোকরা! সামনে দাঁড়িয়ে যা-তা বলে যাচ্ছিস। আচার্য কোলাহল যে কে, কি তাঁর প্রতাপ, তা তুই জানিসনে। জানে তোর গুরু। যাক্, এই আমি বলে দিয়ে যাচ্ছি, এ চতুষ্পাঠী আমি মাটিতে মিশিয়ে দিয়ে তবে ছাড়বো।"

"তা তোমার যা সাধ্য তা করতে পারো। কিন্তু এটা জেনে রেখো, তোমার গুরু যে বিদ্যাহীন, আমার একথাটি পরম সত্য।"

"তার মানে?" মারমুখী হয়ে রুখে দাঁড়ায় বনৃজি।

বিদ্যা অখণ্ড বোধ এনে দেয়, সমদর্শিতা দেয়, বিনয় দেয়। সর্বভূতকে বেঁধে নেয় স্নেহ প্রেমের ডোরে। সে বিদ্যা তোমার আচার্যের নেই। আরো শুনে নাও মূর্খ! বিদ্ হচ্ছে আত্মজ্ঞানের আলো, ঐশ্বরীয় আলো, এ আলো যিনি পেয়েছেন তিনিই হচ্ছেন বিদ্বান্। তোমার আচার্য দুর্ভাগা, কূট তার্কিকতার ভাগাড়ে পড়ে তাই কেবলই খাবি খাচ্ছেন।"

বনৃজি ক্ষিপ্তপ্রায় হয়, চতুষ্পাঠী হইতে বাহির হইয়া আসে। চীৎকার করিয়া গালমন্দ করিতে থাকে জঘন্য ভাষায়।

বালক পড়ুয়া যামুন এবার প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়ায়, দৃঢ় সংযত কণ্ঠে বলিয়া ওঠে, "শোন বনৃজি তোমার গুরুর এই অন্ধ অহমিকা এবং ঔদ্ধত্য আমি ভেঙে দেবো, সংকল্প করেছি। প্রতিপক্ষ হিসাবে আমি তাঁকে তর্কযুদ্ধে আহ্বান করছি। রাজসভায় এই তর্ক অনুষ্ঠিত হবে একথাটি তাঁকে এবং পাণ্ড্যরাজকে তুমি জানিয়ে দেবে।"

বিস্ময়ে বাক্‌রোধ হয় বনৃজির। এ বালক কি পাগল? বারো বৎসরের একটা নবীন পড়ুয়া, অর্বাচীন ছোকরা, তর্কবিচারে আহ্বান করছে দক্ষিণ ভারতের শ্রেষ্ঠ রাজপণ্ডিতকে? তবে কি বনৃজি এতক্ষণ একটা পাগলের সঙ্গে ঝগড়া ও চেঁচামেচি করিতেছে?

সংযত ও প্রশান্ত কণ্ঠে বালক যামুন আবার জানায়, "বনৃজি, আমার কথাকে বালকের কথা বলে উড়িয়ে দিয়ো না যেন। আচার্য

নাথমুনি আমার পিতামহ, আর ঈশ্বরমুনি আমার পিতা। আমাদের বংশের ওপর প্রভু শ্রীরঙ্গনাথের কৃপা ও বর রয়েছে। আরো শুনে রাখো, বনজি, আমার গুরুর কৃপায় বহুতর শাস্ত্র আমি ইতিমধ্যে আয়ত্ত করেছি। আচার্য কোলাহলকে তর্কে আহ্বান করার শক্তি আমি ধারণ করি। শাস্ত্রতত্ত্ব বা কূটপ্রশ্ন যে কোনো দিক দিয়ে আমি তাঁকে ধরাশায়ী করতে পারবো, এ বিশ্বাসও আমার আছে।"

পণ্ডিত বনজি রাগে গজ্ গজ্ করিতে করিতে তখনি স্থান ত্যাগ করে, ত্বরায় উপনীত হয় রাজধানীতে। সরাসরি রাজসভায় গিয়া নিবেদন করে ভাষ্যাচার্যের ছাত্রের সব কথা।

সকল কিছু শোনার পর আচার্য কোলাহল ক্রোধে ফাটিয়া পড়েন, এ ঔদ্ধত্যের সমুচিত দণ্ড দিবার জন্য রাজাকে বলিতে থাকেন। সভাসদেরাও বালকের ধৃষ্টতায় কম বিস্মিত হন নাই।

পাণ্ড্যরাজ গম্ভীর স্বরে বলেন, "আমার মনে হয়, শুধু একটি বালক পড়ুয়ার কথা নিয়ে এত উত্তেজিত হয়ে ওঠা আমাদের পক্ষে ঠিক নয়। চতুষ্পাঠীর যিনি পরিচালক সেই ভাষ্যাচার্যের কাছে আমি দূত পাঠাচ্ছি। সে জেনে আসুক, ভাষ্যাচার্য নিজে এ-বিষয়ে কি বলতে চান। হয় তিনি তাঁর ছাত্রের হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করুন, নয়তো পরিষ্কার ক'রে জানিয়ে দিন তর্কবিচার সম্পর্কে তাঁর মতামত।" বিশেষ পত্রী দিয়ে তখনি এক দূতকে প্রেরণ করা হইল।

এদিকে বিদ্যালয় হইতে ফিরিয়া আসার পরই ভাষ্যাচার্য যামুনের মুখ হইতে সকল কথা শুনিলেন। ভয়ে তাঁহার মুখ শুকাইয়া গেল। কহিলেন, "বৎস যামুন, এ তুমি অত্যন্ত অসমীচীন কাজ করেছো। আচার্য কোলাহল দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত, তাছাড়া, অত্যন্ত আত্মম্ভরীও বটে। অচিরে সে প্রতিহিংসা গ্রহণ করবে। এবার আমার এবং আমার এ চতুষ্পাঠীর দুর্দশার সীমা থাকবে না।"

প্রবীণ ও নবীন ছাত্রেরা একে একে সেখানে আসিয়া জড়ো হইয়াছে। সবারই চোখে মুখে আতঙ্কের ছায়া, চতুষ্পাঠীর উপরে রাজরোষ ঘনাইয়া আসিতেছে, এবার আর কাহারো নিস্তার নাই।

যুক্তকরে নিবেদন ক'রে যামুন, "প্রভু, আমায় আপনি ক্ষমা করুন। যে সব কথা আমি বনজিকে বলেছি, তা বলেছি তার ঔদ্ধত্যের সমুচিত জবাব দেবার জন্যে, আর আপনার সম্মান রক্ষার জন্যে।"

"যামুন, তুমি সংসার বিষয়ে অনভিজ্ঞ। আচার্য কোলাহলকে রাজা শ্রদ্ধা করেন গুরুর মতো, রাজসভায় তাঁর বিপুল প্রতিপত্তি, তাঁর শিষ্যকে কঠোরভাবে বলা ও চটিয়ে দেওয়া তোমার উচিত হয় নি। অনেক জটিলতা ও বিপদের সৃষ্টি করলে তুমি।"

"প্রভু, আপনার মান সম্ভ্রমের মুখ চেয়েই তো আমি এ বিপদের ঝুঁকি নিয়েছি। তাছাড়া, আমার অন্তরাত্মা থেকে কে যেন বার বারই বলছে, কোনো ভয় নেই। তোমার মেধা ও প্রতিভা দিয়ে গুরুর সম্মান রক্ষা করো, আত্মম্ভরী আচার্য কোলাহলের সম্মুখীন হও। জয় তোমার সুনিশ্চিত।"

আচার্য কিছুকাল চুপ করিয়া রহিলেন, কহিলেন, "বৎস প্রভু শ্রীরঙ্গনাথের প্রিয় ভক্ত, সিদ্ধ মহাত্মা, নাথমুনির পৌত্র তুমি। তাছাড়া, আমি তো জানি, ঈশ্বর প্রদত্ত কি অসামান্য প্রতিভা নিয়ে তুমি জন্মেছো, মাত্র বারো বৎসর বয়সে কি বিপুল শাস্ত্রজ্ঞান তুমি আয়ত্ত করেছো। হয়তো ঈশ্বরের কোনো অভিপ্রায় রয়েছে এই ব্যাপারে তোমার মাধ্যমেই হয়তো আচার্য কোলাহলের দম্ভ চূর্ণ হবে, অত্যাচার দূর হবে, এ দেশের সারস্বত জীবন হয়ে উঠবে শুদ্ধতর, পবিত্রতর।

"আমায় আশীর্বাদ করুন, প্রভু। আপনার প্রসাদে যেন জয়যুক্ত হই আমি"—গুরুর চরণ বন্দনা করিয়া প্রার্থনা জানায় যামুন।

গুরু আশীর্বাদ করিলেন বটে, কিন্তু মন হইতে আতঙ্ক দূর হইল না। দৈবী কৃপা ছাড়া আসন্ন বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার আর কোনো উপায় নাই।

পরের দিন ভোর হইতে না হইতেই পাণ্ড্যরাজের দূত আসিয়া উপস্থিত। পণ্ডিত ভাষ্যাচার্য পত্রীর উত্তরে পরিষ্কার ভাষায় জানাইয়া

দিলেন,—তাঁহার ছাত্র বালক হইলেও অমানুষী প্রতিভা ও বিদ্যাবত্তার অধিকারী। যথাসময়ে প্রস্তাবিত তর্ক-বিচারের সভায় সে উপস্থিত থাকিবে।

সারা পাণ্ড্যরাজ্যে এ সংবাদ দাবানলের মতো ছড়াইয়া পড়িল। আচার্য কোলাহল বহুলশ্রুত দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিত, সেই মহারথীকে বিচারদ্বন্দ্বে আহ্বান করিয়াছে এক বারো বৎসরের বালক। এর চাইতে আশ্চর্যকর কথা আর কি হইতে পারে।

আচার্য কোলাহল ছিলেন অতিমাত্রায় বিদ্যাদর্পী, ধরাকে তিনি সরা জ্ঞান করিতেন। কাজেই পাণ্ড্য রাজসভায় এবং রাজধানীর বুধ-সমাজে তাঁহার শত্রুর অভাব নাই। অনেকে ভাবেন, দৈবের বিধানে যদি কোলাহলের পতন ঘটে, তবে কি চমৎকারই না হয়!

সর্বত্র জটলা শুরু হইয়া যায়, কে জানে এই বালক প্রতিদ্বন্দ্বী ঐশ্বরীয় শক্তিতে শক্তিমান্ কিনা। নতুবা এত স্পর্ধা তার! সারা দেশের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতকে পরাজয় করার সাহস তাহার কি করিয়া হইল?

বালক তর্কযোদ্ধা যামুন যে বিস্ময়কর পাণ্ডিত্য ও প্রতিভার অধিকারী, রাজা ইতিমধ্যে একথা জানিয়াছেন। কিন্তু কি করিয়া সে দুর্ধর্ষ তর্কশূর কোলাহলের সঙ্গে আঁটিয়া উঠিবে, সে কথাটিই তিনি ভাবিয়া পাইতেছেন না।

রাজা ও রানী সেদিন বাগানে বেড়াইতেছেন, উভয়ের মধ্যে বিতর্ক উঠিল, তর্কসভায় কে হইবে জয়ী?

রাজার ধারণা রাজসভায় দিগ্‌বিজয়ীর সম্মুখে দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে বালক ভয়ে মূর্ছা যাইবে। রানী কিন্তু ভাবেন ভিন্নরূপ। বলেন, "মহারাজ আমার কিন্তু কেবলই মনে হচ্ছে, এ বালক ঐশ্বরীয় শক্তিতে শক্তিমান্। যে ভাবে সাহস ক'রে সে তর্কযুদ্ধে নামতে আসছে তাতে আবার মনে হয়, প্রতিপক্ষকে অবশ্য সে হারিয়ে দেবে, মহারাজ।"

"এটা তার সাহস, না দুঃসাহস, না হাস্যকর প্রয়াস, তা কে বলবে?" সহাস্যে মন্তব্য করেন রাজা।

"মহারাজ, ছদিন থেকে বার বারই আমার মনে চিন্তার ঝলক খেলে যাচ্ছে। বারো বৎসর বয়সেই তো বালক অষ্টাবক্র রাজা জনকের সভাপণ্ডিত আচার্য বন্দীকে হারিয়েছিলেন শাস্ত্রীয় তর্কে। আর আচার্য শঙ্কর? যোল বৎসর বয়সেই হলেন তিনি ভারতজয়ী পণ্ডিত। আমার দৃঢ় ধারণা, মহারাজ, এ বালক ঐ ধরনের ঐশ্বরীয় শক্তির অধিকারী। সে জিতবেই জিতবে।"

"যদি সে না জেতে, তবে?"

"তবে আমি আপনার দাসীদের দাসী হয়ে থাকবো মহারাজ,"—বাজী ধরে বসেন রানী।

কথায় কথায় পাণ্ড্যরাজেরও জেদ চড়িয়া যায়। উত্তেজিত কণ্ঠে বলেন, "তা হলে রানী, তুমিও শুনে নাও আমার শপথ। যদি বালক যামুন জয়ী হয়, আমি তৎক্ষণাৎ দান করবো তাকে আমার রাজ্যের অর্ধেক অংশ। দেখা যাক, কে জয়ী হয় এই বিচারে।"

রাজা ও রানীর এই বাজী ধরার কথা অচিরে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে, জনসাধারণের কৌতূহলের সীমা থাকে না।

রাজার প্রেরিত স্বর্ণখচিত শিবিকায় আরোহণ করিয়া যামুন রাজধানী মাদুরায় উপনীত হইলেন। শুধু রাজধানীরই নয়, রাজ্যের দূর দূরান্তের কৌতূহলী মানুষেরাও ভিড় করিয়াছে রাজসভায়। শাস্ত্রবিদ্ আচার্য, শিক্ষিত ও অশিক্ষিত বহু নাগরিকই সেদিন সভায় মিলিত হইয়াছে সেদিনকার অসম ও অদ্ভুত তর্কযুদ্ধ দেখার জন্য। উত্তেজনা ও উন্মাদনার অবধি নাই।

বালক যামুন ধীর গম্ভীরভাবে সভাকক্ষে উপস্থিত হয়, নতশিরে রাজা ও রানীকে জ্ঞাপন করে তাহার শ্রদ্ধা। এই ক্ষুদ্র বালকের দিকে এতক্ষণ কৌতূহল ভরে তাকাইয়া ছিলেন আচার্য কোলাহল। এবার রানীর দিকে মুখ ফিরাইয়া তাচ্ছিল্যের হাসি হাসিয়া প্রশ্ন করেন, "আলওয়ান্দারা?" অর্থাৎ, এই বালকই কি করবে আমায় পরাজিত?

বালক পণ্ডিতের প্রতি পরিপূর্ণ আস্থা জ্ঞাপন করিয়া রানী দৃঢ়

স্বরে বলিয়া উঠেন, "আলওয়ান্দার," অর্থাৎ, হাঁ, এই বালকই তো করবে পরাজিত।[১]

রাজসভায় তিল ধারণের স্থান নাই, উৎসাহ উদ্দীপনায় সবাই চঞ্চল, প্রতীক্ষায় রহিয়াছে তর্কযুদ্ধের।

পাণ্ড্যরাজ নির্দেশ দেবার সঙ্গে সঙ্গে আচার্য কোলাহল শুরু করেন তাঁহার প্রশ্ন। পাণিনি ও অমরকোষ হইতে কয়েকটি প্রশ্ন প্রথমে তিনি উত্থাপন করেন। ঋজু, দৃপ্ত ভঙ্গীতে দাঁড়াইয়া অবলীলায় যামুন তাহার উত্তর দেন। মীমাংসার দক্ষতায় এবং বাচনভঙ্গীর চমৎকারিত্বে দর্শকেরা প্রীত হইয়া উঠেন। ঘন ঘন করতালিতে সভাগৃহ মুখর হইয়া উঠে।

এবার যামুনের প্রশ্ন করার পালা। যামুন কিন্তু বেশ বুঝিতে পারিয়াছেন, দিগ্‌বিজয়ী আচার্য কোলাহল তাঁহাকে আদৌ কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী পণ্ডিতের সম্মান দেন নাই। গণ্য করিয়াছেন এক নগণ্য বালক পড়ুয়ারূপে, তাই এবার নিজের প্রশ্নবাণ নিক্ষেপের আগে কোলাহলকে তিনি চটাইয়া দিলেন। কহিলেন, "আচার্য, আপনার প্রশ্নগুলোর কোনো গুরুত্ব নেই। আপনি বোধহয় আমাকে ক্ষুদ্রকায় বালক ভেবে অবজ্ঞা করেছেন। আরো ভেবেছেন, আপনার মতো বিরাটকায় হলে এবং বিরাট উদর থাকলেই পাণ্ডিত্য হয় অগাধ। তবে কি আমরা ধরে নেবো, একটা বিশালকায় হাতি আপনার চাইতে বড় পণ্ডিত?"

সভায় হাসির হররা বহিয়া যায়, আর সেই সঙ্গে গণ্ডগোলও বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

যামুন আবার কহিলেন, "আচার্যবর, আপনার বোধহয় জানা আছে, অষ্টাবক্র মুনি যখন জনকের সভাপণ্ডিত বন্দীকে পরাভূত করেন, তখন তাঁর বয়স ছিল বারো বৎসর। কাজেই বয়সের কথা ভেবে আমার সঙ্গে যেন প্রশ্নোত্তর করবেন না।"

---

১ বেদান্ত দর্শনের ইতিহাস (১ম ভাগ): প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী, শঙ্কর-মঠ, বরিশাল।

পাণ্ড্যরাজ হাসিয়া কহিলেন, "ও সব কথা থাক। এবার রাজ-পণ্ডিতকে প্রশ্ন করা হোক। সত্যকার তর্কবিচার চলুক।"

রাজার নির্দেশ মানিয়া নিয়া যামুন এবার উঠিয়া দাঁড়ান, বলেন, "আচার্য কোলাহল, আপনাকে আমি তিনটি অতি সাধারণ প্রশ্ন করবো। আপনি সাধ্যমতো উত্তর দিন সভার সমক্ষে। আমার প্রথম বক্তব্য : আপনার মাতা বন্ধ্যা নন। এ-বাক্যটি আপনি খণ্ডন করুন।"

আচার্য কোলাহল তো হতবাক্। একি অদ্ভুত হেঁয়ালিপূর্ণ বাক্য! নিজের মাতার পুত্ররূপে জলজ্যান্ত তিনি রাজসভায় বসিয়া আছেন, কি করিয়া তিনি বলিবেন যে তাঁহার মাতা বন্ধ্যা? নাঃ, এ কোনো প্রশ্নই নয়। উত্তরও ইহার কিছু দেওয়া যায় না।

শ্লেষাত্মক হাসি হাসিয়া যামুন বলেন, "এবার আমার আর দুটি বাক্য শুনুন আচার্যবর। আমি বলছি, পাণ্ড্যরাজ সম্পূর্ণরূপে নিষ্পাপ। আপনি এটি খণ্ডন করুন। আমার শেষ বাক্য,—আমাদের রানীমাতা, যিনি এখানে সিংহাসনে উপবিষ্টা রয়েছেন তিনি সাবিত্রীর মতো সাধ্বী। আপনি আমার এ বাক্যটিও খণ্ডন করুন।"

আচার্য কোলাহল বিভ্রান্ত ও বিব্রত হইয়া পড়েন। অভিযোগের সুরে রাজাকে বলিয়া উঠেন, "মহারাজ, এ দুটি বাক্য খণ্ডন করতে হলে আমায় প্রমাণ করতে হবে, আপনি পাপী এবং আমাদের রানীমা সতী সাধ্বী নন। না—না, এ বড় ধৃষ্ট প্রশ্ন, বড় কূট এবং হেঁয়ালিপূর্ণ প্রশ্ন। আমি এর উত্তর দেব না।"

পণ্ডিত কোলাহলের পক্ষীয় পণ্ডিত এবং ছাত্রেরা সভামধ্যে চেঁচামেচি শুরু করিয়া দেয়,—এসব প্রশ্ন অশালীন, অসমীচীন। কোলাহলের বিরোধীরাও মহাউত্তেজিত। তাহারা বার বার জেদ করিতে থাকে, প্রশ্ন যখন করা হইয়াছে—তাহার খণ্ডন অবশ্যই করিতে হইবে। দুই পক্ষের এই বাদানুবাদে রাজসভা মুখর হইয়া উঠে।

সবাইকে শান্ত হইতে আদেশ দিয়া রাজা কহিলেন, "বেশ তো,

আচার্য কোলাহল যখন উত্তর দিতে অসমর্থ হয়েছেন, এবার প্রতিপক্ষ যামুনই তাঁর নিজের প্রশ্ন খণ্ডন করবেন।"

যামুন উঠিয়া দাঁড়ান, রাজা ও বুধমণ্ডলীকে অভিবাদন জানাইয়া বলেন, "এবার তাহলে আমার প্রস্তাব একটি একটি ক'রে আমিই খণ্ডন করছি। আচার্য কোলাহল তাঁর মাতার একমাত্র পুত্র, তবুও আমি বলবো, তাঁর মাতা বন্ধ্যা। শ্রেষ্ঠ ধর্ম-শাস্ত্রকার মনু বিধান দিয়েছেন, একমাত্র পুত্রের পিতা একাধিক পুত্র লাভের জন্য পুনরায় বিবাহ করতে পরে। শাস্ত্রকার চেয়েছেন, পুত্রদের মধ্যে একটি যেন বেঁচে থাকে এবং গয়ায় গিয়ে পিণ্ড দিতে সক্ষম হয়। মেধাতিথির ভাষ্যেও আমরা দেখি—একঃ পুত্রোঽপুত্রো বা। সুতরাং আচার্য কোলাহলের মাতাকে বন্ধ্যা বলা যেতে পারে।"

সভাকক্ষে গুঞ্জন উঠে। অনেকেই বলিতে থাকেন, "যেমন কূট প্রশ্ন, তেমনি কৌশলপূর্ণ খণ্ডন। বেশ বেশ!"

যামুন অতঃপর বলা শুরু করেন, "এবার রাজার নিষ্পাপত্বর কথায় আসছি। সংহিতার একটি শ্লোকে মনু বলেছেন, প্রজার রক্ষণাবেক্ষণের পরিবর্তে রাজা প্রজার কাছ থেকে কর গ্রহণ করেন। প্রজার উৎপন্ন বস্তুর ষষ্ঠাংশ তাঁর প্রাপ্য; এই উৎপন্ন বস্তু বলতে ভৌতিক এবং আধ্যাত্মিক দুই-ই বুঝায়। কাজেই একথা বলা যেতে পারে যে, রাজা তাঁর প্রজাদের পাপপুণ্যেরও এক ষষ্ঠাংশ গ্রহণ ক'রে থাকেন। আপনারা বলুন, রাজ্যের প্রজারা কি নিষ্পাপ? তারা যদি নিষ্পাপ না হয়ে থাকে, তবে রাজাও তো নিষ্পাপ নন।"

"এবার মহারানীর সাধ্বীত্বের কথা। মনু বলেছেন, অভিষেক-অনুষ্ঠানের সময় রাজার দেহে বিরাজ করতে থাকেন সূর্য, চন্দ্র, ইন্দ্র, বরুণ প্রভৃতি অষ্টদিক্‌পাল। তদনুযায়ী রাজ্ঞী রাজার এবং তাঁর অভ্যন্তরস্থিত অষ্টদিক্‌পাল, উভয়েরই মহিষী। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে কি ক'রে বলবো, তিনি সাবিত্রী-সমা সাধ্বী[১]?"

বালক পণ্ডিতের প্রতিভা ও শানিত বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্যে সবাই

১ যামুনাচার্য : জীবনকৃষ্ণ দে, উদ্বোধন, চৈত্র ১৩৭৭

চমৎকৃত। সবাই উপলব্ধি করিলেন। শাস্ত্রপারঙ্গম তো তিনি বটেই, ব্যাখ্যান কৌশল, কূটবুদ্ধি ও চাতুর্যেও তিনি অপরাজেয়।

প্রতিপক্ষ দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত কোলাহল নীরবে নত মস্তকে বসিয়া আছেন আর সভাকক্ষের সবাই যামুনকে জানাইতেছেন তাঁহাদের সোল্লাস অভিনন্দন।

অতঃপর রাজার আদেশে শুরু হয় বেদ, উপনিষদ ও ধর্মশাস্ত্রের দুরূহ তত্ত্ব ও দার্শনিকতার বিচার-দ্বন্দ্ব। আচার্য কোলাহলের সে উৎসাহ, সে আত্মবিশ্বাস, সে দম্ভ আর নাই। সারস্বত জীবনের দীপশিখাটি কে যেন এক ফুৎকারে নিভাইয়া দিয়াছেন। কোনো-ক্রমে হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া তিনি শাস্ত্রের জটিল তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে চাহিতেছেন, আর প্রতিভাধর বালক প্রতিদ্বন্দ্বীর এক একটি তীক্ষ্ণ প্রশ্নবাণে হইতেছেন বিপর্যস্ত। বিচারের শেষের দিকে তর্কশূর কোলাহল একেবারে ভাঙিয়া পড়িলেন। এবার সমবেত বুধমণ্ডলীর সমর্থন লাভের পর পাণ্ড্যরাজ ঘোষণা করিলেন, এ বিচারে যামুন জয়লাভ করিয়াছেন।

তখনি চারিদিকে ধ্বনিত হয় বালক পণ্ডিত যামুনের সাধুবাদ ও জয়ধ্বনি, জয়মাল্য অর্পিত হয় তাঁহার কণ্ঠে।

রাজ্ঞীর আনন্দের অবধি নাই। পার্শ্বে উপবিষ্ট হতমান, নতশির, আচার্য কোলাহলের দিকে তাকাইয়া শ্লেষের সুরে বলিয়া উঠেন, "আলওয়ান্দার, আলওয়ান্দার।" অর্থাৎ, আচার্য তা'হলে এই বালকই শেষটায় পরাজিত করল আপনার মতো দিক্‌পাল আচার্যকে।

তর্কবিচার সভা ভঙ্গ হইল। অতঃপর পাণ্ড্যরাজ রানীর নিকট যে শপথ করিয়াছিলেন তাহা রক্ষা করিলেন, যামুনকে প্রদান করিলেন রাজ্যের অর্ধাংশ।

পাণ্ড্যরাজের বিচার সভার সেদিনকার এই বিজয়ী বালক পণ্ডিতই উত্তরকালের দেশবরেণ্য মহাসাধক যামুনাচার্য। ভক্তিবাদের ভাস্বর আলোকস্তম্ভরূপে দশম শতকের দাক্ষিণাত্যে ঘটে তাঁহার অভ্যুদয়। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের মহান্ উদ্‌গাতা ও ধারক বাহকরূপে,

তিনি পরিচিত হইয়া উঠেন। আচার্য রামানুজের প্রেরণাদাতা ও আরাধ্য পূর্বসূরীরূপে সারা ভারতে অর্জন করেন অতুলনীয় কীর্তি।

দক্ষিণ ভারতে মাদুরাইর এক বিখ্যাত বিষ্ণুভক্ত ব্রাহ্মণ পরিবারে যামুনাচার্যের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম ঈশ্বরমুনি। পিতামহ নাথমুনি ছিলেন এক দিক্‌পাল পণ্ডিত, ভক্তিসিদ্ধ মহাপুরুষ বলিয়াও চারিদিকে তাঁহার খ্যাতি ছিল।

শঙ্কর মঠের স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী এই মনীষী ও সাধক সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "দশম শতাব্দী হইতে বিশিষ্টাদ্বৈত সাধনার স্রোত প্রবল বেগে প্রবাহিত হইয়া ভবিষ্যতে মহাপ্লাবনের সূচনা করিতে লাগল। মহাপুরুষ শ্রীনাথমুনি এই দার্শনিক যজ্ঞের প্রথম পুরোহিত। অনুমান ৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের প্লাবন সূচিত হয়। যামুনাচার্যের সময় নাথমুনির সাধনার ফল ফলিতে আরম্ভ হয় এবং রামানুজের সাধনায় সেই ফল পরিপূর্তি লাভ করে। নাথমুনির হৃদয়ে যে প্লাবনের সূচনা হয়, সেই প্লাবনই পরবর্তীকালে সমস্ত ভারতকে প্লাবিত করিয়াছে[১]।"

দক্ষিণী ভক্তসমাজে নাথমুনি শ্রীবৈষ্ণব সমাজের প্রথম আচার্য-রূপে সম্মানিত। তাঁহার সম্পর্কে প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব আচার্য বেঙ্কটনাথ লিখিয়াছেন,—'সমস্ত অজ্ঞান-অন্ধকারের বিনাশক আমাদের এই দর্শন নাথমুনির দ্বারা সূচিত, যামুনের বহু প্রয়াসের মাধ্যমে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, আর রামানুজের দ্বারা সম্যক্‌রূপে বিস্তারিত[২]।'

নাথমুনি 'ন্যায়তত্ত্ব' নামে একটি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন বলিয়া বেঙ্কটনাথ উল্লেখ করিয়াছেন, এবং কিছু কিছু উদ্ধৃতির অনুবাদও তিনি দিয়াছেন। কিন্তু ঐ গ্রন্থ আর পাওয়া যায় নাই। অধ্যাপক শ্রীনিবাসচারীর মতে, ঐটি হইতেছে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ মতের প্রথম আধুনিক গ্রন্থ[৩]।

১ বেদান্ত দর্শনের ইতিহাস : স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, শঙ্কর মঠ, বরিশাল।

২ সঙ্কল্পসূর্যোদয় : বেঙ্কটনাথ

৩ দ্য ফিলসফি অব বিশিষ্টাদ্বৈত : জি, এন, শ্রীনিবাসচারী, আদেয়ার।

উত্তরজীবনে নাথমুনি শ্রীরঙ্গনাথের এক অন্তরঙ্গ সিদ্ধভক্ত ও শ্রীরঙ্গমের শ্রেষ্ঠ আচার্যরূপে বিপুল খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীসম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ আচার্য রামানুজ তাঁহার স্তোত্ররত্ন ও অন্যান্য রচনায় পূর্বসূরী নাথমুনির কথা সশ্রদ্ধভাবে উল্লেখ করিয়াছেন, প্রশস্তি গাহিয়াছেন অকুণ্ঠভাবে।

নাথমুনির একমাত্র পুত্র ঈশ্বরমুনি। এই পুত্রটিকে পরম স্নেহে ও আদরে তিনি লালন করেন, বড হইয়া উঠিলে সযত্নে নিজের কাছে রাখিয়া নানা শাস্ত্রে তাঁহাকে পারঙ্গম করিয়া তুলেন। শাস্ত্রজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে পুত্র ঈশ্বরের জীবনে দেখা দেয় প্রবল বিষ্ণুভক্তি, ইষ্টদেব বিষ্ণুর অর্চনা ও সাধনায় তিনি নিবিষ্ট হইয়া পড়েন। পুত্রের বিদ্যাবত্তা ও সাধননিষ্ঠা দর্শনে নাথমুনির অন্তর তৃপ্তি ও আনন্দে ভরিয়া উঠে।

অতঃপর তরুণ কৃতী পুত্রকে বিবাহ দেওয়াইয়া নাথমুনি তাহাকে সংসারাশ্রমে প্রবিষ্ট করেন এবং কয়েক বৎসর পরে, ৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ভূমিষ্ঠ হয় এক সুদর্শন, সুলক্ষণযুক্ত পৌত্র। ক্ষুদ্র স্বল্পবিত্ত সংসারে এ যেন দিবালোকের এক ঝলক আলোক-রশ্মি। সারা গৃহ আনন্দে উল্লাসে পূর্ণ হইয়া উঠে।

এই পৌত্রের নাম রাখা হয় যামুন, বালককাল হইতেই প্রকাশ পায় তাহার অসাধারণ মেধা ও প্রতিভা। একবারটি যাহা কিছু শ্রবণ করে, আর কখনো সে তাহা বিস্মৃত হয় না। শুধু তাহাই নয়, এক এক সময়ে অধীত বিষয় সম্পর্কে নূতন নূতন প্রশ্ন তুলিয়া শিক্ষকদের সে অবাক করিয়া দেয়।

ঈশ্বরমুনি শাস্ত্রবিদ্ ব্রাহ্মণ বংশের যোগ্য প্রতিনিধি হইয়া উঠিয়াছেন। পরম আদরের পৌত্র যামুনও গড়িয়া উঠিতেছেন সহজাত শুভ সংস্কার নিয়া। আগামী কয়েক বৎসরের মধ্যেই সে যে এক কৃতী পড়ুয়া হইয়া উঠিবে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। কিন্তু এসময়ে নাথমুনির সংসার জীবনে নিপতিত হয় দৈবের এক নির্মম আঘাত। আকস্মিক এক কঠিন রোগে ভুগিয়া প্রিয় পুত্র ঈশ্বরমুনি ইহলোক ত্যাগ করেন।

একমাত্র পুত্রের এই বিয়োগ ব্যথায় নাথমুনি মুহ্যমান হইয়া পড়েন, হৃদয়ে জাগিয়া উঠে তীব্র বৈরাগ্যের আগুন। সংকল্প স্থির করিয়া ফেলেন, এবার চিরতরে সংসার ত্যাগ করিবেন, সন্ন্যাস নিয়া শুরু করিবেন কঠোর তপস্যা, প্রভু রঙ্গনাথজীর পবিত্র পীঠে অবস্থান করিয়াই কাটাইয়া দিবেন জীবনের বাকী দিনগুলি।

গৃহের লোকদের ভরণপোষণের মোটামুটি ব্যবস্থা করার পর বালক পৌত্র যামুনকে তিনি পাঠাইয়া দিলেন গুরুগৃহে। কুলপ্রথা অনুযায়ী এ বয়সে সবাই তাঁহারা শাস্ত্রপাঠ সমাপ্ত করিয়াছেন গুরুর সন্নিধানে বাস করিয়া। যামুনের জন্যও সেই ব্যবস্থাই করা হইল। পণ্ডিত ভাষ্যাচার্য একজন খ্যাতিমান্ শাস্ত্রবিদ্, সদাচারী ও বিষ্ণুভক্ত বলিয়াও তাঁহার সুনাম রহিয়াছে। যামুনকে তাঁহার আশ্রয়ে রাখিয়া নাথমুনি নিশ্চিন্ত হইলেন। তারপর একদিন শ্রীরঙ্গমে উপনীত হইয়া গ্রহণ করিলেন বৈষ্ণবীয় সন্ন্যাস।

বিষ্ণু আরাধনার সঙ্গে সঙ্গে নিগূঢ় যোগ সাধনায়ও ব্রতী হন নাথমুনি। অতঃপর কয়েক বৎসরের মধ্যে শ্রীরঙ্গম অঞ্চলে সাধক হিসাবে তাঁহার খ্যাতি ছড়াইয়া পড়ে। যোগে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, তাই সাধক মহলে তাঁহার সম্ভ্রমের সীমা ছিল না, সবাই তাঁহাকে অভিহিত করিত নাথমুনি নামে।

এদিকে অল্পকাল মধ্যে বালক যামুন পরিচিত হইয়া উঠেন ভাষ্যাচার্যের চতুষ্পাঠীর অন্যতম অগ্রণী ও প্রতিভাধর ছাত্ররূপে। এই নবীন পড়ুয়ার প্রতি পণ্ডিত ভাষ্যাচার্যের স্নেহ মমতার সীমা ছিল না। ঈশ্বরমুনির ঘরের ছেলে যামুন, স্বভাবতই পিতা ও পিতামহের সাত্ত্বিকী সংস্কার ও সহজাত মেধা নিয়া সে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। তদুপরি দিনের পর দিন প্রকাশ পাইতেছে তাঁহার মননশক্তি ও প্রতিভার চমৎকারিত্ব। গোড়া হইতেই আচার্য বুঝিয়া নিয়াছেন, তাঁহার এই বালক পড়ুয়া ঈশ্বরপ্রদত্ত অসামান্য প্রতিভার অধিকারী, কালে অবশ্যই সে গণ্য হইবে দিক্‌পাল পণ্ডিতরূপে। তাই স্বভাবতই

ভাষ্যাচার্য যামুনকে প্রাণ ঢালিয়া এতদিন পড়াইয়াছেন। গড়িয়া তুলিয়াছেন এক সর্বশাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিতরূপে।

ছাত্র যামুনকে কেন্দ্র করিয়া আচার্য অনেক কিছু আশা করিয়াছেন, ভবিষ্যতের সুখ স্বপ্ন দেখিয়াছেন। কিন্তু সে যে সেদিন হঠাৎ এমন করিয়া দুর্ধর্ষ পণ্ডিত কোলাহলের সহিত সংঘর্ষ বাধাইয়া বসিবে এবং সে সংঘর্ষে জয়ী হইবে, এ কথা তাঁহার মনে কোনোদিন স্থান পায় নাই।

এবার ভাষ্যাচার্যের আনন্দ আর ধরেনা। দর্পী অত্যাচারী আচার্য কোলাহল পাণ্ড্যরাজ্য ছাড়িয়া দূরে পলায়ন করিয়াছে। বালক শিষ্যের বিজয়ে ভাষ্যাচার্যের নিজের খ্যাতি প্রতিপত্তি যেমন বাড়িয়াছে, তেমনি জাঁক বাড়িয়াছে তাঁহার চতুষ্পাঠীর।

বিজয়ী নবীন পণ্ডিত যামুনের জীবনের ধারা এবার বহিয়া চলে এক নূতনতর খাতে। নিজে তিনি বালক, রাষ্ট্রীয় কর্মের কোনো অভিজ্ঞতা নাই। তাই পাণ্ড্যরাজের অভিভাবকত্ব ও সহায়তায় পরিচালনা করিতে থাকেন তাঁহার নবলব্ধ রাজ্যের সমস্ত কিছু দায়িত্ব। এই সঙ্গে বহিয়া চলে তাঁহার সারস্বত জীবনের ধারা। দেশ দেশান্তর হইতে শাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিতেরা আসিয়া জড়ো হন তাঁহার রাজধানীতে এই পণ্ডিতদের সাহচর্যে যামুন গড়িয়া তোলেন এক শাস্ত্রপারঙ্গম বুধমণ্ডলী।

ক্রমে যৌবনে পদার্পণ করেন রাজা যামুন। শক্তি, আত্মবিশ্বাস ও প্রতিভার মূর্তবিগ্রহ তিনি। পার্শ্ববর্তী রাজন্যদের উপর স্বভাবতই তাঁহার প্রভাব ধীরে ধীরে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। রাজ্যের আয়তন অচিরে বৃদ্ধি পায়, রাজকীয় বিত্ত বিভব হয় পুঞ্জীভূত এবং ভোগ বিলাসের পরিবেশ সৃষ্টি হয় তাঁহার চারিদিকে। দশ বারো বৎসরের মধ্যে যামুন পরিণত হন এক ধনজন পরিপূর্ণ রাজ্যের অধীশ্বররূপে।

স্বাধ্যায়ী, তপস্বী এবং দরিদ্র ব্রাহ্মণের গৃহে তাঁহার জন্ম। কিন্তু

ভাগ্যচক্রের আবর্তনে রাজশক্তি ও রাজ্যবৈভবের দিকেই তিনি আকৃষ্ট হইয়া পড়েন।

আরো কয়েক বৎসর অতীত হইলে স্বভাবতই যামুন বিস্মৃত হন তাঁহার প্রথম জীবনের সাত্ত্বিকী, সদাচারী, তপোনিষ্ঠ চিত্তবৃত্তির কথা। রাজ্যের প্রসার ও প্রভাবের জন্য, ধন মান ও বিলাস বৈচিত্র্যের জন্য, দিন দিন তিনি উৎসাহী হইয়া উঠেন। প্রথম জীবনের পরম সম্ভাবনার উপর ধীরে ধীরে নামিয়া আসে বিস্মৃতির যবনিকা।

এভাবে প্রায় তেইশ বৎসর কাল পরমানন্দে তিনি রাজদণ্ড পরিচালনা করেন এবং সর্বত্র পরিচিত হইয়া উঠেন এক কৌশলী রাজনীতিবিদ্ ও দক্ষ শাসকরূপে। রাজ্যের পরিধি তাঁহার দিনের পর দিন আরো বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

গৃহত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস নিবার পরও নাথমুনি কিন্তু পৌত্র যামুনের কথা বিস্মৃত হন নাই। বরং তাঁহার কল্যাণময় দৃষ্টি সতত নিবদ্ধ রহিয়াছে তাঁহারই দিকে। সিদ্ধপুরুষের উপলব্ধিতে আসিয়া গিয়াছে যামুনের আত্মিক জীবনের পরম সম্ভাবনার কথা। ধ্যান বলে তিনি জানিয়াছেন, ভক্তিধর্মের এক মহান্ নেতারূপে ভবিষ্যতে ঘটিবে তাঁহার অভ্যুদয়, সহস্র সহস্র সাধক লাভ করিবে তাঁহার পরমাশ্রয়। তাছাড়া, ইহাও তিনি জানিয়াছেন, যামুনের তপস্যা, তাঁহার সিদ্ধি, তাঁহার দার্শনিকতা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের এক দৃঢ় ভিত্তিভূমি গড়িয়া তুলিবে, সারা ভারতের ধর্ম-সংস্কৃতির আন্দোলনে ঘটাইবে এক কল্যাণময় পদক্ষেপ।

যামুন রাষ্ট্র পরিচালনার কাজ নিয়া সদা ব্যস্ত। কিন্তু দিব্য দৃষ্টি সহায় নাথমুনি যে দেখিয়াছেন, তাঁহার সহজাত সাত্ত্বিকী সংস্কার, ত্যাগ বৈরাগ্য ও কৃচ্ছ্রময় তপস্যার সংস্কার, জীবনের গভীরতর খাতে বহিয়া চলিয়াছে অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার মতো। সে প্রচ্ছন্ন ধারার আত্মপ্রকাশের আর বেশী দেরি নাই। লগ্নটি প্রায় আসিয়া পড়িয়াছে।

এদিকে নাথমুনির নিজের মহাপ্রয়াণের দিনটিও নিকটবর্তী হয়। বিদায়ের দিন অন্তরঙ্গ শিষ্য, উচ্চকোটির ভক্তিসিদ্ধ সাধক, মানাক্কাল নম্বিকে নিভৃতে নিজের শয্যার পাশে ডাকাইয়া আনিলেন। কহিলেন, "নম্বি, তোমার ওপর বহু কর্তব্যের ভারই বহুবার চাপিয়েছি। এবার চাপিয়ে দেবো একটি ঐশ্বরীয় কাজের দায়িত্ব।

"আজ্ঞা করুন প্রভু, এ দাস যে কোনো কঠিন কাজে পিছপাও হবে না।" জোড়হস্তে নিবেদন করেন নম্বি।"

"তা জানি বৎস। এবার মন দিয়ে শোনো আমার কথা। আমার সময় পূর্ণ হয়েছে. আজই আমি এই দেহের খোলস ছেড়ে যাচ্ছি। কিন্তু তার আগে দক্ষিণদেশের সহস্র সহস্র ভক্তের, বিশেষ ক'রে শ্রীসম্প্রদায়ের অনুগামীদের একটা আশ্রয় গড়ে তোলার কথা আমি ভাব্‌ছি। নম্বি, তুমি আমার পৌত্র, রাজা যামুনকে তো জানো?

"আজ্ঞে হ্যাঁ, তাঁর ওখানে আমি কয়েকবার গিয়েছি। সদাচারী এবং ধার্মিক রাজা, তা স্বীকার করতে হবে।"

"শোনো নম্বি, যতই ভালো হোক, রাজত্ব নিয়েই সে মজে আছে। তা থেকে তাঁকে টেনে বার করতে হবে।"

"সে কি কথা, প্রভু, এ আপনি কি বলছেন?"

"হ্যাঁ নম্বি, তাই করতে হবে এবং তোমাকেই তা করতে হবে। প্রভু রঙ্গনাথ আমায় তাঁর স্বরূপ দেখিয়ে দিয়েছেন। একটা শক্তিধর মহাবৈরাগী প্রচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে রাজা যামুনের ভেতরে। সে জানে না যে সে ঈশ্বর প্রেরিত মহাসাধক। বহুজনের উদ্ধারকারী সে। কিন্তু আপন স্বরূপ সে বিস্মৃত হয়েছে, ডুবে আছে বিষয়ের পঙ্কে। তাকে সেই পঙ্ক থেকে টেনে তুলতে হবে, জানিয়ে দিতে হবে তাঁর প্রকৃত পরিচয়, বুঝিয়ে দিতে হবে ঐশ্বরীয় কার্যের গুরুদায়িত্বের কথা।"

"কিন্তু, প্রভু, আমায় দিয়ে কি ক'রে এই দুরূহ কাজ সম্পন্ন হবে, তা আমি বুঝে উঠতে পারছিনে।"

"তুমিই এটা করবে, বৎস। রাজা যামুন সব সময়ে রাজকার্যের জটিল জালে আবদ্ধ। তাঁকে কৌশলে তোমায় ভুলিয়ে আনতে

হবে শ্রীরঙ্গনাথের চরণ তলে। তাঁর ভেতরকার সুপ্ত শক্তিকে জাগিয়ে তুলতে হবে। রঙ্গনাথের কৃপায় তুমি ভক্তিসিদ্ধ হয়েছো। তোমার পবিত্র সঙ্গ দেবে যামুনকে কিছুদিনের জন্য। দেখবে মুক্তি আস্বাদনের লোভে উন্মত্তের মতো বেরিয়ে আসবে সে তার সোনার পিঞ্জর থেকে। যে-কোনো উপায়ে তাঁকে টেনে বার ক'রে এনো, নম্বি, গুরু হিসেবে এই আমার শেষ নির্দেশ তোমার প্রতি।"

"আপনার আজ্ঞা এ দাস শিরোধার্য করছে, প্রভু।"

বৃদ্ধ নাথমুনির অন্তর তৃপ্তিতে ভরিয়া উঠে। চোখে মুখে ছড়াইয়া পড়ে দিব্য আলোকের আভা, হৃদ্‌পদ্মে প্রভু রঙ্গনাথজীর ধ্যান করিতে করিতে প্রবিষ্ট হন নিত্যলীলার মহাধামে।

মানাকাল নম্বি অচিরে উপনীত হন যামুনের রাজধানীতে। নাথমুনির প্রিয়তম শিষ্য তিনি, তাছাড়া শ্রীরঙ্গমের এক খ্যাতনামা সাধক তিনি। যামুনের সহিত পূর্ব হইতেই তিনি সুপরিচিত। সভাগৃহে নম্বির দর্শন পাওয়া মাত্র সসম্ভ্রমে যামুন জ্ঞাপন করেন অভ্যর্থনা, পিতামহের অন্তিম সময়ের কথা শ্রবণ করেন তাঁহার কাছে। তারপর রাজ-অতিথি ভবনে নম্বির যথোচিত অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করিয়া লিপ্ত হইয়া পড়েন জরুরী কাজে।

ইতিমধ্যে কয়েকদিন কাটিয়া গিয়াছে, কিন্তু রাজা যামুনের সঙ্গে কোনো কথাবার্তা বলার সুযোগই নম্বি পাইতেছেন না। মন্ত্রীর কাছে দরবার করিয়াও রাজার সহিত সাক্ষাৎ করা সম্ভব হইতেছে না।

লোকের কানাঘুষায় শুনিলেন, প্রতিবেশী একটি দুষ্ট রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধের আয়োজন চলিতেছে, যামুন তাই অতিমাত্রায় ব্যস্ত। এজন্যই ভক্ত নম্বিকে কোনো সময় দেওয়া তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইতেছে না।

নম্বি এবার তাঁহার কার্যক্রম স্থির করিলেন। গুরু নাথমুনি বলিয়া গিয়াছেন, প্রয়োজন বোধে ছলাকলার আশ্রয় নিবে, সেই অনুসারে এক কৌশলপূর্ণ উপায়ও তিনি গ্রহণ করিলেন।

বহু চেষ্টায় সেদিন রাজার সহিত সাক্ষাৎ ঘটিল। যামুন সৌজন্য

ও বিনয় দেখাইয়া কহিলেন, "ভক্তপ্রবর, আমি একটা আসন্ন যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে মহাব্যস্ত, ইচ্ছা সত্ত্বেও আপনার মতো বৈষ্ণব সাধকের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে পারছিনে।"

নম্বি একথার সুযোগ নিতে ছাড়িলেন না। সবিনয়ে কহিলেন, "মহারাজ, যুদ্ধের প্রস্তুতির সব চাইতে বড় কথা—অর্থ, সমরোপকরণ ও সেনা বাহিনী। আপনার তো কিছুরই অভাব নেই।"

"ভক্তবর, বড় রকমের উদ্যোগ আয়োজনে কোনো কোনো দিকে অভাব তো কিছুটা থাকবেই। প্রতিপক্ষ অতি খল এবং শক্তিশালী। তাকে চকিতে আক্রমণ ক'রে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করতে চাই আমি। নতুবা বিষদাঁত বার বার গজাবে, আর অযথা আমাদের কামড়াতে আসবে।"

"অভিজ্ঞ রাজনীতিকের মতোই কথা বলছেন আপনি।" প্রশংসার সুরে বলেন নম্বি।

"যত সত্বর হয়, একটি বৃহৎ অশ্বারোহী বাহিনী আমি গড়ে তুলতে চাই, এই বাহিনী নিয়ে তড়িৎবেগে আক্রমণ করা যায়, আকস্মিক ও তীব্র আক্রমণে শত্রু সেনা হয় ছিন্নভিন্ন। কিন্তু এই বাহিনীকে বড় ক'রে তুলতে হলে বিদেশ থেকে আনা দরকার অজস্র বলবান্ ও বেগবান্ অশ্ব। এর জন্য প্রচুর অর্থ চাই। রাজকোষে টান পড়ে গিয়েছে। এ সম্পর্কিত ব্যবস্থাদি নিয়ে একটু ব্যতিব্যস্ত রয়েছি আমি। একটু অপেক্ষা করুন, অবসর ক'রে নিয়ে আপনার সঙ্গে আবার আলাপ করবো।"

"মহারাজ, প্রচুর অর্থ হলেই তো আপনার সব সমস্যা মিটে যায়।"

"তা যায় বৈ কি। কিন্তু হঠাৎ তা চাইলেই তো আর এ বস্তু পাওয়া যায় না।"

নম্বি এবার ছাড়েন তাঁহার অমোঘ বাণ। কহেন, "মহারাজ অর্থের জন্য ভাবনা নেই। প্রচুর অর্থ আমার কাছে গচ্ছিত রয়েছে, হ্যাঁ, বিপুল পরিমাণ ধনরত্ন রয়েছে, এবং আপনিই হচ্ছেন তার

একমাত্র উত্তরাধিকারী। এ ধন সম্পদ আপনার হাতে ন্যস্ত ক'রে আমি দায়িত্ব থেকে রেহাই পেতে চাই, মহারাজ।"

মুহূর্তে যামুনের আয়ত নয়ন দুটি ঝক্‌ঝক্ করিয়া উঠে, উৎসাহে উদ্দীপনায় খপ্ করিয়া নম্বির হাত দুটি তিনি ধরিয়া ফেলেন। বলেন, "বলুন, তাড়াতাড়ি বলুন, কার অর্থ? কে-ই বা দান করেছেন আমাকে?"

"মহারাজা, আপনার পিতামহ নাথমুনি সাংসারিক আশ্রমে দরিদ্র ছিলেন বটে, কিন্তু সন্ন্যাস নেবার পর বিপুল অর্থের মালিক হন তিনি। শ্রীরঙ্গমের পুণ্যভূমিতে নিভৃতে তপস্যা করার কালে দৈব কৃপায় বিপুল ধনরত্ন তিনি প্রাপ্ত হন। সে সব গচ্ছিত রয়েছে আপনারই জন্য। নাথমুনির ঐশ্বর্য তাঁর একমাত্র পৌত্র ছাড়া আর কে পাবে বলুন তো?"

"কোথায় আছে সে ধন, মহাত্মন্, কে জানে তার সন্ধান? বলুন, বলুন, সব আমায় অকপটে খুলে বলুন" রাজা যামুনের এবার ধৈর্য ধারণ করা দায়।

প্রশান্ত কণ্ঠে উত্তর দেন নম্বি, "মহারাজ, একমাত্র আমিই জানি সে গুপ্তধনের সন্ধান। যদি পেতে চান, আর দেরি না ক'রে আমার সঙ্গে চলুন।"

উৎসাহে যামুন চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছেন। বলেন, "এখুনি আমি আমার দেহরক্ষীদের তৈরী হতে নির্দেশ দিই, যানবাহনের ব্যবস্থাদিও করতে বলি।'

উত্তরে নম্বি কহিলেন, "মহারাজা, গুপ্তধনের স্থানটি হচ্ছে দূরে, শ্রীরঙ্গম অঞ্চলে। আর সেখানে আপনাকে যেতে হবে একলাটি আমার সঙ্গে এবং গোপনে ছদ্মবেশে। বেশী জানাজানি হলে কিন্তু সব বেহাত হয়ে যাবে। ওখান থেকে ফেরবার সময় লোকলস্কর ও যানবাহনের ব্যবস্থার জন্য আপনাকে ভাবতে হবে না।"

যামুন তাঁহার রাজকার্যের ভার কিছুদিনের জন্য মন্ত্রীর উপর ন্যস্ত রাখিলেন। প্রচার করিয়া দিলেন, শরীর পীড়াগ্রস্ত, তাই

কিছুদিন তিনি প্রাসাদের অভ্যন্তরে থাকিয়া বিশ্রাম নিবেন, কেহ যেন এ কয়টি দিন তাঁহাকে বিরক্ত না করে।

সেইদিনই গভীর রাত্রে নম্বিকে সঙ্গে নিয়া যামুন গোপনে ত্যাগ করেন রাজপ্রাসাদ। সাধারণ নাগরিকের ছদ্মবেশে উভয়ে রওনা হন পুণ্যভূমি শ্রীরঙ্গমের দিকে।

পথে চলিতে চলিতে নম্বি কহিলেন, "মহারাজ, সারাটা পথ পদব্রজে অতিক্রম করতে হবে। আমি স্থির করেছি, প্রতিদিন তিন ক্রোশের বেশী আমরা অগ্রসর হবো না। কারণ, আপনার পক্ষে বেশী শ্রম সহ্য করা কঠিন।"

যামুন রাজপ্রাসাদের বিলাসব্যসনে অভ্যস্ত, পদব্রজে চলার অভ্যাস মোটেই নাই, নম্বির কথায় তৎক্ষণাৎ সায় দিলেন।

তিন ক্রোশ অন্তর এক একটি গ্রামে পৌঁছিয়া উভয়ে বিশ্রাম করিতেন। তারপর ভক্ত নম্বি শুরু করিতেন তাঁহার ইষ্টসেবার কাজ। স্নান বন্দনাদি শেষ করিয়া ঠাকুরের প্রসাদ রন্ধন করিতেন, তারপর পূজা ও ভোগ নিবেদনের পর রত হইতেন গীতাপাঠে। ভাবাপ্লুত কণ্ঠে উচ্চ স্বরে প্রতিদিন তিন অধ্যায় তিনি পাঠ করিতেন, আর পাশে বসিয়া যামুন তাহা শ্রবণ করিতেন।

নম্বি ভক্তিসিদ্ধ পুরুষ। গীতা পাঠ শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে সারা দেহ তাঁর পুলকাঞ্চিত হইয়া উঠে। চোখে মুখে ফুটিয়া উঠে দিব্য জ্যোতির আভা, অপার্থিব আনন্দে তিনি ভরপুর হইয়া উঠেন।

যামুন সবিস্ময়ে পরম ভক্তের এই আনন্দঘন মূর্তির দিকে চাহিয়া থাকেন। অন্তরে বার বার লাগে দোলা, ভাবিতে থাকেন, অপার আনন্দের অধিকারী এই নম্বি, স্বর্গীয় আনন্দের আস্বাদ লাভ ক'রে জীবন তাঁর হয়েছে ধন্য, কৃতার্থ। গীতাপাঠ, বহুতর শাস্ত্রপাঠ, যামুন আগে বহু করেছেন। কিন্তু স্বাধ্যায়কে এমন ক'রে ইষ্ট চিন্তনের সঙ্গে মিশিয়ে মধুর ক'রে তো কখনো তুলতে পারেন নি। তাছাড়া, রাজকার্যে লিপ্ত হবার পর থেকে একের পর এক মায়া বন্ধনের মধ্যে

জড়িয়ে পড়েছেন যামুন। দিব্যলোকের আনন্দ ও প্রসাদ থেকে রয়েছেন বঞ্চিত।'

মহাপুরুষ নম্বির পাঠ যেন চৈতন্যময়। উচ্চারিত এক একটি শ্লোক যেন উন্মোচিত ক'রে ঈশ্বর চেতনার এক একটি দিব্য স্তর। পরমপ্রভু শ্রীকৃষ্ণের মহাবাণী বার বার অনুরণিত হয় যামুনের অন্তরে—ভক্তি নিয়ে এসো, শরণাগতি নিয়ে এসো আমার কাছে, আমি তোমায় দেবো পরাশান্তি, দেবো পরামুক্তি। এ বাণী মন-ভোলানো, প্রাণ-গলানো। এ বাণী যে অমোঘ।

সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ে আসে তীব্র অনুশোচনা। যে বিষয় বিভব ক্ষণস্থায়ী, যে দেহ ভঙ্গুর ও মরণশীল তাহা নিয়াই নির্বোধের মতো সময় কর্তন করিয়াছেন এতদিন। আর নয়, এবার ছিন্ন করিতে হইবে এই বন্ধন ডোর, শুরু করিতে হইবে অমৃতময় জীবনের পথ-সন্ধান।

ছয় দিনের পথে অষ্টাধ্যায়ী গীতা নম্বি পাঠ করিলেন, এই পাঠ যামুনের অন্তরে জাগাইয়া তুলিল দিব্যলোকের স্পর্শ, কাজ করিল মন্ত্রচৈতন্যের মতো। 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' ঘটিল রাজা যামুনের বিষয়-বিমোহিত জীবনে।

সপ্তম দিনের প্রত্যূষে উভয়ে পৌঁছিয়া গেলেন শ্রীরঙ্গমে। কাবেরীতে স্নান সমাপনের পর নম্বি যামুনকে উপস্থিত করিলেন শ্রীবিগ্রহ রঙ্গনাথজীর সম্মুখে। প্রেমাপ্লুত স্বরে কহিলেন, "মহারাজ, এই দেখুন আপনার পিতামহ নাথমুনির গুপ্ত ভাণ্ডার। এই ভাণ্ডারের সন্ধান আপনাকে দেবো বলে আমি প্রতিশ্রুত ছিলাম আমার গুরুর কাছে, আজ তা পালিত হল।"

বিগ্রহ দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে যামুন প্রেমাবেশে আত্মহারা হইয়া গেলেন। দরদর ধারে ঝরিতে লাগিল পুলকাশ্রু। রঙ্গনাথজীর জ্যোতির্ময়, আনন্দঘন, মূর্তি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল তাঁহার হৃদয়াকাশে। বাহ্যচৈতন্য হারাইয়া মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন মন্দিরতলে।

সেইদিন হইতে যামুন পরিণত হন এক নূতন মানুষে। রাজা যামুনের এবার মৃত্যু ঘটিয়াছে, সেস্থলে জাগিয়া উঠিয়াছে ভক্তিপ্রেম পথের এক ভিখারী সাধক।

রাজসিংহাসন ও রাজবৈভব যামুন চিরতরে ত্যাগ করিলেন, পিতামহ নাথমুনির পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া গ্রহণ করিলেন সন্ন্যাস। প্রেম, ভক্তি ও প্রপত্তির পথে, ইষ্টপ্রাপ্তির পথে, শুরু হইল তাঁহার অভিযাত্রা।

রাজধানী হইতে স্বজনেরা, পাত্রমিত্রেরা, যামুনকে ফিরাইয়া নিতে আসিলেন। কিন্তু অনুনয় ও অশ্রুজল ত্যাগী ভক্তের সংকল্প টলাইতে পারিল না। স্মিত হাস্যে তিনি উত্তর দিলেন, "যে রাজ্য, যে বিষয়বৈভব নিয়ে এতদিন দিন কাটিয়েছি তা ক্ষণস্থায়ী, মূল্যহীন। এবার এক নূতন রাজার অধীনে কাজ নেবো। সে রাজার দ্বিতীয় নেই, আর রাজ্য তাঁর সারা সৃষ্টি জুড়ে,—অখণ্ড, অনন্ত, শাশ্বত সে রাজ্য। সে রাজ্যের রাজাই শুধু দিতে পারেন অমৃতত্ব আর অখণ্ড দিব্য আনন্দ। পরমপ্রভু শ্রীবিষ্ণুই সেই রাজা,—আর তাঁর জাগ্রত বিগ্রহ এই শ্রীরঙ্গনাথ। এখন থেকে আজীবন আমি থাকবো তাঁরই সেবক হয়ে।"

আত্মপরিজন ও শুভানুধ্যায়ীরা বুঝিলেন বৈরাগ্যবান্ সাধককে সংসার জীবনে আর ফিরাইয়া নিবার উপায় নাই, হতাশ হইয়া তাঁহারা দেশে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

শ্রীরঙ্গমের ভক্ত-সমাজে, বিশেষত বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীদের মধ্যে, আনন্দের জোয়ার বহিয়া যায়। সকলেরই মনে আশা জাগিয়া উঠে, ভক্তি প্রেমের যে পথটি নাথমুনি প্রবর্তন করিয়া গিয়াছেন, প্রতিভাধর যামুনের সাধনা ও সিদ্ধিতে সে পথটি এবার আরো প্রশস্ততর হইবে, হইবে আরো আলোকোজ্জ্বল।

শ্রীরঙ্গনাথের সেবা পূজায় যামুন এবার প্রাণমন ঢালিয়া দেন। সেই সঙ্গে চলে ভক্তিমার্গীয় সাধনতত্ত্ব ও দর্শনের গবেষণা ও গ্রন্থ-রচনা। কয়েক বৎসরের মধ্যে এক ভক্তিসিদ্ধ মহাপুরুষরূপে তিনি

পরিচিত হইয়া উঠেন। শ্রীরঙ্গমের ভক্তগোষ্ঠীর নেতারূপে, বিশিষ্টা-দ্বৈতবাদের শ্রেষ্ঠ আচার্যরূপে, সারা দাক্ষিণাত্যে বিস্তারিত হয় তাঁহার খ্যাতি প্রতিপত্তি।

অমানুষী প্রতিভা নিয়া আচার্য যামুন জন্মিয়াছেন, বহুপূর্ব হইতেই সর্বশাস্ত্রে তিনি পারঙ্গম। এবার তাঁহার সেই পাণ্ডিত্য ও নেতৃত্বের দক্ষতা ঐশ্বরীয় কার্যে নিয়োজিত হইল।

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের এক বিস্তৃততর দার্শনিক ব্যাখ্যা আচার্য যামুন উপস্থাপিত করিলেন। পিতামহ নাথমুনি যে দার্শনিকতার প্রবর্তন করেন, তাহার ভিত্তিকেই তিনি করিলেন দৃঢ়তর। যামুনাচার্যের পরবর্তীকালে তাঁহার নাতিশিষ্য রামানুজের অবদানের ফলে এই বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ পরিগ্রহ করে এক পূর্ণতর অবয়ব, আত্মপ্রকাশ করে আচার্য শঙ্করের প্রতিপক্ষীয় সুসম্বদ্ধ দার্শনিক মতবাদরূপে।

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের ধারা এদেশে সুপ্রাচীন কাল হইতে বহমান। ব্রহ্মসূত্রে আচার্য আশ্মরথ্যকে উল্লেখ করা হইয়াছে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী-রূপে। মহাভারতে পাঞ্চরাত্রমতের কথা বর্ণিত আছে, ঐ মতবাদে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের ছায়াটিকে স্পষ্টরূপে দেখা যায়।

ব্রহ্মসূত্রের বিষ্ণুপর ব্যাখ্যার সূচনা দশম শতকে। নাথমুনি ও যামুনাচার্যের পরে একাদশ শতকে রামানুজের আবির্ভাব ঘটে এবং তাঁহার বিষ্ণুসাধনা ও দার্শনিক ব্যাখ্যার মাধ্যমে প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠে বিশিষ্টাদ্বৈত মতের ভক্তিবাদ।

কিন্তু একথা ভুলিলে চলিবে না, নাথমুনি, যামুন ও রামানুজের ভক্তিবাদের উৎস আড়বার সাধকদের জীবন সাধনা। তামিলদেশে ভক্ত আড়বারগণ আবির্ভূত হন ঐতিহাসিক যুগের অনেক পূর্বে। শ্রীবৈষ্ণবেরা বলেন, প্রাচীন আড়বার-আচার্যদের অভ্যুদয় ঘটে দ্বাপর যুগের শেষের দিকে। এই অভ্যুদয়ের ধারা এবং গুরু-পরম্পরা কলিযুগ অবধি বহিয়া চলে।

ভক্তিসিদ্ধ প্রাচীন আড়বারদের মধ্যে রহিয়াছেন: কাঞ্চীর পোইহে, মল্লাপুরীর পুদত্ত, ময়লাপুরের পে, মহীসারের তিরুমিড়িশি।

পরবর্তীকালের উল্লেখযোগ্য হইতেছেন—শঠকোপ, মধুর কবি, কুলশেখর, পেরিয়া, অণ্ডাল প্রভৃতি। ইঁহাদের প্রেমভক্তিময় জীবনের কাহিনী ও রচিত স্তবগাথা হাজার হাজার বৎসর যাবৎ দাক্ষিণাত্যকে ভক্তিরসে সিঞ্চিত করিয়াছে। অগণিত নরনারীর জীবনে আনিয়াছে ভক্তি, প্রেম ও শরণাগতির প্রেরণা।

আড়বারদের এই ভক্তিবাদ এবার নবতর রূপ পরিগ্রহ করিল যামুনাচার্যের সাধনা, সিদ্ধি ও দার্শনিক তত্ত্বের মধ্য দিয়া।

প্রাচীন আড়বার ও তাঁহাদের উত্তরসূরী বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী সাধক ও দার্শনিকদের প্রসঙ্গে স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী লিখিয়াছেন :

—প্রাচীন আলোয়ারগণ যে ভক্তির স্নিগ্ধ শান্তভাব প্রবাহে অবগাহন করিয়া পূতপবিত্র হইয়াছেন, সেই পূত প্রবাহের সহিত দার্শনিকতার সম্মিলনে পুণ্যতীর্থের সৃষ্টি হইয়াছে। যামুনাচার্য্যের সময় হইতেই ইহাদের মধ্যে দার্শনিক প্রতিভার বিকাশ হইয়াছে। একদিকে যেমন আলোয়ারগণ ভক্তিবাদের প্রসার করিয়াছেন, অন্যদিকে তেমন দ্রমিড়াচার্য্য গুহদেব, টঙ্ক, শ্রীবৎসাঙ্ক প্রভৃতি আচার্য্যগণ দর্শনের মহিমা প্রকটিত করিয়াছেন। যামুনাচার্য্যের পূর্বে বেদান্তদর্শনের ভাষ্যকার দ্রমিড়াচার্য্য আপনার প্রতিভার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। শ্রীবৎসাঙ্ক মিশ্র, টঙ্ক প্রভৃতি আচার্য্যগণ ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। 'সিদ্ধিত্রয়' নামক গ্রন্থে যামুনাচার্য্য প্রাচীন আচার্য্যগণের নামোল্লেখ করিয়াছেন। ভাষ্যকার দ্রমিড়াচার্য্য, টীকাকার টঙ্ক, ও শ্রীবৎসাঙ্ক প্রভৃতি আচার্য্যগণ শ্রীসম্প্রদায়ভুক্ত। আচার্য্য ভর্তৃপ্রপঞ্চ, ভর্তৃহরি, ব্রহ্মদত্ত শঙ্কর প্রভৃতি নির্বিশেষ ব্রহ্মবাদী। আচার্য্য ভাস্কর ভেদাভেদবাদী। যখন নির্বিশেষ ব্রহ্মবাদের ও ভেদাভেদবাদের অভ্যুদয় হইয়াছে, তখন স্বীয় মত প্রতিষ্ঠার জন্যই যামুনাচার্য্যের দার্শনিক ক্ষেত্রে অবতরণ। দশম শতাব্দী দার্শনিক প্রতিভার যুগ, সকলক্ষেত্রেই নবজীবনের সূত্রপাত হইয়াছে। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদও তখন আপনার প্রতিষ্ঠার জন্য অগ্রসর হইয়াছে।

—অনেকে মনে করেন, শঙ্করের জ্ঞানবাদে ব্যভিচারের সূত্রপাত হইলে, আচার্য্য রামানুজ প্রভৃতির আবির্ভাব হয় ; কিন্তু আমাদের মনে হয় এই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। কারণ, যামুনাচার্য্যের অবতরণ কালেই বাচস্পতির আবির্ভাব কাল। বাচস্পতির মহিমা যখন সমস্তদেশে পরিব্যাপ্ত হইতেছিল, তখনই রামানুজের আবির্ভাব। একাদশ শতাব্দীতে বাচস্পতির প্রতিভা সমস্ত ভারতে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। ভারতের আচার্য্যগণ সকলেই অবতার। ধর্মের গ্লানি না হইলে অবতার অবতীর্ণ হন না। জীবন চরিতকার-গণ অবতারের ফলে ধর্ম্মের গ্লানি অঙ্গীকার করিয়া লইয়াছেন। আচার্য্য রামানুজ ও মধ্ব প্রভৃতির আবির্ভাবের কারণ শাঙ্করমতের গ্লানি। কিন্তু রামানুজ ও মধ্বের যুগে শাঙ্কর সম্প্রদায়ের প্রতিভার আরও অধিকতর স্ফূর্তি হইয়াছে। যে মতের গ্লানি হয়, তাহার স্ফূর্তি অসম্ভব। যদি শাঙ্করমতের গ্লানি হইত, তাহা হইলে দার্শনিক মনীষার প্রস্ফুরণ হইতে পারিত না। আমাদের বিবেচনায় যখন শাঙ্করমতের প্রাধান্য সুস্থিত হইয়াছে, তখন প্রতিদ্বন্দ্বী মতবাদ সকল স্বীয় প্রতিষ্ঠার জন্য শাঙ্করমত আক্রমণ করিয়াছেন।

···—প্রবল শত্রুকে পরাজিত করিবার জন্যই সমধিক প্রচেষ্টার আবশ্যকতা, যদি শাঙ্করমতের গ্লানিই আরম্ভ হইয়াছিল। তাহা হইলে যামুনাচার্য্য, রামানুজাচার্য্য প্রভৃতি আচার্য্যগণ বদ্ধপরিকর হইয়া শাঙ্করমত খণ্ডন করিতেন না। বিশেষতঃ যামুনাচার্য্য নির্বিশেষ ব্রহ্মবাদী আচার্য্যগণের নামোল্লেখ করিয়া তাহাদের মত নিরসনের জন্যই 'প্রকরণ প্রক্রমের' আবশ্যকতা স্বীকার করিয়াছেন। প্রবল যোদ্ধাকে পরাজিত করিবার জন্যই এরূপ চেষ্টা স্বাভাবিক।

—শাঙ্করমতের প্রবলতায় ও ভাস্করমতের অভ্যুদয়ে বিষ্ণুভক্তিবাদ স্থাপনের জন্যই যামুনাচার্য্যের প্রয়াস। যখন শঙ্করের জ্ঞানবাদে সমস্ত দেশ প্লাবিত, তখনই যামুনাচার্য্যের দার্শনিক ক্ষেত্রে অবতরণ। দক্ষিণ ভারতে তৎকালে সকল সম্প্রদায়ই আপন আপন মতবাদের

প্রতিষ্ঠার জন্য লালায়িত। যামুনাচার্য্যও বৈষ্ণবমতের প্রতিষ্ঠার জন্য দার্শনিক ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন।

যামুনাচার্যের রচিত গ্রন্থসমূহেব মধ্যে প্রধান—সিদ্ধিত্রয়ম। বিশিষ্টাদ্বৈত সিদ্ধান্ত ইহাতে সুন্দররূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। তাঁহার অপর রচনাবলী নাম—স্তোত্ররত্নম্, আগমপ্রামাণ্যম্ এবং গীতার্থ সংগ্রহ।

আচার্য যামুন তাঁহার দার্শনিক ব্যাখ্যায় প্রধানত শঙ্করের নির্বিশেষ ব্রহ্মাত্মবাদকে আক্রমণ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মতে চেতন ও অচেতন সকল বস্তুই হইতেছে ব্রহ্মের শরীর, আর ব্রহ্ম সেই শরীরের আত্মা এবং অধিষ্ঠাতা। শরীর ও শরীরীকে এক বলিয়া ধরা হইয়া থাকে, কাজেই ব্রহ্ম স্বরূপত এক এবং অদ্বিতীয়। তরঙ্গ, ফেনা ও বুদ্বুদ প্রভৃতি অংশ থাকা সত্ত্বেও সমুদ্রকে এক ও অখণ্ড বলিয়া গণ্য করা হয়; তেমনি জীব, জগৎ ও ঈশ্বর প্রভৃতির অনেকত্ব থাকিলেও সমষ্টিভূত সত্তা, পুরুষোত্তম নারায়ণ এক এবং অখণ্ড।

আচার্য যামুন আরও বলেন, ঈশ্বর পুরুষোত্তম; সৃষ্ট জীব হইতে তিনি শ্রেষ্ঠ। ঈশ্বর পূর্ণ, জীব অণু অংশ। ঈশ্বর ও জীব নিত্য পৃথক। তাঁহার মতে, মুক্ত জীব ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করে, কিন্তু ঈশ্বরভাব লাভ করিতে সক্ষম হয় না।

ব্রহ্ম ও জীবের ভেদের কথা বলিতে গিয়া তিনি বলিয়াছেন—এই দুইয়ে স্বজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদ নাই। কিন্তু স্বগত ভেদ রহিয়াছে। তাঁহার মতে, 'মৌলিক পদার্থ তিনটি,—চিৎ, অচিৎ ও পুরুষোত্তম। চিৎ—জীব, অচিৎ—জগৎ, আর পুরুষোত্তম—ব্রহ্ম। ব্রহ্ম সবিশেষ—সগুণ, অশেষ কল্যাণ গুণের নিলয়, সর্বনিয়ন্তা। জীব তাঁহার চির দাস।'

সাধক যামুনের প্রাণের আকাঙ্ক্ষা, তিনি থাকিবেন পরম প্রভুর ঐকান্তিক নিত্যকিঙ্কর হইয়া। দাস্য ও পরাভক্তিতে তিনি

অভিলাষী, কাজেই সবিশেষ ব্রহ্ম এবং তাঁহার মূর্ত ব্রহ্মরূপই তাঁহার ধ্যেয়।

তাঁহার এই দার্শনিক সিদ্ধান্ত প্রধানত বিষ্ণুপুরাণ হইতে তিনি গ্রহণ করিয়াছেন। ঐ পুরাণে মহামুনি পরাশর চিৎ, অচিৎ ও ঈশ্বর সম্বন্ধে যে দিগ্‌দর্শন দিয়াছেন। আচার্য শ্রদ্ধাভরে তাহার গুণকীর্তন করিয়াছেন।[১]

যামুনাচার্যের স্তোত্ররত্নে পরাভক্তি ও শরণাগতির তত্ত্বটি বড় মনোরম হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। প্রাণের আকুতি উঘারিয়া ভক্তি-সিদ্ধ মহাপুরুষ বলিতেছেন :

মথনাথ যদস্তি যোঽস্ম্যহং
সকলং তদ্ধি তবৈব মাধব।
নিয়তং স্বমিতি প্রবুদ্ধধীরথ বা
কিংনু সমর্পয়ামি তে॥

—হে নাথ, হে মাধব, যা কিছু আমি, যা কিছু আমার সকলই যে তোমার প্রভু। যদি কখনো আমার এরূপ জ্ঞান হয় যে,—সকলই সর্বসময়ে একান্তভাবে তোমার—তবে আমার কোন্ বস্তু কি ক'রে করবো তোমায় সমর্পণ?

"এই শরণাপত্তির সহিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের সাদৃশ্য আছে।—কি দিব আমি, যে ধন তোমারে দিব, সেই ধন তুমি। আচার্য যামুন সর্বস্ব তাঁহাতে বিকাইয়া দিয়াছেন, আর বৈষ্ণব কবি যাহা কিছু সকলই নারায়ণ রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। যামুনাচার্যের ভাব—তবৈবাহং। বৈষ্ণব কবির ভাব অনেকটা পরিমাণে— মমৈব ত্বং।

"ঈশ্বরের সহিত জীবের পিতা, মাতা, তনয়, সুহৃদ্ সকল সম্বন্ধই সম্ভব, কিন্তু দাস্য ভাবই যামুনাচার্যের মতে শ্রেষ্ঠ। এক স্তোত্রে তিনি প্রার্থনা করিতেছেন, 'হে প্রভু, তোমার প্রতি দাস্য ভাবই সকল ভাবের শিরোমণি। একমাত্র দাস্যসুখে আসক্ত ব্যক্তির গৃহে

১. ভাগবতধর্মের প্রাচীন ইতিহাস, ২য় খণ্ড: স্বামী বিদ্যারণ্য, (প্রাচ্যবাণী মন্দির)

কীটজন্মও সার্থক, তবুও অন্যবুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তির গৃহে চতুর্মুখ ব্রহ্মা হইয়া জন্মানোও কাম্য নয়।[১]

প্রভু শ্রীরঙ্গনাথের সেবা, দাস্য ও বিশিষ্টাদ্বৈত সিদ্ধান্তের প্রচার, এইসব নিয়া দীর্ঘকাল অতিবাহিত হইয়াছে। এবার যামুনাচার্য পৌঁছিয়াছেন বার্ধক্যের কোঠায়। মনে কেবলই দুশ্চিন্তা, ভক্তি-বাদের যে ভিত্তি তিনি রচনা করিয়াছেন, তাহার উপর সৌধ গড়িয়া তুলিবে কে? দার্শনিক সিদ্ধান্তগুলিকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা দরকার, সে কাজের উপযোগী ভক্তি ও প্রতিভাই-বা সমকালীন কোন্ সাধকের আছে?

এসব নানা চিন্তায় আচার্যের অন্তর আলোড়িত হয়। কাঁদিয়া কাঁদিয়া রঙ্গনাথজীর চরণে দিনের পর দিন নিবেদন করেন, "প্রভু, ভক্ত নিয়েই তোমার সংসার, দেখো ভক্তিধৃত শ্রীসম্প্রদায় যেন তোমার কৃপা হতে বঞ্চিত হয় না। ভক্তি, প্রপত্তি ও দাস্যভাবের মাহাত্ম্য প্রকটিত হোক, এই যে আমার অন্তরের একমাত্র আকুতি।"

কিছুদিনের মধ্যেই প্রভু বরদরাজের অন্তরঙ্গ ভক্ত কাঞ্চীপূর্ণের সহিত শ্রীরঙ্গম মন্দিরে যামুনাচার্যের দেখা। কথাপ্রসঙ্গে কাঞ্চীপূর্ণ কহিলেন, "আচার্যবর, শাঙ্কর বেদান্তী যাদবপ্রকাশের কৃতী ছাত্র লক্ষ্মণের কথা আমি আপনাকে বলতে চাই। অদ্বৈত সিদ্ধান্তে সে পারঙ্গম, কিন্তু কি বিস্ময়কর ভক্তি ও সংস্কার নিয়ে সে জন্মেছে। তেমনি রয়েছে অমানুষী প্রতিভা। বেদান্তের বিষ্ণুপর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ নিয়ে দিনরাত রয়েছে সে মগ্ন হয়ে। লক্ষ্মণকে আমি তার বাল্যকাল থেকে জানি, যৌবনেও তাকে দেখছি অন্তরঙ্গভাবে। আমার কোনো সন্দেহ নেই আচার্য, বরদরাজের সে কৃপাপ্রাপ্ত, ভক্তি আন্দোলনের সে এক চিহ্নিত নায়ক।"

আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া বলেন যামুনাচার্য, "কাঞ্চীপূর্ণ, প্রভু রঙ্গনাথজীর চরণে বার বার মিনতি জানিয়েছি আমি, শ্রীসম্প্রদায়ের

১. বেদান্ত দর্শনের ইতিহাস, ১ম ভাগ।

একটি উপযুক্ত ভাবী নেতার জন্য। আশা হচ্ছে, প্রভুর কৃপা প্রসাদ আমরা পেয়ে গিয়েছি। তোমার আজকের সুসংবাদে আমি পরম আনন্দিত।”

কাঞ্চীপূর্ণ আরো জানান, “আচার্য, অধ্যাপক যাদবপ্রকাশের সঙ্গে লক্ষ্মণের বার বার মতদ্বৈধ ঘটেছে দ্বৈত ও অদ্বৈতবাদের সিদ্ধান্ত নিয়ে। আমার মনে হয়, উভয়ের ছাড়াছাড়ি হবার আর বেশী দেরি নেই।”

যামুন বলিলেন, “অতি উত্তম কথা। কাঞ্চীপূর্ণ, কিছুদিন যাবৎ আমি ভাবছি, কাঞ্চীতে গিয়ে প্রভু বরদরাজকে একবার দর্শন ক'রে আসবো।”

“আচার্য। সেই সুযোগে আমরা কাঞ্চীর ভক্তেরা, আপনাকে নিয়ে আনন্দ করতে পারবো।” সোৎসাহে বলে উঠেন কাঞ্চীপূর্ণ।

যামুনাচার্য সেদিন বরদরাজ বিগ্রহ দর্শনে আসিয়াছেন। স্নান তর্পণ ও পূজাদি সমাপ্ত হইয়াছে। অন্তর তাঁহার দিব্য আবেশে ভরপুর। এবার কাঞ্চীপূর্ণ ও অন্যান্য ভক্তদের সঙ্গে নিয়া ফিরিয়া চলেন নিজের আবাসে।

ভাবমত্ত অবস্থায় ধীরে ধীরে পথ চলিতেছেন, হঠাৎ কাঞ্চীপূর্ণ তাঁহাকে বলিয়া উঠেন, “আচার্য, দেখুন দেখুন, বেদান্তকেশরী যাদবপ্রকাশ এদিকে এগিয়ে আসছেন, সঙ্গে রয়েছে তাঁর কৃতী শিষ্যদল। আমাদের প্রিয়ভাজন ভক্ত-প্রবর লক্ষ্মণও রয়েছেন তাঁর সঙ্গে।

যামুনাচার্য রাস্তার একপাশে সরিয়া দাঁড়ান। অদূরে অধ্যাপক যাদবপ্রকাশ তাঁহার ছাত্রদল নিয়া পদব্রজে চলিয়াছেন, আর তাঁহার হাতটি ন্যস্ত রহিয়াছে লক্ষ্মণের স্কন্ধদেশে।

মহাপুরুষ যামুনাচার্য একদৃষ্টে, ভাবময় নেত্রে চাহিয়া আছেন লক্ষ্মণের দিকে। আচার্যের চোখে মুখে ছড়াইয়া পড়িয়াছে প্রসন্ন মধুর হাসির আভা।

কাঞ্চীপূর্ণ হর্ষভরে বলেন, “আচার্য আপনি অনুমতি দিলে

লক্ষ্মণকে আমি ডেকে নিয়ে আসি, আপনার আশীর্বাদ গ্রহণ ক'রে সে ধন্য হোক।"

"না কাঞ্চীপূর্ণ, তার প্রয়োজন নেই। লক্ষ্মণকে আমি আশীর্বাদ ইতিমধ্যেই করেছি। তাঁর ভেতরে পরাভক্তির উন্মেষের জন্য আমার দৃষ্টি দিয়েই করেছি শক্তিপাত। এই লক্ষ্মণই যে শ্রীসম্প্রদায়ের ভাবী নায়ক, একথা আজ আমি জেনেছি অভ্রান্তভাবে। অযথা তার সঙ্গে এসময়ে বাক্যালাপ করলে অদ্বৈত বেদান্তী যাদবপ্রকাশের সঙ্গে নূতন ক'রে এখানে তর্কযুদ্ধ হবে, আমার অন্তরের প্রসন্নমধুর ভাবটি নষ্ট হবে। শ্রীবরদরাজের দর্শনের অভীষ্ট ফল আমি হাতে হাতে এখানে পেয়ে গেছি।"

উত্তরকালে যাদবপ্রকাশের ঐ প্রতিভাদীপ্ত প্রধান ছাত্রেরই অভ্যুদয় ঘটে আচার্য রামানুজরূপে, বিশিষ্টাদ্বৈত মতের প্রখ্যাত প্রবক্তারূপে। ভারতের দার্শনিক সমাজে গ্রহণ করেন তিনি কালজয়ী আসন।

শ্রীরঙ্গমে ফিরিয়া আসিয়াছেন যামুনাচার্য। কিন্তু হৃদয়ে তাঁহার জাগিয়া রহিয়াছে ভক্ত পণ্ডিত লক্ষ্মণের লাবণ্যময় রূপ। পবিত্রতা, তেজস্বিতা আর বিষ্ণুভক্তির যে দিব্য আভা আচার্য তাঁহার আননে দেখিয়া আসিয়াছেন, আর তাহা ভুলিতে পারেন কই ?

লক্ষ্মণের সাধন প্রস্তুতি যাহাতে পূর্ণাঙ্গ হইয়া উঠে, অচিরে যাহাতে সে শ্রীসম্প্রদায়ের দায়িত্ব গ্রহণ করে—এই প্রার্থনাটি যামুন আকুল অন্তরে নিবেদন করেন পরমপ্রভুর চরণে। লক্ষ্মণকে একান্ত ভাবে নিজজন রূপে প্রাপ্ত হইবেন, এই উদ্দেশ্যে এ সময়ে এক স্তোত্রও তিনি রচনা করেন। শ্রীসম্প্রদায়ের ভক্তদের মধ্যে এই স্তোত্রটি আজো স্মরণীয় হইয়া আছে।

অল্পদিনের ব্যবধানে শ্রীরঙ্গমে বসিয়া আর এক শুভ সংবাদ প্রাপ্ত হন যামুনাচার্য। সম্প্রতি লক্ষ্মণের সহিত তাঁহার গুরু যাদবপ্রকাশের তীব্র মতভেদ দেখা দিয়াছে এবং উভয়ের মধ্যে ঘটিয়াছে বিচ্ছেদ।

পরম ভক্ত প্রবীণ আড়বার সাধক কাঞ্চীপূর্ণের প্রতি লক্ষ্মণ চিরদিনই অতিশয় শ্রদ্ধাবান্। এবার তিনি এই সিদ্ধ মহাত্মারই আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারই নির্দেশ মতো করিতেছেন সাধন-ভজন, শ্রীবরদরাজের সেবা-অর্চনা ও শাস্ত্রপাঠ।

লক্ষ্মণের প্রাণের আকাঙ্ক্ষা, সিদ্ধ মহাত্মা কাঞ্চীপূর্ণের নিকট তিনি দীক্ষা গ্রহণ করিবেন। কিন্তু এ আকাঙ্ক্ষা তাঁহার পূর্ণ হয় নাই। মহাত্মা বার বারই কেবলই তাঁহাকে এড়াইয়া চলিতেছেন।

যতবারই কাঞ্চীপূর্ণকে লক্ষ্মণ চাপিয়া ধরেন, তিনি বলেন, "বৎস, আমি প্রভু বরদরাজের কাঙাল ভক্ত। তাছাড়া, আমি যে জাতে শূদ্র, তোমার মতো পবিত্রদেহ ব্রাহ্মণকে আমি দীক্ষা দেব কি ক'রে? সর্বোপরি কথা, প্রভুর কাছ থেকে আমি জেনেছি, তোমার গুরুকরণ হবে অন্যত্র। এবং তার আর বেশী দেরি নেই।"

তবুও লক্ষ্মণ কিন্তু মহাত্মা কাঞ্চীপূর্ণকেই জ্ঞান করেন গুরুরূপে, ত্রাতারূপে। তাঁহারই নির্দেশ মতো নিত্যকার সাধনভজন করেন, পবিত্র শালকূপ হইতে জল বহিয়া আনিয়া স্নান করান বরদরাজ শ্রীবিগ্রহকে। এই বিগ্রহের অর্চনা ও ধ্যান জপে তন্ময় হইয়া থাকেন।

এদিকে বৃদ্ধ যামুনাচার্য শ্রীরঙ্গমের মঠে গুরুতর পীড়ায় শয্যাশায়ী হইয়া পড়িয়াছেন। নিজে স্পষ্টতই বুঝিয়া নিয়াছেন, শেষের দিনের আর বেশী দেরি নাই। এবার প্রধান ও অন্তরঙ্গ ভক্ত মহাপূর্ণকে ডাকিয়া কহিলেন, "আমার বিদায়ের লগ্ন প্রায় সমাগত। এ সময়ে শ্রীসম্প্রদায়ের, ভক্তিবাদের, ভবিষ্যৎ ভেবে ব্যাকুল হয়েছি। বাচস্পতি মিশ্রের অভ্যুদয় ঘটেছে, শাঙ্কর মত তিনি নিপুণভাবে প্রপঞ্চিত করছেন। এর বিরুদ্ধে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ আর কতদিন যুঝতে পারবে, টিকে থাকতে পারবে?"

"আপনার নির্দেশের দিকেই তো আমরা চেয়ে আছি, মহাত্মন" —উত্তরে বলেন মহাপূর্ণ।

"ভাবছি কেবল ভক্তশ্রেষ্ঠ লক্ষ্মণের কথা। শুনেছো বোধহয়, যাদবপ্রকাশের সঙ্গে সকল সম্বন্ধ সে ছিন্ন করেছে, আশ্রয় নিয়েছে কাঞ্চীপূর্ণের কাছে। শ্রীবরদরাজের সেবায় করছে সে দিন যাপন। তুমি শিগ্‌গীর কাঞ্চীতে চলে যাও। তাঁকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে এসো শ্রীরঙ্গমে। দেহান্ত হবার আগে আমার মনের সংকল্প ক'টি তার কাছে বলে যেতে চাই।"

আশ্বাস দিয়ে মহাপূর্ণ বলেন, "আচার্যবর, আমি এক্ষুনি র'ওনা হচ্ছি কাঞ্চীতে। কালবিলম্ব না ক'রে লক্ষ্মণকে আপনার কাছে উপস্থিত করছি।"

কাঞ্চীতে পৌঁছিয়াই প্রভু বরদরাজের মন্দিরে প্রণাম নিবেদন করিতে গেলেন মহাপূর্ণ। সেখানে ভক্তদের কাছে শুনিলেন, শ্রীবরদরাজের স্নান অভিষেক সম্পন্ন করানো লক্ষ্মণের নিত্যকার প্রধান সেবা কর্ম—আর দেরি নাই, এখনি তিনি সেখানে আসিয়া পড়িবেন।

মহাপূর্ণ আর ধৈর্য ধরিতে পারিতেছেন না। পথের দিকে একটু অগ্রসর হইতেই দেখিলেন, লক্ষ্মণ ধীরপদে মন্দিরের দিকে আসিতেছেন, মুখে গুন্‌গুন্ করিয়া গাহিতেছেন বিষ্ণুর স্তবস্তুতি আর মাথায় বহিয়া আনিতেছেন পবিত্র জলের বৃহৎ ভাণ্ড।

নিকটে গিয়া প্রসন্নমধুর কণ্ঠে মহাপূর্ণ গাহিয়া উঠিলেন যামুনাচার্যের রচিত এক অপূর্ব স্তোত্র। এ স্তোত্রের ভাব ভাষা ও মধুর ঝঙ্কার লক্ষ্মণের অন্তরে জাগাইয়া তোলে দিব্য উন্মাদনা। সাশ্রুনয়নে প্রশ্ন করেন, "মহাত্মন, এ অমিয়মাখা স্তোত্র কোথায় পেলেন আপনি, শ্রীবিষ্ণুর কৃপাধন্য কোন মহাপুরুষের রচনা এটি, দয়া ক'রে আমায় বলুন।"

"এ যে আমার প্রভু যামুনাচার্যের রচনা। শ্রীসম্প্রদায়ের সেই মধ্যমণি ছাড়া আর কার হৃদয়ে হবে এমনতর দিব্য জ্যোতির বিচ্ছুরণ? আর কে পরিবেশন করবে এমন অমৃত?"

"রঙ্গনাথজীর প্রিয়তম সেবক, মহাত্মা যামুনাচার্যের চরণ দর্শনের

অভিলাষ আমার অনেক দিন থেকে। ভাগ্যহীন আমি, তাই বঞ্চিত রয়েছি এতদিন। আপনি তাঁর নিজজন, কৃপা ক'রে আমায় নিয়ে যাবেন তাঁর আশ্রয়ে?"

"বৎস, আমি যে আচার্য প্রভু যামুনের কাছে থেকেই এসেছি তোমার কাছে। তোমার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য তিনি ব্যাকুল, তোমার পথ চেয়েই যে রয়েছেন। তাছাড়া, তিনি এখন অন্তিম শয়নে শায়িত। বৎস, তাঁর দর্শন যদি পেতে চাও, আর এক মুহূর্ত বিলম্ব ক'রো না।"

ক্রমাগত চারদিন পথ চলার পর দেখা গেল প্রভু শ্রীরঙ্গনাথের মন্দির। কাবেরীর অপর তীরে পৌঁছিয়াই উভয়ে হইলেন বজ্রাহতের মতো স্তম্ভিত। দক্ষিণী বৈষ্ণব জগতের শ্রেষ্ঠপুরুষ যামুনাচার্য আর ইহজগতে নাই। সহস্র সহস্র শোকার্ত নরনারী তাঁহার মরদেহটি বেষ্টন করিয়া ক্রন্দন করিতেছে, আর মঠের ভক্ত শিষ্যেরা রত রহিয়াছে তাঁহার শেষকৃত্যের কাজে।

আচার্যের চন্দনলিপ্ত, পুষ্পশোভিত দেহের সম্মুখে লক্ষ্মণ সাষ্টাঙ্গ প্রণাম নিবেদন করিলেন। উঠিয়া দাঁড়াইতেই লক্ষ্য পড়িল তাঁহার হস্তের দিকে। দেখিলেন, তিনটা অঙ্গুলি তাঁহার মুষ্টিবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে।

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে সেবকদের দিকে তাকাইতেই তাঁহারা কহিলেন, "তিনটি সংকল্প-সিদ্ধির বিষয়ে আচার্য প্রভু অন্তিম শয্যায় বিশেষ-ভাবে চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন, তারই চিহ্ন রয়ে গিয়েছে ঐ বদ্ধ অঙ্গুলি তিনটিতে।"

একথার সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল, ভক্তপ্রবর লক্ষ্মণ এক দিব্যভাবে আবিষ্ট হইয়া পড়িয়াছেন। ঐ আবেশের মধ্যেই, অর্ধবাহ্য অবস্থায় তিনি উচ্চারণ করিলেন ক্রমান্বয়ে তিনটি সংকল্প বাণী। কহিলেন, "বিষ্ণুভক্তিময় দ্রাবিড় বেদের প্রচার করবো আমি, জ্ঞানহীন জনগণের মধ্যে বিতরণ করবো সেই ভক্তির সুধা। লোকরক্ষা

ব্রত নিয়ে আমি রচনা করবো তত্ত্বজ্ঞানময় শ্রীভাষ্য। আর পুরাণরত্ন বিষ্ণু পুরাণের রচয়িতা পরাশর মুনির নামে চিহ্নিত ক'রে আমি গড়ে তুলবো ভক্তিবাদের এক শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাতাকে।”

অন্তরঙ্গ ভক্ত শিষ্যেরা লক্ষ্য করিলেন এক অবিশ্বাস্য দৃশ্য। ঐ সংকল্প বাণীর এক একটি উচ্চারিত হইতেছে, আর সঙ্গে সঙ্গে কোন্ এক অদৃশ্য পুরুষের অলৌকিক শক্তির ইঙ্গিতে একে একে খুলিয়া যাইতেছে প্রাণহীন যামুনাচার্যের তিনটি বদ্ধ অঙ্গুলি।

সকলেই উপলব্ধি করিলেন, ভক্তপ্রবর লক্ষ্মণই যামুনাচার্যের সেই ভাবী উত্তরাধিকারী, ঈশ্বরের চিহ্নিত সেই মহানায়ক যিনি এবার গ্রহণ করিবেন শ্রীসম্প্রদায়ের নেতৃত্বভার।

দেখা গেল, দেহান্তের পরও আচার্য যামুন নিজের সংকল্পে রহিয়াছেন অবিচল, আর ঐশী বিধানের অমোঘতার তত্ত্বটিও তিনি এই সময়ে ইঙ্গিতে ভক্তদের সবাইকে বুঝাইয়া দিয়া গেলেন।

শেষকৃত্য শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কাবেরীর বিশাল তটভূমি মুখর হইয়া উঠে সহস্র কণ্ঠের স্তবগানে। তারপর অন্তরঙ্গ ভক্তেরা ভাঙিয়া পড়েন শোকার্ত কান্নায়।

জাগ্রত বিগ্রহ শ্রীরঙ্গনাথের শ্রেষ্ঠ কিঙ্কররূপে এতদিন শ্রীরঙ্গমে বিরাজিত ছিলেন যামুনাচার্য। দক্ষিণী ভক্তিবাদের ছিলেন এক চির-ভাস্বর আলোকস্তম্ভ, আজ সেই স্তম্ভটির ঘটিল শোকাবহ তিরোধান।

গোস্বামী লোকনাথ

প্রেমভক্তিধর্মের এক শক্তিধর নায়করূপে শ্রীগৌরাঙ্গ সবেমাত্র নবদ্বীপে আবির্ভূত হইয়াছেন। বৈষ্ণবসাধক ও ভক্ত নরনারী দলে দলে শরণ নিতেছেন তাঁর চরণতলে। বর্ষীয়ান্ সর্বজন শ্রদ্ধেয় বৈষ্ণবনেতা অদ্বৈত আচার্য, শ্রীবাস পণ্ডিত, অবধূত নিত্যানন্দ প্রভৃতিকে একে একে তিনি করিয়াছেন আত্মসাৎ।

শ্রীবাসের কীর্তনের অঙ্গন প্রভু এবং তাঁহার মরমী পরিকরদের মিলন স্বর্গ। এই স্বর্গে নিত্য নূতন উদ্‌ঘাটিত হইতেছে লীলানাট্য, আর রসবিলাসের বৈচিত্র্য। প্রকাশিত হইতেছে তাঁহার চমকপ্রদ ভগবত্তা-ভাব।

পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকের নবদ্বীপ কীর্তিত ছিল ভারতের এক শ্রেষ্ঠ বিদ্যাকেন্দ্ররূপে। উচ্চতর টোল ও চতুষ্পাঠীগুলিতে বিরাজ করিতেন দিক্‌পাল পণ্ডিত, তার্কিক ও দার্শনিকেরা। শতশত প্রতিভাধর ছাত্র ইঁহাদের সান্নিধ্যে থাকিয়া গ্রহণ করিত নব্যন্যায়, স্মৃতি ও বেদ বেদান্তের পাঠ। প্রাচ্যের এই অক্সফোর্ডে আসিয়া জড়ো হইত সমকালীন ভারতের পণ্ডিত পড়ুয়ারা। তাই তখনকার দিনে নবদ্বীপের সারস্বত জীবনের যে কোনো তরঙ্গ, যে কোনো তর্ক বিচার, যে কোনো ধর্ম সংস্কৃতির আন্দোলন, অচিরে ছড়াইয়া পড়িত দেশের সর্বত্র এবং সমাজজীবনের সর্বস্তরে।

শ্রীগৌরাঙ্গের নূতন প্রেমধর্মের জোয়ার তখন ঢেউ তুলিয়াছিল দেশের দিগ্‌বিদিকে। সুদূর উত্তর বাংলার তালখড়ি গ্রামেও এ ঢেউ সেদিন পৌঁছিয়া গিয়াছিল।

তালখড়ি চতুষ্পাঠীর তরুণ পণ্ডিত লোকনাথ চক্রবর্তী লোকমুখে গৌরাঙ্গের আবির্ভাব কাহিনী শুনিলেন; শুনিয়া হৃদয় তাঁহার অপার আনন্দে ভরিয়া উঠিল। এই গৌরাঙ্গ যে তাঁহারই প্রিয় বন্ধু বিশ্বম্ভর

মিশ্র, উভয়ে তাঁহারা প্রায় সমবয়সী। লোকনাথ যখন আচার্য অদ্বৈতের কাছে ভাগবত অধ্যয়নে রত, বিশ্বম্ভর তখন গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে ব্যাকরণ পাঠ করেন, উভয়ের মধ্যে কত ঘনিষ্ঠতা, কত হৃদ্যতাই না ছিল। সেই বিশ্বম্ভর আজ আবির্ভূত হইয়াছেন গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের মহানায়করূপে, শ্রেষ্ঠ সাধকেরা তাঁহাকে জ্ঞান করিতেছেন ভগবান্‌রূপে। এই জন্যই তো লোকনাথের আনন্দের অবধি নাই।

বিষয়-বিরক্ত, নৈষ্ঠিক বৈষ্ণবসাধক, লোকনাথ পণ্ডিত নিজের সংকল্প স্থির করিয়া ফেলিলেন। সংসার হইতে চিরবিদায় নিয়া উপনীত হইলেন নবদ্বীপে।

প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ নিজ ভবনের অলিন্দে বসিয়া আছেন। গদাধর, মুরারী, শ্রীরাম প্রভৃতি অন্তরঙ্গ ভক্তেরা সম্মুখে উপবিষ্ট। প্রভু ভাবাবেশে মত্ত হইয়া কখনো কৃষ্ণকথা কহিতেছেন, কখনো বা কৃষ্ণ-বিরহের আর্তিতে হইতেছেন মুহ্যমান। এক এক সময়ে তাঁহাকে দেখা যাইতেছে অতিশয় চিন্তাকুল, গম্ভীরবদন।

সন্ন্যাস নিবার সংকল্প প্রভু ইতিমধ্যে স্থির করিয়া ফেলিয়াছেন। অন্তরঙ্গ কয়েকজন ভক্তকে বুঝাইয়াছেন, কৃষ্ণের বিরহে উন্মত্ত হইয়া তিনি নিজে ঘরসংসার ত্যাগ না করিলে কৃষ্ণের জন্য লোকে ব্যাকুল হইবে কেন? সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী না হইলে বিষয়ী লোকে তাঁহার কথা শুনিতে চাহিবে কেন? তাই মাঝে মাঝে প্রভুকে গম্ভীর হইতে দেখিয়া ভক্তদের প্রাণ শুকাইয়া যাইতেছে। বিষণ্ণ অন্তরে ভাবিতে-ছেন, হয়তো আসন্ন বিচ্ছেদের আর দেরি নাই।

এমনি সময়ে দীর্ঘ পথ পরিব্রাজনের পর শ্রান্ত ক্লান্তদেহে ভক্ত-প্রবর লোকনাথ সেখানে আসিয়া উপস্থিত। ছিন্ন তরুর মতো, বিরহখিন্ন লোকনাথ লুটাইয়া পড়েন প্রভুর পদতলে।

বাহু প্রসারিয়া প্রভু তাঁহাকে প্রেমভরে আলিঙ্গন দিলেন। প্রাণ তাঁহার পরম আনন্দে উচ্ছলিত। কৃষ্ণের চিহ্নিত ভক্ত লোক-নাথের হৃদয়ে জাগিয়াছে কৃষ্ণপ্রেমের আর্তি, সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া তাই সে ছুটিয়া আসিয়াছে তাঁহার কাছে।

বার বার শ্রীগৌরাঙ্গ গদ্‌গদ স্বরে বলিতে থাকেন, "লোকনাথ, আমার প্রাণের লোকনাথ, তুমি এসে গিয়েছো। আহা, কৃষ্ণের কি কৃপা। হারানো বন্ধুকে আজ আবার আমি ফিরে পেলাম।"

নব ভাবে উদ্দীপিত হইয়া প্রভু এবার শুরু করেন তাঁহার নর্তন কীর্তন। প্রভুর দিব্যলাবণ্যময় রূপ, ভাবের প্রমত্ততা, আর ঘন ঘন সাত্ত্বিক প্রেমবিকার দর্শনে লোকনাথ আনন্দে একেবারে আত্মহারা। বহুদিনের সুখস্বপ্ন আজ তাঁহার সফল। কৃষ্ণপ্রেমের মূর্তবিগ্রহ শ্রীগৌরাঙ্গেব মধুময় সান্নিধ্যে এবার তিনি আসিয়া পড়িয়াছেন, তাঁহার দিব্যপ্রেমে হইয়াছেন ভরপুর। লোকনাথের নয়ন মন প্রাণ আজ তাই সার্থক হইয়া উঠিয়াছে।

গভীর রাত্রে কীর্তন, কৃষ্ণকথা এবং ইষ্টগোষ্ঠী শেষ হইল। প্রভু কহিলেন, "লোকনাথ, বহুদূর থেকে পদব্রজে তুমি এসেছো, পথশ্রান্ত তুমি। আজ গৃহে গিয়ে বিশ্রাম নাও। কাল প্রভাতে আমাদের সাক্ষাৎ হবে। অন্তরঙ্গ কথা, প্রাণের গোপন কথা, তোমায় তখন বলবো। লোকনাথ, কৃষ্ণের কি অপার মহিমা, তোমার মতো বন্ধুর সঙ্গে আবার আমার মিলন ঘটিয়ে দিয়েছেন। কৃষ্ণের কাজে তোমায় দিয়ে আমার বড় প্রয়োজন। কাল তোমায় সব খুলে বলবো।"

প্রভুর এই স্নেহপূর্ণ বাণী শোনার পর ঘরে গিয়া লোকনাথ সারা রাত আর ঘুমাইতে পারেন নাই। অনির্বচনীয় আনন্দে চিত্ত তাঁহার উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে। প্রভুর স্নেহপূর্ণ কথা কয়টির অনুরণন চলিতেছে তাঁহার অন্তরে।

রাত্রি প্রভাত হইতেই লোকনাথ শ্রীগৌরাঙ্গের কাছে গিয়া উপস্থিত হন। চরণ বন্দনা করিয়া উঠিয়া দাঁড়ান, প্রভু তাঁহাকে জড়াইয়া ধরেন সস্নেহ আলিঙ্গনে। প্রসন্ন কণ্ঠে বলেন, "লোকনাথ, তুমি মহাভাগ্যবান্। কৃষ্ণের কর্মে অবিলম্বে তোমায় নিযুক্ত হতে হবে। নবদ্বীপে আর তোমার থাকার আবশ্যক নেই, তুমি বৃন্দাবনে চলে যাও। কৃষ্ণের প্রেমমাধুর্যে মণ্ডিত লীলাস্থলীগুলো আজো

লোকচক্ষুর অন্তরালে রয়ে গিয়েছে। বহু বৎসরের ব্যবধানে সেই সব পুণ্যস্থল হয়েছে অরণ্যে পরিণত। তুমি এগুলো উদ্ধারের ভার নাও। এখন থেকে তপস্যা আর কৃষ্ণলীলা-তীর্থের উদ্ধার এই দুটি হোক তোমার নিত্যকার পবিত্র কর্ম।"

লোকনাথের মাথায় যেন বজ্রাঘাত হয়। একি নিষ্ঠুর কথা কহিতেছেন গৌরসুন্দর। করজোড়ে কহিলেন, "প্রভু, বড় আশা ক'রে, ঘরসংসার ছেড়ে দিয়ে নবদ্বীপে এসেছি, তোমার ভুবনমোহন লীলা দর্শন করবো, আর ভিখিরির মতো পড়ে থাকবো একধারে। আর তুমি আমার সে আশায় এমন ক'রে বাজ হানছো? তোমার দর্শনলাভের পরেই এমন ক'রে কেন আমায় দূরে ঠেলে দিচ্ছো? আমার কোন দোষে এমন নির্মম হলে তুমি।"

"আমি নির্মম কোথায় লোকনাথ? তোমায় যে কৃষ্ণের কর্মের ভার দিয়েছি, এছাড়া বৈষ্ণবের আর কি ঈপ্সিত বস্তু থাকতে পারে, বলতো?"

"না প্রভু, তুমি যাই বলো, আমি বুঝতে পারছি, তোমার বিশাল হৃদয়ে নগণ্য লোকনাথের জন্য এতটুকু স্থানও নেই। তাই তাঁকে এমনভাবে করছো অপসারিত।"

প্রভু উত্তরে বলেন, "লোকনাথ, বৃন্দাবনই যে আমার হৃদয়। সেই বৃন্দাবনেই তো আমি তোমায় স্থাপন করছি স্থায়ীভাবে। কৃষ্ণ বলেছেন, বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছামি। সেই বৃন্দাবনে চিরদিন কৃষ্ণসঙ্গী হয়ে, কৃষ্ণধ্যানে বিভোর হয়ে, তুমি থাকবে। একি কম সৌভাগ্যের কথা? লোকনাথ যে বৃন্দাবনের কৃষ্ণ আর বৃন্দাবন-লীলা তোমার উপজীব্য, সেই বৃন্দাবনেই তো তোমায় পাঠাচ্ছি।"

"প্রভু, এত কঠিন হ'য়ো না তুমি। আমায় এ সময়ে দূর ক'রে দিয়ো না।" ক্রন্দন করিয়া বলেন লোকনাথ।

প্রভু আবার প্রবোধ দিয়া বলেন, "আমার কথা মন দিয়ে শোনো লোকনাথ। নিত্যবৃন্দাবন সিদ্ধ বৈষ্ণবের আস্বাদ্য, সবার জন্য তো নয়। কিন্তু ভৌম বৃন্দাবন আস্বাদ্য সকল ভক্ত নরনারীর। আমি

চাই, ভৌম বৃন্দাবনকে তোমার সাধনা ও কর্ম দিয়ে জাগিয়ে তোল, তার দুয়ার উন্মোচন ক'রে দাও ভক্ত ও পাষণ্ডী সবাইর জন্য। ভেবো না লোকনাথ, বৃন্দাবনে আমিও যাবো, আর যাবে আমার প্রাণপ্রিয় ভক্তেরা। সবাই মিলে প্রকটিত করবো কৃষ্ণলীলার পবিত্র পীঠস্থানগুলি। লীলা মাহাত্ম্যের প্রচার ক'রে জীবন করবো সফল।"

সঙ্গে সঙ্গে প্রভু বৃন্দাবন বাসের নিদিষ্ট স্থান এবং দিনচর্যার ইঙ্গিতও দিয়া দিলেন। এসম্পর্কে ভক্ত নিত্যানন্দ দাস তাঁহার রচিত প্রেমবিলাস-এ লিখিয়াছেন :

চীরঘাট বাসস্থলী কদম্বের সারি।
তার পূর্ব পাশে কুঞ্জ পরম মাধুরি॥
তমাল বকুল বট আছে সেই স্থানে।
বাস কর সেই স্থানে সুখ পাবে মনে॥
বাসস্থলী বংশীবট নিধুবন স্থান।
ধীর সমীরণ মধ্যে করিবে বিশ্রাম॥
যমুনাতে স্নান কর, অযাচক ভিক্ষা।
ভজন স্মরণ কর জীবে দেহ দীক্ষা॥

প্রভুর দর্শন ও কৃপালাভের পরই এই বিচ্ছেদ বিরহের চিন্তা অসহনীয়। অন্তরঙ্গ ভক্তদের নিয়া প্রাণপ্রিয় প্রভু নবদ্বীপে আনন্দের মেলা বসাইয়া দিয়াছেন, উৎসারিত করিতেছেন প্রেমভক্তি রসের দুর্লভপ্রবাহ। এসব ছাড়িয়া নির্জন অরণ্যসঙ্কুল বৃন্দাবনে কি করিয়া দিন অতিবাহিত করিবেন, লোকনাথ ভাবিয়া পান না। এই সঙ্গে প্রভুর আজ্ঞার কথা এবং কৃষ্ণলীলাস্থল উদ্ধারের ঐশ্বরীয় ব্রত উদ্‌যাপনের গুরুত্বও বিস্মৃত হওয়া যায় না। বৃন্দাবনে বাস করিতে অবশ্যই তিনি যাইবেন। কিন্তু প্রভুর পুণ্যময় দর্শন ও সঙ্গ যে তাঁহার আরো কিছুদিন চাই।

সজল নয়নে প্রভুর নিকট ভিক্ষা করিলেন আর কয়েকটি দিনের মধুময় সান্নিধ্য। প্রভু সম্মত হইলেন। পাঁচদিন নবদ্বীপের প্রেম-লীলা প্রাণ ভরিয়া দর্শন করিলেন লোকনাথ, তারপর রওনা হইলেন

বৃন্দাবনধামে। এ জীবনে প্রভুর সঙ্গে আর তাঁহার সাক্ষাৎ হয় নাই। প্রভুর আদিষ্ট ঐশী কর্মের উদ্‌যাপন এবং প্রভুর নির্দেশিত পন্থায় কৃষ্ণভজন হইয়াছিল তাঁহার দীর্ঘ জীবনের উপজীব্য।

লোকনাথের বৃন্দাবন যাত্রার কথাবার্তা যখন চলিতেছে, গদাধর পণ্ডিতের নবীন শিষ্য ভূগর্ভ তখন কাছেই ছিলেন দণ্ডায়মান। বৃন্দাবনে গিয়া সাধনভজন করিবেন, এই ইচ্ছাটি তাঁহার মনে বহুদিন যাবৎ প্রচ্ছন্ন ছিল। ভূগর্ভ দেখিলেন, তাঁহার পক্ষে এ এক পরম সুযোগ। কহিলেন, "প্রভু, আপনার আজ্ঞা যদি মিলে, তবে আমিও পণ্ডিত লোকনাথের সঙ্গী হয়ে বৃন্দাবনে যেতে পারি। তাঁর পার্শ্বচর হয়ে আপনার মনোমতো কার্য এ অধম কিছুটা সম্পন্ন করতে পারবে। সে হবে আমার পরম সৌভাগ্য।"

সহায়সম্পদহীন অবস্থায় বৃন্দাবনে গমনের পর লোকনাথের একটি সঙ্গী থাকিবে এত অতি উত্তম কথা। প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ তাই মহাআনন্দিত। সোৎসাহে ভূগর্ভকে লোকনাথের সহযাত্রী হইবার অনুমতি দিলেন, প্রভুর অনুমতির পর গদাধর পণ্ডিতেরও কোনো আপত্তি রহিল না। ত্বরায় উভয়কে প্রভু রওনা করিয়া দিলেন তাঁহার আদিষ্ট কর্ম উদ্‌যাপনের জন্য।

ভক্তদের সঙ্গে কীর্তনরঙ্গে গৌরাঙ্গপ্রভু প্রায়ই প্রমত্ত হইয়া উঠিতেন, সাত্ত্বিকপ্রেম বিকারের ফলে হারাইয়া ফেলিতেন বাহ্যজ্ঞান। আবার দিব্যভাবেও প্রায়ই থাকিতেন আবিষ্ট। কিন্তু লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, প্রেরিত পুরুষরূপে যে ঐশী ব্রত উদ্‌যাপন করিতে তিনি আসিয়াছেন, যে কর্মসূচী গ্রহণ করিয়াছেন, শত ভাবাবেশ বা প্রমত্ততার মধ্যেও সে লক্ষ্য ও সে দায়িত্ব তিনি বিস্মৃত হন নাই, তাহা হইতে এতটুকুও বিচ্যুত হন নাই।

আচার্য অদ্বৈত, শ্রীবাস প্রভৃতির সহায়তায় প্রভু নবদ্বীপে তুলিয়াছেন বৈষ্ণব আন্দোলনের বিপুল ভাবতরঙ্গ।

অবধূত নিত্যানন্দকে আত্মসাৎ করিয়া তাঁহাকে গৃহী করিয়াছেন এবং ব্রতী করিয়াছেন বাংলার বৈষ্ণবীয় সংগঠনের কাজে।

আর বাসুদেব সার্বভৌম, স্বরূপ, রায় রামানন্দ এবং রাজা প্রতাপরুদ্রের মাধ্যমে দৃঢ়মূল করিয়া তুলিয়াছেন উড়িষ্যার ভক্তি-আন্দোলন।

সর্বশেষে তিনি লোকনাথ, রূপ, সনাতন প্রভৃতিকে বৃন্দাবনের গোস্বামীরূপে বসাইয়া দিয়া গড়িয়া তুলিয়াছেন নবযুগের বৃন্দাবন। বৃন্দাবনের ভক্তি সাম্রাজ্যের পত্তন ও প্রসার হইয়াছে ঐ গোস্বামীদের তপস্যা ও কর্মে। ইহার ফলে ভৌম বৃন্দাবনের কৃষ্ণলীলাস্থলের উদ্ধার যেমন সম্ভব হইয়াছে, তেমনি বৃন্দাবনের পবিত্রতা ও মাধুর্য প্রতিফলিত হইয়াছে সারা ভারতের জনমানসে।

ঐশ্বরীয় কর্ম প্রভু অপূর্ব দূরদর্শিতার সহিত নিষ্পন্ন করিতেন, এবং ঐ কর্মসূচীর প্রতিটি ধাপের প্রতি সতত নিবদ্ধ থাকিত তাঁহার তীক্ষ্ণ সজাগ দৃষ্টি।

প্রিয় সুহৃদ্ ও প্রিয় ভক্ত লোকনাথকে সুদূর বৃন্দাবনে পাঠানোর সিদ্ধান্তের পিছনেও ছিল সেই দূরদর্শিতা এবং অন্তর্দৃষ্টি।

বৃন্দাবনের কৃষ্ণলীলাস্থলীর পুনরুদ্ধার কর্মে গোস্বামী লোকনাথ ছিলেন প্রথম পথিকৃৎ। তাঁহার অক্লান্ত চেষ্টায় দুর্গম অরণ্যে শুরু হইয়াছিল সহস্র ভক্তের সমাগম। উত্তরকালে রূপ, সনাতন ও শ্রীজীব প্রভৃতি প্রতিভাধর গোস্বামীরা প্রেমধর্মের প্রাণকেন্দ্র বৃন্দাবনে গৌড়ীয় ধর্ম সংস্কৃতির যে বিরাট সৌধ গড়িয়া তুলিয়াছেন, লোকনাথই প্রস্তুত করিয়াছিলেন তাহার ভিত্তিভূমি।

কঠোর বৈরাগ্য, কৃচ্ছ্রময় তপস্যা এবং বিগ্রহসেবার অনন্য নিষ্ঠা নিয়া কাঙাল বৈষ্ণব সাধকের যে জ্বলন্ত মূর্তি নিজ জীবনে তিনি দেখাইয়া যান, দীর্ঘদিন তাহা গৌড়ীয় গোস্বামী ও সাধককুলের কাছে ছিল স্মরণীয়।

আরও একটি বিশিষ্ট অবদান ছিল লোকনাথ গোস্বামীর। উত্তরকালের গৌড়ীয় ধর্মের অন্যতম প্রাণপুরুষ নরোত্তমের তিনি

ছিলেন দীক্ষাগুরু। সদা আত্মগোপনশীল মহাবৈরাগী লোকনাথকে তিতিক্ষাপরায়ণ সাধক নরোত্তম যেভাবে তাঁহার দীক্ষাগুরুরূপে লোক-লোচনের সম্মুখে আনয়ন করেন, আজো গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সমাজে তাহার স্মৃতি অম্লান রহিয়াছে।

গোস্বামী লোকনাথের জন্ম হয় আনুমানিক ১৪৮৪ খ্রীষ্টাব্দে যশোহর জেলার তালখড়ি গ্রামে। পিতার নাম পদ্মনাভ চক্রবর্তী, মাতা সীতাদেবী।

পদ্মনাভ খ্যাতনামা পণ্ডিত ছিলেন। যৌবনে নবদ্বীপে থাকিয়া তিনি বিদ্যা অর্জন করেন এবং বৈষ্ণব আচার্য শ্রীঅদ্বৈতের নিকট বৈষ্ণবীয় ধর্মে দীক্ষালাভ করেন। গৃহে ফিরিয়া পদ্মনাভ এক চতুষ্পাঠী স্থাপন করেন, দেশের সে অঞ্চলে সুপণ্ডিত আচার্য এবং ভক্তিমান্ সাধক বলিয়া তিনি পরিচিত হইয়া উঠেন। লোকনাথ গোস্বামী তাঁহার তৃতীয় সন্তান।

বালক বয়সে লোকনাথ পিতার চতুষ্পাঠীতেই শিক্ষা লাভ করেন। চৌদ্দ বৎসর বয়সেই দেখা যায়, সংস্কৃত সাহিত্য ও শাস্ত্রে তাঁহার সন্তোষজনক ব্যুৎপত্তি হইয়াছে। অতঃপর উচ্চতর শিক্ষার জন্য প্রেরিত হন নবদ্বীপে। এস্থানে আসিয়া লোকনাথ শাস্ত্র অধ্যয়নে রত হন এবং পিতার আদেশে তাঁহার গুরু অদ্বৈত আচার্যের কাছে শুরু করেন ভাগবত পাঠ। অদ্বৈতের পাঠচক্র ও কীর্তন সভায় তাঁহার ঘনিষ্ঠ সঙ্গী ছিলেন গদাধর। অদ্বৈতের শাস্ত্র ব্যাখ্যা ও বৈষ্ণবসাধনার প্রভাবে পড়িয়া লোকনাথ কৃষ্ণভজনে ও কৃষ্ণতত্ত্ব অধ্যয়নে উৎসাহী হইয়া উঠেন।

অতঃপর কয়েক বৎসরের মধ্যে লোকনাথ ভাগবতের তত্ত্বে অধিকার লাভ করেন। কৃষ্ণ আরাধনা ও কৃষ্ণপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা অন্তরে জাগিয়া উঠে দুর্নিবারভাবে। এসময়ে আচার্য অদ্বৈত এই স্নেহভাজন তরুণকে কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষা দেন। এই দীক্ষার পর হইতেই

লোকনাথের অন্তর্জীবনে আসে দূরপ্রসারী পরিবর্তন। প্রেমভক্তির রস উপজিত হয় তাঁহার সাধনসত্তায়, তত্ত্বানুসন্ধান ও সাধনভজনে তিনি নিবিষ্ট হইয়া পড়েন।

নবদ্বীপের ছাত্রজীবনেই লোকনাথ তরুণ বিশ্বম্ভরের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসেন। উভয়েই ছিলেন প্রায় সমবয়সী এবং শুদ্ধসত্ত্ব, তাই অচিরে উভয়ের মধ্যে গড়িয়া উঠে অচ্ছেদ্য সখ্যতার বন্ধন।

নবদ্বীপের পাঠ সাঙ্গ হইলে লোকনাথ যশোহরে স্বগ্রাম তালখড়িতে ফিরিয়া যান, চতুষ্পাঠী খুলিয়া শুরু করেন অধ্যাপক বৃত্তি। সুপণ্ডিত অধ্যাপক এবং কৃষ্ণভক্ত আচার্যরূপে ধীরে ধীরে সে অঞ্চলে তাঁহার সুনাম ছড়াইয়া পড়ে।

জনশ্রুতি আছে, এসময়ে পণ্ডিত বিশ্বম্ভর, উত্তরকালের শ্রীচৈতন্যপ্রভু, একবার তালখড়িতে আসিয়া উপস্থিত হন। পণ্ডিত হিসাবে বিশ্বম্ভর তখন পূর্ববাংলার কয়েকটি অঞ্চলে পরিভ্রমণ করিতেছিলেন।

নবদ্বীপ হইতে বিশ্বম্ভর পণ্ডিতের আগমনের কথা শুনিয়া লোকনাথের পিতা পদ্মনাভ গ্রামের উপান্তে গিয়া উপস্থিত হন, নবীন পণ্ডিতকে আতিথ্য গ্রহণ করান তাঁহার গৃহে। প্রাক্তন সুহৃদ্ এবং নবদ্বীপের প্রতিভাধর নবীন পণ্ডিত বিশ্বম্ভরের আগমনে লোকনাথের আনন্দ আর ধরে না। ছাত্র জীবনের কথা, নবদ্বীপের পুরাতন কথা প্রভৃতি আলোচনায় উভয়ে মত্ত হইয়া পড়েন।

এই সাক্ষাতের কয়েক বৎসর পরেই বিশ্বম্ভরের জীবনে ঘটে বিরাট রূপান্তর। তীক্ষ্ণধী, বিদ্যাদর্পী, নবীন পণ্ডিত পরিণত হন এক নূতন মানুষে। নূতন প্রেমভক্তি আন্দোলনের মহানায়করূপে নবদ্বীপের সাধক ও পণ্ডিতসমাজে সৃষ্টি করেন তিনি বিরাট চাঞ্চল্যের। অচিরে অগণিত বৈষ্ণব ভক্তের দিক্‌দিশারী ও আশ্রয় দাতারূপে তিনি কীর্তিত হইয়া উঠেন।

এই সময়েই লোকনাথ ব্যাকুল হইয়া উঠেন প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গের দর্শনের জন্য। জননী সীতাদেবী বহুপূর্ব হইতেই বুঝিয়া নিয়াছেন, পুত্র তাঁহার সত্যকার বৈরাগ্যবান্ সাধক, তাঁহার কৃষ্ণরতি ও কৃষ্ণ

আরাধনার জের এখানেই থামিবে না। কৃষ্ণের বাঁশী অতি সত্বরই একদিন তাঁহাকে টানিয়া নিবে ঘর-সংসারের বাহিরে।

জননী সীতাদেবী ও জনক বৃদ্ধ পণ্ডিত পদ্মনাভের ভাগ্য ভাল, তরুণ লোকনাথের গৃহত্যাগের শোক তাঁহাদের সহ্য করিতে হয় নাই। পুত্র বিরাগী হওয়ার পুর্বেই, অল্পদিনের ব্যবধানে তাঁহারা লোকান্তরে চলিয়া যান।

লোকনাথের জ্যেষ্ঠ দুই ভ্রাতা ইতিমধ্যে বিবাহ করিয়া সংসারী হইয়াছেন, লোকনাথ তখনো অবিবাহিত। এসময়ে তাঁহার বয়স প্রায় পঁচিশ বৎসর। এই তরুণ বয়সেই অন্তরে জাগিয়া উঠিয়াছে তীব্র নির্বেদ, মন তাঁহার একান্তভাবে পড়িয়া রহিয়াছে নবদ্বীপে। সেখানে প্রেমধর্মের নব উদ্‌গাতা, তাঁহার প্রাক্তন সুহৃদ্ গৌরচন্দ্রের উদয় ঘটিয়াছে, ভক্তিপ্রেমের আলোকে সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে বাংলার তমসাবৃত অধ্যাত্মগগন। সে আলোকের হাতছানি লোকনাথকে আজ পাগল করিয়া তুলিয়াছে।

অগ্রহায়ণ মাসের এক নিশীথ রাত্রে সমাগত হয় তাঁহার জীবনের পরম লগ্ন। ইষ্টদেবের অমোঘ হাতছানিটি তাঁহাকে ব্যাকুল করিয়া তোলে। কৃষ্ণ-কৃষ্ণ বলিয়া ঘরের বাহিরে আসিয়া দাঁড়ান লোকনাথ। পদব্রজে ছুটিয়া চলেন অন্ধকারময় পথপ্রান্তর দিয়া। দীর্ঘপথ অতিক্রম করিয়া তৃতীয় দিবসে উপস্থিত হন নবদ্বীপে, প্রভুর দর্শন লাভে হন কৃতকৃতার্থ। তারপর মাত্র পাঁচ দিনের ব্যবধানে প্রভুর আন্তরিক ইচ্ছায় ও নির্দেশে চিরদিনের জন্য চলিয়া যান বৃন্দাবন ধামে।

বৃন্দাবনের যাত্রাপথে লোকনাথ ও ভূগর্ভকে প্রায় তিনমাস অতিবাহিত করিতে হয়। তখনকার দিনে পথঘাট মোটেই নিরাপদ ছিল না, কাজেই লোকনাথ ও ভূগর্ভকে বিপদসঙ্কুল নানা অঞ্চল এড়াইয়া বহুপথ ঘুরিয়া বৃন্দাবনে উপস্থিত হইতে হয়।

এই তিন মাসে লোকনাথ ও ভূগর্ভ উভয়ে উভয়কে ঘনিষ্ঠভাবে চিনিয়াছিলেন, আবদ্ধ হইয়াছেন অচ্ছেদ্য একাত্মকতার বন্ধনে।

বৃন্দাবনে বাস করার সময়েও উভয়ের এই প্রীতির বন্ধন অক্ষুণ্ণ ছিল। শাস্ত্রবিদ্ প্রেমিক বৈষ্ণব লোকনাথ ছিলেন প্রভুর লুপ্ততীর্থ উদ্ধারের প্রধান ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি, আর ভূগর্ভ পণ্ডিত ছিলেন তাঁহার সদা সহচর ও বিশ্বস্ত সহকারী।

উভয়ে মিলিয়া মথুরা ও ব্রজমণ্ডলের নানা স্থানে পরিভ্রমণ শুরু করেন এবং এই সঙ্গে চলে লীলাস্থলীসমূহের অনুসন্ধান। পুরাণ শাস্ত্র ও জনশ্রুতির ইঙ্গিত গ্রহণ করিয়া বহুতর স্থানে তাঁহারা ঘোরাফেরা করিতে থাকেন। কিন্তু মথুরা, বৃন্দাবন ও ব্রজমণ্ডলের বিস্তৃত অঞ্চল তখন অরণ্যে আবৃত, পথঘাট দুর্গম, তস্কর ও দস্যুদের দ্বারা উপদ্রুত। নিঃসহায় বৈরাগীদ্বয় কি করিয়া এই কার্য সম্পন্ন করিবেন ভাবিয়া পান না।

স্থানীয় সাধুদের কাছে পুরাণবর্ণিত কৃষ্ণলীলাস্থলসমূহের কিছু কিছু সন্ধান পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তাহার প্রামাণিকতা প্রতিপন্ন করা কঠিন হইয়া পড়ে।

এই অঞ্চল অরণ্যে পরিণত হওয়ার পর কিছু সংখ্যক নিম্নশ্রেণীর লোক ও বুনো জাতি এখানে আসিয়া বসবাস স্থাপন করিয়াছে। প্রাচীন পুরাবৃত্ত বা ঐতিহ্যের খবর ইহারা রাখে না। বংশ পরম্পরায় কোনো জনশ্রুতিও ইহাদের মধ্যে প্রচলিত নাই।

এই সব অসুবিধা সত্ত্বেও লোকনাথ ও ভূগর্ভ বিপুল নিষ্ঠা ও অধ্যবসায় নিয়া প্রভুর আদিষ্ট কর্ম সম্পন্ন করিতে থাকেন।

বৃন্দাবনের লুপ্ততীর্থ উদ্ধার ও দর্শনের জন্য আচার্য অদ্বৈত ও ও নিত্যানন্দ প্রভু কম পরিশ্রম করেন নাই। কিন্তু ব্রজমণ্ডলে তাঁহারা বাস করিয়াছেন অল্প দিনের জন্য। তাই সত্যকার কোনো অনুসন্ধান চালানো তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। লোকনাথ ও ভূগর্ভ এখানে আসিয়াছেন স্থায়ী অধিবাসী হিসাবে, আর শিরোধার্য করিয়া নিয়াছেন লুপ্ততীর্থ উদ্ধারের মহাব্রত। যত শ্রমসাধ্য, যত কষ্টপূর্ণ ও বিপদসঙ্কুলই হোক, আপ্রাণ চেষ্টায় এ ব্রত যে তাঁহাদের উদ্‌যাপন করিতেই হইবে।

অনাহারে অনিদ্রায় দেহ ক্লিষ্ট হইয়া পড়িতেছে। জনমানবহীন দুর্গম গভীর বনে কত দিন ও রাত্রি কাটাইতে হইতেছে, কিন্তু কোনো কিছুতেই তাঁহাদের ভ্রূক্ষেপ নাই। যখন যেখানে যে জনশ্রুতি ও শাস্ত্রীয় ইঙ্গিতের সন্ধান মিলিতেছে অপার নিষ্ঠায় সে সব লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতেছেন, আর তীর্থচারী সাধু মহাত্মাদের সাহায্য নিয়া চলিতেছে সেগুলির তথ্য নিরূপণ ও সনাক্তকরণ।

মথুরা ও ব্রজমণ্ডলের পৌরাণিক ইতিহাস ও ঐতিহ্য অতি প্রাচীন। রামায়ণেই আমরা মথুরার উল্লেখ প্রথম পাই। তখনকার দিনে এটি প্রচলিত ছিল মধুপুরী নামে। মহর্ষি বাল্মীকি বলিতেছেন,—ইয়ং মধুপুরী রম্যা মধুরা দেব নির্মিতা।[১] এই মধুপুরী পরে মধুরাই হইয়াছে এবং তাহারই অপভ্রংশ,—মথুরা। পরবর্তীকালে এই নাম অনুসরণ করিয়াই দাক্ষিণাত্যে গড়িয়া উঠিয়াছে মধুরাই বা মাদুরা নগরী।

পুরাণশাস্ত্র মতে, মধু দৈত্য স্থাপন করেন মধুরাই। তখনকার দিনে এই অঞ্চলে আর্য প্রভাব প্রসারিত হয় নাই। মধু দৈত্যের পুত্র ছিলেন লবণ। এই লবণকে পরাস্ত ও নিহত করিয়া রামচন্দ্রের অনুজ শত্রুঘ্ন মধুপুরী বা মধুরা অধিকার করেন। তখন হইতে এই অঞ্চল আর্যদের অধিকারে আসে এবং আর্য সভ্যতার এক বিশিষ্ট কেন্দ্ররূপে পরিচিত হইয়া উঠে। পরবর্তীকালে শূরসেন বংশীয় আর্যেরা এখানে বসতি স্থাপন করেন এবং শক্তিমান্ রাজবংশরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

শূরসেন ক্ষত্রিয়বংশে কালক্রমে আবির্ভাব ঘটে প্রসিদ্ধ নৃপতি যযাতির। ইঁহার পুত্র যদুর অধস্তন বংশীয় যাদবেরা মথুরায় পরাক্রান্ত হইয়া উঠেন। এই যাদবদেরই বৃষ্ণি শাখায় আবির্ভূত হন অবতার পুরুষ—বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ।

১ রামায়ণ, উত্তরকাণ্ড ৮৩

যাদবদের অন্যতম শাখা ভোজ বংশের প্রধান, রাজা কংস, মথুরার রাজসিংহাসন অধিকার করেন। বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের সহিত কংসের সংঘর্ষ ঘটে এবং তিনি নিহত হন। এই সময় হইতেই ভারতের রাষ্ট্রীয় ও সমাজজীবনে মথুরা এবং ব্রজমণ্ডলের খ্যাতি প্রতিপত্তি প্রচারিত হইতে থাকে।

ভারত যুদ্ধের পর সম্রাট্ যুধিষ্ঠির অর্জুনের পৌত্র পরীক্ষিৎকে স্বীয় রাজ্যভার প্রদান করিয়া মহাপ্রস্থানের পথে চলিয়া যান। যাত্রার পূর্বে মথুরামণ্ডলের রাজারূপে অভিষিক্ত করেন শ্রীকৃষ্ণের প্রপৌত্র বজ্রনাভকে। ভক্তিমতী মাতার প্রেরণায় বজ্রনাভ প্রপিতামহ শ্রীকৃষ্ণের স্মৃতিপূজার ব্যবস্থায় তৎপর হইয়া উঠেন।[১] তাঁহার উদ্দীপনা ও প্রয়াসের ফলে সৃষ্ট হয় শ্রীকৃষ্ণের কয়েকটি পবিত্র বিগ্রহ। ইহাদের নাম যথাক্রমে—শ্রীগোবিন্দ। শ্রীমদনগোপাল এবং শ্রীগোপীনাথ। রাজা বজ্রনাভের উৎসাহ ও প্রযত্নে এবং ভক্তিমান্ আচার্যদের সহায়তায় এই বিগ্রহদের অর্চনা ও ভোগরাগের পদ্ধতি প্রবর্তিত হয়। ব্রজমণ্ডল ও মথুরার সাধকগণ দীর্ঘদিন এই বিগ্রহদের সেবা পূজা করিতে থাকেন এবং জাগ্রত বিগ্রহরূপে জনগণের কাছে ইহারা পরিচিত হইয়া উঠেন। এই সময়ে ভক্তিমান্ সাধু মহাত্মাদের প্রচেষ্টায় প্রভু শ্রীকৃষ্ণের বহুতর লীলাস্থল নূতন করিয়া আবিষ্কৃত হয় এবং গণ্য হয় পবিত্র তীর্থরূপে।

পরবর্তীকালে কলির প্রভাবে এই সব বিগ্রহ ও তীর্থ লুপ্ত হইয়া যায়। বিশেষ করিয়া জৈন ও বৌদ্ধধর্মের প্রভাব এবং হিন্দু বৌদ্ধের সংঘর্ষের ফলে ব্রজমণ্ডল ও মথুরার ধর্ম সংস্কৃতির উপর নিপতিত হয় প্রচণ্ড আঘাত। এ সময়ে জনজীবন যেমন বিপর্যস্ত হয়, তেমনি ক্ষতিগ্রস্ত হয় অজস্র তীর্থ, মঠ, মন্দির ও সাধনপীঠ। ইতিহাসের পাঠকমাত্রেই জানেন, চীনা পরিব্রাজকদের লেখনীতে হিন্দুতীর্থ মথুরা গণ্য হইয়াছে একটি বৌদ্ধনগরীরূপে।

---

১ শ্রীশ্রীবৃন্দাবন রহস্য : রামযাদব বাগচী
২ মথুরা : গ্রাউস

কালক্রমে মথুরা ও ব্রজমণ্ডলের জনবসতি কমিয়া যায়। সারা অঞ্চল দুর্গম অরণ্যে পরিবৃত হইয়া পড়ে।

মথুরার রাজকীয় বৈভব ও প্রতাব যাহাই থাকুক, বৃন্দাবন কিন্তু পৌরাণিক যুগে প্রধানত একটি বনরূপেই বিরাজ করিত। বহু সাধু মহাত্মা এবং ভক্তিমান্ গৃহীদের আশ্রম ও আবাস ছড়ানো ছিল এই জনপদের আশেপাশে এবং সর্বত্র।

স্কন্দ পুরাণের মথুরাখণ্ডে সংক্ষেপে বৃন্দাবনের একটি মনোরম বর্ণনা আমরা পাই।

বৃন্দাবনং সুগহনং বিশালং বিস্তৃতং বহু।
মুনীনামাশ্রমৈঃ পূর্ণং বন্যবৃন্দসমন্বিতম্॥

বৃন্দাবনের বৈশিষ্ট্য ও ঐতিহাসিক বিবর্তন সম্পর্কে ইতিহাসবিদ্ লেখক শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র লিখিয়াছেন :

—৮৪ ক্রোশ পরিমিত স্থান লইয়া এই বিশাল বন অবস্থিত। এখনও ইহার দ্বাদশটি বন ও চতুর্বিংশ তপোবন তীর্থস্থানে পরিণত। পূর্বকালে এইসব বনভাগে মুনির আশ্রম ছিল। সাধকেরা নিজমনে সাধনভজন করিতেন, আর জঙ্গলের মধ্যে আভীর প্রভৃতি অনুন্নত এবং অন্য বন্যজাতির বাসভূমি ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ছিল। শেষে পশ্চিম সীমান্তের গিরিপথ দিয়া যখন মুসলমান বাহিনী ধন লুণ্ঠনের প্রত্যাশায় দলে দলে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিতে লাগিল মথুরা নগরীর উপকণ্ঠে বলিয়া সে সব আক্রমণের ফল বৃন্দাবনের উপর ফলিতেছিল।

—গজনীপতি মাহ্‌মুদ যখন বহুদিন ধরিয়া মথুরা লুণ্ঠন করেন, দেব-বিগ্রহ ভগ্ন করিয়া দুর্ভেদ্য অভ্রভেদী মন্দিরসমূহ ভূমিসাৎ করেন, তখন বৃন্দাবনও ফলভোগে বঞ্চিত হয় নাই। বৃন্দাবন পরিক্রমার অন্তর্গত একটি বনের নাম মহাবন। উহার রাজা মাহ্‌মুদের নিকট পরাজিত ও পদানত হইয়াও রক্ষা পান নাই; তিনি যখন প্রজাবর্গের দারুণ হত্যাকাণ্ড সম্মুখে দেখিলেন, তখন নিজ স্ত্রী-পুত্রের হত্যাসাধন

করিয়া অবশেষে আত্মহত্যা দ্বারা নিজের উদ্ধারসাধন করেন। সে দৃশ্য দেখিয়া বৃন্দাবন হইতে বহুলোক পলায়ন করে।

ক্রমে পাঠানেরা দিল্লী গৌড় প্রভৃতি নানাস্থানে রাজতক্ত পাতিয়া দেশ শাসন করিতে লাগিলেন। বৃন্দাবনের জঙ্গল আরও শ্বাপদসঙ্কুল হইয়া রহিল। তীর্থানুসন্ধিৎসু নির্ভীক সাধুরা ব্যতীত সে বনে আর কেহ ভ্রমণ করিতে আসিতেন না। সে জঙ্গলে শুধু বন্যেরাই বাস করিত।

—দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে গৌড়াধিপ লক্ষ্মণ সেনের সভা কবি জয়দেব যখন বৃন্দাবন দর্শনে আসেন তখন বৃন্দাবন শুধু অরণ্যই ছিল। তাঁহার কোমলকান্ত পদাবলীতে বৃন্দাবনের যে রসময়ী ললিতকান্তি ফুটিয়া উঠিয়াছিল তাহা কেবল প্রেমরসিকের কল্পনারই সামগ্রী। এখন যেমন শ্রীবৃন্দাবন নির্বিঘ্ন ভক্ত সাধকের শেষাশ্রয়রূপে জনকোলাহলের মধ্যেও শান্তিনিকেতনে পরিণত হইয়াছে, পাঠান রাজত্বকালে উহার সে দশা ছিল না। বাঙালীর একটা গৌরবের কথা এই, তাহারাই বৃন্দাবনের বনজঙ্গলের আবাদ করিয়া ভক্তির পত্তন করিয়াছিলেন।

—বাঙালী যখন এই নববৃন্দাবনের সৃষ্টি করেন, তখন বাংলা-দেশের এক সুবর্ণযুগ। পাঠান বিজয়ের উদ্দাম আক্রোশ প্রশমিত হইয়াছে আর পরাক্রান্ত পাঠান নৃপতিগণ স্বাধীনভাবে বঙ্গের শাসনদণ্ড পরিচালন করিতেছেন। তখন বিখ্যাত হুসেন শাহ্ গৌড়ের সিংহাসনে সমাসীন; দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠিত; অন্নপণ্য সর্বত্র সুলভ; শিল্পকলার সমধিক উন্নতিতে বঙ্গদেশ খ্যাত। হুসেনের রাজদরবার প্রতিভাসম্পন্ন হিন্দু অমাত্য এবং কৃতী ও পণ্ডিত দ্বারা সমলঙ্কৃত। নবদ্বীপ, চন্দ্রদ্বীপ, বিক্রমপুর প্রভৃতি বহুস্থানের শিক্ষা-সদনে সহস্র সহস্র বিদ্যার্থীর জ্ঞান-পিপাসা মিটিতেছিল। বাঙালী কোনো বিষয়ে পরমুখাপেক্ষী ছিল না। একমাত্র ধর্মক্ষেত্রে নানাবিধ ব্যভিচার ও অবনতি দেখা যাইতেছিল।

---

১ সপ্তগোস্বামী : সতীশচন্দ্র মিত্র

—এমন সময় নবদ্বীপে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাব হইল। অপরিণত বয়সে তাঁহার অলৌকিক শক্তিপ্রভাবে সকল সমস্যা ও সকল বিকারের অভিনব সমাধান হইয়াছিল। ইহাই, শুধু বঙ্গীয় কেন, ভারতীয় ইতিহাসের একটি নবযুগ। সে যুগে ইতিহাসের যে নূতন ধারা প্রবাহিত হইয়াছিল। তাহার একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল বৃন্দাবন। শ্রীগৌরাঙ্গদেব স্থায়ীভাবে বৃন্দাবনে বাস না করিলেও তাহারই প্রেরণায় তাঁহারই ব্যবস্থায়, তাঁহার প্রেরিত ভক্ত-সম্প্রদায়ের একাগ্র চেষ্টায় শ্রীবৃন্দাবনে বাঙালীর নূতন উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল। সেই ঔপনিবেশিকদিগের একমাত্র সাধনা—ভক্তির রাজ্য প্রতিষ্ঠা, ভক্তিবাদের ভিত্তিপত্তন এবং লীলা-ধর্মের প্রবর্তন।

—সেই ঔপনিবেশিকদের অগ্রদূত হইয়াছিলেন—শ্রীলোকনাথ গোস্বামী; ছায়ার মতো তাঁহার সহচর ছিলেন, অন্য এক বাঙালী ব্রাহ্মণ—শ্রীভূগর্ভ গোস্বামী।

বৃন্দাবনে পৌঁছানোর প্রায় দুই মাস পরে লোকনাথ সংবাদ পাইলেন, প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ ভক্তজনদের কাঁদাইয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন। নূতন নাম নিয়াছেন, শ্রীচৈতন্য। পুরীতে কিছুদিন অবস্থান করার পর প্রভু বহির্গত হইয়াছেন দাক্ষিণাত্যের তীর্থভ্রমণে। তীর্থদর্শন আর নবতর প্রেমভক্তি ধর্মের প্রচার দুই-ই চলিতেছে সমভাবে।

প্রভুর ত্যাগবৈরাগ্যময় সন্ন্যাসমূর্তি দর্শনের জন্য লোকনাথ ও ভূগর্ভ ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। বৃন্দাবনের কাজ কিছুদিনের জন্য স্থগিত রাখিয়া উভয়ে রওনা হইলেন দক্ষিণ ভারতের দিকে।

কিন্তু প্রভু শ্রীচৈতন্য সদাই রহিয়াছেন ভ্রাম্যমাণ। তন্ন তন্ন করিয়া দক্ষিণের বহু তীর্থ ও সাধনপীঠে লোকনাথ ও ভূগর্ভ তাঁহাকে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, কিন্তু দর্শন মিলিল না।

এদিকে শ্রীচৈতন্য পুরীধামে আসিয়া প্রেমভক্তি আন্দোলনের ভিত্তিভূমি গড়িয়া তুলিতে তৎপর হইয়াছেন। শক্তিমান্ বৈষ্ণব

সাধকেরা কেন্দ্রীভূত হইতেছেন তাঁহার চারিদিকে। অতঃপর প্রভু গৌড়ে গিয়া রূপ, সনাতনকে আত্মসাৎ করিলেন, বৃন্দাবনে তাঁহার আসার কথা ছিল কিন্তু তাহা হইয়া উঠিল না।

পরবর্তী বৎসরে প্রভু বৃন্দাবনে উপস্থিত হইলেন বটে, কিন্তু লোকনাথ, ভূগর্ভ তখন সেখানে নাই। উভয়ে দক্ষিণদেশের তীর্থে তীর্থে তখনো প্রভুর দর্শনের আশায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন। কিছুদিন পরে বৃন্দাবনে প্রত্যাবর্তন করিয়াই শুনিলেন প্রভু শ্রীচৈতন্য ভাবাবিষ্ট অবস্থায় ব্রজমণ্ডলের নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া রওনা হইয়াছেন প্রয়াগের দিকে।

উন্মত্তের মতো লোকনাথ ও ভূগর্ভ ছুটিয়া চলিলেন প্রভুকে ধরিবার আশায়। পথে রাত্রির অন্ধকার নামিয়া আসিল। শ্রান্ত-ক্লান্ত দেহে উভয়ে আশ্রয় নিলেন এক বৃক্ষতলে।

গভীর রাত্রে লোকনাথ দর্শন করিলেন এক চাঞ্চল্যকর স্বপ্ন। জ্যোতির্ময় মূর্তিতে প্রভু আবির্ভূত হইয়াছেন তাঁহার সম্মুখে, তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া প্রসন্নমধুর কণ্ঠে কহিতেছেন :

তোমার নিকটে নিরন্তর আছি আমি।
বৃন্দাবন হৈতে কোথা না যাইহ তুমি॥
প্রয়াগ হইতে আমি যাব নীলাচল।
শুনিতে পাইবে মোর বৃত্তান্ত সকল॥

(নরোত্তম বিলাস)

এই স্বপ্ন দর্শনের মধ্য দিয়া ভক্ত লোকনাথের বিরহখিন্ন হৃদয়ে কৃপাময় প্রভু বুলাইয়া দিলেন শান্তির প্রলেপ। লোকনাথের গণ্ড বাহিয়া ঝরিতে লাগিল পুলকাশ্রু। প্রভুর বাণী শিরোধার্য করিয়া সংকল্প গ্রহণ করিলেন, এ-জীবনে আর কখনো বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া কোথাও যাইবেন না, প্রভুর আদিষ্ট কর্ম উদ্‌যাপন ও প্রভুর ধ্যান মননেই করিবেন দিনযাপন।

শ্রীবিগ্রহ সেবার একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা বেশ কিছুদিন যাবৎ

জাগ্রত হইয়াছে লোকনাথের অন্তরে। কিন্তু কোথায় কোন্ শ্রীবিগ্রহ প্রকট হইবেন সেবা পূজার জন্য, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না। সেদিন প্রয়াগের পথ হইতে ফিরিবার কালে ব্রজমণ্ডলের কিশোরী কুণ্ডে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। পবিত্র কুণ্ডে স্নান করার সময় লোকনাথ তাঁহার ইষ্টদেবের কৃপায় লাভ করিলেন এক পরম সুন্দর বিগ্রহ—শ্রীরাধাবিনোদ। এখন হইতে এই বিগ্রহের সেবা ও ধ্যান জপ হইয়া উঠে তাঁহার ব্যক্তিগত সাধনজীবনের প্রধান উপজীব্য।

শ্রীবিগ্রহ কৃপাভরে দর্শন দিয়া সেবা প্রকট করিয়াছেন বটে কিন্তু তাঁহার ভক্তের কাঙালত্ব তো মোচন করেন নাই। প্রভুর সেবায় আসন, শয্যা, সাজপোষাক ভোগরাগ অনেক কিছু উপকরণ দরকার। নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণব লোকনাথের পক্ষে এসব জোটানো কঠিন, কোনো অর্থ সম্বলই যে তাঁহার নাই। অরণ্যচারী সাধু তিনি, দিন রাত বনে বনে লুপ্ত তীর্থ উদ্ধারের জন্য ঘুরিয়া বেড়ান, একখানা পর্ণকুটিরও তাঁহার নাই।

বনের অধিবাসীরা সাধুবাবাকে ভালোবাসে, তাহারা প্রস্তাব দেয়, "বাবাজী, নিজে তুমি যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়াও, থাকা খাওয়ার কোনো ঠিক নেই। কিন্তু ঠাকুর যখন কৃপা ক'রে এসেছেন তোমার কাছে, তাঁকে তো ভালোভাবে রাখতে হবে। আমরা তোমায় একটা কুঁড়েঘর বেঁধে দিচ্ছি, সেখানে ঠাকুরের সেবা পূজা তুমি করতে থাকো।"

লোকনাথ উত্তর দেন, "বাবা, আমি যেমন বনচারী আমার ঠাকুরও যে তাই। যতদিন আমি বনে বনে ঘুরে বেড়াবো, তিনিও থাকবেন সঙ্গে সঙ্গে। আমি থাকবো বৃক্ষতলে আর আমার ঠাকুর থাকবেন বৃক্ষের কোটরে।"

সেই ব্যবস্থাই আপাতত চলিতে থাকে। রোজ প্রত্যূষে উঠিয়া লোকনাথ ভক্তিভরে বনতুলসী ও বনফুল তুলিয়া আনেন, নিবিষ্ট হইয়া সম্পন্ন করেন শ্রীবিগ্রহের পূজা। বেলা হইলে অরণ্যের শাক

পাতা ফল কুঁড়াইয়া আনিয়া প্রস্তুত করেন ভোগরাগ ; ইষ্টবিগ্রহকে শয়ান দেন পুষ্পশয্যায়, ঘুম পাড়ান তাঁহাকে বৃক্ষপল্লবের বাতাস দিয়া। নিত্যকার সেবা পূজা ও জপ ধ্যানের শেষে সহচর ভূগর্ভকে নিয়া সারা দিনের মতো বাহির হইয়া পড়েন লুপ্ত, অবজ্ঞাত ও প্রচ্ছন্ন লীলাস্থলীর সন্ধানে।

কিন্তু এক একদিন এই অনুসন্ধান কর্মে দূরদূরান্তে চলিয়া যাইতে হয়, বিগ্রহ সেবায় উপস্থিত হয় নানা অন্তরায়। অবশেষে তিনি গ্রহণ করেন এক নূতনতর ব্যবস্থা। শনের গোছা পাকাইয়া এক ঝোলা তৈরি করেন, তাহারই মধ্যে স্থাপিত করেন শ্রীবিগ্রহকে। তারপর সেটি কণ্ঠে ঝুলাইয়া ঘুরিয়া বেড়ান নিত্যকার কর্মে।

লোকনাথের পবিত্র চরিত্র, সেবা নিষ্ঠা, বৈষ্ণবীয় দৈন্য ও প্রেমাবেশ দেখিয়া বনবাসীরা ক্রমে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হয়। ধীরে ধীরে দূর জনপদ হইতে দুই একটি করিয়া ভক্ত তাঁহার নিকট আসিতে থাকে।

বিগ্রহের সেবা পূজার জন্য তাহাদের কেহ কেহ অনেক সময়ে ফল মূল ইত্যাদি কিনিয়া আনিত। লোকনাথ সানন্দে প্রভুর ভোগ লাগাইতেন, তারপর ঐসব বিতরণ করিয়া দিতেন ভক্ত ও বনবাসী দরিদ্র ব্যক্তিদের মধ্যে। সেবা পূজার কোনো উপচার বা ভেট তিনি একদিনের তরেও সঞ্চয় করিতেন না। প্রাপ্তিমাত্রেই তাহা বিতরিত হইয়া যাইত।

বৈষ্ণবীয় দৈন্য ও ত্যাগ তিতিক্ষার মূর্ত বিগ্রহ লোকনাথের আদর্শ জীবন সম্পর্কে ভক্তি রত্নাকর লিখিয়াছেন :

যে বৈরাগ্য তাঁর তা' কহিতে অন্ত নাই।
শ্রীরাধাবিনোদ কৃপা কৈলা এই ঠাঁই ॥
ফলমূল শাক অন্ন যবে যে মিলয়।
যত্নে তাহা শ্রীরাধাবিনোদে সমর্পয় ॥
বর্ষা শীতাদিতে এই বৃক্ষতলে বাস।
সঙ্গে জীর্ণ কাঁথা অতি জীর্ণ বহির্বাস ॥

আপনি হইতা সিক্ত অতি বৃষ্টি নীরে।
ঠাকুরে রাখিতা এই বৃক্ষের কোটরে॥
অন্য সময়েতে জীর্ণ ঝোলায় লইয়া।
রাখিতেন বক্ষে অতি উল্লসিত হিয়া॥

(৫ম তরঙ্গ)

এই বৈরাগ্যময় তপস্যা ও কর্মনিষ্ঠার ফল ক্রমে ফলিতে আরম্ভ করে। একের পর এক কতকগুলি লুপ্ত ও বিস্মৃত তীর্থের উদ্ধার সাধন করেন লোকনাথ। সারা ব্রজমণ্ডলে এবার সাড়া পড়িয়া যায়। গৌড়ীয় সাধক লোকনাথ গোস্বামীর প্রতি পতিত হয় ভক্ত সমাজের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি। তাঁহার নিজের ব্যাপক অনুসন্ধানের সঙ্গে মিলিত হয় প্রভু শ্রীচৈতন্যের দিক্‌দর্শন ব্রজমণ্ডলে আসিয়া প্রভু ভাবপ্রমত্ত অবস্থায় কয়েকটি লীলাস্থল ও শ্রীকুণ্ডের আবিষ্কার করেন, স্থানীয় সাধু-সন্ন্যাসী ও জনসাধারণ এগুলি সম্পর্কে নূতন করিয়া সজাগ হন, শ্রদ্ধান্বিত হন।

লোকনাথের এই একনিষ্ঠ প্রয়াসের সঙ্গে শুধু প্রভু শ্রীচৈতন্যের আবিষ্কারই যুক্ত হয় নাই, পরবর্তীকালে আগত রূপ গোস্বামী ও সনাতন গোস্বামীর কর্মতৎপরতাও অশেষভাবে তাঁহার কার্যের সহায়ক হইয়া উঠে।

পুরীধাম হইতে শক্তি সঞ্চারিত করিয়া প্রভু শ্রীচৈতন্য রূপ ও সনাতনকে ব্রজমণ্ডলে পাঠাইয়া দিয়াছেন। এই দুই গোস্বামী অশেষ শাস্ত্রবিদ্, পরিচালন-দক্ষতা এবং অভিজ্ঞতাও তাঁহাদের যথেষ্ট। ইঁহাদের আগমনের পর লোকনাথ গোস্বামীর কর্মভার অনেকটা কমিয়া গেল, আগেকার মতো বন বনান্তরে ছুটাছুটি করার প্রয়োজনীয়তা আর তেমন রহিল না।

রূপ ও সনাতনকে ডাকিয়া লোকনাথ তাঁহার নিজের উদ্ধারকরা লুপ্ত তীর্থগুলি বুঝাইয়া দিলেন, শাস্ত্র ও পুরাণের তথ্যের সহিত মিলাইয়া এবং এই দুই মনীষীকে দিয়া অনুমোদন করাইয়া নূতন

তীর্থগুলির মাহাত্ম্য প্রকটিত করিলেন। কতকগুলির নূতন নূতন নামাকরণও এ সময়ে করা হইল। পরবর্তীকালে রঘুনাথ গোস্বামীর প্রচেষ্টায় শ্যামকুণ্ড রাধাকুণ্ডের উদ্ধার সাধন সম্পূর্ণ হয় এবং সারা ব্রজমণ্ডল তীর্থ, বিগ্রহ এবং কুণ্ডের মাহাত্ম্যে পূর্ণ হইয়া উঠে।

ব্রজমণ্ডল সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসু, শ্রীমৎ নারায়ণ ভট্ট নামক এক সাধক 'শ্রীব্রজভাব বিলাস' গ্রন্থের রচয়িতা। এই গ্রন্থে তিনি লিখিয়া গিয়াছেন যে, প্রভু শ্রীচৈতন্যের আদিষ্ট কর্ম উদ্‌যাপন করিতে গিয়া লোকনাথ গোস্বামী তিনশত তেত্রিশটি বন ও তীর্থ আবিষ্কারে সমর্থ হন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, নারায়ণ ভট্টের এই গ্রন্থ রচিত হয় রূপ গোস্বামীর ও সনাতন গোস্বামীর জীবিতকালে। সেই সময়ে শ্রীচৈতন্যের এই দুই প্রধান পরিকরের অনুমোদন ছাড়া ব্রজ সম্পর্কিত গ্রন্থাদির প্রকাশ সম্ভব ছিল না। কাজেই লোকনাথের আবিষ্কৃত লীলাস্থলের এ সংখ্যাটিকে মোটামুটিভাবে ঠিক বলিয়া ধরিয়া নেওয়া যাইতে পারে।

অতঃপর গৌড়ীয় ভক্ত সমাজের উপর পতিত হইল মহা দুর্দৈবের আঘাত, প্রভু শ্রীচৈতন্য নীলাচলে লীলা সংবরণ করিলেন।

এসময়ে ভক্তপ্রবর রঘুনাথ দাস বিষাদখিন্ন হৃদয়ে কাঁদিতে কাঁদিতে উপস্থিত হইলেন বৃন্দাবনে। লোকনাথ, রূপ, সনাতন, গোপাল ভট্ট, রঘুনাথ ভট্ট প্রভৃতি বৃন্দাবনে আগে হইতেই অবস্থান করিতেছেন, ভক্তিপ্রেম সাধনার আলোক প্রজ্বলিত করিয়াছেন। প্রভু চৈতন্যের এই প্রতিভাধর পরিকরদের ঐকান্তিক সাধনা ও কর্মের ফলে ভৌম বৃন্দাবনে পত্তন হইল এক নবতর ভক্তি সাম্রাজ্যের। এই ভৌম বৃন্দাবনের প্রথম ও বরেণ্য পথিকৃৎ লোকনাথ গোস্বামী।

"এখন যেখানে বৃন্দাবনের গোকুলানন্দ আশ্রম, সেইস্থানে বনের মধ্যে লোকনাথের কুঞ্জ ছিল। তাহা পথ হইতে দূরে, বৃক্ষবল্লরীর আড়ালে, নিভৃত নিলয়ে স্থাপিত। সহজে তাহা খুঁজিয়া বাহির করা যাইত না। লোকনাথও বিশেষ প্রয়োজন না হইলে কুঞ্জ ছাড়িয়া কোথাও যাইতেন না; যাঁহার সন্ধানে বৃন্দাবনে আসিয়াছেন, তাঁহারই

ধ্যানধারণায় পূজার্চনায় তাঁহার দিবা বিভাবরী অতিবাহিত হইত। তখন রূপ গোস্বামীই সমগ্র ব্রজমণ্ডলের কর্তা, বিপন্নভক্তের সহায়, নিরাশ্রয়ের আশ্রয় ছিলেন। পাণ্ডিত্যের ভিত্তিতে সেখানে যে একপ্রকার বৈষ্ণব বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল, শ্রীরূপ তাহার কর্ণধার। কত দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত নবমতের মূল ধ্বংস করিবার জন্য গোস্বামিগণের বিদ্যা পরীক্ষা করিতে আসিতেন, তাঁহাদের সঙ্গে বিচার বা জয়পরাজয় রূপের ব্যবস্থায় হইত; কোনো কিছু নূতন বিধি নিষেধ প্রবর্তিত করিতে হইলে, তাহা রূপই সকলের পরামর্শ লইয়া করিতেন। এ সব ব্যাপারে লোকনাথের সময়ক্ষেপ করিতে হইত না। তিনি নিজের সাধনভজন ও দেবসেবা লইয়াই থাকিতেন।"[১]

বৃন্দাবন ও ব্রজমণ্ডলের গোস্বামীরা এক-একজন ছিলেন প্রদীপ্ত ভাস্করের মতো। প্রতিভা, শাস্ত্রবিদ্যা, কৃচ্ছ্রসাধন ও ভজননিষ্ঠা নিয়া ভক্তি আন্দোলনের যে মহান্ কেন্দ্র তাঁহারা স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহার যশঃপ্রভায় চারিদিক আলোকিত হইয়া উঠিয়াছিল।

শ্রীচৈতন্যের প্রচারিত প্রেমভক্তি ধর্মের মূলে ছিল ভাগবতে বর্ণিত পরমপুরুষ রসময় কৃষ্ণের তত্ত্ব। এই তত্ত্ব রূপ, সনাতন, গোপাল ভট্ট, রঘুনাথ দাস প্রভৃতি প্রোজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছিলেন তাঁহাদের মনীষা ও তপস্যার মধ্য দিয়া। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধনা ও দার্শনিকতার বৈশিষ্ট্য সে সময়ে শুধু গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের জীবনকেই উদ্দীপিত ও প্রভাবিত করে নাই, সারা ভারতের সমক্ষেও তুলিয়া ধরিয়াছে প্রেমভক্তি সাধনার এক নূতনতর আলোকবর্তিকা।

কিন্তু বৃন্দাবনের এই দূরপ্রসারী প্রভাব ও ঔজ্জ্বল্য খুব বেশী দিন বর্তমান থাকে নাই। প্রভু শ্রীচৈতন্যের অপ্রকটের পরে প্রবীণ নেতৃদ্বয় নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত লীলা সংবরণ করিয়াছেন। অতঃপর বৃন্দাবনে—একে একে নিভিল দেউটি। প্রথমে সনাতন, তার পরে রূপ ও রঘুনাথ ভট্ট করিলেন মহাপ্রয়াণ। রঘুনাথদাস গোস্বামী

[১] সপ্তগোস্বামী : সতীশচন্দ্র মিত্র

শ্রীচৈতন্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লীলাপরিকর, প্রেমভক্তি সাধনার এক মূর্ত বিগ্রহ। কিন্তু তিনি তখন নিজেকে একান্তভাবে গুটাইয়া নিয়াছেন। রাধাকুণ্ডের নিকটে বসিয়া রত রহিয়াছেন কঠোর তপস্যায়, বৃন্দাবনের সাধক ও ভক্তেরা তাঁহার পুণ্যময় সঙ্গ হইতে বঞ্চিত। এসময়ে বৃন্দাবনের সাধন প্রদীপ জ্বালাইয়া রাখিয়াছেন প্রধানত তিন গোস্বামী —লোকনাথ, গোপাল ভট্ট ও শ্রীজীব। শ্রীজীব বিপুল মনীষা ও শাস্ত্র জ্ঞানের অধিকারী, সংগঠন শক্তিও তাঁহার অসাধারণ। রূপ গোস্বামীর তিরোধানের পর হইতে তিনিই বৃন্দাবনের ভক্তি সাম্রাজ্যের প্রধান পরিচালক ও ব্যবস্থাপক। গোপাল ভট্ট গোস্বামী পূর্বাশ্রমে ছিলেন শাস্ত্রবিদ্ শুদ্ধাত্মা ব্রাহ্মণ। বৃন্দাবনে আসিয়া তিনি বৈষ্ণবধর্মের সংহিতা রচনা করিয়া সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছেন। এই সর্বজনীন শ্রদ্ধা ও প্রভু শ্রীচৈতন্যের মনোনয়ন তাঁহাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে গুরুস্থানীয় মহাপুরুষরূপে। এই গোস্বামীদের মধ্যে লোকনাথ ছিলেন সকলের চাইতে বয়োবৃদ্ধ, ত্যাগ তিতিক্ষা, ভজন-নিষ্ঠা ও ভজনসিদ্ধির দিক দিয়া বরেণ্য।

ইতিমধ্যে বৃন্দাবনের গোস্বামীরা প্রায় অর্ধশতক ব্যাপিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতবাদের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন, বহুতর শাস্ত্রগ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। কিন্তু গৌড়ে এসবের প্রচার তেমন হয় নাই। গৌড় প্রভু শ্রীচৈতন্যের দেশ। যে দেশে সর্বপ্রথম তিনি রচনা করেন নিগূঢ় প্রেমধর্মের মধুচক্র, সেখানে কি তাঁহার পরিকরদের ভক্তিশাস্ত্র ও ভক্তি সাহিত্যের প্রচার ঘটিবে না, নব উজ্জীবন সাধিত হইবে না? লোকনাথ, শ্রীজীব প্রভৃতি বড় চিন্তিত হইয়া উঠিয়াছিলেন, মনে দুঃখও পাইতেছিলেন।

এই প্রচার ও উজ্জীবনের কর্ম বড় দুরূহ, বড় দায়িত্বপূর্ণ। এই কর্মভার গ্রহণের জন্য চাই এমন সব সাধক যাঁহারা কর্মকুশল, তত্ত্ববিদ্ এবং আপন আপন সাধনা ও সিদ্ধির আলোকে প্রেমধর্মের উদ্দীপনা সৃষ্টি করিতে পারেন, লক্ষ লক্ষ মানুষকে চালিত করিতে পারেন অধ্যাত্মজীবনের পথে।

কিছুদিনের মধ্যে আশার রশ্মি দেখা গেল। ত্যাগ বৈরাগ্য ও মুমুক্ষার আর্তি নিয়া বৃন্দাবনে একে একে উপস্থিত হইলেন তিনটি চিহ্নিত সাধক—শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দ। প্রাণের আবেগে নিজ নিজ প্রদেশ হইতে বৃন্দাবনে তাঁহারা ছুটিয়া আসিলেন, নিপতিত হইলেন গোস্বামী প্রভুদের পদপ্রান্তে।

উত্তরকালে এই তিন নবীন সাধক গৌড়ীয় বৈষ্ণব আন্দোলনে সংযোজন করেন নূতনতর অধ্যায়। শ্রীনিবাস রাঢ় বঙ্গে সহস্র সহস্র ভক্তকে আশ্রয় প্রদান করেন। শ্যামানন্দের প্রভাবে উড়িষ্যায় শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত নবধর্ম বিস্তৃতি লাভ করে, আর নরোত্তম উত্তর বঙ্গ এবং আসামে বহাইয়া দেন ভক্তিপ্রেমের জোয়ার।

শ্রীনিবাস গোপাল ভট্ট গোস্বামীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া ধন্য হন, আর শ্যামানন্দ দীক্ষালাভ করেন শ্রীজীবের কাছে। নরোত্তমের গুরুকরণ তখনো সম্ভব হয় নাই। গোস্বামী লোকনাথের তপস্যাপূত সিদ্ধোজ্জ্বল মূর্তি নরোত্তমের অন্তরপটে চিরতরে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে। বার বার নরোত্তম তাঁহার চরণে লুটাইয়াছেন, অশ্রুজলে তাঁহার কুটিরের মৃত্তিকা সিক্ত করিয়াছেন দীক্ষা প্রাপ্তির জন্য। কিন্তু লোকনাথ কৃপার দুয়ার উন্মোচন করেন নাই। তাঁহার সংকল্প ছিল—কখনো কাহাকেও শিষ্য করিবেন না, এখনো সেই সংকল্পে আছেন অবিচল। নরোত্তমের তাই মনোকষ্টের অবধি নাই।

শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দ এই তিন প্রতিভাধর নবীন বৈষ্ণবকে শাস্ত্র শিক্ষার ভার নিয়াছেন শ্রীজীব। রূপ, সনাতনের স্নেহধন্য উত্তরসাধক শ্রীজীব, প্রভু চৈতন্যের অচিন্ত্য ভেদাভেদ-বাদের প্রধান প্রবক্তা ও ব্যাখ্যাতা তিনি। তাছাড়া ব্রজমণ্ডলের বৈষ্ণবগোষ্ঠীর নায়ক ও প্রধান পরিচালকরূপেও তিনি চিহ্নিত। নবাগত প্রতিভাধর শিষ্যত্রয় অপরিসীম শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা নিয়া তাঁহার কাছে অধ্যয়ন করিতেছেন ভক্তিপ্রেম ধর্মের শাস্ত্রতত্ত্ব।

শিক্ষাগুরু শ্রীজীবের প্রবল ইচ্ছা, তাঁহার এই তিনটি ত্যাগী ও

প্রতিভাধর শিষ্যকে নিয়োজিত করিবেন প্রভু শ্রীচৈতন্যের ধর্মের প্রচার ও প্রসারকল্পে। কিন্তু নরোত্তমকে নিয়া গোল বাধিয়াছে। দীক্ষা গ্রহণ না করিয়া বৃন্দাবন হইতে তিনি এক পা-ও নড়িবেন না। মনে মনে গুরুরূপে বরণ করিয়াছেন গোস্বামী লোকনাথকে, কিন্তু তাঁহার কৃপা লাভের কোনো চিহ্নই দেখা যাইতেছে না।

শ্রীজীব এবং বৃন্দাবনের বিশিষ্ট বৈষ্ণব সাধুরা ব্যাপারটির গুরুত্ব বুঝেন। নরোত্তমের মতো প্রতিভাধর নবীন সাধকের প্রচেষ্টা ব্যতীত গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধন ও শাস্ত্রতত্ত্বের প্রচার সফল হইবে না। সবাই মিলিয়া লোকনাথ গোস্বামীকে চাপিয়া ধরিলেন, অনুনয় করিলেন—তিনি কৃপা না করিলে তো নরোত্তমকে নব পরিকল্পিত কর্মভার দেওয়া সম্ভব হইতেছে না। তাঁহার কাছে দীক্ষা পাইলে তবেই সে বৃন্দাবন ত্যাগ করিবে।

একান্তে তপস্যারত, নিগূঢ় ভজনানন্দে মত্ত, গোস্বামীর সেই একই কথা—শিষ্য গ্রহণের দায়িত্ব এ-জীবনে তিনি আর গ্রহণ করিবেন না, আর যে প্রতিজ্ঞা ইতিপূর্বে করিয়াছেন, কোনো মতেই তাহা তিনি ভাঙিতে পারিবেন না।

নরোত্তমের বাড়ি রাজসাহী জেলার পদ্মাতীরস্থ খেতরী গ্রামে। পিতা কৃষ্ণানন্দ মজুমদার ছিলেন প্রভাবশালী জমিদার। রাজা উপাধি ছিল তাঁর, আর ছিল বহু লক্ষ টাকার বিষয় বৈভব।

নরোত্তমের মাতা নারায়ণী দেবী অতিশয় ধর্মপ্রাণা। দীর্ঘদিন সন্তান লাভে বঞ্চিত হইয়া তিনি বহুতর ব্রত পূজার অনুষ্ঠান করেন এবং দেবতার কৃপায় লাভ করেন পুত্র নরোত্তমকে। শুভ সাত্বিক সংস্কার নিয়া নরোত্তম জন্মগ্রহণ করেন, তাই বাল্যকাল হইতেই তাঁহার জীবনে দেখা যায় ত্যাগ বৈরাগ্য ও ধর্মপরায়ণতা। বিশেষ করিয়া প্রভু চৈতন্যের জীবন ও আদর্শ তাঁহাকে উদ্দীপিত করিতে থাকে। অতঃপর তরুণ বয়সে পিতার প্রাসাদের রাজতুল্য ধন, ঐশ্বর্য ও ভোগবিলাসময় জীবন ত্যাগ করিয়া বাহির হইয়া পড়েন মুক্তির সন্ধানে।

বৃন্দাবনে আসার পর শ্রীজীবের স্নেহ ও আশীর্বাদ লাভে নরোত্তম ধন্য হন, তাঁহার প্রসাদে বৈষ্ণবীয় শাস্ত্রতত্ত্বে পারঙ্গম হইয়াও উঠেন। শ্রীজীব জানেন, নরোত্তম উত্তরবঙ্গের রাজতুল্য জমিদারের সন্তান, প্রচুর বিত্ত বিভবের উত্তরাধিকারী। সেজন্যই যে তিনি তাঁহাকে এত স্নেহ করিতেন তাহা নয়। নরোত্তম জন্ম-বৈরাগী, রাজতুল্য বিষয় বৈভব ত্যাগ করার শক্তি তিনি রাখেন, নরোত্তম প্রতিভাধর, নবীন শাস্ত্রবিদ্, নরোত্তম কৃচ্ছ্রব্রতী ভজননিষ্ঠ সাধক। তাই শ্রীজীবের এত প্রিয় তিনি। এই প্রিয় নবীন সাধকের উপর তাঁহার অনেক আশা, অনেক ভরসা। ঐশ্বরীয় কর্মের অনেক ভার তাঁহার উপর তিনি চাপাইতে চান। তাই শ্রীজীব তাঁহাকে গড়িয়া পিটিয়া তুলিতেছেন, পরিচিত করাইয়া দিতেছেন শ্রেষ্ঠ সাধুদের সঙ্গে।

শ্রীজীবের কৃপা ও স্নেহ মিলিয়াছে। এবার নরোত্তমের চাই গোস্বামী লোকনাথের কৃপাদীক্ষা। এই দীক্ষা লাভ করিতে পারিলে তবেই জীবন তাঁহার কৃতার্থ হইতে পারে। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নরোত্তম বহু চেষ্টাই করিয়াছেন, কিন্তু এ যাবৎ কোনো ফলোদয় হয় নাই। লোকনাথ প্রভু তাঁহার প্রতিজ্ঞায় অটল, এদিকে ভক্ত নরোত্তমও পণ করিয়া বসিয়াছেন, শিষ্যত্ব নিতে হইলে নিবেন একমাত্র তাঁহারই কাছে।

নরোত্তম স্থির করিলেন, দীক্ষা সম্পর্কে এবার শেষ চেষ্টায় ব্রতী হইবেন। লোকনাথের কুঞ্জ ছিল বৃন্দাবনের এক প্রান্তে, এক নিভৃত অরণ্যে। এই কুঞ্জের অনতিদূরে লোকনাথ কঠোর ভজনসাধনের জন্য এক ঝুপড়ি বাঁধিলেন। দিন রাতের অধিকাংশ সময় জপ ধ্যানে অতিবাহিত হইত, কিছুটা সময় ব্যয় করিতেন শ্রীজীবের নিকট শাস্ত্র অধ্যয়নে, অবশিষ্ট সময়ে নিবিষ্ট থাকিতেন বহু আকাঙ্ক্ষিত গুরুমূর্তির ধ্যানে।

স্বল্পভাষী, তপস্যারত লোকনাথ গোস্বামীর নিকটে তিনি কখনো আসিতেন না, কথাবার্তাও বলিতেন না। মৃদুস্বরে ইষ্টনাম গাহিয়া

গাহিয়া টহল দিতেন তাঁহার কুঞ্জের চারিদিকে। সর্বদা লক্ষ্য রাখিতেন সদা ভজনশীল লোকনাথকে কেহ যেন বিরক্ত না করে। তাঁহার নির্দিষ্ট দিনচর্যায় ব্যাঘাত না জন্মায়।

কিছুদিন এভাবে চলিল। অতঃপর নরোত্তম উদ্ভাবন করিলেন গুরুসেবার এক বিচিত্র উপায়। লোকনাথ প্রত্যূষে উঠিয়া নিকটস্থ বনের এক নির্দিষ্ট স্থানে শৌচে যাইতেন। নরোত্তম স্থির করিলেন, এখন হইতে গুরুর মেথরের কাজটি তিনি গ্রহণ করিবেন, ইহাতে একদিকে বৃদ্ধ গুরুর পরিচর্যা যেমন করা হইবে, তেমনি তাঁহার নিজেরও হইবে অহমিকার বিনাশ। উত্তরবঙ্গের শ্রেষ্ঠ ভূম্যধিকারীর পুত্র তিনি, এতকাল দেশে রাজতুল্য সম্মানে থাকিয়া আসিয়াছেন, অকল্পনীয় ভোগবিলাসের মধ্যে বর্ধিত হইয়াছেন। লোকের কাছে রাজসম্মান প্রাপ্তির ফলে অন্তরে যে অহংবোধ দানা বাঁধিয়াছে, এই ত্যাগ বৈরাগ্যের জীবনেও হয়তো তাহা একেবারে যায় নাই সূক্ষ্ম-ভাবে রহিয়া গিয়াছে। বৃন্দাবনে আসার পরেও লক্ষ্য করিয়াছেন, মন্দিরের পূজারী ও সাধু সন্ন্যাসী, যাঁহারা তাঁহার পূর্বাশ্রমের সংবাদ জানেন, বেশ কিছুটা সমীহ করেন তাঁহাকে, সম্ভ্রমও দেখাইয়া থাকেন। ইহার সূক্ষ্ম প্রতিক্রিয়া কি কিছু তাঁহার জীবনে সৃষ্ট হইতেছে না? নাঃ—এবার গুরুর মেথরের কাজের মধ্য দিয়া সেটিকে নিশ্চিহ্ন করিবেন।

সংকল্প অনুযায়ী কাজ শুরু করিয়া দিলেন। প্রত্যহ চারদণ্ড রাত্রি থাকিতে নির্দিষ্ট বনের প্রান্তে উপস্থিত হইতেন, স্থানটিকে কণ্টকশূন্য করিয়া ঝাঁটা দিয়া ভালোভাবেই মার্জন করিতেন। নিকটেই রাখিয়া দিতেন সদ্য তোলা এক ভাণ্ড জল। তারপর ঝাঁটা গাছটি এককোণে পুঁতিয়া রাখিয়া সরিয়া পড়িতেন সেখান হইতে। আবার বেশ খানিকটা বাদে ফিরিয়া আসিয়া কোদালির সাহায্যে স্থানটি ময়লা-মুক্ত করিয়া ফেলিতেন। এমনিভাবে অন্তরালে আত্মগোপন করিয়া নরোত্তম দিনের পর দিন চালাইয়া যান তাঁর গুরুসেবা।

প্রথম দিনেই লোকনাথ গোস্বামী বুঝিলেন, কেহ অলক্ষ্যে থাকিয়া তাঁহার সেবা করিতে চাহিতেছে। ভাবিলেন, স্থানীয় বুনো লোকদের অনেকে তাঁহাকে সাধু বাবাজী বলিয়া জানে। হয়তো কাহারো খেয়াল হইয়াছে বৃদ্ধ সাধুর একটু সহায়তা করা, তাই এসব করিতেছে।

এভাবে মাসের পর মাস অতিবাহিত হয়, শেষে বৎসর গড়াইয়া যায়। কৃষ্ণভাবে সদা বিভাবিত, আপনভোলা লোকনাথ গোস্বামীর মনে হঠাৎ একদিন একটা ধাক্কা লাগে। ভাবেন, 'কাজটি তো আমার পক্ষে বড় গর্হিত হচ্ছে। কোনো ভক্ত হয়তো সাধু সেবার জন্য এই মেথরের কাজ অবলীলায় ক'রে যাচ্ছে, কিন্তু আমি নিজে সর্বস্ব ছেড়ে বৈরাগ্য অবলম্বন করেছি, কৃষ্ণ ভজনে মত্ত রয়েছি, সেই আমি কেন তার এই সেবা নেবো, কেনইবা নিজেকে এভাবে পাপে জড়াবো! না—না, এ তো হতে পারে না। আজই নিশ্চয় এর প্রতিবিধান করতে হবে।'

রাত্রি শেষ হইবার পাঁচ ছয় দণ্ড বাকী, সেই সময়ে লোকনাথ বনের ঐ নির্দিষ্ট স্থানটির কাছে গিয়া এক বৃক্ষের আড়ালে গোপনে দাঁড়াইয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পরেই অদূরে দেখা গেল এক মনুষ্য মূর্তি। সারা বন তখনো অন্ধকারাচ্ছন্ন, লোকটিকে তাহা বুঝিতে পারা যাইতেছে না।

লোকনাথ গোস্বামী হাঁক দিয়া কহিলেন, "কে তুমি ওখানে? কি করছো, বল। ভয় নেই, এসো আমার কাছে।"

লোকটির দিক হইতে কোনোই সাড়া শব্দ নাই। নীরবে ধীর পদে সে নিকটে আসিয়া উপস্থিত হয়, তারপর অকস্মাৎ লুটাইয়া পড়ে লোকনাথের চরণতলে।

অন্ধকারের ঘোর তখনো কাটে নাই, তাই ভূলুণ্ঠিত ব্যক্তিটি উঠিয়া দাঁড়ানোর পরও লোকনাথ তাঁহাকে চিনিতে পারেন নাই। আবার সহজ কণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন, "কে তুমি বাবা?"

নতশিরে লোকটি উত্তর দেয়, "আমি নরোত্তম।"

"তুমি! তা হলে রোজ তুমিই একাজ করছো," সবিস্ময়ে বলিয়া উঠেন গোস্বামী লোকনাথ।

"আজ্ঞে হ্যাঁ, প্রভু, আপনার কোনো বিঘ্ন না জন্মিয়ে যদি কিছু সেবা করতে পারি, এজন্য এ কাজটুকু করছি।"

"রাজতুল্য জমিদারের পুত্র হয়ে, এই মেথরের কাজ তুমি করছো, বাবা! না, না, নরোত্তম, এতো ঠিক নয়। এতো আমি চলতে দিতে পারিনে," ব্যাকুল স্বরে বলেন লোকনাথ।

"প্রভু, আমি কাঙাল আশ্রয়হীন, অতি অভাজন। আপনার চরণে আত্মসমর্পণ ক'রে আছি। আপনি ছাড়া আমার আর গতি নেই। অন্তত এটুকু সেবা আমায় করতে দিন।" কাকুতি জানান নরোত্তম।

"হুঁ!" বলিয়া গোস্বামী লোকনাথ গম্ভীর হইলেন, নিষ্পলক নেত্রে তাকাইয়া রহিলেন করুণাপ্রার্থী তরুণ ভক্তের দিকে।

নরোত্তম এবার হৃদয়ে কিছুটা বল পাইয়াছেন। জোড়হস্তে কহিতে লাগিলেন, "প্রভু, রাজসংসারে আমি জন্মেছি, কিন্তু সে সংসার-সুখ কোনো দিনই আমায় তৃপ্তি দিতে পারে নি। কৃষ্ণকৃপার লোভ, মহাপ্রভুর কৃপার লোভ আমায় হাতছানি দিয়ে বাইরে টেনে এনেছে। কিন্তু বৃন্দাবনধামে এসেও ভজনের প্রকৃত পথ খুঁজে পাচ্ছিনে, পাষাণে বার বার মাথা কুটে মরছি। গুরু কৃপা না হলে তো মহাপ্রভুর কৃপা, ইষ্টের কৃপা মিলবে না। আপনার চরণেই নিজেকে উৎসর্গ ক'রে আমি অপেক্ষা ক'রে আছি। আপনি যদি নির্দয় হন, এ ছার দেহ তবে বৃন্দাবনের রজেই দেবো বিসর্জন।"

গোস্বামী লোকনাথের অন্তর বিগলিত হইয়াছে, নয়ন হইয়াছে করুণার্দ্র। মৃদুস্বরে আপন মনে কহিলেন, "নরোত্তম, আমি বুঝেছি, তুমি মহাপ্রভুর আপন জন, তাঁর কৃপার অধিকারী। তাঁর পবিত্র কর্মের চিহ্নিত পুরুষ তুমি। কিন্তু বৎস, নিজের প্রতিজ্ঞা আমি নিজে কি ক'রে ভাঙি? একি কঠিন পরীক্ষায় কৃষ্ণ আমায় ফেলেছেন।"

লোকনাথের চরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম নিবেদন করিলেন নরোত্তম।

তারপর একটি গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া নতশিরে ধীরপদে সেখান হইতে চলিয়া গেলেন।

পরের দিনই কিন্তু দেখা গেল, নরোত্তমের অমানুষী আর্তির ফল ফলিয়াছে। নিত্যকার কুঞ্জ পরিক্রমা সমাপণ করিয়া তিনি নিজের ভজন-কুটিরে ফিরিতেছেন এমন সময়ে লোকনাথ তাঁহাকে নিকটে আহ্বান করিলেন। গোস্বামী প্রভুর চোখে মুখে প্রসন্নতার আভা। নরোত্তম নূতন আশায় বুক বাঁধিলেন, অনুভব করিলেন, হিমালয়ের হিমবাহ ধীরে ধীরে গলিতে শুরু করিয়াছে, শতধারে এবার উহা ঝরিয়া পড়িবে প্রাণদায়িনী ঝর্ণারূপে!

অতঃপর লোকনাথ নরোত্তমকে একদিন তাঁহার ভজনকুঞ্জে ডাকাইয়া আনেন। বলেন, "বৎস, কয়েকটা শপথ তোমায় নিতে হবে আমার কাছে। আজ হতে ভোগবিলাসের কোনো সম্পর্ক রাখবে না, এমনকি চিন্তায়ও তার স্থান দেবে না। আর আজীবন থাকতে হবে তোমায় ব্রহ্মচারী হয়ে।"

বৈরাগ্য সাধনার সকল কঠোর পথই যে লোকনাথ একান্তভাবে অনুসরণ করিয়া চলিয়াছেন। এ শপথ উচ্চারণে তাই এক মুহূর্ত বিলম্ব করিলেন না।

লোকনাথ করুণাভরা কণ্ঠে কহিলেন, "নরোত্তম, বৎস, তুমি নরোত্তমই বটে। তোমার মতো যোগ্য শিষ্যকে উপলক্ষ ক'রেই কৃষ্ণ আমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করালেন। আমি তোমায় দীক্ষা দেব। আগামী শ্রাবণী পূর্ণিমার তিথিতে তুমি পাবে তোমার ইষ্টমন্ত্র।"

নরোত্তম আনন্দে আত্মহারা, সাশ্রুনয়নে তৎক্ষণাৎ লুটাইয়া পড়েন লোকনাথের চরণে। তারপর এই সুসংবাদ জানানোর জন্য বাহির হইয়া পড়েন শ্রীজীব ও অন্যান্য বৈষ্ণব সাধকদের ভজন-কুটিরের দিকে।

বহু আকাঙ্ক্ষিত দীক্ষা লাভ করিলেন নরোত্তম। এবার সোৎসাহে রত হইলেন সদ্‌গুরুর সর্বাত্মক সেবায়। এই সঙ্গে গুরুর উপদেশ

নিয়া নিগূঢ় অন্তরঙ্গ প্রেমসাধনার ক্রমগুলি তিনি অতিক্রম করিতে লাগিলেন।

নরোত্তম বিশ্বাস করিতেন গুরুর অর্জিত সাধনা ও সিদ্ধির উত্তরাধিকারী হইতে হইলে চাই সেবা পরিচর্যার মাধ্যমে গুরুর সহিত একাত্মকতা গড়িয়া তোলা। আত্মিক সাধনার এই মূল সূত্রটি ধরিয়া, আপ্রাণ চেষ্টায় এখন হইতে তিনি অগ্রসর হইতে থাকেন। নরোত্তমের এই গুরু সেবা ও গুরু পরিচর্যার কাহিনী সারা ব্রজমণ্ডলের গল্পকাহিনীর বস্তু হইয়া উঠে।

শিষ্য নরোত্তম এক বিরাট শুদ্ধসত্ত্ব আধার, আর গুরু লোকনাথ গোস্বামীও ব্রজরসের সিদ্ধ মহাত্মা, তদুপরি দিব্য করুণা ধারার বিরাট উৎস তিনি। গুরুর কৃপা তাই একবার ঝরিয়া পড়িল অঝোরধারে। যে নিগূঢ় ব্রজরস সাধনার পদ্ধতি নিজে অনুসরণ করিয়া লোকনাথ সিদ্ধ হইয়াছিলেন, সযত্নে যথাযথভাবে তাহাই শিখাইয়া দিলেন তাঁহার একমাত্র শিষ্যকে।

নরোত্তম আর নর রহিলেন না, তপস্যার বলে আর গুরুর কৃপা বলে হইয়া উঠিলেন দেব-মানব। বৃন্দাবনের পথেঘাটে দেব-দেউলে তাঁহার তপঃসিদ্ধ আনন্দঘন মূর্তিটি যে একবার দর্শন করিত সেই শির নত করিত সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধা সহকারে।

শ্রীজীব গোস্বামী নরোত্তমকে পূর্ব হইতেই অশেষভাবে স্নেহ করিয়া আসিতেছেন। লোকনাথের নিকট হইতে কৃপাদীক্ষা প্রাপ্তির পর নরোত্তম যে নিগূঢ় ব্রজরস সাধনায় পারঙ্গম হইয়াছে, ইহা তাঁহার দৃষ্টি এড়ায় নাই। গোস্বামী এবং সিদ্ধ মহাত্মাদের মহলে শ্রীজীব প্রস্তাব তুলিলেন, সিদ্ধ সাধক নরোত্তমকে দান করা হোক 'ঠাকুর' উপাধি। অতঃপর গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে যাহাতে তিনি গুরু স্থানীয় সাধক পুরুষরূপে সম্মান প্রাপ্ত হন, এই জন্যই তাঁহার এই প্রস্তাব। সানন্দে সকলেই ইহাতে সম্মতি দিলেন এবং এখন হইতে সাধু নরোত্তম হইলেন—নরোত্তম ঠাকুর। বৃন্দাবনে এসময়ে ঠাকুর বলিতে লোকে বুঝিত বরেণ্য বৈষ্ণব সাধক নরোত্তমকে। নরোত্তমের

এই স্বীকৃতি ও মর্যাদার ভিতর দিয়া সাধক-সমাজে বিশেষভাবে ফুটিয়া উঠিল সিদ্ধ মহাত্মা লোকনাথ গোস্বামীর অবদানের প্রকৃত মাহাত্ম্য।

"লোকনাথ ক্রমে জরাগ্রস্ত এবং স্থবির হইয়া পড়িতেছিলেন; পূজার্চনার সকল রীতি রক্ষা করিতে পারেন না, জপ সংখ্যাও প্রত্যহ পূর্ণ হয় না। তবুও তিনি স্বাবলম্বনের পূর্ণ মূর্তি, কাহারও অপেক্ষা করিতে চাহিতেন না। নরোত্তম যে এত সেবা করিতেন, তবুও তিনি পরবশ হইলেন না। নরোত্তমের যখন গৃহে ফিরিবার ব্যবস্থা হইল তিনি তাহাকে অম্লান বদনে অনুমতি দিলেন, অথচ দ্বিতীয় শিষ্য গ্রহণ করিলেন না। নরোত্তমই তাঁহার একমাত্র শিষ্য।

লোকনাথের আর একটি বিশেষত্ব ছিল। তিনি আপনার কথা কাহাকেও কিছু বলিতেন না। কোনো প্রকারে কেহ তাঁহার কোনো গুণগাথা গায় তাহা তিনি পছন্দ করিতেন না। তিনি নিজে কোনো শাস্ত্রগ্রন্থ লিখেন নাই, অথচ রূপ, সনাতন ও গোপাল ভট্ট প্রভৃতি গোস্বামিগণের সাধনতত্ত্বের অনেক সারাংশ তাঁহার নিকট হইতেই গৃহীত।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ যখন বৃন্দাবনের সকল ভক্তগণের উপদেশ ও আনুকূল্যে তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত রচনা করিতেছিলেন, তখন লোকনাথও তাঁহাকে অনেক সাহায্য করেন, কিন্তু গ্রন্থ মধ্যে তাঁহার নিজের কোনো প্রসঙ্গ উল্লেখ করিতে তিনি বারংবার নিষেধ করিয়াছিলেন। এজন্য সেই বিরাট গ্রন্থে সে যুগের বহু কথা, বহু ঘটনা চোখের জলের কালিতে লিখিত হইয়াছিল, তাহার মধ্যে লোকনাথের কোনো কথা নাই। সে যুগে এমন আত্মগোপন গোপাল ভট্ট ব্যতীত গোস্বামীপাদদিগের মধ্যেও আর কেহ করেন নাই। লোকনাথ গোস্বামীর জীবদ্দশায় কোনো লেখক তাঁহার কোনো কথা কোনো গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিতে সাহস করেন নাই। এই জন্যই লোকনাথ চরিত্রের অনেক তথ্য মনুষ্য নেত্রের

পথবর্তী হইবার অবসর পাইতেছে না। লোকনাথের মতো নিস্পৃহ, সর্বত্যাগী মহাপুরুষ অতি বিরল[১]।"

বৃন্দাবনে গোস্বামীদের প্রতিভা, উৎসাহ ও কর্মনিষ্ঠার ফলে বহুতর বৈষ্ণব শাস্ত্র রচিত ও সংগৃহীত হইয়াছে। শ্রীজীব গোস্বামী ও অন্যান্য উচ্চকোটির সাধুরা স্থির করিয়াছেন এই অমূল্য শাস্ত্র সম্পদ গৌড়ে পাঠানো হইবে। ইহার দায়িত্বভার গ্রহণ করিবেন শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দ, শ্রীজীবের তিন প্রতিভাধর ছাত্র। ইঁহাদের জন্য ব্যবস্থা করা হইবে উপযুক্ত যানবাহন ও রক্ষীদল।

লোকনাথ গোস্বামীর বয়স তখন প্রায় একশত বৎসর। বৃন্দাবনের প্রাচীনতম সিদ্ধপুরুষ তিনি। তাঁহার কুঞ্জে আসিয়া শ্রীজীব তাঁহার প্রস্তাব উপস্থাপিত করিলেন। কহিলেন, "শ্রীনিবাস ও শ্যামানন্দের সঙ্গে নরোত্তমকেও আমরা গৌড়ে পাঠাতে চাই। এদের মতো কঠোরতপা ভক্ত সাধকই বৈষ্ণব শাস্ত্র এবং বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারে সমর্থ। মহাপ্রভুর আরব্ধ আজ সম্পন্ন করার জন্য এদের গৌড়ে যাওয়া প্রয়োজন।"

গোস্বামী লোকনাথ সোৎসাহে সমর্থন করিলেন এই প্রস্তাব। কহিলেন, "শ্রীজীব, তোমাদের এই ব্যবস্থাপনায় মহাপ্রভুর কর্ম সিদ্ধ হবে, জীবের কল্যাণ সাধিত হবে। এতো অতি আনন্দের সংবাদ। নরোত্তমকে গৌড়ে যাবার অনুমতি অবশ্যই আমি দেবো।"

বিদায়কালে প্রাণপ্রিয় শিষ্যকে লোকনাথ গোস্বামী কহিলেন, "বৎস নরোত্তম, আমি প্রাণভরে আশীর্বাদ করি, তোমার এই নূতন ব্রত সুসম্পন্ন হোক। তুমি আমার একমাত্র শিষ্য, সার্থকনামা শিষ্য। যখন যেখানে থাকো, বিষয় সংস্পর্শ সম্পূর্ণরূপে বর্জন ক'রে, তা থেকে দূরে থাকবে। ভজনানন্দে ও অষ্টপ্রহরীয় লীলা অনুধ্যানে করবে দিন যাপন।"

আসন্ন বিচ্ছেদের কথা স্মরণ করিয়া নরোত্তম শোকাকুল হইয়া উঠিয়াছেন, কপোল বাহিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িতেছে। তাঁহাকে

---

১ লোকনাথ গোস্বামী : সতীশচন্দ্র মিত্র

প্রবোধ দিয়া লোকনাথ আবার কহিলেন, "বৎস, তোমায় আমি শিষ্য করেছি, নিজের দীর্ঘ দিনের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ ক'রে। আমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়েছে তোমার ভক্তি ও পুণ্যের বলে। আজ আমি তোমার কৃতবিদ্যতা ও সাধনোজ্জ্বলা বুদ্ধি দেখে পরম সন্তুষ্ট। যে কয়দিন বেঁচে আছি, আর কাউকে আমি শিষ্য করবো না। আমার শিক্ষা দীক্ষা ও সাধনের প্রদীপকে একলাটি তুমিই রাখবে জ্বালিয়ে।"

জোড়হস্তে কাতরকণ্ঠে নরোত্তম বলেন, "প্রভু, আশীর্বাদ করুন, গৌড়ের কর্মব্রতের ফাঁকে ফাঁকে এ অধম যেন আপনার চরণ দর্শন ক'রে যেতে পারে।"

"না বৎস," সুস্পষ্ট ভাষায় বলেন লোকনাথ গোস্বামী, "তোমার আর বৃন্দাবনধামে আসবার প্রয়োজন নেই। তোমার আমার এই শেষ দেখা।"

গুরুগত প্রাণ ভক্ত নরোত্তমের মাথায় যেন বজ্রাঘাত হয়। তৎক্ষণাৎ মূর্ছিত হইয়া তিনি ভূমিতলে পতিত হন।

কিছুকাল পরে বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিলে গুরুদেবের চরণে প্রণিপাত করিয়া ভিক্ষা মাগেন তাঁহার পাদুকা দুইটি। এই পাদুকা শিরে ধারণ করিয়া নিষ্ক্রান্ত হন বৃন্দাবন হইতে।

অতঃপর তপঃসিদ্ধ মহাপুরুষ লোকনাথ গোস্বামী আর বেশী দিন জীবিত থাকেন নাই। আনুমানিক ১৫৮৮ খ্রীষ্টাব্দে নির্ধারিত চিরবিদায়ের ক্ষণটি আসিয়া যায়। ইষ্টদেব শ্রীরাধাবিনোদের বিজয়-মূর্তির দিকে সজল নয়নদুটি নিবদ্ধ করিয়া নরলীলায় ছেদ টানিয়া দেন চিরতরে। বৃন্দাবনের নব উজ্জীবনের জন্য যে প্রথম আলোক-বর্তিকাটি প্রভু শ্রীচৈতন্য স্বহস্তে জ্বালাইয়া দিয়াছিলেন, সেদিন তাহা নির্বাপিত হইয়া যায়।

রূপ গোস্বামী

শ্রাবণ মাসের বর্ষণ-জর্জর নিশীথ রাত্রি। ঝুপ্ ঝুপ করিয়া অঝোর-ধারে বৃষ্টি পড়িতেছে, সেই সঙ্গে রহিয়াছে উদ্দাম ঝড়ের হাওয়া। এই দুর্যোগের রাত্রে রামকেলি হইতে একটি তাঞ্জাম চলিয়াছে গৌড় শহরের দিকে। পথঘাট পিচ্ছিল, বাহকেরা খুব সতর্কপদে চলিতেছে।

তাঞ্জামের ভিতরে চিন্তিত মনে বসিয়া আছেন সন্তোষ দেব, সুলতান হুসেন শাহের রাজস্ব বিভাগের অধিকর্তা। সুলতানের জরুরী তলব আসিয়াছে তাড়াতাড়ি হাজির হওয়ার জন্য। তাই ভরা বর্ষার এই মধ্য রাত্রেই এভাবে তাঁহাকে ছুটিতে হইয়াছে।

হঠাৎ অসময়ে কেন এই তলব? দপ্তরের কোনো গোলযোগ? বড় ধরনের কোনো তহবিল তছরুপ? না সুলতান গোপনে কোনো সামরিক অভিযানে যাইতেছেন, এজন্য কোষাগার খোলার জন্য অধিকর্তাকে এমন তাড়াতাড়ি ডাকিয়া নেওয়া? জরির কিংখাবে মোড়া তাঞ্জামের ভিতরে, তাকিয়া হেলান দিয়া বসিয়া আছেন সন্তোষ দেব। গড়গড়ার নলটি মুখে বসানো। চিন্তিত মনে মাঝে মাঝে সেটি টানিয়া চলিয়াছেন, বাদশাহী অম্বুরি তামাকের ধোঁয়া ও সুবাস ছড়াইতেছে চারিদিকে।

ঘন অন্ধকারময় রাজপথ হঠাৎ প্রদীপ্ত হইয়া উঠে বজ্র বিদ্যুতের আলোকে। একটা প্রকাণ্ড বৃক্ষ ঝড়ে ভাঙিয়া পড়িয়াছে, আড়াআড়ি ভাবে পতিত হওয়ায় রাস্তাটি প্রায় বন্ধ। পথ চলিবার উপায় নাই। রাজপথের একপাশে সারি সারি পর্ণকুটির, রজকেরা এগুলিতে বাস করে। রাজপুরীর কাজকর্ম করিয়া সংসার চালায়।

রাজপথ বন্ধ, তাই বাহকেরা তাঞ্জামটি নিয়া একটি পর্ণকুটিরের ছাঁচতলা ঘেঁষিয়া ধীরপদে চলিতেছে, বর্ষণের ফলে সেখানে তখন

জমিয়া গিয়াছে হাঁটুজল, জল ঠেলিয়াই ধীরে ধীরে বাহকদের চলিতে হইতেছে।

তাঞ্জামে উপবিষ্ট অবস্থায় সন্তোষদেবের কানে পৌঁছিল পর্ণ-কুটিরের ভেতরকার আওয়াজ। গভীর রাত্রে এমন ঘোর বর্ষায়, কে পথ চলিয়াছে তাহা নিয়া চলিয়াছে ধোপা ও ধোপানীর কথাবার্তা।

পুরুষ কণ্ঠের প্রশ্ন, "অন্ধকারে, সপ্ সপ্ শব্দে হাঁটুজল ঠেলে কে যাচ্ছে, কে জানে?

নারীকণ্ঠের মন্তব্য শোনা যায়, "কে আর হবে? হয় কুকুর, বা চোর। নয়তো রাজার কোনো গোলাম। এ ঘোর দুর্যোগে আর কেউ তো বেরুবে না।"

"না গো, কুকুর নয়, চোরও নয়। কয়েকটা মানুষের পায়ের জল-ঠেলা শব্দ পাচ্ছি। হয়তো কোনো হতভাগা রাজকর্মচারী রক্ষীদল নিয়ে পথ চলেছে জরুরী তলব পেয়ে।"

তাঞ্জামের ভিতর অর্ধশায়িত ছিলেন সন্তোষদেব, ক্ষিপ্রভাবে তিনি উঠিয়া বসেন। দম্পতির কথাগুলি যেন তাঁহাকে দংশন করে বৃশ্চিকের মতো। কুকুর বা তস্কর বা রাজার গোলাম! একই পর্যায়ভুক্ত এসব! দরিদ্র নিরক্ষর দম্পতির কথা বটে, স্থূল ধরনের মন্তব্য বটে, কিন্তু কথাগুলি তো মোটামুটিভাবে অসত্য নয়। রাজার গোলামী হলেও, এ গোলামী ঘৃণ্য, অসহ্য। সোনার খাঁচা বা লোহার খাঁচা, বন্দী পাখির জীবনে একই দুর্ভাগ্য বহন করিয়া আনে।

ক্ষুণ্ণ মনে নিজের সমগ্র জীবনের দিকে দৃষ্টিপাত করেন সন্তোষ-দেব। বিষয় বৈভব যথেষ্ট অর্জন করিয়াছেন, রাজ সরকারে প্রচুর সম্মান। সুলতানের অনুগৃহীত বলিয়া দেশের সবাই সমীহ করে, সম্ভ্রম দেখায়। কিন্তু এই মান-ঐশ্বর্যময় জীবন এখনও তো দাসত্বের শৃঙ্খলে বাঁধা। মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় দীর্ঘ দিন জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিয়াছেন। কিন্তু আজো তাহা করায়ত্ত হয় নাই। এই ব্যর্থ জীবন, বন্ধ্যা জীবন, আজ সত্যই তাঁহার পক্ষে বড় দুর্বহ। নাঃ আর নয়, এবার রাজ-প্রশাসনের উচ্চপদ ছাড়িয়া, বিত্তবিষয় সবকিছু বিলাইয়া দিয়া,

বাহির হইবেন মুমুক্ষার পথে। ইষ্টদর্শনের জন্য, কৃষ্ণলাভের জন্য করিবেন মরণ পণ।

সেদিনকার এই উদ্দীপনা ও আর্তি সন্তোষদেবের জীবনে ঘটায় রূপান্তর। রাজানুগ্রহ ও রাজসেবা চিরতরে তিনি ত্যাগ করেন, কৃষ্ণ-সেবায় সমগ্র জীবন করেন নিয়োজিত। সারা ভারতের এক শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব নেতারূপে, মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের অন্যতম প্রধান পার্ষদরূপে তিনি কীর্তিত হইয়া উঠেন, পরিগ্রহ করেন প্রভুর প্রদত্ত রূপ গোস্বামী নাম। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের অন্যতম অধিনায়ক রূপে বৃন্দাবনে যে ভূমিকা তিনি গ্রহণ করেন আজো তাহা অবিস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে।

রূপ গোস্বামীর পূর্বপুরুষ ছিলেন দাক্ষিণাত্যের বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। এক সময়ে কর্ণাটের কোনো অঞ্চলে ইঁহারা রাজত্ব করিতেন। পরবর্তীকালে ইহাদের একটি অধস্তন পুরুষ গৌড়ে আসিয়া রাজ সরকারে কর্ম গ্রহণ করেন এবং স্থায়ীভাবে গৌড়েই বসবাস করিতে থাকেন।

এই বংশের মুকুন্দদেব ছিলেন গৌড়ের বাদশাহের এক সুদক্ষ ও আস্থাভাজন উচ্চ কর্মচারী। ইঁহার পুত্রের নাম কুমারদেব। শাস্ত্র-বিদ্ বৈষ্ণব বলিয়া তাঁহার খ্যাতি ছিল। কুমারদেব তিনটি নাবালক পুত্র রাখিয়া অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন। পিতামহ মুকুন্দদেবকে গ্রহণ করিতে হয় তিন পৌত্র, অমর, সন্তোষ ও বল্লভকে মানুষ করার দায়িত্বের ভার।

অমর সন্তোষ ও বল্লভ উত্তরকালে প্রভু শ্রীচৈতন্যের কৃপা ও আশ্রয় লাভ করেন এবং প্রভু তাঁহাদের নূতন নামকরণ করেন, যথাক্রমে—সনাতন, রূপ ও অনুপম। অনুপম তাঁহার একমাত্র পুত্র শ্রীজীবকে রাখিয়া অকালে ইহলোক ত্যাগ করেন। আর উত্তরকালে সনাতন ও রূপের অভ্যুদয় ঘটে শ্রীচৈতন্যের অন্তরঙ্গ পার্ষদরূপে, বৃন্দাবনের ভক্তি সাম্রাজ্যের নিয়ন্তারূপে।

পিতামহ মুকুন্দদেব সনাতন ও রূপের শিক্ষার সুবন্দোবস্ত করিতে কোনো ত্রুটি করেন নাই। রামকেলিতে রামভদ্র বাণী-বিলাসের নিকট তাঁহারা ব্যাকরণ পাঠ সমাপ্ত করেন। তারপর তাঁহাদের নবদ্বীপে পাঠানো হয়, সেখানে রত্নাকর বিদ্যাবাচস্পতি এবং বাসুদেব সার্বভৌমের নিকট অধ্যয়ন করেন উচ্চতর শাস্ত্র।

মুকুন্দদেব বিচক্ষণ ব্যক্তি। বুঝিলেন, শুধু শাস্ত্রবিদ্যায় রাজ-সরকারে উচ্চপদ মিলিবে না, এজন্য চাই ফার্সী ও আরবী ভাষার শিক্ষা। সপ্তগ্রামের শাসক সৈয়দ ফকরুদ্দীন মুকুন্দদেবের বন্ধু, ফার্সী ও আরবীতে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। তাঁহার তত্ত্বাবধানে থাকিয়া উভয় ভ্রাতা ঐ ভাষা দুইটি যত্ন সহকারে অধ্যয়ন করিলেন। অল্প সময়ের মধ্যে ব্যুৎপন্ন হইয়াও উঠিলেন।

দরবারে পিতামহের প্রতিপত্তি ছিল, তাই অল্পবয়সে সনাতন রাজকার্যে ঢুকিয়া পড়িলেন। প্রখর বুদ্ধি, প্রতিভা ও কর্মকুশলতার গুণে অধিকার করিলেন মুখ্য সচিবের পদ। ছোটভাই রূপকে তিনি ঢুকাইয়া দিয়াছিলেন রাজস্ব বিভাগে, বিদ্যাবুদ্ধি ও পরিচালন দক্ষতায় অল্পসময়ে তিনি সুলতানের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন, উন্নীত হইলেন রাজস্ব অধিকর্তার উচ্চপদে।

গৌড়ের সন্নিহিত গ্রাম রামকেলিতে উভয় ভ্রাতা বাস করিতেন। পদমর্যাদা, বিত্ত এবং শিক্ষাদীক্ষার দিক দিয়া তাঁহারা অগ্রণী। ধর্ম এবং সমাজের নেতৃত্বও ছিল তাঁহাদেরই করায়ত্ত। রামকেলিতে তাঁহাদের ভবনে প্রায়ই আগমন ঘটিত শাস্ত্রবিদ্ ব্রাহ্মণদের, ধর্মীয় আলোচনা ও বিচার অনুষ্ঠিত হইত সোৎসাহে। রূপ ও সনাতনের বিদ্যা ও বৈদগ্ধ্য সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। ব্রাহ্মণ এবং সাধু সজ্জনের ভিড় লাগিয়াই থাকিত তাঁহাদের গৃহে, আদর আপ্যায়ন দানধ্যানে রূপ ও সনাতন সকলের সন্তোষ বিধান করিতেন।

রামকেলির এই পরিবেশ হইতে বাহির হইলেই দেখা যাইত রূপ সনাতনের আর এক রূপ। সেখানে তাঁহারা গৌড়ের বাদশাহের আস্থাভাজন ও অতি অন্তরঙ্গ উচ্চ কর্মচারী। দরবারের মুসলিম

পরিবেশের রূপান্তরিত মানুষ তাঁহারা। চোগা চাপকান সমন্বিত পোষাক, আরবী ফার্সী বুলির চমৎকারিতা, এবং মুসলমানী আদপ কায়দা দেখিয়া বুঝিবার উপায় নাই যে তাঁহারা নিষ্ঠাবান্ হিন্দু এবং সনাতন ধর্মের ধারক ও বাহক।

বৈষ্ণবীয় সংস্কার পূর্ব হইতেই বর্তমান ছিল রূপ ও সনাতনের বংশে। এবার উভয় ভ্রাতার মধ্যে এই সংস্কার ধীরে ধীরে প্রবল হইয়া উঠে। প্রেমভক্তির রসধারায় অন্তর অভিসিঞ্চিত হয়, কৃষ্ণকৃপা ও কৃষ্ণপ্রাপ্তির জন্য প্রাণমন হয় অধীর চঞ্চল। মুক্তির আকুতি আর বিষয় বৈরাগ্য ক্রমে দুর্বার হইয়া উঠে।

সারা গৌড়দেশে তখন নবদ্বীপের চাঞ্চল্যকর সংবাদ ছড়াইয়া পড়িয়াছে। শ্রীচৈতন্যের অভ্যুদয়ের কথা, প্রেমভক্তি ধর্মের নবতন আন্দোলনের কথা, অন্যান্য স্থানের মতো রামকেলিতেও আলোচিত হইতেছে। ভক্ত মানুষ, মুক্তিকামী মানুষ, নূতনতর আবেগ আর নূতনতর আশায় অধীর হইয়া উঠিয়াছে।

সনাতন ও রূপ এসময়ে প্রভু শ্রীচৈতন্যের চরণাশ্রয় চাহিয়া পত্র দিলেন। প্রভু জানাইলেন, এখন নয়, আরো কিছুদিন তোমরা অপেক্ষা কর।

অতঃপর সন্ন্যাস গ্রহণের পর প্রভু নিজেই একদিন বৃন্দাবন গমনের ছলে রামকেলিতে আসিয়া উপস্থিত। রূপ ও সনাতন ছুটিয়া গেলেন তাঁহার পদপ্রান্তে, সংসার ত্যাগের জন্য উভয়ে অস্থির হইয়া পড়িয়াছেন। এবারও প্রভু বাধা দিলেন. কহিলেন, আরো কিছুকাল ধৈর্য ধারণ কর।

প্রভুর সেদিনকার দিব্য দর্শন ও আশীর্বাদ লাভের পর হইতেই বিষয় বিতৃষ্ণায় দুই ভ্রাতার মন ভরিয়া উঠিয়াছে। অতঃপর কি করিয়া নিগড় কাটিয়া ফেলিয়া মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলিবেন, এই চিন্তাই কেবল করিতেছেন।

মনের এই নির্বিণ্ণ অবস্থায় সেদিনকার দুর্যোগময় রাত্রে রূপের সর্বসত্তায় এক প্রচণ্ড নাড়া পড়িয়া গেল। সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া

ফেলিলেন,—চিরতরে করিবেন গৃহত্যাগ। প্রভু শ্রীচৈতন্যের পদাশ্রয় গ্রহণ করিয়া হইবেন কান্থা করঙ্গধারী বৈষ্ণব, অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করিবেন কৃষ্ণভজনে।

রূপ এবং সনাতন দুই ভ্রাতা নিতান্ত আকস্মিকভাবে রাজ-ঐশ্বর্য ত্যাগ করিয়া বৈরাগী হন নাই এবং মন্ত্রবলে প্রেমভক্তি রসের রহস্য জ্ঞাত হন নাই। এজন্য সংসার জীবনে, উচ্চ রাজপদে থাকার কালে দীর্ঘ প্রস্তুতির মধ্য দিয়া তাঁহাদের চলিতে হইয়াছে। এ প্রস্তুতির মূল্য নিরূপণ না করিলে তাঁহাদের ত্যাগপূত জীবনের মূল রহস্যের সন্ধান পাওয়া যাইবে না। ভক্তি রত্নাকর বলিতেছেন :

সদা সর্বশাস্ত্র চর্চা করে দুইজন।
অনায়াসে করে দোহে খণ্ডন স্থাপন॥
ন্যায়সূত্র ব্যাখ্যা নিজকৃত যে করয়।
সনাতন রূপ শুনিলে সে দৃঢ় হয়॥

গবেষক ও ইতিহাসকার সতীশচন্দ্র মিত্র সনাতন ও রূপের শাস্ত্রচর্চার চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন :

শুধু নিজেরা দুইজনে তর্ক করিয়া কোনো মত খণ্ডন বা নূতন মত স্থাপন করিতেন, তাহা নহে, অন্য পণ্ডিতেরাও কেহ ন্যায়শাস্ত্রের কোনো নূতন ব্যাখ্যা করিলে তাহা উভয় ভ্রাতাকে জানাইয়া এবং অনুমোদিত করিয়া না লইলে কাহারও চিত্ত স্থির হইত না। এইভাবে উচ্চ রাজকার্য হইতে যেটুকু অবসর মিলিত, ভ্রাতৃদ্বয় তাহা শাস্ত্র-চর্চায় অতিবাহিত করিতেন। সনাতনের গুরুদেব বিদ্যা-বাচস্পতি মহাশয় সাধারণত নবদ্বীপ-সংলগ্ন বিদ্যানগরে বাস করিতেন। যখন তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা পুরীতে এবং পিতা কাশীতে যান, তখন তিনি সময় সময় দীর্ঘকাল গৌড়ে আশ্রয় লইতেন। দূরদেশ হইতে যে সব শাস্ত্রদর্শী পণ্ডিত সুব্রাহ্মণ আসিতেন, রাজাজ্ঞাতেই আসুন বা সনাতনের আহ্বানেই আসুন, দুই ভ্রাতা পরম যত্নে রামকেলির বাড়িতে তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিতেন এবং সশ্রদ্ধ আপ্যায়নে সকলকে পরিতুষ্ট করিতেন। এজন্য তাঁহারা

অজস্র অর্থব্যয়ে কখনো কুণ্ঠিত হইতেন না। রামকেলিতে চতুষ্পাঠী বসিয়াছিল, সংস্কৃত শাস্ত্রের পঠনপাঠন হইত। তাঁহারা সে সকল অনুষ্ঠানের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এইরূপ নানাভাবে রামকেলিতে বহু ব্রাহ্মণ আসিতেন, সুদূর কর্ণাটদেশ হইতেও তাঁহাদের নিজ সম্প্রদায়ভুক্ত বৈদিক ব্রাহ্মণেরা আসিতেন। সুগন্ধ কুসুম ফুটিলে তাহার সৌরভামোদে চারিদিক হইতে ভৃঙ্গকুল আসিয়া থাকে, তেমনি তাঁহাদেরও যশ সর্বত্র বিকীর্ণ হইয়াছিল। সমাগত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের অনেকেরই জন্য তাঁহারা বাসস্থানের ব্যবস্থা করিয়া দিয়েছিলেন।

"কর্ণাট দেশাদি হইতে আইলা বিপ্রগণ॥
সনাতন রূপ নিজ দেশস্থ ব্রাহ্মণে।
বাসস্থান দিলা সবে গঙ্গা সন্নিধানে॥
ভট্টগোষ্ঠী বাসে 'ভট্টবাটী' নামে গ্রাম।
সকলে শাস্ত্রজ্ঞ, সর্বমতে অনুপম॥"

কলিকাতার নিকটবর্তী আধুনিক ভট্টপল্লী বা ভাটপাড়ার মত রামকেলির পার্শ্বে ভাগীরথী তীরেও আর একটি ভট্টবাটী গ্রাম হইয়াছিল; এখন তাহার চিহ্ন পর্যন্ত নাই।

তাঁহারা যে অবসরকালে কেবল শাস্ত্রচর্চা লইয়াই থাকিতেন, তাহা নহে, ধর্ম সাধনায়ও তাঁহারা পশ্চাদ্‌পদ ছিলেন না। একদিনেই মানুষ নূতন করিয়া গড়িয়া উঠে না। সকল প্রতিভারই উন্মেষ পূর্ব জীবনে হইয়া থাকে। যদি কেহ ভাবিয়া থাকেন, মুসলমান নৃপতির কর্মচারী রূপ সনাতন বৃন্দাবনে গিয়া একদিনেই অসাধারণ পণ্ডিত ও ভক্তচূড়ামণি হইয়াছিলেন, তাহা মিথ্যা কথা। উভয় ভ্রাতা অসাধারণ পণ্ডিত পূর্ব হইতেই ছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের ভক্তির উন্মেষ কর্মজীবনেই হইয়াছিল, নতুবা তাঁহাদিগকে দেখিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নীলাচল হইতে ছুটিয়া রামকেলিতে আসিতেন না। উভয় ভ্রাতা অতি ভক্তিনিষ্ঠার সহিত শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন করিতেন এবং বৃন্দাবনলীলার অনুষ্ঠানও প্রায়শ করিতেন।

বৃন্দাবনলীলার বহু বিগ্রহ রামকেলি গ্রামের নানাস্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, এজন্য ঐ গ্রামের অন্য নাম, কৃষ্ণকেলি। রামকেলিতে তাঁহাদের আবাস বাটীর চারিধারে শ্যামকুণ্ড, রাধা কুণ্ড, বিশাখা কুণ্ড —এই নামে কতকগুলো সরোবর রহিয়াছে। তাহাদের সাধনভজন সম্বন্ধে ভক্তিরত্নাকরে আছে—

বাড়ীর নিকটে অতি নিভৃত স্থানেতে।
কদম্বকানন রাধাশ্যাম কুণ্ড তা'তে॥
বৃন্দাবনলীলা তথা করয়ে চিন্তন।
না ধরে ধৈরয নেত্রে ধারা অনুক্ষণ॥

এখানেও তাঁহারা বিগ্রহ সেবা করিতেন, এখানেও তাঁহারা সাধুসঙ্গ ও সাধুসেবা করিতেন। সময়ে সময়ে তাহা করিতে না পারিয়া বিরক্ত ও বিষণ্ণ হইতেন। বিষয়ী রাজার সেবা এবং রাজকার্য পরিচালনা করিতে গিয়া যখন পদে পদে তাঁহাদের অনুকূল পথের অন্তরায় উপস্থিত হইত, তখন তাঁহারা অবিরত অনুতাপানলে দগ্ধ হইতেন, উহাতেই তাঁহাদের বৈরাগ্যের পথ উন্মুক্ত করিয়াছিল।

রূপ এবং সনাতন দুই ভাইয়েরই প্রতিভার বিকাশ দেখা দিয়াছিল তাঁহাদের যৌবন উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে। এই সঙ্গে মিলিত হইয়াছিল সংস্কৃত শাস্ত্র এবং আরবী ফার্সী-সাহিত্যের পারদর্শিতা। তারপর উভয়ে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিলেন নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য নিয়া। "দর্শনশাস্ত্রে সনাতনের এবং কাব্য ব্যাকরণাদিতে রূপের কিছু বিশেষ অধিকার ছিল। যৌবনেই লোকের কবিত্বের উন্মেষ হয়, রূপেরও তাহা হইয়াছিল। তিনি গৌড়ে থাকিতেই তাঁহার দুইখানি কাব্য হংসদূত ও উদ্ধব-সন্দেশ রচনা করেন। অগ্রজ অপেক্ষা রূপ বোধহয় পারসীক ভাষায় অধিকতর পারদর্শিতা লাভ করিয়া ছিলেন। তাঁহার কাব্যানুরক্তির ইহাও অন্যতম কারণ। তাঁহার ভাষার মধ্যে যে কোমল কাব্যকলার মধুর নিক্বণ অনুভূত হয়,

তাহাতে পারস্য সাহিত্যের ঋণ অস্বীকার করা যায় না। তরুণ বয়সে সপ্তগ্রামে থাকিয়া উভয় ভ্রাতায় তথাকার প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও শাসনকর্তা, সৈয়দ ফকরউদ্দীনের নিকট থাকিয়া পারসীক ভাষা শিক্ষা করেন।

"সনাতনের বিদ্যাবুদ্ধি ও কার্যদক্ষতায় মুগ্ধ হইয়া সুলতান হুসেন শাহ তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা রূপকে রাজস্ব বিভাগে উচ্চ পদ প্রদান করেন। ঐ বিভাগের কার্যে যেরূপ সূক্ষ্ম সন্ধান, কার্যকুশলতা এবং লোকপরিচালনের ক্ষমতা থাকা প্রয়োজনীয় রূপের তাহা ছিল। তিনি স্থূলকায় ছিলেন, তাঁহার মুখাবয়বে এমন একপ্রকার কঠোর তেজস্বিতা প্রচ্ছন্ন ছিল যে তাঁহাকে দেখিলেই লোক মস্তক অবনত করিত। সুকুমার দেহ সনাতনের প্রশান্ত মূর্তি ও ভাবগাম্ভীর্য দেখিয়া লোকে তাঁহাকে ভক্তি করিত, রূপের মুখপ্রতিভা দেখিয়া সকলে তাহাকে ভয় করিত। রূপের মতো ব্যক্তি লোকপাল হইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। বৃন্দাবনে গিয়া তিনিই তথাকার সর্বময় কর্তা হইয়াছিলেন। তাঁহার মতো রাশভারী লোকদিগের অন্তঃকরণে কোনো নীচতা বা সংকীর্ণতা আসিতে পারে না, তাঁহারা সর্বত্রই সর্বকার্যে বিশ্বাসী ও প্রতিপত্তিশালী হন।

"রাজকার্যে রূপের অপ্রতিহত ক্ষমতা ও বিশ্বস্ততার জন্য সুলতান হুসেন শাহ তাঁহাকে সাকর বা সাকের (বিশ্বস্ত) মল্লিক" এই সম্মান-সূচক নাম এবং উপাধি দিয়াছিলেন। তিনি সকল কার্যই বলদর্পের সহিত করিতেন। তাঁহার সংকল্প স্থির হইতে বিলম্ব হইত না; সংকল্প হওয়া মাত্র উহা তিনি কার্যে পরিণত করিতে দৃঢ় চেষ্টা করিতেন। রাজস্ব সচিবরূপে রূপ যে রাজা প্রজা সকলের নিকট হইতে প্রীতি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহা বলাই বাহুল্য। তিনি এমন সুন্দরভাবে পারসীক লিখিতে, পড়িতে ও অনর্গল বলিতে পারিতেন এবং সকল মুসলমান কর্মচারীর সহিত মিশিয়া কার্য নির্বাহ করিতেন যে সাকর মল্লিক মুসলমান বা হিন্দু ছিলেন, তাহা কেহ বুঝিতে পারিত না। নানাভাবে বিধর্মীদিগের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে

মিশিতে গিয়া তিনি ও তাঁহার ভ্রাতারা সকলেই কতকটা ম্লেচ্ছাচারী হইয়া গিয়াছিলেন। রাজকার্যে তাঁহাদের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হইত এবং মুসলমানী হাবভাবে তাঁহাদিগকে আত্মগোপন করিতে বাধ্য হইতে হইলেও তাঁহারা নিজগৃহে কখনও শাস্ত্রচর্চা পরিত্যাগ করেন নাই। তাঁহারা পণ্ডিতগণকে পাইলে দর্শনাদি শাস্ত্র লইয়া ঘোর তর্কবিতর্ক করিতেন।"[১]

সেদিন সুলতানের সহিত সাক্ষাতের পরই রূপ রামকেলিতে ফিরিয়া আসিলেন আর কালবিলম্ব না করিয়া সরাসরি উপস্থিত হইলেন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সনাতনের কক্ষে। তারপর নিবেদন করিলেন নিজ সংকল্পের কথা।

সব কিছু শোনার পর সনাতন গম্ভীর হইয়া উঠেন। প্রশান্ত কণ্ঠে বলেন, "তোমার বক্তব্য সবই আমি শুনলাম। কিন্তু আমি তো এতে সম্মতি দিতে পারিনে, ভাই। আমি জ্যেষ্ঠ, আমি স্থির ক'রে রেখেছি, প্রথমে আমিই করবো সংসার ত্যাগ। আগে আমায় যেতো দাও। পরে সুযোগমতো তুমি একদিন চলে আসবে।"

নিজ সিদ্ধান্তে রূপ অটল। যুক্তকরে বলেন, "জীবনের সকল কিছু ব্যাপারে আপনি আমার শিক্ষাদাতা, প্রেরণাদাতা। আপনাকে আমি শুধু বড় ভাই রূপেই দেখি না, গুরুস্থানীয় বলে মনে করি। সব কাজ করি আপনারই উপদেশ ও নির্দেশ মতো। কিন্তু এবারটি আমার নিজের প্রাণের আবেগ অনুযায়ী চলতে দিন।"

সনাতন ধীর স্থির বিচক্ষণ। উত্তর দেন, "আবেগের কথা তুমি বলছো বটে, কিন্তু যুক্তি বা শালীনতার কথাও তো জড়িত রয়েছে এতে। তুমি যদি আগে সংসার ছাড়ো, লোকে আমায় কি বলবে বলতো? আমি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, বয়সও আমার যথেষ্ট হয়েছে। এই বয়সে রাজকার্য থেকে অবসর নেওয়াই তো আমার উচিত। তাছাড়া, মহাপ্রভুর উপদেশ মতোই এতকাল আমি সংসারে রয়ে

১ রূপ গোস্বামী: সতীশচন্দ্র মিত্র

গিয়েছি, আর তো আমি ধৈর্য ধারণ করতে পারছিনে। আমাকে বৈরাগ্য গ্রহণ করতেই হবে।"

এবার নিজ যুক্তিতর্কের জাল বিস্তার করেন রূপ। দৃঢ়স্বরে নিবেদন করেন, "রাজ সরকারে আপনি অত্যন্ত দায়িত্বপূর্ণ কাজ নিয়ে রয়েছেন। শান্তির সময়ে প্রশাসনের ব্যাপারে, যুদ্ধবিগ্রহে সর্বদাই বাদশাহ আপনার মতামতকে মূল্যবান মনে করেন। আপনার পরামর্শ নেন। তাই নয় কি?"

"হ্যাঁ, একথা যথার্থ।"

"বিশেষ ক'রে এ সময়ে উড়িষ্যারাজের সঙ্গে বাদশাহের ঘোর মনান্তর চলছে, যে কোনো সময়ে একটা যুদ্ধ বেধে যেতে পারে।"

"হ্যাঁ, সে সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।"

"তাই তো এ সময়ে আপনি রাজকর্ম ত্যাগ করলে বাদশাহ ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠবেন। তারপর আবার আমি যখন চলে যাবো, তিনি ভাববেন, আমরা ষড়যন্ত্র করেছি, একযোগে কাজে ইস্তাফা দিয়ে বাদশাহকে বিপদে ফেলবার চেষ্টা করছি। তার ফলে আমাদের আত্মীয়স্বজনদের উপর ঘোর অত্যাচার চলতে থাকবে। কাজেই আমার প্রস্তাবটিই আপনি মেনে নিন।"

সনাতন এবার কিছুটা নরম হইয়াছেন। এই সুযোগে রূপ আবার কহিলেন, "সংসারের এবং আত্মীয়-কুটুম্বদের ভরণপোষণের ব্যবস্থা সব আমি তাড়াতাড়ি সেরে ফেলছি। এ নিয়ে আপনাকে ভাবতে হবে না। আমি চলে যাবার পর আপনি যাতে সহজে এখান থেকে নিষ্ক্রান্ত হতে পারেন সে ব্যবস্থাও আমি ক'রে যাবো।"

রূপের প্রার্থনা এবার মঞ্জুর হইল। সনাতন প্রাজ্ঞ এবং বিচক্ষণ বটে, কিন্তু সংসারের ব্যবস্থাপনা নিয়া তিনি কোনো মাথা ঘামাইতেন না, প্রধানত রূপই এসব কাজ করিতেন। এবার উভয়ে মিলিয়া রুদ্ধদ্বার কক্ষে বেশ কিছুক্ষণ পরামর্শ চলিল এবং কার্যক্রম সম্বন্ধে একমত হইলেন।

সকলের সঙ্গে দেনা পাওনার হিসাব রূপ তাড়াতাড়ি মিটাইয়া ফেলিলেন। রামকেলি রাজধানী গৌড়ের অতি নিকটে, সেখানে আত্মপরিজনদের আর থাকা তেমন নিরাপদ নয়। তাহাদের কিছু সংখ্যককে পাঠানো হইল চন্দ্রদ্বীপের প্রাসাদে বাকলায়। ফতেহাবাদের প্রেমভাগে আর একটি ভবন তাঁহাদের ছিল, সেখানেও সরাইয়া দিলেন অনেককে। ধন সম্পত্তি সমস্ত কিছু গুছাইয়া নেওয়া হইল। বিগ্রহ সেবা, কুলগুরু, ব্রাহ্মণ ও প্রাপকদের অসুবিধা না হয় এজন্য দরাজ হাতে করিলেন এককালীন দান। চৈতন্য চরিতামৃতে এই বিলি ব্যবস্থা সম্পর্কে বলা হইয়াছে :

শ্রীরূপ গোসাঞি তবে নৌকাতে ভরিয়া।
আপনার ঘর আইলা বহু ধন, লঞা॥
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবে দিল তার অর্ধ ধনে।
এক চৌঠি ধন দিল কুটুম্ব ভরণে॥
দণ্ডবন্ধ লাগি চৌঠি সঞ্চয় করিল।
ভাল ভাল বিপ্রস্থানে স্থাপ্য রাখিল॥

তাছাড়া, সংকট সময়ে সনাতনের প্রয়োজন হইতে পারে ভাবিয়া এক মুদির কাছে রূপ দশ হাজার টাকা গচ্ছিত রাখিলেন।

ইতিমধ্যে রূপ শ্রীচৈতন্যের সন্ধান নিবার জন্য নীলাচলে লোক পাঠাইয়াছিলেন। শুনিলেন, প্রভু ঝাড়িখণ্ডের পথে বৃন্দাবনের দিকে রওনা হইয়া গিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে পথে মিলিত হইবেন, এবং একত্রে বৃন্দাবনে পৌছিবেন এজন্য রূপ আগ্রহী। তাই তাড়াতাড়ি হাতের কাজ সারিয়া নিয়া পদব্রজে ধাবিত হইলেন ঝাড়িখণ্ডের অরণ্য পথে। সঙ্গে চলিলেন মুমুক্ষু কনিষ্ঠ ভ্রাতা অনুপম।

কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর শুনিলেন, হুসেন শাহ সনাতনের বৈরাগ্য প্রবণতায় ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, এবং তিনি মুখ্য সচিবের কাজ ত্যাগ করিবেন একথা বলায় তাঁহাকে নিক্ষেপ করিয়াছেন কারাগারে। তৎক্ষণাৎ পথ হইতে রূপ একটি লোক মারফত পত্রী পাঠাইলেন। লিখিলেন, সনাতন যেন এ সংকটে, প্রয়োজন বোধে, মুদির নিকট

গচ্ছিত রাখা টাকাটা কাজে লাগান এবং উৎকোচ দিয়া কারাগার হইতে মুক্ত হইয়া আসেন।

মুক্তিলাভের ঐ পন্থাটি গ্রহণ করা ছাড়া সনাতনের আর উপায় ছিল না। অতঃপর কারাগার হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া তিনি শ্রীচৈতন্যের চরণাশ্রয় লক্ষ্য করিয়া যাত্রা করেন। দীর্ঘপথ অতিক্রম করার পর কাশীতে পৌঁছিয়া লাভ করেন তাঁহার দর্শন। এই দর্শনের সময়েই সনাতনকে করেন প্রভু আত্মসাৎ।

রূপ এবং বল্লভ প্রয়াগে পৌঁছিয়া শুনিলেন, শ্রীচৈতন্য বৃন্দাবন হইতে ফিরিবার পথে সেখানে উপস্থিত হইয়াছেন। প্রভুর বহু আকাঙ্ক্ষিত দর্শন এবার সম্ভব হইবে, আশ্রয় মিলিবে তাঁহার চরণতলে। রূপের আনন্দ আর ধরে না।

শ্রীচৈতন্য বিন্দুমাধব মন্দিরে আসিয়াছেন। ভাবাবিষ্ট অপরূপ আনন্দঘন মূর্তি, মুখে মধুর কণ্ঠের কৃষ্ণনাম। সহস্র সহস্র ভক্ত এই দেবমানবকে দর্শন করিতে আসিয়াছে। আনন্দে অধীর হইয়া, তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া ভক্ত ও দর্শনার্থীরা নাচিতেছে গাহিতেছে। এক বিরাট জনসংঘট্ট সেখানে।

দূর হইতে প্রভুর দিব্য ভাবাবেশ দেখিয়া রূপের সারা দেহ পুলকাঞ্চিত হইয়া উঠে, নয়নে বহিতে থাকে অশ্রুধারা। কিন্তু সেই বিপুল জনসমুদ্রে প্রভুর সম্মুখীন হইবেন কি করিয়া? এক দক্ষিণী ভক্ত ব্রাহ্মণের গৃহে সেদিন শ্রীচৈতন্যের ভিক্ষার নিমন্ত্রণ ছিল। তিনি সেখানে উপস্থিত হইলে রূপ ও বল্লভ দুই ভ্রাতা গিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। প্রভু তো মহাউল্লসিত। বার বার কহিতে থাকেন, "কৃষ্ণের কি অপার করুণা তোমাদের ওপর। বিষয়কূপ থেকে এবার দু'জনকে উদ্ধার করলেন। আহা কি ভাগ্যবান্ তোমরা দু'ভাই।"

প্রভু ত্রিবেণীর তীরে ভক্ত গৃহে বাস করিতেছেন। রূপ এবং বল্লভও নিকটস্থ এক কুটিরে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

বৈদিক যজ্ঞে পারঙ্গম, শাস্ত্রবিদ্ বল্লভ ভট্ট সে-সময়ে ত্রিবেণীর

অদূরে এক গ্রামে অবস্থান করিতেছিলেন। শ্রীচৈতন্য ও তাঁহার গৌড়দেশাগত দুই নবাগত ভক্তকে ভট্টজী সেদিন তাঁহার গৃহে নিমন্ত্রণ করিলেন।

রূপের দিব্যকান্তি ও ভাবাবেশ দেখিয়া বল্লভ ভট্ট মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন। সানন্দে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে যাইবেন, রূপ অমনি চকিতে দূরে সরিয়া গেলেন, "না—না, ভট্টজী, আমায় কেন আপনি স্পর্শ করছেন? আমি অস্পৃশ্য পামর। এতকাল কাটিয়ে এসেছি পাপকর্মে। আমি তো আপনার স্পর্শযোগ্য নয়!"

বিলাস ও ঐশ্বর্যে চিরলালিত, ক্ষমতার চূড়ায় বসিয়া থাকিতে সদা অভ্যস্ত, রূপের এই দৈন্য ও বৈরাগ্যভাব দেখিয়া শ্রীচৈতন্য মহা সন্তুষ্ট। অদূরে বসিয়া মিটিমিটি হাসিতেছেন তৃপ্তির হাসি।

দশদিন প্রয়াগে প্রভুর পুণ্যময় সান্নিধ্যে অবস্থান করেন রূপ। এই দশদিনেই প্রভু তাঁহার সাত্ত্বিক আধারে উজাড় করিয়া ঢালিয়া দেন বৈষ্ণবীয় সাধনার নিগূঢ় তত্ত্ব। ব্রজরসের পরমতত্ত্ব ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেন তাঁহার নিজ মুখে।[১]

শ্রদ্ধা ভক্তি ও কৃষ্ণসেবার মাহাত্ম্য বর্ণনা করেন প্রভু। তারপর ভক্তি সাধনার, ক্রম, কৃষ্ণভক্তিরসের বৈচিত্র্য, এবং সর্বোপরি কান্তা-ভাব সম্পন্ন মধুর রসের দিক্‌দর্শন করেন। শুধু তাহাই নয়, কৃপাভরে নবীন সাধক রূপের আধারে, করেন শক্তি সঞ্চারিত।

কৃষ্ণভক্তি ভক্তিতত্ত্ব রসতত্ত্ব প্রান্ত।
সব শিখাইলা প্রভু ভাগবত সিদ্ধান্ত॥
রামানন্দ পাশে যত সিদ্ধান্ত শুনিলা।
রূপে কৃপা করি তাহার সব সঞ্চারি॥
শ্রীরূপ হৃদয়ে প্রভু শক্তি সঞ্চারিলা।
সর্বতত্ত্ব নিরূপিয়া প্রবীণ করিলা॥

(চৈ-চরিতামৃত)

[১] শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়: কবি কর্ণপুর

রূপের হৃদয় মন স্বর্গীয় আনন্দে পূর্ণ হইয়া উঠে, প্রভুর কৃপায় জীবন হয় কৃতকৃতার্থ। এবার প্রভু বারাণসীর দিকে যাইবেন, প্রেমালিঙ্গন ও আশীর্বাদ দিয়া কহিলেন, "রূপ "তুমি বৃন্দাবনে যাও। যে তত্ত্ব লাভ করলে, বৃন্দাবনের পবিত্র ধামে এবার তা স্ফুরিত হয়ে উঠুক, এই আমি চাই।"

অতঃপর রূপ ও অনুপম বৃন্দাবনে চলিয়া আসিলেন। এখানে পৌঁছিয়াই ভক্তপ্রবর সুবুদ্ধি রায়ের সঙ্গে তাঁহাদের সাক্ষাৎ ঘটিল।

সুবুদ্ধি রায় ছিলেন গৌড়ের এক প্রভাবশালী ভূম্যধিকারী। বাদশাহ হুসেন শাহ তাঁহার প্রথম জীবনে, যখন সহায় সম্পদহীন ভাগ্যান্বেষী যুবক মাত্র, তখন তিনি সুবুদ্ধি রায়ের অধীনে এক নগণ্য চাকুরী গ্রহণ করেন। কোনো অপরাধে লিপ্ত থাকায় সুবুদ্ধি রায় তাঁহার উপর ক্রুদ্ধ হন এবং চাবুক মারিয়া তাঁহাকে শাস্তি দেন। ঐ চাবুকের ক্ষতের দাগ দীর্ঘদিন পরেও একেবারে মিলাইয়া যায় নাই। উত্তরকালে এই হুসেনের ভাগ্য পরিবর্তিত হয়, তিনি গৌড়ের বাদশাহ হইয়া বসেন।

হুসেন শাহের বেগম একদিন স্বামীর পৃষ্ঠে ক্ষতের দাগ দেখিয়া বিস্মিত হন এবং উহার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। পুরাতন দিনের ঘটনাদি বাদশাহ বিবৃত করেন এবং উল্লেখ করেন প্রাক্তন মনিব সুবুদ্ধি রায়ের বেত্রাঘাতের কথা। বেগম তো একথা শুনিয়া মহা উত্তেজিত। জেদ ধরিয়া বসেন, সুবুদ্ধি রায়কে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হোক। হুসেন শাহ কিন্তু এ দণ্ড দিতে সম্মত হন নাই। বলেন প্রাক্তন অন্নদাতার প্রাণনাশ করা তাঁহার দ্বারা সম্ভব হইবে না। অতঃপর বেগম ও ওমরাহ্‌রা সবাই মিলিয়া স্থির করেন, প্রাণনাশের বদলে সুবুদ্ধি রায়ের ধর্মনাশ করা হোক। এই প্রস্তাব অনুযায়ী, অপরাধীর মুখে কুখাদ্য পুরিয়া দেওয়া হইল।

জাতিভ্রষ্ট মর্মাহত সুবুদ্ধি রায় তখন বিত্ত বিষয় ছাড়িয়া কাশীতে শাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিতদের কাছে উপস্থিত হন, জানিতে চাহেন জাতি নাশের

জন্য প্রায়শ্চিত্তের বিধান। পণ্ডিতেরা বলেন, এজন্য তপ্তঘৃত পান করিয়া তাঁহাকে আত্মহত্যা করিতে হইবে।

প্রভু শ্রীচৈতন্য তখন কাশীধামে উপস্থিত হইয়াছেন, তাঁহাকে ঘিরিয়া ভক্ত সমাজে জাগিয়া উঠিয়াছে প্রবল উদ্দীপনা। সুবুদ্ধি রায় শ্রীচৈতন্যের চরণে নিপতিত হইলেন, কাঁদিয়া কহিলেন "প্রভু, আপনি স্বয়ং ঈশ্বর। আমায় বলুন, জাতি নাশের পাপ স্খালনের জন্য কি প্রায়শ্চিত্ত আমায় করতে হবে।"

প্রভু কহিলেন, "একবার কৃষ্ণনাম যত পাপ হরে, জীবের কি সাধ্য আছে তত পাপ করে? তোমার কোনো ভয় নেই। তুমি বৃন্দাবনে যাও, সেখানকার পবিত্র রজে প্রত্যহ গড়াগড়ি দাও, আর কৃষ্ণনামের জপধ্যানে জীবন সার্থক ক'রে তোল। এই হল তোমার প্রায়শ্চিত্তের বিধান।"

সুবুদ্ধি রায়ের প্রাণে এবার নূতন আশা সঞ্চারিত হয়। বৃন্দাবনে আসিয়া শুরু করেন ত্যাগ তিতিক্ষাময় বৈষ্ণব জীবন।

গৌড় বাদশাহের অন্যতম প্রধান কর্মচারী রূপকে সুবুদ্ধি রায় ভালো করিয়াই চিনিতেন। বৈরাগী হইয়া তিনি শ্রীচৈতন্যের শরণ নিয়াছেন এবং বৃন্দাবনে আসিয়াছেন জানিয়া তাঁহার আনন্দের আর অবধি নাই।

ছুটিয়া আসিয়া রূপ ও অনুপমকে প্রেমভরে জড়াইয়া ধরিলেন, ঘুরিয়া ঘুরিয়া দর্শন করাইলেন পবিত্র দ্বাদশ বন।

প্রভু শ্রীচৈতন্যের কৃপার কথা, শ্রীকৃষ্ণের লীলা মাহাত্ম্যের কথা আলোচনা করিয়া কিছুদিন আনন্দে কাটিয়া গেল।

লোকনাথ ও ভূগর্ভ তখন ব্রজমণ্ডলের অভ্যন্তর ভাগে অরণ্যে ঘোরাঘুরি করিতেছেন, ইঁহাদের সঙ্গে রূপ ও অনুপমের এসময়ে সাক্ষাৎ হয় নাই। প্রায় একমাস বৃন্দাবনে বাস করার পর রূপের মন উচাটন হইয়া উঠিল। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সনাতন চিরদিন তাঁহার পথপ্রদর্শক ও পরিচালক। গুরুর মতো রূপ তাঁহাকে শ্রদ্ধা করেন। সেই সনাতন এখনো বাদশাহের কারাগারে রহিয়াছেন না মুক্ত

হইয়াছেন, সে সংবাদ তাঁহার জানা নাই। মনের দুশ্চিন্তা কোনো-মতেই হয় না। অবশেষে অনেক কিছু ভরিয়া চিন্তিয়া দুই ভ্রাতা কিছুদিনের জন্য বৃন্দাবন ত্যাগ করিলেন, বাহির হইয়া পড়িলেন সনাতনের সন্ধানে। পদব্রজে চলিলেন কাশীর দিকে।

সনাতন ইতিমধ্যে কারাগার হইতে মুক্ত হইয়াছেন কাশীতে গিয়া লাভ করিয়াছেন শ্রীচৈতন্যের কৃপা। সেখান হইতে ভিন্ন পথে তিনি বৃন্দাবনে পৌঁছিলেন, রূপের সহিত সাক্ষাৎ ঘটিল না। কাশীতে পৌঁছাইয়া সনাতনের সংবাদ পাইয়া রূপ প্রকৃতিস্থ হইলেন। প্রভু চৈতন্যের কৃপা তিনি লাভ করিয়াছেন, একথা জানিয়া আনন্দে মন প্রাণ ভরিয়া উঠিল।

অনুজ অনুপম ছিলেন ইষ্ট শ্রীরামচন্দ্রের উপাসক। বৃন্দাবনে থাকা সম্পর্কে তিনি তখনো মন স্থির করিতে পারেন নাই। রূপকে কহিলেন, গৌড়ের দিকে তাঁহার মন চলিতেছে, এসময়ে সনাতনও সংসার ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিয়াছেন, রূপ যদি আর একবার কিছুদিনের জন্য গৌড়ে যান, বিষয় সম্পর্কিত শেষ বিলি ব্যবস্থা করিয়া আসেন তবে বড় সুবিধা হয়।

কনিষ্ঠ ভ্রাতার অনুরোধে রূপকে রাজী হইতে হইল, উভয়ে প্রত্যাবর্তন করিলেন গৌড়দেশে। সেখানে পৌঁছানোর পর ঘটিল এক মহাদুর্দৈব, অল্প কিছু দিনের মধ্যে এক মারাত্মক রোগে ভুগিয়া অনুপম ইহলোক ত্যাগ করিলেন।

প্রিয় অনুজের এই শোকাবহ মৃত্যু রূপকে ফেলিয়া দিল নানা সাংসারিক দায়িত্ব ও সমস্যার মধ্যে। এদিকে প্রভু শ্রীচৈতন্যের চরণ দর্শনের জন্য, তাঁহার পুণ্যময় সান্নিধ্যের জন্য, মন তাঁহার অধীর হইয়া উঠিয়াছে। তাই যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি এখানকার সমস্যা মিটাইয়া ফেলিয়া পদব্রজে ছুটিয়া চলিলেন নীলাচলে।

আগে হইতেই রূপ মনে মনে স্থির করিয়া আসিয়াছেন, ভক্ত হরিদাসের কুটিরে তিনি আশ্রয় নিবেন, তারপর সুযোগমতো করিবেন

প্রভুর চরণ দর্শন। দীর্ঘদিন গৌড় দরবারে থাকায়-ম্লেচ্ছ স্পর্শদোষ তাঁহার ঘটিয়াছে, তাই প্রভু শ্রীচৈতন্যের নিষ্ঠাবান্ উচ্চবর্ণের ভক্তদের গৃহে অবস্থান করা তাঁহার পক্ষে ঠিক নয়।

প্রবীণ ভক্ত হরিদাসের কুটিরে পৌছিতেই বাহু প্রসারিয়া রূপকে তিনি জ্ঞাপন করেন আন্তরিক সংবর্ধনা। স্নেহভরে কহেন, "রূপ, তুমি আসবে, তা আমরা সবাই জানি। মহাভাগ্যবান্ তুমি, প্রভু সাগ্রহে তোমার প্রতীক্ষা করছেন, বার বার বলছেন তোমারই কথা।"

প্রভু শ্রীচৈতন্যের দিনচর্যা ছিল প্রত্যহ সকালবেলায় অন্তরাল-বাসী পরম ভক্ত হরিদাসকে দর্শন দেওয়া। জগন্নাথদেবের উপল ভোগের সময় প্রভু সেখানে স্বগণসহ উপস্থিত থাকিতেন। তারপরই চলিয়া আসিতেন হরিদাসের নিভৃত কুটিরে। এখানে অন্তরঙ্গ পার্ষদ ও ভক্তদের নিয়া চলিত ইষ্টগোষ্ঠী এবং প্রেমরস তত্ত্বের আলোচনা।

হরিদাসের কুটিরে প্রভু পদার্পণ করার সঙ্গে সঙ্গে রূপ ছুটিয়া আসিলেন, নিবেদন করিলেন দণ্ডবৎ প্রণাম। আলিঙ্গন ও কুশল প্রশ্নাদির পর পরমানন্দে সবাই প্রভুকে ঘিরিয়া বসিলেন, ভাগবত ও কৃষ্ণকথার জোয়ার বহিতে লাগিল।

পুরীধামের রথযাত্রা তখন আসন্ন। গৌড়ীয়া ভক্তদল প্রভুর দর্শন ও সান্নিধ্যের লোভে পদব্রজে দীর্ঘপথ অতিক্রম করিয়া আসিয়াছেন। প্রভুর সহিত মিলনের পর মাতিয়া উঠিয়াছেন আনন্দরঙ্গে। এই ভক্তদের মধ্যে রহিয়াছেন প্রবীণ বৈষ্ণবাচার্য শ্রীঅদ্বৈত, নিত্যানন্দ প্রভৃতি।

সেদিন কয়েকটি অন্তরঙ্গ ভক্ত সঙ্গে নিয়া প্রভু হরিদাসের কুটিরে আসিয়াছেন। রূপকে আলিঙ্গন দানের পর অদ্বৈত ও নিত্যানন্দকে কহিলেন, "কৃষ্ণের আহ্বানে রূপ বিষয় কূপ ছেড়ে চলে এসেছে। আপনারা দু'জন তাঁকে আশীর্বাদ দিন, কৃষ্ণের ভজনে সে যেন সিদ্ধ হয়, আর কৃষ্ণভক্তি রসের গ্রন্থ লিখে যেন সাধন করতে পারে জীবের মঙ্গল।"

গৌড়ীয় নেতারা, রামানন্দ রায়, স্বরূপ দামোদর প্রভৃতি এই

প্রতিভাধর নূতন ভক্তকে জ্ঞাপন করেন তাঁহাদের প্রাণভরা আশীর্বাদ। রূপের চেহারার একটা বিশেষ মাধুর্য ও কমনীয়তা ছিল, আর তাই স্বভাবে ছিল বিনয় ও দৈন্যের পরাকাষ্ঠা। অচিরে প্রভুর গৌড়ীয়া ও ওড়িশী ভক্তদের তিনি পরম প্রিয় হইয়া উঠিলেন।

প্রভু তাঁহার ভক্তগোষ্ঠী সঙ্গে যেখানে যেখানে উপস্থিত হন, দিব্য আনন্দের স্রোত বহিয়া যায়। ভক্তিপ্রেমের দিব্য ভাবাবেশে সবাই মাতোয়ারা হইয়া উঠেন। কখনো শ্রীমন্দির চত্বরের কীর্তনে, কখনো সমুদ্র স্নানে, কখনো বা গুণ্ডিচা মার্জনে, দিনের পর দিন চলে উৎসব আর আনন্দ-হুল্লোড়।

ভক্ত হরিদাসের মতো রূপও নিজেকে দৈন্যভরে মনে করেন ম্লেচ্ছাধম, তাই শ্রীজগন্নাথের মন্দিরের ভিতরে কখনো যান না। দূর হইতেই দর্শন ও প্রণাম করেন। প্রভুর নর্তন কীর্তন ও পুণ্যময় নানা অনুষ্ঠানে প্রবল জনসংঘট্ট হয়, সেসব স্থানও রূপ সযত্নে পরিহার করিয়া চলেন। দূর হইতে প্রভু ও ভক্তগোষ্ঠীর আনন্দলীলা মুগ্ধনেত্রে দর্শন করেন, প্রণাম জানান বার বার।

কিন্তু রাতের অধিকাংশ সময়ই কাটে হরিদাসের নিরালা ভজন-কুটিরে। এখানে নামমূর্তি হরিদাস প্রায় সময়ে নিবিষ্ট থাকেন তাঁহার সংকল্পিত নামজপের সাধনায়। আর এককোণে একান্তে বসিয়া রূপ ব্যাপৃত থাকেন রসশাস্ত্রের অবগাহনে আর গ্রন্থরচনায়।

প্রত্যহ জগন্নাথদেবের ভোগরাগ সম্পন্ন হইবার পর একান্তবাসী ভক্তদ্বয় হরিদাস আর রূপের জন্য প্রসাদ পাঠানো হয়। ঐ প্রসাদ গ্রহণ করিয়া উভয়ে নিরত হন নিজ নিজ নির্দিষ্ট সাধনায় ও কর্মে।

"রূপ গোস্বামী আজন্ম সুকবি। একাধারে এমন কবিত্ব, পাণ্ডিত্য ও ভক্তি অতি কম দেখা যায়। গৌড়ে থাকিতে তিনি হংসদূত ও উদ্ধব-সন্দেশ নামক কাব্য রচনা করেন, উহা পরে বৃন্দাবনে শেষ হইয়া প্রচারিত হয়। গৃহত্যাগ করিয়া আসিবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক নাটক লিখিতে থাকেন। উহাতে তিনি কৃষ্ণের

ব্রজলীলা ও অন্যান্য লীলা একত্র লিখিবেন বলিয়া স্থির করেন। পরে নীলাচলে আসিবার সময় স্বপ্নাদেশে ও মহাপ্রভুর আজ্ঞায় পৃথক পৃথক দুইখানি নাটক রচনার পরিকল্পনা স্থির হয়। শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা-বিষয়ক নাটকের নাম দিয়াছিলেন 'বিদগ্ধ মাধব' এবং তাঁহার পুরলীলা-বিষয়ক নাটকের নামকরণ হয় 'ললিত মাধব'। নীলাচলে আসিবার পর হইতে তিনি অধিকতর একাগ্রতার সহিত এই দুইখানি নাটক একই সময়ে লিখিতেছিলেন। হরিদাস ঠাকুরের শান্তরসাস্পদ কুটিরে এবং সপার্ষদ মহাপ্রভুর সঙ্গগুণে ও আশীর্বাদের ফলে রূপের স্বাভাবিক কবিত্ব প্রতিভা বিশেষভাবে স্ফুরিত হইয়াছিল। গ্রন্থদ্বয়ের অধিকাংশই নীলাচলে বসিয়া লিখিত হয়, পরে বৃন্দাবনধামে গিয়া প্রথমে বিদগ্ধ মাধব ও তৎপরে ললিত মাধব সমাপ্ত হয়।"

নীলাচলের বৃহত্তম ও মহত্তম অনুষ্ঠান রথযাত্রা আসিয়া যায়। লক্ষ লক্ষ ভক্ত নরনারী ভারতের নানা দিগ্‌দেশ হইতে এই সময়ে মহাধামে আগত হয়, শ্রীজগন্নাথের বিজয়যাত্রা দেখিয়া প্রাণমন সার্থক করে। এই রথযাত্রার আর এক বড় আকর্ষণ—দেবমানব প্রভু শ্রীচৈতন্যের উপস্থিতি ও নৃত্য কীর্তন।

রথ টানা শুরু হইলে ভক্ত ও পার্ষদদের নিয়া প্রভু রথাগ্রে কীর্তন করিতে থাকেন। সাত্ত্বিক প্রেমবিকারের ঐশ্বর্য প্রকটিত হয় তাঁহার গৌরকান্তি দিব্যশ্রীমণ্ডিত দেহে। এ অপার্থিব মূর্তি ও ভাবমত্ততা দেখিয়া অগণিত দর্শনার্থী আনন্দে উদ্বেল হইয়া উঠে।

রথাগ্রে প্রভুর দেবদুর্লভ নৃত্য ও উদ্দণ্ড কীর্তন রূপ প্রাণ ভরিয়া দূর হইতে দর্শন করেন, দিব্য ভাবের আবেশে প্রমত্ত হইয়া উঠেন। জীবন মন সার্থক জ্ঞান করিয়া প্রত্যাবর্তন করেন ভজন-কুটিরে।

প্রভুর ইচ্ছা অনুসারে নীলাচলে তিনি বাস করেন প্রায় দশমাস।

১ সপ্ত গোস্বামী: সতীশচন্দ্র মিত্র

তাঁহার জীবনে এই দশটি মাসের মূল্য অপরিসীম। প্রভুর শ্রীচৈতন্যের প্রেমময় সান্নিধ্যে, তাঁহার অন্তরঙ্গ পার্ষদদের স্নেহময় পরিবেশে, অবিরাম অন্তরে তাঁহার বহিয়া চলে দিব্যরসের প্রবাহ। শুধু তাহাই নয়, কৃষ্ণভক্তি ও কৃষ্ণপ্রেম লীলাবিষয়ক যে সব গ্রন্থ লেখানোর জন্য প্রভু ইচ্ছুক তাহারও প্রস্তুতি এসময়ে ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠে। কৃষ্ণতত্ত্ব ও ব্রজরসতত্ত্বের উৎস সন্ধানটি প্রভুর কৃপায় এসময়ে রূপ প্রাপ্ত হন। প্রয়াগে থাকিতে যে অমৃতময় তত্ত্বোপদেশ প্রভু দিয়াছিলেন, তাহাই এবার নূতনতর উদ্দীপনা নিয়া উদ্‌গত হইতে থাকে তাঁহার অন্তস্তল হইতে।

সুকবি, প্রতিভাধর ও সুপণ্ডিত রূপ প্রভুর নির্দেশে কৃষ্ণলীলা ও কৃষ্ণরসের নাটক লিখিতেছেন। কিন্তু কাব্যপ্রতিভা থাকিলেই কৃষ্ণরসের, ব্রজরসের, পরমতত্ত্ব উদ্‌ঘাটন করা যায় না, কৃষ্ণলীলার প্রকৃত মাহাত্ম্য ও ফুটাইয়া তোলা যায় না। এজন্য একদিকে চাই ব্রজরসের সম্যক্ উপলব্ধি আর চাই রসনাট্যের আঙ্গিক ও সিদ্ধান্ত বিষয়ে নির্ভুল প্রয়োগনৈপুণ্য।

শ্রীচৈতন্য ইতিপূর্বেই রূপের সাধন-আধারে তাঁহার শক্তি সঞ্চারিত করিয়াছেন। এবার সেই শক্তির-স্রোতকে উৎসারিত ও বিস্তারিত করিতে চান জনকল্যাণে।

প্রভুর ব্রজরসতত্ত্বের দুই পরম রসজ্ঞ পার্ষদ—রামানন্দ রায় এবং স্বরূপ দামোদর। প্রভু স্থির করিলেন, এই দুই বিদগ্ধ ও প্রবীণ পার্ষদকে তিনি নিয়োজিত করিবেন রূপের নব রচিত কাব্যের রস আস্বাদনে ও মূল্য নিরূপণে।

রামানন্দ রায় রসতত্ত্বের শাস্ত্রে বাহ্যত শ্রীচৈতন্যেরও উপদেষ্টা। দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের কালে প্রভু এই মরমী সাধককে আত্মসাৎ করেন, তাঁহার মুখ দিয়া প্রকাশিত করেন মধুর রস এবং নিগূঢ় ভজনের মর্মকথা।

রামানন্দ শ্রীচৈতন্যকে বলিতেন, "প্রভু, ব্রজরসতত্ত্ব, কান্তাভাব ও রাধাতত্ত্বের মহিমা আমি কি জানি? আমি তোমার কাষ্ঠপুত্তলী,

আমায় তুমি যেভাবে নাচাও, যেভাবে বলাও, তাই আমি করি, আর তাই বলি।"

প্রভু দৈন্যভরে উত্তর দিতেন, "রায় আমি শুষ্ক সন্ন্যাসী। মহাভাবময়ী শ্রীরাধিকার রসতত্ত্ব আমি কি জানি? আহা, সে তত্ত্ব যে তুমিই আমায় শেখালে।"

উভয়ের এই মতদ্বৈধ আর আনন্দ-কলহ প্রায়ই চলিত, আর অন্তরঙ্গ পার্ষদ ও ভক্তেরা মিটিমিটি হাসিতেন।

রামানন্দ রায় উড়িষ্যার এক শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব, কৃষ্ণরস তত্ত্বে পারঙ্গম এবং যশস্বী নাট্যকার। প্রভু শ্রীচৈতন্যের দর্শন লাভের পূর্বে তিনি সংস্কৃত ভাষায় 'জগন্নাথ বল্লভ' নাটক রচনা করিয়া যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। প্রেমভক্তির সাধনায় আগে হইতেই তিনি অনেক দূর অগ্রসর ছিলেন, এবার শ্রীচৈতন্যের আশ্রয় নিয়া সেই সাধনায় হইয়াছেন সিদ্ধকাম।

প্রভুর অন্যতম শ্রেষ্ঠ পার্ষদ স্বরূপ দামোদরও কৃষ্ণতত্ত্ব ও ব্রজরসের এক শ্রেষ্ঠ মর্মজ্ঞ সাধক এবং ধারক বাহক। শুধু তাহাই নয়, স্বরূপের আরও গুণ আছে, তিনি—'সংগীতে গন্ধর্বসম শাস্ত্রে বৃহস্পতি'।

তাঁহার মধুর রসের সংগীতে শ্রীচৈতন্য ভাবোন্মত্ত হইতেন, আবার তাঁহারই প্রবোধবাক্যে ও সংগীতে হইতেন আশ্বাসিত, লাভ করিতেন বাহ্যজ্ঞান।

স্বরূপের আরো বৈশিষ্ট্য ছিল। তিনি একদিকে যেমন রসজ্ঞ এবং নিগূঢ় মধুর রসের সাধক, তেমনি বৈষ্ণব সাহিত্যে সুপণ্ডিত এবং কঠোর, সূক্ষ্ম সমালোচনার জন্য প্রখ্যাত।

মহাভাবের মূর্ত বিগ্রহ ছিলেন প্রভু শ্রীচৈতন্য, তাই প্রেমভক্তি-ধর্মের কোনো বাক্য বা রচনার বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত বা রসাভাষ কখনো সহ্য করিতে পারিতেন না। তাই সদা পার্শ্বচর ও মরমী ভক্ত স্বরূপকে তিনি নিয়োজিত করিয়াছিলেন বৈষ্ণবীয় রসতত্ত্বের নিরূপণে এবং পরীক্ষাকর্মে—

গ্রন্থশ্লোক গীত কেহো প্রভু আগে আনে।
স্বরূপ পরীক্ষা কৈলে পাছে প্রভু শুনে।

এমনি দুই উচ্চকোটির সাধক ও ব্রজরসের তত্ত্বজ্ঞ এবার রূপের রচনা শ্রবণ করিবেন, সূক্ষ্মভাবে পরীক্ষা করিবেন।

প্রভু একদিন রথাগ্রে নৃত্যকীর্তন করিতেছেন। হঠাৎ ভাবপ্রমত্ত হইয়া 'কাব্য প্রকাশের' যঃ কৌমারহর ইত্যাদি বাক্যসূচক শ্লোকটি উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। নিভৃত মধুময় পরিবেশ, আর একান্ত-চিত্ত কান্তা আর কান্তের নিভৃত মধুর মিলনের রস এই শ্লোকটিতে উৎসারিত।

প্রভুর অন্তরের ভাব বুঝিয়া স্বরূপ দামোদর তখনই এই রসের অনুসারী এক মধুর সংগীত রচনা করিলেন, তখনি প্রভুকে গাহিয়া শুনাইলেন, প্রভু অত্যন্ত খুশী হইয়া উঠিলেন।

পরের দিন শ্রীচৈতন্য রায়-রামানন্দ, স্বরূপ প্রভৃতিকে সঙ্গে নিয়া হরিদাস ও রূপকে দেখিতে আসিয়াছেন। হঠাৎ তাঁহার নজরে পড়ে হরিদাসের কুটিরের চালে গুঁজিয়া-রাখা একটি তালপত্র।

প্রভু অত্যন্ত কৌতূহলী হইয়া উঠেন, বলেন, "নিয়ে এসো দেখি, কি রয়েছে ওতে।"

রূপ বড় লাজুক এবং বিনয়ী, কহিলেন, "না প্রভু, ওটা তোমার দেখবার যোগ্য কিছু নয়।"

"তা হোক, নিয়ে এসো আমার কাছে।"

তালপত্রটি তাড়াতাড়ি খুলিয়া আনা হইল এবং দেখা গেল, এটিতে লিখিত রহিয়াছে রূপের সদ্য রচিত কয়েকটি প্রেমরসে উচ্ছল মনোরম শ্লোক।

গতকাল প্রভু কান্তা ও কান্তের নিভৃত মিলন সম্পর্কে যে শ্লোকটি বলিয়া উঠেন এবং স্বরূপ যাহা গীতচ্ছন্দে রূপায়িত করিয়া শোনান, এটি সেই ভাবেরই দ্যোতক। কালিন্দী পুলিনে নিভৃতে কৃষ্ণ ও রাধার মিলনানন্দের কথা লিখিয়াছেন রূপ তাঁহার অতুলনীয় ভাব, ভাষায় এবং ছন্দে।

এই তালপত্রের রচনাটি প্রভু সবাইকে নিয়া সোৎসাহে শুনিলেন, আর বার বার মুক্তকণ্ঠে করিতে লাগিলেন গুণগান। "আহা, আহা, এমন রসবস্তু তো সচরাচর পাওয়া যায় না! রূপ, তুমি আমাদের আজ সত্যই বড় আনন্দ দিলে।"

প্রভুর এই উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় রূপের কাব্যপ্রতিভার প্রতি স্বরূপ রামানন্দ প্রভৃতির দৃষ্টি সেদিন বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইল।

•

আর একদিন প্রভাতে প্রভু হরিদাসের কুটিরে আসিয়াছেন। সঙ্গে আছেন স্বরূপ, রামানন্দ প্রভৃতি বিশিষ্ট ভক্তবৃন্দ।

প্রভু জানেন, রূপের কাব্য রচনা কিছুটা বেশ অগ্রসর হইয়াছে। এ কাব্য যে মধুর রসের এক উৎসরূপে গণ্য হইবে, অন্তর্যামী প্রভুর তাহা অজানা নাই।

আজ ভক্তপ্রবর রূপের মহিমা তিনি বাড়াইতে চান এবং বিশেষ করিয়া স্বরূপ ও রামানন্দের মতো রস-বিচারকদের স্বীকৃতি দিয়া তাঁহাকে নব প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করিতে চান।

সোৎসাহে প্রভু নিজেই একদিন রূপের খাতাপত্র টানিয়া বাহির করিলেন, কিছু কিছু অংশ তিনি পাঠ করিলেন। ভাষার লালিত্যে, রসের পারিপাট্যে ও শাস্ত্র-সিদ্ধান্তে এ রচনা সত্যিই অপরূপ।

প্রভু বিশেষ করিয়া বিদগ্ধ মাধবের পাণ্ডুলিপি হইতে একটি রমণীয় শ্লোক সবাইকে শুনাইতে লাগিলেন। এ শ্লোকটির মর্ম :

'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' এই দুটি বর্ণ—
আহা, কি অমৃত দিয়েই না হয়েছে সৃষ্ট।
রসনায় যখন এ নামের হয় উচ্চারণ—
হৃদয়ে উদ্‌গত হয় শত রসনা লাভের বাসনা।
কর্ণে শ্রবণ করলে স্পৃহা ওঠে জেগে—
কোটি কোটি কর্ণের জন্য।
আর চেতনায় যখন এ নামের হয় স্ফুরণ।
জীবের সর্ব ইন্দ্রিয় হয় যে পরাভূত।

ভক্তেরা আনন্দে উল্লসিত হইয়া উঠেন, আর এক বাক্যে সবাই প্রশস্তি গাহিতে থাকেন, নাম মাহাত্ম্যের এমন মধুর শ্লোক তো সহসা শুনা যায় না।

প্রভু শ্রীচৈতন্যের চোখ মুখ তৃপ্তির আনন্দে ভরিয়া উঠিয়াছে, প্রসন্ন অন্তরে বার বার রূপকে জানাইতেছেন আশীর্বাদ।

স্বরূপ এ সময়ে রামানন্দ রায়কে সার কথাটি বুঝাইয়া দিলেন। প্রভুর অন্তরের ইচ্ছা জানিয়া রূপ এক মহান্ কর্মে ব্রতী হইয়াছেন, শুরু করিয়াছেন কৃষ্ণলীলার নূতন নাটক রচনা।

প্রভু নির্দেশ দিলেন, "রূপ, সবাই তোমার রচনা শুনে উল্লসিত হয়ে উঠেছে। তোমার নূতন নাটক থেকে কিছু কিছু অংশ পড়ে শোনাও।"

রূপ সংকোচে আড়ষ্ট হইয়া আছেন, জোড়হস্তে নিবেদন করেন, "প্রভু, ম্লেচ্ছাধম আমি, কৃষ্ণলীলা নাট্য আমি কি লিখবো? শুধু লিখছি, তোমার ইচ্ছেটি জেনে।"

"না—না রূপ। তোমার রচনার কিছু কিছু অংশ রামানন্দ আর স্বরূপকে আজ পড়ে শোনাও।"

নাটক পাঠ শুরু হইল। স্বরূপ ও রামানন্দ তো মহাবিস্মিত। ভাষা, রস ও সিদ্ধান্ত সব দিক দিয়াই এ কাব্য অতি চমৎকার। প্রভু উপযুক্ত লোকের উপরই দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছেন। উপস্থিত সবাই ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন। প্রভুর দৃষ্টি বিশেষভাবে রামানন্দের দিকে নিবদ্ধ। রামানন্দের সারা অন্তর আনন্দে বিস্ময়ে ভরিয়া উঠিয়াছে। রূপকে লক্ষ্য করিয়া গদ্‌গদ স্বরে তিনি উচ্চারণ করিলেন প্রশস্তিবাণী :

কবিত্ব না হয় এই অমৃতের ধার।
নাটক-লক্ষণ সব সিদ্ধান্তের সার।
প্রেম পরিপাটি এই অদ্ভুত বর্ণন।
শুনি চিত্ত-কর্ণের হয় আনন্দ ঘূর্ণন।

(চৈ-চরিতামৃত, অন্ত্য)

রামানন্দ মরমী ও শাস্ত্রবেত্তা, নিজের নাটক 'জগন্নাথ বল্লভ'-এ সতর্কভাবে নিগূঢ় ও সূক্ষ্ম রসতত্ত্বের মীমাংসা তিনি করিয়াছেন। রূপের নাটকাংশ শুনিয়া তিনি সত্যই বিস্মিত। বুঝিলেন, এ কাজের পশ্চাতে রহিয়াছে প্রভু শ্রীচৈতন্যের প্রেরণা ও ঐশী ইঙ্গিত। নতুবা এমন বস্তু নবাগত ভক্ত রূপের লেখনীতে পরিবশিত হওয়া তো সম্ভব নয়। প্রভুর দিকে তাকাইয়া এবার সহাস্যে কহিলেন :

ঈশ্বর তুমি যে চাহ করিতে।
কাষ্ঠের পুত্তলী তুমি পার নাচাইতে॥
মোর মুখে যে সব রস করিলে প্রচারণে।
সেই রস দেখি এই ইহার লিখনে॥
ভক্তকৃপায় প্রকাশিতে চাহ ব্রজরস।
যারে করাও সে করিবে, জগৎ তোমার বশ॥

(চৈ-চরিতামৃত, অন্ত্য)

প্রভুর দিব্য প্রেরণা, কৃপা ও রসজ্ঞ বৈষ্ণবদের স্বীকৃতি রূপ লাভ করিয়াছেন। তাঁহার প্রতি সকলের আস্থা জাগিয়া উঠিয়াছে। এবার প্রভু তাঁহাকে বিদায় দিতে মনস্থ করিলেন।

সকলের আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া রূপ সেদিন বৃন্দাবনে রওনা হইতেছেন, এ সময়ে প্রভু কহিলেন :

ব্রজে যাই রস শাস্ত্র কর নিরূপণ।
লুপ্ত সব তীর্থ তার করিহ প্রচারণ॥
কৃষ্ণসেবা রসভক্তি করহ প্রচার।
আমিও দেখিতে তাহা যাব একবার॥

বৈষ্ণব শাস্ত্রের লিখন ও প্রচার, তীর্থ উদ্ধার ও বিগ্রহ সেবা এবং কৃষ্ণভক্তির পথে ভক্ত জনসমাজকে চালিত করা, এই তিনটি ঐশীকর্মের সূচনা ও প্রসার শ্রীচৈতন্য তাঁহার বৃন্দাবন সংগঠনের মধ্য দিয়া করিতে চাহিয়াছিলেন। সেই কথাটিই তাঁহার চিহ্নিত সেবক, প্রতিভাধর রসতত্ত্বের ব্যাখ্যাতা, রূপের মনে সেদিন দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত করিয়া দিলেন।

রূপ ও সনাতনের যুক্ত প্রতিভা এবং কর্মনিষ্ঠার ফল কয়েক বৎসরের মধ্যে ফলিতে দেখা যায়।—"উভয়ে কঠোর সাধনায় ও শাস্ত্রালোচনায় আত্মনিয়োগ করিয়া পরিমূর্ত প্রেমিকের আদর্শ স্বরূপ শীঘ্রই সর্বজাতীয় ভক্তের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। একদিকে যেমন দৈন্যমূতির অন্তরালে পাণ্ডিত্যের বিকাশ হইতে লাগিল, অন্যদিকে তেমনিই রাগানুগা ভক্তির দিব্যোন্মাদ তাঁহাদিগকে সকলের স্মরণীয় ও বরণীয় করিয়া তুলিল। একভাবে যেমন কাহারও মনে কোনো আধ্যাত্মিক সমস্যা উপস্থিত হইলে তিনি তাহার সমাধানের প্রত্যাশায় উহাদের দীর্ঘ কুটিরের দ্বারস্থ হইতেন, অন্যভাবে তেমনই কেহ মানবরূপী দেবতা দেখিয়া জীবন চরিতার্থ করিবার জন্য তাঁহাদের দর্শন লাভের জন্য লালায়িত হইতেন। তাঁহাদের ভবনকুঞ্জ মানবকুলের পবিত্র তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হইল।

"কত ভক্ত ও শিষ্য আসিলেন। তাহাদের সাহায্যে ভারতবর্ষের নানা প্রদেশ হইতে অসংখ্য শাস্ত্রগ্রন্থ সংগৃহীত হইয়া বৃন্দাবনে আসিল। উহাদের সাহায্যে সনাতনের বিচার শক্তি ও রূপের কবিত্ব প্রতিভা নূতন নূতন শাস্ত্রপথ পাইয়া গিরিনদীর মতো ক্ষিপ্রগতিতে ছুটিয়া চলিল। তাঁহাদের লিখিত, সংকলিত ও ব্যাখ্যাত ভক্তিগ্রন্থসমূহ বিশ্বমানবের সার সম্পত্তি হইতে লাগিল।..

"মহাপ্রভু সনাতনকে বৃন্দাবনধামে পাঠাইবার সময় বলিয়া দিয়াছিলেন যে তিনি যেন শ্রীধামে তাঁহার দীন ভক্তবৃন্দের আশ্রয়-স্থল হন। কিন্তু সে কার্য তাঁহার একনিষ্ঠ কনিষ্ঠ ভ্রাতা দ্বারাই বিশেষভাবে সাধিত হইয়াছিল। সনাতন কিছু আত্মহারা গম্ভীর প্রকৃতির লোক, সাধারণ কর্মপটুতা রূপেরই অধিক ছিল। উপযুক্ততার অনুপাতে মানুষের কর্মভার আপনিই জুটিয়া থাকে। চৈতন্যদেবের প্রবর্তনায় বা প্রচারিত উপদেশের ফলে যেমন দলে দলে ভক্তগণ নানাদিক হইতে বৃন্দাবনে আসিতেছিলেন, রূপ অগ্রণী ও উদ্যোগী হইয়া তাঁহাদের সকলের তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন। যিনি যেমন প্রকৃতির লোক, তাহাকে সেইভাবে কুটির বাঁধিয়া বাস করিতে দিয়া,

সকলের অভাব অভিযোগের সুমীমাংসা করিয়া রূপ গোস্বামী বৃন্দাবনের ভক্তমণ্ডলীর কর্তা হইয়া বসিলেন। এই কর্তৃত্বই গোস্বামী নামের সার্থকতা রাখিল। কাজের লোক চিনিয়া লইতে কাহারও বিলম্ব হয় না। নূতন ভক্ত কেহ আসিলে তিনি সর্বাগ্রে রূপকেই খুঁজিয়া বাহির করিতেন। প্রবাসী ভক্তেরা অঙ্গুলি দিয়া তাঁহাকেই দেখাইয়া দিতেন; কোনো পর্ব উৎসব অনুষ্ঠানের প্রস্তাব হইলে রূপই তাহার ব্যবস্থা করিতেন। এই প্রকার নানারূপে রূপ শ্রীকৃষ্ণ-রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনের রাজা, রূপ হইলেন তাঁহার রাজপ্রতিনিধি। রূপের নাম সর্বত্রই দেশে প্রচারিত হইল, শত শত ভক্ত তাঁহার অনুবর্তন করিয়া ব্রজমণ্ডলে এক সঙ্ঘ গড়িলেন। লোকে রূপের কথায় উঠিত বসিত এবং তাঁহার উপদেশের ফলে জ্ঞান ও সাধনার পথে অগ্রসর হইয়া ধন্য হইত। কে বড়, কে ছোট তাহা সকলে জানিত না, রূপ-সনাতন এই জোড়া নামে সকলে রূপেরই প্রাধান্য স্বীকার করিত। সমাজের প্রতি এমন অবাধ প্রতিপত্তি কম শক্তির পরিচায়ক নহে[১]।"

প্রভু শ্রীচৈতন্য শ্রীবিগ্রহ সেবার যে নির্দেশ দিয়াছিলেন রূপ ও সনাতন তাহা একদিনের তরেও বিস্মৃত হন নাই। লুপ্ততীর্থ উদ্ধারের পরিকল্পনার সঙ্গে তাঁহারা লুপ্ত শ্রীবিগ্রহের পুনরাবির্ভাবের কথাও একান্তমনে ব্যাকুলভাবে ভাবিতেছিলেন।

বৃন্দাবনে কাজ শুরু করার পর দীর্ঘ বৎসর গত হইয়াছে। রূপ ও সনাতনের পরে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন গোপাল ভট্ট, রঘুনাথ ভট্ট প্রভৃতি পণ্ডিত ও সাধকগণ। শ্রীচৈতন্যের লীলা সংবরণের পরে রঘুনাথ দাস প্রভৃতি বিশিষ্ট ভক্তেরাও বৃন্দাবনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গৌড়ীয় গোস্বামীদের তপস্যা, পাণ্ডিত্য, ও সংগঠনের গুণে বৃন্দাবন পরিণত হইল ভারতের এক শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবকেন্দ্র রূপে।

১ রূপ গোস্বামী : সতীশচন্দ্র মিত্র

ইতিমধ্যে ব্রজমণ্ডলের প্রাচীন এবং হারাইয়া যাওয়া পবিত্র বিগ্রহগুলির অনুসন্ধান প্রবলভাবে চলিতেছিল, এই সঙ্গে মিলিত হইয়াছিল সনাতন রূপ প্রভৃতির আর্তি ও ব্যাকুল প্রার্থনা। এ প্রার্থনার ফল অচিরে ফলিল। সনাতন গোস্বামী মথুরার চৌবেজীর গরীব বিধবার নিকট হইতে মদনগোপাল বিগ্রহ সংগ্রহ করিয়া আনিলেন। শ্রীবিগ্রহ কৃপাভরে চৌবে ঘরনীকে স্বপ্ন দেখাইয়া নিজেই নিজেকে সঁপিয়া দিলেন কাঙাল ভক্ত সনাতনের করে।

মদনগোপাল বিগ্রহের পর গোস্বামীদের করায়ত্ত হয় গোবিন্দদেব বিগ্রহ। ব্রজমণ্ডলের প্রসিদ্ধ এবং সুপ্রাচীন অষ্টমূর্তির মধ্যে এইটি সর্বপ্রধান। শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র বজ্রনাভের আমলের পরে এই বিগ্রহ আত্মগোপন করেন। রূপ গোস্বামীর অলৌকিকী প্রয়াসই এই পবিত্র ঐতিহ্যময় বিগ্রহকে লোকলোচনের সম্মুখে প্রকটিত করে এবং তিনিই পরম আনন্দে গ্রহণ করেন ইঁহার সেবা পূজার দায়িত্ব।

এই গোবিন্দদেবের উদ্ধার সাধনের কাহিনী আজো ব্রজমণ্ডলের জনমানসে জাগরূক রহিয়াছে, আজো পরম জাগ্রত বিগ্রহরূপে ইনি বিরাজিত রহিয়াছেন ভারতের প্রেমিক সাধকদের অন্তরপটে।

প্রাচীন শাস্ত্রীয় গ্রন্থাদি ঢুঁড়িয়া রূপ গোস্বামী জানিয়াছিলেন, বৃন্দাবনের যোগপীঠে রাজা বজ্রনাভের এই শ্রীবিগ্রহটি বিরাজ করিতেন। কান্থা-করঙ্গধারী সনাতন ও রূপ যখন বৃন্দাবনের অরণ্যে প্রান্তরে তীর্থ উদ্ধারের জন্য ঘুরিয়া বেড়াইতেন, তখন হইতেই গোবিন্দদেব রূপের হৃদয়-সিংহাসন জুড়িয়া বসেন। কিন্তু কোথায় প্রাচীনকালের সেই যোগপীঠে, কোথায় কোন্ নদীগর্ভে বা দুর্গম বনে সেই বিগ্রহ আত্মগোপন করিয়া আছেন, তাহা কে বলিবে ?

যখন যেখানে থাকিতেন কাঙাল বৈষ্ণব রূপ জপধ্যান শেষে রোজ জানাইতেন আকুল প্রার্থনা, "হে প্রভু, হে প্রাণনাথ, কোথায় তুমি লুকিয়ে আছো, আমায় তার সন্ধান দাও, এই অনাথের প্রাণ রক্ষা করো।"

এই প্রার্থনা একদিন ইষ্টদেব শুনিলেন, তাঁহার কৃপার উদ্রেক

হইল। সেদিন যমুনা তীরে বসিয়া সজল নয়নে শ্রীগোবিন্দের স্মরণ করিতেছেন, এমন সময়ে সেখানে আবির্ভূত হয় দিব্য লাবণ্যময় শ্যামকান্তি এক চঞ্চল ব্রজবালক।

"হেই বাবাজী, বসে বসে নিদ্ যাচ্ছো, না তোমার গোবিন্দের ধেয়ান করছো? গোবিন্দ তো হোথায়। ঐ গোমাটিলার ভেতরে।"

ধ্যানাবেশ কাটিয়া যায় রূপ গোস্বামীর, চমকিয়া আসন হইতে উঠিয়া দাঁড়ান। ব্যাকুল স্বরে প্রশ্ন করেন, "ভাই, গোমাটিলার কোথায় লুকিয়ে আছেন তিনি, কে আমায় তা বলে দেবে?"

"কেন, বাবাজী আমি বাতিয়ে দেবো তোমায়। জানতো ঐ গোমাটিলার এক জায়গায় রোজ দুপুরবেলায় একটা গাই চরতে আসে, আর ঠিক ঐ জায়গাতেই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে দুধ ঢেলে দিয়ে যায়। ওরই নিচেই তো রয়েছেন তোমার গোবিন্দজী।"

অপার্থিব আনন্দে প্রাণ-মন অধীর হইয়া উঠে, অর্ধবাহ্য অবস্থায় গোস্বামী ভাবিতে থাকেন, একি সত্যি সত্যিই কোনো ব্রজবালক, না দিব্যলোকের কোনো অধিবাসী? না স্বয়ং শ্রীগোবিন্দই ছদ্মবেশে হইয়াছেন আবির্ভূত? তীব্র-রসাবেশ জাগিয়া উঠে রূপ গোস্বামীর সারা দেহে মনে, তখনি তিনি মূর্ছিত হইয়া পড়েন।

জ্ঞান ফিরিয়া আসিলে দেখেন, সেই সুদর্শন বালক আর নাই, কোথায় সে অন্তর্হিত হইয়াছে।

ব্যগ্রভাবে রূপ গোস্বামী তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া যান সন্নিহিত গ্রামে। সবাইকে প্রশ্ন করেন গোমাটিলার রহস্যের কথা, গাভীর নিত্যকার দুগ্ধ ক্ষরণের কথা।

ব্রজবাসীরা সোৎসাহে বলিতে থাকে, "হাঁ, বাবাজী, তুমি তো ঠিক কথাই বলছো। অনেক বৎসর ধরে আমরা যে দেখে আসছি, গাই-এর দুধ ঠিক একটা জায়গাতে নিয়মিতভাবে ঝরে পড়ে। ওখানে কোনো দেবতা আছেন নিশ্চয়।"

আনন্দাশ্রু বহিতে থাকে রূপ গোস্বামীর নয়নে। সারা দেহ

ভাবাবেশে বার বার কণ্টকিত হইতে থাকে। আকুল প্রার্থনা জানান গ্রামের লোকদের কাছে, "ভাই সব, তোমরা চল। সবাই মিলে আমায় সাহায্য দাও। ঐ স্থান থেকে বার হয়ে আসবেন আমাদের সকলের প্রাণপ্রিয় ঠাকুর, শ্রীগোবিন্দদেব।"

বাবাজীর এই উৎসাহ ও প্রেরণায় সবাই উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠে, সমবেত চেষ্টায় শুরু হয় খননের কাজ। সেই দিনই আবিষ্কৃত হন শ্রীগোবিন্দের পবিত্র বিগ্রহ।

ঐ গোমাটিলাই যে দ্বাপর যুগের যোগপীঠ এবং ঐ বিগ্রহই যে বজ্রনাভ মহারাজের প্রতিষ্ঠিত ও পূজিত গোবিন্দদেব শাস্ত্রবাক্য উদ্ধৃত করিয়া রূপ গোস্বামী গ্রামবাসীদের কাছে, সাধু সন্ত ও ভক্তজনের কাছে, একথা প্রমাণিত করিলেন।

গোস্বামীর তপস্যার ফলে গোবিন্দদেব নিজে কৃপা করিয়া প্রকটিত হইয়াছেন, একথা অচিরে সারা ব্রজমণ্ডলে ছড়াইয়া পড়ে দলে দলে ভক্ত ও সাধু সজ্জনেরা সেখানে সমবেত হইতে থাকেন, সবাই মিলিয়া অনুষ্ঠান করেন এক বিরাট ভাণ্ডারার।

উত্তরকালে রূপ সনাতনের সহকর্মী রঘুনাথ ভট্টের এক ধনবান শিষ্য গোবিন্দদেবের একটি সুন্দর মন্দির ও জগমোহন নির্মাণ করিয়া দেন।[১]

বৃন্দাবনের গৌড়ীয় গোস্বামীদের শাস্ত্র প্রণয়ন, সংকলন এবং প্রকাশনার বিস্তার ও গম্ভীরতা দেখিলে বিস্মিত না হইয়া পারা যায় না। সহায় সম্পদহীন এই কাঙাল ভক্তেরা দীর্ঘদিনের সাধনা ও

১ উড়িষ্যার রাজা প্রতাপরুদ্রের পুত্র, পুরুষোত্তম জানা, রূপ গোস্বামীর তিরোধানের কিছু পূর্বে এই মন্দির-বিগ্রহের পাশে একটি রাধিকা-মূর্তি স্থাপন করেন। মন্দিরটি পরবর্তীকালে জীর্ণ হইয়া পড়িলে অম্বরের রাজা মানসিংহ ইহার স্থলে লাল পাথরের কারুকার্যময় এক সুবৃহৎ মন্দির নির্মাণ করিয়া দেন। অতঃপর অওরঙ্গজেব এটির প্রধান অংশ ভগ্ন করিয়া দিলে মন্দিরের সৌন্দর্য ও বৈভব নষ্ট হয়।

কর্মনিষ্ঠায় যে শাস্ত্র-সম্পদ গড়িয়া তোলেন, তাহার তুলনা ইতিহাসে বিরল।

বৈষ্ণব ইতিহাসের গবেষক ও ব্যাখ্যাতা সতীশচন্দ্র মিত্র লিখিয়াছেন: ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমপাদে ইহারা যে ধর্ম গড়িয়া দেশময় তুমুল আন্দোলন তুলিয়াছিলেন, তাহার প্রবাহ কয় শতাব্দী পরে হইতে পারিত, তাহা কে জানে? কারণ বঙ্গের যাঁহারা শক্তিশালী বা সমৃদ্ধিশালী লোক, সমাজে যাঁহারা কুলীন বলিয়া চিহ্নিত, বঙ্গীয় সমাজের উচ্চস্তরের সেই ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য প্রভৃতি জাতির অধিকাংশই তখন শাক্ত মতাবলম্বী—তাঁহারা গৌড়ীয় বৈষ্ণবমতের ঘোর শত্রু ছিলেন। পাণ্ডিত্য প্রতিভায় বংশ পরম্পরায় যে ব্রাহ্মণগণ সর্বত্র খ্যাতিসম্পন্ন, ধর্মসাধনা অপেক্ষাও আচার-নিষ্ঠায় যাঁহাদের অধিক আগ্রহ, তাঁহারা সকলেই নবমতকে অশাস্ত্রীয় এবং অনাচরণীয় বলিয়া উপেক্ষা করিতেছিলেন। সুতরাং প্রবর্তক প্রভুদিগের অন্তর্ধানের পর এক তাঁহাদের ধর্মকে বাঁচাইয়া রাখা গুরুতর সমস্যার বিষয় ছিল। এদেশে শাস্ত্রের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠাপিত না হইলে কোনো ধর্মই টিকিবে না; এই পণ্ডিতের দেশে যেখানে সেখানে তর্ক-যুদ্ধে সকলকে পরাজিত করিয়া নিজমত স্থাপন করিতে না পারিলে, সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইবে—এ রহস্য চৈতন্য বুঝিতেন। ভাবের বন্যায় জলোচ্ছ্বাস আসিতে পারে, কিন্তু কালে শুষ্ক বালুকায় তাহা শুকাইয়া যাওয়া বিচিত্র নহে। তাহাকে দৃঢ় মৃত্তিকার খাতে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে না পারিলে, ইহা সুপেয় সলিলপূর্ণ গভীর জলাশয়ে পরিণত হইয়া চিরপিপাসুর তৃষ্ণা নিবারণে সমর্থ হইবে না।

—এই জন্যই শ্রীচৈতন্য নিজ ভক্তের মধ্য হইতে বাছিয়া বাছিয়া লোক পাঠাইয়া তাঁহাদের দ্বারা বৈষ্ণবমতের শাস্ত্রগঠন ও সংকলন করাইয়াছিলেন। জগতের সকল জাতির নেতৃবৃন্দের মধ্যে যিনিই উপযুক্ত লোক নির্বাচনে সুপটু এবং গুণগ্রাহী ও সূক্ষ্মদর্শী তিনি জগতে জয়লাভ করিয়াছেন। চৈতন্যমতের সাফল্যের ইহাই প্রধান কারণ।

—তিনি যাহাদিগকে মোহিনী মূর্তিতে আত্মসাৎ করিয়া শক্তি সঞ্চারিত করিয়াছিলেন, তাঁহার সেই বাছা বাছা ভক্তেরা নিখিল হিন্দু শাস্ত্রের আকর স্থান হইতে রত্নোদ্ধার করিয়া নব প্রবর্তিত গৌড়ীয় মতকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের নিকট লোকে সর্বপ্রথমে পাণ্ডিত্যে পরাজিত হইয়া মস্তক অবনত করিয়াছিলেন, তবে তো নবমতের বিজয়ে পতাকা উড়িয়াছিল। নতুবা আজ শ্রীচৈতন্যের ধর্মের কি পরিণতি হইত, কে বলিবে? যে সব সংসারত্যাগী অসাধারণ শাস্ত্রদর্শী দৈন্যবেশী সন্ন্যাসী ভক্তেরা বৃন্দাবনকে কেন্দ্রস্থল করিয়া, তথায় বসিয়া অসংখ্য দার্শনিক গ্রন্থ লিখিয়া বৈষ্ণবধর্মের ভিত্তিমূল রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান ছিলেন তিনজন—শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপ গোস্বামী এবং উহাদের ভ্রাতুষ্পুত্র ও শিষ্য শ্রীজীব গোস্বামী। সনাতন তাঁহার ধর্মকে ও ভক্তিবাদের সিদ্ধান্তকে সনাতন-ধর্মমতের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া প্রমাণিত করিয়াছেন। রূপ সে ধর্মের সাধন-প্রণালীর রূপ নির্ণয় করিয়াছেন, আর শ্রীজীব তাঁহার বিবিধ সন্দর্ভে তত্ত্বব্যাখ্যা করিয়া সে ধর্মকে চিরজীবী করিয়া গিয়াছেন।

এই গোস্বামীদের মধ্যে ত্যাগে, তপস্যায়, সংগঠন শক্তিতে, শাস্ত্র ও কাব্য রচনায় রূপ গোস্বামী ছিলেন অনন্যসাধারণ। কিন্তু তাঁহার শ্রেষ্ঠতম অবদান তাঁহার কৃষ্ণলীলা এবং কৃষ্ণরসে রসায়িত কাব্য ও নাটক।

"রূপ গোস্বামী আজন্ম কবি এবং অল্পবয়সেই পরম পণ্ডিত। তাঁহার হস্তাক্ষর যেমন মুক্তাপঙ্‌ক্তির মতো সুন্দর তাঁহার ভাষাও তেমনি মার্জিত, অলংকৃত এবং নিরুপম কবিত্বপূর্ণ। তাঁহার রচনা সর্বত্রই গভীর চিন্তাশীলতার পরিচয় দেয়; নব নব ভাব ও সুন্দর শব্দ-সমাবেশে তাঁহার শ্লোকগুলি বিষয়ানুরূপ গাম্ভীর্যে বিমণ্ডিত হইয়া কাব্য রসকলায় ভরপুর থাকে। সেই গুরুগম্ভীর শব্দ সম্ভারে ভারাক্রান্ত শ্লোকগুলি পড়িবামাত্র রূপ গোস্বামীর লেখনীপ্রসূত

বলিয়া ধরিতে পারা যায় এবং অর্থের উপলব্ধি হইবামাত্র উহাদের কবিত্ব-কৌশলে মুগ্ধ হইতে হয়। এমন ভাবুক, এমন লেখক যৌবনাবধি কেন যে মুসলমান শাসকের রাজস্বসচিব হইয়া তৃপ্ত ছিলেন তাহা বিস্ময়ের বিষয়। পারিপার্শ্বিক অবস্থার দোষে প্রমত্ত কবিকেও প্রচণ্ড বৈষয়িক করিতে পারে, ইহা তাহারই দৃষ্টান্ত। সংসারকে যে ভালো করিয়া ধরিতে জানে, কর্মবাসনার সমাপ্তি হইলে সেই আবার সংসারকে ভালো করিয়া ছাড়িতে পারে। মরিচা কাটিয়া গেলে সকল ধাতুরই ঔজ্জ্বল্য প্রকাশ পায়; বিষয় মরীচিকার হাতে নিস্তার পাইয়া রূপ যে নবজীবন পাইয়াছিলেন, তাহার ঔজ্জ্বল্যে সমগ্র ভারতবর্ষ উদ্ভাসিত হইয়াছে।

"রাজকর্মচারী থাকিবার কালেও তিনি কখনও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সঙ্গে শাস্ত্রচর্চায় বিরত হন নাই, তাঁহার কবি প্রতিভা কখনও সম্পূর্ণ লুক্কায়িত থাকে নাই। সংসার ছাড়িয়া বৃন্দাবনে আসিবার পর যখন তিনি রাশি রাশি শাস্ত্রগ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া তাহা লইয়া তদ্‌গতচিত্ত থাকিতেন, তখন তাহার চিন্তার ধারা স্বভাবত উছলিয়া পড়িত, ভাষা আসিয়া দাসীর মতো উহা বহন করিয়া লোকশিক্ষার জন্য গ্রন্থিত করিয়া রাখিত। কত কাব্য নাটক, কত স্তোত্র বা মন্ত্র কবিতা, কত সারার্থ-ব্যাখ্যা বা শাস্ত্র সংগ্রহ যে তাঁহার লেখনী মুখে প্রকাশিত হইত, তাহা বলিবার নহে। রূপ গোস্বামী বহু প্রকারের বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। শ্রীজীব গোস্বামী স্বপ্রণীত 'লঘুতোষণী' গ্রন্থে নিজ বংশের পরিচয় কালে ঐ সকল গ্রন্থের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন।[১]

কাব্য, নাটক, রসগ্রন্থ, স্তোত্র, ভাণিকা এবং শাস্ত্রসংগ্রহ পুস্তক সব মিলাইয়া রূপ গোস্বামী ষোলখানা গ্রন্থ প্রণয়ন ও সংকলন করেন। বিদগ্ধমাধব এবং ললিতমাধব এই নাটক দুইটিতে নায়ক শ্রীকৃষ্ণের বিদগ্ধ এবং ললিত এই দুইটি মাধুর্যময় রূপে এবং রাধা ও প্রধানা সখীদের সহিত তাঁহার মিলনলীলা বর্ণনা তিনি করিয়াছেন।

---

১ রূপ গোস্বামী : সতীশচন্দ্র মিত্র

মধুর রস যে সাধকদের উপজীব্য, এই নাটক দুইটিতে তাঁহাদের জন্য পরিবেশিত হইয়াছে কৃষ্ণের অনুপম ভাবমূর্তি ও নিগূঢ় প্রেমতত্ত্ব। কিন্তু রূপ গোস্বামীর গ্রন্থসমূহের মধ্যে সর্বপ্রধান হরিভক্তি রসামৃত-সিন্ধু এবং উজ্জ্বল নীলমণি। রসগ্রন্থ নামে এই দুইটি প্রসিদ্ধ।

ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর রচনায় সনাতন এবং রূপ এই দুই ভ্রাতারই অবদান রহিয়াছে। সনাতনই সেখানে শাস্ত্ররহস্যের বিচারকর্তা এবং রূপ তাঁহার নির্দেশ এবং সম্মতি নিয়া তত্ত্ব ও সিদ্ধান্ত স্থির করিয়াছেন, দীর্ঘ বৎসরের পরিশ্রমে এই মহাগ্রন্থ লিখিয়াছেন। এজন্য তিনিই ইহার রচয়িতারূপে পরিচিত। এই গ্রন্থে ভক্তিরসের বিভিন্ন ধারার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ তিনি দিয়াছেন এবং ভক্তির স্বরূপ ও প্রকারভেদ নির্ণয় প্রসঙ্গে উপস্থাপিত করিয়াছেন গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতবাদ।

ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে রূপ গোস্বামী শান্ত দাস্য প্রভৃতি সব রসের বর্ণনা দিয়াছেন, কিন্তু মধুর রস অত্যন্ত গূঢ় বলিয়া তাহার আলোচনা করিয়াছেন সংক্ষেপে। এই গূঢ় রসের বিস্তৃত ব্যাখ্যা পাওয়া যায় তাঁহার উজ্জ্বল নীলমণিতে। ভক্তি সমুদ্র হইতে নীলমণিতুল্য মধুর অথবা উজ্জ্বলরস আহরণ করিয়াছেন বিদগ্ধ লেখক, তাই ইহার নামকরণ করিয়াছেন—উজ্জ্বলনীলমণি। মধুর রসের বিস্তৃত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে এ গ্রন্থ ভরপুর।

শাস্ত্রসংগ্রহ গ্রন্থসমূহের মধ্যে রূপ গোস্বামীর লঘুভাগবতামৃত বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এটি আসলে সনাতন গোস্বামীর মহান্ গ্রন্থ বৃহৎ ভাগবতামৃতের সংক্ষেপণ। বিদগ্ধ রূপের মতে ভাগবতামৃত দুই প্রকারের,—কৃষ্ণামৃত ও ভক্তামৃত। গ্রন্থটি তাই বিভক্ত করা হইয়াছে দুই ভাগে। শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ নির্ণয়, অবতার তত্ত্বের আলোচনা এবং কৃষ্ণ অবতারের শ্রেষ্ঠত্ব এই গ্রন্থে তিনি প্রতিপাদিত করিয়াছেন। মথুরামণ্ডলে শ্রীকৃষ্ণ এখনো নিত্যলীলা করিয়া চলিয়াছেন, এবং দেবতারা সদাই তাহা দর্শন করেন,—এই তত্ত্বটি তিনি উপস্থাপিত করিয়াছেন শাস্ত্র পুরাণের বহুতর উদ্ধৃতি দিয়া।

বৈষ্ণবীয় সাধনা ও সিদ্ধির মূর্ত বিগ্রহ ছিলেন রূপ গোস্বামী। কোমলতা ও কঠোরতা, বৈরাগ্য ও অনুরাগ, বৈধী এবং রাগানুগা সাধনার ধৃতি, একসঙ্গে অপরূপ বৈশিষ্ট্য নিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছিল তাঁহার মহাজীবনে। ভক্তি ও জ্ঞানের ঘটিয়াছিল বিরাট সমন্বয়।

নিজস্ব সাধনজীবনে তিনি ছিলেন ডোরকৌপীনধারী দিনাতিদীন বৈষ্ণব। তৃণের অপেক্ষা নীচু এবং তরু অপেক্ষা সহিষ্ণু—মহাপ্রভুর এই বৈষ্ণবীয় আদর্শ রূপায়িত হইয়াছিল তাঁহার মধ্যে। কিন্তু এই সঙ্গে ছিল তাঁহার ধর্মীয় আদর্শ রক্ষার নিষ্ঠা ও অনমনীয়তা। শিষ্য ও ভক্তদের মধ্যে বিন্দুমাত্র শৈথিল্য বা স্খলন পতন ঘটিলে মুহূর্তমধ্যে প্রকটিত হইত তেজস্বী সিদ্ধপুরুষের অগ্নিগর্ভ মূর্তি, রুদ্ররোষে তিনি ফাটিয়া পড়িতেন। বৃন্দাবনের ভক্তসমাজে তাই রূপ গোস্বামী গণ্য হইতেন এক অনন্যসাধারণ বৈষ্ণব নায়করূপে।

দিক্‌পাল পণ্ডিত এবং অতুলনীয় কৃষ্ণরসবেত্তা ছিলেন রূপ-গোস্বামী। বৈষ্ণবীয় দৈন্য ও বিনয় ছিল তাঁহার চরিত্রের বড় বৈশিষ্ট্য, আর প্রতিষ্ঠা তাঁহার দৃষ্টিতে ছিল—শূকরী বিষ্ঠা। ভারতের দিগ্‌দিগন্ত হইতে কত ধর্মনেতা, কত দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিত বৃন্দাবনে আসিতেন, রূপ গোস্বামীর কাছে উপস্থিত হইতেন তর্ক-বিচারের জন্য। তিনি কখনো এজাতীয় দ্বন্দ্বে লিপ্ত হইতেন না, সানন্দে তৎক্ষণাৎ লিখিয়া দিতেন জয়পত্র। প্রতিদ্বন্দ্বী বুক ফুলাইয়া স্থানত্যাগ করিলে রূপ রত হইতেন তাঁহার শাস্ত্ররচনায় অথবা ভজনসাধনে।

একবার আচার্য বল্লভ ভট্ট রূপ গোস্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন। ভট্টজী বিষ্ণুস্বামী সম্প্রদায়ের প্রখ্যাত নেতা এবং ভক্তি-পুরাণ শাস্ত্রে সুপণ্ডিত। রূপ গোস্বামী তখন নিজের কুটিরে ভক্তিরসামৃতের পুঁথি রচনায় নিবিষ্ট আছেন, আর শ্রীজীব তাঁহার পাশে বসিয়া একটি পাখা হাতে নিয়া ভক্তিভরে তাঁহাকে ব্যজন করিতেছেন। রূপ ভট্টজীকে সসম্মানে অভ্যর্থনা জানান, একপাশে আসন বিছাইয়া বসিতে দেন।

কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর ভট্টজী রূপ গোস্বামীর সদ্য লিখিত পুঁথির দুই চারিটি শ্লোক শুনিতে চাহিলেন। রূপ মঙ্গলাচরণের দুই একটি শ্লোক পাঠ করার সঙ্গে সঙ্গে বল্লভ ভট্ট শাস্ত্রীয় বিতর্ক তুলিলেন, কহিলেন, "গোস্বামীজী, এ শ্লোকে ত্রুটি রয়েছে দেখতে পাচ্ছি, একটু সংশোধন ক'রে নেওয়া সঙ্গত।"

"অতি উত্তম কথা," তখনি সানন্দে বলিয়া উঠেন রূপ গোস্বামী: "আপনি দয়া ক'রে নিজে সংশোধন ক'রে দিলে বড়ই উপকৃত বোধ করবো। আপনি কাজটা এখানে বসে শেষ করুন। এদিকে আমার আবার ঠাকুর সেবার কাজ আছে, বেলা হয়ে যাচ্ছে, আমি যমুনায় স্নান সমাপন ক'রে আসছি।"

পুঁথিটি তেমনিভাবে খুলিয়া রাখিয়া প্রশান্ত মনে, অবলীলায়, রূপ গোস্বামী চলিয়া গেলেন।

শ্রীজীব কিন্তু এতক্ষণ চুপচাপ একপাশে উপবিষ্ট ছিলেন। ভট্টজী লেখনীটি হাতে নিয়া পাণ্ডুলিপি সংশোধনে উদ্যত হইতেই তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। কঠোর স্বরে কহিলেন, "আচার্য, একটু অপেক্ষা করুন। আগে স্থির হোক সংশ্লিষ্ট এ শ্লোকটিতে কোনো ত্রুটি আছে কিনা। আমাদের গোস্বামী প্রভু দৈন্যের অবতার। আপনি সম্পূর্ণরূপে ভ্রান্ত, একথা জেনেও আপনার অহংবোধকে উনি এভাবে কিছুটা প্রশ্রয় দিচ্ছেন।"

"কে হে তুমি অর্বাচীন! তোমার স্পর্ধাতো দেখ্ছি কম নয়। তুমি জানো, আমি কে?"

"আজ্ঞে, আপনার পরিচয় শুনেছি।"

"তবে? এমন সাহস পেলে কোথায়?"

"আচার্যবর, এ সাহস এসেছে গুরুকৃপায়। আপনি যাঁর লেখা সংশোধন করতে যাচ্ছেন, তাঁর কাছেই হয়েছে আমার দীক্ষা আর শাস্ত্র শিক্ষা। সে শিক্ষার এক কণাও আয়ত্ত করতে পারি নি। তবুও তাঁর প্রসাদে আমার মতো অর্বাচীনই বৃন্দাবনে আগত দুই চারিটি দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিতকে পরাস্ত করেছে।"

"হুম্!" ভিতরকার ক্রোধ ও উত্তেজনা অতিকষ্টে সংযত করিয়া বল্লভ ভট্ট কহিলেন, "বেশ, গোস্বামীর এই শ্লোকটি যে সঙ্গত তার কারণ দর্শাও।"

"আপনি আদেশ করলে দেখাতে পারি বৈ কি।" একথা বলিয়া প্রতিভাধর তরুণ পণ্ডিত শ্রীজীব প্রাচীন শাস্ত্র হইতে ঐ শ্লোকের যথার্থতা সপ্রমাণ করিলেন।

আচার্য বল্লভ ভট্ট কিছুক্ষণ তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া রহিলেন, তারপর পাণ্ডুলিপিটি সশব্দে বন্ধ করিয়া দিয়া বিদায় নিলেন।

পথিমধ্যে রূপ গোস্বামীর সঙ্গে ভট্টজীর দেখা। আচার্য এসময়ে বড় গম্ভীর বদন। কহিলেন, "গোস্বামী মহারাজ, আপনার কুটিরে উপবিষ্ট ঐ তরুণ বৈষ্ণবটি কে?"

"কেন বলুন তো? ঐটি আমার শিষ্য, শ্রীজীব।"—সন্দিগ্ধ স্বরে উত্তর দেন রূপ। বল্লভ ভট্ট এবার বিষণ্ণ স্বরে সংক্ষেপে বর্ণনা করেন শ্রীজীব সম্পর্কিত ঘটনার কথা। তারপর ধীর পদে সেখান হইতে প্রস্থান করেন।

কুটিরের আঙিনায় পা দিয়াই রূপ গোস্বামী কঠোর স্বরে শ্রীজীবকে নিকটে ডাকিলেন। প্রেমবিলাস এই বিস্ফোরণশীল পরিস্থিতির বর্ণনায় বলিতেছেন:

শ্রীরূপ ডাকিয়া কহে শ্রীজীবের প্রতি।
অকালে বৈরাগ্য বেশ ধরিলে মূঢ়মতি॥
ক্রোধের উপরে ক্রোধ না হইল তোমার।
তে কারণে তোর মুখ না দেখিব আর॥

শ্রীজীব নতশিরে নীরবে দাঁড়াইয়া আছেন। মুহূর্তমধ্যে তিনি উপলব্ধি করিয়াছেন নিজের অপরাধের গুরুত্বের কথা। সত্যিই তো, ক্রোধ ত্যাগ না করিলে সর্বত্যাগী বৈরাগী হওয়া, শ্রীকৃষ্ণের চরণে নিবেদিত-প্রাণ ভক্ত হওয়া তো সম্ভব নয়!

রূপ গোস্বামী এবার কহিলেন, "তুমি কি ভেবেছো, বল্লভ ভট্ট যে ভ্রান্ত, একথা আমি বুঝি নি। সব বুঝেই আমি তাঁকে প্রশ্রয় দিয়েছি,

তাঁর কাছে নতি স্বীকার করেছি। অনেক দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিতকেই বৃন্দাবনে আমি বিনা-তর্কে জয়পত্র দিয়ে দিয়েছি। তোমার তো এসব অজানা নেই। মহাপ্রভুর পবিত্র ধর্ম যে প্রচার করবে, তার তো তোমার মতো আচরণ থাকা উচিত নয়। শুধু ক্রোধ নয়, সূক্ষ্ম অহংবোধও তোমার এ মনোভাবে প্রচ্ছন্ন রয়েছে। এগুলো পরিহার যদি করতে পারো, তবেই আসবে আমার কাছে, নতুবা নয়।”

• প্রাণাধিক ভ্রাতুষ্পুত্র এবং নিজের হাতে গড়া দিক্‌পাল শিষ্য শ্রীজীব বৃন্দাবনের ভক্তি সাম্রাজ্যের তিনি ভবিষ্যৎ অধ্যক্ষ। সেই শ্রীজীবকে এক মুহূর্তে বিতাড়িত করিতে রূপ গোস্বামীর সেদিন এতটুকুও বাধে নাই। বৈষ্ণবীয় নীতি ও নিষ্ঠা বিষয়ে এমনি বজ্রকঠোর ছিলেন তিনি।

গুরুকে প্রণাম করিয়া, ক্রন্দন করিতে করিতে জীব গোস্বামী প্রবেশ করেন বৃন্দাবনের এক জনমানবহীন দুর্গম জঙ্গলে। সেখানে লতাপাতা দিয়া এক পর্ণকুটির বাঁধিয়া শুরু করেন নূতনতর কৃচ্ছ্র ও তপস্যা। সংকল্প করেন, যে শোধন ও রূপান্তর গুরু দাবি করিয়াছেন তাহা সাধিত না হইলে লোকালয়ে আর কখনো ফিরিয়া আসিবেন না, জীবনপাত করিবেন এই অরণ্যে।

কয়েক মাস অতিবাহিত হইয়া গেল। অত্যধিক কঠোরতার মধ্য দিয়া শ্রীজীব দিনাতিপাত করিতেছেন। দূর গ্রাম হইতে কেহ কখনো আসিয়া যদি কিছু খাদ্য দেয়, তাহা দিয়াই জীবনধারণ করেন। এক একদিন কোনো রাখাল বা ভক্ত বনবাসী একমুষ্টি গম নিয়া হয়তো উপস্থিত হয়। তাহাই চূর্ণ করিয়া জলসহ তিনি পান করেন। আবার নিমগ্ন হন দীর্ঘ সময়ের জপ ধ্যানে।

হঠাৎ একদিন এই বনের প্রান্তস্থিত গ্রামে সনাতন গোস্বামীর আগমন ঘটে। গ্রামের সবাই প্রাচীন মহাত্মা সনাতনের ভক্ত ও অনুরাগী। নানা কুশল প্রশ্নাদির পর নবীন বৈরাগীর কথাটি প্রকাশ হইয়া পড়ে। কৌতূহলী সনাতন তখনি বহির্গত হন তাঁহার খোঁজে।

দর্শন পাওয়া মাত্র শ্রীজীব লুটাইয়া পড়েন পিতৃব্যের চরণতলে, নিবেদন করেন তাঁহার দুর্ভাগ্যের কথা। স্নেহে করুণায় সনাতনের হৃদয় বিগলিত হইল, সান্ত্বনা দিলেন নানা ভাবে কিন্তু রূপের মনোভাব কি, সঠিকভাবে তাহা জানেন না। তাই তাঁহার সম্মতি না নিয়া শ্রীজীবকে নিজের সঙ্গে নিতে সাহসী হইলেন না।

বৃন্দাবনে আসার পর রূপের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইতেই সনাতন প্রশ্ন করিলেন, "তোমার ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর রচনা কতটা এগিয়েছে? সমাপ্ত হতে আর বিলম্ব কত?"

রূপ গোস্বামী উত্তর দিলেন, "কাজ তো অনেকটা অগ্রসর হয়েছে। এতদিন সমাপ্ত হয়ে যেতো যদি শ্রীজীব কাছে থাকতো, আর তার সাহায্য পেতাম। তাকে তো সেদিন হঠাৎ এ স্থান ত্যাগ করতে হয়েছে।"

"আমি সব শুনেছি। বনে ভ্রমণ করার সময় শ্রীজীবের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎও ঘটেছে। আহা! অনাহারে, অনিদ্রায় ও কঠোর তপস্যায় তার যা হাল হয়েছে, তার দিকে আর তাকানো যায় না। অতি শীর্ণ, অতি দুর্বল তার দেহ। দেখলাম, কোনো মতে প্রাণটুকু মাত্র রয়েছে।

সনাতনের অন্তরের কথা এবং তাঁর ইঙ্গিতের মর্ম রূপ বুঝিলেন। সনাতন শুধু তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাই নয়, তাঁহার গুরুস্থানীয়—তাঁহার হৃদয়ের দেবতা। তাই স্থির করিলেন, আর নয়, এবার শ্রীজীবকে ক্ষমা করিতে হইবে। প্রায়শ্চিত্ত তাহার ইতিমধ্যে অনেকটা হইয়াছে।

সেই দিনই পত্রী পাঠাইয়া শ্রীজীবকে ডাকাইয়া আনিলেন, সেদিনকার অপরাধটি তখনি মার্জনা করা হইল। গুরুর করুণা লাভ করিয়া শ্রীজীব যেন পুনর্জীবন প্রাপ্ত হইলেন।

এই ঘটনার মধ্য দিয়া সারা বৃন্দাবনের ভক্তসমাজে একটা ত্রাসের সঞ্চার হইয়াছিল এবার তাহা দূর হইল। সবাই হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন।

বৃন্দাবনে প্রভু শ্রীচৈতন্যের আদিষ্ট কর্ম উদ্‌যাপনে রূপ সনাতন নিজেদের জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। কাঙাল কান্থা করঙ্গিয়া এই দুই বৈরাগী পত্তন করিয়াছেন এক বিরাট ভক্তি সাম্রাজ্যের। বিশেষ করিয়া তাঁহারা চিহ্নিত হইয়াছেন প্রভু প্রচারিত ভক্তি-প্রেমধর্মের চিহ্নিত অধিনায়করূপে। তৎকালীন ভক্ত সমাজের অন্যতম মুখপাত্র কৃষ্ণদাস কবিরাজ এই দুই গোস্বামীর মূল্যায়ন করিতে গিয়া লিখিয়াছেন:

সনাতন কৃপায় পাইনু ভক্তির সিদ্ধান্ত।
শ্রীরূপ কৃপায় পাইনু রসভার প্রান্ত॥

প্রায় অর্ধশত বৎসরের বিপুল উদ্যম ও প্রয়াসের ফলে ভক্তিধর্ম ও রসতত্ত্বের বিরাট শাস্ত্র ভাণ্ডার রচিত হইয়াছে, গঠিত হইয়াছে নিগূঢ় সাধনার সিদ্ধিতে সমুজ্জ্বল সাধকগোষ্ঠী। সর্বাপেক্ষা আনন্দের কথা, এই শাস্ত্রভাণ্ডার এবং এই সাধকগোষ্ঠীর কুশলী ও প্রতিভাধর নেতারূপে ধীরে ধীরে অভ্যুদয় ঘটিতেছে শ্রীজীবের। রূপ গোস্বামী ও সনাতন গোস্বামী উভয়ে প্রাচীন হইয়াছেন, দীর্ঘদিনের কৃচ্ছ্র ও পরিশ্রমে স্বাস্থ্যও তাঁহাদের ভাঙিয়া পড়িতেছে। এবার তাই উন্মুখ হইয়া আছেন শেষের দিনটির জন্য।

অল্পকালের মধ্যে, আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথিতে বৃদ্ধ সনাতন গোস্বামী সবাইকে শোকসাগরে ভাসাইয়া দেহত্যাগ করিলেন। দেবপ্রতিম জ্যেষ্ঠভ্রাতা, শিক্ষাগুরু এবং রূপের জীবনের সর্বকর্মের উদ্যোক্তা ও নায়ক ছিলেন সনাতন গোস্বামী। তাই এই বিচ্ছেদ রূপের পক্ষে বড় মর্মান্তিক। কাঁদিয়া কাঁদিয়া সনাতনের শেষকৃত্য সমাপন করিলেন, সাড়ম্বরে ভাণ্ডারা অনুষ্ঠানও সমাপ্ত হইয়া গেল। তারপর রূপ গোস্বামী প্রবেশ করিলেন তাঁহার নিভৃত ভজনকুটিরে।

জীবনের অবশিষ্ট কয়েকটি মাস এই কুটির হইতে তাঁহাকে বাহির হইতে দেখা যায় নাই. ইষ্টধ্যানে ও ইষ্টনাম জপে নিরন্তর থাকিতেন তিনি অভিনিবিষ্ট

১৫৫৪ খ্রীষ্টাব্দের চিহ্নিত ক্ষণে মহাসাধকের চির বিদায়ের লগ্নটি আসিয়া যায়, প্রাণপ্রভু গোবিন্দদেবের শ্রীবিগ্রহের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া প্রবিষ্ট হন নিত্যলীলায়। ভারতের অধ্যাত্ম-আকাশ হইতে খসিয়া পড়ে প্রেমভক্তি সাধনার এক অত্যুজ্জ্বল নক্ষত্র।

তন্ত্রাচার্য শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব

উনবিংশ শতাব্দীর ভারতে ধর্ম-সংস্কৃতি, শিক্ষা ও রাষ্ট্রচিন্তায় এক নব জাগৃতির সূচনা হয়। এই জাগৃতির প্রধান উৎসটি সেদিন বিরাজিত ছিল বাংলাদেশে। পাশ্চাত্যের শিক্ষা ও ধ্যান ধারণায় তখন নব্যপন্থী বাঙালীর জীবন প্রভাবিত। শিক্ষিত মহলে আধুনিক বিচারবুদ্ধি, যুক্তিনিষ্ঠা ও বস্তুতান্ত্রিকতা দিন দিন প্রবল হইয়া উঠিতেছে। ধর্ম, সমাজ ও রাজনীতিতে শুরু হইয়াছে নূতন মূল্যায়ন। ইহাতে একদিকে সুফল যেমন ফলিয়াছে, কুফলও কম দেখা দেয় নাই। নব্যপন্থীদের বেশীর ভাগই উন্নাসিক ও উগ্রমতবাদী। ভারতের ধর্ম-সংস্কৃতির অনেক কিছুই তাঁহাদের মতে হেয় ও কুসংস্কাচ্ছন্ন, তাই অনেক কিছুই নস্যাৎ করিয়া দিতে তাঁহারা উৎসাহী হইয়া উঠিয়াছেন।

মানস সংকটের এই দুর্দিনে আবির্ভাব ঘটে সনাতন ধর্মের ধারক বাহক একদল শক্তিধর আচার্য ও সাধকের। শাশ্বত ভারতের প্রাণ-স্পন্দন তাঁহারা উৎকর্ণ হইয়া শুনিয়াছেন, দু'চোখ ভরিয়া দেখিয়াছেন তাঁহাদের ধ্যানের ভারতকে, আকণ্ঠ পুরিয়া পান করিয়াছেন প্রাচীন শাস্ত্র, সাধনা ও তত্ত্বজ্ঞানের সুধা। তারপর অবতীর্ণ হইয়াছেন ভারত-ধর্মের উজ্জীবন ও বিস্তার সাধনে। এই শক্তিধর আচার্য ও সাধকদের অন্যতম শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব।

শক্তি সাধনায় শিবচন্দ্র সিদ্ধ হন, তারপর তন্ত্রের পরম তত্ত্বের প্রচারে ব্রতী হইয়া তন্ত্রকুশল একদল সাধককে তিনি উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলেন। শিবচন্দ্র ও তাঁহার পূর্ণাভিষিক্ত শিষ্য স্যর জন উড্রফ, শুধু ভারতেই নয়, সারা বিশ্বে তন্ত্রশাস্ত্র ও তন্ত্রসাধনার যে বিজয়-কেতন উড়াইয়া গিয়াছেন, এদেশের ধর্ম-সংস্কৃতির ইতিহাস কোনোদিন তাহা বিস্মৃত হইবে না।

১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে, অবিভক্ত বাংলার নদীয়া জেলার কুমারখালিতে, শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব ভূমিষ্ঠ হন। গৌরী নদী বিধৌত এই গ্রামটিতে তখন ছিল বহু সম্পন্ন গৃহস্থ ও সাধু সজ্জনের বাস। নিকটবর্তী গ্রাম ভাঁড়ারায় থাকিয়া সাধনভজন করিতেন মরমিয়া সাধক লালন ফকির। ত্রিজটা সন্ন্যাসী, সনাতন গোস্বামী, মহাত্মা সোনাবঁধু, পাগল হরনাথ প্রভৃতি সিদ্ধ সাধকদের অধ্যুষিত ছিল এই অঞ্চল।

কুমারখালির ভট্টাচার্য বংশ চিরদিনই সাধনা ও শাস্ত্রচর্চার জন্য প্রসিদ্ধ। এই বংশেরই অতুজ্জ্বল রত্ন, তন্ত্রাচার্য শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব। পিতার নাম চন্দ্রকুমার তর্কবাগীশ। মাতা—চন্দ্রময়ী দেবী। পিতামহ কৃষ্ণসুন্দর ভট্টাচার্য ছিলেন একজন বিশিষ্ট তন্ত্রশাস্ত্রবিদ্, তান্ত্রিক ক্রিয়া অনুষ্ঠানেও তাঁহার দক্ষতা ছিল অসাধারণ।

এই ভট্টাচার্যদের আদিনিবাস ছিল ফরিদপুর জেলার কুমার-নদের তীরে মহিশালা গ্রামে। পরবর্তীকালে নদীয়ার কুমারখালিতে তাঁহারা বসবাস করিতে থাকেন। এ বংশের পিতৃপুরুষদের মধ্যে কামদেব, জয়দেব ও নিমানন্দ ভট্টাচার্যের তন্ত্রসাধনার খ্যাতি দীর্ঘদিন প্রচারিত ছিল।

শিবচন্দ্রের হাতেখড়ি হয় সাধক-সাহিত্যিক কাঙাল হরিনাথের কাছে। উত্তরকালেও শিবচন্দ্রের সাধনা ও সাহিত্যচর্চার উপর কাঙালের প্রভাব কিছুটা বিস্তারিত হয়।

পাঁচ বৎসর বয়সে বালককে স্থানীয় স্কুলে ভর্তি করিয়া দেওয়া হয়। এখানে জলধর সেন ছিলেন তাঁহার অন্যতম সহপাঠী।

কুমারখালি স্কুলে শিবচন্দ্র পড়াশুনা করিতেছেন, মেধাবী ছাত্র বলিয়া শিক্ষকদের প্রিয় হইয়াও উঠিয়াছেন, কিন্তু ইতিমধ্যে হঠাৎ সামান্য একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া তাঁহার জীবনের গতি পরিবর্তিত হইয়া গেল।

আজন্ম সুহৃদ্ জলধর সেন ইহার এক বিবরণ দিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন :

শিবচন্দ্রের পিতা, আমাদের চন্দ্রকাকা, অত্যন্ত তেজস্বী ব্রাহ্মণ ছিলেন। শিবচন্দ্র তখন চরিতাবলী পড়েন।

সেই সময় চন্দ্রকাকা একদিন শিবকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'ও কি পড়িস্‌রে শিব?'

শিবচন্দ্র বলিলেন,—'ডুবালের গল্প।'

'ডুবালের গল্প? দেখি,' এই বলে বইখানা হাতে নিয়ে চার পাঁচ লাইন পড়ে সেটি দূরে নিক্ষেপ করে, বললেন,—'এইসব বুঝি পড়া হয়?' দেশে আর মানুষ নেই, মহাপুরুষ নেই—পড়িস কিনা ডুবালের গল্প। যাঃ কাল থেকে আর তোকে স্কুলে যেতে হবে না। এই ডুবালেই দেখছি দেশটা ডুবালে।

তেজস্বী ব্রাহ্মণের যে কথা সেই কাজ। পরদিন থেকে শিবচন্দ্র আর স্কুলে গেলেন না।

ইংরেজী স্কুলে পড়াশুনা করা এবং তাহার প্রতিশ্রুতিময় সম্ভাবনা শেষ হইয়া গেল। অতঃপর পিতা শিবচন্দ্রকে নবদ্বীপের এক চতুষ্পাঠীতে পাঠাইয়া দেন এবং সেখানেই গড়িয়া উঠে শিবচন্দ্রের শাস্ত্র-সাধনার ভিত্তি।

ব্যাকরণ, কাব্য, অলংকার অল্পকালের মধ্যেই তিনি আয়ত্ত করিয়া ফেলেন। বিশেষ করিয়া এই কিশোর ছাত্রের সহজাত কবিত্বের খ্যাতি স্থানীয় পণ্ডিত মণ্ডলে ছড়াইয়া পড়ে।

নবদ্বীপের সারস্বত জীবন তখন ছিল চাঞ্চল্যময় এবং প্রাণবন্ত। দেশবিদেশ হইতে প্রতিভাধর ছাত্রেরা এখানকার টোলে শাস্ত্রপাঠ করিতে আসিতেন। এ সময়কার স্মৃতিচারণ করিতে গিয়া শিবচন্দ্র উত্তরকালে তাঁহার বাল্যকালের সহজাত কবিত্ব শক্তির এক মনোজ্ঞ বর্ণনা দিয়াছেন:

নবদ্বীপের হর ভট্টাচার্য মহাশয়ের বার্ষিক শ্রাদ্ধ তত্রত্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিতসমাজে একটা বিশেষ বার্ষিক ব্যাপার বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। এই ব্যাপার শীতকালে অনুষ্ঠিত হইত। পৌষ কি মাঘমাসে তাহা আমার মনে নাই, উক্ত শ্রাদ্ধে নবদ্বীপ ও তাহার প্রান্তবর্তী

গ্রাম-সমূহের অধ্যাপক ও ছাত্রসমাজ সাদরে নিমন্ত্রিত হইতেন; বলা অধিক যে ব্যাকরণ, সাহিত্য, স্মৃতি ও ন্যায়শাস্ত্রের সকল টোলেই মাসাবধি পূর্ব হইতে ছাত্রগণ তর্কবিচারে 'শান' দিতে আরম্ভ করিতেন। উহা যেন ছাত্র সমাজের একটা বার্ষিক পরীক্ষার সময়, কে কাহাকে পরাজয় করিয়া নিজে কৃতী হইবে সে জন্য সকলেই বিশেষ ব্যস্ত।

আমার সেরূপ ব্যস্ততার কোনো কারণ ছিল না। ব্যাকরণের ছাত্র আমি,—আমার বিচার আচার কিসের? অন্যান্য ছাত্রগণের সহিত আমিও সেদিন নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়াছিলাম। গিয়া দেখি বিশাল সভা প্রাঙ্গণে কোথাও ন্যায়ের, কোথাও স্মৃতির, কোথাও সাহিত্যের, কোথাও ব্যাকরণের ছাত্রগণের দলে দলে একেবারে বিচার বিতর্কের দাবানল জ্বলিয়া উঠিয়াছে। সাত আট শত ছাত্র, দুই শতের অধিক অধ্যাপক—নানা শাস্ত্রের ভাষাভেদে বিচারের স্থানটি বিষম কোলাহলে পরিপূর্ণ। কেবল অধ্যাপক মধ্যস্থগণই যাহা কিছু নিস্তব্ধ। চতুর্দিকে পাঁচশতেরও অধিক শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ ও ভদ্রগণ শ্রোতা দর্শকরূপে দণ্ডায়মান।

তখনও পাকা টোলের ছাত্রগণ আসিয়া উপস্থিত হন নাই। এই টোলের ছাত্রসংখ্যা তখন শতাধিক এবং সকল ছাত্রই মৈথিলী ব্রাহ্মণ। কবিতার পাদপূরণ করিতে পারিতাম বলিয়া আমার কিছুটা খ্যাতি ছিল। আমি উপস্থিত হইবা মাত্রই সভার কর্তৃপক্ষগণ একটি দৃশ্য পদার্থ স্বরূপে আমাকে বিশেষ আদর করিয়া তদানীন্তন অধ্যাপক সমাজের শীর্ষস্থানীয় হরমোহন তর্ক চূড়ামণি, প্রসন্নকুমার ন্যায়রত্ন, ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন প্রভৃতি অধ্যাপকগণ সভার মধ্যস্থলে যেখানে উপবিষ্ট ছিলেন আমাকে তাঁহাদের নিকট আনিয়া বসাইয়া দিলেন।

আমি যেমন গিয়া বসা, অমনই সমস্যা পূরণের তরঙ্গ উঠিল। অধ্যাপকগণ অনেকেই এক একটি প্রশ্ন করিলেন, তাহার সকল-গুলিরই উত্তর দিতে লাগিলাম। এই কৌতুক দেখিবার নিমিত্ত

তারিণীচরণ চট্টোপাধ্যায় (ভারতবর্ষের ইতিহাস প্রণেতা ও সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যাপক) আনন্দবাবু প্রভৃতি তখনকার গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ আসিয়া আমাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইলেন।

এই সময় দেখিলাম—পাকা টোলের ছাত্রমণ্ডলী সেই সভায় আসিতেছেন। সে এক অদ্ভুত অপরূপ দৃশ্য। সকলেই হিন্দুস্থানী বস্ত্র পরিহিত, গলে রুদ্রাক্ষমালা, কপালে রক্তচন্দনের তিলক ত্রিপুণ্ড্র, মস্তকের শিখায় এক একটি জবাপুষ্প; অধিকাংশই সুদীর্ঘ মূর্তি এবং গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ—হন্ হন্ করিয়া দ্রুতপদে বিচারোন্মুখ স্ফুরিত ওষ্ঠাধরে তাঁহাদের সেই সভা প্রবেশ মনে করিলেও এক অপূর্ব দৈব দৃশ্য বলিয়াই বোধ হয়। যাহা হউক, তাঁহারা সভার মধ্যস্থলে আসিয়া মণ্ডলাকারে বসিলেন।

বিচারের চেষ্টা হইতেছিল কিন্তু সম্মুখেই আমার পাদপূরণের ঘটাঘট্ট এবং সুখ্যাতির গৌরবটা যেন তাঁহাদের কিছু অসহ্য বোধ হইল। তাঁহারা বিচারের দিক হইতে আমার দিকেই দৃষ্টি প্রসারণ করিলেন এবং হরমোহন তর্কচূড়ামণি মহাশয়কে বলিলেন, "আমরা একবার ইহার পরীক্ষা করিব। আমাদের প্রদত্ত সমস্যা যদি পূরণ করিতে পারে, তবেই ইহাকে কবি বলিয়া স্বীকার করিব, অন্যথায় নহে।"

এতদিন পর্যন্ত কখনও সমস্যা পূরণে আমার কোনো রূপ ভয়, বিভীষিকা বা আতঙ্ক উপস্থিত হয় নাই। কিন্তু আজ এই সকল মৈথিলী ছাত্রগণের এই ভীম ভৈরব মূর্তি আর ন্যায়শাস্ত্রের প্রখর বিদ্যার স্ফূর্তি, এই দুই দেখিয়া আমার মনে ভয়ের উদয় হইয়াছিল।

তাঁহারা ত্বরিত পদে আমার নিকট আসিয়া আকৃষ্ট মুষ্টি প্রসারণ পূর্বক সদম্ভে প্রশ্ন করিলেন, "সূচ্যগ্রে ষট্কূপং তদুপরি নগরী, তত্র গঙ্গা প্রবাহ।" অর্থাৎ একটি সূচের অগ্রভাগে ছয়টি কূপ, তাহার উপর এক নগরী, তাহাতে গঙ্গাপ্রবাহ।

শুনিয়া তো আমার চক্ষুস্থির। এ পর্যন্ত পাদপূরণের সময়ে

কখনও বিশেষ সময় লইয়া কোনোদিন কিছু চিন্তা করি নাই, প্রশ্ন শুনিবামাত্র তাহার উত্তর যখন যাহা মনে আসিয়াছে তখন তাহাই দিয়াছি, কিন্তু আজিকার প্রশ্নে সে চিন্তার আবশ্যক হইল বলিয়া লজ্জায় ভয়ে আড়ষ্ট হইলাম।

একটু চিন্তার পর আমার উত্তরের উপক্রম দেখিয়া পাণ্ডিত্য, এবং চাতুর্যের চূড়ামণি হরমোহন তর্কচূড়ামণি মহাশয় তখন আমাকে সাবধানতার ইঙ্গিতপূর্বক কহিলেন, "মুখে উত্তর করিও না, কাগজে লিখিতে হইবে।" ইহা বলিয়া দোয়াত কলম কাগজ আমার কাছে সরাইয়া দিলেন।

আমি একবার ঊর্ধ্বে দৃষ্টিপাত করিয়া সর্বান্তঃকরণে জগদম্বাকে স্মরণ করিয়া কবিতা লিখিলাম। আমার লেখা শেষ হইলে, চূড়ামণি মহাশয় আমার হাত হইতে কাগজখানি লইয়া শ্লোকটি মনে মনে পড়িয়া দেখিলেন, দেখিয়া তখন উহা মুষ্টিবদ্ধ করিয়া তারিণীচরণ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত যাবতীয় ভদ্রগণকে ডাকিয়া বলিলেন, "আপনাদিগকে একবার ইহার মধ্যস্থ হইতে হইবে। মৈথিল সমাজের সহিত নবদ্বীপ সমাজের চিরকাল বিদ্যার স্পর্ধা, তজ্জন্য আমি বলিতেছি, আজ মৈথিলী ছাত্র সমাজ এই বালকের প্রতি যে ভয়ঙ্কর কূট সমস্যার কঠোর বজ্র নিক্ষেপ করিয়াছেন, তাহা আপনারা স্বচক্ষে দেখিলেন, স্বকর্ণে শুনিলেন। এখন বঙ্গীয় বালকের দ্বারা এই মৈথিলী অধ্যাপকগণের কূট সমস্যার উত্তর যাহা হইল তাহা এই কাগজে লেখা আমার হাতে। আগে আমি উহা পড়িতে দিব না। ইঁহারা যে শ্লোকের এক চরণে আজিকার এই প্রশ্ন করিয়াছেন অবশ্য তাহার আরও তিন চরণ আছে—ইহা ধ্রুব নিশ্চিত। উঁহাদের দেশে এই সমস্যার উত্তরে সেই তিন চরণে কি লেখা আছে, তাহা না দেখিয়া না শুনিয়া আমরা আমাদের উত্তর উঁহাদিগকে দেখিতে দিব না। সেই তিন চরণ কি, অগ্রে আমাদিগকে বলুন।"

তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের কূট কৌশলে বাধ্য হইয়া তাঁহাদিগকে

উহা বলিতে হইল, তুই কবিতার সমালোচনার জন্য উহাও কাগজে লিখিয়া লইলেন। সেই তিন চরণের ভাব মাত্র আমার মনে আছে —অর্থাৎ চন্দ্র সূর্যের যদি গতি স্তব্ধ, জলে যদি অগ্নি জ্বলে, পর্বতের শিখরে যদি পদ্ম প্রস্ফুটিত হয়, তবেই এরূপ প্রশ্ন হয়।

তাঁহাদের সেই শ্লোকের ব্যাখ্যা সাধারণকে বুঝাইয়া দিয়া চূড়ামণি মহাশয় তখন আমার সমস্যা পূরণের শ্লোকটি আমাকে পাঠ করিতে বলিলেন। আমি উহা পড়িলাম এবং উহার অর্থও সাধারণকে বুঝাইয়া দিলাম। শ্লোকটির কিছুমাত্র এখন মনে নাই, তবে যাহা মনে আছে তাহা এই—মনুষ্য জীবনের অতি সূক্ষ্মাগ্র মনই সুতীব্র সূচ্যগ্রস্বরূপ, তাহারই উপরিভাগে ছয়টি কূপ—কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য; তদুপরি নগরী এই বিশাল সংসার, তন্মধ্যে গঙ্গা প্রবাহ—ইহলোক পরলোকে নিরন্তর যাতায়াত।

ইহা শুনিয়া মৈথিলীগণ নিজেরাই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিলেন, "আমাদের যাহা শ্লোক আছে, এ শ্লোকের নিকট তাহা সমস্যাপূরণ বলিয়াই গণ্য নহে।"

তখন তর্কচূড়ামণি মহাশয়ও বলিতে লাগিলেন, "তবে বন্ধু, তোমাদের দেশের প্রসিদ্ধ, প্রবীণ ও প্রাচীন অধ্যাপকগণ দ্বারা যাহা হয় নাই, আমাদের বঙ্গদেশের দশ এগার বৎসরের বালকের দ্বারা তাহা সম্পন্ন হইল। ইহাও জানিয়া রাখিবে, এই বালক আমাদের নবদ্বীপ সমাজের গৌরব পতাকা।"

মৈথিলীগণ সানন্দে তাঁহার সে কথা স্বীকার করিয়া সহাস্য বদনে আমাকে যথেষ্ট আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন, "বালক আজ শুধু কবি নয়, 'কবিরত্ন' বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়া বাঙালার—বিশেষত নবদ্বীপ পণ্ডিতসমাজের মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন।

এ সভাতেই বালককালে সর্বসম্মতিক্রমে আমার কবিরত্ন উপাধি লাভ হইল[১]।

১ বীরাচারী তন্ত্রসাধক শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব: বসন্তকুমার পাল, হিমাদ্রি পত্রিকা ২৯শে পৌষ, ১৩৭২

সংকোচবশত নবদ্বীপের প্রবীণ পণ্ডিতদের প্রদত্ত এই উপাধি কিন্তু শিবচন্দ্র জীবনে কখনো ব্যবহার করেন নাই।

শিবচন্দ্রের মেধা ও প্রতিভা দেখিয়া এ সময়ে যে সব অধ্যাপক বিস্মিত হন তাঁহাদের মধ্যে দু'একজন প্রস্তাব করেন, শিবচন্দ্রকে সংস্কৃত কলেজে পড়ানো হোক। কিন্তু শিবচন্দ্রের রক্ষণশীল পিতা ও পিতামহের সম্মতি মিলিল না, কারণ সেখানেও ইংরেজীর ছোঁয়াচ রহিয়াছে। নবদ্বীপের টোলেই উচ্চতর পাঠ তিনি সমাপ্ত করিলেন। পারঙ্গম হইয়া উঠিলেন ব্যাকরণ, সাহিত্য, স্মৃতি ও দর্শনশাস্ত্রে।

সংস্কৃত টোলের অধ্যয়ন শেষে শিবচন্দ্র কলিকাতায় গিয়া বিদ্যাসাগর উপাধি পরীক্ষা দেন, এই পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণও হন। কিন্তু এই বিদ্যাসাগর উপাধি গ্রহণেও তাঁহাকে সে সময়ে রাজী করানো যায় নাই।

তিনি দৃঢ়স্বরে সাইকে বলেন, "ভেবে দেখলাম, আমার গুরু-স্থানীয় জীবনানন্দ বিদ্যাসাগর মহাশয় বেঁচে থাকতে 'বিদ্যাসাগর' উপাধি ব্যবহার করা আমার পক্ষে সমীচীন হবে না। এতে তাঁর অসম্মান করা হবে। কাজেই এ উপাধি আমি বর্জন করছি।"

সমবেত পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁহার এ কথা শুনিয়া মহা সমস্যায় পড়িলেন। অতঃপর অনেক কিছু ভাবিয়া চিন্তিয়া তাঁহারা শিবচন্দ্রকে ভূষিত করিলেন বিদ্যার্ণব উপাধিতে। উত্তরকালে এই উপাধি দ্বারাই জনসমাজে তিনি পরিচিত হইয়া উঠেন।

পরীক্ষা, উপাধি, এসব সম্পর্কে তরুণ শিবচন্দ্রের আর যেন তেমন উৎসাহ নাই। বরং এই বয়সেই অধ্যাত্মজীবনের আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিয়াছে তাঁহার অন্তরে। জন্মান্তরের শুভ সংস্কার নিয়া জন্মিয়াছেন, তদুপরি রহিয়াছে পিতা ও পিতামহের শাস্ত্রজ্ঞান ও সাধনার বীজ। বংশের বৈশিষ্ট্য হইতেছে তান্ত্রিক সাধনা—এই সাধনার দিকেই তিনি নিয়ত আকৃষ্ট হইতেছেন। জগজ্জননী তারা-মায়ের অমোঘ আহ্বান হৃদয়ে দোলা দিতেছে বার বার।

'বিদ্যাসাগর' উপাধি ত্যাগের সময় শিবচন্দ্র তাঁহার তারা-মায়ের

উদ্দেশ্যে একটি কবিতা লিখেন। তরুণ বিদ্যার্থী কিভাবে অধ্যাত্ম-জীবনের পথে এ সময়ে মোড় নিতেছেন, এই ভাবময় কবিতাটিতে তাহার চিহ্ন পরিস্ফুট :

ভাইরে! আর কি কর বিদ্যার সাধন
মহাবিদ্যা মাকে ভুলে ?
যাত্রা কর সেই পরীক্ষায় তারানামের
নিশান তুলে ॥
তারা বিদ্যা, তারা শিক্ষা, তারা বিশ্ববিদ্যালয়।
শাস্ত্র তারা, ছাত্র তারা, স্বয়ং গুরু তারাময় ॥
যত দেখ দর্শন শাস্ত্র (ওরে) তারার দর্শন
কিছুতেই নয়।
ওরে, সব অদর্শন, যদি আমার তারা মায়ের
দর্শন না হয় ॥
তারা পদাম্বুজ প্রান্তে যারা করে তারা লয়।
এই তারাতেই তারা দেখে যায়রে
তারা তার আলয় ॥
তারা মায়ের মায়া বলব কি ভাই!
হ'লে পরে মহা প্রলয়।
শব হয় এসব, তবু সে সব—ভাইরে
মা মোর কোলে লয় ॥
ভাই—এ সময় ভাই! সময় থাকতে বল
—জয় জয় তারার জয়।
যে বলে সেই তারার জয় জয়, সেই
করে সেই তারার জয় ॥
তাই—তারা হয়েও তারার জয় নাই,
কেবল তারার ছেলের জয়।
অধিকন্তু, তারার জয়ে—তারা হয় রে
মৃত্যুঞ্জয়।

অধ্যাত্ম-জীবন গঠনের স্পৃহা ক্রমেই বাড়িয়া উঠিতেছে। তাই শিবচন্দ্র এবার অধ্যাত্ম-ভারতের মর্মকেন্দ্র কাশীতে গিয়া উপস্থিত হন। শাস্ত্র পাঠ, ধর্মদর্শনের আলোচনা ও সাধনভজন সব কিছুরই সুযোগ-সুবিধা এখানে রহিয়াছে। শিবচন্দ্র এই সুযোগ সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করার জন্য তৎপর হইয়া উঠেন। প্রসিদ্ধ বেদান্তী, শতাধিক বর্ষীয় আচার্য, রামরাম স্বামীর নিকট এ সময়ে তিনি বেদান্তের পাঠ নিতে থাকেন।

আগম নিগমের রহস্যবেত্তাও কাশীধামে কয়েকজন আছেন। ইঁহাদের পদপ্রান্তে বসিয়া তন্ত্রশাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্ব শিক্ষা করিতে শিবচন্দ্র সচেষ্ট হন।

অসামান্য মেধা ও প্রতিভা নিয়া তিনি জন্মিয়াছেন। তাই অল্প সময়ের মধ্যে ষড়দর্শনের মর্ম এবং সাধনভজনের বিভিন্ন পন্থা সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করিতে তাঁহাকে দেখা যায়।

কাশী হইতে ফিরিয়া আসিয়া শিবচন্দ্র নিজ জীবনের লক্ষ্য এবং আদর্শ স্থির করেন। তন্ত্রতত্ত্ব ও তন্ত্র সাধনায় পারঙ্গম হইবার জন্য হন কৃতসংকল্প।

পিতামহ কৃষ্ণসুন্দর ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ তান্ত্রিক। তন্ত্রশাস্ত্র ও তান্ত্রিক ক্রিয়ায় তাঁহার পারদর্শিতার কথা সারা নদীয়া জেলায় পরিব্যাপ্ত। শিবচন্দ্র তাঁহারই নিকট হইতে তন্ত্রসাধনার পাঠ নেওয়া স্থির করিলেন।

কৃষ্ণসুন্দর আনন্দে উল্লসিত হইয়া উঠেন, বলেন, "শিব, তুমি যে আমাদের বংশের ঐতিহ্য অনুযায়ী শক্তিসাধনায় রত হতে চাও, তন্ত্রতত্ত্ব আয়ত্ত করতে চাও, এ অতি উত্তম কথা। জানতো, আমাদের বংশেই জন্মেছেন তন্ত্রসিদ্ধ মহাপুরুষ কামদেব, জয়দেব, নিমানন্দ প্রভৃতি। এদের শক্তি বিভূতির কথা আজো মধ্য বাংলার সাধক ও পণ্ডিতেরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে থাকেন। এই সব সিদ্ধ-পুরুষদের ধারা তোমার ভেতর দিয়ে বয়ে চলুক, এই তো আমি চাই। কিন্তু এজন্য তোমাকে চলতে হবে একটা সুনির্দিষ্ট পথ অনুসরণ ক'রে।"

শিবচন্দ্র উত্তরে বলেন, "কি করতে হবে, আজ্ঞা করুন। শক্তি আরাধনার জন্য আমি বদ্ধপরিকর। আরও স্থির করেছি, তন্ত্র সাধনা সম্বন্ধে লোকের মনে, বিশেষ ক'রে এ যুগের শিক্ষিত মানুষের মনে, যে ভুল ধারণা আছে তা দূরীভূত করবো।

"এজন্য তো প্রস্তুতি চাই, ভাই।"

"আপনি আমায় নির্দেশ দিন কি করতে হবে, এজন্য জীবন দিতেও আমি কুণ্ঠিত হবো না।"

"দুটো কাজ তোমায় করতে হবে। তুমি আনুষ্ঠানিক দীক্ষা গ্রহণ করো, তন্ত্রাভিষেক গ্রহণ করো এবং তন্ত্রোক্ত ক্রিয়া সম্যক্‌ভাবে আয়ত্ত করো। এই সঙ্গে তন্ত্রের প্রকৃত শাস্ত্রতত্ত্ব ও গূঢ় রহস্যের সঙ্গে পরিচিত হয়ে ওঠো।"

"এ সম্পর্কে আপনি যা করতে বলবেন, যেখানে যেতে বলবেন, আমি সেজন্য প্রস্তুত।"

"কোথাও তোমায় যেতে হবে না। আমাদের এই গৃহেই রয়েছে প্রাচীন তন্ত্রশাস্ত্রের বহুতর প্রাচীন পুঁথি। পিতৃপুরুষেরা এগুলো বহুকাল ধরে সংগ্রহ ক'রে আসছেন বাংলার প্রাচীন তন্ত্রাচার্যদের কাছ থেকে। নেপাল ও তিব্বত থেকেও আনীত হয়েছে তালপত্রে ভূর্জপত্রে লেখা কিছুসংখ্যক মূল্যবান পুঁথি। এগুলো তুমি আমার কাছে বসে অধ্যয়ন করো। শক্তি সাধনার শাস্ত্রীয় ভিত্তি দৃঢ় ক'রে তোল। আমি আশীর্বাদ করছি, অচিরে তুমি তন্ত্রসিদ্ধ হও, পরিণত হও তন্ত্রের বিশিষ্ট আচার্যরূপে।"

অভিজ্ঞ ও প্রবীণ তান্ত্রিক বলিয়া পিতামহ কৃষ্ণসুন্দরের সুনাম ছিল। শিবচন্দ্র অবিলম্বে তাঁহার নিকট হইতে গ্রহণ করিলেন শাক্তী দীক্ষা। এই সঙ্গে শুরু করিলেন আগম নিগম শাস্ত্রের চর্চা। প্রাচীন ও দুর্লভ যে সব পুঁথি গৃহে সযত্নে সঞ্চিত ছিল, এবার সেগুলি তিনি যত্ন সহকারে পাঠ করিতে থাকেন। ফলে তন্ত্রের শাস্ত্রীয় ভিত্তিটি তাঁহার জীবনে দৃঢ়তর হইয়া উঠে। শুধু তাহাই নয়, কয়েক বৎসরের মধ্যে কৌল সাধন ও কৌল শাস্ত্রের প্রকৃত স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে তিনি সফলকাম হন।

এই সময় ভেড়ামারা গ্রামের চিন্তামণি দেবীর সহিত শিবচন্দ্রের বিবাহ হয়। কিন্তু এই পত্নী বেশী দিন জীবিত থাকেন নাই, একটি শিশু কন্যা রাখিয়া তিনি লোকান্তরে চলিয়া যান। পরবর্তীকালে পিতা চন্দ্রকুমারের আগ্রহে ও নির্দেশে আবার শিবচন্দ্রকে গার্হস্থ্য জীবনে প্রবেশ করিতে হয়। ঐ স্ত্রী ছিলেন কুমারখালি গ্রামের কন্যা, নাম—মনমোহিনী দেবী।

আজীবন ঘর সংসারে অবস্থিত রহিয়াছেন শিবচন্দ্র, দেশের মানুষ ও সমাজকে ভারতের আত্মিক-জীবনের প্রেরণায় করিয়াছেন উদ্বোধিত, আর তন্ত্রতত্ত্বের প্রচারে করিয়াছেন আত্মনিয়োগ। কিন্তু তাঁহার সমস্ত কিছু অস্তিত্ব, সমস্ত কিছু কর্মোদ্যমের অন্তরালে সদা-বিরাজিত রহিয়াছেন তাঁহার ইষ্টদেবী সর্বমঙ্গলা মা। এই মায়ের কৃপায় ও মায়ের সাধনায় তাঁহার জীবন হইয়াছে দিব্য আনন্দ ও চৈতন্যে ভরপুর। উত্তর জীবনে এক তন্ত্রসিদ্ধ মহাপুরুষরূপে ঘটিয়াছে তাঁহার অভ্যুদয়।

তরুণ বয়সেই আপন জীবনের আদর্শ ও লক্ষ্য শিবচন্দ্র স্থির করিয়া ফেলেন। তন্ত্রসাধনায় সিদ্ধকাম হইবেন এবং তন্ত্রশাস্ত্রের প্রকৃত স্বরূপ ও মাহাত্ম্য সর্বত্র প্রচার করিবেন—এই সংকল্পটি তাঁহার মনে ধীরে ধীরে দানা বাঁধিয়া উঠে।

জন্মগত সংস্কারের প্রভাবে শিবচন্দ্র স্বভাবতই মাতৃসাধনায় উদ্বুদ্ধ। ভট্টাচার্য বংশের পুরাতন তান্ত্রিক ঐতিহ্য এবং নিগমানন্দ প্রভৃতি সিদ্ধ কৌলদের কাহিনী বাল্যকাল হইতে দৃঢ়মূল হইয়া বসিয়া গিয়াছে তাঁহার অন্তরে। এবার তাঁহাদেরই অনুসৃত সাধনপন্থা তিনি গ্রহণ করিলেন একনিষ্ঠভাবে।

এই তন্ত্র সাধনা শুরু করার কয়েক বৎসরের মধ্যেই সিদ্ধিলাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠেন শিবচন্দ্র। শিবধাম বারাণসীতে বেদান্তী যোগী তান্ত্রিক বৈষ্ণব সকল সাধকেরই আনাগোনা। প্রকাশ্যে এবং প্রচ্ছন্ন-ভাবে মাঝে মাঝে প্রাচীন ও শক্তিধর তন্ত্রসাধকেরা এখানে আসিয়া

অবস্থান করেন। উচ্চকোটি সাধক মহলে প্রায়ই ব্যাকুলভাবে খোঁজাখুঁজি করেন শিবচন্দ্র। ইঁহাদের আস্তানা বাহির করিয়া, ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে বাস করেন, শিক্ষা করেন সাধনার নানা নিগূঢ় পদ্ধতি।

শিবচন্দ্রের প্রধান শিষ্য এবং দীর্ঘ দিনের সহচর দানবারি গঙ্গোপাধ্যায় বলিয়াছেন, "কাশীধামে থাকার কালে একবার দেখা যায়—জটাজুট সমন্বিত, রক্তচক্ষু, এক অতি প্রাচীন তান্ত্রিক মহাত্মার পিছনে পিছনে শিবচন্দ্র ঘোরাফেরা করিতেছেন। এ সময়ে মণিকর্ণিকার শ্মশানে অমাবস্যার নিশীথ রাত্রে কয়েকটি নিগূঢ় ক্রিয়াও এ সময়ে ঐ মহাত্মার সাহায্য নিয়া অনুষ্ঠান করেন। নিজের দৃঢ় সংকল্প, দুর্জয় সাহস ও একনিষ্ঠার ফলে শিবচন্দ্র মহাত্মাটির বিশেষ কৃপা লাভ করেন এবং তন্ত্রসাধনার কয়েকটি সিদ্ধি তাঁহার করায়ত্ত হয়।

অতঃপর কাশী হইতে শিবচন্দ্র স্বগ্রাম কুমারখালিতে ফিরিয়া আসেন। এখন হইতে জগন্মাতার দর্শনের জন্য তিনি অধীর হইয়া উঠেন, মত্ত হন প্রচণ্ড সাধন সমরে। দেখি, ছেলে হারে কি মা হারে—এই ভাব। সারা দিন রাতের অধিকাংশ সময় কাটিয়া যায় মাতৃপূজায় আর মাতৃধ্যানে। আর অমাবস্যার নিশি আসিলেই, গভীর রাত্রের সূচীভেদ্য অন্ধকারের মধ্যে উপবেশন করেন গ্রামের উপান্তে মহাশ্মশানে। চারিদিকে কঙ্কাল করোটির ছড়াছড়ি, আর মাঝে মাঝে দুই একটি চিতার আগুনে দগ্ধ হইতেছে শবদেহ।

তন্ত্রোক্ত সাধন-উপচার সঙ্গে নিয়া শিবচন্দ্র শ্মশানে বসিয়া সমাপ্ত করেন তাঁহার নিগূঢ় ক্রিয়া অনুষ্ঠান। 'তারা তারা' শব্দে উত্থিত হয় তাঁহার ভীমভৈরব আরাব। তারপর স্বরচিত সাধন সংগীতের মধ্য দিয়া শুরু হয় তাঁহার প্রাণের আকুতি। ইষ্টদেবীর চরণে সিদ্ধির সংকল্প নিবেদন করেন বার বার :

স্বয়ম্ভু-শয়নে নিদ্রা পরিহরি,—
ষড়দলে সুষুম্না পথ ভেদ করি,
জাগো জাগো, মহা-যোগ যোগেশ্বরী,
সে যোগ সংযোগে জা-গো।

ঢুলু ঢুলু আঁখি উন্মীলন করি,
চাহগো চিন্ময়ি! নিদ্রা পরিহরি,
ব'স দিগম্বর-হৃদে দিগম্বরী,
ঘুচাও মা বিরাগ ॥
নব অনুরাগে মাত মাতঙ্গিনি!
মহাকাল-হৃদে কাল কাদম্বিনী
দোল দোল দিগম্বর নিতম্বিনি;
পুরাও যে সোহাগ।
সোহাগের ভরে সাদরে অধরে,
ধর কাদম্বিনী করাম্বুজ পরে,
মাতি শিবানন্দে, মাতাও শিবচন্দ্রে
(দাও) স্বধাম-সমাধি যোগ।
কুল মন্ত্রময়ি! কুল তন্ত্র মাঝে
কুল কুণ্ডলিনি! কুলযন্ত্র বাজে
সে কুল-কুণ্ডলে, এলোকেশী সাজে
একবার সাজগো।
লয়ে কুল-নাথে কুল সমী কুলে
কুল যজ্ঞে পূর্ণাহুতি দাও মা! কুলে
সে আহুতি তরে ও যন্ত্র কুহরে।
জানত মা! আজ জা-গো।

অনন্ত কোটি বিশ্বের মহাবিস্তারে, অনাদ্যন্ত এ সৃষ্টিতে শিবচন্দ্রের আরাধ্যা জননী মহাকালীর লীলা বিস্তারিত। ব্রহ্মানন্দের লহরী লীলায় নিরন্তর চলে তাঁহার লীলাবিলাস। এ লীলা বৈচিত্র্যের বর্ণনা দিয়াছেন শিবচন্দ্র অন্তরের ভাব গদ্‌গদ ভাষায়। শুধু ভাবের ঐশ্বর্য নয়, বাংলা গদ্যের নিটোল মাধুর্য ও বলিষ্ঠতার প্রকাশ দেখি তাঁহার এই বর্ণনায়:

"আমরি মরি মরি! কি মধুর ভৈরব নিস্তব্ধতা! আর কিন্তু

অনন্তশান্তি প্রস্রবণ! আনন্দময়ী মায়ের আমার ব্রহ্মানন্দ লহরী যেন কৈবল্যধাম হতে নিষ্যন্দিত হয়ে এই ধরাধাম বিপ্লবিত করেছে। আমরি! আমরি! অমাবস্যার মহানিশার এই নবনীরদ নিবিড় নীল সৌন্দর্য সাগরে পূর্ণিমার পূর্ণেন্দু চন্দ্রিকা কি আজ জলবুদ্‌বুদ বিন্দু বলিয়া বোধ হয় না? ঊর্ধ্বে এই অনন্ত আকাশ, নিম্নে এই বিশাল বিস্তীর্ণ ধরিত্রীমণ্ডল—ইহারই আবার মধ্যস্তরে কখন শূন্য, কখন পূর্ণ, কখন বায়ু, কখন অগ্নি, কখন মেঘ, কখনও বিদ্যুৎ, কখন বৃষ্টি, কখন রশ্মি—কত রঙ্গে কত তরঙ্গ কতবার আসছে, কতবার যাচ্ছে, কার সাধ্য তাহার ইয়ত্তা করে?

"শুধুই কি এই? এর মধ্যে আবার কত চন্দ্র সূর্য কত গ্রহপুঞ্জ নক্ষত্রলোক স্তরে স্তরে সুসজ্জিত। জ্যোতিষ্কমণ্ডলের এই সমুজ্জ্বল জ্যোতিঃপুঞ্জ এক জ্বলছে আর নিভ্‌ছে, যেন সুবর্ণময় কুসুমস্তবক খচিত প্রসারিত নীলাম্বরের উদ্দীপ্ত অঞ্চল বায়ুবেগে একবার উড়ছে, একবার পড়ছে—আর সেই সঙ্গে সঙ্গে এই চন্দ্র সূর্য এবং গ্রহ নক্ষত্র জ্যোতিষ্কদামও যেন অয়ন ঋতু তিথি ভেদে এক একবার জ্বলে উঠছে, অঞ্চলের পরিবর্তনে আবার যেন নিভে যাচ্ছে। কখন দিন, কখন রাত্রি, কখন সন্ধ্যা, কখন বা মধ্যাহ্ন। কখন শীত, কখন গ্রীষ্ম, কখন শরৎ, কখন বসন্ত, কখন পূর্ণিমা, কখন অমাবস্যা, কত নিত্য নব পরিবর্তন এ অঞ্চলে একবার উঠছে একবার পড়ছে—অথচ লোকে দেখছে—আকাশ কেবল শূন্য শূন্য বই আর কিছুই নয়। এমন অসীম পূর্ণতা কি আর কোথাও সম্ভবে?

"এই অসীম অনন্ত আকাশের নামই অম্বর—অসম্বর স্বরূপিণী দিগম্বরী মা আমার এই অম্বরে গা ঢাকা দিয়েছেন। পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতনী যাকে নিজের আবরণ করেছেন, সে যদি শূন্য হয় তবে আর পূর্ণ কার নাম? ঊর্ধ্বে দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া বলি তা'ত হল—আবরণ বলেই কি এমন ক'রে গা ঢাকা দিতে হয় যে স্বর্গ, মর্ত, রসাতল, আকাশ পাতাল—কোথাও আর খুঁজে সন্ধান পাবার উপায় নাই। তুমি গা ঢাকাই দাও আর যাই করো, ও অসম্বর স্বপ্রকাশ স্বরূপ

তোমার অম্বরে কি গা ঢাকে মা? আমার কিন্তু দেখে বোধ হয়, খেলার ঘোরে উন্মাদিনী বালিকা যখন আপন ভাবে আপনি আত্মহারা হ'য়ে বসনভূষণ দূরে ফেলে খেলতে খেলতে এক দিগন্ত হতে অন্য দিগন্তে ছুটে পালায়, তেমনি কি জানি কি খেলার ঘোরে, আপন ভাবে বিভোর হ'য়ে, মা তুই তোর এই দিগম্বর ছুঁড়ে ফেলে উন্মাদিনী উলঙ্গিনী সেজে যেন কোন নিভৃত দিগন্তে গিয়ে কোথায় আবার কি খেলা খেলছিস্। তাই তোর অভাবে তোর বসন এই পূর্ণ আকাশও আজ শূন্য হয়ে পড়ে আছে, অম্বরের অঞ্চলে এই স্তরে স্তরে কত চন্দ্র সূর্য গ্রহ নক্ষত্র প্রকৃতির সোহাগের হিল্লোলে ও অভিমানে ধূলায় পড়ে গড়াগড়ি দিচ্ছে।"

বড় ভয়ঙ্করা, বড় মধুরা, বড় স্নেহময়ী শিবচন্দ্রের এই ইষ্টদেবী। এই দেবীকে সাধনসমরে পরাভূত করিতে হইবে, সাধক শিবচন্দ্রের হৃদয়সাগরে ঘটাইতে হইবে তাঁহার জ্যোতির্ময় পূর্ণ প্রকাশ:

কে রে, শ্যামা ত্রিভঙ্গিনী।
অলস আবেশে খল খল হাসে,
একাকিনী তবু সমর রঙ্গিণী।
প্রেমে টলমল অরুণ কমল,
মদে ঢল ঢল ত্রিনয়নী।
গলিত বসনে, দলিত রসনে
মধুর হাসনে মনোমোহিনী।
মুক্ত মহাকাশে, নৃত্য তালে তালে,
নিত্য লীলাময়ী উন্মাদিনী।
শিবচন্দ্র হৃদি—আনন্দ জলধি
তরল তরঙ্গে চন্দ্রাননী।

"নাচ মা মোর এলোকেশী"—ভাবের ঘোরে এই গান প্রায়ই গাহিয়া উঠিতেন শিববন্দ্র। হৃদয়াকাশের অন্তহীন গহ্বর, আর বিশ্ব

সৃষ্টির আদি অন্তহীন মহাবিস্তার, এই দুইয়েতেই রহিয়াছে পরাশক্তি জগজ্জননীর এলোকেশ বিস্তারিত। সর্বত্রই শিবচন্দ্র দর্শন করেন, মহামায়ার মায়া। আদরের সন্তান তাঁহার ভাবরসে আপ্লুত হইয়া মাকে এই মায়া প্রসঙ্গে যাহা বলিয়াছেন, অধ্যাত্ম-সাহিত্যে তাহার তুলনা খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। তিনি বলিয়াছেন :

"মা, তুমি মায়া বিজয়িনী কিন্তু মায়া বিধ্বংসিনী নও, যেহেতু তুমি মা, ত্রিলোকলোচনের আলোকরূপিণী, মায়া তোমার নিবিড় অন্ধকারময়ী তমঃ শক্তি, আঁধার আলোকের শরণাগত, তাই মায়া তোমার চরণাশ্রিতা, ভাব দেখিয়া আমার বোধ হয়, মা! এই মায়াই তোমার আলুলায়িত কেশপাশ, তাই নিত্য-লীলায় নিত্যধামে, তোমার ঐ নিত্য মূর্তির উপাদান কুঞ্চিত কেশকলাপরূপে অনিত্য জগৎ প্রসবিত্রী মায়াকেও তুমি স্থান দিয়াছ, মায়া তোমারি ইচ্ছায় উৎপন্না, তোমারই অবলম্বনে অবস্থিতা। তুমি যদি তোমার শ্রীঅঙ্গে তাহার অবস্থান অঙ্গীকার করিয়া স্থান না দিতে, তবে কি মায়ার সত্তা বলিয়া জগতে কোনো পদার্থ থাকিত? তবে কি মায়া কেশরূপে হেলিয়া দুলিয়া, তোমার সোহাগ ভরে ঢলিয়া ঢলিয়া চরণ চুম্বনের অধিকার পাইত?

"মায়া লীলার অভিনয়ে কেশরূপে পরিণত তোমারই সচেতন কেশকলাপ যখন সংযত মস্তকে সম্বন্ধ ছিল···তখন ভাবিয়া দেখিল ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি, সংহার যাঁহাদিগের এক এক কটাক্ষের ফল, তাঁহারা যাঁহার চরণতলে ধূলায় লুণ্ঠিত—আমরা তাঁহার মস্তকে বাস করি, ইহা অপেক্ষা বিষম ধৃষ্টতার বিষয় আর কি আছে? ভক্ত বলিয়া ত্রিজগৎ যাঁদের চরণাম্বুজের মকরন্দ মধুপানে নিত্য অধিকারী—আমরা তাঁহার নিত্য দেহের নিত্যসঙ্গী অঙ্গীভূত হইয়াও সে চরণ সেবায় নিত্য বঞ্চিত, ইহা অপেক্ষা বিধির বিড়ম্বনা তো আর নাই। ভাবিয়া চিন্তিয়া, কেশপাশ সহসা যেন চরণতলে খসিয়া পড়িল। কেবল পড়িল তাহা নহে, না জানি কি কি মাধুর্যের রসাস্বাদে চরণযুগল বেড়িয়া ধরিল, আর মকরন্দ মধুপানে ভাবের

ভরে বিভোর হইয়া হেলিয়া দুলিয়া, ঢলিয়া ঢলিয়া নাচিতে নাচিতে খেলিতে লাগিত, ফুল্ল কমলে ভ্রমরমালা মধুমত্ত হইয়া যেন ঝাঁকে ঝাঁকে উড়িয়া একবার এপাশে একবার ওপাশে ঝঙ্কার দিয়া পড়িতে লাগিল, মঞ্জীররব সংশিঞ্জিত চরণাম্বুজ বেড়িয়া যেন সেই নৃত্যের তালে তালে আপন গান সংযোজিত করিল।

"চির নিগড় বন্ধনগ্রস্ত সংসার কারারুদ্ধ জীব আমরা, তাই তোর মুক্ত কুন্তলকলাপকান্তি ত্রিতাপ তপ্ত হৃদয়ে শান্তির অনন্তধারা ঢালিয়া দেয়। কেশপাশ হেলিতেছে দুলিতেছে, খেলিতেছে আর তারই সঙ্গে সঙ্গে নাচিয়া নাচিয়া প্রেমানন্দে ঢলিয়া পড়িতেছে। ঐ পতিতপাবন বন্ধনমোচন দৃশ্য দেখিয়া প্রাণ যেন আনন্দে নাচিয়া উঠে।

বলিব কি মা! কালোরূপে ঐ এলো চুলে কেমন যে দেখায় মা! তাহা বলিবার নহে, শুনাইবারও নহে, দেখাইবারও নহে, কেবল প্রাণ ভরিয়া দেখিবার কথা। কিন্তু মা! দেখিবে কে? প্রাণে তুমি না জাগিলে নয়নে তোমায় দেখা যায় না। মুক্ত জীব না হইলে কেহ কি কখন মুক্তকেশীর স্বরূপ রূপ দর্শনের অধিকারী হয়? এই জন্য এলোকেশী রূপে নৃত্যনিরতা মায়ের স্বরূপ দর্শন লালসায় সাধককুল সর্বদা লালায়িত। যে ভক্তের নয়নে মুক্তকেশী পাগলী মেয়ের আহ্লাদ-বিহ্বল রূপের ক্ষণপ্রভা মুহূর্তের জন্য পতিত হইয়াছে, তাহার মন আর বিশ্বের কোনো রূপেই আকৃষ্ট হয় না। তাহার চিত্ত মধুকর করুণাময়ীর চরণ সরোজের মধুপানে নিরন্তর বিভোর হইয়া থাকে। বহুবিধ সন্তাপে তাপিতচিত্ত জীব যদি একবার কালভয় নিস্তারিণী কালীর অভয় চরণে শরণাগত হয়, বিবিধ সমস্যা সমাকীর্ণ সংসারক্ষেত্রে আর তাহাকে বিড়ম্বিত হইতে হয় না। ব্যথিতপ্রাণ সন্তানকুলকে এই রহস্যময় তত্ত্বকথা স্মরণ করাইয়া অভয়দান করিবার জন্যই অভয়ামায়ের এই মুক্ত কেশলীলা[১]।"

মাঝে মাঝে অতীন্দ্রিয় দিব্য দর্শন ঘটিতেছে। চকিতে আবির্ভূত

১. হিমাদ্রি পত্রিকা ১৩ই মাঘ ১৩৭৩

হইয়া জগজ্জননী, তাঁহার আদরিণী মা সর্বমঙ্গলা, আবার তেমনি চকিতে হইতেছেন অন্তর্হিত। কত ভাবে, কত ঐশ্বর্যেই না দর্শন দেন ষড়ৈশ্বর্যময়ী! কখনো আসেন রণঙ্গিণী বেশে। কখনো করুণাময়ী বরাভয়দায়িনী, কখনো বা তিনি স্নেহপীযূষময়ী সত্যকার জননী। ধ্যানসিদ্ধ মহাপুরুষ মায়ের এই লীলাময়ী রূপ দর্শনের কথা বিবৃত করিয়াছেন তাঁহার সংগীতে :

এই দেখছি শ্যামাঙ্গিনী
হচ্ছে আবার হেমাঙ্গিনী।
এই দেখ্‌ছি মা রক্তবস্ত্রা,
অমনি দেখি উলঙ্গিনী।
এই যে মা তোর বেণী বন্ধ,
আবার দেখি মুক্তকেশী।
এই দেখি ভ্রূকুটী ভঙ্গী,
আবার দেখি আসছে হেসে।
এই দেখি মা তীক্ষ্ণ অসি,
শোভিছে বাম করোপরে।
এই দেখি মা জপের মালা,
ঘুরিছে ঐ দক্ষিণ করে।
এই দেখি মা সিংহাসনে,
আবার দেখি পদ্মাসনে।
আবার দেখি ঘোর শ্মশানে,
নাচছ শব শিবাসনে।
এই দেখি কিশোরী, মাগো,
হচ্ছ আবার ষোড়শী।
অমনি ভীমা ধূমাবতী,
অমনি রমা রূপসী।
এই দেখি মা দৈত্যের জিহ্বা,
ধরেছ ওই বাম করে।

আবার দেখি দক্ষিণ হস্তে
অভয় দিচ্ছ অমরে।
এই দেখি মেতেছ, মাগো!
শত্রুর সনে সমরে।
আবার দেখি পুত্র স্নেহে,
ঝরছে দুধ ওই পয়োধরে।
এই দেখি মা ত্রিনয়নে,
চন্দ্র সূর্য অগ্নি জ্বলে।
আবার দেখি সেই নয়নে,
করুণা কটাক্ষ গলে।

মায়ের করুণা কটাক্ষ আর রুদ্র রোষ দুইকেই মায়ের দান হিসাবে শিরোধার্য করিতেন সাধক শিবচন্দ্র। সর্বমঙ্গলা মায়ের আদরের দুলাল রূপে পরিচিত ছিলেন তিনি। কিন্তু তাঁহার এই আদরের দুলালকে মা জীবনে কম দুঃখকষ্ট দেন নাই, পরীক্ষার আগুনেও কম দহন করেন নাই। কিন্তু মাতৃগতপ্রাণ সাধক সকল কিছু সহ্য করিয়াছেন অম্লানবদনে।

তখন শিবচন্দ্র স্বগৃহ কুমারখালিতে বাস করিতেছেন। মাতৃ-পূজায় আর মাতৃধ্যানে সদাই তিনি বিভোর থাকেন। সংসারের আয় তেমন কিছুই নাই, আকাশবৃত্তি গ্রহণ করিয়া আছেন, যেদিন যাহা কিছু মায়ের ভোগরাগের জন্য উপস্থিত হয় তাহাতেই গৃহের সবাই করেন উদরপূর্তি।

প্রায় দুই দিন হয় অন্ন সংস্থান নাই। কোনো মতে দুই একটি ফল সংগ্রহ করিয়া দেবী সর্বমঙ্গলার ভোগ দেওয়া হইতেছে।

সব চাইতে বিপদ শিশুকন্যা কালীকুমারীকে নিয়া। তাহার খাদ্য যোগাড় না করিলে তো চলিবে না। পত্নী চিন্তামণি দেবী তাই অনাহারে দুশ্চিন্তায় প্রায় ভাঙিয়া পড়িয়াছেন। এদিকে মাতৃমণ্ডপে বসিয়া ভাবাবিষ্ট সাধক শিবচন্দ্র ইষ্টবিগ্রহের সম্মুখে পরমানন্দে গাহিয়া চলিয়াছেন:

কবে গো, আনন্দময়ী! এ দীনে সে দিন দিবে
যে দিন—দিন রাত্রি হবে, রাত্রি আমার দিন হবে
নিশাচরে দিবাচরে, সমান হবে চরাচরে,
দিবাকর নিশাকর করে, আলোক আঁধার হবে।
সম্পদ বিপদ হবে, বিপদ সম্পদ রবে,
স্বজন বিজন হবে, বিজন স্বজন হবে।
পিতামাতা ভ্রাতা জায়া, অসার সংসার মায়া,
ঘুচিবে সব ছায়া কায়া, আসা যাওয়া সমান হবে
সংসার শ্মশান সাজিবে, শ্মশান সংসার হবে,
নদীতট শয্যা হবে, ভার্যা হবে চিতা যবে।[১]

উদাত্ত কণ্ঠের গান ও ভাবাবেশ শেষ হইতেছে না, পত্নী ক্রন্দনরত শিশুকন্যাকে কোলে নিয়া মণ্ডপে এক একবার ঝগড়া করিতে গিয়াছেন, আবার ফিরিয়া আসিতেছেন।

অবশেষে গান থামিলে, পত্নী সম্মুখে আসিয়া কহিলেন, "এসব তো বেশ শুনলাম। কিন্তু ছুটো ভাতের সংস্থান কি ক'রে হবে? তুমি নিজে ছুদিন উপবাসী রয়েছো। শিশু মেয়েটাকে এ ছুদিন যদিইবা কিছু খেতে দেওয়া হয়েছে। আজ তার কোনো ব্যবস্থাই নেই।"

প্রশান্ত স্বরে উত্তর দেন শিবচন্দ্র, "ছাখো, মা সর্বমঙ্গলা তাঁর এ সৃষ্টিটা তোমার আমার সঙ্গে পরামর্শ ক'রে করেন নি, চালাচ্ছেনও নিজেরই ইচ্ছেমতো। চালাবার শক্তিও তার আছে।"

"এসব তো অনেক বড় কথা, তাঁর সৃষ্টির কথা। আমাদের মতো ক্ষুদ্র মানুষের কথা ভাববার সময় আছে কি তাঁর?"

"কি হাস্যকর কথা বলছো তুমি। এই অনন্ত কোটি গ্রহ তারায় যেমন আছেন তিনি, তেমনি আছেন অণুপরমাণুতে। তার তো কোনো কিছুকেই ভুলবার উপায় নেই। মা আমার সর্বমঙ্গলা। ব্যবস্থা একটা করেছেনই তিনি।"

---

১. গীতাঞ্জলি: শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব

কথা কয়টি শেষ হইতে না হইতেই গ্রামের পোস্টমাস্টার শশধর চক্রবর্তী সেখানে আসিয়া হাজির।

"কি মনে ক'রে ভাই?" স্মিতহাস্যে প্রশ্ন করেন শিবচন্দ্র।

উত্তরে বলেন পোস্টমাস্টার, "ঠাকুরমশাই, আপনার একটা টেলিগ্রাম মনিঅর্ডার, আর চিঠি আছে। পিয়নের অসুখ, আজ সে কাজে বেরোয় নি। তাই বাড়ি যাবার পথে আপনার এ দুটো আমি নিজেই দিয়ে যাচ্ছি।"

এই টাকা ও চিঠিটি পাঠাইয়াছেন উত্তরপ্রদেশেস্থিত গোরখপুরের এক ভক্ত। তিনি লিখিয়াছেন, 'গভীর রাতে ঘুমিয়ে আছি, হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। দেখলাম, জ্যোতির্ময়ী মূর্তিতে দেবী সর্বমঙ্গলা মণ্ডপ আলো ক'রে বসে আছেন। আর আমার দিকে তাকিয়ে বলছেন, কুমারখালিতে আমার ছেলে শিবচন্দ্রকে শিগগীর একশো টাকা তুমি পাঠিয়ে দাও। বাড়ির সবার উপবাসে মরবার অবস্থা।'

"এই নাও এবার," পত্নীর দিকে টাকাটা ঠেলিয়া দিলেন শিবচন্দ্র। "মায়ের ভোগরাগের ব্যবস্থা মা নিজেই ক'রে নিলেন। বুঝলে তো, সন্তানের ওপর মায়ের দৃষ্টিটি ঠিকই থাকে।"

সৃষ্টি স্থিতি লয়ের মূলে রহিয়াছেন পরাশক্তি মহামায়া, কৈবল্যে আর লীলায় সর্বত্র সর্বকালে তাঁহারই পরমসত্তা ক্রিয়াশীল। সিদ্ধ সাধক শিবচন্দ্রের দিব্য অনুভূতির এই তত্ত্বটি তাঁহার হৃদয়ের এক স্বতোৎসারিত সংগীতে ফুটিয়া উঠিয়াছে। তিনি গাহিয়াছেন:

কৈবল্যের সেই নিত্য লীলায়
লীলাময়ী আমারই মা।
মহাকালের হৃৎকমলে তালে তালে
নাচছে শ্যামা।
শিবের বামে জীবের বামে আমারই
সেই একই মা,
সর্বত্র সমদক্ষিণা, বামা হয়েও নন মা
বামা

শক্তি স্বরূপিণী মা মোর, জীবেরও মা,
শিবেরও মা।
কি জীব, কি শিব, দুই-ই হন শব,
কোলে যদি না করেন মা,
জননে জননী মা মোর, ধারণে হন
ধাত্রী মা।
কারণে ক্রিয়া শক্তি, কার্যে ফল-
বিধাত্রী মা।
জীবনে জীবনী-শক্তি, মৃত্যুরূপা
মরণে, মা।
সাধনায় সাধনা, মুক্তি দানে মুক্ত-
কেশী—মা।
কোলের ছেলে কোলে করে, দোলে
মা মোর কি শুধু মা।
আপন কোলে আপনি দোলে, আনন্দ
হিল্লোলে মা।
আপন মুখে আপন নাম ঐ,
গেয়ে বেড়ায়, আমারই মা,
মায়ের কেবা আপন, কেবা হয় পর,
আর কিছু নাই সবই যে মা
কোন্ মা তুমি, কে মা তুমি, সে কথায়
আর কাজ কি বা?
যে মা, সে মা, হও মা। তুমি বলতে
দাও মা। 'জয় মা শ্যামা'।

কাশীধামের সেই ঈশ্বর প্রেরিত প্রাচীন তন্ত্রসিদ্ধ পুরুষের কাছ হইতে নিগূঢ় ক্রিয়া গ্রহণ করার পর হইতেই শিবচন্দ্রের নয়নসমক্ষে

অভীষ্ট সাধনের বর্ত্মটি খুলিয়া যায়। মরণপণ সংকল্প নিয়া শেষ পর্যায়ের প্রয়াসে তিনি ব্রতী হন।

এ সময়ে কৈলাস ও মানস সরোবরে বৎসরাধিক কাল তিনি অবস্থান করেন এবং সেখানেও লাভ করেন এক উচ্চকোটির কৌল-সাধকের কৃপা। সেখানে অনুষ্ঠান করেন কঠোর তপস্যার।

তারপর জ্বালামুখী, বিন্ধ্যাচল, কামাখ্যা প্রভৃতি দেবীপীঠে মাতৃ-আরাধনা সম্পন্ন করিয়া প্রত্যাগত হন নিজ গৃহে। এখানে সর্বমঙ্গলা মণ্ডপে বসিয়া ধ্যানরত অবস্থায় বীরাচারী মহাসাধকের জীবনে আসে তাঁহার বহু প্রার্থিত পরমপ্রাপ্তির লগ্ন। জ্যোতিঃঘন, ষড়ৈশ্বর্যময়ী জগজ্জননী আবির্ভূতা হন তাঁহার নয়নসম্মুখে।

মহাকৌল শিবচন্দ্রের হৃদয় দহরে ফুটিয়া উঠে একমেবোদ্বিতীয়ম্ পরমসত্তার মহাপ্রকাশ। সেই প্রকাশের সম্মুখে শিব শিবানীতে পার্থক্য নাই, ব্রহ্ম ও শক্তিতে সদা রহিয়াছে অভেদ দর্শন, ধ্যেয় ও ধ্যাতা সেখানে একাকার। এই পরম উপলব্ধির কথা উত্তর জীবনে ঝঙ্কৃত হইয়াছে মহাসাধকের কণ্ঠে :

পূজার আগে সোহং, পরে সোহং,
মধ্যে যে ত্বং, সে ও অহংময় ;
নইলে তোমার অঙ্গন্যাসে, আমার কিবা আসে ?
আমার অঙ্গন্যাসে তোমার কিবা হয় ?
প্রেম জাগে যখন, আর কি তখন,
তোমায় আমায় সাধনা হয়,
তখন অভেদ সম্বন্ধে—,
মাতি প্রেমানন্দে,
ব্রহ্মময়ীর পূজায় পূজক ব্রহ্মময়[১] ॥

সাধনায় সিদ্ধি ও ইষ্টদর্শন হইয়াছে, শিবচন্দ্রের অন্তরপটে মাঝে মাঝে ঘটিতেছে জ্যোতির্ময়ী জগজ্জননীর আবির্ভাব। আবার

১ গীতাঞ্জলি (১ম): শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব

চকিতে হইতেছে তাঁহার অদর্শন। এ সময়কার ব্যবহারিক জীবনে শিবচন্দ্র বহুতর কর্ম নিয়া ব্যাপৃত থাকিতেন। কখনো তন্ত্রতত্ত্বের প্রচারে, কখনো বা ইষ্টদেবীর পূজা অনুষ্ঠানে, তিনি মত্ত থাকিতেন। কখনো তৎপর হইয়া উঠিতেন দেশমাতৃকার পূজারী মুক্তিসংগ্রামীদের সমর্থনে। কিন্তু যে কর্মেই নিয়োজিত থাকুন, অন্তরে জগজ্জননীর স্মরণ মনন অনুধ্যান চলিত নিরন্তর।

পণ্ডিত রাধাবিনোদ গোস্বামী উত্তরকালে শিবচন্দ্রের স্মৃতিতর্পণ করিতে গিয়া তাঁহার এ সময়কার মনোভাবের চিত্র দিয়াছেন[১]: "দিদিমার সহিত তাঁহার (বিদ্যার্ণবের) সর্বমঙ্গলা মন্দিরে আমারও যাতায়াত ছিল। কিন্তু আমি তখন ছোট। মনে পড়ে, সেই সময়েই একবার তিনি খুব ধুমধামের সহিত পাঁচখানি দুর্গাপূজা করিয়াছিলেন। যাহা হোক, পরে আমি যখন স্কুলে পড়ি, সেই সময়ে একদিন তাঁহার আলোচনা সভায় যোগদান করার সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল। সেদিন তিনি অনেক ভালো কথা বলিয়াছিলেন। পরে তাঁহার 'তন্ত্রতত্ত্বে' সেই সকল আলোচনা পড়িয়া আমি মুগ্ধ হইয়াছিলাম। তিনি আলোচনা করিতেছিলেন, আর মাঝে মাঝে তারা, 'তারা, তারা ব্রহ্মময়ী' বলিয়া ধ্বনি করিয়া উঠিতেছিলেন। বার কয়েক শুনিবার পর আমি ফস্ করিয়া বলিয়া বসিলাম,—বেশ তো বলিতেছেন, কিন্তু মাঝে মাঝে অমন চিৎকার করিয়া উঠিতেছেন কেন? বলিয়াই তৎক্ষণাৎ আমি সংকুচিত হইয়া পড়িলাম। কোথায় সামান্য গ্রাম্য বিদ্যালয়ের অর্বাচীন তরুণ ছাত্র আমি, আর কোথায় হাইকোর্টের চিফ জাস্টিস, সারপেণ্ট পাওয়ার প্রভৃতির লেখক, উডরফ সাহেবের গুরু, ভারতের অদ্বিতীয় সংস্কৃত বক্তা, তন্ত্রাচার্য শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব মহাশয়।"

উপস্থিত সবাই সচকিত হইয়া উঠিয়াছেন বালকের ঐ মন্তব্যে। ভাবিতেছেন, শিবচন্দ্র এবার হয়তো ক্রুদ্ধ হইয়া বালককে তিরস্কার করিবেন। কিন্তু কার্যত দেখা গেল অন্যরূপ।

১ স্মৃতি তর্পণ: তন্ত্রাচার্য শিবচন্দ্র, গৌরভাবিনী, মাঘ-চৈত্র ১৩৬৩।

চক্ষু নিমীলিত করিয়া কিছুক্ষণ শিবচন্দ্র নীরব রহিলেন, তারপর বালকের দিকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে তাকাইয়া মৃদুস্বরে কহিলেন, "ঠিক বলেছিস তুই। তারা—তারা ব'লে কত ডাকছি, কত কেঁদে মরছি, কিন্তু ছেলের কথায় যখন তখন সে বেটি তো সাড়া দেয় না। সব সময়ে তো পাইনে তার দর্শন!" বলিতে বলিতে শিবচন্দ্রের চক্ষু দুইটি অশ্রুসজল হইয়া আসিল। ভক্ত ও দর্শনার্থীরা মাতৃসাধকের দিব্যভাবমণ্ডিত আননের দিকে নির্নিমেষে চাহিয়া রহিলেন।

কুমারখালির প্রবীণ ভক্তসাধক কাঙাল হরনাথ এবং তরুণ শিবচন্দ্রের অন্তরঙ্গতা ছিল অতি গভীর। এই অন্তরঙ্গতাব প্রভাব শিবচন্দ্রের উপর বিশেষভাবে পতিত হয়, তাঁহার তন্ত্রধৃত জীবনে বাল্যকাল হইতেই দেখা দেয় উদারতা ও অসাম্প্রদায়িকতা। তাই কালী ও কৃষ্ণের অভেদ তত্ত্ব তাঁহার ভিতরে অতি সহজভাবে স্ফুরিত হইয়া উঠে।

কাঙাল হরনাথ শিবচন্দ্রের পিতার কাছে মন্ত্র দীক্ষা নিয়াছিলেন, আবার শিবচন্দ্র শৈশবে হাতেখড়ি নিয়াছিলেন হরনাথেরই কাছে। উভয় পরিবারে তাই ঘনিষ্ঠ আত্মিক যোগ ছিল।

শুদ্ধা ভক্তির সাধনায় কাঙাল হরনাথ উচ্চাবস্থা লাভ করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার লেখায় গানে ও উপদেশে সমন্বয়মূলক প্রেমধর্ম প্রচার করিয়া বেড়াইতেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ফিকিরচাঁদ সংসদে বাল্যকালে শিবচন্দ্র প্রায়ই যাতায়াত করিতেন, কাজেই হরনাথের ভক্তিভাব অনেক পরিমাণে তাঁহাকে রসায়িত করিয়াছিল।

উত্তর জীবনে শিবচন্দ্র তন্ত্রসাধক ও তন্ত্রশাস্ত্রবিদ্‌রূপে খ্যাত হইয়া উঠেন। স্বদেশ এবং হিন্দুধর্মের উজ্জীবনের জন্য নানা কল্যাণকর প্রয়াসের সহিত তিনি যুক্ত হইয়া পড়েন। এ সময়ে কাঙাল হরনাথের সহিত প্রায়ই তাঁহাকে পরামর্শ করিতে দেখা যাইত। কি করিয়া শাক্ত ও বৈষ্ণবের বিবাদ ও মনোমালিন্য মেটানো যায়, কি করিয়া

জড়বাদী পাশ্চাত্য সভ্যতার প্লাবন হইতে সনাতন ধর্মকে রক্ষা করা যায়, উভয়ে সেই পন্থা উদ্ভাবনের চেষ্টা করিতেন।

মনীষী বঙ্কিমচন্দ্র এ সময়ে কৃষ্ণচরিত্র রচনা করেন, নিজের মতবাদ ও যুক্তি তর্ক বিশ্লেষণের মধ্য দিয়া কৃষ্ণ-চরিত্রের এক আধুনিক ব্যাখ্যা তিনি স্থাপন করেন।

বঙ্কিমের এই ব্যাখ্যার সহিত শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব একমত হন নাই, তিনি তৎক্ষণাৎ ইহার এক সমালোচনা লিখিয়া ফেলেন। প্রবীণ সাধক হরনাথকে পড়িতে দিয়া জানিতে চাহেন তাঁহার অভিমত।

হরনাথ বলেন, "তুমি শক্তিমান্ সাধক, তত্ত্ব জানো। এ ধরনের সমালোচনায় শুধু দোষ ত্রুটি উদ্ঘাটিত হয়। এসব না লিখে বরং প্রকৃত তত্ত্ব, প্রকৃত রস উদ্‌ঘাটন কর। কৃষ্ণলীলা মাধুর্যের রস পরিবেশন কর সর্বজনের কল্যাণে। তাতে কাজ বেশী হবে।"

শিবচন্দ্র তৎক্ষণাৎ এ কথা মানিয়া নিলেন। অতঃপর কিছুদিনের মধ্যে রচনা করিলেন 'রাসলীলা'। তন্ত্রসিদ্ধ মহাপুরুষের এই গ্রন্থটি পড়িলে বুঝা যায়, পরম বস্তুতে কোনো ভেদ্ নাই, তাঁহার রসের ধারায় পরিতৃপ্ত হয় জাতি বর্ণ নির্বিশেষে বিশ্বের সকল মানুষ।

কাঙাল হরনাথ যখন ইহলোক ত্যাগ করেন, তখন শিবচন্দ্র তাঁহার ভক্তদের সঙ্গে কাঁধ মিলাইয়া মরদেহটি সৎকারের জন্য বহন করিয়া নিয়া যান। রক্ষণশীল ব্রাহ্মণদল অধ্যুষিত কুমারখালিতে তাঁহার এই কার্যটি অনেকের কাছে নিন্দনীয় বলিয়া গণ্য হয়। কিন্তু তত্ত্ববিদ্ সাধক শিবচন্দ্র সেদিকে দৃক্‌পাত করেন নাই।

প্রখ্যাত মরমিয়া সাধক লালন ফকীর সে-বার কুমারখালিতে শিবচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন।

লালন নিকটেই থাকেন। সাধক হিসাবে শিবচন্দ্রের প্রতিষ্ঠার কথা, তাঁহার শাস্ত্র রচনা ও বাগ্মিতার কথা, তিনি শুনিয়াছেন। বয়স

হিসাবে সিদ্ধ ফকীর লালন শিবচন্দ্র হইতে বড়। কিন্তু নিজেই সখ্যতা দেখাইতে আসিয়াছেন, পদব্রজে উপস্থিত হইয়াছেন শিবচন্দ্রের দুর্গামণ্ডপের সম্মুখে।

শিবচন্দ্র তো মহা আনন্দিত, পরম সমাদরে এই সিদ্ধ ফকীরকে অভ্যর্থনা জানাইলেন। স্মিত হাস্যে কহিলেন, "বড় অনুগ্রহ আমার ওপর।"

"অনুগ্রহ নয়—দর্শন। হেথায় দর্শন করতে এলাম আমার দাদা ঠাকুরকে।" সারল্যভরা হাসি হাসিয়া বলেন লালন। "তাছাড়া, পড়শী তো আমরা বটেই। সেই মনের মানুষ যে জন, তাঁকে ঘিরেই তো আমরা সব পড়শীরা দিন গুজরান করছি। আপনি যার জন্য ফকীর, আমিও তাঁর জন্যই। তাই না দাদাঠাকুর ?"

বাউল বেশী লালন ফকীরের কাঁধে ঝোলা, হাতে একতারা। আর বীরাচারী মাতৃসাধক শিবচন্দ্রের পরিধানে একটি গৈরিক বসন, সারা দেহ ভস্মলিপ্ত, কপালে বৃহৎ রক্ত চন্দনের ফোঁটা আর ত্রিপুণ্ড্রক। দুই-ই ফকীর বই কি। গ্রামের লোকেরা লালনের আগমনবার্তা পাইয়াই ছুটিয়া আসিয়াছে। সর্বমঙ্গলার মণ্ডপের সম্মুখে দুই সাধককে ঘিরিয়া কৌতূহলী হইয়া দাঁড়াইয়া আছে সংলাপ শোনার প্রতীক্ষায়।

শিবচন্দ্র গদ্‌গদ স্বরে বলেন, "ফকীর, তোমায় পেয়ে আনন্দ আমার উথলে উঠ্‌ছে, সে আনন্দ প্রকাশ করার ভাষাও ফেলেছি হারিয়ে। যাক্‌, এসেছো যখন, প্রাণের পিপাসা মেটাও, বিলাও তোমার বাউল গানের সুধা।"

একতারা বাজাইয়া নাচিয়া নাচিয়া গান ধরেন লালন ফকীর :

আমি একদিনও না দেখলাম তারে।
আমার বাড়ির কাছে আরশীনগর
—পড়শী বসত করে।
গ্রাম বেড়ে তার অগাধ পানি,
ও তার নাই কিনারা নাই তরণী পারে।

মনে বাঞ্ছা করি দেখবো তারে,
কেমনে সে গাঁয়ে যাই রে।
কি কব পড়শীর কথা, ও তার
হস্তপদ স্কন্ধমাথা নাই রে।
ও সে ক্ষণেক ভাসে শূন্যের উপর
ক্ষণেক ভাসে নীরে।
পড়শী যদি আমায় ছুঁতো
ও মোর যম যাতনা সকল যেতো দূরে।
সে আর লালন একখানে রয়,
তবুও লক্ষ যোজন ফাঁক্ রে।

শিবচন্দ্র বিহ্বল হইয়া গিয়াছেন, প্রিয় ভক্ত দানবারিকে ডাকিয়া উৎফুল্ল কণ্ঠে কহিলেন, "দানু, দানু, প্রাণ ভরে শোন. কি অপূর্ব গান ফকীরের। সিদ্ধপুরুষ ছাড়া এ গান কে গাইতে পারে?"

বলিহারের রাজার কৌল সাধনার উপর অত্যন্ত শ্রদ্ধা ছিল। তিনি স্থির করিলেন, আচার্য শিবচন্দ্রকে বরণ করিবেন তাঁহার সভাপণ্ডিতরূপে। ভাবিলেন, সেই সুযোগে তাঁহার উপদেশ নিয়া অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য তান্ত্রিক ক্রিয়া অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা যাইবে।

বহু অনুনয় বিনয় করিয়া শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণবকে বলিহারে নিয়া যাওয়া হইল। সেখানে থাকিয়া শিবচন্দ্র বেশ কিছুদিন রত হইলেন শাস্ত্রচর্চা ও তপস্যায়। কিন্তু অতঃপর সভাপণ্ডিতের বৃত্তি তাঁহার অসহ্য হইয়া উঠিল। হঠাৎ একদিন সেখানকার বাস উঠাইয়া দিয়া ফিরিয়া আসিলেন কুমারখালির নিজ আবাসে।

ভক্ত পরিবৃত হইয়া তিনি থাকিতেন। ঘরে স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি ছিল, তারপর ছিল ইষ্টদেবীর পূজার দায়িত্ব। তাই শিবচন্দ্রকে এই সময়ে প্রতিমাসে বহু অর্থ ব্যয় করিতে হইত। বলিহারের সভাপণ্ডিত হিসাবে প্রতিমাসে বাঁধাধরা একটা মোটা আয় ছিল, এবার তাহাও বন্ধ হইয়া গেল।

আত্মীয় বন্ধুবান্ধবেরা চিন্তিত হইয়া উঠিলেন, সংসারের বিপুল ব্যয়-ভার এবার কি করিয়া চলিবে? শিবচন্দ্র উত্তর দিলেন, "মায়ের অভয় পদে যে শরণ নিয়ে আছে, তার আবার ভয় কি? নাঃ—এখন থেকে কোনো ব্যক্তি বিশেষের অর্থ সাহায্যের ওপর আর আমি নির্ভর করবো না। আমার মা সর্বমঙ্গলা যা হোক একটা ব্যবস্থা করবেন বৈ কি।"

অতঃপর সংসারের ব্যয় এবং সর্বমঙ্গলার ভোগ রাগ ও পূজা-অর্চনার ব্যয় নির্বাহ হইত নিতান্তই ইষ্টদেবীর অনুগ্রহে। যেদিন যেমন অর্থের দরকার হইত, তাহা উপস্থিত হইত দূর দূরান্তের ভক্ত ও অনুরাগীদের নিকট হইতে।

দ্বারভাঙ্গার মহারাজা কামেশ্বর সিং বরাবরই তন্ত্রসাধনার অনুরাগী ছিলেন। উচ্চকোটির সাধক মহলে তাঁহার যাতায়াত ছিল এবং সুযোগ পাইলেই ক্রিয়াবান্ সাধকদের নিকট হইতে তিনি উপদেশ গ্রহণ করিতেন।

কামেশ্বর সিংজী একবার তারাপীঠে মহাত্মা বামাক্ষেপার নিকট উপস্থিত হন এবং অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য শ্মশানে বসিয়া অভিচার অনুষ্ঠানের প্রার্থনা জানান।

ক্ষেপা তাঁহাকে আশীর্বাদ দিয়া বলেন, "তুমি তন্ত্রসাধক শিবচন্দ্রের কাছে যাও, তিনি শক্তিমান্, তান্ত্রিক নিগূঢ় অনুষ্ঠানেও দক্ষ। তাঁর কৃপা পেলে সিদ্ধ হবে তোমার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা।"

নির্দেশমতো, কিছুদিনের মধ্যে কামেশ্বর সিংজী কুমারখালিতে শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণবের কাছে আসিয়া উপস্থিত। ক্ষেপার কথা শুনিয়া এবং মহারাজার আন্তরিক ইচ্ছার পরিচয় পাইয়া শিবচন্দ্র তাঁহাকে সাহায্য করিতে রাজী হন। অচিরে গভীর নিশাযাগে স্থানীয় শ্মশানে অনুষ্ঠিত হয় মহাকালীর আরাধনা। শিবচন্দ্রের ব্যক্তিত্ব ও সাধনবিভূতি দেখিয়া কামেশ্বর সিংজী মুগ্ধ হন, পরিণত হন তাঁহার এক অনুরাগী ভক্তরূপে।

অতঃপর আরও কয়েকবার কামেশ্বর সিংজী আচার্য শিবচন্দ্রের

সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং তন্ত্রের সাধন ও তত্ত্ব সম্পর্কে উপদেশ লাভ করেন। একবার শিবচন্দ্রের দেওঘরে অবস্থানের কালে তিনি তাঁহার সহিত মিলিত হন এবং সেখানকার শ্মশানে বসিয়া সম্পন্ন করেন তাঁহার উত্তরসাধকের কর্ম।

সিদ্ধ কৌল শিবচন্দ্রের শ্মশান সাধনার তথ্য খুব কমই জানা গিয়াছে। তাঁহার উত্তর সাধকদের প্রদত্ত যৎসামান্য সংবাদ হইতে এ সম্পর্কে একটা মোটামুটি চিত্র দাঁড় করানো যায়।

তাঁহার শ্মশান সাধনা ছিল তিথি ও যোগ সাপেক্ষ। এই যোগ যে কখন সমাগত হইবে তাহা অপরে জানিত না। এই শুভ লগ্ন যখন উপস্থিত হইত তখন তিনি শ্মশানভূমিতে গমন করিয়া সাধনা করিবার জন্য অস্থির হইয়া পড়িতেন। মাতৃতত্ত্বপিপাসু শিষ্যগণ যখন তাঁহার সহিত গমন করিতেন, শিক্ষাদানকল্পে যাহা আবশ্যক সকলকেই তাহা প্রদর্শন করিতেন, তবে উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন শিষ্য না হইলে কখনো সঙ্গে লইতেন না বা সাধনার সময় নিকটে থাকিতে সম্মতি দিতেন না।

—হাওড়া শিবপুরের শশধর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সিদ্ধ কৌল বামাক্ষ্যাপার আশ্রম তারাপীঠে কিছুদিন অবস্থান করেন। ক্ষেপা একদিন তাঁহাকে আদেশ করিলেন 'ওরে, তুই কুমারখালির পণ্ডিত শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণবের কাছে যা, সেখানে তুই সায়েস্তা হবি।'

—ভাগ্যবান্ সাধক এই আদেশ প্রাপ্তির পর বিদ্যার্ণবের গৃহে সমাগত হইয়া তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন, তারপর সর্বদা ভক্তি প্রণত হইয়া তাঁহার নিকট সাধনা বিষয়ে নানা শিক্ষা গ্রহণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে কিছুকাল অতিবাহিত হইবার পর একদা যখন শ্মশান সাধনার সুযোগ উপস্থিত হইল, তিনি গুরুদেবের সহিত নিশীথে সাধনার জন্য গৌরীতটে শ্মশানে উপস্থিত হইলেন। সাধনার কোনও প্রক্রিয়া কয়েকবার এই শিষ্যকে প্রদর্শন করার পরও যখন যথাযথ অনুষ্ঠানে তিনি অক্ষম হইলেন, তখন সেই নিস্তব্ধ শ্মশানেই ঠাকুর সক্রোধে শিষ্যকে চিমটা দ্বারা প্রহার করিলেন। তারপর

আবশ্যকীয় ক্রিয়া ও সাধনায় তত্ত্বপিপাসু শিষ্যকে কৃতিবান্ করিয়া নিশা শেষে গৃহে ফিরিলেন।

—ইহা ছাড়াও ঘোর নিশীথে কখনও কখনও কোনো শ্মশানে বসিয়া শ্মশানবাসিনী শ্যামা মায়ের আরাধনায় তিনি নিমগ্ন থাকিতেন। সেখানে যে কি প্রকার ক্রিয়াকলাপ অনুষ্ঠান করিতেন, কিভাবে যোগ সমাধিতে মগ্ন হইয়া থাকিতেন, তাহা আর অন্য কেহ জানিতে পারিত না; যদি কিছু জানা সম্ভব তাহা তাঁহার ভাগ্যবান্ শিষ্য দানবারি গঙ্গোপাধ্যায়ই একমাত্র জানিতে পারিতেন।

কয়েকজন জার্মান পণ্ডিত সে-বার বারাণসীতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। ভারতীয় সাধনা ও ধর্ম সংস্কৃতির সম্বন্ধে ইঁহারা অতিশয় অনুসন্ধিৎসু। শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব তখন বারাণসীতে অবস্থান করিতেছেন, সারা উত্তর ভারতে তাঁহার তখন প্রচুর খ্যাতি। তাত্ত্বিক ও ক্রিয়াবান্ এই সিদ্ধ মহাপুরুষকে জার্মান পণ্ডিতেরা সোৎসাহে দর্শন করিতে আসিলেন। সবাই তাঁহারা ভালো সংস্কৃত জানেন, কাজেই কথাবার্তায় কোনো অসুবিধা হইল না। তাঁহাদের প্রশ্নের উত্তরে শিবচন্দ্র ভারতীয় সাধনার বৈচিত্র্য ও গভীরতা, বিশেষত প্রত্যক্ষ দর্শন ও অনুভূতির মর্মকথা বুঝাইয়া বলিলেন।

তন্ত্রের আলোচনা উঠিল এবং এই সাধনধারার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তিনি এক মনোজ্ঞ ভাষণ দিলেন। এই ভাষণে বর্ণনা করিলেন তাঁহার নিজের উপলব্ধি এবং শাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্ব।

জার্মান পণ্ডিতেরা একমনে তাঁহার ভাষণ শুনিতেছেন, আর নির্নিমেষে চাহিয়া আছেন তাঁহার মুখের দিকে।

বিদায়ের সময় সবাই একে একে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া এই সিদ্ধ মহাত্মার চরণ বন্দনা করিলেন, পরমানন্দে গ্রহণ করিলেন তাঁহার সস্নেহ আশীর্বাদ।

শিবচন্দ্রের অন্তরঙ্গ ভক্তশিষ্য এবং তাঁহার বহু নিগূঢ় ক্রিয়ার উত্তরসাধক ছিলেন কুমারখালির দানবারি গঙ্গোপাধ্যায়। গুরুর

জীবনের বহু ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন তিনি। তিনি বলিয়াছেন, "দীর্ঘকাল ঠাকুরের সঙ্গ করেও তাঁকে বুঝতে পেরেছি বলে মনে হয় না। তাঁর সাধনজীবনের কার্যকলাপ যা কিছু দেখেছি, তা থেকে আমার এই ধারণা জন্মেছে যে, তিনি ছিলেন মহাশক্তি মহামায়ার কৃপাপ্রাপ্ত সাধক, বিপুল শক্তি-বিভূতির উৎস।

"বীরাচারী, দক্ষিণাচারী, বামাচারী সব তন্ত্রসাধকেরাই আসতেন তাঁর কাছে। প্রত্যেককেই যাঁর যাঁর নিজস্বধারা ও প্রণালী অনুযায়ী প্রক্রিয়া তিনি দেখিয়ে দিতেন। নিগূঢ় উপদেশ পেয়ে তাঁরা কৃতার্থ হতেন। সত্যকার সাধনকামীদের প্রতি তিনি ছিলেন পরম কৃপালু. হাতে কলমে তাঁদের শিক্ষা দিতেন, অনেক সময় শ্মশানে বসে সারা রাত্রি ব্যস্ত থাকতেন তাঁদের নিয়ে। বহুবার নিজে সঙ্গে থেকে এসব আমি দেখেছি।

"কাশীতে দেখেছি—ভারতের নানা প্রদেশ থেকে শুধু শাক্তই নয়, আরো অন্য সম্প্রদায়ের সাধক—শৈব, সৌর, বৈষ্ণব, গাণপত্য. আসতেন তাঁর কাছে উপদেশপ্রার্থী হয়ে। সবারই আধ্যাত্মিক সমস্যার সমাধানে হাসিমুখে সাহায্য করতেন গুরুদেব।"

শিবচন্দ্রের মাতৃপূজার অনুষ্ঠানাদি সংখ্যায় যেমন অজস্র ছিল, তেমনি ছিল জাঁকজমকপূর্ণ ও ব্যয়বহুল। কিন্তু সব সময়েই দেখা যাইত মায়ের প্রসাদে প্রয়োজনীয় অর্থ পূর্বাহ্নেই হইত সংগৃহীত হইয়াছে ভক্তদের খেদের কোনো কারণ থাকিত না।

একবার শিবচন্দ্র মহা আড়ম্বরের সহিত পঞ্চ-দুর্গোৎসবের অনুষ্ঠান করেন। তাঁহার এই পূজা যেমনি অভিনব, তেমনি বৈচিত্র্যপূর্ণ। সারা বাংলার ঘরে ঘরে এই রাজসিক মহাপূজার কাহিনী প্রচারিত হয় এবং দূরদূরান্ত হইতে অগণিত ভক্ত সাধক ও কৌতূহলী দর্শক তাঁহার পূজাক্ষেত্রে আসিয়া জড়ো হন।

শিবচন্দ্রের এই পঞ্চদুর্গার মূর্তিতে ছিল পাঁচটি বিভিন্ন ভঙ্গীর রূপকল্পনা। এগুলি যথাক্রমে : সিংহে আরূঢ়া মহিষমর্দিনী, আর সম্মুখে আরাধনারত শ্রীরামচন্দ্র ও তাঁহার পরিকরগণ; বাংলার

দশপ্রহরণধারিণী দেবী-দুর্গা; চণ্ডীতে বর্ণিত শ্রীদুর্গা; নবদুর্গা পরিবৃতা লক্ষ্মী সরস্বতী ইত্যাদি সহ মহিষমর্দিনী দেবী; চৌষট্টি যোগিনী এবং দশমহাবিদ্যা বেষ্টিতা—মহাচণ্ডী।

শিবচন্দ্রের পরিকল্পিত এই মহাপূজার মর্মকথা এবং তাৎপর্য—অগণিত শক্তি ও প্রতীকের মূলে রহিয়াছে এক এবং অখণ্ড পরমাশক্তি।

এই মহাপূজায় কাশীধাম ও বাংলার প্রখ্যাত পণ্ডিত ও সাধকেরা উপস্থিত ছিলেন এবং এ পূজা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল দেশের প্রভাবশালী ভূম্যধিকারীদের অকৃপণ সহায়তায়।

বাহ্য পূজার প্রয়োজনের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দিতেন শিবচন্দ্র। তাছাড়া, দেবীপূজায় তন্ত্রোশাস্ত্রোক্ত কোনো খুঁটিনাটি অনুষ্ঠান ও উপচার বাদ দিবার কথা তিনি ভাবিতে পারিতেন না। শাস্ত্রোক্ত আরাধনায় জনমানসে দেবী স্ফুরিতা হইয়া উঠেন এবং মৃন্ময়ী চিন্ময় রূপ পরিগ্রহ করেন, একথাটি বার বার তিনি বলিতেন। পূজা সম্পর্কে শিবচন্দ্র লিখিয়াছেন:

"যাঁহার শক্তি আমাতে সংক্রামিত করিতে হইবে, তাঁহার তত্ত্ব-সাগরে আমার আত্মঅস্তিত্ব একেবারে ডুবাইয়া দিতে হইবে। নতুবা তাঁহার সে শক্তি কিছুতেই আমাতে সংক্রামিত হইবার নহে। যাঁহার ভাবে যিনি যতদূর আত্মহারা হইয়াছেন তিনি তাঁহাতে ততদূর তন্ময়ত্ব লাভ করিয়াছেন; যতদূর তন্ময়তা সিদ্ধি হইয়াছে, ততদূরই শক্তি তাঁহাতে সংক্রামিত হইয়াছে। শক্তিরাজ্যে ইহা নৈসর্গিক নিয়ম।

"মাকে ডাকিবার, বিবিধ উপচারে অর্চনা করিবার, এবং তাঁহার ভাবে আত্মহারা হইবার মতো শক্তি হৃদয়ে সঞ্চয় করিবার পর মায়ের প্রতিমায় তাঁহার আবির্ভাবের কথা বিচার করা আবশ্যক। তুমি দেখ প্রতিমার পূজা, কিন্তু যিনি স্বয়ং পূজা করেন, অলৌকিক দৃষ্টি বলে তিনি কিন্তু দেখিতে পান—অচেতন প্রতিমা যন্ত্রে চৈতন্যময়ীর পূর্ণ আবির্ভাব। প্রাণ প্রতিষ্ঠার পর হইতে বিসর্জনের পূর্ব পর্যন্ত

সাধকের সিদ্ধাঞ্জনস্নিগ্ধ নয়নে মৃন্ময়ী প্রতিমা তখন চিন্ময়ীর স্বরূপে আবির্ভূত হইয়া নিত্য নব লাবণ্যময়ী ব্রহ্মময়ী বিশ্বজননীর ব্রহ্মময় কান্তিচ্ছটা উদ্গীরণ করে।"

"মায়ের ভক্ত তাঁহার অন্তর হইতে চিন্ময়ীর যে জ্যোতির আনিয়া মৃন্ময়ীতে সংযোজিত করেন, মৃন্ময়ীতে পূজা শেষ করিয়া আবার সেই চিন্ময়ীর জ্যোতিঃ চিন্ময়ীতে সংযোজিত করেন। তখন বাহিরের মণ্ডপে যেমন ভুবনভরা রূপের ছটা, অন্তরের মণ্ডপেও দেখি তেমনই অনুপম সৌন্দর্য-ঘটা।"

বিশ্বজননীর লীলা সদাই তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তজনের হৃদয়ে। চকিত আবির্ভাব ও অন্তর্ধানে, আলোয় আঁধারে, বহু বিচিত্র রসে এই লীলা উচ্ছলিত। মায়ের এই লীলা তাঁহার জীবনে কোন্ রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে সে সম্পর্কে শিবচন্দ্র বলিতেছেন, "মা আমাদের যেমন ভিতরে তেমনি বাহিরে, যেমন বাহিরে তেমনি ভিতরে। কিছুদিন এইরূপে ভিতরে বাহিরে আসা যাওয়া করিতে করিতে প্রাণের কপাট যেদিন একেবারে খুলিয়া যাইবে, সেইদিন আমার আবাহন বিসর্জন একেবারে জন্মের মতো ঘুচিয়া যাইবে। বাহিরে চাহিলে যেদিন ভিতরের মূর্তি আমি দেখিতে পারিব, ভিতরে চাহিলে যেদিন বাহিরের মূর্তি দেখিব, ভিতরে বাহিরে,—বাহিরে ভিতরে যেদিন এক হইয়া যাইবে, সেইদিন মা আমার আসা যাওয়া ঘুচাইয়া চরণ দুখানি গোছাইয়া স্থির হইয়া বসিবেন। অশান্ত নৃত্যকালী সেইদিন আমার শান্ত হইবেন কিংবা কি জানি অন্তরে বাহিরে খোলাপথ পাইয়া হয়তো আনন্দময়ী আরও ছুটাছুটি করিবেন। কিন্তু সে ছুটাছুটি করিলেও সেদিন আমি আর তাঁহাকে আনিবও না, লইবও না, তিনি আপনি আনন্দে আপনি আসিবেন, আর আপনি যাইবেন— আপনি নাচিবেন, আপনি গাইবেন, আপন খেলা আপনি খেলিবেন, আমি সেই সঙ্গে সঙ্গে তাল দিয়া 'জয় মা—জয় মা' বলিয়া নাচিয়া বেড়াইব।"

শিবচন্দ্রের অনুরাগী ভক্ত এবং তাঁহার জীবনের বহু ঘটনা ও অনুষ্ঠানের প্রত্যক্ষদর্শী, শ্রীবসন্তকুমার পাল তাঁহার কুলকুণ্ডলিনী-পূজার বিবরণ দিতে গিয়া লিখিয়াছেন :

পরমসিদ্ধ, মাতৃসাধন সুধার অর্ণব, শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণবের আরাধিতা সর্বমঙ্গলা দেবীর নিত্যকার পূজার সহিত অন্যতম অপরিহার্য অবশ্য অনুষ্ঠান-অঙ্গ তন্ত্রোক্ত বিধানে কুলকুণ্ডলিনী শক্তির পূজা এবং ভোগ ব্যবস্থিত ছিল। উহার উপচারাদির মধ্যে প্রধান ছিল কাঁচা দুগ্ধ, উৎকৃষ্ট জাতীয় সুপক্ক কদলী ও পরমান্ন প্রভৃতি। এই পূজাটি অনুষ্ঠিত হইত শিবমন্দিরে শিবসন্নিধানে। ভোগ নিবেদন সমাপন করিয়া শিবচন্দ্র নিমীলিতনেত্রে ধ্যান নিমগ্ন হওয়ার অনতিকাল মধ্যেই কোথা হইতে কুলকুণ্ডলিনী স্বরূপিণী একটি বৃহৎ গোক্ষুরসর্প (সাড়ে চার ফুট পাঁচ ফুট লম্বা) আসিয়া দুগ্ধ, পরমান্ন ও পাত্রস্থিত নিবেদিত আহার্য ভোজনে রত হইত। কখনও কখনও সঙ্গে আর একটি শ্বেত সর্পের আগমনও হইত, অবশ্য শ্বেতসর্পটি প্রত্যহ দেখা যাইত না। পরিতোষ সহকারে ভোগ প্রসাদ আহারান্তে সর্পটি ফণা বিস্তারপূর্বক ধ্যানে উপবিষ্ট শিবচন্দ্রের মস্তকের উচ্চতার সমান ঊর্ধ্বে উঠিয়া দণ্ডায়মান অবস্থায় ফোঁস ফোঁস শব্দে দুলিতে থাকিত।

অর্ধোন্মীলিত নেত্রে ভাবাবিষ্ট শিবচন্দ্র—"আয় মা, আয় মা, এলি ? ব্রহ্মময়ী তারা মা আমার, আয় আয়"—ধ্বনি করিতে করিতে সম্মুখে হস্ত সম্প্রসারণপূর্বক কুণ্ডলিনী স্বরূপা অজগরটির মস্তকে হাত বুলাইয়া দিলে উহা তাঁহার ক্রোড়ে উঠিয়া এবং কুণ্ডলী পাকাইয়া বিরাট ফণাটি বিস্তারপূর্বক হিস্ হিস্ শব্দে ডানে বামে দুলিতে থাকিত। আবার ক্ষণকাল পরেই বিদ্যার্ণব ঠাকুরের কখনও দক্ষিণবাহু কখনও বামবাহু জড়াইয়া ধরিয়া ক্রমে উপরে উঠিয়া তাঁহার কণ্ঠ সংলগ্ন হইয়া পুনঃ ফণা বিস্তার করিয়া তাঁহার বুকের সহিত মাথাটি লাগাইয়া যেন কান পাতিয়া থাকিত।

মনে হইত, সর্পটি যেন বিদ্যার্ণব হৃদয়ের গভীরতম অন্তস্তল-উত্থিত মর্মোচ্ছ্বাস ধ্বনি শ্রবণ করিবার জন্য এভাবে তাঁহার বক্ষসংলগ্ন হইয়া

থাকিত। আর বিদ্যার্ণব ঠাকুর মাঝে মাঝে ভাব নিমগ্ন অবস্থায়ই "তারা তারা তারা" বলিয়া তারায় আত্মহারা হইয়া তারস্বরে ধ্বনি দিতে থাকিতেন।

এইরূপে বারকয়েক ধ্বনি দেওয়ার পর পুনঃ সর্পের মস্তকে হস্ত সঞ্চালন করিলে সর্পটি এবার বিদ্যার্ণবের কণ্ঠ হইতে শিরে উঠিয়া দুই-চারবার বিস্তৃত ফণায় দোল দিয়া ধীরে ধীরে সম্মুখস্থ শিবের লিঙ্গমূর্তিটির শীর্ষে আরোহণ করিত, পূর্ববৎ ফণা বিস্তার করিয়া, ক্ষণকাল থাকিয়া, কোথায় আবার অদৃশ্য হইয়া যাইত।

সর্পটি চলিয়া যাইবার পর শিবচন্দ্র ভোগের ভুক্তাবশিষ্ট হইতে প্রসাদ লইয়া "তারা তারা" ধ্বনি করিতে করিতে সাশ্রুনয়নে তাহা গ্রহণ করিতেন। প্রথম প্রথম সকলেই তাঁহাকে এই প্রসাদ গ্রহণে বিরত থাকিবার জন্য আকুতি ও অনুরোধ করিত—কিন্তু তিনি নির্ভয়ে মায়ের প্রসাদ খাইয়া ফেলিতেন। নিঃসন্দেহে দুঃসাহসিক ছিল এই কার্য।[১]

তন্ত্রসাধন, তন্ত্রসিদ্ধি ও তন্ত্রশাস্ত্রের তত্ত্বের আলোকে ভাস্বর হইয়া উঠিয়াছিল শিবচন্দ্রের জীবন। এবার এই ভাস্বর জীবনে দেখা দেয় আচার্যের ভূমিকা। আচার্যরূপে জনকল্যাণের তিনটি বৃহৎ কর্মসূচী তিনি গ্রহণ করেন।

প্রাচীন তন্ত্রসাধনার অবনতি এদেশে বহু শত বৎসর যাবৎ শুরু হইয়াছে। এই অবনতি নিম্নতম পর্যায়ে আসিয়া পৌঁছিয়াছে বৌদ্ধ-তান্ত্রিকতার শেষ যুগে। সাধনার ভিতরে ঢুকিয়া পড়িয়াছে নানা বীভৎসতা, নিষ্ঠুরতা ও যৌন কদাচার। শাস্ত্রের ভিতরে দেখা দিয়াছে নানা বিভ্রান্তি ও অপব্যাখ্যা। ফলে এই নিগূঢ় মুক্তি-সাধনা সম্পর্কে জনসাধারণের মনে এই যুগে সঞ্চারিত হইয়াছে ঘৃণা, সন্দেহ ও অহেতুক আতঙ্ক।

এই অধঃপতন ও অপব্যাখ্যার কবল হইতে তন্ত্রসাধনা ও তন্ত্রশাস্ত্রকে মুক্ত করার জন্য তৎপর হইয়া উঠিলেন শিবচন্দ্র।

এই কার্য সাধন করিতে হইলে সাধনা এবং শাস্ত্রের প্রকৃত স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করা আবশ্যক। তাই সাধনকামী শিষ্যদের সম্মুখে তিনি তুলিয়া ধরিলেন নিজের বীরাচারী ও শুদ্ধতর ক্রিয়াসমন্বিত সাধনা। কাশীতে থাকা কালে ভারতের কৌল সাধক এবং পণ্ডিত মহলে শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণবের তন্ত্রসিদ্ধির কথা প্রচারিত হয় এবং বহু মুমুক্ষু ভক্ত তাঁহার নিকট আশ্রয় গ্রহণ করিতে আসেন, দীক্ষা ও উপদেশ পাইয়া তাঁহারা ধন্য হন।

প্রকৃত তন্ত্রশাস্ত্র এবং তন্ত্রতত্ত্বের প্রচার না হইলে তন্ত্র সম্পর্কে লোকের ভয় এবং সন্দেহ দূর হইবে না, অনুরাগও আসিবে না। তাই নিজের নিভৃত সাধনচক্র হইতে শিবচন্দ্রকে বাহিরে আসিতে হইল, অমিত উৎসাহ ও কর্মশক্তি নিয়া প্রচারকর্মে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন।

সর্বপ্রথমে কাশীধামে উচ্চকোটির সাধক ও শাস্ত্রবিদ্‌দের নিয়া শিবচন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন সর্বমঙ্গলা সভা। এই সভার মাধ্যমে, শিবচন্দ্র এবং তাঁহার সহযোগী মনীষী ও সাধকদের চেষ্টায় তন্ত্রের শুদ্ধতর রূপটির সহিত সাধক ও ভক্ত জনগণের পরিচয় সাধিত হইতে থাকে।

শিবচন্দ্র একাধারে ছিলেন সিদ্ধপুরুষ, শাস্ত্রবিদ্‌, কবি ও বাগ্মী, কাজেই তাঁহার ব্যক্তিত্বের আকর্ষণ ছিল অপরিসীম। বিশেষ করিয়া জনজীবনে তাঁহার বাগ্মিতার প্রভাব ছিল বিস্ময়কর। বাংলা, সংস্কৃত এবং হিন্দিতে অনর্গলভাবে তিনি বক্তৃতা দিতে পারিতেন। তাঁহার জ্ঞানের গভীরতা, ভাষার আবেগময় ঝঙ্কার এবং তেজোদৃপ্ত উদ্দীপনায় সহস্র সহস্র শ্রোতা বিমুগ্ধ হইয়া যাইত, গ্রহণ করিত উচ্চতর জীবন সাধনার প্রেরণা।

এই সময়ে সারা উত্তর ভারতে সনাতন ধর্মের উজ্জীবনের জন্য এক প্রবল ভাবতরঙ্গ উত্থিত হয়। এই তরঙ্গের শীর্ষে অধিষ্ঠিত দেখি ধর্ম সংস্কৃতির ধারক বাহক একদল প্রতিভাধর পুরুষকে। ইঁহাদের

মধ্যে অগ্রণী—শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব, স্বামী কৃষ্ণানন্দ, শশধর তর্কচূড়ামণি, কালিবর বেদান্তবাগীশ প্রভৃতি।

শিবচন্দ্র এবং ইঁহাদের সমবেত চেষ্টায়, বিশেষত ইঁহাদের বাগ্মিতা ও লেখনীর প্রভাবে, ভারতের ধর্ম ও সংস্কৃতি সম্পর্কে শিক্ষিত সমাজে নূতন মূল্যবোধ জাগিয়া উঠে, হিন্দু ধর্মের শাশ্বত ও সর্বজনীন রূপের প্রতি সকলের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়।

শিবচন্দ্রের আবাল্য বন্ধু জলধর সেন তাঁহার অসাধারণ বাগ্মিতা সম্পর্কে বলিয়াছেন, "সাধু-ভাষায় এমন ওজস্বিনী বক্তৃতা ক'রে ঘণ্টার পর ঘণ্টা শ্রোতৃবর্গকে মন্ত্রমুগ্ধ ক'রে রাখবার শক্তি সত্যসত্যই শিবচন্দ্রের ছিল। সে সময়ে আরও একজনের সে শক্তি ছিল, তিনি পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন। উভয়ের বক্তৃতার একটা পার্থক্য এই ছিল যে, শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন চলতি ভাষায় বক্তৃতা করতেন, আর শিবচন্দ্র সাধুভাষায় বলতেন। বাংলা ভাষা যে কতদূর শক্তিসম্পন্ন, বাংলা ভাষার মাধুর্য যে কতদূর মনোমদ, যাঁরা বাগ্মীপ্রবর শিবচন্দ্রের বক্তৃতা শুনেছেন তাঁরা সেকথা অকুণ্ঠিত চিত্তে স্বীকার করবেন।"

তন্ত্রের প্রকৃত স্বরূপ ও মাহাত্ম্য প্রচারে উদ্বুদ্ধ হইয়া শিবচন্দ্র রচনা করিলেন 'তন্ত্রতত্ত্ব'। এই মহান্ গ্রন্থ তাঁর সারস্বত জীবনের এক মহান্ কীর্তি। তন্ত্রশাস্ত্রের প্রাচীনত্ব, মহত্ত্ব এবং প্রামাণিকতা এই গ্রন্থে তিনি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এই সঙ্গে চেষ্টা করিয়াছেন তন্ত্র সম্পর্কে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিদের অশ্রদ্ধা ও অবিশ্বাস দূর করিতে। এই গ্রন্থে তন্ত্রসিদ্ধ মহাপুরুষ শিবচন্দ্র একথাও প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে তন্ত্রের সহিত বেদ, দর্শন প্রভৃতির ও পুরাণের কোনো বিরোধ নাই। শুধু তাহাই নয়, তন্ত্র, বেদান্ত, বৈষ্ণব শাস্ত্র প্রভৃতি সকলেরই মধ্যে হিন্দু সাধনার পরমতত্ত্ব প্রতিফলিত, এই উদার সার্বভৌম মতও তিনি ইহাতে উপস্থাপিত করিয়াছেন। এই উদার শুভবুদ্ধি ও অখণ্ড জীবনবোধ শিবচন্দ্রকে চিহ্নিত করিয়া দেয় সমকালীন ভারতের এক অসামান্য ধর্মনেতা রূপে।

কবি, সাহিত্যিক ও তত্ত্বদর্শী শিবচন্দ্রের রচনার সংখ্যা কম নয়।

সাহিত্যিক মূল্যায়নের দিক দিয়াও এগুলি বৈশিষ্ট্যের দাবি রাখে। তাঁহার রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—তন্ত্রতত্ত্ব (১ম ও ২য় ভাগ), গঙ্গেশ (নাটক), দুর্গোৎসব (২খণ্ড), মা, কর্তা ও মন (১ম, ২য়) রাসলীলা (১ম, ২য়), গীতাঞ্জলি (১ম, ২য়), শৈব গীতাবলী, ভাগবতী তত্ত্ব, স্বভাব ও অভাব, পীঠমালা, স্তোত্রমালা, এবং দশমহাবিদ্যা স্তোত্র।

কৌল তত্ত্ব ও সাধনার ধারক বাহক 'শৈবী' নামক একটি পত্রিকাও কয়েক বৎসর তিনি সম্পাদনা করিয়াছিলেন।

বাংলার মানস ও সমাজ বিবর্তনে তন্ত্রের সাধন ও দার্শনিকতার প্রভাব অস্বীকার করার উপায় নাই। যুগে যুগে এ প্রভাব সক্রিয় হইয়া রহিয়াছে। শিবচন্দ্র তন্ত্রসিদ্ধ মহাপুরুষ এবং তন্ত্রশাস্ত্রের বিশিষ্ট প্রবক্তা, বিশেষ করিয়া উনবিংশ শতকের তন্ত্র-উজ্জীবনের চিহ্নিত নেতা। তাই বাংলায় তন্ত্রধৃতির বৈশিষ্ট্যটি স্মরণ রাখিয়াই তিনি অবতীর্ণ হইয়াছিলেন তাঁহার জীবন ব্রত উদ্‌যাপনে।

এ প্রসঙ্গে বাংলার সাহিত্য ও সমাজ মানসের সুধী সমালোচক অধ্যাপক মোহিতলাল মজুমদারের বক্তব্য অনুধাবনযোগ্য:

—তন্ত্র বলিতে যাহা বুঝায় তাহা বহু দেশের বহুকালের সাধন পদ্ধতির অঙ্গীভূত হইয়াছিল। প্রাক্ ঐতিহাসিক যুগেও ইহার প্রচার ছিল। উহা প্রাক্ বৈদিক তো বটেই। উহারই নানা রূপ ভেদ, নানা জাতির সাধনায় ঘটিয়াছে; এককালে জগতের সকল সুপ্রাচীন সমাজে উহা প্রচলিত ছিল। সেই মূল তত্ত্বকে বহন করিয়া অতঃপর নানা যুগের নানা ধর্ম অল্পবিস্তর তান্ত্রিকতা আশ্রয় করিয়াছে। এ কথা সত্য হইলেও, বাংলার সম্বন্ধে দুইটি বিশেষ কথা অনুধাবন করিবার আছে। প্রথমত—এই বাংলার ভূমিতে উহা একটি নিরবচ্ছিন্ন ধারায় বহিয়া আসিয়াছে এবং এই বাংলাতেই ঐ সাধনার চরমোৎকর্ষ ঘটিয়াছে। দ্বিতীয়ত—তন্ত্র অর্থে যে সাধনতত্ত্ব বা পদ্ধতিই বুঝাক না কেন এবং যে কালে যে ধর্মের

সহিত যুক্ত হইয়া উহা একটি বিশিষ্ট রূপ ধারণ করুক না কেন, সেই সকল মত ও সাধনপন্থা এই বাংলায় একটি বিশিষ্ট বাঙালী পন্থায় রূপান্তরিত হইয়াছে। তেমন আর কোথাও হয় নাই। অতএব এমন কথা বলা যাইতে পারে যে, ঐ তন্ত্রও এই বাংলাদেশে একটা বিশেষ ভাববীজকে আশ্রয় করিয়াছে। এক কথায়, শৈবতান্ত্রিক বা বৌদ্ধতান্ত্রিক বা তিব্বতীয়, চীনা তান্ত্রিক অথবা আরও কোনো আদিম অসংস্কৃত তান্ত্রিক সাধনা কোনো এককালে বাংলায় প্রবেশ করিয়া থাকিলেও, বাঙালীর নিজের একটা তন্ত্র ছিল—সেই তন্ত্রে সকল তন্ত্রই বাঙালী তন্ত্র হইয়া উঠিয়াছে। এই বাঙালী তন্ত্রের সর্বশেষ জয় ঘোষণা আমরা দেখিয়াছি বাংলার শাক্ত ও বৈষ্ণব সাধনার অভ্যুদয়ে, বাংলার সহস্র সার্বিক সাধনার যে একটি বিশেষ সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহার পূর্ণ পুষ্পিতরূপ উহাই।[১]

সিদ্ধ কৌল শিবচন্দ্রের প্রচারিত তান্ত্রিকতায় বাংলার তন্ত্র-সাধনার সেই উদার ও সর্বসমন্বিত রূপ, সেই পুষ্পিত ও ফলিত রূপ, আমরা দেখিতে পাই।

মহামায়া জগদম্বার স্বরূপ ব্যাখ্যা করিতে গিয়া সাধক শিবচন্দ্র লিখিয়াছেন :—মা! স্বরূপতঃ তোমার কোনো অংশই কখনও একেবারে দুইভাগে ঢাকা পড়িতে পারে না ; কারণ একভাগে তুমি চিরকাল আবৃতা, আচ্ছাদিতা—লুক্কায়িতা অন্তর্হিতা, আর অন্যভাগে তুমিই নিবারণসুন্দরী—তুমি স্বপ্রকাশ জ্যোতির্ময়ী নিখিল আবরণের আবরণরূপিণী ব্যোমব্যাপিনী দিগম্বরী। যে ভাগ তোমার পশ্চাৎবর্তী তাহাই মা!—মায়া রাজ্য ; আর যাহা মায়ার অতীত তত্ত্ব তাহাই তোমার সম্মুখবর্তী। মহাবিদ্যার দৃষ্টিপাতে অবিদ্যার আঁধার ঘুচিয়া যায়, তাই তোমার সম্মুখে মায়া দাঁড়াইতে পারে না। কিন্তু মা! এ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ডের একমাত্র উপাদান মায়া তবে কাহার আশ্রয়ে দাঁড়াইবে? তাই তো মায়া তোমার চরণে শরণাগতা, অভয়পদের

১ বাংলা ও বাঙালী : মোহিতলাল মজুমদার

চিরাশ্রয়ে নিরাপদে রক্ষিতা ; তাই মা ! মায়ার অতীতা হইয়াও স্বয়ং তুমি মায়াময়ী মহামায়া[১]।

জগজ্জননীর অখণ্ড অদ্বৈতসত্তার উদ্ভাসন দেখা দিয়াছে সাধক শিবচন্দ্রের জীবনে। স্নেহময়ী ইষ্টদেবী আর পরাৎপরা মহাশক্তি এবার তাঁহার উপলব্ধিতে এক এবং অখণ্ড হইয়া গিয়াছেন। তাই তিনি বলিতেছেন :

—মূলে তিনি ব্রহ্মময়ী, বৃক্ষে তিনি মায়াময়ী পুষ্পে তিনি জগন্ময়ী আবার ফলে তিনি মুক্তিময়ী ; ব্রহ্ম, ঈশ্বর, মায়া, অবিদ্যা এই চারি তাঁহারই স্বরূপ। একা তিনিই এই চতুর্ভাগে বিভক্ত হইয়া চরাচর জগতে আনন্দ লীলায় অভিনেত্রী, আপন আনন্দে আপনি মাতিয়া তিনি উন্মাদিনী, আপনি জন্মিয়া, আপনি মরিয়া, আপন শ্মশানে আপনি নাচিয়া, আপন শবে শিব হইয়া আপনি তিনি বিলাসিনী। আপনি পুরুষ আপনি প্রকৃতি, আপনি মহাকাল যুবতী, আপনি রতি, মতি, গতি পরমানন্দ নন্দিনী। আপনি মায়া, আবার আপনি অমায়া, আপনি মায়ারূপিণী ; আপনি বিদ্যা, আপনি অবিদ্যা, আপনি স্যাধ্যাসনাতনী, বেদ বেদান্ত পুরাণ তন্ত্র যাহাকে তুমি জিজ্ঞাসা করিবে, তিনি তাঁহার এই অদ্বৈত বিভূতির সুস্পষ্ট সাক্ষ্য প্রদান করিবেন।

—সাধক সেই শাস্ত্রীয় আস্তিক্য দৃষ্টিতেই তাঁহার বিদ্যা এবং অবিদ্যা উভয়রূপে ব্রহ্মাণ্ডলীলা দেখিয়া, কি বন্ধনে কি মোচনে, উভয় দশাতেই মায়ের কোলে বসিয়া থাকেন, তিনি সেই সোহাগে গলিয়া গিয়া সেই অভিমানে কঠিন হইয়া, আদরে মায়ের কোলে বসিয়া, বন্ধনে বদ্ধ দুটি হাত মায়ের হাতে ধরিয়া দিয়া গদ্‌গদ স্বরে বলিতে থাকেন "মা ! তুই বড় পাগলী মেয়ে।"

তন্ত্র অর্বাচীন নয়, সুপ্রাচীন—সনাতন তন্ত্র বেদবহির্ভূত নয়, বেদেরই অংশ। বৈদিক ঋষিদের অনেককেই তন্ত্রের মন্ত্রশক্তির

১ মা (১ম ভাগ) : শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব

সহায়তা গ্রহণ করিতে দেখা গিয়াছে। তাই বেদ ও তন্ত্রকে পৃথক করিয়া দেখা অতিশয় ভ্রমাত্মক—একথাটি শিবচন্দ্র বার বার তাঁহার লেখায় ও ভাষণে জোর দিয়া বলিয়াছেন :

—ভগবান্ ভূতভাবন নিজেই বলিয়াছেন : 'মথিত্বা জ্ঞানদণ্ডেন বেদাগম মহোদধি',—আমি জ্ঞানদণ্ডদ্বারা বেদশাস্ত্ররূপ মহাসমুদ্র মন্থন করিয়া তন্ত্ররূপ অমৃতের উদ্ধার করিয়াছি।..."

—বেদ বেদাঙ্গ বেদান্ত যদি তন্ত্রের পূর্বে না থাকিবে তবে বেদশাস্ত্র-সমুদ্রের মন্থন সম্ভবে কিরূপে ? এতাবৎ যিনি তন্ত্রের প্রচারকর্তা, তিনিই তো নিজ মুখে বলিয়াছেন : বেদের পর তন্ত্রের প্রচার। তবে আর তন্ত্র আধুনিক বলিয়া নূতন কথাটা কি শুনাইলে ভাই ? কিন্তু তাই বলিয়া মনে করিও না ৪০ হইতে ৭০ বৎসর যাহাদের পরমায়ুর পূর্ণ সংখ্যা তাহাদের পক্ষেও আধুনিক। ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-স্থিতি সংহার যাঁহার এক কটাক্ষের ফল, তন্ত্রের এ আধুনিকতা তাঁহার চক্ষেই শোভা পায়। দ্বিনেত্রের উপর যাঁহার ত্রিনেত্র উদ্ভাসিত, তন্ত্রের স্বরূপ তাঁহার দৃষ্টিতেই প্রতিবিম্বিত, ভগবানের আজ্ঞা, শব্দব্রহ্ম এবং পরব্রহ্ম উভয়েই আমার নিত্যদেহ। হিন্দুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া যথাশাস্ত্র তন্ত্রে বিশ্বাস করিতে হইলে ব্রহ্মের সচ্চিদানন্দ স্বরূপে আর শব্দব্রহ্মরূপে শাস্ত্রকে তাঁহারই নিত্যমূর্তি বলিয়া অবনতমস্তকে মানিয়া লইতে হইবে। তাহাতে কি বেদ, কি পুরাণ, কি তন্ত্র, কি জ্যোতিষ —ইহাদের সকলকেই ভগবানের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বলিয়া জানিতে হইবে। শাস্ত্রসকল যে এক কেন্দ্রবন্ধনে আবদ্ধ তাহার একটি বন্ধন ছিন্ন করিলেই সমস্তই বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবে। কাহারও সাধ্য নাই ইহার কোনো একটির বিপর্যয় ঘটাইতে পারে।

—বেদ-মূলকতা না থাকিলে যেমন কোনো শাস্ত্রের প্রামাণ্য নাই, কোনো শাস্ত্রের প্রামাণ্য না থাকিলেও তদ্রূপ বেদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নাই। বিশেষতঃ তন্ত্রশাস্ত্র মন্ত্রশাস্ত্র ; মন্ত্রই বেদের জীবনীশক্তি বা পরমাত্মা। সুতরাং তন্ত্রশাস্ত্রের অভাব হইলে, বেদ তো তখন চেতনাহীন। বেদেও লোকের যেমন অধিকার, তন্ত্রেও তেমনিই।

আসলে বৈদিক হইয়া যেমন বেদ বুঝিতে হয়, তান্ত্রিক হইয়া তেমনি তন্ত্র বুঝিতে হয়। সেইরূপ উপনয়ন সংস্কারে সংস্কৃত হইয়া যেমন প্রকৃত ব্রাহ্মণ হইতে হয়, সাধনা করিয়া তেমনি সিদ্ধ হইতে হয়। মন্ত্রশাস্ত্র যদি বেদের আত্মা হয়, তবে আর বেদের পর তন্ত্রের সৃষ্টি—ইহা সঙ্গত কিরূপে ?····

—স্বয়ং মহাদেব হইতে আরম্ভ করিয়া ঋষিগণ পর্যন্ত সকলেই বেদের অনুসরণ-কর্তা ভিন্ন কর্তা কেহ নহেন। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, রামচন্দ্র প্রভৃতি ভগবদবতার এবং অন্যান্য দেবগণ যুগযুগান্তে সময়ে সময়ে বেদের প্রকাশক হইয়াছেন এইমাত্র। শাস্ত্র প্রচারের সময় সকল ঋতু মাস বৎসরাদির ন্যায় স্ব স্ব চক্রবর্তেই ঘুরিয়া আসিতেছে, তাই বেদেও তন্ত্রমন্ত্রের উল্লেখ দেখিতে পাই।

—বেদে তন্ত্রমন্ত্রের উল্লেখ শুনিয়া হয়তো অনেকেই চমকিত হইবেন। প্রকৃতপক্ষে আমরা তন্ত্রকে একমাত্র মন্ত্রশক্তিরই লীলা খেলা—সাধনাসিদ্ধির আকর—ভিন্ন আর কিছু বুঝি না। সেই মন্ত্র-শক্তিই বেদের সঞ্জীবনী। অন্যান্য শাস্ত্র বেদের অঙ্গ হইলেও মন্ত্রশক্তি বেদের পরমাত্মা। জগৎপিতা ও জগজ্জননীর প্রশ্নোত্তরে তাহাই আগম ও নিগম মূর্তিতে পুনঃপ্রকটিত হইয়াছে মাত্র। বেদ ও তন্ত্র উভয়ের যথাশাস্ত্র অধিকারী যিনি, তিনি একথা কখনও অস্বীকার করিতে পারিবেন না।

তন্ত্রশাস্ত্র যে বেদ ভিত্তিক, বেদেরই 'অন্তর্ভুক্ত, এবিষয়ে শিবচন্দ্র নিঃসংশয় ছিলেন। তাই লিখিয়াছেন[১] :

—হিন্দুজাতির একমাত্র আশ্রয় বেদবৃক্ষ—তান্ত্রিক পঞ্চোপাসনা উহারই পঞ্চশাখা। এই বিশাল শাস্ত্রবৃক্ষ সহস্র মন্বন্তর কল্পকল্পান্তরের প্রাচীন। জীবাত্মা পরমাত্মায় যে ভেদ, বেদ ও তন্ত্রে সেই ভেদ অর্থাৎ আত্মার অস্তিত্বে যেমন মনের (ন্যায় মতে জীবাত্মার) অস্তিত্ব, তন্ত্রের অস্তিত্বেও সেইরূপ বেদের অস্তিত্ব। জীবদেহে পরমাত্মা যেমন বিশুদ্ধ চিৎশক্তি, শাস্ত্রদেহেও তন্ত্র তদ্রূপ মন্ত্রময়ী চিৎশক্তি।

১ তন্ত্রতত্ত্ব, ১ম ভাগ : শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব

জীবাত্মায় যেমন সগুণ মনঃশক্তির প্রক্রিয়াসকল নিত্য প্রবাহিত, বেদেও তদ্রূপ স্বত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই ত্রিগুণ অধিকারানুরূপ জ্ঞানময় শক্তিসকল নিত্য অধিষ্ঠিত। মারণ, উচাটন ইত্যাদি ব্যাপারের অধিকাংশ তন্ত্রোক্ত প্রক্রিয়া অথর্ববেদে কথিত হইয়াছে। আবার বেদোক্ত অনেক মন্ত্রই তান্ত্রিক উপাসনায় নির্দিষ্ট হইয়াছে। ইহার পর বেদের যে শত সহস্র শাখা লুপ্ত হইয়াছে তাহাতে কত শত তান্ত্রিক উপাসনাতত্ত্ব বিলীন হইয়াছে, কাহার সাধ্য তাহার ইয়ত্তা করিবে? অন্য উদাহরণ নিষ্প্রয়োজন, বেদের সর্বস্ব সার সম্পত্তি প্রণবও যে তন্ত্রমন্ত্রারিক্ত নহে সাধকবর্গ মন্ত্রতত্ত্বে তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাইবেন।

তন্ত্র সাধনায় মন্ত্রের চৈতন্যময় ক্রিয়াশক্তির গুরুত্ব অত্যন্ত বেশী —একথাটি শিবচন্দ্র তাঁহাদের শিষ্যদের কাছে বার বার বলিতেন। আরও বলিতেন: "সাধকের আত্মশক্তি বায়ুস্থানীয় এবং মন্ত্রশক্তি অগ্নিস্থানীয়, এজন্য তাঁহার আত্মশক্তি নিমেষ মধ্যে তাহাকে বিপুল করিয়া তুলিতে পারে। শাস্ত্র যত কেন দূর পারাবার না হয়, একমাত্র ভেলা যেমন অগ্রসর হইয়া তোমাকে তাহার পারান্তরে লইয়া যাইবে, তদ্রূপ জ্ঞান, যোগ, সমাধিতত্ত্ব যত কেন দূরান্তর না হয় মন্ত্রময়ী মহাদেবী মূর্তিমতী হইয়া তোমার হাত ধরিয়া তাহার অপর পারে লইয়া যাইবেন। জ্ঞান, যোগ, সমাধি যাহারই কেন অনুষ্ঠান না কর, দেখিবে তাহার সকলের মধ্যেই সর্বেশ্বরী আনন্দময়ী মুক্তকেশী মা আমার আনন্দে হাসিয়া হাসিয়া নাচিতেছেন। তাঁহারই অশ্রান্ত নৃত্যভরে আমার জ্ঞানের সমুদ্রে প্রেমের তরঙ্গ উদ্বেলিত হইয়া পড়িতেছে।"

তন্ত্র গৃহ আর শ্মশান, যোগ ও ভোগ এই দুটিকেই যুক্তভাবে একীভূত সত্তায় দেখিতে শিখায়। জগৎ সৃষ্টির প্রতিটি ধূলিকণায় ব্রহ্মময়ী জগজ্জননীর বিভূতি ও স্বরূপ দর্শন করিয়া তন্ত্রাচারী বীর সাধক আনন্দে উদ্বেল হইয়া উঠে। তারপর দ্বৈত হইতে তাঁহার উত্তরণ ঘটে অদ্বৈতে, লীলা হইতে পৌঁছে গিয়া অদ্বৈতে। এই তত্ত্ব

ব্যাখ্যা করিতে গিয়া শিবচন্দ্র বলিয়াছেন, "অন্ধকার না থাকিলে যেমন আলোকের স্বরূপ অবগত হওয়া যাইত না তদ্রূপ এই নাম রূপাত্মক দ্বৈত ব্রহ্মাণ্ড না থাকিলে অদ্বৈত তত্ত্বও অবগত হওয়া যাইত না, দ্বৈতাদ্বৈত বিচার করিবার কর্তাও কেহ থাকিত না, প্রয়োজনও হইত না। মৃত্তিকা বুঝিতে হইলেই, যে দেশে ঘট কুম্ভ কুম্ভকার কিছুই নাই সেই দেশে গিয়া বুঝিতে হইবে, এরূপ নহে। বুদ্ধি থাকিলে ঘট সম্মুখে রাখিয়াই বুঝিতে হইবে যে, ইহা স্বরূপতঃ মৃত্তিকা বই আর কিছুই নহে; এইরূপে মৃত্তিকা তত্ত্ব যিনি বুঝিয়াছেন তিনি ঘট দেখিয়া বিস্মিত হন না, অধিকন্তু ব্রহ্মময়ীর অনন্ত শক্তি দেখিয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়া নামরূপ সকল ভুলিয়া প্রতিরূপে সেইরূপ দেখিতে থাকেন—যেরূপে এই বিশ্বরূপ ডুবিয়া গিয়া ব্রহ্মরূপের আবির্ভাব হয়, তুমি আমি ঘট দেখিলেও জ্ঞানী যেমন তাহাকে মৃত্তিকা বই আর কিছুই দেখেন না, তদ্রূপ তুমি আমি স্ত্রীপুত্র পরিবারময় সংসার দেখিলেও তান্ত্রিক সাধক তাহাতে ব্রহ্মময়ীর স্বরূপ বই আর কিছুই দেখেন না।"

কালপ্রবাহের ফলে, যুগপরিবর্তনের প্রভাবে, তন্ত্রসাধনা এবং তন্ত্রশাস্ত্রের মধ্যে অনেক কিছু অবাঞ্ছনীয় বস্তু ঢুকিয়া পড়িয়াছে। তাহার ফলে তন্ত্র ও কৌলসাধকদের বিরুদ্ধে পুঞ্জীভূত হইয়া রহিয়াছে সন্দেহ, ঘৃণা এবং অপপ্রচার। ইহার প্রতিবিধান কিরূপে হইবে? তন্ত্রসাধনা ও তন্ত্রশাস্ত্রকে ত্যাগ করিলে তো প্রকৃত সমস্যার সমাধান হইবে না। বরং ইহাদের পরিশুদ্ধ করিয়া নিতে হইবে, সাধনালব্ধ সত্যের কষ্টিপাথরে যাচাই করিয়া নিতে হইবে। এক কথায় তন্ত্রকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে তাঁহার স্বমহিমায়, স্থাপন করিতে হইবে প্রকৃত সাধনার্থীদের পূজাবেদীর উপর।

আচার্য শিবচন্দ্র তাই বলিয়াছেন, "পথে প্রান্তরে শ্রান্ত পথিকের বিশ্রামের শান্তিনিকেতন এই যে কোটি কোটি অশ্বত্থ বটবৃক্ষ দিগ্‌দিগন্তে শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া কি লৌকিক পথিক পরমার্থ পথিক লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি সাধু সন্ন্যাসী সাধক সিদ্ধমহাপুরুষ-

গণকে আশ্রয় দিয়া রক্ষা করিতেছে, কত যোগী যোগীন্দ্র, ঋষি মহর্ষি মুনিগণের সাধনা সিদ্ধ এই সকল স্থাবর গুরুতরুগণের চরণ প্রান্তে নিত্য নিবেদিত ত হইতেছে ; সেই বিশাল বৃক্ষের প্রান্তরে অন্ধকারে সর্বস্ব অপহরণের জন্য চোর দস্যুদল, কোঠরে বা শাখা-প্রশাখায় শরীর ঢাকিয়া কখনও কি লুক্কায়িত থাকে না ? এখন সেই অপরাধেই কি যেখানে দেখিব অশ্বত্থ বটবৃক্ষ, সেইখানেই তাহাকে সমূলে ছেদন করিতে হইবে ? কোনো রমণী কখনও যদি ব্যভিচারিণী হয়, এই অপরাধে বিবাহ প্রথা উঠাইয়া দেওয়া যেমন বুদ্ধিমানের কাজ নহে, বর্তমান সমাজেও অত্যাচারী স্বেচ্ছাচারীদিগের দোষে সর্বমঙ্গলরূপ শাস্ত্রভাণ্ডার তন্ত্রশাস্ত্রকে ত্যাগ করাও তাহাই।”

কালের প্রভাবে পুণ্যময় ভারতে ধর্ম এবং আত্মিক সাধনার অবনতি ও অবক্ষয় শুরু হইয়াছে, আর শক্তিবিভূতিধর সিদ্ধ তান্ত্রিক মহাপুরুষেরা দিন দিন দুর্লভ হইতেছেন। কিন্তু প্রকৃত শ্রদ্ধা এবং প্রকৃত দৃষ্টি দিয়া দেখিতে জানিলে এই সিদ্ধ মহাত্মাদের দর্শন এখনও মিলে। এখনও প্রচ্ছন্ন অস্তিত্ব হইতে, অন্তরাল হইতে, মাঝে মাঝে তাঁহারা প্রকট হন। এ সম্পর্কে নিজের অভিজ্ঞতা ও দর্শনের ভিত্তিতে শিবচন্দ্র মুমুক্ষুদের আশ্বাস দিয়া বলিয়াছেন :

“এখনও তান্ত্রিক সিদ্ধ সাধক মহাপুরুষগণ নিজ নিজ তপঃপ্রভাবে ভারতের দিগ্‌দিগন্ত প্রজ্বলিত করিয়া রাখিয়াছেন, এখনও ভারতের শ্মশানে প্রতি অমাবস্যার ঘোরে মহানিশায় প্রজ্বলিত চিতাগ্নির সঙ্গে সঙ্গে ভৈরব ভৈরবীগণের জ্বলন্ত দিব্যজ্যোতি নৈশতমসা বিদীর্ণ করিয়া গগনাঙ্গন আলোকিত করে, এখনও শ্মশানের জলমগ্ন মৃত ও পচিত শবদেহ সাধকের মন্ত্রশক্তি প্রভাবে পুনর্জাগ্রত হইয়া সিদ্ধ সাধনায় সাহায্য করে, এখনও তান্ত্রিক যোগিগণ দৈব দৃষ্টি প্রভাবে এই মর্তলোকে বাস করিয়া দেবলোকের অতীন্দ্রিয় কার্য সকল প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। এখনও ভবভয়ভীত প্রণত শরণাগত ভক্ত সাধককে মুক্ত করিবার জন্য ভক্তভয়ভঞ্জিনী মুক্তকেশী মহা-শ্মশানে দর্শন দিয়া থাকেন। এখনও ব্রহ্মময়ীর সেই ব্রহ্মাদি বন্দিত

পদাম্বুজে ব্রহ্মরন্ধ্র স্থাপন করিয়া সাধক ব্রহ্মস্বরূপে মিশিয়া যান, এখনও মন্ত্রশক্তির অদ্ভুত আকর্ষণে পর্বতনন্দিনীর সিংহাসন টলিয়া থাকে। মুক্তিপুরীর শ্রান্ত যাত্রী সাধকের পক্ষে ইহাই চিরপ্রশস্ত রাজপথ, শয্যাশায়ী মুমূর্ষু অন্ধের পক্ষে ইহা অন্ধকার বই আর কিছুই নহে; কিন্তু অন্ধ, নিশ্চয় জানিও—এ অন্ধকার তোমারই নয়নপথে।"

প্রকৃত নিষ্ঠাবান্ ও ক্রিয়াবান্ তন্ত্রসাধকের জন্য শিবচন্দ্র যন্ত্র, অভিষেক, অভিচার ইত্যাদির ব্যবস্থা করিতেন, আর সাধারণ মাতৃ-সাধক ভক্তদের বেলায় জোর দিতেন মাতৃনাম জপের উপর। তিনি বলিতেন: "মাতৃনামে তারকব্রহ্ম নাম, এ নাম জাতিবর্ণ নির্বিশেষে সবাইকে উদ্ধার করে। তেমনি তন্ত্রসাধনা নিবিচারে কোল দেয় সবাইকে।—"পারের ঘাটে নৌকায় উঠিতে যেমন জাতি বিচার নাই, গঙ্গার জলে স্নান করিতে যেমন পুণ্যাত্মা পাপাত্মার বিচার নাই, কাশীধামে মৃত্যু হইলে নির্বাণ মুক্তির অধিকারে যেমন স্থাবর জঙ্গম কীট পতঙ্গ কাহারও কোনো তারতম্য নাই, তদ্রূপ এই ভবসাগরের পারের নৌকায় জ্ঞানগঙ্গার পবিত্র জলে ব্রহ্মাণ্ডময় বারাণসী তান্ত্রিকদীক্ষায় দীক্ষিত হইতে কাহারও কোনো বাধা নাই। অধিক কি, কাহাকেও আত্মসাৎ করিতে অগ্নির যেমন আপত্তি নাই, তদ্রূপ কাহাকেও ব্রহ্মসাৎ করিতেও তন্ত্রের কোনো আপত্তি নাই, তাই তান্ত্রিক দীক্ষা ত্রৈলোক্য নিস্তারের অদ্বিতীয় এবং অমোঘ উপায়।"

শিবচন্দ্রের সাধনা, সিদ্ধি ও তত্ত্বোজ্জ্বলা বুদ্ধি তাঁহার জীবনে ফুটাইয়া তুলিয়াছিল সত্যকার পরমবোধ ও সমদর্শিতা। মহাকালীর আরাধনা ও শ্মশান-সাধকের আরাবে প্রমত্ত হইয়া উঠিতেন যে শিবচন্দ্র, তিনিই কৃষ্ণ-উপাসনা ও গোপীপ্রেমের কথা বলিতে বলিতে পুলকাঞ্চিত হইতেন, বক্ষ প্লাবিত হইত অশ্রুজলে।

তিনি বলিতেন, "আজও ভারতবর্ষের সে শুভদিনের সুপ্রভাত

হয় নাই, যাহাতে আমরা স্বাধীনভাবে গোপী প্রেমের বিনিময়ে ভগবানের তত্ত্বনির্ণয় নির্বিঘ্নে নিঃসংকোচে সাধারণের সমক্ষে খুলিয়া দিতে পারি।”

জননী সর্বমঙ্গলার সিদ্ধ সাধক, মহাকালীর পরমতত্ত্বের সংবাহক, শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব অবলীলায় গোপীপ্রেম সম্বন্ধে যে উচ্ছ্বসিত প্রশস্তি গাহিয়াছেন তাহা যে কোনো মহাবৈষ্ণবের লেখনীতেও দুর্লভ। তিনি লিখিয়াছেন :

—গোপীগণ নিজ নিজ হৃদয়কুম্ভ লইয়া প্রেমের জল আনিতে শ্যাম সরোবরের অভিমুখে ধাবিত হইয়াছেন, সে অগাধ প্রেমের জলে কামের কুম্ভ ডুবাইয়াছেন, দেখিতেছেন—তাহাতে একা গোপী কেন? অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের সুরাসুর নরনারী ঐ ত্রিতাপহরণ বারিদবরণ বারি সঞ্চয়ের জন্য তাঁহার কূলে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন, কেহ ডুবিয়াছেন, কেহ ডুবিতেছেন, কেহ ডুবাইতেছেন, আবার কেহ ডুবিবেন, কেহ ডুবাইবেন, যিনি একবার আসিয়াছেন তিনি আর ফিরিয়া যাইবেন না, যদিও কেহ ফিরিয়া যান, যেমন আসিয়াছিলেন তেমন আর ফিরিয়া যাইবেন না।

—শ্যাম সাগরের অগাধ জলে কামের কান্তি এবার ধুইয়া গিয়া প্রেমিকের প্রেমময় অঙ্গপ্রত্যঙ্গে শ্যামকান্তি ছড়াইয়া পড়িবে। তখন কি সাগরে কি নগরে, কি গহনে, কি পবনে, কি ভুবনে, শ্যামময় নয়ন হইয়াছে অথবা নয়নময় শ্যাম হইয়াছেন, বাঁশী বাজাইয়া মন হরণ করিয়া মনের অধীশ্বর আপনি আসিয়া মনের স্থান পূরণ করিয়াছেন, মনের সঙ্গে প্রাণকেও আকর্ষণ করিয়াছেন, এখন অবশিষ্ট বহির্মুখ দেহ বৃত্তি অন্তর্মুখ হইতে পারে না, হইলেও অন্তস্তাড়িত বহিঃনির্বাসিত কামকে বহিঃপ্রেম তরঙ্গের মতো প্রতিঘাতে লাঞ্ছিত মূর্ছিত করা যায় না, তাই সে বহির্মুখ দেহবৃত্তি বাহিরে আকর্ষণ করিয়া যোগীন্দ্রগণের অন্তরের নিধি বৃন্দাবনের নিকুঞ্জকাননে প্রেমমন্থর নটবর ত্রিভঙ্গ মধুর শ্যামসুন্দর আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন, তাই গৃহপিঞ্জর ভগ্ন করিয়া কুলবিহঙ্গী গোপিনীকুলকে কুলনাথ আজ প্রেমসাগরের অকূল কূলে

আকর্ষণ করিয়াছেন। কাহার সাধ্য তাহার জলে আত্ম অস্তিত্ব আর রাখিতে পারে ?

প্রকৃত শাক্ত ও বৈষ্ণবের মধ্যেকার কোনো পার্থক্যকে শিবচন্দ্র কোনোদিন আমল দিতেন না। স্বরচিত পদাবলীতে যে তত্ত্ব তিনি উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার সিদ্ধ জীবনের সমদর্শিতা ও অভেদদর্শনের পরিচয় আমরা পাই। তিনি লিখিয়াছেন :

শ্যাম ভক্ত আর শ্যামা ভক্ত,
আপনাকে দাও তাঁরই কাছে।
ওরে দাস হয়ে যাও প্রভুর পাছে,
ছেলে হয়ে রও মায়ের কাছে।
যারে শ্যামের বাঁশী বাজল প্রাণে,
তার কি আবার দু'কুল আছে ?
নাচ্‌ছে, শ্যামার অসি অট্টহাসি—
ভাঙ্গল কুল সে কুলের মাঝে।
কুলের মাঝে কুলের মা যে,
কুলকুণ্ডলিনী সাজে।
সে কুলের কাণ্ডারীর হাতে।
ঐ যে কুলের বাঁশী বাজে॥

কৈলাস ধাম আর বৈকুণ্ঠ ধাম সিদ্ধপুরুষের ধ্যাননেত্রে এক হইয়া গিয়াছে, জগজ্জননী উমা হইয়া উঠিয়াছেন রাসেশ্বরী—কৃষ্ণশক্তির সহিত একাত্মকা এবং একীভূতা। তাঁহার স্বরচিত নাটকে এই তত্ত্বের ব্যঞ্জনা পাই :

তপনে মা'র প্রভাশক্তি গগনে মায়ের মহিমা।
চন্দ্রমায় চন্দ্রিকা মা মোর, অণুতে মা অণিমা॥
পবনে মা বেগশক্তি, দহনে মোর দাহিকা মা।
জলে মায়ের শীতলতা, মধুরে মা'র মধুরিমা॥
ধরিত্রীর ধারণা শক্তি, জগদ্ধাত্রী আমারই মা।

বিধাতার বিধাতৃশক্তি, বিষ্ণুর স্থিতি-শক্তি মা।
মহারুদ্রের মহারৌদ্রী মহাশক্তি সেই আমার মা।
ব্রহ্মলোকে সাবিত্রী মা, বৈকুণ্ঠবাসিনী রমা॥
কৈলাসধামে, বাবার বামে, আমার মা-ই সেই গৌরী উমা।
আবার সেই—গোলোকধামে, শ্যামের পাশে
রাসেশ্বরী আমারই মা॥[১]

দাক্ষায়, শিক্ষায় এবং বংশগত ঐতিহ্য ও সংস্কারে শিবচন্দ্র ছিলেন নির্ভেজাল তান্ত্রিক। কিন্তু তৎসত্ত্বেও বৈষ্ণব সাধনার প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ছিল অপরিসীম।

গ্রামে মদনমোহনের একটি মন্দির ছিল, প্রতি বৎসর ঠাকুরের রথযাত্রা উৎসব সেখানে অনুষ্ঠিত হইত। মন্দির হইতে রথ মেলার দূরত্ব প্রায় এক মাইল। একটি বৃহৎ চৌদোলায় শ্রীবিগ্রহকে চড়ানো হইত, গ্রামবাসী ভক্তেরা সেটিকে কাঁধে তুলিয়া পরিক্রমণ করিতেন সমস্তটা পথ।

সেবার শিষ্যগণসহ তন্ত্রাচার্য শিবচন্দ্রও কাঁধে নিয়াছেন ঠাকুরের ঐ চৌদোলা। একে সেটি অত্যন্ত ভারী, তদুপরি একাজে তাঁহার মোটেই অভ্যাস নাই। কিছুটা পথ অগ্রসর হওয়ার পর গুরুভার চৌদোলার চাপে তাঁহার শরীর বাঁকিয়া গেল, ঘন ঘন হাঁফাইতে লাগিলেন।

এ সময়ে পাশ হইতে এক ব্যক্তি রসিকতা করিয়া মন্তব্য করিলেন, "আরে, একি আর মায়ের দুলালের কাজ ?"

ক্লান্ত দেহে পথ চলিতে চলিতে শিবচন্দ্র তৎক্ষণাৎ দিলেন একথার এক সরস উত্তর, "আমি তো না হয় শুধু এক জায়গায় বেঁকে গেছি। কিন্তু বৃন্দাবনের দুলাল আর মা-যশোদার দুলাল, যাঁকে আমরা কাঁধে করেছি, তাঁর কি অবস্থা বলতো ? তিনি তো নিজেই হয়েছেন ত্রিভঙ্গ মূর্তি—তিন জায়গায় বেঁকে গিয়েছেন। আমি কিন্তু

১ গণেশ (নাটক): শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব

ভাই, বহু চেষ্টা ক'রেও এখন অবধি অতটা বেঁকে যেতে পারি নি।” একথায় মদনমোহনের মিছিলের মধ্যে একটা হাসির উচ্ছ্বাস বহিয়া গেল।

প্রথম পরিচয়ের পর হইতে শিবচন্দ্রের আকর্ষণে লালন ফকীর মাঝে মাঝে কুমারখালিতে আসিয়া উপস্থিত হইতেন। দুই সাধকের মিলনে বহিয়া যাইত দিব্য আনন্দের তরঙ্গ।

লালন জাতিতে মুসলমান, ফকীর বাউলদের তিনি মধ্যমণি। কিন্তু জাতের বিচার তাঁহার কাছে কিছু নাই। একবার তাঁহাকে নিয়া গ্রামে একটু চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইল।

বহুদূরের পথ হইতে লালন ফকীর সেদিন আসিতেছিলেন। গ্রামে প্রবেশ করার পথেই পড়িল স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের টোল। সেখানে একটু বিশ্রাম করিবেন ভাবিয়া লালন বহির্বাটীর ঘরটিতে ঢুকিয়া পড়িলেন, এক কোণে বসিয়া পণ্ডিতমশাই একমনে ধূমপান করিতেছিলেন, লালন ফকীরের দিকে চোখ পড়িতে তড়াক্ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, রাগে গর্‌গর্‌ করিতে করিতে হুঁকাটি উপুড় করিয়া সবটা জল ফেলিয়া দিলেন।

নিমেষ মধ্যে লালন ব্যাপারটি বুঝিয়া নিলেন, পণ্ডিতমশাই জাত যাওয়ার ভয়ে ভীত, তাই তাড়াতাড়ি হুঁকার জল তাঁহাকে ফেলিয়া দিতে হইল। মনে মনে তিনি আহত হইলেন বটে, কিন্তু মুখে কিছুই বলিলেন না, ধীর পদে রওনা হইয়া গেলেন শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণবের চণ্ডীমণ্ডপের দিকে।

লালনকে পাইয়া শিবচন্দ্র আনন্দে উচ্ছল, দুই বাহু প্রসারিয়া তাঁহাকে কোল দিলেন। তারপর বিশ্রাম এবং জলযোগের পর শুরু হইল লালনের স্বরচিত বাউল সংগীত। ইতিমধ্যে ফকীরের আগমন বার্তা চারিদিকে রটিয়া গিয়াছে, মণ্ডপের সম্মুখে জড়ো হইয়াছে বহু কৌতূহলী দর্শক।

করজোড়ে দাদাঠাকুরকে নমস্কার জানাইয়া লালন এবার গান ধরিলেন :

সবে বলে লালন ফকীর হিন্দু কি যবন ?
লালন ব'লে আমার আমি না জানি সন্ধান ॥
এক ঘাটেতে আসা যাওয়া।
একই পাটনী দিচ্ছে খেওয়া।
তবুও কেউ খায়না কারও ছোঁয়া,
—ভিন্ন জল কোথাতে পান ?
বিবিদের নাই মুসলমানী।
পৈতা যার নাই সেও বাম্‌নী ॥
দেখরে ভাই দিব্যজ্ঞানী
দুই রূপ করলেন কিরূপ প্রমাণ।

শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব হাসিয়া বলেন, "ফকীর, তুমি সিদ্ধপুরুষ, তোমার আবার জাত কি ? ঈশ্বর আর তার সৃষ্টি, সব তোমার চোখে যে একাকার হয়ে গিয়েছে।"

"দাদাঠাকুর, মানুষের মনের মণিকোঠায় যিনি বসে আছেন, তিনি যে সকলের, আর সকলেই যে তাঁর। এই সাদা কথাটা কেউ বুঝে না বলেই তো যত গোল।"

একতারায় ঝঙ্কার তুলিয়া, ভক্তিরসে রসায়িত হইয়া, লালন আবার গাহিতে থাকেন :

ভক্ত কবীর জাতে জোলা,
প্রেম ভক্তিতে মাতোয়ালা।
ধরেছে সে ব্রজের কালা,
দিয়ে সর্বস্ব তার।
এক চাঁদে হয় জগৎ আলো।
এক বীজে সব জন্ম হলো।
ফকীর লালন ক'য়, মিছে কলহ
কেন করিস্‌ সদাই ?

গোঁড়া রক্ষণশীল দলের কিছু সংখ্যক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সেখানে উপস্থিত ছিলেন। লোকের কানাঘুষায় ইতিমধ্যে তাঁহারা শুনিয়াছেন,

স্মৃতিরত্নের বহির্বাটীর ঘটনার কথা। তাঁহারা বলেন, "মুসলমান লালনের স্পর্শদোষ এড়ানোর জন্য হুঁকোর জল ফেলে দেওয়া হয়েছে, তাতে দোষ কি হয়েছে? বর্ণাশ্রম আর আচার বিচার সব লোপ পেলে হিন্দুধর্মের রইল কি?"

এবার শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণবকে লক্ষ্য করিয়া তাঁহারা বলেন, "আচ্ছা, মা-সর্বমঙ্গলার দুয়ারের সামনে মুসলমান লালন ফকীরকে দিয়ে বর্ণাশ্রম বিরোধী এই যে সব গান আপনি গাওয়াচ্ছেন, এটা কি ভালো হচ্ছে?"

শিবচন্দ্র উত্তরে কিছু বলিবার আগেই লালন ভাবাবেশে নাচিয়া নাচিয়া আবার গান ধরেন :

ধর্ম-প্রভু জগন্নাথ
চায়না রে সে জাত অজাত
ভক্তের অধীন সে রে।
যত জাত-বিচারী দুরাচারী,
যায় তারা সব দূর হয়ে।
লালন ক'য়, জাত হাতে পেলে
পুড়াতাম আগুন দিয়ে রে।

আগুন দিয়া পোড়ানো হইবে 'জাত'-কে? এসব কি কথা? বর্ণাশ্রম ধর্মের চাঁইদের কয়েকজন উত্তেজিত হইয়া উঠেন, নিন্দা সমালোচনা শুরু করেন।

শিবচন্দ্র সতেজে উঠিয়া দাঁড়ান। সবাইকে নীরব হইতে ইঙ্গিত করিয়া বলিতে থাকেন, "ছাখো, জাতিভেদ মানা বা না মানা যার যার নিজের ব্যক্তিগত কথা। এ নিয়ে নিন্দা সমালোচনা বা ঝগড়া বিবাদ থাকবে কেন? বহিরঙ্গ জীবনে যত ভেদ বিভেদই আমরা দেখি না কেন, মূলত সর্ববস্তু ও সর্বজীব এক। একই ব্রহ্মময়ী মা সবার ভেতরে রয়েছেন অনুস্যূত। হিন্দুর বেদ, তন্ত্র ও দর্শনে রয়েছে সেই পরম এক এবং অদ্বিতীয়ের কথা। মুসলমান ধর্মও বলেছে— লা ইলাহা ইল্লা আল্লাহ্। আল্লাহ্ ছাড়া অপর কোনো ঈশ্বর নেই

—তিনিই হচ্ছেন অদ্বিতীয় সত্তা। তবে, এ নিয়ে বৃথা এতো বাদ বিসম্বাদ কেন, বলতো ?”

অতঃপর বেদ ও আগম নিগম হইতে বহুতর শাস্ত্রবাক্য উদ্ধৃত করিয়া সবাইকে তিনি বুঝাইয়া দিলেন, হিন্দুর ব্রহ্মবাদ ও পরা-শক্তিবাদের আসল কথা—অভেদ তত্ত্ব। এই তত্ত্বের উদারতা ও সর্বজনীনতা উপলব্ধি না করিলে হিন্দুধর্ম রক্ষা করা সম্ভব হইবে না। নিন্দুক ও সমালোচকেরা এবার নীরব হইয়া গেল।

লালন ফকীর সিদ্ধ বাউল, সদানন্দময় পুরুষ, বহিরঙ্গ জীবনের অনেক কিছু ঝড় ঝাপটার বহু উর্ধ্বে তিনি বিচরণ করেন। লালন কহিলেন, “দাদাঠাকুর, পাহাড়ের ওপরে উঠে গেলে নিচের সব কিছু সমান দেখা যায়, তোমার তাই হয়েছে। তুমি পাহাড়ের চূড়ায় উঠে বসে আছো, আর আপন ভাবে আপনি রয়েছো মশগুল। তাইতো, মাঝে মাঝে তোমায় নামিয়ে আনি আমাদের এই মাটিতে, এতো বিতর্ক, এতো হৈ-হুল্লোড় ক’রে তোমায় হুঁশে আনি, তোমার ভেতরকার প্রেমরস টেনে বার করি।”

প্রেমাবিষ্ট সিদ্ধপুরুষ শিবচন্দ্র ফকীরকে আবদ্ধ করেন প্রেম-আলিঙ্গনে, টানিয়া নেন বুকের মধ্যে।

“আবার আসবো দাদাঠাকুর, আবার প্রাণভরে তোমার কথা শুনবো,”—একথা বলিয়া লালন সেদিনকার মতো বিদায়গ্রহণ করেন।

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দ। বঙ্গভঙ্গের আগুন তখন দাবানলের মতো বাংলার দিকে দিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে। প্রখ্যাত নেতা ও বাগ্মী সুরেন্দ্র-নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এসময়ে কুষ্টিয়ায় আসিয়াছেন স্বদেশী মেলায় ভাষণ দিবার জন্য। তাঁহার পার্শ্বে উপবিষ্ট আছেন রুদ্রাক্ষ ও রক্তচন্দনে বিভূষিত তেজোদৃপ্ত শিবচন্দ্র।

সুরেন্দ্রনাথ বক্তৃতা দিলেন ইংরেজীতে, যুক্তি-তর্ক, ভাবময়তা ও রাষ্ট্রচেতনায় তাহা ভরপুর। কিন্তু গ্রামাঞ্চলের খুব কম লোকেরই

তাহা বোধগম্য হইল। এবার শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব উঠিলেন তাঁহার বক্তব্য বলার জন্য। প্রায় দশ সহস্র নরনারী শহরের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে সমবেত হইয়াছে, তাহাদের সম্মুখে জগন্মাতা আর দেশমাতার ঐক্যবোধ জাগাইয়া তুলিয়া উদাত্ত কণ্ঠে, সাধু বাংলা ভাষায়, প্রাণ-উন্মাদনাকারী ভাষণ দিতে তিনি শুরু করেন, শ্রোতারা ভাবের উচ্ছ্বাসে উদ্বেল হইয়া উঠে।

সিংহ-পুরুষ শিবচন্দ্র ওজস্বিনী ভাষায় কহিলেন, "দেশমাতা আর জগন্মাতায় কোনো ভেদ নেই। অখিল ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিনী হয়ে রয়েছেন মা ব্রহ্মময়ী। এই ধরিত্রী ও তার অংশ ভারতবর্ষ সেই ব্রহ্মময়ীরই অংশ ছাড়া আর কিছু নয়। জগজ্জননী মহামায়া যেমন বিশ্বাতীতা, তেমনি আবার বিশ্বগতাও বটেন। তাই ধ্যানদৃষ্টিতে দেখা যায়, দেশমাতার ভেতরেই রয়েছেন চৈতন্যরূপা ব্রহ্মময়ী।"

স্বদেশের এই চৈতন্যময় সত্তার কথাটি বজ্র নির্ঘোষে ঘোষণা করিয়া আবার তিনি কহিলেন, "এই আমাদের 'মা'-টি, ইনি কিন্তু শুধু মাটি নন—ইনি, হলেন প্রকৃত 'মা'-টি। এই 'মা'-টিকে খাঁটি ক'রে ধরতে হবে। নান্য পন্থা বিদ্যতে অয়নায়। এই 'মা'-টিকে এতদিন আমরা চিনতে পারি নি, একে ছেড়ে দিয়ে বসে আছি, তাই তো আমরা মাটি হতে বসেছি। শিবহীন দক্ষযজ্ঞ বিনাশের পর এমনি ক'রেই মায়ের অঙ্গচ্ছেদ হয়েছিল।"

শিবচন্দ্রের এই ভাষণ শুনিয়া জনতার মধ্যে প্রবল উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়, জয়ধ্বনি ও করতালিতে সভাপ্রাঙ্গণ মুখরিত হইয়া উঠে। প্রধান বক্তা সুরেন্দ্রনাথ বিস্ময় বিস্ফারিত নয়নে সাধক শিবচন্দ্রের দিকে চাহিয়া থাকেন।

সেদিনকার ঐ স্মরণীয় বক্তৃতা সম্পর্কে পণ্ডিত রাধাবিনোদ বিদ্যাবিনোদ লিখিয়াছেন, "তাঁহার সেই ছন্দোময়ী ভাষার কি মাধুর্যময়ী তেজস্বিতা, আর তাঁহার সেই উদাত্ত কণ্ঠের কি কমনীয় নমনীয়তা। তিনি উচ্ছ্বসিত হইয়া ললিত উদাত্ত কণ্ঠে বক্তৃতা করিতেছিলেন, মনে হইতেছিল যেন পুণ্য সলিলা জাহ্নবী কল-

তরঙ্গভঙ্গে নাচিয়া নাচিয়া ছুটিয়া চলিয়াছেন। তদুপরি তাঁহার ত্রিপুণ্ড্রক লাঞ্ছিত গৌরবর্ণ ললাটস্থিত রক্ততিলকের আভা, আয়ত নেত্র সমুদ্ভাসিত তপ্তকাঞ্চন বিনিন্দিত মুখমণ্ডলের সেই প্রশান্ত জ্যোতি, আবক্ষ-লম্বিত কাঁচ পাথর সমন্বয়ে গ্রথিত রঙবেরঙের বিচিত্র রুদ্রাক্ষের মালা, সর্বোপরি আজানুলম্বিত সেই রক্তগৈরিক, সবগুলি মিলিয়া তাঁহাকে এক অনির্বচনীয় শ্রী প্রদান করিয়াছিল।

"তিনি বক্তৃতা প্রদান করিতেছিলেন ভাবে বিভোর হইয়া। আর তাঁহার দুই আয়ত নেত্র বাহিয়া দর-বিগলিত ধারায় অশ্রু নির্গত হইয়া তাঁহার বক্ষোদেশ প্লাবিত করিতেছিল। মহাকবি ভবভূতির বজ্রাদপি কঠোরানি মৃদুনি কুসুমাদপি ইত্যাদি উক্তি যে বর্ণে বর্ণে সত্য, সেদিন সেকথা আমরা সম্যক্ বুঝিতে পারিয়াছিলাম। বুঝিয়াছিলাম, শিবচন্দ্র সত্যই একজন লোকোত্তর-চরিত পুরুষ।"

কাশী ও বৈদ্যনাথধাম শিবচন্দ্রের খুব প্রিয় ছিল। কাশীতে নানা গুপ্ত শক্তিপীঠে বিশেষ করিয়া মণিকার্ণিকার শ্মশানে কৌলপদ্ধতি অনুসারে বহু নিগূঢ় তান্ত্রিক ক্রিয়া তিনি সম্পন্ন করিয়াছিলেন। পরবর্তীকালে, সর্বমঙ্গলা সভা স্থাপনের পর দীর্ঘদিন কাশীই ছিল তাঁহার প্রধান কর্মকেন্দ্র। সেখানে অবস্থান করিয়া উত্তর ভারতের তন্ত্রাচারী সাধকদের সঙ্গে তিনি যোগাযোগ রক্ষা করিতেন এবং সর্বমঙ্গলা সভার মাধ্যমে তন্ত্রশাস্ত্রের প্রচারে তৎপর থাকিতেন।

তপস্যার জন্য কয়েকবার তিনি বৈদ্যনাথধামে অবস্থান করেন। এই সময়ে শুধু সেখানকার বাঙালী সমাজেই নয়, স্থানীয় পণ্ডিত এবং পাণ্ডাদের মধ্যেও, তাঁহার প্রভাব ছড়াইয়া পড়ে। ইহাদের অনেকে তাঁহাকে শিবকল্প মহাপুরুষ বলিয়া মনে করিতেন, দেবতা জ্ঞানে শ্রদ্ধা ও সমীহ করিতেন।

বৈদ্যনাথধামের শ্মশানটি ছিল শিবচন্দ্রের অতি প্রিয় সাধন-স্থান। কৃষ্ণা চতুর্দশী বা অমাবস্যার নিশীথ রাত্রে এই প্রাচীন শ্মশানে গিয়া তিনি উপস্থিত হইতেন, সারা রাত্রি ব্যাপিয়া অনুষ্ঠান করিতেন

তাঁহার সংকল্পিত ক্রিয়া এবং অভিচার। মাঝে মাঝে কৌলপন্থার শ্রেষ্ঠ ক্রিয়া শবসাধনাও তিনি সেখানে সম্পন্ন করিতেন।

গঙ্গাপ্রসাদ ফলাহারী নামে এক শক্তিমান্ তান্ত্রিক সাধক সেই সময়ে বৈদ্যনাথধামে বাস করিতেন। শিবচন্দ্রের শক্তি বিভূতি ও তন্ত্রশাস্ত্রের জ্ঞান সম্পর্কে অবগত হইয়া গঙ্গাপ্রসাদজী তাঁহার খুব অনুরক্ত হইয়া পড়েন। শ্মশানের কয়েকটি নিগূঢ় অনুষ্ঠানে তিনি যোগ দেন শিবচন্দ্রের সহকারীরূপে।

শিবচন্দ্র যখন যেখানেই বাস করুন না কেন, ইষ্টদেবী সর্বমঙ্গলার অর্চনা ও ভোগের ব্যাপারে কখনো কোনো ত্রুটি হইতে পারিত না। তাঁহার এই তান্ত্রিকী পূজার উপচার ও বিধিবিধান ছিল নানা রকমের এবং এগুলি সম্পর্কে কখনো কোনো ত্রুটিবিচ্যুতি ঘটিবার উপায় ছিল না। পূজা, ভোগরাগ, আরাত্রিকের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি তান্ত্রিক প্রণালী অনুসারে সম্পন্ন করা হইত। কুমারী পূজা এবং শিবাভোগ প্রদানও ছিল শিবচন্দ্রের নিত্যকার কর্ম। ভোগ প্রসাদ গ্রহণে শিবাদল যদি কখনো দেরি করিত, সজল নয়নে 'আয় আয়' বলিয়া শিবচন্দ্র তাহাদের ডাকিতে থাকিতেন এবং তারপরেই ঘটিত তাহাদের আবির্ভাব। নীরবে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে প্রসাদ গলাধঃকরণ করিয়া তাহারা সরিয়া পড়িত।

শিবচন্দ্রের আচার্য জীবনে কৃপালীলার প্রকাশ বহুবার দেখা গিয়াছে। শুধু ভক্ত ও মুমুক্ষু মানুষই তাঁহার আশ্রয় নেয় নাই, ঈশ্বর-বিমুখ এবং সংশয়বাদী দুরাত্মারাও তাঁহার চরণে ঠাঁই নিয়াছে, দীক্ষা ও শিক্ষার মধ্য দিয়া শুরু করিয়াছে উন্নততর জীবন।

কালীধন চট্টোপাধ্যায় ছিলেন এমনই এক ব্যক্তি। হাওড়ার বাঁটরা গ্রামে তিনি বাস করিতেন। দেব দ্বিজে কোনোদিনই তাঁহার ভক্তি শ্রদ্ধা ছিল না; অতিমাত্রায় ছিলেন আত্মম্ভরী ও ঈশ্বরদ্বেষী। সাধু সন্তের দেখা পাইলেই তাঁহাদের সম্বন্ধে নিন্দা ও বক্রোক্তি শুরু করিতেন, কখনো কখনো অপমান করিতেও ছাড়িতেন না।

শিবচন্দ্র তখন কিছুদিনের জন্য হাওড়ার শিবপুরে অবস্থান করিতেছেন। এই খ্যাতনামা তন্ত্রসিদ্ধ পুরুষকে দর্শনের জন্য প্রতিদিন সেখানে ভিড় জমিয়া উঠিত।

কালীধন চট্টোপাধ্যায়কে মাঝে মাঝে ঐ দিক দিয়া যাওয়া আসা করিতে হইত। অদূরে দাঁড়াইয়া তিনি এই জনসংঘট্ট দেখিতেন এবং শিবচন্দ্র সম্পর্কে করিতেন নানা শ্লেষাত্মক উক্তি। শিবচন্দ্রের বিশিষ্ট শিষ্য যতীন মুখোপাধ্যায়ের সহিত কালীধনের বন্ধুত্ব ছিল। যতীন বাবু একদিন কহিলেন, "সাধুকে ভালো ক'রে ঘনিষ্ঠভাবে না দেখে তাঁর সম্পর্কে মন্তব্য করা কি ভালো হে? কালীধন, তুমি একদিন আমার সঙ্গে ঠাকুরের কাছে চল। তাঁর দিব্যমূর্তি একটিবার দর্শন করলে, আর ওজস্বিনী বাণী শুনলে, তোমার এত সব লম্ফঝম্ফ আর থাকবে না।"

কালীধনের মুখে তাচ্ছিল্যের হাসি। বলেন, "নিজের পায়ে যার জোর নেই, সে-ই লাঠি ভর দিয়ে হাঁটে। সাধুর ওপর নির্ভর করে তারাই, যারা দুর্বল, আর নেই কোনো আত্মবিশ্বাস। তাছাড়া, ভাই, ঠিক ক'রে বলতো, তোমার এই তান্ত্রিক গুরুর শক্তি কতটা, আর কি তিনি আমায় দিতে পারেন?"

"তিনি সেই শান্তি দিতে পারেন, যা আজ অবধি কোথাও তুমি পাও নি। আর যদি তার চেয়ে আরো বড় কিছু চাও, ঈশ্বর দর্শন চাও, তাঁর কৃপায় তাও হতে পারে। মা-সর্বমঙ্গলার আদরের দুলাল শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব। মায়ের কাছে যা যিনি সুপারিশ করবেন তাই যে তুমি পাবে ভাই।"

"যাই বল না কেন, মাথায় জটা, পরনে গৈরিক, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, ঐ সব সাধু সন্ন্যেসী দেখলেই রাগে আমার পিত্তি জ্বলে যায়। থাক্ ভাই, ওসব আসরে যেতে আমায় আর অনুরোধ ক'রো না।"

"কালীধন, একবার আমার গুরুকে দর্শন ক'রেই এসোনা। সারা জীবনটা তো পাষণ্ডের মতোই কাটালে, পাপও ঢের তুমি করেছো। একবার ভগবানের রাজ্যের এ দিকটাও একটু ছাখোনা। তুমি শক্ত

লোক, আত্মবিশ্বাসী লোক, এ সাধু তো তোমার মতো লোককে দর্শনমাত্র গিলে খাবেন না।”

কি জানি কেন, কালীধনের সুমতি হইল, বন্ধুর সঙ্গে উপস্থিত হইলেন সিদ্ধ মহাপুরুষ শিবচন্দ্রের আবাসে।

কালীধনকে দেখামাত্র আচার্য শিবচন্দ্র তাঁহাকে কাছে ডাকিলেন, স্নেহপূরিত কণ্ঠে কহিলেন, “ওরে আয়, আয়। আমার কাছে আয়। মায়ের পাগল ছেলে যে তুই, এতদিন মাকে ভুলে কোথায় ছিলি ? তোর সঙ্গে একটিবার দেখা না ক’রে যে এ জায়গা আমি ছাড়তেই পারছিলুম না। আয় আয়।”

মুহূর্ত মধ্যে কালীধনের নয়ন সমক্ষে উদ্‌ভাসিত হইয়া উঠিল সিদ্ধপুরুষের জ্যোতির্ময় দিব্যমূর্তি। অন্তরাত্মা হইতে কে যেন ডাকিয়া বলিল, ‘অকূলে পথহারা হয়ে এযাবৎ কেবলি তুই ঘুরে বেরিয়েছিস্, পাপ-প্রবৃত্তির তাড়নায় দিক্‌ভ্রান্ত হয়েছিস্ বার বার। এবার মিলেছে তোর পরমাশ্রয়। এই পরম দয়াল মহাত্মার চরণে তুই শরণ নে, লাভ কর্ পরমা পরম শান্তি।”

অহংকার, বিচারবুদ্ধি বা বিতর্কের কোনো অবকাশ রহিল না। আবেশে কালীধনের সারা দেহ ঘন ঘন কম্পিত হইতেছে, দুই চোখে ঝরিতেছে অশ্রুধারা, ছুটিয়া গিয়া পতিত হইলেন শিবচন্দ্রের আসনের সম্মুখে, কিছুক্ষণের জন্য বাহ্যজ্ঞান রহিল না।

অতঃপর আচার্য শিবচন্দ্রের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া কালীধন চট্টোপাধ্যায় শুরু করেন তন্ত্রানুসারী সাধন-ক্রিয়া। গুরুর কৃপায় উত্তরকালে পরিণত হন এক বিশিষ্ট সাধকরূপে।

তন্ত্র-অনুরাগী সাধকদের শিবচন্দ্র সাধারণত সংসারে থাকিয়াই সাধন করিতে বলিতেন। সে-বার এক সন্ন্যাসকামী দীক্ষিত শিষ্যকে তিনি বলিয়াছিলেন, “দেবাদিদেব স্বয়ং বলেছেন, গৃহস্থ আশ্রমে থেকেও ভক্ত সাধকেরা সিদ্ধি লাভ করতে পারে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, ঘর-সংসারে জড়িয়ে থেকে কেবলই ধন বৃদ্ধি ক’রে যেতে হবে। সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী সাধন ও গুরুকৃপার বলে ব্রহ্মলাভ

ক'রে থাকে, আবার সংসার-আশ্রমী সাধকের হৃদয়ে ব্রহ্মতত্ত্বের স্ফুরণ হলে গোটা সংসারটাই হয়ে পড়ে ব্রহ্মময়।

"সংসার ছেড়ে অত দূরের পথ পর্যটন করা কলিযুগের জীবের পক্ষে সহজসাধ্য নয়, তাই তন্ত্রশাস্ত্র বলেছেন, সংসারে বাস ক'রেই বাড়িয়ে তোল ব্রহ্মদৃষ্টি। যে সব সাধক গৃহী হয়েও বৈরাগ্যবান্ এবং কায়মনোবাক্যে সন্ন্যাসী, তাঁরাও তো সত্যকার শ্মশানবাসী। শব আর কঙ্কালে পূর্ণ পূতিগন্ধময় মহাশ্মশানে তাঁরাই তো চৈতন্যরূপী মহাশিব।

"জগজ্জননী মহামায়া অনাদি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে তাঁর মায়ারূপী কেশপাশ এলিয়ে দিয়েছেন, সবাইকে ভোলাচ্ছেন তাঁর মায়ায়। আবার ত্মাখো, ঐ কেশপাশ ছুঁয়ে আছে তাঁর চরণ দু'টি। ঐ চরণে রয়েছে যে তাঁর কৃপা, যে কৃপায় হয় সিদ্ধি আর মুক্তি। সংসারে থেকে ক্রিয়াবান্ সার্থক তান্ত্রিক হও, মহামায়ার চরণ ধরে পড়ে থাকো, মায়ার কেশপাশে আর জড়িয়ে পড়তে হবে না।"

শিবচন্দ্রের করুণালীলার অপর একটি ঘটনা শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার পাল বর্ণনা করিয়াছেন।

একদিন কুমারখালিতে সর্বমঙ্গলার মন্দিরে বসিয়া ভক্ত শিষ্যদের সহিত তিনি নানা তত্ত্বালাপ করিতেছেন। হঠাৎ সেখানে এক জরুরী তারবার্তা আসিয়া উপস্থিত। যশোরের নলডাঙ্গার জমিদার এটি প্রেরণ করিয়াছেন, তাঁহার পুত্র হঠাৎ এশিয়াটিক কলেরায় আক্রান্ত হইয়াছে এবং জীবনের কোনো আশা নাই, শিবচন্দ্র যেন কৃপা করিয়া তাঁহাকে রক্ষা করেন।

এই পরিবারটির উপর শিবচন্দ্রের গভীর স্নেহ ছিল। কিছুক্ষণ নীরবে থাকিবার পর তিনি সর্বমঙ্গলার একটি বিশেষ পূজা অনুষ্ঠানের জন্য তৎপর হইয়া উঠিলেন।

তখন রাত্রি হইয়া গিয়াছে। ঘন অন্ধকারে চারিদিক সমাচ্ছন্ন। দানবারি গঙ্গোপাধ্যায় এবং অন্যান্য ভক্তেরা আচার্যের নির্দেশ পাইয়া

অতি সত্বর প্রয়োজনীয় বহুবিধ উপচার সংগ্রহ করিয়া আনিলেন। কিন্তু একজোড়া বোয়াল মৎস্য কোনোমতেই জোটানো গেল না।

কথাটি শিবচন্দ্রের কানে যাওয়া মাত্র তিনি কহিলেন, "চিন্তার কোনো কারণ নেই। এখনি কাউকে পাঠিয়ে দাও কুণ্ডুবাবুদের পুকুরে. মাছ পেতে দেরি হবে না।" এই নির্দেশ অনুযায়ী মৎস্য অনতিবিলম্বে ধরিয়া আনা হইল, এবার শিবচন্দ্র তাঁহার সহকারীদের নিয়া রুদ্ধদুয়ার মন্দিরে শুরু করিলেন মায়ের অর্চনা।

পূজা শেষে হোমকুণ্ডে দেওয়া হইল পূর্ণাহুতি। রাত্রি তখন শেষ হইয়া আসিয়াছে, শিবচন্দ্র মন্দিরকক্ষ হইতে বাহিরে আসিয়া সহাস্যে কহিলেন, "আর ভয় নেই, মা সর্বমঙ্গলার কৃপায় ছেলেটির প্রাণরক্ষা হয়েছে। এবার কয়েকদিনের ভেতরই সে সুস্থ হয়ে উঠবে।"

তিন দিন পরেই কুমারখালিতে আর একটি তারবার্তা আসিয়া উপস্থিত। লেখা রহিয়াছে, রোগীর সংকট কাটিয়া গিয়াছে, ঠাকুরের কৃপাদৃষ্টি যেন তাহার উপর নিবদ্ধ থাকে।

শিবচন্দ্রের আচার্য জীবনে, তন্ত্রশাস্ত্র প্রচারের কাজে, বড় সহায়ক ছিলেন তাঁহার দীক্ষিত ও কৃপাপ্রাপ্ত শিষ্য স্যর জন উডরফ। তন্ত্র সাধনা ও তন্ত্রশাস্ত্রের পুনরুজ্জীবন ঘটুক, শুদ্ধ বীরাচারী তন্ত্রসাধনা আবার পূর্ব গৌরবে অধিষ্ঠিত হোক, এই প্রার্থনাই শিবচন্দ্র বার বার নিবেদন করিতেন জননী সর্বমঙ্গলার কাছে আরো চাহিতেন, শুধু ভারতেই নয়, সারা বিশ্বে এই মাতৃসাধনার বীজ ছড়াইয়া পড়ুক এবং এই সাধনার মাধ্যমে ভারতের ধর্ম সংস্কৃতির জয়গৌরব ঘোষিত হোক দিগ্‌বিদিকে।

শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণবের প্রণীত তন্ত্রতত্ত্বের ইংরেজী অনুবাদ সম্পন্ন করান শিষ্য উডরফ। তন্ত্ররহস্য উদ্‌ঘাটনের জন্য ইংরেজী ভাষায় আরো কয়েকটি মহামূল্যবান গ্রন্থও তিনি রচনা করেন, আজো তাহা সারা বিশ্বের শিক্ষিত সমাজের সম্মুখে তন্ত্রের বিজয় বৈজয়ন্তী

উড্ডীন করিয়া রাখিয়াছে।[১] এই গ্রন্থগুলি উডরফ রচনা করেন তাঁহার ছদ্মনামে। আভালন নাম দিয়া এগুলি প্রকাশিত হয়।

এ সব গ্রন্থে তন্ত্রের তত্ত্ব এবং ধর্মসাধনায় তন্ত্রের বৈজ্ঞানিক উপযোগিতার উপর উডরফ জোর দিয়াছিলেন। নিগূঢ় রহস্যে ঘেরা তন্ত্রসাধনার প্রতি এতকাল বিশ্বের শিক্ষিত সমাজে যে ভীতি ও অবজ্ঞা ছিল, উডরফের প্রয়াসে তাহার কিছুটা দূর হয়।

শিবচন্দ্র ও উডরফের যুগ্ম প্রচার প্রয়াস, রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের যুগ্ম সত্তাকে স্মরণ করাইয়া দেয়। রামকৃষ্ণ-শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণের অধ্যাত্মবাদকে সারা জগতের সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়াছিলেন, অদ্বৈত বেদান্তের যুগোপযোগী ব্যাখ্যার মধ্য দিয়া গুরুর মহিমা ঘোষণা করিয়াছিলেন। উডরফও তেমনি আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন স্বীয় গুরু তন্ত্রাচার্য শিবচন্দ্রের শাস্ত্রপ্রচার কর্মের ধারক বাহকরূপে। তাঁহার রচনার মাধ্যমে তন্ত্রের মাহাত্ম্য নূতন করিয়া ঘোষিত হইয়াছিল, বিশ্বের জ্ঞানী-গুণী মহলে শুরু হইয়াছিল তন্ত্রচর্চার ব্যাপক প্রয়াস। উডরফ বিবেকানন্দের মতো বিরাট আধ্যাত্মিক পুরুষ ছিলেন না, একথা ঠিক, কিন্তু ভারতীয় অধ্যাত্মশাস্ত্রের প্রচারকল্পে তাঁহার নিষ্ঠা ও দক্ষতার কথা অস্বীকার করার উপায় নাই।

ইংরেজী ভাষায় রচিত উডরফের তন্ত্রসাহিত্য ইউরোপ ও আমেরিকার মনীষীদের মধ্যে তন্ত্রতত্ত্ব ও তন্ত্রসাধনা সম্পর্কে প্রবল অনুসন্ধিৎসার সৃষ্টি করিয়াছিল। তখনকার দিনের 'ইণ্টার ন্যাশনাল জার্নাল অব তান্ত্রিক অর্ডার ইন আমেরিকা' প্রভৃতি পত্রিকা এই অনুসন্ধিৎসা ও গবেষণার পরিচয় দিয়াছে।

উডরফের মাধ্যমে শিবচন্দ্রের সহিত প্রসিদ্ধ কলাতত্ত্ববিদ্ ই. বি.

১ এ বিষয়ে উডরফের প্রধান সহযোগী ছিলেন অধ্যাপক প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় (বর্তমানের প্রখ্যাত তান্ত্রিক সন্ন্যাসী স্বামী প্রত্যাত্মানন্দ), এবং শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল মজুমদার

হ্যাভেল এবং ডঃ আনন্দ কুমারস্বামীর পরিচয় সাধিত হইয়াছিল এবং তাঁহারা উভয়েই তন্ত্রাচার্যের ভাবধারায় যথেষ্টরূপে প্রভাবিত ও অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন।

শিবচন্দ্রের মুখে তন্ত্রের প্রকৃত স্বরূপ এবং ভারতীয় অধ্যাত্মতত্ত্ব এবং নন্দনতত্ত্বের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ শুনিয়া ডঃ কুমারস্বামী মুগ্ধ হন। শুধু তাহাই নয়, কিছুদিন পরে হিন্দুধর্ম গ্রহণের জন্য তিনি আগ্রহী হইয়া উঠেন। ভট্টপল্লীর রক্ষণশীল পণ্ডিতেরা কুমারস্বামীর হিন্দুধর্মে আশ্রয় নিবার প্রস্তাব সমর্থন করেন নাই। তাঁহারা বিধান দেন, কুমারস্বামী খ্রীষ্টান, শাস্ত্রমতে ম্লেচ্ছকে হিন্দুরূপে গ্রহণ করা সম্ভব নয়।

এসময়ে শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব অগ্রসর হইয়া আসেন ডঃ কুমারস্বামীর সহায়তায়। বহুতর প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থ হইতে উদ্ধৃতি দিয়া তিনি প্রমাণ করেন, ম্লেচ্ছের হিন্দুকরণ এবং ম্লেচ্ছের পক্ষে হিন্দুধর্মের আশ্রয় গ্রহণ মোটেই অশাস্ত্রীয় নয়। তাছাড়া, তন্ত্রশাস্ত্রের উদার বিধানের কথা উল্লেখ করিয়াও কুমারস্বামীর হিন্দুত্ব গ্রহণের প্রস্তাব তিনি জোরালো ভাবে সমর্থন করেন। দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেন, আর্য-অনার্য, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, সাধু পাষণ্ডী সবাই মাতৃতত্ত্ব ও তন্ত্রশাস্ত্রের অধিকারী সাধক। জগজ্জননীর কোলে উঠিবার দাবি অস্বীকার করার কোনো উপায় নাই।

শোনা যায়, বিদ্যার্ণবের এই উদার এবং শাস্ত্রীয় যুক্তিতর্ক সমন্বিত ঘোষণার পর কুমারস্বামীর হিন্দুধর্ম গ্রহণে আর কেউ কোনো বাধা জন্মান নাই।

আর্টস্কুলের অধ্যক্ষ ই. বি. হ্যাভেলের সহিত বিচারপতি উডরফের ঘনিষ্ঠতা ছিল। ভারতীয় চারুকলার মর্ম উদ্‌ঘাটনের জন্য হ্যাভেল এক সময়ে খুব ব্যাকুল হইয়া উঠেন। এসময়ে উডরফের পরামর্শে তিনি শরণ নেন শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণবের।

তন্ত্রতত্ত্বের আলোকে শিবচন্দ্র ভারতীয় নন্দনতত্ত্ব, চারুকলা এবং ভাস্কর্যের অপরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করেন সুধী গবেষক হ্যাভেলের

কাছে। এই সব ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ শুনিয়া হ্যাভেলের বহু সংশয়ের নিরাকরণ হয়, ভারতীয় নন্দনতত্ত্বের মর্মকথা জ্ঞাত হইয়া তিনি আনন্দে অধীর হইয়া উঠেন।

অতঃপর উডরফের ভবনে হ্যাভেল এবং কুমারস্বামী মাঝে মাঝে শিবচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন। তন্ত্রতত্ত্ব ও নন্দনতত্ত্বের নানা নিগূঢ় বিষয় প্রতিভাধর শিবচন্দ্র এই সময়ে সংস্কৃত ভাষায় অনর্গল-ভাবে বলিয়া যাইতেন, আর উডরফ এবং তাঁহার সংস্কৃতের শিক্ষক হরিদেব শাস্ত্রী ঐ দুই সুধী জিজ্ঞাসুকে তাহা ইংরেজীতে বুঝাইয়া দিতেন।

বিদ্যার্ণবের তত্ত্ব ব্যাখ্যা এবং উপদেশ এই সময়ে গভীরভাবে হ্যাভেলকে প্রভাবিত করে। হিন্দু দেবদেবীর সূক্ষ্মতর দিব্য অস্তিত্ব ও মাহাত্ম্য সম্পর্কে নূতনতর চেতনা ও শ্রদ্ধা তাঁহার মধ্যে জাগিয়া উঠে। শোনা যায়, এসময়ে হ্যাভেল তান্ত্রিক ঐতিহ্যযুক্ত কোনো কোনো দেবদেবীর ভাস্কর্যমূর্তি দর্শনে ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়িতেন। কখনো বা অর্ধবাহ্য অবস্থায়, পদ্মাসন করিয়া বসিয়া পড়িতেন তাঁহাদের সম্মুখে। এ সময়ে হ্যাভেলকে এই আসন হইতে উঠাইয়া আনিতে গিয়া আর্টস্কুলের সহযোগীরা হইতেন গলদ্‌ঘর্ম।

হ্যাভেল সরলভাবে বন্ধুমহলে বলিতেন, তন্ত্রাচার্য শিবচন্দ্রের প্রসাদেই ভারতীয় ভাস্কর্যের বহু নিগূঢ় রহস্য তাঁহার দৃষ্টি সমক্ষে উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। এজন্য তাঁহার কৃতজ্ঞতার সীমা ছিল না।

শিবচন্দ্রের আচার্য জীবনের এক অত্যুজ্জ্বল অধ্যায়, শিষ্য স্যর জন উডরফকে দীক্ষা দেওয়া এবং তন্ত্র প্রচারে তাঁহাকে উদ্বুদ্ধ করা।

ব্যারিস্টারী ছাড়িয়া উডরফ তখন কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতির পদ গ্রহণ করিয়াছেন। কিছুদিনের জন্য তিনি অস্থায়ী প্রধান বিচারপতি পদেও নিযুক্ত হইয়াছিলেন। হিন্দু সাধনা ও

ভারত তন্ত্রের প্রতি চিরদিনই তাঁহার প্রবল অনুসন্ধিৎসা। এসময়ে হাইকোর্টের প্রবীণ ভকীল অটলবিহারী ঘোষের সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠতা জন্মে। অটলবিহারী ছিলেন 'আগম অনুসন্ধান সমিতি'র একজন বিশিষ্ট সদস্য। কিছুদিনের মধ্যে উডরফ এই সমিতির সংস্রবে আসেন এবং তন্ত্রসাধনার রহস্য সম্পর্কে কৌতূহলী হইয়া উঠেন। তাঁহার এই কৌতূহল ক্রমে পরিণত হয় সত্যকার অনুসন্ধিৎসায় এবং তন্ত্রের মূল গ্রন্থ পাঠ করার জন্য তিনি ব্যস্ত হইয়া পড়েন।

এজন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন, সংস্কৃত ভাষা ভালোভাবে শিক্ষা করা। হাইকোর্টের সরকারী দোভাষী, হরিদেব শাস্ত্রী, সংস্কৃতে সুপণ্ডিত এবং ইংরেজীতেও তাঁহার দক্ষতা আছে। উডরফ তাঁহাকেই নিযুক্ত করিলেন নিজের শিক্ষকরূপে। তাঁহার মতো প্রতিভাধর ব্যক্তির পক্ষে এই ভাষা আয়ত্ত করিতে বিলম্ব হয় নাই, অল্পদিনের মধ্যেই ভারত এবং তিব্বতের কতকগুলি দুরূহ তন্ত্রগ্রন্থ তিনি অধ্যয়ন করিয়া ফেলিলেন।

তন্ত্রের সাধন রহস্য অবগত হওয়ার ইচ্ছাও ক্রমে তাঁহার দুর্বার হইয়া উঠে। কিন্তু শুধু গ্রন্থ পাঠে তাহা আয়ত্ত করা সম্ভব নয়। এজন্য চাই দক্ষ ক্রিয়াবান্ কৌল সাধকের সাহায্য ও কৃপা। তেমন মহাপুরুষের সন্ধান কোথায় পাইয়া যায়? এখন হইতে এ চিন্তাই উডরফের চিত্তকে আলোড়িত করিতে থাকে। সংস্কৃতের শিক্ষক হরিদেব শাস্ত্রীকে মাঝে মাঝে এবিষয়ে প্রশ্ন করেন, অনুরোধ জানান দক্ষ কোনো তন্ত্রাচার্যের সন্ধান দিবার জন্য।

দৈবযোগে উপস্থিত হয় এক পরম সুযোগ। হাইকোর্টের একটি মামলার ব্যাপারে হিন্দুশাস্ত্রের, বিশেষত তন্ত্রশাস্ত্রের, কতকগুলি প্রশ্নের উপর আলোকপাতের জন্য কাশী হইতে আহ্বান করা হয় পণ্ডিত শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণবকে।

হরিদেব শাস্ত্রী সহাস্যে উডরফকে বলেন, "আপনি একটি উচ্চকোটির তন্ত্রবিদের সন্ধান চাচ্ছিলেন, এবার তিনি এসে গিয়েছেন।"

"কে বলুন তো, শাস্ত্রীজী," ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করেন উডরফ।

"শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণবের কথাই আমি বলছি। হাইকোর্টের কাজ উপলক্ষে তিনি কলকাতায় এসেছেন। এই সুযোগে আপনি তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলুন। আমার মনে হয়, আপনার মনে তন্ত্রসাধনার জন্য যে গভীর আগ্রহ জন্মেছে, তা মিটতে পারে এঁরই সাহায্যে।"

"তাঁকে আজই তবে নিয়ে আসুন আমার গৃহে।"

"তবে একটা কথা, স্যর, ইনি কিন্তু ইংরেজী ভাষা জানেন না মোটেই। এরূপ আচার্য আপনার পছন্দ হবে কিনা, জানিনে।"

"ইংরেজী না-জানা শাস্ত্রবিদ্‌ই তো আমি চাই। তাঁর ভেতরে রয়েছে নির্ভেজাল বস্তু।"

হরিদেব শাস্ত্রীর সাহায্য নিয়া উডরফ নিজের ভবনেই সাক্ষাতের ব্যবস্থা করিলেন আচার্য শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণবের সঙ্গে। যথাসময়ে বিদ্যার্ণব সেখানে উপস্থিত হইলে সসম্ভ্রমে তাঁহাকে আনিয়া বসাইলেন নিজের ড্রয়িংরুমে।

তন্ত্রাচার্যের প্রথম দর্শনেই উডরফ অভিভূত হন। শক্তি-সাধনা ও তত্ত্বজ্ঞানের মূর্ত বিগ্রহ তাঁহার সম্মুখে উপবিষ্ট। আয়ত নয়ন দুটি শাণিত ছুরিকার মতো ঝক্‌ঝক্ করিতেছে। মাথায় দীর্ঘ কেশের গুচ্ছ, ললাটে বৃহৎ সিঁদুরের ফোঁটা এবং রক্তচন্দনের তিলক। কণ্ঠে বিলম্বিত রুদ্রাক্ষ ও স্ফটিকের কয়েক লহর মালা। পরিধানে একটি গৈরিক রঞ্জিত আলখাল্লা। নির্নিমেষ নয়নে এই বীরাচারী সিদ্ধ কৌলের দিকে উডরফ চাহিয়া আছেন।

ক্ষণপরেই শুরু হয় তন্ত্রশাস্ত্র সম্পর্কে উভয়ের দীর্ঘ আলোচনা। উডরফ তাঁহার এক একটি প্রশ্ন উত্থাপন করেন, আর শিবচন্দ্র তৎক্ষণাৎ অবলীলায় তাঁহার সমাধান জ্ঞাপন করেন, সমর্থন টানিয়া আনেন প্রাচীন শাস্ত্রের ভূরি ভূরি উদ্ধৃতি হইতে।

বিস্ময়ে হতবাক্ হইয়া গিয়াছেন স্যার জন উডরফ। ভাবেন, শুধু শাস্ত্রবিদ্যা আহরণ করিয়া এমনতর তাত্ত্বিক দিক্‌দর্শন তো কেহ দিতে পারেন না! অলৌকিক শক্তি ও অলৌকিক প্রজ্ঞা রহিয়াছে এই

মহাপুরুষের প্রতিটি উচ্চারিত বাক্যের পিছনে। প্রতিটি বাক্য যেন মন্ত্রচৈতন্য দিয়া আবির্ভূত হইতেছে, উডরফের সর্বসংশয় ভঞ্জন করিয়া দিতেছে সঙ্গে সঙ্গে।

বিদায়ের কালে শিবচন্দ্র কহিলেন, "সাহেব, আপনার ভেতরে জন্মান্তরের শুভ সংস্কার রয়েছে, নতুবা তন্ত্র সম্বন্ধে এরূপ শ্রদ্ধা, আর অনুসন্ধিৎসা তো সম্ভব নয়।"

বিদ্যার্ণব কাশীধামে চলিয়া গেলেন, কিন্তু উডরফের মানসপটে দীপ্যমান রহিল সিদ্ধকৌল মহাপুরুষের সেই তপস্যাপূত মূর্তি ও তাঁহার শাস্ত্রীয় ভাষণের স্মৃতি।

তন্ত্রশাস্ত্রের নানা তথ্য ও তন্ত্র সম্পর্কিত প্রশ্ন এ-সময়ে উডরফের মনে জাগিয়া উঠিত। এগুলির মীমাংসা অবশ্য চাই। হরিদেব শাস্ত্রীর মাধ্যমে এসব প্রশ্ন তিনি কাশীতে শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণবের কাছে প্রেরণ করিতেন, উত্তরে তিনিও সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার বক্তব্য জানাইয়া দিতেন, করিতেন জটিল তত্ত্ব ও রহস্যের মীমাংসা।

অতঃপর কয়েক মাসের মধ্যেই উডরফ তাঁহার সংকল্প স্থির করিয়া ফেলিলেন। হরিদেব শাস্ত্রীকে কহিলেন, "শাস্ত্রীজী, আমার অন্তরে আচার্য শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণবের প্রথম দর্শনের স্মৃতি চিরউজ্জ্বল হয়ে রয়েছে কোনোমতেই তাঁকে ভুলতে পারছিনে। স্থির করেছি, তাঁর কাছ থেকেই আমি দীক্ষা নেবো।"

"একি অদ্ভুত কথা আপনি বলছেন, স্যর উডরফ? তান্ত্রিক দীক্ষা নেবার তাৎপর্য নিশ্চয় কিছুটা আপনি জানেন?" সবিস্ময়ে বলিয়া উঠেন হরিদেব শাস্ত্রী।

"তা জানি বৈ কি। তান্ত্রিক আচার অনুষ্ঠান ও ক্রিয়া আমায় সম্পন্ন করতে হবে নিখুঁতভাবে, এ জীবনের অনেক কিছু সংস্কার, আচার আচরণ ত্যাগ করতে হবে। তাতে আমি মোটেই পশ্চাদ্‌পদ হবো না।"

"তা যেন বুঝলুম। কিন্তু বিদ্যার্ণব মশাইর সম্মতি তো আগে

নেওয়া চাই। ভিন্ন দেশ, ভিন্ন জাতি, ভিন্ন ধর্ম সংস্কৃতি আপনার। সহজে যে তিনি আপনাকে সাধন দেবেন, তন্ত্রের গূহ্য তত্ত্ব ও ক্রিয়া শেখাবেন, তা তো আমার মনে হচ্ছে না।"

"শাস্ত্রী, সেই জন্যই তো আপনাকে আমার উকিল নিযুক্ত করা। আমার হয়ে আপনি বিদ্যার্ণবকে জোর ক'রে বলুন। আমার দিক থেকে আমি মন স্থির ক'রে ফেলেছি। এমন কি, আমার স্ত্রীর অনুমতিও মিলে গিয়েছে।"

"এসব প্রশ্নের মীমাংসা দূর থেকে হয় না। তাহলে, বরং চলুন, আমরা দুজনে মিলে কাশীতে যাই। সেখানে গিয়ে বিদ্যার্ণবকে আপনি আপনার প্রার্থনা জানাবেন। আমিও যথাসাধ্য বলবো।"

"এ অতি উত্তম কথা। চলুন তা হলে কাশীতে গিয়ে তাঁকে আমি সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাই।"

কয়েকদিনের মধ্যেই উভয়ে উপনীত হইলেন কাশীধামে। শিবচন্দ্র তখন পাতালেশ্বরে অবস্থান করিতেছেন। এই সময়ে তাঁহার সর্বমঙ্গলা সভার জয়জয়কার চারিদিকে। দেশের দিগ্‌দিগন্ত হইতে তন্ত্রসাধনার অনুরাগীরা জড়ো হইতেছেন তাঁহার কাছে। ধনী দরিদ্র, শিক্ষিত অশিক্ষিত সকল ভক্তকেই তিনি দিতেছেন তাঁহার সাহায্য ও কৃপাপ্রসাদ।

শিবচন্দ্রের ভবনে গিয়া উডরফ ও হরিদেব শাস্ত্রী শুনিলেন, সেদিন সাড়ম্বরে মায়ের পূজা অনুষ্ঠিত হইতেছে। বিদ্যার্ণব মহাশয় অত্যন্ত ব্যস্ত, সাহেবকে পূজা শেষ না হওয়া অবধি ঘণ্টা তিনেক অপেক্ষা করিতে হইবে।

ভক্ত সেবকেরা উডরফ ও শাস্ত্রীজীকে পরম সমাদরে অভ্যর্থনা জানান এবং একটি নিভৃত কক্ষে নিয়া বসাইয়া দেন। অদূরে গৃহের অভ্যন্তরে দেবীর পূজা ও হোম অনুষ্ঠিত হইতেছে, কানে আসিতেছে সিদ্ধ কৌল শিবচন্দ্রের উচ্চারিত মন্ত্র, আর আবেগ কম্পিত কণ্ঠের ঘন ঘন আরাব—তারা, তারা, তারা।

পূজা-অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়া গেল। রক্ত গৈরিক পট্টবাস পরিহিত শিবচন্দ্র ধীরপদে সেই কক্ষে আসিয়া উপস্থিত হন, তাম্রকুণ্ড হইতে ভস্ম নিয়া লেপন করিয়া দেন উডরফ এবং হরিদেব শাস্ত্রীর ললাটে।

মুহূর্ত মধ্যে উডরফের সর্বসত্তায় সঞ্চারিত হয় এক অলৌকিক শক্তির প্রবাহ। একটা বিদ্যুতের তরঙ্গ যেন তাঁহার সারা দেহকে বিপর্যস্ত করিয়া ফেলে, প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ থরথর করিয়া কাঁপিতে থাকে, বাহ্যচৈতন্য বিলুপ্ত হইবার উপক্রম হয়।

এই সময়ে শিবচন্দ্রের ইঙ্গিতে হরিদেব শাস্ত্রী তাঁহাকে দুই হাতে জড়াইয়া ধরেন, পার্শ্বস্থিত তক্তপোশে শোয়াইয়া দেন।

কিছুক্ষণ বাদেই উডরফের সংবিৎ ফিরিয়া আসে, সুস্থ এবং স্বাভাবিক হইয়া উঠিয়া শিবচন্দ্রকে নিবেদন করেন সশ্রদ্ধ প্রণাম। শিবচন্দ্রের আশীর্বাদ ও কুশল প্রশ্নাদি শেষ হইলে শুরু হয় আসল কথাবার্তা।

উডরফ নিবেদন করেন, "ঠাকুর, কলকাতায় প্রথম যেদিন আপনাকে দর্শন করি, সেদিন থেকেই আমার মন জুড়ে বসে আছে তন্ত্রসাধনার আকাঙ্ক্ষা। তাই আজ আপনার শরণ নিতে এসেছি।"

শিবচন্দ্রের আয়ত নয়নদ্বয় আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠে। প্রসন্ন কণ্ঠে বলেন, "সাহেব, আপনার ওপর জগন্মাতার আশীর্বাদ নিরন্তর বর্ষিত হোক। আপনি ভাগ্যবান, তাতে সন্দেহ নেই। জগন্মাতার সন্তান তো এ জগতে কতোই রয়েছে, কিন্তু মাতৃসাধনার জন্য এমন ব্যাকুল হয়ে ওঠে কয়জন?"

"আমার দিক দিয়ে বন্ধন ও বাধাবিঘ্ন অনেক, তা আমি জানি," অকপটে বলেন উডরফ। "কিন্তু, আমার একান্ত প্রার্থনা, কৃপা ক'রে সে সব আপনি দূর ক'রে দিন। তন্ত্র সাধনার আলোক দিয়ে জীবন আমার ধন্য করুন।"

"সাহেব, গোড়াতেই আমি বলে রাখতে চাই, এই সাধনা ও তত্ত্ববিদ্যা গুরুমুখী। শ্রদ্ধাবান্ হয়ে, ত্যাগতিতিক্ষা নিয়ে, গুরুর কাছে পুরোপুরিভাবে আত্মসমর্পণ করতে হবে, তবেই সিদ্ধি হবে করায়ত্ত। তাতো সহজ কথা নয়।"

"আমি আপনার চরণে নিজেকে উৎসর্গ করতে চাই। শক্তি সাধনার আলো জেলে আপনি আমায় পথ দেখিয়ে দিন এই আমার প্রার্থনা।'

এবার স্নেহমধুর কণ্ঠে শিবচন্দ্র কহিলেন, "সাহেব, আমি হরিদেব শাস্ত্রীর কাছে শুনেছি, আপনি সুপণ্ডিত এবং প্রকৃত তত্ত্বান্বেষী। এ খুবই আনন্দের কথা। কিন্তু আপনাকে বিশেষভাবে আমার দুই একটা নির্দেশ দেবার আছে।"

"বলুন। যথাসাধ্য আমি তা পালন করবো।"

"আমাদের এই ভারতবর্ষ পুণ্যময় হয়েছে, প্রজ্ঞানময় হয়েছে শত শত যোগী ঋষি ও সিদ্ধ মহাত্মাদের পুণ্য ও জ্ঞানের আলোকে। উচ্চকোটির এই সব সাধক প্রচ্ছন্ন রয়েছেন এদেশের হিমালয় অঞ্চলে, গঙ্গা, যমুনা, কাবেরীর তটে তটে, রয়েছেন বহুতর তীর্থ ও জাগ্রত মহাপীঠে। প্রকৃত শ্রদ্ধা নিয়ে, যুক্তপাণি হয়ে, তাঁদের সন্ধানে বেরুলে আজকের দিনেও তাঁদের সাক্ষাৎ মিলে। আপনি হিমালয় অঞ্চলে গিয়ে এঁদের দু-চার জনকে খুঁজে বার করুন, তাঁদের কাছ থেকে আশীর্বাদ ও উপদেশ নিন্। তাই হবে আপনার সাধনার বড় প্রস্তুতি।" এই প্রস্তুতির পর স্থির করা যাবে, তন্ত্রদীক্ষা আপনি নেবেন কিনা, কার কাছে নেবেন।"

শ্রদ্ধাভরে শিবচন্দ্রকে প্রণাম করিয়া উডরফ কলিকাতায় চলিয়া আসিলেন। এখন হইতে তাঁহার ধ্যান জ্ঞান হইয়া উঠিল সিদ্ধ মহাত্মাদের অনুসন্ধান ও কৃপালাভ। এজন্য অজস্র চিঠিপত্র তিনি লিখিতে লাগিলেন, সাধু মহল সম্পর্কে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদেরও পাঠাইলেন দিকে দিকে।

কাশীতে সেদিন শিবচন্দ্রের ভবনে এক অলৌকিক দিব্য অনুভূতি লাভ করেন উডরফ। এই অনুভূতির পুণ্যময় স্মৃতিটি উত্তরকালে তাঁহার অন্তরে চির জাগরূক ছিল।

এ সম্পর্কে স্যার জন উডরফ শিবচন্দ্রের প্রধান শিষ্য দানবারি গঙ্গোপাধ্যায়কে বলিয়াছিলেন, "কাশীতে ঠাকুর শিবচন্দ্রের ভবনে

সেদিন উপস্থিত হবার পরেই এক দিব্য অনুভূতিতে আমার বাহ্যজ্ঞান প্রায় লোপ পেয়ে যায়। একটা বিদ্যুতের প্রবাহ যেন আকস্মিক-ভাবে আমার দেহের ভেতরে প্রবেশ করে, ছড়িয়ে পড়ে প্রত্যেকটি অঙ্গে প্রত্যঙ্গে। মনে হতে থাকে, সারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যেন চক্রাকারে ঘূর্ণিত হচ্ছে আর অপসৃত হয়ে যাচ্ছে সৃষ্টির নিঃসীম মহাকাশে। মনের ক্রিয়া তারপর স্তব্ধ হয়ে গেল।

"কিছুক্ষণ বাদে দেখা গেল চৈতন্যের পুনরাবির্ভাব, ধীরে ধীরে ফিরে এলাম নিজের অভ্যন্তরে, একটা দিব্য পরিবেশে। বিদ্যুতের মতন দ্যুতিমান একটা বিরাটায়তন ওঙ্কার রূপায়িত হয়ে উঠল আমার নয়ন সমক্ষে। তার ভেতরে নিরন্তর ভেসে বেড়াচ্ছিল পবিত্র মাতৃবীজ সমন্বিত দিব্যোজ্জ্বল মন্ত্ররাশি। হরিদেব শাস্ত্রী আমায় পরে বলেছিলেন, আমার অর্ধবাহ্য অবস্থা লক্ষ্য ক'রে ঠাকুর শিবচন্দ্র ইঙ্গিতে শাস্ত্রীজীকে নির্দেশ দিয়েছিলেন আমাকে শুইয়ে দিতে। কিছুক্ষণ পরে অবশ্য আমার সংবিৎ ফিরে এসেছিল, তখন ঠাকুরের উপদেশ পেয়ে আমি ধন্য হয়েছিলাম।"

উডরফ তখন কলিকাতায়। হাইকোর্টের দীর্ঘ অবকাশ আসিয়া পড়িয়াছে। এ সময়ে তাঁহার এক সংবাদদাতার নিকট হইতে চিঠি পাইলেন, হরিদ্বারের কাছাকাছি অঞ্চলে এক ব্রহ্মবিদ্ মহাত্মার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।

আর কালবিলম্ব না করিয়া তিনি হরিদ্বারের দিকে রওনা হইয়া গেলেন। সঙ্গে চলিলেন তাঁহার দোভাষী হরিদেব শাস্ত্রী এবং আরো দুই তিনটি সাধনকামী বন্ধু।

হরিদ্বারের নিকটস্থ এক পর্বতের নিভৃত কন্দরে ঐ মহাত্মার দর্শন পাওয়া গেল। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর সমাধি হইতে তিনি ব্যুত্থিত হইলেন, হাতছানি দিয়া সবাইকে ডাকিয়া নিলেন তাঁহার নিজের আসনের কাছে।

অপার শান্তির প্রবাহ যেন স্তব্ধ হইয়া রহিয়াছে এই প্রাচীন

তাপসের গুহাহিত জীবনে। দিব্য আনন্দের আলো দু'চোখ হইতে ঠিকরাইয়া পড়িতেছে, সমগ্র গুহার পরিবেশকে করিয়া তুলিয়াছে স্নিগ্ধমধুর ও শান্তিময়।

স্নেহপূর্ণ স্বরে মহাত্মা উডরফকে প্রশ্ন করিলেন, "বেটা, মনে হচ্ছে তুমি এদেশের নও, বিদেশ থেকে এসেছো। কি তোমার মনোবাঞ্ছা, খুলে বল।"

"বাবা, ভগবৎ দর্শনের জন্য প্রাণ বড় অধীর হয়ে উঠেছে। কিন্তু এ দর্শনের পথ বড় কঠিন, বড় বিপদসঙ্কুল। এ পথে সদ্‌গুরুর দর্শন যদি না মিলে, তিনি যদি হাত ধরে না নিয়ে যান, তবে তো একেবারে উপায় নেই। আমি তাই গুরুর সন্ধানে বেরিয়েছি। আপনি আমায় কৃপা করুন, এ বিষয়ে সাহায্য করুন।"

"দেখো বেটা, ভগবানের লীলা কত বিচিত্র, কত চমৎকার। সাত সমুদ্রের পারে তোমার দেশ। সংস্কার, জন্ম, পরিবেশ সব ভিন্‌দেশী। আর তিনি তোমায় এদেশে টেনে এনে গুরুর সন্ধানে ঘোরাচ্ছেন অরণ্যে পর্বতে।"

অতঃপর মহাত্মা উডরফকে গুহার এক নিভৃত কোণে নিয়া বসাইলেন, স্পর্শ করিলেন তাঁহার ব্রহ্মদণ্ডে। এ যেন এক অবিশ্বাস্য ইন্দ্রজাল। উডরফের চিত্তপটে একের পর এক ফুটিয়া উঠিল বহুতর বিচিত্র দৃশ্য। এ সব দৃশ্য যেন পূর্বজন্মে নিজ জীবনে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন অনির্বচনীয় আনন্দে প্রাণ ভরিয়া উঠিল।

মহাত্মা স্মিতহাস্যে বলিলেন, "বেটা, এসব দৃশ্য যা দেখলে সবই তোমার নিজ জীবনের। বহুপূর্বে জন্মান্তরের ধারায় এসব ঘটনা ঘটেছে। এই ঘটনা পরম্পরার ভেতর দিয়েই গড়ে উঠেছে তোমার সংস্কার, আর তোমার অন্তর্জীবন। এর ফলেই সমুদ্র পার হয়ে, অজানা আনন্দের হাতছানিতে, তুমি এদেশের দেবভূমিতে এসে পৌঁছেছো। যথেষ্ট সুকৃতি তোমার রয়েছে, বেটা।"

দিব্য আনন্দের স্রোত বহিয়া চলিয়াছে উডরফের শিরায় শিরায়। উদ্দীপনায় অধীর হইয়া জোড়হস্তে কহিলেন, "বাবা, শুনেছি ব্রহ্মবিদ্

গুরু শিষ্যের তিন জন্মের সংস্কার ও সাধন ফল দেখে তারপর দীক্ষা দেন। দেখতে পাচ্ছি, আমার বহুজন্মের ওপর আপনার দিব্য দৃষ্টি রয়েছে প্রসারিত। তবে আপনিই এ অধমকে দীক্ষা দিয়ে কৃতার্থ করুন।"

"না বেটা, আমি তোমার গুরু নই। একাধারে শাস্ত্রবিদ্, জ্ঞানী, কর্মী ও শক্তি সাধনায় পারঙ্গম সাধক হবেন তোমার গুরু। তিনি তোমার কাছাকাছিই রয়েছেন। শুভলগ্ন উপস্থিত হলে তাঁর কৃপা তুমি পাবে।"

মহাত্মা এবার নীরব হইলেন, ধুনির সম্মুখে বসিয়া শুরু করিলেন তাঁহার ধ্যান মনন। অতঃপর উডরফ ও তাঁহার সঙ্গীরা প্রণাম নিবেদন করিয়া গুহা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

এবার সন্ধান আসিল হৃষিকেশের এক প্রখ্যাত যোগীর। গঙ্গার অপর পারে, ঘন অরণ্যে আবৃত এক কুঠিয়ায়, এই যোগী দীর্ঘদিন তাঁহার তপস্যায় নিমগ্ন রহিয়াছেন। দুইজন ভক্তিমান্ সঙ্গী নিয়া উডরফ তাঁহার সকাশে উপস্থিত হইলেন।

প্রণাম করার সঙ্গে সঙ্গে যোগী সহাস্যে কহিলেন, "বেটা, কেন তুমি বৃথা এদিকে ওদিকে ঘুরে মরছো, বলতো? হিমালয়ের ব্রহ্মবিদ্ মহাত্মাদের দর্শন করছো, ভালো কথা। এ দর্শনে পুণ্য হয়, মন স্থির হয়, প্রত্যাহার ও ধ্যান ধারণা আপনি এসে যায়।"

"সেইজন্যেই তো এখানে আমার আসা, মহারাজ,"—যুক্তকরে নিবেদন করেন উডরফ।

"কিন্তু বেটা, তোমার তপস্যার স্থান তো এটা নয়, তোমার গুরুও এখানকার কেউ নন। এখানকার উচ্চকোটির মহাত্মারা পরাজ্ঞানের উৎস, কর্ম বা শাস্ত্র প্রচারের ধার তাঁরা ধারেন না। তোমার ভেতরের দিকে তাকিয়ে দেখতে পাচ্ছি, তোমার সাধনার সঙ্গে কিছুটা ঐশ্বরীয় কর্মও যুক্ত রয়েছে। তোমার স্থান তাই এখানে নয়, লোকালয়ে। তপস্যা ও জনকল্যাণ, দুই-ই তোমায় করতে হবে সমভাবে।"

নানা চিন্তায় বিহ্বল হইয়া পড়েন উডরফ। ব্যবহারিক জীবনের সূক্ষ্ম বিচার বিশ্লেষণে তিনি অতিমাত্রায় কুশলী। তীক্ষ্ণধী ব্যারিস্টার হিসাবে এক সময়ে তিনি সুপরিচিত ছিলেন। তারপর কালকাতা হাইকোর্টের এক বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ বিচারপতিরূপে তাঁহার খ্যাতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু এই সিদ্ধ মহাত্মাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলিয়া কোনো স্থির সিদ্ধান্তেই যে আসিতে পারিতেছেন না।

ভাবিলেন, শিবচন্দ্র সিদ্ধ কৌল সাধক। নিজেই তিনি আগ্রহ করিয়া উডরফকে পাঠাইয়াছেন এই সব ঈশ্বরকল্প মহাত্মার সন্ধানে। এক্ষেত্রে বুঝিয়া নিতে হইবে, শিবচন্দ্র চাহিতেছেন, তাঁহার চাইতে বেশী শক্তিধর কোনো মহাপুরুষের নিকট উডরফ দীক্ষা গ্রহণ করুন। কিন্তু এখানে আসার পর উডরফের অভিজ্ঞতা হইয়াছে অন্য রকমের। এই মহাত্মাদের মতে, শিবচন্দ্রের মতো জ্ঞানবান্ ও কর্মী পুরুষই তাঁহার গুরু হওয়ার উপযুক্ত।

সংশয় ও বিপরীতধর্মী চিন্তাস্রোতে চিত্ত যখন বিভ্রান্ত এবং আলোড়িত, এমন সময়ে, উত্তরাখণ্ডে থাকিতেই, আর এক ব্রহ্মজ্ঞ যোগী পুরুষের সংবাদ পান উডরফ।

গুপ্তকাশীর নিকটস্থ এক পর্বতগুহায় ইনি বাস করেন। স্থানীয় সাধক ও জনসাধারণের বিশ্বাস ইঁহার বয়স তিন চার শত বৎসরের কম নয়।

নিকটস্থ এক অরণ্যে উডরফ ও তাঁহার সঙ্গীরা তাঁবু ফেলিলেন। বিশ্রাম ও আহারাদির শেষে উপনীত হইলেন যোগীরাজের গুহায়।

বেশ কিছুক্ষণ সেখানে অপেক্ষা করার পর মহাত্মার ধ্যান ভাঙিল। ইঙ্গিতে দর্শনার্থীদের তিনি নিকটে ডাকিলেন। প্রণামান্তে উডরফ শুরু করিলেন তত্ত্বজ্ঞানের দুই চারিটি প্রশ্ন।

যোগীরাজ সহাস্যে মৃদুস্বরে কহিলেন, "বেটা, তোমার ভেতরে ঈশ্বর দর্শনের ব্যাকুলতা রয়েছে ঠিকই, কিন্তু অহংবোধ আর সংশয় সৃষ্টি করেছে দুস্তর বাধা।"

"বাবা, আপনার কথা অতি যথার্থ। আমি অন্ধ পথিক। কৃপা

করে আমায় আপনি চক্ষুষ্মান করুন। আমায় পথ দেখিয়ে দিন। তত্ত্ববিদ্ গুরুর সাহায্য না পেলে, এক পা'ও যে আমি অগ্রসর হতে পারছিনে। সেই গুরুর সন্ধানে বেরিয়েছি, কিন্তু তিনি রয়ে গেছেন নাগালের বাইরে।"

যোগীরাজ উত্তরে বলিলেন, "বেটা, তুমি অন্ধ, একথা ঠিক। তত্ত্বজ্ঞান যাঁর জীবনে ফুটে ওঠে নি, সে অন্ধই বটে। কিন্তু তোমায়, জিজ্ঞেস করি, এর আগে যে দুই মহাত্মার কাছে গিয়েছিলে, তাঁরা তো তোমার বিধিনির্দিষ্ট গুরুর ইঙ্গিত ঠিকই দিয়েছেন। সেই চক্ষুষ্মান্ মহাত্মাদের বাক্যে তো তুমি কান দাও নি। অন্ধের মতো পথ চলছো, আর হোঁচট খাচ্ছো।"

বিস্ময় বিস্ফারিত নয়নে বৃদ্ধ যোগীরাজের দিকে তাকাইয়া থাকেন উডরফ। উপলব্ধি করেন, এই ঈশ্বরকল্প মহামানবের দৃষ্টির বাহিরে কোনো কিছুই নাই।

করজোড়ে কহিলেন, "বাবা, কৃপা ক'রে আমায় বলুন, কি আমি করবো, কার কাছে শরণ নেবো।"

"শোন বেটা। আগের দুই সর্বজ্ঞ মহাত্মা যা বলেছেন, তার ওপরে আমার আর কিছু বলার নেই। এবার স্বস্থানে ফিরে যাও, সদ্গুরু তুমি সেখানে বসেই পাবে। আরো একটা কথা মনে রেখো। জীবন ক্ষণস্থায়ী, এর একটি মুহূর্তও বিনা সাধনভজনে অপচয় ক'রো না। শিগ্গীর গিয়ে সদ্গুরুর আশ্রয় নাও, তাঁর উপদেশমতো কাজ করো। জীবনকে আহুতি দাও ঈশ্বরের যজ্ঞে। তবেই না ঈশ্বর তোমায় কোলে টেনে নেবেন।"

যোগীরাজের নিকট বিদায় নিয়া নিজের তাঁবুতে ফিরিয়া আসেন উডরফ। এবারে দৃষ্টি তাঁহার ক্রমে স্বচ্ছ হইয়া উঠে। পরিষ্কারভাবে বুঝিতে পারেন, তন্ত্রাচার্য শিবচন্দ্র এতদিন শুধু তাঁহাকে পরীক্ষা করিয়াছেন। ব্যারিস্টারী এবং জজিয়তী জীবনের অত্যুগ্র বিচার বিশ্লেষণ, অহমিকা বোধ আর সংশয়, এতদিন উডরফকে ঘাটে ঘাটে ঘুরাইয়া মারিয়াছে। এবারে তাঁহাকে নিতে হইবে স্থির সিদ্ধান্ত।

সেইদিনই তাঁবু তুলিয়া সঙ্গীদের সমভিব্যাহারে উডরফ রওনা হইলেন কলিকাতার দিকে।

হাইকোর্টের ছুটি ফুরাইতে তখনো বেশ কিছুটা দেরি আছে। গুপ্তকাশী হইতে ফিরিয়া কয়েকদিনের জন্য উডরফ শৈলাবাস দার্জিলিং-এ বেড়াইতে গিয়াছেন। সেদিন ঘুম্ পাহাড়ের এক বনের মধ্য দিয়া পথ চলিতেছেন, হঠাৎ চোখে পড়িল এক সাধুর ঝুপড়ি। অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, ভস্মমাখা, দীর্ঘবপু এক সাধু ধুনি জ্বালাইয়া ধ্যানমগ্ন রহিয়াছেন। কপালে তাঁহার সিন্দুর ও রক্ত চন্দনের ফোঁটা, গলায় হাড়ের মালা। বুঝা গেল, ইনি তান্ত্রিক সন্ন্যাসী।

ধ্যান ভঙ্গ হইলে উডরফ ভক্তিভরে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। কথা প্রসঙ্গে জানা গেল, দীর্ঘদিন ইনি তিব্বতে তপস্যারত ছিলেন। এবার গুরুর আদেশে ফিরিতেছেন সমতল ভূমিতে।

ভাঙা ভাঙা হিন্দিতে উভয়ের আলাপ চলিতেছে। এ সময়ে স্যার উডরফ তাঁহার মনের কথা খুলিয়া বলিলেন, "মহারাজ, আমি তন্ত্র সাধনার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে পড়েছি, কিন্তু সদ্‌গুরু লাভ এখনো হয়ে ওঠে নি।"

কিছুক্ষণ নীরবে নয়ন মুদিয়া থাকিয়া সন্ন্যাসী কহিলেন, "কেন বেটা, তোর গুরু তো তোর জন্য অপেক্ষা ক'রেই রয়েছেন। তাঁর নাম শিবচন্দ্র। তাঁর কাছ থেকেই মিলবে তোর শান্তি আর মুক্তির সন্ধান।"

সন্ন্যাসীকে প্রণাম জানাইয়া উডরফ সানন্দে বিদায় নিলেন। এবার আর তাঁহার মনে কোনো সংশয় নাই, দ্বিধা দ্বন্দ্ব নাই। ব্যারিস্টার ও বিচারপতি হিসাবে আইনের বহুতর কুট প্রশ্ন ও জটিল রহস্যের মীমাংসা তিনি করিয়াছেন, সেক্ষেত্রে প্রচুর সাহস ও আত্মবিশ্বাস তাঁহার আছে। কিন্তু অধ্যাত্ম জীবনের পথঘাট, গলিঘুঁজি অনেক কিছুই তাঁহার জানা নাই। প্রকৃত সমর্থ গুরু কে? তাঁহার ঈশ্বরনির্দিষ্ট গুরুটি বা কোথায় রহিয়াছেন? কোন্ পথে

কোন্ সাধন প্রণালী অনুসরণ করিয়া হইবেন তিনি সিদ্ধকাম ?—তাঁহার প্রতিভা ও বিদ্যাবত্তা এ সব প্রশ্নের কোনো সদুত্তর দিতে পারে না।

এজন্যই তো বার বার সাধু মহাত্মাদের কাছে তিনি ঘোরাফেরা করিতেছেন, অপেক্ষায় রহিয়াছেন নির্ভুল পথ নির্দেশের।

হিমালয়ের যোগী তপস্বীদের কথায় ও ইঙ্গিতে তাঁহার ধারণা জন্মিয়াছে তন্ত্রসিদ্ধ মহাপুরুষ শিবচন্দ্রই তাঁহার বিধিনির্দিষ্ট গুরু। কিন্তু এই চিহ্নিত গুরু তো নিজে স্পষ্ট করিয়া কিছু বলিতেছেন না। একটা অনিশ্চিতির মধ্যে তাঁহাকে ঝুলিয়া রাখিয়াছেন।

এবার তান্ত্রিক সন্ন্যাসীর স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন বাণী তাঁহার হৃদয়ে জাগাইয়া তুলিয়াছে দৃঢ় প্রত্যয়ের শক্তি। শিবচন্দ্রের নাম বলিয়া দিয়া সন্ন্যাসী তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছেন দ্বিধা-দ্বন্দ্বের আবর্ত হইতে। এবার লক্ষ্য তাঁহার স্থির। শিবচন্দ্রের নিকট হইতেই গ্রহণ করিবেন বহু আকাঙ্ক্ষিত দীক্ষা, মাতৃসাধনায় হইবেন সিদ্ধকাম।

কলিকাতায় ফিরিয়াই উড়রফ তাড়াতাড়ি হরিদেব শাস্ত্রীকে ডাকাইয়া আনিলেন। বলিলেন, "শাস্ত্রীজী, আমি সংকল্প স্থির ক'রে ফেলেছি, আচার্যবর শিবচন্দ্রের কাছ থেকেই দীক্ষা নেবো।"

শাস্ত্রীর চোখে মুখে প্রসন্নতার ছাপ। কহিলেন, "কাশীতে শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণবের গৃহে আপনার যে অলৌকিক অনুভূতি হয়েছিল, ওঙ্কার মধ্যস্থ মাতৃবীজ আপনি দর্শন করেছিলেন, তা বোধহয় আপনার স্মরণ আছে।"

"সে অনুভূতি, সে দর্শন, কোনোদিনই ভোলবার নয়।"

"আমি তখনি বুঝেছিলাম, সিদ্ধ কৌল শিবচন্দ্রের কৃপা আপনি পেয়ে গেছেন। কিন্তু তারপরও আপনি হেথায় হোথায় অনর্থক গুরুর জন্য এত খোঁজাখুঁজি করেছেন।"

"সে কথা ঠিক। হয়তো আচার্যদেব, নিজেই ইচ্ছে ক'রে আমায় ঘুরিয়েছেন, আমার সংশয় ছেদন করার জন্য, সংকল্পকে দৃঢ় ক'রে তোলবার জন্য।"

"আপনি সাধনার যোগ্য আধার। শ্রদ্ধা, সরলতা ও পবিত্রতা আপনার আছে। আমার কিন্তু কেবলই ভয় হচ্ছে, তান্ত্রিক সাধনায় যে সব আচার আচরণ আবশ্যক, তা কি আপনি ধৈর্য ধরে করতে পারবেন? আচার্য শিবচন্দ্র কিন্তু অতিমাত্রায় আনুষ্ঠানিক ও ক্রিয়াবান্, মাতৃসাধনায় একটু ত্রুটিবিচ্যুতি দেখলে ক্ষেপে ওঠেন। তাঁর সব নির্দেশ পালন ক'রে আপনি কি চলতে পারবেন?"

"আমি সব কিছুর জন্য মনকে তৈরী করেছি, শাস্ত্রীজী। তন্ত্র-সিদ্ধির জন্য প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি ক্রিয়া ও আচার আমি অবশ্য পালন করবো। তাছাড়া, আমার স্ত্রী এলেনের সম্মতিও আমি নিয়েছি। আমার শক্তি হিসেবে তিনিও দীক্ষা আর সাধন নেবেন। শাস্ত্রীজী, আমার মন বড় ব্যাকুল হয়ে পড়েছে। যত সত্বর হয় আপনি আচার্যদেবকে কলকাতায় নিয়ে আসুন।"

উডরফ ও হরিদেব শাস্ত্রীর সনির্বন্ধ অনুরোধে, কিছুদিনের মধ্যে শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব কলিকাতায় উপস্থিত হইলেন। সাক্ষাৎ ও কুশল প্রশ্নাদির পর শিবচন্দ্র স্মিতহাস্যে কহিলেন, "কি সাহেব, তোমার পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবার সব শেষ হয়েছে তো? মনের দ্বন্দ্ব সংশয় তো আর নেই?"

উডরফ জোড়হস্তে নতশিরে দণ্ডায়মান, কাতর স্বরে কহিলেন, "আচার্যদেব, আমি অবিদ্যার আবর্তে পড়ে মার খাচ্ছি। আমায় উদ্ধার করুন, মাতৃসাধনার দীক্ষা আমায় দিন।"

"সাহেব, কাশীধামে যখন তুমি আমার কাছে গিয়েছিলে, তখনি আমি তোমায় দীক্ষা দিতে পারতাম। দিই নি, তার কারণ আছে। তোমরা ইউরোপীয়রা বড় ভোগসুখী, বাস্তবধর্মী এবং বিচারশীল। বিজ্ঞানের পরীক্ষাগারে না দেখে, চাক্ষুষ না দেখে, তোমরা কোনো কিছু মেনে নিতে চাও না, তাই না?"

"হ্যাঁ, সে কথা যথার্থ।"

"সেই জন্যই তোমায় আমি এদেশের উচ্চকোটির সাধু মহাত্মাদের কাছে যেতে বলেছিলাম। তাঁদের শক্তিবিভূতির পরিচয় নিশ্চয় তুমি প্রত্যক্ষ ক'রে এসেছো।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। তাঁদের যোগবিভূতি অকল্পনীয়। কাছে গিয়ে দাঁড়ালে মনে হয়, তাঁদের দৃষ্টির তুলনায় আমরা অন্ধ. জ্ঞান-বিজ্ঞানের এতো কিছু অধ্যয়ন ক'রেও আমরা অর্বাচীন, মূর্খ।"

"এই মূল্যবোধটি তোমার হোক্, শুধু সেজন্যই তাঁদের কাছে আমি তোমায় পাঠাই নি। সিদ্ধ মহাত্মারা বড় কৃপালু। বিশেষ ক'রে যাঁরা সত্যকার মুমুক্ষু, সত্য উপলব্ধির জন্য ত্যাগ তিতিক্ষায় পশ্চাদ্‌পদ নয়, তাঁদের প্রতি ঐ মহাত্মাদের স্নেহ ও কৃপার অবধি নেই। তুমি ভিন্নদেশীয় লোক, ভিন্ন সংস্কার ও সংস্কৃতির মানুষ, তবুও তন্ত্রসাধনায় আগ্রহী হয়ে উঠেছো, এটা তাঁরা বুঝেছেন এবং তোমায় আশীর্বাদও দিয়েছেন।"

"মূলে রয়েছে আপনারই কৃপা।"

"আমার শুভেচ্ছা ছিল বৈ কি। যাক্, মহাত্মাদের কৃপায় তোমার সংশয় মিটেছে, যাচাই করার বুদ্ধি হয়েছে দূরীভূত। এবার আমি তোমায় শাক্তী দীক্ষা দেবো। কিন্তু তোমার শক্তি?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, আমার স্ত্রী এলেন এজন্য প্রস্তুত, তিনিও আপনার কাছে দীক্ষা নেবার জন্য উৎসুক হয়ে আছেন।"

লেডি এলেন উডরফ পাশের ঘরেই ছিলেন, আহ্বান পাওয়ামাত্র দ্রুতপদে আসিলেন। শিবচন্দ্রের চরণে লুটাইয়া নিবেদন করিলেন সশ্রদ্ধ প্রণাম।

নির্ধারিত শুভ লগ্নে উডরফ দম্পতির দীক্ষা অনুষ্ঠান এবং দেবী সর্বমঙ্গলার পূজা-হোম সুসম্পন্ন হইয়া গেল।

অনুষ্ঠান সমাপ্ত হইবার পর উডরফ করজোড়ে নিবেদন করেন, "আচার্যদেব, দীক্ষা দিয়ে, মাতৃপূজার অধিকার দিয়ে, আজ আপনি আমায় উদ্ধারের পথে নিয়ে এলেন। এবার আমার কর্তব্য গুরুদক্ষিণা

নিবেদন করা। কৃপা ক'রে আমায় বলুন, কোন্ বস্তু আপনার প্রিয়। যে কোনো উপায়ে আমি তা সংগ্রহ ক'রে আপনার চরণে প্রণামী দেবো।"

শিষ্যের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতেই শিবচন্দ্রের ভাবান্তর ঘটিল। কিছুক্ষণের জন্য মৌনী থাকিয়া প্রশান্ত কণ্ঠে বলিলেন, "বৎস, আমার প্রিয় বস্তু তুমি আমায় প্রণামী দিতে চাও, আমার সন্তোষ বিধান করতে চাও, খুবই আনন্দের কথা। কিন্তু কোনো জাগতিক বস্তুতে আমার বিন্দুমাত্র আকর্ষণ নেই। মায়ের কোলে বসে, মাতৃমূর্তি আমি দর্শন করেছি, মত্ত রয়েছি মাতৃসাধনায়। আর তো কোনো কাম্য বস্তু আমার নেই। তুমি আমার প্রিয় মাতৃতত্ত্ব ও মাতৃনাম জগতে প্রচার করো। যতদিন জীবন থাকে, এই মহান্ কর্মেই তুমি রত হয়ে থাকো। এতেই হবে আমার সত্যকার সন্তুষ্টি বিধান, আর এটাই হবে তোমার গুরুদক্ষিণা।"

মাতৃগত-প্রাণ সিদ্ধপুরুষের কথা কয়টি শুনিয়া বিস্ময় ও আনন্দে উডরফের অন্তর ভরিয়া উঠে। করজোড়ে নিবেদন করেন, "আমায় আশীর্বাদ করুন আপনার ঈপ্সিত কর্ম যেন আমি উদ্‌যাপন করতে সমর্থ হই।"

"তথাস্তু, বৎস। মায়ের তত্ত্ব, মায়ের তারক-নাম প্রচারের ব্রত তোমার সার্থক হোক্।"

এ সময়ে শিবচন্দ্র কিছুদিন কলিকাতায় অবস্থান করেন এবং নূতন শিষ্য উডরফকে তন্ত্রোক্ত আচার অনুষ্ঠান ও পূজা হোমের ক্রিয়া পদ্ধতি দেখাইয়া দিতে থাকেন।

সিংহবাহিনী, দশভুজা মহিষমর্দিনী, দেবী দুর্গা উডরফের ইষ্ট-বিগ্রহ। এই বিগ্রহের অর্চনা তন্ত্রশাস্ত্রের বিধান অনুযায়ী ষোড়শ-উপচারে নিত্য তিনি সম্পন্ন করিতেন। পূজা, ধ্যান জপ, হোম, ভোগরাগ ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হইত নিখুঁত ভারতীয় প্রথায়।

দেবী পূজা সমাপ্ত করিয়া উডরফ ভাবাবেশে উঠিয়া দাঁড়াইতেন। গৌরকান্তি দীর্ঘবপু রক্তচন্দনে চর্চিত, পরনে রক্তবর্ণ ক্ষৌম বসন,

গলায় রুদ্রাক্ষের মালা জড়ানো, আর কেশের শিখায় দুলিত এক গুচ্ছ রক্তজবা। তন্ত্রধারক পণ্ডিত ও মণ্ডপের সহকারীরা এই বিদেশী কৌল সাধকের দিকে অবাক্ বিস্ময়ে চাহিয়া থাকিত।

এই সময় হইতে শিবচন্দ্র ও উডরফের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ গড়িয়া উঠে। সুযোগ পাইলেই উডরফ সম্ভ্রম ও সমাদরের সহিত গুরুদেবকে স্বগৃহে আনয়ন করিতেন, গ্রহণ করিতেন নূতন নূতন নিগূঢ় ক্রিয়ার উপদেশ। কখনো বা নিজেই কুমারখালি গ্রামে অথবা কাশীতে শিবচন্দ্রের ভবনে গিয়া উপস্থিত হইতেন। গুরু এবং গুরুপত্নী উভয়কেই তিনি ভূলুণ্ঠিত হইয়া প্রণাম করিতেন। গুরুর সন্নিধানে থাকার সময়ে সকলেরই চোখে পড়িত তাঁহার নগ্নপদ, কাষায় পরিহিত, রুদ্রাক্ষ শোভিত রূপ।

ভারতীয় ধর্ম সংস্কৃতির বহু অনুষ্ঠান বা সভায় উডরফ আমন্ত্রিত হইতেন। সেসব স্থানে ভাষণ দিবার সময় সর্বপ্রথমে তিনি সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করিয়া প্রণাম নিবেদন করিতেন সদ্‌গুরু শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণবের উদ্দেশে।

তন্ত্রশাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাতারূপে এবং তন্ত্র সাধনার সিদ্ধ সাধকরূপে সারা ভারতে তখন আচার্য শিবচন্দ্রের খ্যাতি প্রচারিত। বিশেষত কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি উডরফকে দীক্ষা দিবার পর হইতে তাঁহার খ্যাতি প্রতিপত্তি দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। তাঁহার ব্যক্তিত্ব, সাধনা ও সিদ্ধির তথ্য জানার জন্য অনেকেরই আগ্রহের অন্ত নাই। বহু স্থানে অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিরা উডরফকেও তাঁহার গুরুদেব সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করিতেন। তাই উডরফ মনে মনে স্থির করিলেন, গুরুদেবের একটি প্রামাণ্য জীবনী তিনি লিখিবেন।

কয়েকদিন পরেই শিবচন্দ্রের শুভাগমন হইল তাঁহার কলিকাতার ভবনে। কুশল প্রশ্নের পরে শিবচন্দ্র কহিলেন, "উডরফ, তোমার মুখ দেখে মনে হচ্ছে, তুমি একটা নূতন কাজ শুরু করার সংকল্প করেছো। ব্যাপারটা কি, খুলে বলতো ?"

বুঝা গেল, অনেক কিছুই এই অন্তর্যামী সিদ্ধ পুরুষের দৃষ্টি এড়ায় না। উডরফ হাসিয়া কহিলেন, "আচার্যদেব, আপনি ঠিকই ধরেছেন। আমার মনে বাসনা জেগেছে, আপনার একটা প্রামাণ্য জীবনী রচনা করবার জন্য।"

"কেন? তুমি কি ভেবেছো, একাজে আমি খুশী হবো?"

"না, তা নয়।" আম্‌তা-আম্‌তা করিয়া বলেন স্যার জন উডরফ। "ভারতের এবং ইউরোপ আমেরিকার বহু জিজ্ঞাসু ব্যক্তি আপনার জীবন ও সাধনা সম্পর্কে আমায় প্রশ্ন করেন, অজস্র চিঠিপত্র লেখেন। তাই ভাবছি, এটা লিখবো।"

"শোন উডরফ, আমার জীবনী লিখলে আমি কিন্তু মোটেই খুশী হবো না। আমার জীবনী অতিশয় অকিঞ্চিৎকর। আমি সারা জীবন ধরে অনুসন্ধান ক'রে আসছি আমার মা মহামায়ার জীবনী, তাঁর সৃষ্ট সারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ছড়িয়ে আছে তাঁর জীবনকথা। সেই জীবনী বাদ দিয়ে তুমি আমার জীবনী নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছো?"

"আমাদের মতো সামান্য লোক আপনার মতো মহাপুরুষের কথা ভাবতেই খেই হারিয়ে বসে। ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরীর কথা কি ক'রে তারা জানবে বা লিখবে?" পাল্টা প্রশ্ন করেন উডরফ।

"না উডরফ, আমার শিষ্য যে হবে, সে যে মহামায়ার তত্ত্ব নিয়েই নিমগ্ন থাকবে দিন রাত। তুমি সেই তত্ত্বকথাই প্রচার করো। দীক্ষার অব্যবহিত পরেই তন্ত্রশাস্ত্র প্রচারের কথা তোমায় আমি বলেছি। এখন থেকে তাই হোক্ তোমার ধ্যান জ্ঞান।"

গুরুদেবের এই কথা উডরফ শিরোধার্য করিয়া নিলেন। সেই দিন হইতেই শুরু করিলেন আদিষ্ট তন্ত্রপ্রচারের কাজ। ইংরেজী ভাষায় শিবচন্দ্রের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'তন্ত্রতত্ত্ব'-এর অনুবাদ ও ব্যাখ্যা রচনায় তিনি ব্রতী হইয়া পড়িলেন। অসম্ভব ক্ষিপ্রতার সহিত এ গ্রন্থ রচিত হইল এবং ইহার নাম দেওয়া হইল—প্রিন্সিপল্‌স্ অব্ তন্ত্র। তারপর একে একে রচিত ও প্রকাশিত হইল আরও বহুতর তন্ত্রশাস্ত্রের গ্রন্থ।

ইংরেজী ভাষায় রচিত তন্ত্র সাহিত্য প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের শিক্ষিত

সমাজের সম্মুখে উন্মোচিত করিল সাধনা ও দর্শনের এক নবদিগন্ত।[১] শক্তি সাধনার অন্তর্নিহিত শক্তি, মাতৃতত্ত্বের দার্শনিকতা, এবং মন্ত্রের নিগূঢ় রহস্যের উপর ঘটিল নূতনতর আলোকপাত। গুরু শিবচন্দ্র তাঁহার তন্ত্রতত্ত্বে যে শুদ্ধতর বীরাচারী সাধনতত্ত্বের প্রচার করেন, শিষ্য উডরফ তাহাই তুলিয়া ধরেন সারা বিশ্বের অধ্যাত্মরস পিপাসু মানুষের কাছে।

শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণবের জীবনে দুইটি পর্যায় বিশেষভাবে লক্ষণীয়। প্রথম পর্যায়ে রহিয়াছে সাধনা ও সিদ্ধির নিরন্তর প্রয়াস, সারা ভারতের শ্রেষ্ঠ কৌল সাধকদের তিনি খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন, বাছিয়া বাছিয়া জাগ্রত শক্তিপীঠ ও শ্মশানে উপস্থিত হইতেছেন, সিদ্ধ মহাত্মাদের সাহায্যে উদ্‌যাপন করিতেন নিগূঢ় ক্রিয়া অনুষ্ঠান। এই সময়কার জীবনে তন্ত্রের প্রচার সম্পর্কে শিবচন্দ্রকে মোটেই উৎসাহী হইতে দেখা যায় নাই।

পরবর্তী পর্যায়ে আমরা দেখিতে পাই শিবচন্দ্রের আচার্য রূপ। এই সময়ে তন্ত্রতত্ত্বের প্রচার এবং প্রসারের জন্য তাঁহার তৎপরতার অবধি নাই। এজন্য প্রথমে কাশীধামে এবং পরে স্বগ্রাম কুমারখালিতে সর্বমঙ্গলা সভা তিনি প্রতিষ্ঠিত করেন। কামাখ্যা হইতে জ্বালামুখী, কেদারনাথ হইতে রামেশ্বর, সমগ্র ভারতের প্রধান প্রধান শক্তিপীঠের সাধক ও আচার্যদের সঙ্গে তিনি যোগাযোগ স্থাপন করেন, তন্ত্রের উজ্জীবনের জন্য কর্মতৎপর হন। বিশেষ করিয়া তাঁহার রচিত গ্রন্থাদির মাধ্যমে বাংলার শক্তি-সাধক ও আচার্যদের মধ্যে শিবচন্দ্র এক গভীর যোগসূত্র গড়িয়া তোলেন। তাঁহার 'তন্ত্রতত্ত্ব'

১ স্যার জন উডরফের গ্রন্থগুলির নাম: প্রিন্সিপল্‌স্ অব্ তন্ত্র, শক্তি অ্যাণ্ড শাক্ত, সারপেণ্ট পাওয়ার, গারল্যাণ্ড্ অব লেটার্স, ক্রিয়েশান অ্যাজ্ এক্সপ্লেনড ইন তন্ত্র, ইনট্রোডাকশন টু তন্ত্র, ইজ্ ইণ্ডিয়া সিভিলাইজড্, ইত্যাদি। কোনো কোনো গ্রন্থে ছদ্মনাম, আর্থার আভালন, তিনি ব্যবহার করিয়াছেন।

বাংলার তন্ত্র সাধকদের মধ্যে নূতনতর সাড়া জাগাইয়া তোলে, তাঁহার বজ্রগর্ভ ভাষণে শক্তি সাধনায় আগ্রহী অগণিত নরনারী সে সময়ে নবভাবে উদ্দীপিত হইয়া উঠে।

গুরুদেবের অশেষ কৃপা এবং তাঁহার প্রদত্ত সাধনের কথা বলিতে গেলেই স্যার জন উডরফের দুই চোখ কৃতজ্ঞতায় সজল হইয়া উঠিত। ঘনিষ্ঠ মহলে কখনো কখনো গুরুদেব শিবচন্দ্রের নানা করুণার কথা বিবৃত করিবেন :

"কলিকাতায় একদিন তত্ত্ব ব্যাখ্যানের কালে হঠাৎ আমার ডাক পড়িল—উপস্থিত হইবামাত্র গুরুদেব বলিলেন. 'দেখ সাহেব, তুমি মাতৃসাধনায় রত। আমার ইচ্ছা একবার তুমি কোনো বিশিষ্টা মাতৃ-সাধিকার হস্ত হইতে একটি সিঞ্চন গ্রহণ করো। উত্তরে জানাইলাম, 'আপনি গুরু, পথ নির্দেশক। আপনার ইচ্ছা নিশ্চয়ই সর্বসময়ে সর্বোপরি বলবৎ হইবে। কিন্তু উক্ত কার্যে ক্রিয়াকুশলী যোগ্য দক্ষ সাধিকা কোথায় আছেন তাহা তো আমার জানা নাই। কাজেই আপনার ইচ্ছা পূর্ণ করিবার ব্যবস্থা তো এখন আপনাকেই করিতে হয়।'

"শিবচন্দ্র তদুত্তরে বলিলেন, 'তজ্জন্য তোমাকে ভাবিতে হইবে না। মায়ের ইচ্ছায় সময় পূর্ণ হইলে সকল সুযোগ আপনা হইতেই আসিয়া উপস্থিত হইবে। ইহার কিছুদিনের পর গুরুদেবেরই ব্যবস্থায় কাশীধামের জয়কালী দেবী নামে এক বাঙালী মাতৃসাধিকা কর্তৃক গুরুদেবের ইচ্ছানুযায়ী উক্ত 'সিঞ্চন' অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হইল। শিবচন্দ্র বিরাট রহস্যময় মহাপুরুষ, এরূপ লোকোত্তর চরিত্র মহাপুরুষের চরিত্রের রহস্য ভেদ করা তো সাধারণ মানববুদ্ধির অগম্য[১]।"

জীবনের শেষ কয়েকটি বৎসর শিবচন্দ্র প্রধানত কুমারখালিতেই অবস্থান করেন। দেবী সর্বমঙ্গলার সেবা ও আরাধনা হইয়া উঠে তাঁহার ধ্যান জ্ঞান। মাতৃসাধনায় সিদ্ধ মহাসাধক মাতৃক্রোড়ে বসিয়া মাতৃস্নেহের সুধারসেই বিভোর থাকিতেন দিন রাত।

১ তন্ত্রাচার্য : বসন্তকুমার পাল, হিমাদ্রি পত্রিকা ১৬ই অগ্রহায়ণ, ১৩৭৩

কলিকাতা এবং বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল হইতে শক্তি সাধনার অনুরাগী শত শত লোক এসময়ে দর্শন করিতে আসিতেন একপত্নী তন্ত্রশাস্ত্রবিদ্ শিবচন্দ্রকে। তন্ত্র সাধনার রহস্য, এবং দার্শনিক তত্ত্বের মীমাংসা তাঁহার পদপ্রান্তে বসিয়া তাঁহারা জানিয়া নিতেন।

প্রিয় শিষ্য স্যার জন উডরফ মাঝে মাঝে তাঁহার আচার্যদেবকে কলিকাতার বাসভবনে নিয়া আসিতেন, নিজের 'শক্তি' শ্রীমতী এলেন সহ ভক্তিভরে করিতেন সদ্গুরু শিবচন্দ্রের পাদপূজা। সাধনার নিগূঢ়তর ক্রিয়াগুলি উভয়ে হাতে-কলমে শিখিয়া নিতেন তাঁহার নিকট হইতে।

উডরফ তাঁহার সমধর্মী শক্তিসাধক বন্ধুদের নিয়া প্রায়ই উপস্থিত হইতেন কুমারখালিতে। নগ্নপদ, কাষায় পরিহিত, রুদ্রাক্ষ মালায় শোভিত এই ইংরেজ তন্ত্রসাধক শুধু তাঁহার গুরু শিবচন্দ্রেরই প্রিয় ছিলেন না, কুমারখালি গ্রামের বহু নরনারীর ভালোবাসা ও শুভেচ্ছা লাভেও তিনি সমর্থ হইয়াছিলেন।

সদ্গুরু শিবচন্দ্রের কৃপায় উডরফ রূপান্তরিত হইয়াছিলেন এক উচ্চকোটির শক্তিসাধকরূপে। গুরুর এই কৃপাপ্রসাদের কথা উডরফ সজলচক্ষে ভাবগদ্গদ ভাষায় প্রকাশ্যে সদাই সকলের সম্মুখে বর্ণনা করিতেন। শিবচন্দ্রের তিরোধানের পরেও সদ্গুরুর প্রতি তাঁহার এই শ্রদ্ধা, আস্থা ও কৃতজ্ঞতার এতটুকু তারতম্য দেখা যায় নাই। বসন্তকুমার পালমহাশয় উডরফের এই গুরুভক্তির একটি সুন্দর চিত্র দিয়াছেন।

স্যার জন উডরফ তখন ইংল্যাণ্ডে। কলিকাতা হাইকোর্টের অস্থায়ী প্রধান বিচারপতির পদ হইতে তিনি অবসর নিয়াছেন, লণ্ডনে অবস্থান করিয়া রত রহিয়াছেন আইন অধ্যাপনার কাজে। গুরুদেব শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব ইতিপূর্বে লোকান্তরে চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার স্মৃতির অনুধ্যান, আর তাঁহার শেখানো তন্ত্রোক্ত ক্রিয়া অনুষ্ঠান প্রভৃতিই তখন উডরফের সাধনজীবনের উপজীব্য।

রবীন্দ্রনাথ মিত্র উত্তরকালের বাংলার হোম সেক্রেটারী, উডরফের লণ্ডনস্থ বাসভবনে একবার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। এই সাক্ষাতের কাহিনী উত্তরকালে তিনি বর্ণনা করিয়াছিলেন প্রবীণ সাংবাদিক হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়ের কাছে।[১]

এসময়ে লণ্ডনে থাকিয়া শ্রীমিত্র আই. সি. এস পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। স্যার জন উডরফের কাছে তিনি আইন পড়িতেন। উডরফের স্মৃতিতে তাঁহার গুরুস্থান ভারতভূমির মাহাত্ম্য চির প্রোজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে। ভারতের প্রতিটি ধূলিকণা, প্রতিটি নরনারী তাঁহার অতি প্রিয়। উডরফ একদিন রবীন্দ্র মিত্রকে তাঁহার গৃহে আমন্ত্রণ জানাইলেন, উদ্দেশ্য—ভারতের স্মৃতি, গুরুদেবের স্মৃতি রোমন্থন করিয়া কিছুটা আনন্দ পাইবেন।

উডরফের ভবনে উপস্থিত হইয়াছে মিত্রমহাশয়। সেখানকার পরিবেশ দেখিয়া বিস্মিত ও আনন্দিত হইলেন। উডরফের ড্রয়িংরুমের চারদিকের দেওয়ালে টাঙানো কতকগুলি ভারতীয় দেবদেবীর চমৎকার চিত্র। ইহাদের মধ্যে রহিয়াছেন সিংহবাহিনী দশভুজা দুর্গা, গায়ত্রী দেবী, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব প্রভৃতি। আরও আছে উডরফের গুরু শিবচন্দ্র ও তাঁহার পত্নীর সুদৃশ্য ফ্রেমে আঁটা চিত্র এবং রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, চৈতন্য ও অন্যান্য মহাপুরুষদের বিস্তর ছবি।

মিত্রমহাশয় অবাক্ হইয়া এগুলি দেখিতেছেন আর তাঁহার মনে হইতেছে, এ যেন ইংল্যাণ্ডের কোনো স্থান নয়, ভারতের কোনো দেবালয়, আশ্রম বা ধর্মপ্রাণ নাগরিকের গৃহে তিনি আসিয়াছেন।

স্যার জন উডরফ শ্রীমিত্রকে সস্নেহে অভ্যর্থনা জানাইলেন। তারপর নানা কথাবার্তার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখাইতে লাগিলেন বিভিন্ন কক্ষের ফটো ও চিত্রসমূহ।

ভারতের কয়েকটি গুহাবাসী সিদ্ধ মহাত্মার ফটোও এইসব কক্ষে ঝুলানো ছিল। এগুলি দেখানোর সময় উডরফ শ্রদ্ধাভরে তাঁহার

১ তন্ত্রাচার্য শিবচন্দ্র: বসন্তকুমার পাল, হিমাদ্রি পত্রিকা, ৯ই অগ্রহায়ণ, ১৩৭৩

যুক্তকর কপালে ঠেকাইলেন, আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া কহিলেন, "এই সব পবিত্র, দুরধিগম্য সাধনগুহা এবং এইসব মহাত্মাদের আমি স্বচক্ষে দেখে এসেছি। এ পরম সৌভাগ্য আমার হয়েছিল গুরু-মহারাজ শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণবের কৃপা ও নির্দেশ পেয়ে।"

শিবচন্দ্রের কৃপায় তন্ত্রোক্ত নিগূঢ় সাধন পাইয়া জীবন তাঁহার ধন্য হইয়াছে, এবং এই সাধনার তত্ত্ব তাঁহার জীবনে দিনের পর দিন স্ফুরিত হইতেছে, একথা বলিতে গিয়া উড়রফের দুই নয়ন অশ্রুসজল হইয়া উঠে, ভাবাবেগে সারা দেহ কম্পিত হইতে থাকে।

কিছুক্ষণ পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া আবার বলিতে থাকেন, "তন্ত্রসিদ্ধ, যোগসিদ্ধ আচার্যেরা প্রত্যক্ষ দর্শন ও উপলব্ধির যে সব কথা শাস্ত্রে লিখে গিয়েছেন, শিষ্য পরম্পরায় বলে গিয়েছেন, তার বাইরে আমাদের মতো সাধারণ স্তরের সাধকদের বলবার কিছুই নেই।"

গুরুদেব শিবচন্দ্রের প্রসঙ্গ আসিয়া পড়ায় আবার তাঁহার ভাবাবেগ দেখা দিল, গদ্‌গদ স্বরে কহিলেন :

"আমার মতো লোকের প্রতি গুরুদেবের ছিল অহেতুক কৃপা, তাঁর জীবিতকালে এবং তাঁর তিরোধানের পরে কত করুণালীলা আমি প্রত্যক্ষ করেছি! তাঁর যোগবিভূতির মাধ্যমে পেয়েছি কত গভীর স্নেহের স্পর্শ! কলকাতায় থাকতে যেমন তাঁর দর্শন ও সাহায্য পেয়েছি, তেমনি লণ্ডনে এসেও তা পেয়ে ধন্য হচ্ছি।

"গুরুদেব একবার স্বপ্নে আমায় দেখা দিয়ে কতকগুলো গুহ্য তান্ত্রিক রহস্য বুঝিয়ে দিলেন। বললেন,—'গুরুর মনুষ্যদেহের বিনাশ হলেও শিষ্যের ওপর গুরুশক্তির ক্রিয়া সমভাবেই বর্তমান থাকে, সকল অপবিত্রতা ও অমঙ্গল থেকে তাকে রক্ষা করে।'

"আমার জীবনে তখন এক বিরাট সংকট চলেছে, গুরুদেব নশ্বর দেহ ত্যাগ ক'রে আমার দৃষ্টির সম্মুখ থেকে অন্তর্হিত হয়েছেন। অন্তরে দিনরাত চলছে শোকের আর্তি। এ সময়ে একদিন কলকাতার হাইকোর্ট বেঞ্চে একটি গুরুতর এবং জটিল মামলা চলছে। আইনের বহু কূট তর্ক উঠেছে এবং বহু চেষ্টাতেও কোনো

স্থির সিদ্ধান্তে আমি পৌছুতে পারছিনে। দেহ মন ক্লান্তিতে নৈরাশ্যে মুহ্যমান, অসাড় হয়ে পড়েছে। এমন সময়ে দেখতে পেলাম বিদেহী গুরুমহারাজের আবির্ভাব। তাঁর আত্মিক স্পর্শে সঙ্গে সঙ্গে মন বুদ্ধি সতেজ ও স্বচ্ছ হয়ে উঠল, মামলাটির সম্পর্কে স্থির সিদ্ধান্তে এসে পড়লাম অচিরে।

"তাছাড়া, কলকাতায় ও লণ্ডনে বার বার তাঁর বিদেহী আত্মার স্নেহ স্পর্শ পেয়েছি ঘুমন্ত অবস্থায়, স্বপ্নযোগে। যখন যে সব দুশ্চিন্তা ও সংকটে মুষড়ে পড়তাম, তখনি স্বপ্নে প্রত্যাদেশ পেতাম তাঁর কাছ থেকে। কর্তব্য ও কর্মপন্থা সেই মুহূর্তে সহজ সরল হয়ে উঠতো।

"একবার কলকাতার হাইকোর্টে আমার এজলাসে প্রকাণ্ড ও একটি জটিল মামলা চলছে। প্রধান সাক্ষীরা সুচতুর এবং অতিমাত্রায় অসৎ। তারা বিভ্রান্ত করতে চাচ্ছিল বিচারপতিকে। তাঁদের কথা-বার্তা সতর্কভাবে শুনছি, চোখ মুখের ভাব তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে লক্ষ্য করছি। কিন্তু সত্য উদ্‌ঘাটনের কোনো পথই খুঁজে পাচ্ছিনে। একবার সন্দিগ্ধ মনে একটি সাক্ষীর দিকে তাকিয়ে তার কথার প্রকৃত সত্যতা অনুধাবন করতে চাচ্ছি, এমন সময়ে সহসা আমার দৃষ্টি পড়ল কোর্টের দেওয়ালের দিকে। দেখলাম—বিদেহী গুরুমহারাজের জ্যোতির্ময় মূর্তিটি আকারিত হয়ে উঠেছে সেখানে। গুরুমূর্তি দর্শনে তৎক্ষণাৎ মনে মনে নিবেদন করলাম আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম। গুরুদেবের চোখে মুখে প্রসন্নতা ফুটে উঠেছে। দক্ষিণ হাত উত্তোলন ক'রে অস্ফুটস্বরে বলে উঠলেন, 'কল্যাণমস্তু'। দিবালোকে প্রকাশ্য আদালত কক্ষের দেওয়ালে বিদেহী গুরুজীর এ এক মহনীয় এবং অকল্পনীয় আবির্ভাব। মন প্রাণ আমার আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে সাক্ষীদের জবানবন্দীর প্রকৃত অর্থ ও উদ্দেশ্যও স্বচ্ছ হয়ে উঠল আমার দৃষ্টিতে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলাম।

"শুধু ব্যবহারিক কাজকর্মেই নয়, আত্মিক সাধনার ক্ষেত্রেও বিদেহী সদ্‌গুরুর স্নেহময় হাতটিকে প্রসারিত দেখেছি বার বার। সেবার বাড়িতে বসে গভীর রাত্তে একটা বড় জটিল মামলার রায়

লিখছি। হঠাৎ দেখলাম, জ্যোতির্ময় তান্ত্রিক ভৈরবের বেশে, ত্রিশূল হস্তে, গুরুদেব কক্ষমধ্যে অদূরে দাঁড়িয়ে আছেন, নয়ন থেকে ঝরে পড়ছে দিব্য আনন্দের আভা। ঐ মূর্তির উদ্দেশে করজোড়ে প্রণাম নিবেদন করলাম। দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন ক'রে, বরাভয় দিয়ে, তিনি বললেন, 'কল্যাণমস্তু'। তৎক্ষণাৎ কক্ষমধ্যে ফুটে উঠল এক অত্যাশ্চর্য অতীন্দ্রিয় দৃশ্য। গুরুদেবের এ মূর্তিটি পরিণত হল অসংখ্য জ্যোতিঃঘন মূর্তিতে, সারা কক্ষটি তাতে একেবারে পূর্ণ হয়ে উঠল। বিস্ময় বিস্ফারিত নয়নে যেদিকে তাকাই, সেদিকেই দেখি ঐ মূর্তি। দিব্য আনন্দে আমি অধীর হয়ে উঠলাম, নয়ন বয়ে ঝরতে লাগল পুলকাশ্রু। নয়ন মুছে, ভাবাবেগ সংবরণ ক'রে, যখন কক্ষের চারদিকে তাকিয়ে দেখছিলাম, তখনো আমার চোখে পড়ছিল ঐসব দিব্যমূর্তি। এমনি অপার ও অহেতুকী ছিল আমার সদ্‌গুরু শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণবের করুণা।"

জীবনের শেষ তিনটি বৎসর শিবচন্দ্র কুমারখালিতেই অতিবাহিত করিয়াছেন : সহজে এস্থান ত্যাগ করিতে চাহিতেন না। ইষ্টদেবী সর্বমঙ্গলার পূজা ও ধ্যানে অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হইত, এক-একদিন সারা রাত্রিই কাটিয়া যাইত দিব্য ভাবাবেশে। মাতৃসাধক রূপান্তরিত হইতেন মায়েরই এক শিশুরূপে।

অনেক সময় দেখা যাইত, ভাবাবিষ্ট শিবচন্দ্র নিবিষ্ট মনে মা-সর্বমঙ্গলার সহিত কত কথাবার্তা বলিতেছেন, কত আদর আব্‌দার করিতেছেন। ইষ্টদেবী ও ভক্তের এই লীলাখেলার মধ্যে হঠাৎ এক এক সময়ে শিবচন্দ্র ভাবাবেশে প্রমত্ত হইয়া উঠিতেন, পার্শ্বে উপবিষ্ট অন্তরঙ্গ ভক্ত সাধকদের ডাকিয়া বলিতেন, "ঐ ছাখো, মা আমার জ্যোতির ছটায় মণ্ডপ আলো ক'রে সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন আর প্রসন্ন মধুর হাসি হাসছেন। নাও, দেখে নাও তোমরা প্রাণভরে আমার মা'কে।"

শিবচন্দ্রের আহ্বানে জাগ্রতা হইয়া উঠিতেন ইষ্টদেবী সর্বমঙ্গলা।

শুধু তাঁহারই নয়ন সমক্ষেই মা দাঁড়াইতেন তাহা নয়, শিবচন্দ্রের স্নেহভাজন ভক্ত সাধকদের কাছেও হইতেন প্রত্যক্ষীভূত। এভাবে মাতৃদর্শনের দিব্য সুধা শিবচন্দ্র পরমানন্দে বিলাইয়া দিতেন স্বগণদের মধ্যে। তাই ভক্তদের অনেকে কৃপালু গুরুদেবকে অভিহিত করিতেন, 'সদাশিব' নামে।

কুমারখালির কাছাকাছি গ্রাম তেবাড়িয়া। এই গ্রামের নেপালচন্দ্র সাহা ছিলেন শিবচন্দ্রের অন্যতম ভক্ত। সেবার নেপালের ভ্রাতুষ্পুত্র নীরদ এক প্রাণঘাতী ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়াছে, শহর হইতে খ্যাতনামা ডাক্তারদের আনা হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহাদের চিকিৎসায় রোগী নিরাময় হয় নাই। সংকট দিন দিন ঘনাইয়া আসিতে লাগিল।

নেপাল শিবচন্দ্রের কাছে ছুটিয়া আসিলেন। কাঁদিয়া কহিলেন, "বাবা ঠাকুর, আমার ভাইপো নীরদের জীবনের কোনো আশা নেই। আপনি একবার চলুন, কৃপা ক'রে তার প্রাণ ভিক্ষা দিন।"

শিবচন্দ্র মা সর্বমঙ্গলার ধ্যানে আবিষ্ট। কহিলেন, "নেপাল, আমি তাঁর শরণ নিয়ে পড়ে আছি, তাঁর মুখ চেয়ে আছি, তুমি সেই বেটিকে ডাকো। সৃষ্টিস্থিতি লয়ের যে তিনিই কর্ত্রী।"

"বাবা, আমরা পাপী-তাপী মানুষ তাঁকে তো আমরা চিনিনে, চিনি শুধু আপনাকেই। যা করবার আপনি করুন, বা আপনার মাকে দিয়ে করান।"

"ব্রহ্মময়ীর সুধাসমুদ্রে ক্ষুদ্র সফরীর মতো আমি ভেসে বেড়াচ্ছি। আমার সামর্থ্য কতটুকু বল।"

"সে সব কথা আমি বুঝিনে, বাবা। এইতো সেদিন পাঁচুপুরের জমিদার নিকুঞ্জবাবু মারাত্মক অসুখে ভুগে মরতে বসেছিলেন, আপনিই তো কৃপা ক'রে তাঁর প্রাণরক্ষা করলেন।"

"ঠিকই বলেছো, নেপাল, কিন্তু সেটা আমি করি নি। করেছেন আমার ঐ মা বেটি। তাঁর প্রত্যাদেশ পেয়েছিলাম, তাই তো অসম্ভব সম্ভব হল, নিকুঞ্জ বেঁচে উঠল।"

"আপনি সংকল্প করলে মা তা সিদ্ধ করবেন না, তাকি কখনো

হতে পারে ? না বাবাঠাকুর, আপনি আমার নীরদকে এবার বাঁচান। আমার ছোটভাই যখন মৃত্যুশয্যায় শুয়ে, তখন তার এই ছেলেকে আমার হাতে সঁপে দিয়েছিল। ছেলেটি আমার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়। একে যদি বাঁচাতে না পারি আপনার সর্বমঙ্গলা মায়ের দুয়ারে আমি আত্মঘাতী হবো।"

কথা কয়টি বলার সঙ্গে সঙ্গে নেপাল সাহা হাউমাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠেন, খড়মসহ আচার্যবর শিবচন্দ্রের পাদুটি সবলে জড়াইয়া ধরেন। নীরবে কিছুকাল দাঁড়াইয়া থাকার পর শিবচন্দ্র মৃদুস্বরে বলেন, "এ ছেলের বড় দুটি ভাইও তো এই একই বয়সে, একই রোগে মারা গিয়েছে। কি বল, নেপাল, তাই না ?"

"আজ্ঞে হাঁ, আপনি অন্তর্যামী, আপনার অজানা তো কিছু নেই। ডাক্তারেরা বলছেন, এ রোগ কোনোমতে সারানো সম্ভব নয়। আর তাই শুনে বাড়ির মেয়েরা কান্নায় ভেঙে পড়েছে।"

"হুঁ, এ যে মহাকালের ডাক। এ রোগীকে ফিরিয়ে আনা বড়ই কঠিন।"

"বাবাঠাকুর, মা সর্বমঙ্গলার দোহাই, আপনি এ ছেলেকে প্রাণ ভিক্ষা দিন।"

নিঃশব্দে, গম্ভীর মুখে মায়ের পূজা-মণ্ডপে গিয়া শিবচন্দ্র দ্বার রুদ্ধ করেন। দীর্ঘ সময় ইষ্টদেবীর সম্মুখে বসিয়া হন ধ্যানস্থ। তারপর দুয়ার খুলিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়ান, বলেন, "চল নেপাল। মায়ের সঙ্গে আমি কথা বলে নিয়েছি, তোমার বাড়িতে গিয়ে করতে হবে পূজা, হোম ও তন্ত্রোক্ত অভিচার। কিন্তু, এ যে কালব্যাধি, এর অভিচারের ফল অভিচারকারীর পক্ষে ভালো হবে না। আমাকে এজন্য দণ্ড গ্রহণ করতে হবে, নেপাল। খণ্ডন করতে হবে নিজের আয়ু। যাক্, হতভাগ্য পিতৃহীন ছেলেটা তো বাঁচুক !"

রোগীর ভবনে পৌঁছিয়াই শিবচন্দ্র শুরু করিয়া দিলেন দেবীর পূজা, হোম ও অভিচারের ক্রিয়া। কক্ষের দ্বার বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। ভিতরে শুধু রহিলেন শিবচন্দ্র, তাঁহার তন্ত্রধার এবং মুমূর্ষু

রোগী নীরদ। শেষ রাত্রে সকল কিছু অনুষ্ঠান সমাপ্ত হইলে শিবচন্দ্র পরিবারস্থ সবাইকে নিকটে আহ্বান করিলেন। ভাবাবিষ্ট স্বরে কহিলেন, "তোমাদের আর কোনো ভয় নেই, মায়ের কৃপা হয়েছে। নীরদ এবার বেঁচে গেল।"

বলা বাহুল্য, সেই দিনই রোগীর সংকট কাটিয়া যায় এবং অল্প কয়েকদিনের মধ্যে সে সুস্থ হইয়া উঠে। ইহার পর দীর্ঘ পরমায়ু নিয়া সে সংসারধর্ম পালন করিতে থাকে।

তিন মাস পরের কথা। মা সর্বমঙ্গলার ভবনটির সংস্কার ও মেরামতের কাজ চলিতেছে। মিস্ত্রীরা নানা আবর্জনার সঙ্গে কয়েকটা তীক্ষ্ণ বাঁশের খণ্ড আঙিনায় ফেলিয়া গিয়াছে। শিবচন্দ্র নগ্নপদে সেখান দিয়া চলিতেছিলেন, হঠাৎ একটি তীক্ষ্ণ বাঁশের ফলা তাঁহার পায়ে বিদ্ধ হয়, প্রচুর রক্ত ক্ষরণ হইতে থাকে।

পরের দিনই গোটা পা ফুলিয়া উঠে এবং শুরু হয় অসহ্য যন্ত্রণা। স্থানীয় ডাক্তারেরা অভিমত দেন, ক্ষতস্থানটি বিষাক্ত হইয়া উঠিয়াছে, অবিলম্বে শিবচন্দ্রকে কলিকাতার হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা দরকার। আধুনিকতম ইনজেকশান ও ঔষধাদি ছাড়া এ রোগীকে বাঁচানো যাইবে না।

এ সংবাদ কলিকাতায় পৌঁছানো মাত্র উডরফ এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ভক্তেরা তৎক্ষণাৎ চিকিৎসার সব ব্যবস্থা করিয়া ফেলিলেন। স্থির হইল, একটি আধুনিক বড় হাসপাতালের ক্যাবিনে, কোনো খ্যাতনামা সার্জনের চিকিৎসাধীনে শিবচন্দ্রকে রাখা হইবে।

কিন্তু গোল বাধাইলেন শিবচন্দ্র নিজে। শান্ত দৃঢ় স্বরে তিনি কহিলেন, "তোমরা অনর্থক হৈ চৈ ক'রো না। ডাক এসে গিয়েছে, মায়ের কোলে এবার আমায় ফিরতে হবে। এ কটা দিন নিভৃতে, একান্তে বসে, মা সর্বমঙ্গলার শ্রীমুখ আমি দর্শন করবো, তাঁর নামসুধা রসে মত্ত হয়ে থাকবো। অন্তিম সময়ে কুমারখালির এই মাটি, মায়ের মন্দির আর সিদ্ধাসন ছেড়ে আমি কোথাও যাবো না।"

অগত্যা ভক্তগণ কুমারখালি গ্রামেই যথাসাধ্য সুচিকিৎসার বন্দোবস্ত করিলেন। পায়ে অস্ত্রোপচার করিতে হইবে, সার্জন ও তাঁহার সহকারীরা তৈরী হইলেন, এনাস্থেশিয়া দিয়া রোগীকে অচেতন করিবার জন্য। শিবচন্দ্র হাসিয়া বলিলেন, "এত হাঙ্গামায় কি দরকার? এমনিতেই অস্ত্রোপচার শেষ ক'রে ফেলুন।"

ঘণ্টাখানেক ধরিয়া কাটাকুটি ও ড্রেসিং চলিল, মহাপুরুষ দিব্য ভাবে আবিষ্ট হইয়া রহিলেন, মুখ দিয়া একটি কাতরোক্তিও বাহির হইল না।

কয়েক দিনের মধ্যেই দেখা দিল চরম সংকট, চিকিৎসক ও সেবকেরা বুঝিলেন, তাঁহাদের এত কিছু সেবা যত্ন সবই এবার ব্যর্থ হইতে যাইতেছে। রোগীকে আর বাঁচানো সম্ভবপর নয়। শুধু সর্বমঙ্গলার মন্দিরে নয় সারা কুমারখালি গ্রামে নামিয়া আসে আসন্ন শোকের কৃষ্ণছায়া।

১৩২০ সালের ১১ই চৈত্র। চতুর্দশীর তিথিটি পূর্বদিন অতিক্রান্ত হইয়াছে। শিবচন্দ্রের শয্যার পাশে পত্নী, পরিজন ও ভক্তশিষ্যেরা বিষণ্ণ বদনে দাঁড়াইয়া আছেন। অনেকেই অশ্রুমোচন করিতেছেন।

শিবচন্দ্র কহিলেন, "কাঁদবার সময় তোমরা অনেক পাবে, সে সব পরে হবে। অমাবস্যা পড়ে গিয়েছে, আর মোটেই দেরি ক'রো না, মা সর্বমঙ্গলার পূজো যথারীতি সম্পন্ন ক'রে ফেল।"

পূজা সাঙ্গ হইলে কহিলেন, "এবার সবাই মিলে আমায় ধরাধরি ক'রে বাইরে বিল্বমূলে নিয়ে শুইয়ে দাও।"

শিবচন্দ্রের নির্দেশ মতো, তাঁহার পরমপ্রিয় বানলিঙ্গটি আনিয়া রাখা হইল তাঁহার বক্ষোদেশে। আর ইষ্টবিগ্রহ সর্বমঙ্গলাকে স্থাপন করা হইল অদূরে, নয়ন সমক্ষে।

মা সর্বমঙ্গলার দিকে স্থির দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া মহাসাধক উচ্ছ্বসিত স্বরে ডাকিয়া উঠেন, "মা—মা, তারা, তারা—ব্রহ্মময়ী।" বজ্রকঠোর সিদ্ধকৌল শিবচন্দ্র এবার যেন মায়ের কোলের, আদরের শিশুটি হইয়া গিয়াছেন। মা সর্বমঙ্গলার মুখপদ্ম ধ্যান করিতে করিতে

তাঁহার বদনমণ্ডলে ছড়াইয়া পড়ে দিব্য জ্যোতির আভা। তারপর নয়ন ছুটি ধীরে ধীরে নিমীলিত হইয়া আসে, ব্রহ্মময়ীর আদরের দুলাল, মাতৃমন্ত্রের সিদ্ধসাধক শিবচন্দ্র মরদেহ ত্যাগ করেন। ভারতের কৌল সাধনার আকাশ হইতে স্খলিত হয় একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক।

স্বামী অভেদানন্দ

স্বামী অভেদানন্দ ছিলেন ঠাকুর রামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ লীলা-পার্ষদ, তাঁহার তত্ত্বের ধারক বাহক এবং রামকৃষ্ণ মণ্ডলীর অন্যতম নেতা। অধ্যাত্ম-শিল্পী শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্য হস্তের স্পর্শে নূতন মানুষে রূপান্তরিত হন তিনি, ত্যাগ তিতিক্ষাময় তপস্যা, মনীষা, শাস্ত্রজ্ঞান ও তত্ত্বোজ্জ্বলা বুদ্ধির দীপ্তিতে ভাস্বর হইয়া উঠে তাঁহার সাধনজীবন। এই জীবনের আলোয় আলোকিত হইয়া উঠে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের শত শত মুমুক্ষু নরনারী

দীর্ঘ পঁচিশ বৎসরকাল বিস্ময়কর নিষ্ঠা ও কুশলতা নিয়া গুরু রামকৃষ্ণের বাণী ও বেদান্তের পরমতত্ত্ব প্রচার করেন অভেদানন্দ। পূর্বসূরী ও গুরুভ্রাতা বিবেকানন্দ আমেরিকা ও ইউরোপের জন-মানসের সম্মুখে হিন্দুধর্মের শাশ্বত রূপটি তুলিয়া ধরেন, সৃষ্টি করেন অদ্বৈত বেদান্তের তত্ত্ব ও আদর্শের ভাবতরঙ্গ। অভেদানন্দ এই তরঙ্গকে আমেরিকার দিকে দিকে ছড়াইয়া দেন, নবসৃষ্ট আন্দোলনকে দাঁড় করান সুদৃঢ় ভিত্তিতে। মাতৃভূমি ভারতের ও ভারত-ধর্মের এক উজ্জ্বল ভাবমূর্তি তিনি সেখানে গড়িয়া তোলেন। ভারতের ধর্ম-সংস্কৃতির ইতিহাসের পক্ষে তাই প্রবর্তক ও আচার্য অভেদানন্দকে কোনোদিন বিস্মৃত হইবার উপায় নাই।

অভেদানন্দের পিতা রসিকলাল চন্দ্র ছিলেন প্রখ্যাত ওরিয়েন্টাল সেমিনারীর কৃতী শিক্ষক। সৎ এবং বিদ্বান্ বলিয়া লোকে তাঁহাকে সম্মান করিত। জননী নয়নতারার চরিত্রে ধর্মভাব খুব প্রবল ছিল, কালীঘাটের মন্দিরে প্রায়ই তিনি পূজা দিতে যাইতেন, দেবীর কাছে প্রার্থনা জানাইতেন একটি ধার্মিক পুত্রের জন্য। দেবী তাঁহার সে প্রার্থনা পূর্ণ করেন—১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের ২রা অক্টোবর তাঁহার অঙ্কে

আবির্ভূত হয় এক প্রিয়দর্শন শিশুপুত্র। দেবীর কৃপায় জন্ম, তাই এ শিশুর নাম রাখা হয়, কালীপ্রসাদ।

কিশোর বয়স হইতেই কালীপ্রসাদের জীবনে দেখা যায় বুদ্ধিমত্তা ও মেধা প্রতিভার বিকাশ। ক্লাসের পরীক্ষায় প্রায়ই ভালো ফল করিতেন, এবং পারিতোষিক ইত্যাদি পাইতেন। অল্প দিনের মধ্যেই বাংলা, সংস্কৃত ও ইংরেজীতে তাঁহার অধিকার জন্মে, জিজ্ঞাসু তরুণ বহুতর গ্রন্থ এসময়ে পড়িয়া ফেলেন।

উইলসনের রচিত ভারতের ইতিহাসে আচার্য শঙ্করের কথা পাঠ করিলেন কালীপ্রসাদ। অদ্বৈত বেদান্তে দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিত ছিলেন শঙ্কর। কালীপ্রসাদের মনে জাগিয়া উঠে উদ্দীপনা, ভাবেন, বড় হইয়া এমনি দুর্ধর্ষ পণ্ডিত ও দার্শনিক তিনি হইবেন।

অনুসন্ধিৎসা ও অধ্যয়নের উৎসাহ ছিল তাঁহার প্রচুর। তাই এই বয়সেই জন স্টুয়ার্ট মিলের রচনা, এবং হের্সেল, গ্যানো, লুইস হ্যামিলটন প্রভৃতির বইএর সহিত তাঁহার পরিচয় ঘটিয়াছে। এই সঙ্গে কালিদাসের রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, শকুন্তলা এবং ভট্টিকাব্যের অধ্যয়নও চলিয়াছে। বুঝুন আর না-ই বুঝুন গোপনে গীতা অধ্যয়ন করিতে থাকেন, এ গ্রন্থের তত্ত্ব আয়ত্ত করিতে প্রয়াসী হন।

বাংলার দিকে দিকে তখন প্রাণের স্পন্দন দেখা যাইতেছে; রাজনীতি, ধর্ম এবং সংস্কার আন্দোলনের প্রবক্তারা কলিকাতার পার্কে পার্কে জ্বালাময়ী ভাষণ দিয়া বেড়াইতেছেন। আর তরুণেরা, সব মাতিয়া উঠিয়াছেন, দলে দলে যোগ দিতেছেন এই সব সভায়। কালীপ্রসাদও সুযোগ পাইলেই কোনো কোনোটিতে গিয়া উপস্থিত হন, তরুণ চিত্ত নূতন স্বপ্ন নূতন উদ্দীপনায় উচ্ছল হইয়া উঠে।

অ্যালবার্ট হলে এসময়ে প্রসিদ্ধ ধর্মবক্তা শশধর তর্কচূড়ামণি পাতঞ্জলির যোগসূত্র ও যোগসাধনা সম্বন্ধে ভাষণ দিতেছিলেন। কালীপ্রসাদ এই ভাষণ শুনিয়া উৎসাহিত হইয়া উঠেন। স্কুলের জলখাবারের পয়সা জমাইয়া কিনিয়া ফেলেন একখণ্ড পাতঞ্জল দর্শন। কিন্তু এবয়সে ঐ কঠিন দর্শনতত্ত্ব বুঝিবার ক্ষমতা তাঁহার কই?

ভাবিয়া চিন্তিয়া শশধর তর্কচূড়ামণির সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন, "কহিলেন, আপনি যদি দয়া ক'রে এ বইএর সূত্রগুলি আমায় বুঝিয়ে দেন, তবে আমি কৃতার্থ হই।"

তর্কচূড়ামণি খুশী হইয়া উঠেন, বলেন, "বাবা, এ বয়সে তোমার যোগসূত্র পাঠ করার ইচ্ছে হয়েছে, এতে আমি খুব আনন্দ বোধ করছি। আমার সময় থাকলে অবশ্যই তোমায় আমি সাহায্য করতাম। কিন্তু বক্তৃতার কাজ নিয়ে সদাই আমি ব্যস্ত, তার ওপর এত লোকজনের সঙ্গে দেখাশুনা করতে হচ্ছে। আমার হাতে যে সময় নেই।"

কালীপ্রসাদ ক্ষুণ্ণ মনে ফিরিয়া আসিতেছেন, এমন সময়ে শশধর তর্কচূড়ামণি কহিলেন, "বাবা, তুমি এক কাজ করো। কালীবর বেদান্তবাগীশের কাছে যাও। আমার নাম ক'রে তাঁকে বল, তিনি নিশ্চয় রাজী হবেন।"

কালীবরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলে তিনি কহিলেন, "তোমার মতো ছোট ছেলেদের এ ইচ্ছে হয়েছে, এতো খুব ভালো কথা। কিন্তু আমি যে এসময়ে পাতঞ্জল দর্শনের বাংলা অনুবাদ করছি। সময়ের বড় অভাব। তা হোক, বাবা, তুমি এক কাজ করো, স্নানের আগে রোজ একটি সেবক বেশ কিছুকাল আমায় তেল মাখায়। রোজ সে সময়ে তুমি এসো, কিছু কিছু সূত্র আমি তোমায় বুঝিয়ে দেবো।"

কালীপ্রসাদ তাহাতেই রাজী। কিছুদিন বেদান্তবাগীশের বাড়িতে যাতায়াত করিতে লাগিলেন।

ইতিমধ্যে 'শিবসংহিতা' তিনি পাঠ করিয়াছেন। হঠযোগ, প্রাণায়াম ও রাজযোগের পদ্ধতি এ গ্রন্থে বর্ণিত রয়েছে। কালী-প্রসাদ এসব আয়ত্ত করার জন্য মহাব্যগ্র। কিন্তু শুধু বই পড়িয়া তো কোনো কাজ হইবে না, এই ধরনের সব বইএতেই লেখা রহিয়াছে—সিদ্ধগুরুর সাহায্য ছাড়া যোগসাধন সম্ভব নয়।

যোগীগুরু কোথায় পাওয়া যায়? কালীপ্রসাদের অন্তরে

কেবলি উঁকিঝুঁকি মারিতে থাকে এই প্রশ্নটি। অনেকের কাছে এ সম্বন্ধে খোঁজখবরও নিতে থাকেন।

তাঁহার ব্যগ্রতা দেখিয়া সহপাঠী এক বন্ধু কহিলেন, "ভাই, আমি কিন্তু এক সিদ্ধপুরুষের কথা জানি। খুব বড় যোগী, দক্ষিণেশ্বরে রানী রাসমণির কালীবাড়িতে থাকেন। তাঁর কোনো ভণ্ডামী নেই। শুনেছি, শহরের গণ্যমান্য লোকেরা তাঁর কাছে যাতায়াত করেন। গেলে হয়তো তোমার মনের ইচ্ছা পূর্ণ হতে পারে।"

অতঃপর একদিন কালীপ্রসাদ পায়ে হাঁটিয়া দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে গিয়া উপস্থিত। ঠাকুর রামকৃষ্ণ তখন সেখানে নাই, কলিকাতায় এক ভক্তের গৃহে গিয়াছেন।

ঠাকুরের আর এক তরুণ ভক্ত শশী সেখানে উপস্থিত। পূর্বে সে আরো দুই-চারবার ঠাকুরের কাছে আসিয়াছে। কালীপ্রসাদকে সে উৎসাহিত করিয়া বলিল, "এসো, এবেলা এখানে মায়ের প্রসাদ খেয়ে আমরা অপেক্ষা করি। পরমহংসদেব রাত্তিরে ফিরবেন। তখন তুমি তাঁকে দর্শন ক'রো, তোমার মনের কথা খুলে ব'লো।

রাত্রে বাড়িতে ফেরা হইবে না, ফলে মা এবং বাবা দুশ্চিন্তায় থাকিবেন। কালীপ্রসাদ ভাবিত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু শশী তাঁহাকে সাহস দিল, "আমার তো এরকম মাঝে মাঝেই হয়, দক্ষিণেশ্বরে এসে আর কলকাতায় ফেরা হয় না। বাড়িতে সবাই ভেবে অস্থির হন। তা কি আর করা যাবে, বল। সাধু দর্শনে এসে, শেষদর্শন না ক'রে তো ফেরা ঠিক নয়।"

কালীপ্রসাদ অপেক্ষা করিল। গভীর রাত্রে পরমহংসদেব ফিরিয়া আসিলেন। গাড়ি হইতে নামিয়াই প্রবেশ করিলেন নিজের কক্ষে।

কিছুক্ষণের মধ্যে ঠাকুর কালীপ্রসাদকে কাছে ডাকাইয়া নিলেন। ভক্তিভরে প্রণাম সারিয়া নিয়া কালীপ্রসাদ সম্মুখস্থ একটি মাদুরের উপর বসিলেন নির্নিমেষে চাহিয়া রহিলেন গৌরকান্তি, সৌম্যদর্শন এই মহাপুরুষের দিকে।

স্নিগ্ধস্বরে ঠাকুর রামকৃষ্ণ প্রশ্ন করিলেন, "তুমি কতদূর পড়েছো ?"

কালীপ্রসাদ উত্তর দিলেন, "আজ্ঞে, এণ্ট্রান্স ক্লাসে পড়ছি।"

"সংস্কৃত জানো ? কোন্ কোন্ শাস্ত্র পড়েছো।"

"রঘুবংশ, কুমারসম্ভব এসব কাব্য, আর গীতা, পাতঞ্জল দর্শন, শিবসংহিতা পড়া হয়েছে।"

"বেশ, বেশ।" বলিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ কালীপ্রসাদকে আশীর্বাদ জানাইলেন। তারপর উত্তরের বারান্দায় ডাকিয়া নিয়া গিয়া নিভৃতে সম্পন্ন করিলেন একটি বিশেষ ধরনের অলৌকিক ক্রিয়া। উত্তরকালে স্বামী অভেদানন্দ এ ঘটনাটির প্রামাণ্য বিবরণ নিজের আত্মজীবনীতে লিখিয়া গিয়াছেন :

—আমি যোগাসনে উপবিষ্ট হইলে পরমহংসদেব আমায় জিহ্বা বাহির করিতে বলিলেন। আমি জিহ্বা বাহির করিলে তিনি তাঁহার দক্ষিণহস্তের মধ্যমাঙ্গুলির দ্বারা জিহ্বায় একটি মূলমন্ত্র লিখিয়া শক্তি সঞ্চার করিলেন এবং তাঁহার দক্ষিণহস্ত দ্বারা বক্ষঃস্থলের ঊর্ধ্বদিকে শক্তি আকর্ষণ করিয়া মা কালীর ধ্যান করিতে বলিলেন। আমি তাহাই করিলাম। গভীর ধ্যানে মগ্ন হইয়া সমাধিস্থ হইয়া কাষ্ঠবৎ অবস্থান করিতে লাগিলাম এবং এক অপূর্ব আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলাম। তখন জগতের সমস্ত বিষয় ভুল হইয়া গেল। এইভাবে কতক্ষণ ছিলাম জানি না।

—কিছুক্ষণ পরে পরমহংসদেব আমার বক্ষঃস্থলে হস্ত দিয়া কুণ্ডলিনীশক্তি নিম্নদিকে নামাইয়া আনিলেন। তখন আমার বাহ্য-চৈতন্য ফিরিয়া আসিল এবং অপূর্ব নির্মল এক আনন্দস্রোতে সমগ্র শরীর পূর্ণ হইয়া গেল।

—আমার সেই অবস্থা দেখিয়া পরে রামলালদাদা ও গোপালমা বলিয়াছিলেন : "কি আশ্চর্য! তোমাকে স্পর্শ করামাত্র তুমি কাষ্ঠবৎ ধ্যানমগ্ন হয়ে গিয়েছিলে।" যাহা হউক, আমি গভীর ধ্যানে কি অনুভব করিয়াছিলাম পরমহংসদেব সস্নেহে আমায় জিজ্ঞাসা করিলে

আমি সমস্তই তাঁহাকে বলিলাম। তিনি শুনিয়া আনন্দে হাসিতে লাগিলেন।

তাহার পর জিজ্ঞাসা করিলেন: "তোমার কি বিবাহ করবার ইচ্ছা আছে?" আমি বলিলাম: "না।" তখন পরমহংসদেব বলিলেন: "তুমি বিবাহ ক'রো না।" তাহার পর কিরূপে ধ্যান করিতে হয় তাহা তিনি শিক্ষা দিয়া বলিলেন:

শুচি অশুচিরে লয়ে দিব্য ঘরে কবে শুবি।
তুই সতীনে পিরীত হ'লে তবে শ্যামা মাকে পাবি॥"

উত্তরকালে অভেদানন্দ বলিতেন, "ঠাকুরের এই পদ দু'টির হেঁয়ালীর অর্থ সেদিন বুঝতে পারি নি, পরে বুঝেছিলাম। শুচি ও অশুচি, ভালো ও মন্দ এই দুইয়ের পার্থক্য জ্ঞান বজায় থাকিলে অভেদ জ্ঞান স্ফুরিত হয় না, মায়াতীত হইয়া সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের পূর্ণ উপলব্ধিও সম্ভব হয় না।"

এভাবে শক্তি সঞ্চারিত করার পর শ্রীরামকৃষ্ণ কহিলেন, "রোজ রাতে নিজের বিছানায় বসে ধ্যান করবে, ধ্যানে দর্শনাদি হবে। সে সব এখানে এসে আমায় বলে যেয়ো। এবার যাও কালীমন্দিরে গিয়ে ধ্যানে বসো।"

ধ্যান শেষে ফিরিয়া আসিলে ঠাকুর সস্নেহে কালীপ্রসাদকে কিছু মিষ্টান্ন প্রসাদ খাইতে দিলেন।

এবার তাঁহার কলিকাতায় ফেরার পালা। ঠাকুর মৃদুমধুর স্বরে কহিলেন, "আবার এখানে এসো।" এই সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে আসবার পথঘাট, শেয়ারে কি করিয়া আসা যায়, এসব সুন্দর রূপে বুঝাইয়া দিলেন।

কালীপ্রসাদ সরল তরুণ, প্রশ্ন করিলেন, "যদি ভাড়া যোগাড় না করতে পারি তবে কি হবে?"

ঠাকুর আশ্বাস দিয়া বলেন, "যাহোক ক'রে এসে পড়বে, তারপর এখান থেকে তোমার যাতায়াতের ভাড়াটা যোগাড় ক'রে দেওয়া যাবে।"

একটি ধনী ভক্ত এ সময়ে নিজের গাড়িতে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে আসিয়াছেন ঠাকুরকে দর্শনের জন্য। তিনি ফিরিবার সময় তাঁহারই গাড়িতে কালীপ্রসাদকে ঠাকুর উঠাইয়া দিলেন।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের এই স্নেহস্নিগ্ধ মূর্তি, এই সুধাময় বাক্যের স্মৃতি, বার বার উঁকি দিতে থাকে তরুণ ভক্ত কালীপ্রসাদের মনের দুয়ারে। এই স্মৃতির মধুর রসে সারা অস্তিত্ব তাঁহার রসায়িত হইয়া উঠে।

এদিকে কালীপ্রসাদের জনক-জননী দুশ্চিন্তায় অস্থির হইয়া উঠিয়াছেন। সারাটা দিন রাত কাটিয়া গেল, তবুও ছেলের কোনো খোঁজ নাই। তবে কি সে গঙ্গায় ডুবিয়া মরিয়াছে, অথবা কোনো দুর্ঘটনায় পড়িয়াছে? চারদিকে বহু খোঁজাখুঁজি করিয়াও পুত্রের সন্ধান পাওয়া গেল না।

পরদিন প্রভাতে হঠাৎ নয়নতারা দেবীর মনে পড়িয়া যায়, কয়েকদিন আগে কালীপ্রসাদ তো তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়াছিল দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ি কোথায়, কলিকাতা হইতে কতটা দূরে? ধর্মের দিকে যে পুত্রের প্রবল ঝোঁক, একথা জননীর অজানা নাই, ভাবিলেন হয়তো কাহারো সঙ্গে সে দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরেই গিয়াছে, কোনো কারণে ফিরিয়া আসিতে পারে নাই।

পত্নীর মুখে একথা শুনিয়া রসিক চন্দ্র তখনি দক্ষিণেশ্বরের দিকে ছুটিলেন। মন্দিরে পৌঁছিয়াই খোঁজ করিতে গেলেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে।

ঠাকুর কহিলেন, "সে তো কাল এখানেই ছিল। এখানেই খাওয়া-দাওয়া করেছে, শুয়ে থেকেছে। আজ একজনের সঙ্গে গাড়িতে তাকে কলকাতায় পাঠিয়ে দিয়েছি।"

এ সংবাদে রসিক চন্দ্র শান্ত হইলেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে পুত্রের জন্য দেখা দিল আর এক দুশ্চিন্তা। দক্ষিণেশ্বরের এই পাগলা ঠাকুরের কাছে সে আসা যাওয়া শুরু করিয়াছে, শেষটায় ঘর-সংসার ত্যাগ করিয়া না বসে।

ঠাকুরকে অনুনয়ের সুরে কহিলেন, "কালীপ্রসাদ আমার ছেলে। সে যাতে মন দিয়ে লেখাপড়া করে, ঘর-সংসার করে, আপনি দয়া ক'রে তাকে সেই উপদেশ দেবেন।"

মৌল এবং গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে ঠাকুর ধোঁয়াটে কথাবার্তা বলিতেন না। পরিষ্কারভাবে কহিলেন, "আপনার ছেলের ভেতর যোগীর লক্ষণ রয়েছে, যোগসাধনার জন্য অধীর হয়েও উঠেছে। এ অবস্থায় তাকে বিয়ে দিলে, তার ফল কি ভালো হবে?"

রসিক চন্দ্র উত্তর দিলেন, "আজ্ঞে, পিতামাতার সেবাই তো পরমধর্ম। তাই নয় কি?"

"তা বটে, তা বটে," বলিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ বার বার আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

উত্তরকালে অভেদানন্দ বলিতেন, "ঠাকুর যে আসলে পিতামাতার সেবা বলতে জগৎ-পিতা ও জগৎ-মাতার সেবা বুঝে নিয়েছিলেন এবং সেইজন্যই আনন্দ প্রকাশ করছিলেন, আমার বাবা তা তখন বুঝে উঠতে পারেন নি।"

প্রথম দর্শনের পর হইতেই কালীপ্রসাদের মন রামকৃষ্ণ চরণে বাঁধা পড়িয়া যায়। বাড়িতে বসিয়া দিনরাত তাঁহারই কথা, তাঁহার বিপুল স্নেহ ভালোবাসা ও কৃপার কথা ভাবিতে থাকেন। লেখাপড়ায় আজকাল আর তাঁহার মনোযোগ নাই, বাড়ির কোনো কিছুতেই নাই পূর্বেকার সেই আকর্ষণ।

শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দেশ মতো রুদ্ধদ্বার কক্ষে প্রতি রাত্রে শয্যায় বসিয়া ধ্যান করেন, কত বিচিত্র কত উদ্দীপনাময় অতীন্দ্রিয় দর্শনাদি তাঁহার হইতে থাকে। পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণ যেন কালীপ্রসাদের জীবনের ভিত্তিমূলে এক প্রচণ্ড নাড়া দিয়াছেন। ফলে বিরাট এক পাষাণপিণ্ড হইয়াছে অপসারিত, আর উন্মোচিত হইয়াছে দিব্যরসের অমৃত নির্ঝর।

তাঁহার এ ভাবান্তর পিতা ও মাতার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়াইতে পারে

নাই। উভয়ে তাঁহাকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন, দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুরের কাছে আর তাঁহার যাওয়া চলিবে না। কিন্তু কালীপ্রসাদকে নিরস্ত রাখা আর সম্ভব হয় নাই।

এক একদিন ঠাকুরকে দর্শনের জন্য কালীপ্রসাদ অধীর হইয়া উঠিতেন। যে কোনো উপায়ে উপস্থিত হইতেন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের চরণতলে।

যাতায়াতের ভাড়া ঠাকুরই প্রায় সময়ে সংগ্রহ করিয়া দিতেন। বিদায় কালে স্নেহপূর্ণ স্বরে কহিতেন, "তুই না এলে, তোকে না দেখলে আমার প্রাণ বড় ব্যাকুল হয়ে ওঠে। রোজই তোকে দেখতে ইচ্ছে হয়।"

মন্ত্রমুগ্ধের মতো কালীপ্রসাদ কহিতেন, "আমিও রোজই আপনার দর্শনের জন্য অস্থির হয়ে উঠি। কিন্তু বাবা মা আমায় কেবলই নিষেধ করেন।"

স্মিতহাস্যে ঠাকুর বলিতেন, "কাউকে জানাবি নে, গোপনে চলে আসবি হেথায়। হাতে পয়সা না থাকলে, এখান থেকে নিয়ে নিবি।"

দেবমানব ঠাকুরের প্রেমঘন মূর্তি আর মধুময় কণ্ঠস্বর। কালীপ্রসাদ কখনো ভুলিতে পারেন না। এ কি অদ্ভুত ধরনের ভালোবাসা স্নেহ প্রেম তাঁহার? এ ভালোবাসায় স্বার্থের লেশমাত্র নাই। ভালোবাসার একমাত্র লক্ষ্য কালীপ্রসাদের ধর্মজীবনকে গড়িয়া তোলা, মুক্তির অমৃতলোকে তাঁহাকে পৌঁছাইয়া দেওয়া। মর্তের মানুষের মধ্যে এ বস্তু কখনো খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।

একদিন কালীপ্রসাদের পিতা সারাদিন বাড়ির সদর দরজায় তালা লাগাইয়া রাখিলেন, পুত্র যাহাতে বাহিরে যাইতে না পারে। বিকালে তিনি ভাবিলেন, দিন প্রায় শেষ হইতে চলিল, আজ এমন অসময়ে কালীপ্রসাদ আর দূরের পথ দক্ষিণেশ্বরে যাইবে না। সদর দরজাটি তাই খুলিয়া দেওয়া হইল। সুযোগ পাওয়ামাত্র কালীপ্রসাদও উন্মাদের মতো ছুটিয়া বাহির হইলেন রাজপথে। দক্ষিণেশ্বরে

পৌঁছিয়া লুটাইয়া পড়িলেন ঠাকুরের চরণতলে। হৃদয় তাঁহার দিব্য আনন্দে ভরপুর হইয়া উঠিল।

ঠাকুর রামকৃষ্ণ স্মিতহাস্যে একদৃষ্টে এতক্ষণ নূতন ভক্তের দিকে চাহিয়া আছেন। এবার প্রসন্ন মধুর কণ্ঠে কহিলেন, "ঠিক হচ্ছে। ও'রকমই করবি। ঈশ্বরের জন্য এমনি ব্যাকুলতাই তো চাই। সুযোগ পেলেই এসে উপস্থিত হবি। যা কিছু দর্শন হবে, অনুভূতিতে আসবে, সব এখানে বলে যাবি।"

ধ্যানের সময় কালীপ্রসাদ প্রায়ই বহুতর দিব্যমূর্তি দর্শন করিতেন। একদিন দেখিলেন অনন্ত আকাশ জোড়া বিস্ফারিত রহিয়াছে এক দিব্যচক্ষু। আর একদিন দেখিলেন, তাঁহার আত্মা যেন দেহপিঞ্জর হইতে বাহির হইয়া মুক্ত বিহঙ্গের মতো মহাশূন্যে বিচরণ করিতেছে। নভোলোকে উর্ধ্বে উঠিতে উঠিতে একসময়ে ইহা এক পরম রম্য স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। অসংখ্য দেব-দেবী, অবতার ও সিদ্ধপুরুষ সেখানে বিরাজিত। এই দর্শনের কথা ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে জানাইলে তিনি কহিলেন, "তোর বৈকুণ্ঠ দর্শন হয়েছে।"

পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন সত্যকার ব্রহ্মরসিক। দিনের পর দিন নানা রস নানা ভাববৈচিত্র্য তাঁহার জীবনলীলায় প্রকট হইয়া উঠিত, আর তরুণ কালীপ্রসাদ আকণ্ঠ ভরিয়া পান করিতেন এই লীলার সুধারস। জীবন কথায় তিনি লিখিয়াছেন, "কখনও তিনি ভাবাবেশে হাসিতেন, কখনও কাঁদিতেন ও নাচিতেন এবং কখনও বা সমাধিস্থ হইয়া থাকিতেন। আবার কখনও বা মধুরকণ্ঠে রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত প্রভৃতি সাধকগণের রচিত গান করিতে করিতে বিহ্বল হইয়া থাকিতেন। কখনও কখনও তিনি রাধাকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা কীর্তন করিতেন। কখনও বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব মহাজন রচিত পদাবলী গান করিতেন এবং আপন ভাবে মাতোয়ারা হইয়া গানে নূতন নূতন আখর দিতেন। কখনও বা পরম

বৈষ্ণব তুলসীদাস যেইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন সেইরূপে রামসীতার লীলা বর্ণনা করিতে করিতে ভাবাবেশে পরমানন্দসাগরে মগ্ন হইয়া যাইতেন। সর্বধর্মসমন্বয়ের ভাব পরমহংদেবের জীবনে প্রত্যহ প্রতিফলিত হইত এবং সকলকে তিনি 'যত মত তত পথ' এই উদার সার্বভৌমিক ভাবের উপদেশ দিতেন। আমি সেই সকল উপদেশ হৃদয়ঙ্গম করিয়া অপূর্ব আনন্দে মগ্ন থাকিতাম।"

দিনের পর দিন ঠাকুরের কত করুণালীলাই না উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে কালীপ্রসাদের নয়ন সমক্ষে। সে-দিন রাম দত্ত মহাশয়ের বাড়িতে শ্রীরামকৃষ্ণ পদার্পণ করিয়াছেন। অভ্যর্থনা করিয়া বৈঠকখানা ঘরে সসম্ভ্রমে তাঁহাকে বসানো হইল। ঠাকুর চারিদিকে একবার দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, "কই, নরেন কই, তাকে তো দেখছি না।"

রাম দত্ত কহিলেন, "নরেন খুব অসুস্থ তাই আসতে পারে নি। মাথায় খুব যন্ত্রণা, চোখ খুলতে পারছে না।"

ঠাকুর অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। তাঁহার নির্দেশে তখনি কালীপ্রসাদ প্রভৃতি নরেনের বাড়ি গিয়া হাজির। কহিলেন, "ঠাকুর তোমার প্রতীক্ষায় রয়েছেন, তাড়াতাড়ি সেখানে চল।"

নরেন একটি ভিজে গামছা মাথায় দিয়া নিচের ঘরে শুইয়া আছেন। কহিলেন, "দ্যাখ আমার অবস্থা। কি ক'রে যাই? আলোয় চোখ মেললেই মাথায় দারুণ যন্ত্রণা হয়।"

কালীপ্রসাদ প্রভৃতির চাপে পড়িয়া নরেনকে অগত্যা যাইতে হইল। মাথায় একটি ভেজা গামছা চাপা দিয়া বন্ধুদের হাত ধরিয়া কোনোক্রমে উপস্থিত হইলেন রাম দত্তের ভবনে।

নরেন আসিয়াছে, শ্রীরামকৃষ্ণের আনন্দের অবধি নাই। কাছে ডাকিয়া মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিলেন, "কিরে, তোর মাথায় কি হয়েছে?"

কি আশ্চর্য, ঠাকুরের হস্তটি মাথায় রাখিবার সঙ্গে সঙ্গে নরেনের তীব্র যন্ত্রণা দূর হইয়া গেল। স্বাভাবিকভাবে চোখ মেলিতেও তিনি সক্ষম হইলেন।

নরেন সবিস্ময়ে কহিলেন, "মশায়, আপনি কি করলেন, আর আমার মাথার বেদনা হঠাৎ কোথায় চলে গেল।"

ঠাকুর তখন মিটিমিটি হাসিতেছেন। একটু পরে নরেনকে কহিলেন, "এবার গান গেয়ে শোনা দেখি।"

নরেন আনন্দে উচ্ছল হইয়া উঠিয়াছেন, তানপুরায় সুর দিয়া মধুর কণ্ঠে গান ধরিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ ধীরে ধীরে ডুবিয়া গেলেন ধ্যানের গভীরে। নরেন কিন্তু পরমানন্দে একের পর এক গান গাহিয়াই চলিয়াছেন। দেখিয়া কে বলিবে, একটু আগেই তিনি শয্যায় শুইয়া তীব্র যাতনায় ছটফট করিতেছিলেন ?

নরেনের গানে শ্রীরামকৃষ্ণের দেহে মনে জাগিয়া উঠিল দিব্য-ভাবের প্রবল উদ্দীপনা। প্রত্যক্ষদর্শী তরুণ সাধক কালীপ্রসাদ সেদিনকার এই দৃশ্যটির চমৎকার বর্ণনা দিয়াছেন, "পদকীর্তন শুনিয়া পরমহংসদেব ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়িলেন। সমবেত ভক্তগণও ভাবে মুগ্ধ ও বিহ্বল হইয়া রহিলেন। পরমহংসদেবের মুখে অপূর্ব জ্যোতি ও প্রসন্ন হাসি বিরাজ করিতে লাগিল। তাহার পর যখন আবার 'নদে টলমল করে গৌরপ্রেমের হিল্লোলে' বলিয়া কীর্তন আরম্ভ হইল, তখন পরমহংসদেব দাঁড়াইয়া উঠিলেন এবং কোমরে কাপড় জড়াইয়া মত্ত সিংহের ন্যায় নাচিতে আরম্ভ করিলেন। উদ্দাম সেই নৃত্য, অথচ মুখে প্রসন্ন হাসি ও ভাব। ইহা দেখিয়া মনে পড়ে, শ্রীচৈতন্যের নৃত্য দেখিয়া তাঁহার ভক্তগণের কথা। তাঁহারা বলিয়াছিলেন, 'গোরা আমার মাতাহাতী।' সেইদিন আমরা সেই মত্তহস্তীর ন্যায় শ্রীরামকৃষ্ণের উদ্দাম নৃত্য দেখিয়া আনন্দে বিভোর হইয়াছিলাম।"

নরেন্দ্র প্রভৃতি তরুণ ভক্তদের প্রতি ঠাকুরের অহেতুক স্নেহ ও প্রেম, ইষ্টগোষ্ঠী ও কীর্তনানন্দ দিনের পর দিন কালীপ্রসাদ প্রত্যক্ষ করেন, আর অভিভূত হইয়া যান।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ যেমনি প্রতিভাধর নট ও নাট্যকার, তেমনি ছিলেন উদ্দাম প্রকৃতির। কালীপ্রসাদ শুনিয়াছেন, ইতিপূর্বে গিরিশ ঠাকুরকে তেমন পাত্তা দেন নাই, মদের ঘোরে কয়েকবার তাঁহাকে অশ্রাব্য ভাষায় গালাগালও দিয়াছেন। বীতরাগভয়ক্রোধ ঠাকুর রামকৃষ্ণ তাহাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হয় নাই। অন্তরঙ্গ ভক্তদের বরং বলিয়াছেন, "মদ খেয়ে অমন আবোল-তাবোল বলছে। খাক্ না শালা ক'দিন খাবে।"

ঠাকুরের অগাধ স্নেহ-প্রেমের আকর্ষণ অতঃপর গিরিশকে নরম করিয়া আনে পরিণত করে একনিষ্ঠ ভক্তরূপে।

সেদিন দুপুরবেলায় কালীপ্রসাদ দক্ষিণেশ্বরে গিয়াছেন; দেখিলেন, একটু পরেই গাড়ি করিয়া গিরিশ ঘোষ সেখানে আসিয়া উপস্থিত। কাতর কণ্ঠে কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন, "ঠাকুর আমায় কৃপা ক'রে উদ্ধার করুন।"

শ্রীরামকৃষ্ণ ইতিমধ্যে ভাবাবিষ্ট হইয়া গিয়াছেন, মা-ভবতারিণীর সহিত চলিতেছে তাঁহার অন্তরঙ্গ সংলাপ। মৃদুস্বরে ঠাকুর কহিতেছেন, "বীরভক্ত গিরিশ ওসব পারবে না মা।"

ক্রমে ঠাকুরের বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসে, স্নেহপূর্ণ স্বরে গিরিশকে বলেন, "মা তোমায় বললেন বকলমা দিতে। তাই করো। তুমি আমায় বকলমা দাও, সব ভার সঁপে দাও, আর কিছু তোমায় ভাবতে হবে না।"

সাশ্রুনয়নে ভক্ত গিরিশ তাহাই করিলেন, ঠাকুরের অভয় আশ্রয় গ্রহণ করিয়া পতিত হইলেন তাঁহার চরণতলে।

কালীপ্রসাদ দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যহ করেন এমনি সব বিস্ময়কর ঘটনা, ঠাকুর রামকৃষ্ণের কৃপা ও অধ্যাত্মশক্তির মাহাত্ম্য অনুভব করেন সারা মনপ্রাণ দিয়া।

তরুণ সাধক কালীপ্রসাদ স্বভাবতই খুব ধ্যানপরায়ণ ছিলেন। গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের অহেতুক কৃপা, আর সাধন সম্পর্কিত পুঙ্খানুপুঙ্খ নির্দেশ তাঁহার এই ধ্যানপ্রবণতাকে চালিত করে উচ্চতর সিদ্ধি

ও উপলব্ধির দিকে। এসময়কার একটি স্মরণীয় অভিজ্ঞতার তথ্য তাঁহার আত্মচরিতে আমরা পাই। তিনি লিখিয়াছেন :

"দক্ষিণেশ্বরে পরমহংসদেব তাঁহার ছোট ঘরটিতে বসিয়া আছেন এবং আমি তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া পদসেবা করিতেছি। তিনি আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, 'ব্রহ্মজ্ঞান কি সহজে লাভ করা যায়!' আমি বলিলাম, 'পাতঞ্জলদর্শনে একটি সূত্র আছে : তীব্র সম্বেগনামাসন্নঃ—অর্থাৎ যাহাদের অন্তরে তীব্র সংবেগ (শ্রদ্ধা, বীর্যাদি) থাকে তাহাদের শীঘ্র সমাধি হয়। তিনি আমাকে সহাস্যে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, 'তোর ব্রহ্মজ্ঞান হবে।' তাহার পর তিনি আমার কপালে নখদ্বারা জোরে চিমটি কাটিয়া বলিলেন, 'এ স্থানে মন স্থির করবি। ন্যাংটা (তোতাপুরী) আমার কপালে একটা কাঁচখণ্ড বিদ্ধ করে সেই বিন্দুতে মন স্থির করতে বলেছিল। আমি সে রকম করলে আমার নির্বিকল্প সমাধি হয়েছিল। সে অবস্থায় বাহ্যজ্ঞান থাকে না। আমিও তিনদিন আর তিনরাত্রি সমাধিস্থ হয়ে ছিলাম। আমার অবস্থা দেখে ন্যাংটা বলেছিল, 'ক্যা দেবী মায়া হ্যায়! চাল্লিশ বরষ সাধন করকে হামকো জো নির্বিকল্প সমাধি মিলা হ্যায়, তুম তিন রোজমে সিদ্ধ কর্ লিয়া ?—অর্থাৎ, কি দৈবী মায়া! আমি চল্লিশ বছর কঠোর সাধন ক'রেও যে সমাধি লাভ করতে পারি নি, রামকৃষ্ণ তা তিন দিনে লাভ করল!

"তাহার পর পরমহংসদেব আমাকে পঞ্চবটীর নিচে বসিয়া ধ্যান করিতে আদেশ দিলেন। তখন হরিশ নামক অপর একজন সেবক আসিল। আমি পরমহংসদেবের সেবার ভার তাকে দিলাম এবং পরমহংসদেবকে প্রণাম করিয়া পঞ্চবটীর তলায় ধ্যান করিতে অগ্রসর হইলাম। সেইখানে আমি ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে মনস্থির করিয়া ধ্যান করিতে করিতে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া কতক্ষণ সমাধিস্থ ছিলাম জানি না। তবে ধীরে ধীরে বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিলে আমি উঠিয়া আসিয়া পরমহংসদেবের চরণে প্রণাম করিলাম। তিনি সস্নেহে আমার মাথায় হস্ত রাখিয়া আশীর্বাদ করিলেন।"

সাধনার গোড়ার দিকে, বিশেষত সাধকদের তরুণ বয়সে, তত্ত্ব ও দর্শনের কত জটিল প্রশ্নই না মনে আসিয়া ভিড় করে। কালীপ্রসাদ স্বভাবতই মননশীল, তাই অনেক প্রশ্নই তাঁহার মনে তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিত। সব প্রশ্নেরই জবাব মিলিত শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে, নিতান্ত আপনার জনরূপে, পিতা ও সখারূপে সতত তিনি তাহাকে এই বিষয়ে সাহায্য করিতেন, জাগাইয়া তুলিতেন ঈশ্বর সম্বন্ধে নূতনতর উদ্দীপনা।

বেদান্তের তত্ত্ব, ব্রহ্ম ও মায়ার তত্ত্ব ঠাকুর তাঁহার নবীন ভক্ত-শিষ্যদের বুঝাইয়া দিতেন প্রাঞ্জল ভাষায়, অতি সহজভাবে কহিতেন, "ব্রহ্ম নির্গুণ এবং সগুণ। নির্গুণ ব্রহ্ম কেমন জানিস্? যেমন সাপ স্থির হয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুমুচ্ছে, আবার সেই সাপ যখন এঁকেবেঁকে চলছে, তখন সগুণব্রহ্ম। নির্গুণব্রহ্ম অখণ্ড স্থির সমুদ্র। তাতে তরঙ্গ অথবা ক্রিয়া নেই, অচল অটল ও সুমেরুবৎ। মায়াশক্তি ব্রহ্মে যেন সুপ্তাবস্থায় লীন হয়ে থাকে। সেই অবস্থায় বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জীবজগৎও মহাপ্রলয়ে লীন হয়ে থাকে। মায়াশক্তি জাগ্রত হয়ে উঠ্‌ল সেই সচ্চিদানন্দ সমুদ্রে তরঙ্গ হতে থাকে। সেই অবস্থাকে বেদান্তশাস্ত্রে সগুণব্রহ্ম বলা হয়েছে। তখন ত্রিগুণাত্মিকা মায়া বা প্রকৃতিতে গুণক্ষোভ হয় এবং সৃষ্টিকার্য আরম্ভ হয়। এই সগুণব্রহ্মই 'অর্ধনারীশ্বর' 'হরগৌরী' নামে শাস্ত্রে অভিহিত।"

কালীপ্রসাদ প্রভৃতি যুবক ভক্তদের উৎসাহিত করিতে গিয়া ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আরো বলিতেন, "অদ্বৈতজ্ঞান আঁচলে বেঁধে যা ইচ্ছা তাই কর।" অর্থাৎ, সাধকের পক্ষে দরকার আগে অদ্বৈতজ্ঞান লাভ করিতে হইবে। ইহার ফলে সংসারজীবনের কাজকর্মে থাকিয়াও মানুষ অবিদ্যা ও অজ্ঞানের হাত হইতে নিষ্কৃতি পায়, মুক্তি লাভ করিতে সমর্থ হয়।

কালীপ্রসাদ একদিন প্রশ্ন করিলেন ঠাকুরকে, "জীব আর ব্রহ্মে পার্থক্য কি?"

উত্তর হইল,—"নদীর স্রোতে জলের উপরে একটা লাঠি

এড়োভাবে ধরলে মনে হয় জল দু'ভাগ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু নিচের জল সেই একই জল রয়েছে। ঠিক সেই রকম, অহং লাঠিটা তুলে ধরার ফলে জীব ও ব্রহ্মকে পৃথক মনে হয়। কিন্তু আসলে কোনোই ভেদ নেই। ব্রহ্মজ্ঞান হলে, সব ভেদ দূর হয়ে যায়।"

আরও বলিতেন, "যিনি নিরাকার, তিনিই সাকার। ঈশ্বরের সাকার রূপও জানতে হবে। সাধক যে রূপ চিন্তা বা ধ্যান করে, সেই রূপই দর্শন করে। পরে অখণ্ড সচ্চিদানন্দে মিলিয়ে যায়। তখন সাকার নিরাকার হয়ে যায়।"

সর্বধর্ম সমন্বয়ের বীজটিও এই সময়ে ঠাকুর রোপণ করিয়া দেন। কালীপ্রসাদ এবং অন্যান্য তরুণ ভক্তদের সাধনজীবনে। বলেন, "যিনি সর্ব ধর্মমতের সমন্বয় করতে পারেন, তিনিই খাঁটি লোক। অন্য সবাই একঘেয়ে। বেদে যাঁকে 'ওঁ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম' বলেছে, তন্ত্রে তাকেই বলেছে, 'ওঁ সচ্চিদানন্দ শিব', আর পুরাণে বলেছে, 'ওঁ সচ্চিদানন্দ কৃষ্ণ'। যত মত, তত পথ। তাঁকে পাবার জন্য নানা মত ও নানা পথ, কিন্তু লক্ষ্য একটাই।"

বেদ বেদান্তের তত্ত্ব ও সিদ্ধ সাধকদের উপলব্ধ সত্য ঠাকুর অতি সহজ সরলভাবে ভক্তদের বুঝাইয়া দিতেন এবং এ তত্ত্বগুলি তাঁহাদের হৃদয়ে চিরদিনের জন্য অঙ্কিত হইয়া থাকিত।

অভেদানন্দ বলিয়াছেন, "শ্রীশ্রীঠাকুর মাঝে মাঝে জীবকোটি ও ঈশ্বরকোটির প্রসঙ্গ তুলিয়া আলোচনা করিতেন। কিন্তু তখন আমি বা আমরা কেহই তাহার যথার্থ অর্থ বুঝিতে পারিতাম না। আমরা বুঝিতাম, সচ্চিদানন্দব্রহ্ম সকলের মধ্যেই বিরাজমান, সুতরাং কেহ ছোট বা বড় এইরূপে চিন্তার কোনো অর্থ নাই। একদিন শ্রীশ্রীঠাকুরের পদসেবা করিতেছি। নিকটে কেহই ছিল না। আমি তাঁহাকে একাকী পাইয়া সেই জীবকোটি ও ঈশ্বরকোটির তত্ত্ব সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি প্রসন্ন হইয়া আমার প্রশ্নের উত্তর দিয়া বলিলেন, 'ব্রহ্ম সকলের মধ্যে আছেন সত্য, কিন্তু সবার শক্তির প্রকাশে তারতম্য আছে। এই প্রকাশের তারতম্যেই ঈশ্বরকোটি

ও জীবকোটি হয়। জীবকোটি নিজে মুক্তি পান, অপরকে মুক্তি দিতে বা উদ্ধার করতে তিনি পারেন না। কিন্তু যিনি নিজে উদ্ধার লাভ ক'রে অপরকে উদ্ধার করতে পারেন, তিনিই ঈশ্বরকোটি। জীবকোটি ও ঈশ্বরকোটির মধ্যে এই প্রভেদ। কেউ কেউ আবার ঐ শক্তি নিয়েই জন্মগ্রহণ করেন।'

"আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'জীবকোটি কি তাহলে ঐ শক্তি পায় না? জীবকোটি কি ঈশ্বরকোটির স্তরে কখনো উঠতে পারে না?'

"শ্রীশ্রীঠাকুর বলিলেন, 'হ্যাঁ পারে। জীবকোটি যদি জগন্মাতার নিকট অপরকে উদ্ধার করার জন্য শক্তি প্রার্থনা করে তবে মা তাকে তা দেন।' এই উপলক্ষে তিনি একটি দৃষ্টান্তও দিলেন। তিনি বলিলেন, 'বনের মধ্যে চারদিকে উঁচু দেওয়াল দিয়ে ঘেরা একটা জায়গা ছিল। কিন্তু কোনো লোক হয়তো ভিতরের দিকে লক্ষ্য করে এবং আনন্দে হা হা ক'রে হেসে পড়ে যায়। এ হল জীবকোটি। কিন্তু যার বিশেষ শক্তি আছে, সে দেওয়ালে উঠে ভিতরের জিনিস দেখে ফিরে আসে এবং আর আর সঙ্গীদের খবর দিয়ে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যায়। এ হল ঈশ্বরকোটি'[১]।"

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাস। এ সময়ে হঠাৎ একদিন ধরা পড়িল, শ্রীরামকৃষ্ণের গলদেশে ক্যান্সার হইয়াছে। শিষ্য, ভক্ত ও অনুরাগীদের উদ্বেগের অবধি রহিল না। কিছুদিন পরে চিকিৎসার সুব্যবস্থার জন্য তাঁহাকে শ্যামপুকুরের একটি বাড়িতে স্থানান্তরিত করা হয়। তাছাড়া, সেবা শুশ্রূষার জন্য দেবী সারদামণিকেও সেখানে নিয়া আসা হয়।

কালীপ্রসাদও এসময়ে চিরতরে গৃহত্যাগ করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের পদপ্রান্তে চলিয়া আসেন, প্রাণমন উৎসর্গ করেন তাঁহার সেবা পরিচর্যায়। নরেন প্রায় সময়েই ঠাকুরের শয্যার পার্শ্বে থাকিতেন।

১ আমার জীবনকথা : স্বামী অভেদানন্দ

এজন্য ভক্তেরা রসিকতা করিয়া এই দুই বিশিষ্ট সেবককে বলিতেন, —পার্সোনাল্ আতাসে টু হিজ্ হোলিনেস্ শ্রীরামকৃষ্ণ।

এসময়ে ঠাকুরের দিব্য ভাব এবং ভগবত্তার ভাবটি দিনের পর দিন দেদীপ্যমান্ হইয়া উঠিতে থাকে কালীপ্রসাদ এবং অন্যান্য অন্তরঙ্গ ভক্তদের দৃষ্টিতে।

কোয়েকার সম্প্রদায়ের এক খ্রীষ্টান ভদ্রলোক সেদিন ঠাকুর রামকৃষ্ণকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন। কথাপ্রসঙ্গে ঐ খ্রীষ্টানটি যীশুখ্রীষ্টের লীলা ও মাহাত্ম্য কিছু কিছু বর্ণনা করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের দেহে মনে জাগিয়া উঠিল দিব্যভাবের উদ্দীপনা, বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া ভাবাবেশে রোগশয্যা ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। খ্রীষ্টান ভদ্রলোকটি তখন ঠাকুরকে যেন দর্শন করিতেছেন তাঁহার ইষ্টদেব খ্রীষ্টরূপে। ভক্তিভরে তিনি স্তব শুরু করিয়া দিলেন।

তারপর তিনি কহিলেন, "আপনারা এঁকে চিনতে পারছেন না। ইনি আর আমাদের খ্রীষ্ট অভিন্ন। আজ এঁর যে ভাব দর্শন করলাম, প্রভু যীশু খ্রীষ্টেরও ঠিক এমনিতর ভাব হত। আমি এর আগে খ্রীষ্ট এবং পরমহংসদেব, এ দুজনকেই স্বপ্নে দেখেছি। ইনিই বর্তমান যুগের যীশুখ্রীষ্ট।"

শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত ও সেবকেরা একথা শুনিয়া বিস্ময়ে আনন্দে অভিভূত হইয়া পড়েন।

সেদিন বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী শ্যামপুকুরে শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখিতে আসিয়াছেন। কালীপ্রসাদ ঠাকুরের পাশে অদূরে উপবিষ্ট। এসময়ে উভয়ের মধ্যে যে কথাবার্তা হয় সে সম্পর্কে উত্তরকালে অভেদানন্দ লিখিয়াছেন, "বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী পরমহংসদেবকে বলিলেন, আমি আপনাকে ঢাকায় এই রকম স্থূল শরীরে দেখেছি। আপনি সেখানে গিয়েছিলেন কি?"

"পরমহংসদেব হাসিতে হাসিতে বলিলেন, 'আপনার ভক্তির জোরে আপনি আমায় দেখেছেন।' এই কথা বলিয়া পরমহংসদেব ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়িলেন এবং বিজয়কৃষ্ণের বক্ষে দক্ষিণপদ স্থাপন

করিলেন। তখন বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী তাঁহার পাদপদ্ম বক্ষে ধারণ করিয়া ভাবে, অশ্রুজলে, ভাসিতে লাগিলেন। আমরা সকলে অবাক্ হইয়া সেই অপূর্ব দৃশ্য দেখিতে লাগিলাম। ভাবিলাম তাহা দেবলীলাই বটে।"

সেদিন ছিল কালীপূজার দিন। ভক্তেরা ঠাকুরের পূর্বদিনের নির্দেশমতো পূজার উপচার সংগ্রহ করিয়া তাঁহার কক্ষে সাজাইয়া রাখিয়াছেন। পূজার লগ্ন উপস্থিত হইলে ঠাকুর আসনে আসিয়া বসিলেন, নিজদেহে বিরাজমানা জগন্মাতাকে উদ্দেশ করিয়া নিজেই অর্পণ করিলেন পুষ্পাঞ্জলি। সঙ্গে সঙ্গে হস্তে প্রকাশিত হইল বরাভয় মুদ্রা। উত্তরাস্য হইয়া বসিয়া তিনি সমাধিস্থ হইলেন।

প্রধান ভক্ত গিরিশ ঘোষ পাশেই বসিয়া ছিলেন, ঠাকুরের ভগবত্তা ভাবের উদ্দীপন দর্শনে বলিয়া উঠিলেন, "আমাদের সামনে আজ জীবন্ত মা কালী বিরাজ করছেন। এসো সবাই তাঁরই পূজা করি।"

মাল্য ও পুষ্পচন্দন নিয়া গিরিশ প্রথমে ঠাকুরকে অঞ্জলি দিলেন, উচ্চারণ করিলেন ঘন ঘন জয়-মা, জয়-মা রব।

কালীপ্রসাদ, নিরঞ্জন প্রভৃতি ভক্তসেবকেরা সবাই আনন্দে অধীর। সোৎসাহে দিলেন পুষ্পাঞ্জলি, ভক্তিভরে গ্রহণ করিলেন প্রসাদ। স্তবগানের ঝঙ্কারে সারা কক্ষটি মুখরিত হইয়া উঠিল।

উত্তরকালে ঠাকুরের এই ভগবত্তা ভাবের দৃশ্যটি বর্ণনা করিয়া স্বামী অভেদানন্দ বলিতেন, "সে অপূর্ব দৃশ্য এ জীবনে কোনোদিন আমরা ভুলতে পারবো না।"

চিকিৎসায় শ্রীরামকৃষ্ণের তেমন কিছু উপকার হইতেছে না দেখিয়া ডাক্তারেরা স্থান পরিবর্তনের পরামর্শ দিলেন। কাশীপুরে আশি টাকা ভাড়ায় একটি পুরাতন বাগানবাড়ি ভাড়া করা হইল।

ভক্ত সুরেশ মিত্রকে ডাকিয়া ঠাকুর কহিলেন, "এরা গরীব, প্রায়ই কেরানী, বেশী টাকা দেবার ক্ষমতা এদের কই? বাড়ি ভাড়াটা তুমি দিও। সুরেশ মিত্র তখনি রাজী হইয়া গেলেন।

এবার বলরাম বাবুকে কহিলেন, "ওগো তুমি আমার খরচটা দিও। চাঁদার খাওয়া আমি পছন্দ করিনে।" বলরাম সোৎসাহে এ নির্দেশ শিরোধার্য করিলেন।

ঠাকুরের দর্শনের জন্য, সেবা শুশ্রূষার তত্ত্বাবধানের জন্য, গৃহী ভক্তদের অনেকে এখানে আসা শুরু করিলেন। আর ত্যাগী তরুণ ভক্তেরা রহিলেন ঠাকুরের সেবা ও চিকিৎসার সকল কিছু দায়িত্ব নিয়া। একদিন কালীপ্রসাদ ও অন্যান্য সেবক ভক্তদের ঠাকুর কহিলেন, "ছাখ্, আমার এই গলার ঘা একটা উপলক্ষ মাত্র। এই সূত্রে তোরা সবাই একত্র হয়েছিস।"

এভাবে ঠাকুর তাঁহার নিজের অসুখটি উপলক্ষ করিয়া ঠাকুর উত্তরকালের রামকৃষ্ণমণ্ডলীর বীজটি রোপণ করিলেন। শুধু তাহাই নয়, যাহাতে এ বীজ অঙ্কুরির্ত ও পুষ্পিত হইয়া উঠে, সযতনে তাহার পরিবেশও রচনা করিয়া গেলেন।

নরেন্দ্রনাথ যুবক-ভক্তদের অগ্রণী, তাঁহার নেতৃত্বে সবাই পালা করিয়া গ্রহণ করিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের সেবাকার্যের ভার।

সবার অলক্ষ্যে, সেদিন সামান্য একটু মন্তব্য আর ইচ্ছা শক্তির প্রয়োগে, নরেন্দ্রনাথের জীবনকে ঠাকুর প্রবাহিত করিলেন বিধি-নির্দিষ্ট খাতে।

নরেন্দ্র রাত জাগিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের সেবা করেন। চিকিৎসার তত্ত্বাবধান করেন, আবার এই সঙ্গে অবসর সময়ে তৈরী হইতেছেন নিজের আইন পরীক্ষার জন্য।

কথা প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ সেদিন তাঁহাকে কহিলেন, "ছাখ্, তুই যদি উকিল হোস্, তবে তো তোর হাতের জল আর আমি খেতে পারবো না।" কালীপ্রসাদও সেদিন সেখানে উপস্থিত। দেখিলেন, নরেন্দ্র স্তব্ধ হইয়া কি যেন চিন্তা করিতেছেন, তারপর তখনি নিচের ঘরে গিয়া আইনের বইগুলি একধারে সরাইয়া রাখিলেন। কহিলেন, "আইন পরীক্ষটা দেওয়া আর হল না।"

যে কাজ করিলে প্রাণপ্রিয় ঠাকুর তাঁহার হাতের জলটুকু পর্যন্ত খাইবেন না, সে কাজ তিনি কি করিয়া করিবেন ?

নরেন্দ্র, কালীপ্রসাদ, শরৎ, নিরঞ্জন প্রভৃতি একসঙ্গে সেদিন বেড়াইতেছেন বাগানে। নরেন্দ্র কহিলেন, "ঠাকুর যে কঠিন ব্যাধি নিজ শরীরে নিয়েছেন, মনে হয় তিনি দেহরক্ষার সংকল্পই করেছেন। এসো, এখন আমরা প্রাণ ঢেলে তাঁর সেবাশুশ্রূষা করি, সঙ্গে সঙ্গে চালিয়ে চাই জপ ধ্যান ও সাধনভজন।"

অভেদানন্দ উত্তরকালে এ সময়কার জীবনের এবং বিশেষ করিয়া নরেন্দ্রনাথ ও তাঁহার নিবিড় অন্তরঙ্গতার বর্ণনা দিয়াছেন :

—রাত্রিতে আমরা আপন আপন পালা বা কর্তব্য শেষ করিয়া পূর্বের ন্যায় আগুন জ্বালাইয়া ধুনির পার্শ্বে বসিয়া ধ্যান, বেদান্ত বিচার, গীতাপাঠ, ও শাস্ত্রালাপ করিতে থাকিতাম। তাহার পর শঙ্করাচার্যের মোহমুদ্গর ও নির্বাণাষ্টকের স্তোত্রগুলি আবৃত্তি ও তাহাদের অর্থের ধ্যান করিতাম। সেই সময় হইতেই সত্য সত্য আমি ও শরৎ (সারদানন্দ) নরেন্দ্রনাথের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার সমস্ত আদেশ পালন করিতাম এবং তাঁহার ছায়ার ন্যায় সঙ্গে সঙ্গে থাকিতাম। নরেন্দ্রনাথ আমার ও শরতের নাম দিয়াছিল 'কেলুয়া' ও 'ভুলুয়া'। তখন কখনও অষ্টাবক্র সংহিতা, যোগবাশিষ্ট পাঠ করা হইত, কখনও বা ভাগবতের 'গোপী-গীতা' আবৃত্তি করা হইত। নরেন্দ্রনাথ সুমধুর কণ্ঠে রামপ্রসাদী গান, ব্রহ্মসংগীত এবং শ্রীশ্রীঠাকুর যে সমস্ত গান গাহিতেন সেই সমস্ত গাহিয়া আমাদের সকলকে মাতাইয়া রাখিত। আবার কখনও বা আমরা 'জয় রাধে' বলিয়া সংকীর্তনে মাতিয়া নৃত্য করিতাম।

—নরেন্দ্রনাথ আমার অপেক্ষা প্রায় চারি বৎসরের বড় ছিল। আমি নরেন্দ্রনাথকে সেই অবধি আপনার জ্যেষ্ঠভ্রাতার ন্যায় ভালো বাসিতাম। নরেন্দ্রনাথও আমায় আপনার সহোদরতুল্য ভালোবাসিত। তাহা ছাড়া আমি যে তাহাকে শুধু ভালোবাসিতাম তাহা নহে, তাহার আজ্ঞানুবর্তী হইয়া সকল কাজই করিতাম।

বলিতে গেলে আমি নরেন্দ্রনাথের ছায়ার মতো সর্বদা সঙ্গে সঙ্গে থাকিতাম। এবং নরেন্দ্রনাথ যাহা করিত আমিও নির্বিবাদে তাহা করিতাম। নরেন্দ্রনাথ যাহা করিতে বলিত, অকুণ্ঠিত হৃদয়ে তৎক্ষণাৎ তাহা করিতাম।

—নরেন্দ্রনাথ ও আমি জ্ঞানমার্গের 'নেতি-নেতি' বিচার করিতাম এবং অদ্বৈত বেদান্ত-মতের একান্ত পক্ষপাতী ছিলাম। নরেন্দ্রনাথ পাশ্চাত্য দর্শন ও ন্যায়, বিজ্ঞান প্রভৃতি শাস্ত্রে অভিজ্ঞ ছিল। ঐ সকল বিষয়ে তাহার সহিত আলোচনা করিতে করিতে আমার জ্ঞানপিপাসা দিন দিন আরও বর্ধিত হইতে লাগিল। তাহা ছাড়া এই সকল বিষয়ে নরেন্দ্রনাথকে আমি এত অধিক অনুকরণ করিতাম যে, যখন নরেন্দ্রনাথ ধ্যান করিতে বসিত তখন আমিও ধ্যান করিতাম। নরেন্দ্রনাথ যেমনটি ভাবে ও সুরে মোহমুদ্গর কৌপীন পঞ্চক বিবেকচূড়ামণি ও অষ্টাবক্র সংহিতা প্রভৃতি আবৃত্তি করিত আমিও তদনুরূপে করিতাম। আমাদের দুইজনের মধ্যে ছিল এক নিবিড় সম্পর্ক এবং সেই সম্পর্ক চিরদিন অটুট ছিল[১]।

নরেন্দ্রনাথ ছিলেন তরুণ ভক্তদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাণবন্ত এবং স্বাভাবিক নেতৃত্বের অধিকারী। ব্রাহ্মদের মতো জাতের বিচার পূর্ব হইতেই তিনি মানিতেন না, এবং সর্বদিক দিয়া ছিলেন অত্যন্ত উদারপন্থী। একদিন কালীপ্রসাদ প্রভৃতিকে কহিলেন, "চলো, তোমাদের কুসংস্কার ভেঙে আসি। পিরুর দোকানের ফাউলকারী রান্না খাইয়ে দিই।"

বন্ধুরা তখনি সায় দিলেন। চমৎকার মুসলমানী রান্না, নরেন্দ্রনাথ উৎসাহের সহিত প্লেটের সবটা উড়াইয়া দিলেন। কালীপ্রসাদ, শরৎ প্রভৃতি নিজেদের কুসংস্কার ভাঙার জন্য, ঘৃণা দূর করার জন্য, নামমাত্র আহার করিলেন।

এদিকে শ্রীরামকৃষ্ণ বার বার তাঁহাদের ডাকাডাকি করিতেছেন।

১ আমার জীবন কথা : স্বামী অভেদানন্দ

কালীপ্রসাদ তাঁহার সেবার জন্য শয্যার পাশে যাওয়া মাত্র প্রশ্ন করিলেন, "তোরা সবাই কোথায় গিয়েছিলি, বলতো।"

"বিডন স্ট্রীটে পীরুর হোটেলে।"

"কে কে গিছলি ?"

"নরেন, শরৎ, নিরঞ্জন আর আমি।"

"সেখানে কি খেলি ?"

"মুর্গির ঝোল।"

"ক্যামন লাগলো তোদের ?"

"আজ্ঞে, আমার আর শরতের তেমন ভালো লাগে নি। তাই একটুখানি মুখে দিয়ে কুসংস্কার ভাঙলাম।"

উচ্চস্বরে হাসিয়া উঠেন শ্রীরামকৃষ্ণ। বলেন, "বেশ করেছিস, ভালো হল, তোদের কুসংস্কার সব দূর হয়ে গেল।"

এতক্ষণে কালীপ্রসাদের দুশ্চিন্তা দূর হইল, ঠাকুর তবে রাগ করেন নাই বরং বেশ কৌতুক বোধ করিতেছেন তাঁহাদের এই অভিযানের কথা শুনিয়া।

নরেন্দ্রনাথের উৎসাহে কাশীপুর বাগানের পুকুরে কয়েকদিন খুব মাছ ধরার কাজ শুরু হইয়া গেল। ঠাকুরের সেবা পরিচর্যার ফাঁকে ফাঁকে তরুণ ভক্তেরা পুকুরের ধারে আসিতেন, ছিপ হস্তে বসিয়া পড়িতেন। এই কাজে কালীপ্রসাদের দক্ষতা ছিল সব চাইতে বেশী, তাঁহার ছিপেই মাছ ধরা পড়িত বেশী সংখ্যায়।

ঠাকুর সেদিন কহিলেন, "কিরে তুই নাকি ছিপ দিয়ে খুব মাছ ধরেছিস্ ?"

বিনীত উত্তর হইল, "আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"ছিপ দিয়ে মাছ ধরা পাপ, ওতে জীব হত্যা হয়।"

কালীপ্রসাদ তর্ক তুলেন, "কেন, গীতার শ্লোকে তো রয়েছে, য এনং বেত্তি হন্তারং, ইত্যাদি। আত্মা হন্তা নয়, হতও হয় না কোনোদিন। তবে মাছ ধরায় পাপ কি ?"

ঠাকুরও যুক্তি দিয়া তাঁহাকে কিছুক্ষণ বুঝাইলেন, তারপর

কহিলেন, "ছাখ্ ঠিক ঠিক জ্ঞান হলে, তখন আর বেতালে পা পড়ে না। যারা তপস্যা ক'রে, গোড়ার দিকে তাদের অনেক কিছু ভালোমন্দ পাপপুণ্য বিচার ক'রে চলতে হয়।

একটু থামিয়া আবার বলিলেন, "আমি তোকে ছেলেদের মধ্যে বুদ্ধিমান বলে জানি। আমি যে কথাগুলো বললাম, তুই তা স্মরণে রেখে ধ্যান কর্, সব বুঝতে পারবি।"

তিন দিনের মধ্যে ধ্যানাবিষ্ট কালীপ্রসাদের উপলব্ধিতে আসিয়া গেল ঠাকুরের বক্তব্যের যথার্থতা। ঠাকুরের নিকট গিয়া বলিলেন, "এবার আমি বুঝতে পেরেছি, মাছ ধরা কেন অন্যায় কাজ। একাজ আর আমি করবো না। আমায় ক্ষমা করুন।"

শ্রীরামকৃষ্ণের মুখে ফুটিয়া উঠে প্রসন্নতার হাসি। ধীরকণ্ঠে বলেন, "মাছ ধরায় বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়। খাবারের লোভ দেখিয়ে বড়শী লুকিয়ে রাখা, আর অতিথি বা বন্ধুকে নিমন্ত্রণ ক'রে এনে খাবারের ভেতর বিষ লুকিয়ে রাখা, একই ধরনের পাপ।"

কথাগুলি তরুণ সাধক কালীপ্রসাদের মর্মে প্রবিষ্ট হইয়া গেল, ঠাকুরের করুণাঘন মূর্তির দিকে সজলনয়নে তিনি চাহিয়া রহিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ আবার কহিলেন, "আত্মা মরে না, অপরকে মারেও না বটে, কিন্তু এই জ্ঞান যার হয়েছে সে তো আত্মস্বরূপ। কাজেই অপর কাউকে হত্যা করার প্রবৃত্তি তার হবে কেন? যতক্ষণ হত্যার প্রবৃত্তি থাকে, ততক্ষণ তো সে আত্মস্বরূপ হতে পারে না, আত্মজ্ঞানও প্রকাশিত হয় না। তাই বলছি যে, ঠিক ঠিক জ্ঞান হলে মানুষের আর বেতালে পা পড়ে না। জানবি—আত্মা দেহ, ইন্দ্রিয়-মন, বুদ্ধির পারে ও সাক্ষীস্বরূপ।"

বিতর্কিত বিষয় সম্পর্কে কালীপ্রসাদের সর্ব সংশয় ইতিমধ্যে দূর হইয়াছে, আনন্দে অভিভূত হইয়া বার বার কেবলই ঠাকুরের কৃপার কথা ভাবিতেছেন।

কালীপ্রসাদ স্বভাবতই তীক্ষ্ণধী, মননশীল ও প্রতিভাধর। নূতন নূতন জ্ঞান বিজ্ঞানের তত্ত্ব শেখার জন্য তাঁহার কৌতূহল ও ঔৎসুক্যের

অবধি নাই। ঠাকুরের সেবা এবং ধ্যান জপের অবকাশে এ সময়ে প্রায়ই তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের জ্ঞানসমৃদ্ধ গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতেন।

একদিন সেবাকর্মের এক ফাঁকে শ্রীরামকৃষ্ণের পাশে বসিয়া জন স্টুয়ার্ট মিলের একখানি বই পড়িতেছেন। ঠাকুর প্রশ্ন করিলেন, "কিরে, কি বই এটা ?"

"আজ্ঞে, ইংরেজী ন্যায়শাস্ত্র।"

"কি শেখায় ওতে ?"

"এতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণের তর্ক, যুক্তি ও বিচার শেখায়।"

"তুই তো দেখছি এখানে ছেলেদের মধ্যে বইপড়া ঢোকালি। তবে কি জানিস্, বই পড়া বিদ্যে আসলে কিছু নয়। আপনাকে মারতে গেলে একটা নরুনই যথেষ্ট। কিন্তু অপরকে মারতে গেলে ঢাল তলোয়ার প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্রের দরকার হয়। অবশ্যি, যারা লোকশিক্ষা দেবে তাদের এসব পড়ার দরকার আছে।"

এ কথার পর শ্রীরামকৃষ্ণ নীরব হইয়া যান, কালীপ্রসাদের বই পড়া নিয়া আর উচ্চবাচ্য করেন নাই। তিনি অন্তর্যামী, তাই বুঝিয়াছিলেন, উত্তরকালে তাঁহার এই নবীন শিষ্য কালীপ্রসাদ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সভ্যতার কেন্দ্রগুলিতে ভারতীয় ধর্ম ও দর্শনের তত্ত্ব প্রচার করিবে। শ্রেষ্ঠ মনীষী ও ধর্মনেতাদের সম্মুখীন হইবে। তাই কালীপ্রসাদের বই পড়া নিষেধ করেন নাই। ভক্ত ও শিষ্যদের মধ্যে সেসময়ে প্রায়ই ধর্মীয় মতবাদ সম্পর্কে তর্কবিতর্ক হইত। কালীপ্রসাদের প্রতিভা যুক্তি, তর্ক ও পরিশীলিত বুদ্ধি সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। ঠাকুরের কানে সব সংবাদই যাইত। একদিন কালীপ্রসাদকে ডাকিয়া বেশ কিছুটা উৎসাহিত ও করিলেন। কহিলেন, "ছেলেদের মধ্যে তুইও বুদ্ধিমান। নরেনের নিচেই তোর বুদ্ধি। নরেন যেমন একটা মত চালাতে পারে, তুইও সেরকম পারবি।"

প্রবীণ ভক্ত বুড়ো-গোপাল একদিন ঠাকুরকে জানাইলেন, "মশায়, কালী কিছুই মানে না। একেবারে নাস্তিক হয়ে গেছে।" শুনিয়া ঠাকুর শুধু একটু মুচকি হাসি হাসিলেন।

একদিন কালীপ্রসাদকে প্রশ্ন করিলেন, "হাঁরে, তুই নাকি নাস্তিক হয়ে গেছিস ?"

কালীপ্রসাদ নিরুত্তর। আবার ঠাকুরের জিজ্ঞাসা, "তুই ঈশ্বর মানিস ?"

সংক্ষিপ্ত একটি উত্তর হইল, "না।"

"অন্য কোনো সাধুর কাছে একথা বললে, সে তোর গালে চড় মারতো।"

"আপনিও মারুন। যতক্ষণ না ঈশ্বর আছেন এবং বেদ সত্য, একথা ঠিক বুঝতে না পারছি, ততক্ষণ আমি অন্ধবিশ্বাসে সে সকল মানবো কি ক'রে ? আপনি আমায় বুঝিয়ে দিন, আমার জ্ঞানচক্ষু খুলে দিন। তখন আমি সব মানবো।"

শ্রীরামকৃষ্ণের মুখে ফুটিয়া উঠে প্রসন্নতার হাসি। সস্নেহে বলেন, "একদিন তুই সব জানবি, আর সব মানবি। এই ছাখ্, নরেন আগে কিছুই মানতো না। কিন্তু এখন 'রাধে রাধে' বলে নাচে আর কীর্তনে নৃত্য করে। এর পর তুইও সব মানবি।"

"আমায় আপনি সব জানিয়ে দিন, তবে তো।"

"সময়ে তুই সব বুঝতে পারবি। একটা কথা মনে রাখিস্—কখনো একঘেয়ে হস্‌নি। আমি একঘেয়ে ভাব ভালোবাসিনে।"

উত্তরকালে আপ্তকাম সাধক স্বামী অভেদানন্দ লিখিয়াছেন, "ইহার কিছুদিন পরে শ্রীশ্রীঠাকুর আমার জ্ঞানচক্ষু খুলিয়া দিলেন। তখন আমি সাধন রহস্যের সকল কথাই জানিতে পারিলাম এবং সকল জিনিস তখন মানিতে লাগিলাম। আর শ্রীশ্রীঠাকুরের অশেষ কৃপার কথা ভাবিলে আজিও আমার দুই চক্ষু জলে ভরিয়া উঠে।"

কাশীপুরে কালীপ্রসাদ সেদিন শ্রীরামকৃষ্ণের পদসেবা করিতেছেন, ঠাকুর বলিলেন, "ওরে, তোর বাবা কাল এসেছিলেন, তোর মা তোর জন্য কেঁদে সারা হচ্ছেন। তাঁর ইচ্ছে, তুই যেন বাড়িতে গিয়ে তাদের সঙ্গে দেখা ক'রে আসিস্। আমি কথা দিয়েছি। তুই তোর মায়ের কাছে একবার যা।"

ঠাকুরের আজ্ঞা শিরোধার্য করিয়া কালীপ্রসাদ আহিরীটোলার বাড়িতে গিয়া উপস্থিত হন। কিন্তু সেখানে প্রায় আধঘণ্টা সময় কাটানোর পরই মন উচাটন হইয়া উঠিল। কাশীপুরে রোগশয্যায় শায়িত শ্রীরামকৃষ্ণের জন্য ছটফট করিতে লাগিলেন, তারপর পিতা মাতার কাছে বিদায় নিয়া তাড়াতাড়ি চলিয়া আসিলেন।

ঠাকুরের সহিত দেখা হইতেই কহিলেন, "কিরে তুই বাড়িতে যাস নি?"

কালীপ্রসাদ উত্তর দিলেন, "আজ্ঞে গিয়েছিলাম।"

"মা বাবা নিশ্চয় থাকতে বলেছিলেন! তবে থাকলিনে কেন?"

"ছিলুম তো।"

"কতক্ষণ ছিলি?"

"আধ ঘণ্টা মাত্র"

"এত তাড়াতাড়ি ফিরে এলি কেন?"

"মা বাবা খুব যত্ন করলেন, থাকবার জন্য ...

কিন্তু আমার বোধ হল, আমি যেন অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে রয়েছি। প্রাণ ছটফট করতে লাগল। একটু মিষ্টি মুখে দিয়েই দৌড়ে পালিয়ে এসেছি। এখানে এসে প্রাণে শান্তি পেলাম।"

শ্রীরামকৃষ্ণ খুশী হইয়া উঠিলেন, স্নেহপূর্ণ স্বরে কহিলেন, "এখানে শান্তি পাবি বৈ কি।"

ঠাকুরের স্নেহ মমতার পিছনে ছিল, আত্মিক শান্তি ও আত্মিক আনন্দের স্পর্শ, এই স্পর্শ কালীপ্রসাদ প্রভৃতি তরুণ সাধকদের রূপান্তরিত করিয়াছিল নূতন মানুষে। তাই সংসার জীবন ও পিতা মাতার স্নেহ মমতা তাহাদের কাছে সে সময়ে তুচ্ছ ও অকিঞ্চিৎকর মনে হইত।

পৌষ সংক্রান্তি প্রায় আসন্ন। গঙ্গাসাগরের মেলায় যাওয়ার জন্য কলিকাতার জগন্নাথ ঘাটে সাধু সন্ন্যাসীরা ভিড় করিতেছে। বুড়ো গোপালের ইচ্ছা, সন্ন্যাসীদের একখানি করিয়া গৈরিক বস্ত্র ও রুদ্রাক্ষ-মালা দান করিবেন। শ্রীরামকৃষ্ণের কানে একথা গেল।

বুড়ো গোপালকে ডাকিয়া কহিলেন, "গঙ্গাসাগর যাত্রী সন্ন্যাসীদের গেরুয়া কাপড় দিলে যে ফল পাবি, তার হাজার গুণ বেশী ফল হবে যদি তুই আমার এই ছেলেদের দিস্। এদের মতো ত্যাগী সাধু আর কোথায় পাবি? এদের এক একজন হাজার সাধুর সমান। হাজারী সাধু। বুঝলি?"

বুড়ো গোপালের মত তখনি পরিবর্তিত হইয়া গেল। ঠাকুরের ত্যাগী ভক্তদেরই তিনি ঐ বস্ত্র ও মালা দান করিলেন।

"নরেন্দ্র, কালীপ্রসাদ প্রভৃতি অনেকেই পরমহংসদেবের আদেশে এক একখানি গৈরিক বস্ত্র ও রুদ্রাক্ষের মালা পরিধান করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিতে গমন করিলেন। তাঁহাদিগকে নবীন সন্ন্যাসীর বেশে দর্শন করিয়া পরমহংসদেব আনন্দ সাগরে ভাসিতে লাগিলেন। তাঁহারা একে একে প্রণাম করিতে লাগিলেন এবং পরমহংসদেব তাঁহাদিগকে 'ইষ্ট লাভ হোক' বলিয়া আশীর্বাদ করিতে লাগিলেন। তিনি একটি ক্ষুদ্র শিশিতে রক্ষিত কারণবারি সকলকে আঘ্রাণ করাইয়া এবং সিঞ্চন করিয়া তাঁহাদিগকে সন্ন্যাস আশ্রমের অধিকারী করিলেন। একখানি বস্ত্র অতিরিক্ত ছিল, তাহা গিরিশচন্দ্র ঘোষের জন্য রাখিয়া দেওয়া হইল[১]।"

দশনামী সম্প্রদায়ের চিরাচরিত সন্ন্যাস অথবা তান্ত্রিক বা বৈষ্ণবীয় সন্ন্যাস দানের প্রথা হইতে ঠাকুর রামকৃষ্ণের আচরিত এই প্রথাটি স্বতন্ত্র রকমের। তবুও নরেন, রাখাল, কালীপ্রসাদ প্রভৃতি এগার জন ত্যাগী ভক্ত এখন হইতে ঠাকুরের প্রদত্ত এই সন্ন্যাসকেই মনে প্রাণে গ্রহণ করিলেন, এবং সাদা কাপড় ত্যাগ করিয়া পরিতে শুরু করিলেন গৈরিক কাপড়।

কাশীপুর বাগানে রোগশয্যায় শায়িত শ্রীরামকৃষ্ণের সেবকের সংখ্যা যেমন দিন দিন বাড়িতেছে, তেমনি অজস্র গৃহস্থ ভক্তও আসিতেছেন তাঁহাকে দর্শনের জন্য। অনেকে এখানেই খাওয়া-দাওয়া করিতেছেন। ফলে ব্যয় যথেষ্ট বাড়িয়া গিয়াছে।

১ স্বামী অভেদানন্দের জীবন কথা: শঙ্করানন্দ

প্রবীণ গৃহস্থ ভক্তদের মধ্যে কেউ কেউ ব্যয় সংকোচের জন্য অতিমাত্রায় উৎসাহী। তাঁহারা প্রস্তাব দেন, ঠাকুরের সেবার জন্য দুইজন ভক্ত বাগানে স্থায়ীভাবে থাকুক। আর সবাই যার যার বাড়ি হইতে এখানে আসা যাওয়া করুক।

একথা শুনিয়া ঠাকুর বিরক্ত হইলেন। নরেন্দ্র, কালীপ্রসাদ প্রভৃতিকে ডাকিয়া কহিলেন, "আমার আর এখানে থাকার ইচ্ছে নেই। এত খরচ চলবে কি ক'রে? ভাবছি, ইন্দ্রনারায়ণ জমিদারকে টানবো নাকি? না, তোরা বড় বাজারের সেই ভক্ত মাড়োয়ারীটাকে ডেকে আন্।"

অতঃপর ঐ মাড়োয়ারী ভক্তটি কিন্তু কিছুদিন পরে প্রচুর অর্থ ভেট নিয়া নিজে হইতেই ঠাকুরের কাছে আসিয়া উপস্থিত হন। তিনি টাকার মোড়কের দিকে কিছুক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া বলেন, "নাঃ, তোমার কাঞ্চন আমি গ্রহণ করবো না।"

ভক্তেরা শ্রীরামকৃষ্ণের সুস্পষ্ট নির্দেশের প্রতীক্ষায় তাঁহার দিকে তাকাইয়া আছেন। তিনি কহিলেন, "তোরা আমায় অন্য কোথাও নিয়ে চল। আমার জন্য তোরা ভিক্ষে করতে পারবি? তোরা যেখানে আমায় নিয়ে যাবি, সেখানেই যাবো। আচ্ছা, তোরা কেমন ভিক্ষে করতে পারিস্, দেখা দেখি। ভিক্ষার অন্ন শুদ্ধ অন্ন। গৃহস্থের অন্ন খাবার ইচ্ছে আমার নেই।"

ভক্তেরা সমস্বরে জানান, "আপনার জন্য নিশ্চয় আমরা ভিক্ষেয় বেরুবো।"

পরদিন প্রভাতে মা-সারদামণির নিকট হইতে ছেলেরা প্রথম মুষ্টি ভিক্ষা গ্রহণ করেন। তারপর ভিক্ষার জন্য বাহির হন পথে-পথে গৃহস্থ বাড়িতে। কেউ দু'মুষ্টি দেয়, কেউবা শ্লেষোক্তি করে, তাড়া করিয়া আসে। কোনো কোনো মহিলা তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলেন, হোৎকা জোয়ান সব মিন্‌সেরা, গতর খেটে খেতে পারে না, ভিক্ষের জন্য দোরে দোরে ঘুরে বেড়ায়। দূর হয়ে যা এখান থেকে।"

ত্যাগ তিতিক্ষার পথে বাহির হইবার পর নবীন ভক্তদের এ এক

কঠোর বাস্তব অভিজ্ঞতা। সংগৃহীত ভিক্ষাদ্রব্য ঠাকুরের চরণতলে রাখিয়া একে একে তাঁহারা প্রণাম নিবেদন করেন।

সারদামণি সেদিন ঐ ভিক্ষান্ন হইতেই ঠাকুরের জন্য প্রস্তুত করেন চালের মণ্ড। খাইতে খাইতে ঠাকুর বলেন, "ভিক্ষান্ন বড় পবিত্র। এতে কারুর কোনো কামনা নেই। আজ ভিক্ষান্ন খেয়ে আমি পরম আনন্দ লাভ করলাম।"

নিজের নরদেহ ত্যাগের পূর্বে, ত্যাগী তরুণ ভক্তদের সন্ন্যাস-বেশ ধারণের পর, ঠাকুর রামকৃষ্ণ ভিক্ষা গ্রহণের কর্তব্যটিও তাঁহাদের শিখাইয়া দিয়া গেলেন।

তরুণ সাধকেরা প্রায়ই বুদ্ধদেবের জীবনী ও আদর্শ সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন। একবার নরেন্দ্র, তারক এবং কালীপ্রসাদ ঠাকুরকে কিছু না জানাইয়া বুদ্ধ গয়ায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। উদ্দেশ্য, বুদ্ধের পুণ্যময় সাধনস্থলীতে বসিয়া কিছুটা তপস্যা করা। এইস্থানে ধ্যানাসনে বসিয়া নরেন্দ্রনাথের জ্যোতি দর্শন হয় এবং তারক ও কালীপ্রসাদের অন্তরে দিব্য আনন্দ ও শান্তির প্রবাহ সঞ্চারিত হয়।

অতঃপর উৎসাহী তরুণ তাপসদের মনে অনুতাপ জন্মে, অসুস্থ ঠাকুরকে ওভাবে ফেলিয়া আসা তাঁহাদের উচিত হয় নাই। আর কালবিলম্ব না করিয়া তাঁহারা কাশীপুরে ফিরিয়া আসিলেন। এ কয়দিন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাদের জন্য উদ্বিগ্ন ছিলেন, তাঁহাদের প্রত্যাবর্তনের পরে তীর্থস্থানের তপস্যা, মাধুকরী প্রভৃতির কাহিনী শুনিয়া তিনি খুশী হইয়া উঠিলেন।

সেদিন বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন। কথা প্রসঙ্গে কহিলেন, কিছুদিন আগে গয়ার ...রর পাহাড়ে এক প্রসিদ্ধ হঠযোগীকে তিনি দর্শন করিয়া ...সিয়াছেন। গোস্বামীজী তাঁহার সুখ্যাতি করিতে লাগিলেন।

কালীপ্রসাদ মনে মনে সংকল্প করিলেন, এই হঠযোগীকে একবার দর্শন করিবেন এবং সম্ভব হইলে তাঁহার নিকট হইতে কিছু কিছু সাধন প্রক্রিয়া শিখিয়া নিবেন।

একদিন কাহাকেও কিছু না জানাইয়া গোপনে রওনা দিলেন, ট্রেনযোগে উপস্থিত হইলেন গয়াধামে। বরাবর পাহাড়ের নিচেই রহিয়াছে একটি ছোট গ্রাম, এই গ্রামের ধর্মশালাতে নিলেন সে রাত্রির মতো আশ্রয়।

একজন দশনামী পুরী সন্ন্যাসী তখন এই ধর্মশালায় অবস্থান করিতেছেন। কালীপ্রসাদ তাঁহার সহিত ভাব জমাইয়া ফেলিলেন। কথা প্রসঙ্গে জানা গেল, সন্ন্যাসীর নিকট সন্ন্যাস-পদ্ধতি এবং বিরজাহোমের তথ্য সমন্বিত একটি ছোট পুঁথি আছে। কালীপ্রসাদ তো এসংবাদে মহা উল্লসিত। তখনি তাড়াতাড়ি সেটি হইতে বিরজাহোমের প্রৈষমন্ত্র, মঠ, মড়ি, যোগপট্ট ইত্যাদি সন্ন্যাস মন্ত্র লিখিয়া লইলেন।

পরের দিন রওনা হইলেন পাহাড়ের চড়াইয়ের পথে, হঠযোগীর গুহার দিকে। গ্রামের লোকেরা আগে হইতেই কালীপ্রসাদকে সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন, হঠযোগীর গুহায় যাওয়া তেমন নিরাপদ নয়। কাহাকেও সেদিকে অগ্রসর হইতে দেখিলে তাঁহার চেলারা বড় বড় পাথর ছুঁড়িতে থাকে, কেহ তাঁহাদের সাধনা বা ক্রিয়াকলাপে বিঘ্ন জন্মায় ইহা তাহাদের অভিপ্রেত নয়।

গুহার নিকট পৌছিলে কালীপ্রসাদের উপরও প্রস্তর-খণ্ড বর্ষিত হইতে থাকে। তিনি তখন এক চাতুরীর আশ্রয় নেন। দূর হইতে হঠযোগী ও তাঁহার চেলাদের প্রণাম জানাইয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠেন, 'ওঁ নমো নারায়ণায়'

এবার সাধুরা শান্ত হয়, প্রস্তর বর্ষণ স্থগিত রাখে। তাহাদের ধারণা হয়, কালীপ্রসাদ একজন সন্ন্যাসী তাহা দ্বারা কোনো অনিষ্ট হওয়ার আশঙ্কা নাই। কিন্তু নিকটে যাওয়া মাত্র কালীপ্রসাদকে মঠাম্নায়, সন্ন্যাস মন্ত্র ইত্যাদি সম্পর্কে বার বার জেরা করিতে থাকে।

কালীপ্রসাদ সন্ত সন্ত এসব তথ্য জানিয়া আসিয়াছেন, তাই তাঁহার উত্তরে হঠযোগীর চেলারা শান্ত হইল।

আলাপ আলোচনার পর কালীপ্রসাদ বুঝিলেন, আসলে এই সাধু্টি হঠযোগী নয়, অঘোরপন্থী। অধ্যাত্ম-সাধন সম্পর্কেও তাঁহার কোনো সুস্পষ্ট ধারণা নাই। স্থির করিলেন, আর কাল-ক্ষেপণ না করিয়া এখান হইতে সরিয়া পড়িবেন।

কিন্তু এই হঠযোগীর খপ্পর হইতে পলায়ন করা বড় সহজ নয়। হঠযোগী ইতিমধ্যে কালীপ্রসাদের প্রতি অত্যন্ত আকৃষ্ট হইয়াছেন। স্থির করিয়াছেন, তাঁহাকে চেলার দলে ভর্তি করিয়া নিবেন। প্রস্তাব জানাইয়া স্পষ্ট ভাষায় তিনি বলিয়াই ফেলিলেন, 'তুমহারা মাফিক চেলা বহুত ভাগ্ সে মিলতা হ্যায়।'

কালীপ্রসাদ পলায়নের সুযোগ খুঁজিতেছিলেন, হঠাৎ এক ফাঁকে হঠযোগীর গুহা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া দিলেন এক দৌড়। হাঁফাইতে হাঁফাইতে নামিয়া আসিলেন বরাবর পাহাড়ে নিচে।

কাশীপুরে ফিরিয়া আসিলে শ্রীরামকৃষ্ণ কহিলেন, "এতদিন কোথায় গিয়েছিলি তুই, বলতো?"

কালীপ্রসাদ ঠাকুরের তাঁহার হঠযোগী সন্দর্শনের সব ঘটনা বিবৃত করিলেন। তারপর কহিলেন, "হঠযোগীকে আমার ভালো লাগল না। আপনার তুলনায় সে কিছুই নয়। তাই তো আপনার চরণতলে আবার ছুটে এলাম।"

ঠাকুর প্রশান্ত স্বরে কহিলেন, "যত বড় সাধু বা সিদ্ধযোগী যে যেখানে আছে, আমি সব জানি। চারখুঁট ঘুরে পায়, কিন্তু এখানে (নিজের বুকে হাত দিয়া) যা দেখছিস্, এমনটি আর কোথাও পাবি নি।" বলিতে বলিতে শায়িত অবস্থায় নিজের চরণটি কালীপ্রসাদের বুকে স্থাপন করিলেন, কালীপ্রসাদ নিমজ্জিত হইলেন অপার আনন্দ সাগরে।

ইতিমধ্যে একদিন কালীপ্রসাদের পিতা শ্রীরামকৃষ্ণের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হন। অনুরোধ জানান, "আপনি কালীপ্রসাদকে

এত ভালোবাসেন, আপনি তাঁর সত্যকার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, তাকে বুঝিয়ে শুনিয়ে বাড়িতে পাঠিয়ে দিন। ঘরের ছেলে ভালোয় ভালোয় ঘরে ফিরে যাক্।

ঠাকুর এবার স্পষ্ট ভাষায় জানাইয়া দিলেন তাঁহাকে, কহিলেন, "তোমার ছেলেকে আমি খেয়ে ফেলেছি। সে এখন আর তোমার নয়। এখান থেকে আর সে ফিরবে না।"

গুরুর কৃপার স্পর্শে, বৈরাগ্যময় সাধনার মধ্য দিয়া কালীপ্রসাদ নূতন মানুষে রূপান্তরিত হইয়াছেন—এ সত্যটি তাঁহার পিতাকে ঠাকুর সেদিন বুঝাইয়া দিলেন দ্ব্যর্থহীন ভাষায়।

আর একদিন সেবারত কালীপ্রসাদকে কহিলেন, "তোদের সঙ্গে আত্মায় আত্মায় সম্বন্ধ—এটা পূর্ব জন্মের জানবি। তোরা যেন বাঁদর, আর আমি বাঁদরওয়ালা। বাঁদর যখন দুষ্টুমি করে, বাঁদরওয়ালা দড়িটা একটু টেনে ধরে, তখন বাঁদর ঠিক হয়ে যায়।"

১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই আগস্ট। কালীপ্রসাদ এবং তাঁহার গুরু-ভাইদের শোকসাগরে ভাসাইয়া ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ নরলীলা সংবরণ করিলেন। ঘর-সংসার ত্যাগ করিয়া তরুণ ভক্তেরা একান্তভাবে ঠাকুরেরই পদপ্রান্তে আশ্রয় নিয়াছিলেন, সে আশ্রয়টি সেদিন অন্তর্হিত হইয়া গেল।

কিছুদিন পরে মা সারদামণি অযোধ্যা, বৃন্দাবন প্রভৃতি স্থানে তীর্থ দর্শন করিতে যান। এ সময়ে কালীপ্রসাদও তাঁহার সঙ্গী হন।

বৃন্দাবনে উপনীত হইবার পর তাঁহার অন্তরে ইচ্ছা জাগে, ব্রজমণ্ডল পরিক্রমায় বহির্গত হইবেন। সুযোগ পাইয়া বৈষ্ণব বাবাজীদের একটি দলের সঙ্গে তিনি জুটিয়া যান, পরমানন্দে শুরু করেন পরিক্রমা।

পথে যেখানে বিশ্রামের ছাউনি পড়ে, কালীপ্রসাদ 'নারায়ণ হরি' বলিয়া ব্রজমায়ীদের দরজায় গিয়া মাধুকরী করেন, দুই এক টুকরা মড়ুয়ার রুটি যাহা মিলে তাহা দিয়াই কোনোমতে করেন জীবন

ধারণ। এ সময়ে তিনি গৈরিক পরিতেন তাই বাবাজীরা তাঁহাকে সোঽহংবাদী সন্ন্যাসী জ্ঞানে যথাসম্ভব পরিহার করিয়াই চলিতেন। ভাবিতেন, কৃষ্ণের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা নাই। শীঘ্রই একদিন তাঁহাদের ভুল ভাঙিয়া গেল। ভাগবতের গোপীগীতা কালীপ্রসাদের মুখস্থ ছিল। একদিন কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর হইয়া আপন মনে উহার শ্লোক তিনি আবৃত্তি করিতেছিলেন, বাবাজীরা মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইলেন। উৎফুল্ল কণ্ঠে কহিলেন, "আপনি যে কৃষ্ণের পরম ভক্ত, এতদিন আমরা তা বুঝতে পারি নি—আপনাকে দূরে সরিয়ে রেখেছিলাম। এখন দেখছি, আপনি আমাদের অতি আপনার জন। আর আপনাকে আমরা মাধুকরী করতে দেবো না। আপনার সেবার ব্যবস্থা আমরাই করবো।"

পরিক্রমার কালে কৃষ্ণলীলাস্থলগুলি দর্শন করিয়া কালীপ্রসাদের প্রাণ মন আনন্দে পূর্ণ হইয়া উঠিল।

বৃন্দাবনে ফিরিয়া শুনিলেন, বরানগরে রামকৃষ্ণ সন্তানেরা একটি ক্ষুদ্র মঠবাড়ি স্থাপন করিয়াছেন। এ অতিশয় সুসংবাদ। মা-সারদামণির সম্মতি নিয়া কালীপ্রসাদ অচিরে বরানগরের মঠে চলিয়া আসিলেন।

মুন্সীবাবুদের একটি ভুতুড়ে পড়ো বাগানবাড়ি ভাড়া নেওয়া হইয়াছে মঠের জন্য। ভাড়া এগার টাকা, ভক্ত সুরেশ মিত্র ভাড়া চালানোর ভার নিয়াছেন। চরম কৃচ্ছ্রের মধ্যে তিনজন ত্যাগী ভক্ত,—তারক—ছুটকো গোপাল ও বুড়ো গোপাল রামকৃষ্ণের স্মৃতি বুকে ধারণ করিয়া এখানে বাস করিতেছেন। কালীপ্রসাদ হইলেন মঠের চতুর্থ স্থায়ী বাসিন্দা।

এই সময় নরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বশক্তি অসম্ভবকেও সম্ভব করিয়া তোলে। শ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শকে কেন্দ্র করিয়া ত্যাগী ভক্তদের একটি মঠ ও মণ্ডলী স্থাপনে তিনি বদ্ধপরিকর হন। নিজেও সিদ্ধান্ত নেন সংসার ত্যাগ করিয়া স্থায়ীভাবে মঠে যোগ দিবার।

নরেন্দ্র এবং কালীপ্রসাদের যুগ্ম প্রচেষ্টায় মঠ স্থাপনার প্রকৃত ভিত্তিভূমি রচিত হয় এই সময়ে। স্বামী শঙ্করানন্দ এ সময়কার অবস্থার এক চিত্র দিয়াছেন, "শ্রীশ্রীঠাকুরের বিছানার সম্মুখে বসিয়াই সকলে ধ্যান জপ করিতেন। ভিক্ষা করিয়া যখন যাহা জুটিত তাহাই পালা ক্রমে রন্ধন করিয়া সকলে আহার করিতেন। আহারের খুবই কষ্ট ছিল। চাল জুটিত তো মুন জুটিত না—এমন অভাব। কোনো দিন বা শুধু ভাত, কোনো দিন বা তেলাকুচা পাতা-সিদ্ধ ও ভাত আহার করিয়া সকলকে থাকিতে হইত। কালীপ্রসাদ আসিবার সঙ্গে সঙ্গেই আবার নূতন উত্তেজনার সৃষ্টি হইল। নরেন্দ্রনাথ, শরৎ, শশী, রাখাল সকলেই বাড়িতে ফিরিয়া গিয়াছিলেন এবং নিজ নিজ পড়াশুনায় মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। কালীপ্রসাদ আসিয়াই নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করিলেন। তাঁহারা দুইজনে মিলিয়া ভাবী কর্মপদ্ধতির কথা আলোচনা করিতে লাগিলেন। ছেলেদিগকে একত্র রাখিতে হইবে—শ্রীশ্রীঠাকুরের এই আদেশ পালন করিতে না পারিলে নরেন্দ্রনাথ মনে অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছিলেন। এক্ষণে কালীপ্রসাদকে সহায় রূপে প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার উৎসাহ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। দুইজনে মিলিয়া তাঁহারা বালক ভক্তগণের বাড়ি গমন করিতে লাগিলেন এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের আদেশ ও তীব্র বৈরাগ্যোদ্দীপক বাক্য দ্বারা তাঁহাদিগকে সংসার ত্যাগ করিতে প্ররোচিত করিতে লাগিলেন।

"শেষে বালকভক্তগণের মনে এমন আতঙ্কের সৃজন হইল যে, নরেন্দ্রনাথ ও কালীপ্রসাদকে দেখিতে পাইলে তাঁহারা অনেকেই দ্বার বন্ধ করিয়া সরিয়া পড়িবার চেষ্টা করিতেন। নরেন্দ্রনাথও ছিলেন নাছোড়বান্দা। তিনি দরজাতে লাথি ও কিল দিয়া এমনই অবস্থার সৃষ্টি করিতেন যে, তাঁহারা কিংকর্তব্যবিমূঢ় ও ভীত হইয়া দ্বার খুলিয়া দিতে বাধ্য হইতেন। বালকগণের অভিভাবকেরা ইহা ভালো চক্ষে দেখিতেন না। সুতরাং তাহাদের অনুপস্থিতিতেই এই কার্য সকল করিতে হইত। তৎকালে অভিভাবকগণ নরেন্দ্রনাথ ও

কালীপ্রসাদের এই প্রকার আচরণের সংবাদে অত্যন্ত সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। একদিন তাহারা দুইজন ও ছুটকো গোপাল, শরৎ ও শশীর বাড়িতে উপস্থিত হইয়া দরজায় ধাক্কা দিতে লাগিলেন। শরৎ দরজা খুলিবেন না, আর নরেনও ছাড়িবেন না। অবশেষে নরেন্দ্রনাথ দরজায় আরও জোরে করাঘাত করিয়া শরৎকে দরজা খুলিতে বাধ্য করিলেন। ঘরে প্রবেশ করিয়াই নরেন্দ্রনাথ অবিরত তীব্র বৈরাগ্য ও ভগবদ্ লাভের প্রসঙ্গ তুলিয়া এক অপূর্ব আধ্যাত্মিক আবেষ্টনীর সৃষ্টি করিলেন। শরৎ ও শশী তাঁহার সেই আবেগময়ী বাক্যস্রোতে সত্যই ভাসিয়া গেলেন। অবশেষে নরেন্দ্রনাথ যখন বলিলেন: 'চল্ বরানগর মঠে যাই', তখন আর তাঁহারা আপত্তি করিতে পারিলেন না। শরৎ ও শশী গায়ে চাদর ফেলিয়া তখনই তাহাদের সহিত বরাহনগরে রওনা হইলেন।”

বরানগর মঠে নবীন সাধকদের ত্যাগ বৈরাগ্য ও কৃচ্ছ্রসাধন চরমে উঠিয়াছিল। কিন্তু নরেন্দ্রনাথের প্রেরণা ও নেতৃত্বের এমনই প্রভাব ছিল যে, এই কঠোর জীবনের দুঃখ কষ্টকে কেহ গায়ে মাখিতেন না। এ সময়কার স্মৃতিচারণ করিতে গিয়া উত্তরকালে স্বামী অভেদানন্দ বলিয়াছেন: “মহা সমাধির পূর্বে একদিন রাত্রে শ্রীশ্রীঠাকুর নরেন্দ্রনাথকে কাছে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন: 'তুই ছেলেদের একত্রে রাখিস্ ও তাদের দ্যাখাশোনা করিস্।' আমরা শ্রীশ্রীঠাকুরের সেই নির্দেশ স্মরণ করাইয়া নরেন্দ্রনাথকেই সকলের প্রধান করিয়া তাহার নির্দেশ অনুসারে চলিতাম এবং মঠে নিয়মিত-ভাবে ধ্যান-ধারণা, পূজা-পাঠ, কীর্তনাদি করিয়া দিন অতিবাহিত করিতাম। প্রকৃতপক্ষে নরেন্দ্রনাথই ছিল আমাদের সকল সময়ের আশা-ভরসা ও সুখ-সান্ত্বনার স্থল। তখন সকলের জীবন অতিশয় দুঃখ-কষ্ট ও দারিদ্র্যের মধ্য দিয়া অতিবাহিত হইলেও একমাত্র শ্রীশ্রীঠাকুরকে জীবনে সহায়সম্বল করিয়া মনের আনন্দেই দিন-যাপন করিতাম। অবশ্য খাওয়াপরার তখন অত্যন্ত কষ্ট ছিল।

“তারকদাদা, আমি, লাটু, গোপালদাদা প্রভৃতি সকলে ভিক্ষায়

বাহির হইয়া সামান্যভাবে যে চাল প্রভৃতি পাইতাম তাহাই সকলে পালা করিয়া রান্না করিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতাম। কোনো কোনো দিন শাক্-সব্জী কোনোরূপ না পাইয়া তেলাকুচার পাতা আনিয়া সিদ্ধ করিতাম ও তাহা দিয়া ভাত খাইতাম। অবশ্য আহার আমাদের একবেলাই জুটিত। সকলের পরনে কাপড় ছিল না। একখানি কাপড় ছিঁড়িয়া কৌপীন করিয়া আমরা তাহাই পরিতাম এবং আর একখানি মাত্র কাপড় আমরা রাখিয়া দিতাম, কেহ কোথাও গেলে সেইখানি পরিয়াই বাহির হইত। সেই সব দুঃখ কষ্টের দিনের কথা আর কি বলিব। তবে এখন সেই সব দিনের কথা মনে হইলে মন আনন্দে ভরিয়া ওঠে।"

এই সময়ে তরুণ রামকৃষ্ণ তনয়দের মধ্যে কৃচ্ছ্র, ধ্যান ও শাস্ত্র-পাঠের উৎসাহ চরমে উঠে। কালীপ্রসাদের একটি ক্ষুদ্র নিজস্ব ঘর ছিল, সেখানে দিনের পর দিন তিনি তপস্যা ও স্বধ্যায়ে মগ্ন থাকিতেন, দেহের দিকে দৃষ্টি দিবার অবসর ছিল না। তাঁহার ঐ ঘরটিকে গুরু ভাইরা বলিতেন, কালীতপস্বীর ঘর।

একদিন মঠের বারান্দায় শুইয়া কালীপ্রসাদ ধ্যান করিতেছিলেন, ক্রমে বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া ফেলিলেন। মধ্যাহ্নের সূর্যকরে বারান্দার ধূলিরাশি উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে, উহারই উপর তিনি শুইয়া আছেন। এসময়ে স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যম ভ্রাতা মহেন্দ্রনাথ দত্ত মঠে বেড়াইতে আসিয়াছেন। কালীপ্রসাদকে অসাড় অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া তাঁহার কাছে গেলেন। হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিয়া দেখিলেন, রৌদ্রে দেহটি তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে, জীবনের কোনো লক্ষণ নাই। মহেন্দ্রনাথ চমকিয়া উঠিলেন, ভাবিলেন, অত্যধিক কঠোর তপস্যা করিতে গিয়া কালীপ্রসাদের মৃত্যু ঘটিয়াছে।

মঠের অভ্যন্তরে গিয়া বিষণ্ণ স্বরে একথা জানানোর সঙ্গে সঙ্গে যোগানন্দ হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "ও কি মরে? ও শালা অমনি ক'রেই ধ্যান করে।" কালীপ্রসাদের ধ্যাননিষ্ঠা সম্পর্কে সে সময়ে সকল গুরুভাইই উচ্চ ধারণা পোষণ করিতেন।

মঠের গুরু-ভাইদের মধ্যে এসময়ে যে অচ্ছেদ্য বন্ধুত্ব ও অন্তরঙ্গতা গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহার তুলনা সত্যই বিরল। একদিন নরেন ও কালীপ্রসাদ কোনো কাজ উপলক্ষে কলিকাতায় গিয়াছেন। গৃহী ভক্তদের বাড়িতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া আলাপ আলোচনাদি করিলেন, কিন্তু কোথাও কেহ আহারাদি করার কথা বলিলেন না। ক্রমে বেশ রাত্রি হইয়া আসিল। নরেন্দ্র ও কালীপ্রসাদ এবার নরেন্দ্রের পৈত্রিক বাড়িতে উপস্থিত হইলেন। বাড়িতে তখন চরম আর্থিক দুর্গতি চলিতেছে, জ্ঞাতিদের সহিত মোকদ্দমায় তাঁহারা সর্বস্বান্ত হইয়াছেন, দু-মুঠো অন্নেরও সংস্থান নাই। অবস্থাটি উভয়েরই জানা ছিল, তাই বাড়িতেও আহারের কথা তাঁহারা বলিলেন না।

সারাদিন একেবারে অনাহারে গিয়াছে, রাত্রিতে খাবার মিলিবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু সব চাইতে বড় বিপদ পৌষের প্রচণ্ড শীত। নরেন বা কালীপ্রসাদ কাহারও একটুকরা গাত্রবস্ত্র নাই।

এ অবস্থায় কি করা যায়? কোঁচার কাপড় কোনোমতে গায়ে জড়াইয়া দুইজনে পিঠাপিঠি করিয়া শুইয়া রহিলেন। তামাক খাওয়া, বেদান্তের আলোচনা সবই চলিতে লাগিল, কিন্তু শীত কিছুতেই যাইতেছে না। অনাহারে শরীরও অবসন্ন।

কালীপ্রসাদ কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন, "ভাই নরেন, শীতের দাপটে যে আর ঘুমুতে পারছিনে।"

নরেন উত্তর দিলেন, "দূর শালা, ভেবে কি হবে, আরও একটু ঠাসাঠাসি ক'রে শো।"

অতঃপর কালীপ্রসাদের খুব কষ্ট হইতেছে বুঝিয়া নরেন উঠিয়া বসিলেন। কহিলেন, "থাম্ শালা, উঠে ব'স, দেখি তো তোর জন্ম চায়ের যোগাড় করতে পারি কিনা। খুঁজিয়া পাতিয়া কিছু চা চিনি ও কেটলী সংগ্রহ করা গেল।

চা তৈরি হইলে নরেন কহিলেন, "কিরে শালা, জেগে আছিস্?"

কালীপ্রসাদ তখনো 'শীতে কাঁপিতেছেন, "কহিলেন এ অবস্থায়

জেগে থাকবো না তো কি? ঘুম আর হল কোথায়। শীতে যে আমার গা কালিয়ে যাচ্ছে।"

"লে শালা, চা খা, একটু গরম হয়ে নে।" বলিয়া নরেন চায়ের বাটিটি কালীপ্রসাদের হাতে দিলেন।

কিছুক্ষণ পরেই রাত্রি প্রভাত হইল, উভয়ে তাড়াতাড়ি চলিয়া গেলেন বরানগরের দিকে।

সুখে দুঃখে, আপদে বিপদে তরুণ রামকৃষ্ণ-তনয়েরা এমনিভাবে দিনের পর দিন একত্রে দিন কাটাইয়াছেন, নিজেদের মধ্যে গড়িয়া তুলিয়াছেন এক অচ্ছেদ্য আত্মিক বন্ধন।

মঠে তরুণ সাধকেরা শাস্ত্রপাঠ, জপধ্যান ও কীর্তনে মাতিয়া রহিয়াছেন। এ সময়ে হঠাৎ একদিন নরেন্দ্রনাথ বলেন, "আমি ভাবছি, সবাই মিলে এবার আমরা শাস্ত্রমতে সন্ন্যাস নিই। তোমাদের কি মত?"

কালীপ্রসাদ মন্তব্য করেন, "শাস্ত্রমতে সন্ন্যাস নিলে আমাদের বিরজা হোম করতে হবে। বিরজা হোমের মন্ত্র কিন্তু আমার কাছে রয়েছে।"

নরেন্দ্রনাথ কৌতূহলী হইয়া প্রশ্ন করেন, "তাই নাকি? তুমি ঐ মন্ত্র কি ক'রে পেলে?"

কালীপ্রসাদ জানাইলেন, "বরাবর পাহাড়ে সে-বার হঠযোগীর সন্ধানে গিয়েছিলাম, জান তো? তখন পাহাড়ের নিচেকার ধর্মশালায় এক সন্ন্যাসীর খাতা থেকে এগুলো টুকে রেখেছিলাম।"

নরেন্দ্রনাথ তো মহা আনন্দিত। বলেন, "তাহলে, এসব ঠাকুরেরই কৃপা। কেমন শুভ যোগাযোগ ছাখো। এসো, আমরা বিরজাহোম সম্পন্ন ক'রে শাস্ত্রীয় মতে পুরোপরি সন্ন্যাসী হই।" সকলে সোৎসাহে একথা সমর্থন করিলেন।

কালীপ্রসাদ এই অনুষ্ঠানের বিবরণ দিতে গিয়া লিখিয়াছেন, "একদিন প্রাতঃকালে সকলে গঙ্গায় স্নান করিয়া বরাহনগরে

মঠে ঠাকুরঘরে শ্রীশ্রীঠাকুরের পবিত্র পাদুকার সম্মুখে উপবেশন করিলাম। শশী বিধিমতো শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজা সমাপ্ত করিল। হোমের জন্য কিছু বিল্বকাষ্ঠ, বারোটি বিল্বদণ্ড ও গব্যঘৃত সংগ্রহ করা হইয়াছিল, অগ্নি প্রজ্বলিত করা হইল। নরেন্দ্রনাথের আদেশে আমি তন্ত্রধারকরূপে, আমার খাতা হইতে সন্ন্যাসের প্রেষমন্ত্র পাঠ করিতে লাগিলাম। প্রথমে নরেন্দ্রনাথ ও পরে রাখাল, নিরঞ্জন, শরৎ, শশী, সারদা, প্রভৃতি সকলে আমার পাঠের সঙ্গে সঙ্গে প্রেষমন্ত্র পড়িতে পড়িতে প্রজ্বলিত অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিল। পরে আমি নিজেই প্রেষমন্ত্র পড়িয়া অগ্নিতে আহুতি দিলাম। অবশ্য সন্ন্যাসদীক্ষা আমরা পূর্বেই শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকটে পাইয়াছিলাম। পূর্বে গোপালদাদা কর্তৃক গঙ্গাসাগর মেলায় আগত সাধুদের উদ্দেশ্যে দান করার জন্য বারোখানি গৈরিক বস্ত্র ও রুদ্রাক্ষের মালা আমরা শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট হইতে পাইয়াছিলাম, তবে শাস্ত্রমতে সন্ন্যাসানুষ্ঠান আমাদের বরাহনগরের মঠে হইয়াছিল।"

সন্ন্যাস গ্রহণের পর নরেন্দ্র নাম গ্রহণ করিলেন বিবিদিষানন্দ,[১] রাখাল—ব্রহ্মানন্দ আর কালীপ্রসাদ—অভেদানন্দ। অপর সকলেও নরেন্দ্রনাথের পরামর্শ মতো নাম গ্রহণ করিলেন।

কিছুদিন পরে মা সারদামণির আশীর্বাদ নিয়া স্বামী অভেদানন্দ তীর্থ ভ্রমণের জন্য বহির্গত হন। প্রথমে উত্তরাখণ্ডের হরিদ্বার, হৃষিকেশ, বদরী, কেদার প্রভৃতি এসময়ে তিনি পরিভ্রমণ করেন।

পরিব্রাজক অভেদানন্দ এসময়ে সংকল্প গ্রহণ করেন, টাকা-পয়সা তিনি স্পর্শ করিবেন না, রন্ধন করিবেন না, জামা পরিধান করিবেন না এবং কাহারও গৃহে শয়ন করিবেন না। তাছাড়া,

১ পরবর্তীকালে নরেন্দ্রনাথ এই বিবিদিষানন্দ নাম পরিবর্তন করিয়া বিবেকানন্দ নাম গ্রহণ করেন। তাঁহার শিষ্য ক্ষেত্রীর রাজা অজিত সিং-এর পরামর্শমতো এই নাম নিয়া তিনি আমেরিকা যান। দ্রঃ স্বামী বিবেকানন্দ : এ ফরগটন্ চ্যাপ্টার অব হিজ লাইফ—বি, এস, শর্মা

মাধুকরী করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিবেন, আর রাত্রিকালে আশ্রয় নিবেন কোনো বৃক্ষতলে।

এই পরিব্রাজনের সময় বহু বিপদে ও সংকটে তিনি পড়িয়াছেন, কিন্তু প্রতিবারই উদ্ধার পাইয়াছেন সদ্‌গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপা বলে। নির্জন অরণ্যে, পথে প্রান্তরে, নিভৃত ধ্যানগুহায় সর্বত্র অলক্ষ্যে থাকিয়া সদ্‌গুরুই জুটাইয়া দিয়াছেন আহার এবং আশ্রয়, প্রতিপদে তাঁহাকে রক্ষা করিয়া চলিয়াছেন।

এই পরিব্রাজনের সময়ে দীর্ঘদিন তিনি হৃষিকেশে অবস্থান করেন। ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বেদান্তী ধনরাজ গিরির আশ্রম ছিল এই স্থানে। অভেদানন্দ তাঁহার নিকট থাকিয়া বেদান্ত অধ্যয়ন করেন এবং জ্ঞানমার্গের উচ্চতম তত্ত্বসমূহে পারঙ্গম হইয়া উঠেন।

ইহার কিছুকাল পরে স্বামী বিবেকানন্দের সহিত হৃষিকেশে ধনরাজ গিরির সাক্ষাৎ ঘটে। স্বামীজী অভেদানন্দ সম্পর্কে প্রশ্ন করিলে গিরি মহারাজ মন্তব্য করেন, "অভেদানন্দ? উসকো তো অলৌকিকী প্রজ্ঞা থে।"

অতঃপর পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতের তীর্থ সম্পর্কে পরিব্রাজন করিয়া অভেদানন্দ কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিলেন। মঠ তখন আলম বাজারে স্থানান্তরিত হইয়াছে। সেখানে পৌঁছিয়া তিনি খুশী হইয়া উঠিলেন। পূর্বেকার মতো আর্থিক দুরবস্থা আর নাই। এখন কিছুটা সচ্ছলতার মুখ দেখিতেছেন তরুণ তাপসেরা। গৃহস্থ ভক্তেরা নানারকমের ভেট পাঠাইতেছেন, ঠাকুরের পূজা ও ভোগরাগের এ সময়ে আর কোনো অসুবিধা নাই।

১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে পাওয়া গেল এক অপ্রত্যাশিত সংবাদ। চিকাগো ধর্ম-মহাসভায় স্বামী বিবেকানন্দ হিন্দুধর্মের প্রতিনিধিরূপে এক ঐতিহাসিক ভাষণ দিয়াছেন, সারা আমেরিকায় তুলিয়াছেন বিপুল আলোড়ন।

কিছুদিনের মধ্যে মঠে স্বামী বিবেকানন্দের এক পত্র আসিল। তিনি লিখিয়াছেন, তাঁহার বিরুদ্ধে অভিসন্ধিমূলক প্রচার চলিয়াছে

এবং বলা হইতেছে, তিনি হিন্দুধর্মের কোনো প্রতিনিধি নহেন এবং আসলে একটি ভ্যাগাবণ্ড মাত্র। তাই অবিলম্বে কলিকাতায় একটি সর্বজনীন সভা আহ্বান করা প্রয়োজন। এই সভার প্রস্তাবে বলিতে হইবে যে স্বামী বিবেকানন্দ হিন্দুধর্মের প্রতিনিধি এবং তাঁহার প্রচার-কর্মে ভারতের জনগণের বিপুল সমর্থন রহিয়াছে।

অভেদানন্দ সারদানন্দ প্রভৃতি গুরুভাইরা এই কার্য সাধনে তৎপর হইয়া উঠিলেন। কলিকাতায় এক বিরাট সভা অনুষ্ঠিত হইল এবং গৃহীত প্রস্তাব প্রেরিত হইল আমেরিকায়।

কলিকাতার এই সময়কার কর্মতৎপরতা সম্পর্কে বিবেকানন্দের ভ্রাতা মহেন্দ্র দত্ত মহাশয় লিখিয়াছেন, "কালী বেদান্তী এই সময়ে প্রাণপণে খাটিয়াছিলেন। উন্মাদের মতো দিবারাত্র কাজ করিয়া টাউনহলের সভা করিয়াছিলেন। তাঁহার পরিচিত ব্যক্তিদিগের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া সভার কার্যপ্রণালী মুদ্রিত করা এবং এই রিপোর্টগুলি নানা প্রেসে পাঠানো প্রভৃতি সমস্ত কার্য তিনি সাধনার মতো করিয়াছিলেন।"

১৮৯৬ সালে স্বামী অভেদানন্দের জীবনে সংযোজিত হয় এক নূতন অধ্যায়। 'কালীবেদান্তীর' অভ্যুদয় দেখা দেয় আধুনিক যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বেদান্ত-প্রচারক সন্ন্যাসীরূপে প্রথমে ইংল্যাণ্ডে পরে আমেরিকায় গিয়া তিনি অদ্বৈত বেদান্ত ও শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবধারা প্রচার করেন। বিশেষত আমেরিকায় প্রায় পঁচিশ বৎসর কাল অবস্থান করিয়া বিবেকানন্দের প্রচারিত ভাবধারাকে বিস্তারিত করেন এবং গড়িয়া তোলেন একটি দৃঢ়সম্বদ্ধ সংগঠন।

বিবেকানন্দ সে-বার আমেরিকা হইতে লণ্ডনে আসিয়াছেন। সেখানকার বেদান্তের প্রচারে প্রয়োজন এক সুযোগ্য গুরুভ্রাতার। এজন্য আহ্বান করিয়া নিলেন স্বামী অভেদানন্দকে।

প্রায় মাসখানেক যাবৎ অভেদানন্দ লণ্ডন শহরে আসিয়াছেন, সেখানকার রীতিনীতি ধীরে ধীরে আয়ত্ত করিয়া নিতেছেন। এ

সময়ে বিবেকানন্দ নানা স্থানে বক্তৃতা দিয়া বেড়াইতেছিলেন। সেদিন হঠাৎ তিনি অভেদানন্দকে ডাকিয়া কহিলেন, "এখানকার ক্রাইস্ট থিয়োসফিক্যাল সোসাইটিতে তোমায় বক্তৃতা দিতে হবে। বক্তা হিসাবে তোমার নাম ওরা ছাপিয়ে দিয়েছে।"

অভেদানন্দ তো আকাশ হইতে পড়িলেন। উদ্বিগ্ন স্বরে কহিলেন, "সে কি কথা! আমি কি ক'রে বক্তৃতা দেব? আমি তো বক্তৃতা করতে জানি নে।"

"ও কথা শুনবো না, বক্তৃতা তোমায় দিতেই হবে।"

"আমার সে ক্ষমতা একেবারেই নেই, আমি কিছুতেই করতে পারবো না।"

"তবে এখানে এলে কেন?" উত্তেজিত স্বরে বলেন বিবেকানন্দ।

"তুমি ডেকেছিলে তাই। বলতো আবার ফিরে যাচ্ছি। বক্তৃতা দিতে হবে এ কথা জানালে কখনই আমি আসতুম না।"

এবার বিবেকানন্দ দৃঢ়স্বরে বলেন, "তা হবে না। এখানেই তোমায় থাকতে হবে, আর বক্তৃতা দেওয়া শিখতেও হবে।"

"আমি পারব না।"

"তুমি কি তা'হলে আমায় অপদস্থ করতে চাও?"

"কেন অপদস্থ হবে?"

"এ সভায় বক্তৃতা দিতে আমাকেই নিমন্ত্রণ করেছিল। আমি বলেছি এবার আমি বক্তৃতা করবো না, আমার এক গুরুভ্রাতা এখানে এসেছেন, তিনি মহাপণ্ডিত, তিনিই বক্তৃতা করবেন। তাঁরা শুনে খুব খুশী হলেন এবং নোটিশ ছাপাতে দিলেন।"

"তুমি আমায় আগে কিছু না জানিয়ে ও রকম নিমন্ত্রণ নিলে কেন?"

"নিয়ে ফেলেছি এখন আর কি হবে?"

এতক্ষণে অভেদানন্দ কিছুটা নরম হইলেন। কহিলেন, "তবে বক্তৃতা কি ক'রে আরম্ভ ও শেষ করতে হয় আমায় বলে দাও।"

"আমাকে কে কবে বলে দিয়েছিল? তোমার অন্তর যে ভাবে,

যে রসে, পূর্ণ হয়ে রয়েছে, তাই দাঁড়িয়ে উঠে ঢেলে দেবে। তুমি তো কালী-বেদান্তী, এতদিন বেদান্তের কত আলোচনা করলে, সেই সম্বন্ধে বলবে। এই তো পঞ্চদশী একখানি বেদান্ত গ্রন্থ—এতে যা শিক্ষা দেয় তা ইংরেজীতে লেখ। লিখে কয়েকবার তা পড়ে ফেল। পরে সভায় দাঁড়িয়ে তাই বলবে।”

“ইংরেজীতে লেখা যে আমার অভ্যাস নেই।”

“চেষ্টা কর, ট্রাই ট্রাই ট্রাই এগেন। প্র্যাকটিস্ কর। প্র্যাকটিস্ মেক্‌স্ এ ম্যান পারফেক্ট।”

অভেদানন্দ মহা সমস্যায় পড়িলেন। নিজের অক্ষমতার কথা ভাবিতে গেলেই হতাশ হইয়া পড়েন। সত্যিই তো, নোটিশ দেওয়া হইয়া গিয়াছে, এখন বক্তৃতা না করিলে স্বামী বিবেকানন্দকে যে এখানকার সমাজে অপদস্থ হইতে হইবে। ইহা তো অভেদানন্দ প্রাণ থাকিতে ঘটিতে দিতে পারেন না।

অগত্যা সাহসে বুক বাঁধিয়া বক্তৃতা দিবার জন্য তিনি প্রস্তুত হইলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীমাকে ভক্তিভরে স্মরণ করিয়া ‘পঞ্চদশী’ অবলম্বন করিয়া লিখিয়া ফেলিলেন এক দীর্ঘ প্রবন্ধ। তারপর বার বার সেটি পাঠ করিয়া আয়ত্ত করিয়া নিলেন।

ইষ্ট স্মরণ করিয়া অভেদানন্দ বক্তৃতামঞ্চে দণ্ডায়মান হইলেন। কোনো জনসভাতেই ইতিপূর্বে কখনো ভাষণ দেন নাই, তাছাড়া এ সভা যে ইংল্যাণ্ডের মতো প্রাগ্রসর দেশের এমন একটি সভা যেখানে শিক্ষিত ও সংস্কৃতিবান্ শ্রোতারা সমবেত হইয়াছেন। আর সম্মুখে বসিয়া আছেন স্বামী বিবেকানন্দ। তাই মনে কিছুটা আতঙ্ক ও দৌর্বল্যের সঞ্চার হইল। কিন্তু ধৈর্য সহকারে নিজেকে শক্ত ও দৃঢ় করিয়া নিলেন, শ্রোতারা তাঁহার দৌর্বল্য বা চাঞ্চল্যের কথা জানিতে পারিলেন না। ক্রমে আত্মস্থ হইয়া বিশুদ্ধ ইংরেজী ভাষায় অনর্গলভাবে বেদান্তের উচ্চতম তত্ত্বগুলি তিনি চমৎকার ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। দেবী সরস্বতী সেদিন যেন তাঁহার কণ্ঠে অধিষ্ঠিতা। মা সারদামণি এক সময়ে অভেদানন্দকে আশীর্বাদ

করিয়াছিলেন, 'বাবা, সরস্বতী তোমার কণ্ঠে অধিষ্ঠাতা হোন্', সে কথা এবার সর্বসমক্ষে ফলিয়া গেল।

লণ্ডনে দুই গুরুভ্রাতা যে অন্তরঙ্গ পরিবেশে বাস করিতেন, শঙ্করানন্দজী তাঁহার কিছুটা বর্ণনা দিয়াছেন, "নূতন বাড়িতে স্বামীজী, গুড্‌উইন এবং অভেদানন্দ বাস করিতে লাগিলেন। গুড্‌উইন স্বামীজীর বক্তৃতা সাঙ্কেতিক লিপিদ্বারা লিখিয়া লইতেন ও বাজার করিতেন। অভেদানন্দ বাড়ির কাজকর্ম ও রন্ধনাদি করিতেন। বাড়িতে দাসদাসী ছিল না। স্বামীজীও মাঝে মাঝে রাঁধিতেন এবং ইংরেজ বন্ধুগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া খিচুড়ী, নিরামিষ ডালনা প্রভৃতি ভারতীয় খাদ্য আহার করাইতেন। গুড্‌উইন রান্না করিবার চেষ্টা করিতেন কিন্তু কিছুই করিতে পারিতেন না।

"স্বামীজী যেদিন সন্ধ্যার পর সুদীর্ঘ বক্তৃতা দিতেন সেদিন তাঁহার সুনিদ্রা হইত না। মস্তকে রক্ত উঠিয়া মস্তিষ্ক গরম হইয়া যাইত। অভেদানন্দ রাত্রি জাগিয়া তাঁহার মাথায় হাত বুলাইয়া দেওয়া প্রভৃতি সেবাকার্য করিতেন। স্বামীজীর আহার সম্বন্ধে কোনো নিয়ম ছিল না। কোনো দিন খুব পেট ভরিয়া মৎস্যাদি আহার করিতেন, আবার কোনো দিন ফলাহার, কোনো দিন উপবাস বা অর্ধ উপবাস করিয়া থাকিতেন। এইরূপ অনিয়মের জন্য তিনি প্রায়ই পেটের অসুখে ভুগিতেন। অভেদানন্দ তাঁহাকে আহার সুনিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য বার বার অনুরোধ করিতেন।"

লণ্ডনের বেদান্ত সমিতির সভাপতিরূপে স্বামী অভেদানন্দ প্রায় বৎসরখানেক কৃতিত্বের সহিত কাজ করেন। তারপর স্বামী বিবেকানন্দের আহ্বানে তিনি আমেরিকায় গিয়া উপস্থিত হন।

বেদান্ত আন্দোলনের মধ্য দিয়া স্বামী বিবেকানন্দ তখন সারা আমেরিকাতে এক বিরাট চাঞ্চল্য সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সেখানকার শিক্ষিত সমাজে ভারতের ধর্ম ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে জাগিয়া উঠিয়াছিল বিস্ময়কর শ্রদ্ধা। স্বামী বিবেকানন্দের ঐ আন্দোলন সীমাবদ্ধ ছিল

একটি ক্ষুদ্র উদারপন্থী দলের মধ্যে। পরে স্বামী অভেদানন্দ ঐ আন্দোলনকে স্থায়িত্ব দেন, এবং আরো বিস্তারিত করিয়া তোলেন।

প্রায় পঁচিশ বৎসর তিনি আমেরিকায় বসবাস করেন এবং নিজের প্রতিভা কর্মকুশলতার গুণে সে দেশের শ্রেষ্ঠ মনীষী ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিদের শ্রদ্ধা অর্জন করিতে সমর্থ হন।

সেদেশে গোড়ার দিকে অভেদানন্দকে দারিদ্র্য ও প্রতিকুল অবস্থার বিরুদ্ধে তীব্র সংগ্রাম করিতে হয়। নিজের স্মৃতিচারণে তিনি লিখিয়াছেন[১], "স্বামী বিবেকানন্দ বেদান্ত প্রচারের যতটুকু সূত্রপাত করেছিলেন আমেরিকায়, তা সফল ক'রে তুলতে আমি উপায় খুঁজতে লাগলাম। কাজ চালাবার জন্য আমার কাছে তখন টাকা পয়সা কিছুই ছিল না বা কোনোরকম দানও ছিল না। কাজেই নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে আমাকে একাই ঘরভাড়া ও হোটেলের খরচ-পত্র, লেকচার হলের ভাড়া, নিজের পকেট খরচা, বিভিন্ন সাপ্তাহিক ও অন্যান্য খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়ার টাকা-পয়সা সবই সংগ্রহ করতে হয়েছিল। ক্লাস ও সাধারণ বক্তৃতার পর শ্রোতারা স্বেচ্ছায় যে যা দিত তা' ছাড়া টাকা-পয়সা পাবার আর কোনো উপায় ছিল না। কিন্তু আমার যা খরচ, তার তুলনায় আয় খুব সামান্য ছিল। কাজেই নিজের সকল কিছু সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জন দিয়ে সে সময়ে ছাত্রদের কাছেই আতিথ্য গ্রহণ ক'রে আমায় অনেকদিন খরচ সংকুলান করতে হয়েছে। এটা ছিল একরকম ভারতের সন্ন্যাসীদেরই ভিক্ষাবৃত্তির মতো।"

ক্রমে এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটে, স্বামী অভেদানন্দের মনীষা, প্রতিভাদীপ্ত ভাষণ, বাগ্মিতা এবং পূত চরিত্রে আকৃষ্ট হইতে থাকেন আমেরিকার একদল বুদ্ধিজীবী ও মুমুক্ষু নরনারী। সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় ছিল তাঁহার ধর্মতত্ত্ব ব্যাখ্যানের কৌশল। আবেগ ও ভাবময়তা অপেক্ষা যুক্তিতর্কের সাহায্যই তিনি বেশী পরিমাণে নিতেন। বেদান্তের পরম তত্ত্বের সঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞান ও পাশ্চাত্য

[১] লীভস্ অব্ মাই ডায়েরী: অভেদানন্দ (অনুবাদ: প্রজ্ঞানানন্দ)

জীবনধারার কোনো বিরোধ নাই, এ কথাটি সর্বদাই তিনি জোর দিয়া বলিতেন।

'হিন্দুইজ্‌ম ইন্‌ভেডস আমেরিকা'র লেখক মিঃ ওয়েলডন টমাস অভেদানন্দের জনপ্রিয়তা প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন,[1] "স্বামী অভেদানন্দের মধ্যে আপন ক'রে নেবার শক্তি বিশেষভাবে আমাদের নজরে পড়েছে। মার্কিন দেশের প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে তাঁর বাণী এবং জীবনধারাকে তিনি মিশিয়ে নিয়েছিলেন।·· ঐতিহাসিক ঘটনাসমূহ এবং কর্মপরিধির দিকে দৃষ্টিপাত করলে আমরা দেখি—স্বামী অভেদানন্দ তাঁর বিশ্ববরেণ্য নেতার চেয়ে প্রাচ্যের বেদান্ততত্ত্বকে পাশ্চাত্যের সংস্কৃতির সঙ্গে বরং অধিকতররূপে খাপ খাওয়াতে পেরেছিলেন। জ্বলন্ত ও অনর্গল ভাষা-নিঃসারী বাগ্মিতা দিয়ে অভিভূত না ক'রে, সত্যকার যুক্তিতর্ক এবং নূতন নূতন আকর্ষণীয় তথ্যের সাহায্যে শ্রোতার মন জয় করার দিকে তিনি বেশী নজর দিয়েছিলেন।"

যীশুখ্রীষ্ট ও খ্রীষ্টান ধর্মসম্পর্কে অভেদানন্দ তাঁহার বক্তৃতায় যে নূতন মূল্যায়ন করেন তাহা আমেরিকার মনীষীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অধ্যাপক কর্সন এ প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, "আপনার বক্তৃতা যীশুখ্রীষ্ট সম্বন্ধে আমার ধারণার জগতে একটা যুগান্তর এনে দিয়েছে। ...যীশুখ্রীষ্ট সম্বন্ধে এমনি এক চূড়ান্ত মীমাংসা আপনি করেছেন যাতে গোঁড়ামী ভাবাপন্ন খ্রীষ্টান মতকেও পরিশেষে আপনার সিদ্ধান্তের কাছে মাথা নোয়াতে হয়েছে।

অদ্বৈততত্ত্ব নিয়া অভেদানন্দের সঙ্গে আমেরিকার প্রসিদ্ধ দার্শনিক অধ্যাপক উইলিয়াম জেমস-এর দীর্ঘ বিতর্ক হয়। অধ্যাপক জেমস অবশেষে বলেন, স্বামীজীর দৃষ্টিকোণ ও যুক্তিতর্কের দিক হইতে বিচার করিলে অদ্বৈত তত্ত্ব অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাঁহার নিজের দিক হইতে ইহা গ্রহণ করা সম্ভব নয়। এই বিতর্কের সময় রয়েস, লানমান, শেলার, লুই জেমস প্রভৃতি প্রখ্যাত

১ মন ও মানুষ: স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ; ২ ঐ-ঐ।

অধ্যাপকেরা উপস্থিত ছিলেন, সবাই স্বামী অভেদানন্দের মনীষা ও পাণ্ডিত্য দেখিয়া মুগ্ধ হন।

১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে স্বামী বিবেকানন্দ দ্বিতীয় বারের প্রচারকর্মে আমেরিকায় উপস্থিত হন। স্বামী অভেদানন্দ ইতিমধ্যে বেশ কিছুটা জাঁকাইয়া বসিয়াছেন, নিউইয়র্কেও বেদান্ত সমিতি তিনি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তাঁহার সাফল্য দেখিয়া বিবেকানন্দ সোল্লাসে কহিলেন, "নিউইয়র্কের দ্বারে আমি তিন তিনবার আঘাত করেছিলাম, কোনো সাড়া পাই নি। আমার খুব আনন্দ হয়েছে, দেখছি তুমি একটি স্থায়ী কেন্দ্র স্থাপন করেছো, নিউইয়র্কে এই প্রথম আমাদের সমিতির নিজস্ব গৃহ হল।"

আমেরিকায় স্বামী অভেদানন্দের পঁচিশ বৎসরের প্রচারের ফল হয় সুদূরপ্রসারী। এ সম্পর্কে নিজের এক ভাষণে তিনি বলিয়াছেন :

"আমার বেদান্ত প্রচারের ফলে আমেরিকায় অনেক খ্রীষ্টান ধর্ম-যাজকের চোখ খুলিয়া গিয়াছে এবং গীর্জায় উপাসনার সময় তাঁহারা বেদান্তের ভাব গ্রহণ করিয়া ঈশাহী ধর্মের মূলতত্ত্বগুলি নূতনভাবে ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। সত্যান্বেষী ও চিন্তাশীল লোক আর ঈশাহী ধর্মের গোঁড়ামীপূর্ণ ক্রিয়াকাণ্ডে বিশ্বাস করেন না। এখন আমেরিকাতে নূতন নূতন ধর্ম আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে। 'নিউ থট্', খ্রীষ্টান সায়েন্স', 'স্পিরিচুয়্যালিস্ট সোসাইটী' প্রভৃতি নব ধর্মমত প্রচারিত হইতেছে। আর এই সকলগুলিই হইতেছে মুখ্য গৌণভাবে আমাদের পঁচিশ বৎসর বেদান্ত প্রচারের ফল। খ্রীষ্টান সায়েন্স-এর প্রতিষ্ঠাত্রী মেরী বেকার এডি গীতার কয়েকটি শ্লোকের উপর তাঁহার সম্প্রদায়ের বনিয়াদ খাড়া করিয়াছেন। 'নিউ থট্' সম্প্রদায়ের সকলেই স্বামী বিবেকানন্দের ছাত্র এবং তাঁহারা বলেন যে, ঈশ্বর সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত হইয়া আছেন, তিনিই সব হইয়াছেন এবং তাঁহার আর দ্বিতীয় নাই। যীশুখ্রীষ্ট বলিয়া কোনো ব্যক্তিকে তাঁহারা বিশ্বাস করেন না, তবে তাঁহারা 'খ্রীষ্টত্ব' নামক আধ্যাত্মিক আদর্শকে স্বীকার করেন। আর 'খ্রীষ্টত্ব' সর্বব্যাপী ; ইহা আমাদের

অন্তরেই বিরাজমান। সত্য কথা বলিতে কি তাঁহারা মনে করেন—প্রত্যেক জীবাত্মাই স্বরূপতঃ 'খ্রীষ্ট'। এই উদার মতবাদ গোঁড়ামী-পূর্ণ খ্রীষ্টধর্মের গোড়ায় কুঠারাঘাত করিয়াছে। কারণ গোঁড়া খ্রীষ্টানগণ যীশুখ্রীষ্ট নামক এক ব্যক্তিতে বিশ্বাসী এবং মনে করেন যে, খ্রীষ্ট তাঁহার রক্ত দিয়া পাপী-তাপীদের পাপতাপ দূর করিয়াছেন। চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ এই প্রকারের পাপ হইতে মুক্তি বিশ্বাস করেন না। শিক্ষিত ব্যক্তিগণ বিশেষত যাহারা বিজ্ঞান ও দর্শন আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারা আর 'অনন্ত নরকে'র মতবাদে আস্থা স্থাপন করেন না। এই সমস্ত ভ্রান্ত ধারণা এখন প্রায় লোপ পাইতে বসিয়াছে।

"পৃথিবী ছয় হাজার বৎসর পূর্বে সৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া আর তাহারা বিশ্বাস করেন না। আর ইহাও বিশ্বাস করেন না যে, যীশুখ্রীষ্টের রক্তই সমস্ত পাপ দূর করিবে। তবে তাঁহারা 'খ্রীষ্ট' শব্দের আধ্যাত্মিক অর্থ গ্রহণ করেন। ইহাকে তাহারা 'খ্রীষ্টু' বলেন এবং তাঁহারা আরও বলেন যে, এই 'খ্রীষ্টত্ব' প্রত্যেক জীবাত্মাতে সুপ্ত অবস্থায় আছে এবং তাহা জাগরিত হইবে। ইহা সুপ্ত অবস্থায় আছে এবং তাহা জাগরিত হইলে প্রত্যেকেই এক একজন 'খ্রীষ্ট' হইবে। তাঁহারা খ্রীষ্টত্বের এই প্রকারেই ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। পঁচিশ বৎসর পূর্বের খ্রীষ্টধর্ম ও আমেরিকার বর্তমান খ্রীষ্টধর্ম এক নহে। বর্তমানে বেদান্তে প্রচারিত এক অনন্ত ও সত্য সত্তার উপরেই খ্রীষ্ট-ধর্মকে দাঁড় করানোর চেষ্টা হইতেছে। বেদের 'একমেবাদ্বিতীয়ম্', 'একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি' প্রভৃতি বাণী আজ খ্রীষ্টান সায়েন্স, নিউ থট্ ও স্পিরিচুয়েলিজম্ গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা যে নূতন ভাব প্রবাহ সৃষ্টি করিয়াছি তাহা দ্বারা তাঁহারা খুবই অনুপ্রাণিত হইয়াছেন।

"ইউরোপেও ধীরে ধীরে এবং নিশ্চিতরূপে তাঁহার ধাক্কা লাগিয়াছে। তাই ইংলণ্ডেও আজ অসংখ্য 'খ্রীষ্টান সায়েন্স'-এর চার্চ এবং বহু 'নিউ থট্' মন্দির গড়িয়া উঠিয়াছে। স্যার অর্থার কনান

ডয়েল, স্যার অলিভার লজ প্রভৃতি প্রেততত্ত্ববিদ্‌গণ বেদান্তের ভাবেই অনুপ্রাণিত হইয়াছেন। বর্তমানে প্রেততত্ত্ব অনুশীলন করিয়া আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, আত্মা নিত্য ও অবিনশ্বর, মৃত্যুর পরে আমাদের অনন্ত নরকে যাইতে হয় না। স্যার অলিভার লজের কথাই ধরুন। তিনি একজন প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক এবং তিনি তাঁহার 'রেমণ্ড' নামক পুস্তকে স্পষ্টই স্বীকার করিয়াছেন যে, আমরা মৃত আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে কথাবার্তা চালাইতে পারি।

দীর্ঘ গবেষণা, ভাষণ এবং লেখার মধ্য দিয়া মনীষী অভেদানন্দ আমেরিকার শিক্ষিত মহলে ভারতের প্রাচীন গৌরবময় ঐতিহ্যটিও তুলিয়া ধরিয়াছিলেন। ইহার ফলে ভারতের একটি অপরূপ ভাবমূর্তি গড়িয়া উঠে। তিনি বলিয়াছিলেন। "আর্য সভ্যতার অরুণালোকে ভারতের দিকচক্রবাল উদ্ভাসিত হয়েছিল প্রথমে। গ্রীসে রোমে আরবে বা পারস্যে নয়; ভারতবর্ষই সকল কিছু অধ্যাত্মশাস্ত্র, দর্শন ন্যায়, জ্যোতিষ, বিজ্ঞান, কলাবিদ্যা, সংগীত, চিকিৎসাশাস্ত্র ও সত্যিকারের নৈতিক ধর্মের আদিভূমি।

"হিন্দুরাই প্রথমে বৈদিক ঋক্‌ছন্দ থেকে সংগীতকলার বিকাশ সাধন করেছিলেন। বিশেষ ক'রে সামবেদ তো গানের জন্যই নির্দিষ্ট ছিল। গ্রীকদের বহুশত বৎসর পূর্বে সপ্তস্বর ও তিনগ্রামের প্রচলন ভারতবাসীরা জানতেন। সম্ভবত গ্রীকরাই ভারতবর্ষের কাছ থেকে ঐ সমস্ত জিনিস শিক্ষা করেছিলেন। তোমাদের একথা জেনে কৌতূহল হবে যে, পাশ্চাত্যের বিখ্যাত সংগীতবিদ্‌ ওয়াগ্‌নারও হিন্দু-সংগীতের কাছে—বিশেষ ক'রে তাঁর 'লিডিং মোটিভ'-এর জন্য ঋণী ছিলেন। ভারতীয় সংগীতের সঙ্গে ওয়াগ্‌নারের সংগীত পদ্ধতির অনেক মিল আছে। এইজন্যই বোধহয় পাশ্চাত্য সংগীতশিক্ষার্থীদের পক্ষে তাঁর সংগীত তত সহজবোধ্য ছিল না। ওয়াগ্‌নার কয়েকটি ভারতীয় সংগীতশাস্ত্রের লাটিন অনুবাদ পড়েছিলেন এবং জার্মান দার্শনিক সোপেন হাওয়ারের সঙ্গে তিনি ঐ সম্বন্ধে আলোচনাও করেছিলেন।"

স্বামী অভেদানন্দ আরও বলিয়াছেন, "পীথাগোরাস যে ভারতবর্ষে এসেছিলেন—এ'কথা বেশীর ভাগ ঐতিহাসিক স্বীকার করেন। পীথাগোরাস হিন্দুদের কাছে থেকে জ্যামিতি ও অঙ্কশাস্ত্র, জন্মান্তর ও পরলোকবাদ, নিরামিষ আহার ও পঞ্চভূতের তত্ত্ব প্রভৃতি শিক্ষা করেছিলেন এবং গ্রীসে ফিরে গিয়ে সেখানকার লোকেদের ভেতর সেগুলি প্রচার করেছিলেন। ইহুদীদের এসেনী সম্প্রদায়ের মধ্যেও এই সব ভাবধারার প্রচলন ছিল। মনে হয় এসেনীরা গ্রীকদের কাছ থেকে পরে ঐ সমস্ত ভাব গ্রহণ করেছিল। ইজিপ্ট ও গ্রীসের লোকেরা চারটি ভূততত্ত্ব (উপাদান বা এলিমেণ্ট) স্বীকার করত, তবে আকাশতত্ত্ব তাঁদের কাছে অজ্ঞাত ছিল। পরে হিন্দুদের কাছ থেকে ঐ দু'টি দেশ আকাশতত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করেছিল।"

আমেরিকায় বিবেকানন্দ ও অভেদানন্দের প্রচারের পূর্বেও বেদান্তের ভাবধারা কোনো কোনো আমেরিকান মনীষীর মাধ্যমে প্রচারিত হইয়াছিল। তবে এ ভাবধারা ছিল অতিশয় ক্ষীণ। এ সম্পর্কে স্বামী অভেদানন্দ বলিয়াছেন: "রাল্‌ফ ওয়াল্‌ডো এমার্সন আমেরিকার একজন জগদ্বিখ্যাত মনীষী। তিনিই সর্বপ্রথমে আমেরিকায় বেদান্ত প্রচার করেন। তাঁর বইয়ের মধ্যে এসব ভাব আছে। এই তো তাঁর 'এস্‌সেঅন্‌ ইম্‌মর্টালিটি'-র (আত্মার অমরত্ব প্রবন্ধের) ভিতর নচিকেতার গল্প আছে। তাঁর 'ব্রহ্ম' বলে একটি কবিতা আছে। গীতায় যে আছে,—য এনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতম্‌। উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে— এই ভাব সে কবিতায় রয়েছে—এরই স্বচ্ছন্দ অনুবাদ। তখন চার্লস উইল্‌কিন্স্‌ সাহেবের গীতার ইংরেজী অনুবাদ ছিল। এই অনুবাদ ওয়ারেন হেস্টিংস-এর সময় হয়। এমার্সন আর কার্লাইল দুজনে বন্ধু ছিলেন। কার্লাইলের সঙ্গে এমার্সনের দেখা হলে তিনি এমার্সনকে গীতা উপহার দিয়ে বলেছিলেন—'এ একখানা আশ্চর্য বই। এতে আমার সব সন্দেহের উত্তর পেয়েছি এবং আমার মনে

হয়, আমার ন্যায় আপনিও গীতার উপদেশ থেকে যথেষ্ট প্রেরণা পাবেন।' এমার্সন এই গীতা পড়েই 'ব্রহ্ম' সম্বন্ধে তাঁর ঐ কবিতা লিখেছিলেন।

"এমার্সন ক্লাবের প্রেসিডেন্ট মিঃ ম্যালয় আমায় ওই 'ব্রহ্ম' কবিতাটির মানে জিজ্ঞাসা ক'রে বললেন, এসব এমার্সন কোথা থেকে পেয়েছিলেন? আমি তাঁকে গীতার ওই কথা বললুম।

"আমি এমার্সনের লাইব্রেরী দেখেছি। সেখানে গীতা, মনু-সংহিতা, বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতির ইংরেজী অনুবাদ আছে[১]।"

আমেরিকায় কৃশ্চিয়ান সায়েন্স নামক তত্ত্ববাদের প্রভাব যথেষ্ট। স্বামী অভেদানন্দ বলিতেন, আমেরিকায় কৃশ্চিয়ান সায়েন্সের খুব প্রভাব। এই তত্ত্ব যে ভারতীয় দর্শন ও ধর্মবিজ্ঞানের কাছে ঋণী তা এই মতাবলম্বীরা স্বীকার করিতে চান না।

এই মতবাদ প্রবর্তন করিয়াছিলেন মিসেস এডি। তাঁহার রচিত 'সায়েন্স অ্যাণ্ড হেল্‌থ' গ্রন্থের অনেকগুলি সংস্করণ আমেরিকায় হইয়াছে। এই গ্রন্থের চতুর্বিংশ সংস্করণ এমন দুষ্প্রাপ্য, ঐ সংস্করণের অষ্টম অধ্যায়ে গীতা হইতে স্পষ্ট উদ্ধৃত বাণী ছিল। কিন্তু বর্তমানে তাহা তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। স্বামী অভেদানন্দ বহু শ্রম স্বীকার করিয়া এই সব তথ্য আমেরিকায় বাস করার কালে উদ্‌ঘাটন করেন এবং চোখে আঙুল দিয়া আমেরিকানদের দেখাইয়া দেন যে তাঁহাদের জনপ্রিয় কৃশ্চিয়ান সায়েন্স মতবাদ ভারতীয় দর্শনের দ্বারা কতটা প্রভাবিত হইয়াছে।

আমেরিকার নানা প্রতিকুল অবস্থায় পড়িয়া এবং ঘাত প্রতি-ঘাতে ক্লান্ত হইয়াও অভেদানন্দ কোনো দিন মানসিক স্থৈর্য হারান নাই। মাঝে মাঝে সহকর্মীদের বলিতেন, শুধু শ্রীশ্রীঠাকুরের দিকে তাকাইয়া আর বিবেকানন্দের অপার স্নেহ প্রীতির কথা স্মরণ করিয়াই এই দীর্ঘ সংগ্রামে তিনি যুঝিতে পারিয়াছেন।

এই সময়ে রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘজননী সারদামণির স্নেহাশিসও তাঁহাকে

১ মহারাজের কথা: স্বামী চিৎস্বরূপানন্দ

যথেষ্ট প্রেরণা যোগাইয়াছে। মা সারদামণির একটি পত্রে তাঁহার কিছুটা পরিচয় মিলে। তিনি লিখিয়াছেন, "কল্যাণীয়েষু, গতকল্য তোমার কুশলসহ এক পত্র পাইয়া আনন্দিত হইলাম। তোমার প্রেরিত পার্শেল পাইয়াছি। তুমি শারীরিক ও মানসিক ভালো আছ জানিয়া বড়ই সন্তোষ লাভ করিলাম। তোমার কার্য ভালোরূপ হইতেছে জানিয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম। তোমরাই শ্রীশ্রীঠাকুরের মুখোজ্জ্বল করিতেছ। শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট সর্বদা প্রার্থনা করি এবং আশীর্বাদ করিতেছি, তোমার কার্য যেন সফল হয়। তিনি তোমার এই মহৎ কার্যে সহায় হইবেন তাহাতে আর সন্দেহ কি? আহারাদি সম্বন্ধে আর তাদৃশ কঠোরতা করিবে না। তুমি সেখানে একদম নিরামিষ আহার না করিয়া উত্তম মৎস্যাদ আহার করিবে। তাহাতে তোমার কোনো দোষ হইবে না। আমি তোমাকে অনুমতি দিতেছি, তুমি স্বচ্ছন্দে উহা খাইবে। সর্বদা শরীরের দিকে নজর রাখিবে। মধ্যে মধ্যে নির্জন স্থানে বাস করিবে। মধ্যে মধ্যে তোমার কুশল লিখিয়া সুখী করিবে। তুমি আমার আশীর্বাদ জানিবে। ইতি। তোমাদের মা"

শ্রীমার উদ্দেশে প্রণতি জানাইয়া অভেদানন্দ তাঁহার ভক্তদের মাঝে মাঝে বলিতেন, "আলমবাজার মঠে থাকতে 'শ্রীমার স্তোত্র' রচনা ক'রে শ্রীমাকেই প্রথম শোনালাম। তিনি শুনে আশীর্বাদ ক'রে বললেন; তোমার মুখে সরস্বতী বসুক'। 'মূকং করোতি বাচালং,' সত্যই আমার মতো মূককে তিনি বাচাল করেছিলেন। নইলে ইংল্যাণ্ড আমেরিকার মতো দেশে, ধুরন্ধর সব পণ্ডিত ও পাদরীদের কাছ থেকে আমার মতো নগণ্য একজন ভারতবাসী কি জয়টীকা নিতে পারে? সবই শ্রীমা ও শ্রীঠাকুরের কৃপা।"

একনিষ্ঠভাবে, সমগ্র মনপ্রাণ দিয়া, সমগ্র সত্তা দিয়া অভেদানন্দ আঁকড়িয়া ধরিয়াছিলেন সদ্গুরু শ্রীরামকৃষ্ণকে। কি পরিব্রাজক জীবনে, কি প্রচারক ও আচার্য জীবনে, সর্বত্র সর্বসময়ে তিনি বিশ্বাস

করিতেন, ঠাকুর রামকৃষ্ণ তাঁহাকে রক্ষা করিতেছেন, ঐশ্বরীয় কর্মসাধনায় যোগাইতেছেন দিব্য প্রেরণা।

উত্তরকালে কথা প্রসঙ্গে নিজ ভক্তদের কাছে ঠাকুরের এক করুণালীলার কথা তিনি প্রকাশ করিয়াছেন: "তিনি যে সব সময়েই পিছনে থেকে আমাদের (তাঁর সন্তানদের) সাহায্য ও রক্ষা করতেন ও এখনও সদা সর্বদা করেন তার জ্বলন্ত নিদর্শন আমি ভূরি ভূরি পেয়েছি। তাঁর উপস্থিতি জীবনে অনুভব করেছি বহুবার। তিনি যে অশেষ করুণাময়, আমাদের হাত ধরেই সর্বদা চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন—একথা মর্মে মর্মে আমি বুঝেছি।

"লণ্ডন থেকে সেবারে আমেরিকায় যাব। জাহাজের টিকিট কেনার সব ঠিক। ইংলণ্ডের বন্দর থেকে যে জাহাজ ছাড়বে তার নাম ছিল লুসিটেনিয়া। টিকিট কিনতে গিয়ে (৬ই মে ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে) এক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটল। টিকিট কিনবো এমন সময় শুনতে পেলাম কে যেন টিকিট কাটতে আমায় স্পষ্ট নিষেধ করল। আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম। ভাবলাম মনের ভুল। এদিকে সেদিকে তাকালাম, কাকেও দেখতে পেলাম না। সুতরাং আবার গেলাম টিকিট কিনতে কিন্তু সেবারেও ঠিক সে' রকম। তখন টিকিট কেনা আর হল না। বাসায় ফিরে আসাই ঠিক করলাম। ভাবলাম কালই না হয় যাওয়া যাবে। কিন্তু পরের দিন সকালে খবরের কাগজ খুলে দেখি বড় বড় হরফে লেখা S. S. Lusitania is no more, অর্থাৎ লুসিটেনিয়া আটলান্টিক মহাসাগরের বুকে কাল রাত্রে ডুবে গেছে। আমি অভিভূত হ'য়ে পড়লাম। চোখে জল এল। বুঝলাম শ্রীশ্রীঠাকুরই আমায় রক্ষা করেছেন[১]।"

কুসুমের মতো মৃদু এবং বজ্রের মতো কঠোর ছিলেন অভেদানন্দ। অন্তরঙ্গ ভক্তেরা বলিতেন, তাঁহার অন্তর ছিল শিশুর সরলতায় পূর্ণ। বহিরঙ্গ জীবনের যে কোনো কাজে যে কোনো ব্যক্তি তাঁহাকে ভুল

১ মন ও মানুষ: স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

বুঝাইতে সক্ষম হইত। আবার তাত্ত্বিক বিচারের সময় এই মানুষটির ভিতরেই দেখা যাইত বিস্ময়কর বিশ্লেষণ শক্তি, ক্ষুরধার তত্ত্বোজ্জ্বলা বুদ্ধি এবং সিদ্ধান্ত স্থাপনের দৃঢ়তা।

অভেদানন্দের আমেরিকান শিষ্যা সিস্টার শিবানী (মেরী ল' পেজ) দুই একটি ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন, যাহা তাঁহার এই জীবন-বৈশিষ্ট্যের পরিচয় বহন করে।[১] শিবানী লিখিতেছেন, "আমাদের বর্ষীয়সী বান্ধবী মিসেস কেপ একদিন আমাদের মতো কয়েকটি তরুণ ছাত্রীকে বললেন, "ছাখো, যে কোনো সামান্য ঘটনা সম্পর্কে তোমাদের সন্দেহ উপস্থিত হবে, সে সম্পর্কে স্বামীজীর বক্তব্য অবশ্যই শুনে নিতে চেষ্টা করবে। আমি একটা সামান্য ঘটনার কথা বলছি। সেদিন এখানে ছিল রামকৃষ্ণ উৎসব। বেশী টাকা খরচ ক'রে একটি মনোরম পুষ্পস্তবক আমি কিনে নিয়েছিলাম। স্বামীজী তখন ভজনালয়ের বেদীর কাছে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে রয়েছেন, আমি সোৎসাহে তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে স্তবকটি দেখিয়ে বললাম, 'স্বামীজী, দেখুন কি চমৎকার আমার এই পুষ্পার্ঘ, আপনি কি এটি পছন্দ করছেন না?' মুহূর্তে স্বামীজী তাঁর মুখটি ঘুরিয়ে নিলেন, একটি কথাও আমায় বললেন না, মনোরম পুষ্পগুচ্ছটি সম্পর্কেও করলেন না সামান্যতম মন্তব্য। আমি স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। কখনো তো এমন রূঢ় আচরণ স্বামীজী আমাদের সঙ্গে করেন না। শুধু তাই না, তাঁর মতো এমন ভদ্র ও কোমল আচরণ খুব কম লোকেরই আমরা দেখতে পাই। তবে কেন এমনটি আজ করলেন? আমি অন্তরে তীব্র আঘাত পেলাম, বিভ্রান্ত এবং হতবুদ্ধি হয়ে পড়লাম। সমিতির ভবন ত্যাগ করার আগে স্বামীজীকে এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করলাম আমি, কিন্তু তিনি তা এড়িয়ে একপাশে সরে পড়লেন।

"আমি সব ব্যাপারই বেশ তলিয়ে দেখতে চাই, এটা আমার চিরদিনের অভ্যাস। কয়েক দিন পরে আবার স্বামীজীকে আমি

১ স্বামী অভেদানন্দ ইন্ আমেরিকা (অ্যান্ অ্যাপোসল্ অব্ মনিজম্): সিস্টার শিবানী

চেপে ধরলাম। বললাম, 'সেদিন আপনি নিশ্চয়ই ঐ রূঢ় আচরণের মধ্য দিয়ে আমায় কোনো শিক্ষা দিতে চেয়েছেন। কি সে শিক্ষা তা আমায় খুলে বলুন।' উত্তরে তিনি শুধু বললেন, 'সেদিন ঐ ফুলের গুচ্ছটি কি তুমি আমার জন্য এনেছিলে, না আমার শ্রদ্ধেয় গুরুদেবের জন্য এনেছিলে?'"

মিসেস কেপ তৎক্ষণাৎ এ কথার তাৎপর্য বুঝিয়া নিলেন। যে পুষ্পার্ঘ প্রভু শ্রীরামকৃষ্ণের জন্য আনা হইয়াছে, তাহা দিয়া প্রভুর দাস অভেদানন্দের মন ভুলাইবার চেষ্টা তাঁহার পক্ষে সমীচীন হয় নাই।

সিস্টার শিবানীর কথিত আর একটি ঘটনায় অভেদানন্দের পুরুষ-সিংহ মূর্তিটির পরিচয় পাই। "সেদিন আশ্রমের লাইব্রেরীতে বসে কাজ করছেন আমাদের প্রিয়দর্শিনী সেক্রেটারী এবং অপর একজন ছাত্রী। হাউসকীপার এ সময়ে একটি অপরিচিত ব্যক্তিকে সেই কক্ষে নিয়ে এল। আশ্রম সম্বন্ধে দু'চারটি প্রশ্ন করার পরই লোকটি নেমে এল ব্যক্তিগত স্তরে। উচ্চ স্বরে শুরু করল স্বামীজী সম্পর্কে অপমান পূর্বক মন্তব্য এবং গালিগালাজ। জানতে চাইল, কেন এই সব কৃষ্ণকায় হিন্দুদের সঙ্গে পাশ্চাত্য দেশের ভদ্রমহিলারা সামাজিকভাবে মেলামেশা করছেন?

"লাইব্রেরীতে উপবিষ্ট মহিলাদ্বয় উত্তেজিত স্বরে ঐ লোকটির কথার প্রতিবাদ জানাচ্ছিলেন। এমন সময়ে সিঁড়িতে শোনা গেল ভারী জুতোর পদধ্বনি। মুহূর্ত মধ্যে দেখা গেল, স্বামীজী ঐ অপরিচিত অভদ্র লোকটিকে সবলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন বাইরে। সিঁড়ির ওপারে রাস্তার ধারে পড়ে রয়েছে তাঁর দেহ। প্রয়োজন-বোধে স্বামীজীকে নির্দ্বিধায় এ ধরনের বীর্যবত্তা প্রকাশ করতে দেখেছি। এবং তখন কেউ তাঁর গতিরোধ বা প্রতিবাদ করতে সাহসী হতো না। এই ঘটনার কথা আশ্রম মণ্ডলীতে অচিরে ছড়িয়ে পড়ল। ভক্তেরা সবাই আনন্দিত হল এ ঘটনার কথা শুনে, স্বামীজীর প্রতি আস্থা তাদের বহুগুণ বেড়ে গেল, তাঁর ভাবমূর্তি আরো প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠল। গুরু হিসাবে এবং সামাজিক ব্যক্তি

হিসাবে স্বামী অভেদানন্দর জুড়ি নেই, এ উপলব্ধিটি সেদিন এসে গেল অনেকেরই মনে।”

সিস্টার শিবানী বলিয়াছেন, “স্বামী অভেদানন্দের যোগশক্তি, রোগনিরাময়ের শক্তি সম্পর্কে অনেকেরই আস্থা ছিল। কিন্তু স্বামীজী নিজে কখনো এ সম্বন্ধে হাঁ বা না, কিছুই বলিতেন না। আমার কাছে সব চাইতে বিস্ময়কর মনে হয়েছে স্বামীজীর একটি যোগবিভূতির প্রয়োগ। আশ্রমের এক ছাত্রীর তরুণী বোনটির মাথা খারাপ হয়ে যায়। আশ্রমে প্রায়ই সে আনাগোনা করতো, স্বামীজীর সঙ্গেও তার বেশ জানাশুনা ছিল। ঐ রুগ্না মেয়েটিকে উন্মাদ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল এবং ডাক্তারেরা শেষটায় বলে দিলেন, চিকিৎসায় আর কোনো ফল হবে না।

“এবার ঐ পাগল মেয়েটির দিদি, আমাদের আশ্রমের ছাত্রীটি শরণ নিল স্বামী অভেদানন্দের। বলল, ‘আপনি মহাত্মা, আপনার যোগশক্তির ওপর আমার অগাধ বিশ্বাস। আমার বোনের উন্মাদ-রোগ ভালো করুন, তাকে বাঁচিয়ে তুলুন।’ অভেদানন্দ যতই বলেন, তিনি যোগী নন, যোগবলে রোগ আরোগ্য করার পদ্ধতি তিনি জানেন না, ছাত্রীটি ততই হয় নাছোড়বান্দা, অবশেষে তাকে সেখান থেকে সরাতে না পেরে স্বামীজী বললেন, ‘আচ্ছা, তুমি তিন দিন পরে আমার কাছে এসো, তখন আমি তোমার এ প্রার্থনার জবাব দেবো।’

“ছাত্রীটি তাই করল, তিন দিন পরে উপস্থিত হল আশ্রমে। অভেদানন্দ তাঁর সঙ্গে চলে গেলেন সেই উন্মাদাগারে। সেখানে গিয়ে রোগিণীর পাশে প্রশান্ত বদনে তিনি উপবিষ্ট হলেন, স্নেহভরে তার হাতটি ধরে রইলেন, আর মাঝে মাঝে দু একটি টোকা দিতে থাকলেন। কথা কিন্তু তিনি বেশী বললেন না, বেশীর ভাগ সময়ই রইলেন অন্তর্লীন অবস্থায়, কোনো চাঞ্চল্যকর ম্যাজিকের ব্যাপার নেই, হৈ-চৈ নেই। প্রশান্ত ও নির্বিকারভাবে বসে একান্তভাবে শুধু তিনি তাকিয়ে রইলেন খানিকটা সময়।

"এর কয়েকদিন পরেই উন্মাদ মেয়েটি আরোগ্য লাভ করল, শুধু তাই নয়, হাসপাতাল থেকে ডাক্তারেরা সানন্দে তাকে ছেড়ে দিল। তখন সে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসেছে, মনের বল ও আস্থা বিস্ময়করূপে আবার ফিরে পেয়েছে। কৃতজ্ঞ ছাত্রীটি তার বোনের এই আরোগ্য লাভের পর স্বামীজীর কাছে এসে উপস্থিত হয় তাঁকে কিছু অর্থ ও সোনা গয়না ভেটস্বরূপ দিতে। তার কথা শুনে দৃঢ়স্বরে স্বামী অভেদানন্দ বলে ওঠেন, সত্য কখনো বিক্রি করা যায় না, তা কেনাও যায় না। এক্ষেত্রে আমি কিছুই কার নি। আসলে রোগমুক্তি সম্পর্কে যা কিছু করবার করেছেন আমার পরম কৃপালু গুরুদেব।"

আর একটি কাহিনীও পাওয়া যায় সিস্টার শিবানীর লেখায়। তাঁহার এক নিকট আত্মীয়ের একজন তরুণী বান্ধবী ছিল। এই মেয়েটি কিরূপে অলৌকিকভাবে অভেদানন্দের কৃপাপ্রাপ্ত হয় তাঁহার বর্ণনা দিয়াছেন সিস্টার শিবানী। "মেয়েটি সেদিন তার অফিসে মধ্যাহ্ন ভোজনের সময় অতর্কিতে একটা প্রচণ্ড মানসিক আঘাতে মুষড়ে পড়ে এবং আমার বাসকক্ষে ছুটে চলে আসে। আমি তখন বাহিরে ছিলাম। আমার অবর্তমানে মেয়েটি সেখানে আত্মহত্যার চেষ্টা করে এবং আমাদের হাউসকীপারের সাবধানতার ফলে তার সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। তারপর আমি ঘরে ফিরে আসি এবং সারা বিকেল বেলাটা মেয়েটির ঝঞ্ঝাট আমাদের পোহাতে হয়।

"মেয়েটি স্বামীজীর কথা আমাদের কাছে আগে শুনেছিল। সন্ধ্যেবেলায় নিজেই বললে, স্বামীজীর বক্তৃতা শুনতে সে আশ্রমে যাবে। নির্ধারিত সময়ে আমরা সবাই হলঘরে উপস্থিত হলাম। আশ্চর্যের কথা, বক্তৃতা প্রসঙ্গে স্বামী অভেদানন্দ হঠাৎ বলা শুরু করলেন আত্মহত্যার প্রবণতার কথা। বললেন, এই প্রবণতার ফল মানুষের দেহ আত্মার পক্ষে বিপর্যয়কর। এই প্রবণতায় যারা ভুগছে তাদের নানা রকমের আশা ও আশ্বাসের বাণীও তিনি এসময়ে শোনালেন।

"বক্তৃতা শোনার পর আমাদের ঐ মানসিক দৌর্বল্যের রোগীটি বলে উঠল, সে স্বামীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে। সাক্ষাতের সময় সে স্বামীজীকে কৃতজ্ঞতার সুরে ধন্যবাদ জানালেন, তাঁকে খুলে বলল নিজের মানসিক দুরবস্থার কথা। খুব আশ্চর্যের কথা, স্বামী অভেদানন্দের সঙ্গে দেখা করার তিন সপ্তাহের মধ্যে ঐ মেয়েটি সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হয়ে উঠল। এবার কেউ যদি আমায় প্রশ্ন করে, কি ক'রে স্বামীজী সেদিন ঐ মেয়েটির মনের সংকটের কথা জানতে পেরেছিলেন, কেনই বা আত্মহত্যার প্রসঙ্গ তুলে আশ্বাসবাণী উচ্চারণ করেছিলেন, তার উত্তরে আমি বলবো, স্বামীজী যথার্থই ছিলেন একজন অন্তর্যামী মহাপুরুষ।"

আমেরিকায় প্রায় পঁচিশ বৎসরকাল অভেদানন্দ অবস্থান করেন এবং ঐ সময়ের মধ্যে সতেরবার তাঁহাকে আটলাণ্টিক মহাসাগর অতিক্রম করিতে হয়। এই দীর্ঘ সময়ের অক্লান্ত একনিষ্ঠ কর্মসাধনার ফলে আমেরিকায় স্বামী বিবেকানন্দের ঈপ্সিত কর্ম তিনি উদ্‌যাপন করেন। বেদান্তের বাণী আমেরিকায় ও বিশ্বের অগ্রসর দেশগুলিতে ধীরে ধীরে ছড়াইয়া পড়ে। এই সময়ের মধ্যে আমেরিকার বেদান্ত সমিতিও সুসম্বদ্ধ রূপে সংগঠিত হইয়া উঠে।

এবার অভেদানন্দ সংকল্প করেন জন্মভূমি ভারতে প্রত্যাবর্তনের জন্য। জাপান, চীন ও দূর প্রাচ্যের বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে তিনি কলিকাতায় উপনীত হন।

আমেরিকায় থাকিতে অভেদানন্দ রুশ পর্যটক নিকোলাস নটোভিচের রচিত 'দ্য আননোন্ লাইফ অব জেসাস্ খ্রাইস্ট', পাঠ করিয়াছিলেন, নটোভিচ তাঁহার এ বইয়ে তিব্বতের হিমিস মঠে রক্ষিত একটি পুঁথির বিবরণ উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাহাতে যীশুখ্রীষ্টের তিব্বত ও ভারতে আসার বিবরণ আছে। তত্ত্ব ও তথ্য সম্পর্কে অভেদানন্দের কৌতূহল ও গবেষণা-নিষ্ঠা ছিল অসাধারণ। তাই ভারতে ফিরিয়া তিনি তিব্বতে উপস্থিত হন এবং হিমিস মঠে গিয়া প্রধান লামার নিকট হইতে নটোভিচ প্রদত্ত তথ্যাদি সম্বন্ধে নানা

অনুসন্ধান করেন। সেই অনুসন্ধানের চাঞ্চল্যকর তথ্য তিনি তাঁহার 'কাশ্মীর ও তিব্বতে' নামক গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন।

১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার নিজস্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী অদ্বৈতবাদ ও রামকৃষ্ণতত্ত্ব প্রচারে অভেদানন্দ আগ্রহী হন। তদনুসারে কলিকাতায় ও দার্জিলিং-এ রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ তিনি প্রতিষ্ঠা করেন। তখন হইতে নূতন প্রতিষ্ঠানটিকে কেন্দ্র করিয়াই তাঁহার জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি অতিবাহিত হইতে থাকে।[১]

কলিকাতায় ও দার্জিলিং-এর মঠ ভবনে বহু মুমুক্ষু ভক্ত, বহু দেশনেতা ও কর্মী তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতেন। কর্মযোগ, মনীষা ও তত্ত্বজ্ঞানের মিলিত মূর্ত বিগ্রহ এই মহাপুরুষের বাণী ও পূত চরিত্র তাঁহাদের জীবনে জাগাইয়া তুলিত আত্মিক সাধনার প্রেরণা।

আচার্য হিসাবে স্বামী অভেদানন্দ ছিলেন এক অসামান্য দিক্-দিশারী, প্রাচ্যে ও প্রতীচ্যে বহু ভাগ্যবান্ ভক্ত সাধক তাঁহার সান্নিধ্যে আসিয়াছেন, তাঁহার অমৃতোপম উপদেশ শ্রবণ করিয়া নিজেদের জীবন গড়িয়া তুলিয়াছেন।

ব্রহ্মানন্দ ও ব্রহ্মসাক্ষাৎকার সম্পর্কে তিনি একদিন বলিলেন, "ব্রহ্মানন্দে ছোট ছোট সমস্ত সুখই অন্তর্নিহিত আছে, আর ছোট ছোট সুখ সমস্ত এই ব্রহ্মানন্দের এক এক কণা মাত্র। বৃহদারণ্যকে আছে—এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি। যারা এই ব্রহ্মানন্দের আস্বাদ পেয়েছে তারা টুকরো টুকরো আনন্দ চায় না। তারা আনন্দময় হয়ে আছে। সংসারসুখের অভাববোধ কখনো তাদের হয় না। ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারের পর এ সংসার তুচ্ছ হয়ে যায়।

১ অজস্র সংখ্যক বক্তৃতাদানের সঙ্গে সঙ্গে স্বামী অভেদানন্দ বহুতর গ্রন্থও রচনা করিয়াছেন। তাঁহার সংগঠিত রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ হইতে স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের ব্যবস্থাপনায় তাঁহার রচনাবলী ' প্রকাশিত হইয়াছে। অভেদানন্দজীর প্রবর্তিত বিশ্ববাণী পত্রিকা এই মঠের মুখপত্র।

আর এ সুখ তো ক্ষণস্থায়ী। একটু বিচার করলে দুঃখই তো বেশী দেখা যায়।

অপরদিকে ব্রহ্মবিৎ পুরুষের সুখ নিত্য। তিনি যে আনন্দ উপভোগ করেন তা নিরপেক্ষ, অর্থাৎ অন্য কোনো জিনিসের অপেক্ষা করে না।

গীতার 'কর্মণ্যেবাধিকারাস্তে মা ফলেষু কদাচন' শ্লোকটি নিয়া আলোচনা চলিতেছিল। এ প্রসঙ্গে তিনি বলিলেন, "ঈশ্বর ঈশ্বর করছ; কে ঈশ্বর? আকাশে কি বসে আছেন? তাঁকে কি ক'রে সেবা করবে? এই সমস্ত মনুষ্য সমষ্টির মধ্যে তাঁকে দেখ। তাকে বলা হয় বিরাট পুরুষ। এইভাবে তোমার সংসারে স্ত্রী-পুত্রের ভিতর, পাড়াপ্রতিবেশীর ভিতর—নমঃশূদ্র, চণ্ডাল, ব্রাহ্মণ এই সবার ভিতর যে নারায়ণ আছেন তাকে দেখ। আর এই ঈশ্বরবুদ্ধি ক'রে নাম যশ কি স্বার্থসিদ্ধি কিছুর দিকে লক্ষ্য না রেখে তাদের দুঃখে কাতর হয়ে তাদের সেবা ক'রে যাও।

"তোমরা কি মনে কর—যে কাজ তোমরা করছ ভগবান্ অমনি তা বসে বসে লিখছেন আর তাই খতিয়ে খতিয়ে তিনি ফল ঢেলে দিচ্ছেন? তা নয়। তাঁর সব কিছুর আইন আছে। তিনি নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত। নিত্য কি—না অনাদি অনন্ত। শুদ্ধ অর্থাৎ তাতে কিছুমাত্র মলিনতা নেই। তারপর তিনি জ্ঞান-চৈতন্যস্বরূপ। তা ভগবান্ লাভ করতে হলে আমাদের সেই অবস্থা পেতে হবে। যেটা অনিত্য, অশুদ্ধ, অজ্ঞান কি বন্ধন, তা ত্যাগ করতে হবে। প্রতিদিন রাত্রিবেলা ভালোই হোক আর মন্দই হোক, পাপ পুণ্য সব ভগবানেই অর্পণ করবে। ঠাকুর একটি ফুল নিয়ে মা'র পায়ে দিয়ে বললেন—'মা, এই নে তোর পাপ, এই নে তোর পুণ্যি; এই নে তোর অবিদ্যে; এই নে তোর ভালো, এই নে তোর মন্দ; আমায় শুদ্ধা ভক্তি দে।' উপাসনার এই আদর্শ। ভগবানের চোখে ভালোমন্দ নেই। এই ধর আগুন। এতে যেমন রান্নাও হয়, শীতকালে বেশ গা গরমও রাখে। আবার ছেলেটি হয়তো পুড়ে

গেল কি সর্বস্বান্ত হয়ে গেল, তখন বললে—ঈশ্বরের অভিশাপ। স্বার্থের হানি হলেই আমাদের মনে মন্দ হল। তা বলে আগুনের কি দোষ আছে, বলতো? এই ধর বিদ্যুৎ। দিব্যি ট্রাম চলছে, কিন্তু তার ছিঁড়ে মাথায় পড়লেই মন্দ হয়ে গেল। একই জিনিস ভালো মন্দ দুই-ই। তা ভালোটা নিতে গেলে মন্দটাও নিতে হবে।' "সর্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ।" আগুন জ্বাললে ধোঁয়াটাও নিতে হবে বৈ কি। অ্যাব্‌সোল্যুট্ গুড্ বা নিছক ভালো এখানে নেই। মনে করতে হবে, এ সংসার ভগবানের। 'আমি আমার' বললেই ফলভোগ। বাসনাবর্জিত হয়ে কাজ করা অভ্যাস করতে হবে[১]।"

আর একদিন স্বামীজী বুঝাইতেছিলেন, দেহের ভোগেচ্ছা ছাড়িয়া ব্রহ্মানন্দের দিকে মনকে চালিত করিতে হয়, এজন্য দেহ হইতে আত্মাকে পৃথক বলিয়া ভাবার অভ্যাস করা দরকার। এ প্রসঙ্গে বলিলেন, "দেহ থেকে আত্মাকে আলাদা ক'রে নিলে বাহ্যজ্ঞান শূন্য হয়ে যেতে হয়। এ আমরা ঠাকুরের হতে দেখেছি। চোখ হয়তো খোলা আছে তাতে আঙুল দিলেও পাতা নড়ে না। মন নিশ্চল হলেই শরীর জড় হয়ে গেল। এই যে সব ব্যাপার, এ ঠাকুর দেখিয়ে শেখালেন—ব্যাখ্যা করেন নি। প্রত্যক্ষ দেখেছি হাত অসাড় হয়ে গেছে—সব যেন স্টিফ্, অনড়। কি কঠোর তপস্যাই না তিনি করেছিলেন। সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত খাওয়া দাওয়া নেই, স্থিরভাবে সূর্যের দিকে তাকিয়ে থাকতেন। এই রকম কত সাধনই তিনি করেছিলেন।

"ক্রমে ক্রমে এমন অবস্থা হয়ে গেল যে দিনরাতই ভাবের ঘোরে থাকতেন। তখন এক সাধু তাঁকে রুল দিয়ে খুব মেরে মেরে একটু জ্ঞান করাতো। আর সেই অবসরে হৃদয় জোর ক'রে কিছু খাইয়ে দিত। আঘাত বন্ধ হলেই আবার তাঁর সেই অবস্থা। সে যে কী—বারো বছর তিনি ঘুমান নি, চোখের পাতা পড়ে নি। এ

১ মহারাজের কথা: চিৎস্বরূপানন্দ

অবস্থায় খুব কম সাধকই যেতে পারে। পরে তিনি বলতেন, 'ওরে, সে একটা ঝড় ব'য়ে গেছে। দিগ্বিদিক জ্ঞান ছিল না।' তখন আমরা বুঝতে পারতুম না—অবাক হয়ে থাকতুম। এখন সব বুঝতে পারছি। দেহ থেকে আত্মা একেবারে আলাদা ক'রে ফেলেছিলেন, তাই এই বিদেহ অবস্থাতেও যাঁদের দেহ থাকে এমন মহাপুরুষ খুব কম।"

প্রণব তত্ত্বের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া অভেদানন্দ সোৎসাহে বলিতেন, তস্য বাচকঃ প্রণবঃ—যত নাম তুমি চিন্তা করতে পার, যা-ই কিছু পড় বা শোন, বিষ্ণুর সহস্র নামই হোক বা শিবের লক্ষ নামই বল না কেন—সবই ওই এক প্রণবেতে আছে। এই হচ্ছে যথার্থ তত্ত্ব। মাণ্ডুক্য উপনিষদ্ তো ওঙ্কারেরই ব্যাখ্যা। অকার জাগ্রত অবস্থা, উকার স্বপ্নাবস্থা, মকার সুষুপ্তি এবং নাদ তুরীয় অবস্থা। কণ্ঠ, তালু প্রভৃতি শব্দের এক একটি স্থান। 'অ'-এর কণ্ঠ থেকে উৎপত্তি। এর উচ্চারণে কোনো খিচ্ নেই, বেশ সরল। 'অ'-কারই বেদের মূল। 'ম' শেষ বর্গীয় বর্ণ, ওষ্ঠদ্বয় বন্ধ ক'রে উচ্চারণ করতে হয়, আর 'উ' মাঝামাঝি। তা তুমি যত রকম শব্দই উচ্চারণ কর না কেন সব এই এক ওঙ্কারেই আছে। খ্রীষ্টানেরা প্রার্থনার শেষে যে 'আমেন' বলে সে এরই অপভ্রংশ।'

"তজ্জপস্তদর্থভাবনম্। এই ওঙ্কার জপ করতে হবে। পাথরেও এক এক ফোঁটা জল ক্রমাগত পড়লে এ একটা জায়গা ঠিক ক'রে নেবে। সেই রকম ক্রমাগত এক চিন্তা করতে হবে। মন অন্য জায়গায় গেলে হবে না। হাতে হরিনামের মালা ওদিকে কার সর্বনাশ করবে মনে ভাবছে—এতে কিছুই হবে না। আর জপের সঙ্গে সঙ্গে তার অর্থ চিন্তা করতে হবে। এতে মনের মলিনতা, কলুষ প্রভৃতি দূর হয়ে যাবে—চিত্ত শুদ্ধ হবে। সংসারী মন বড় পাজী। তাই ভগবান্ কি শুধু ফুল মধু ছড়িয়ে শিক্ষা দেন? তা নয়। মাথায় ঘা দিয়েও শিক্ষা দিয়ে থাকেন। আত্মীয় স্বজনের মৃত্যু—এই রকম বারে বারে কত ঘা খেয়ে মনের শিক্ষা হচ্ছে।

সংসারীর দিক থেকে এসব মহা অশান্তির কারণ বলে মনে হলেও ভগবানের দিক থেকে এ যথার্থ কল্যাণকর। তাই তো কুন্তী বলেছিলেন—হে ভগবান্, আমায় দুঃখ দাও। বল দিখিনি এভাবে প্রার্থনা জগতে আর কে করতে পারে? ওই যে আছে না—যে করে আমার আমার আশ, আমি করি তার সর্বনাশ। সব শ্মশান হয়ে গেলে মন নিরালম্ব হয়—আর তখনই ভগবান্ আসেন।"

আর একদিন ভক্তদের বলিতেছিলেন,[১] "ব্রহ্ম বা ভগবান্ জ্ঞানস্বরূপ। তুমিও তাই। জ্ঞান স্বতঃপ্রকাশ। জ্ঞান তার প্রকাশের জন্য অন্য কিছু সাহায্যের অপেক্ষা রাখে না। আলোকে জানার জন্য আর আলোর দরকার হয় না। তাই সাধন-ভজন ক'রে যেতে হয়, কবে জ্ঞান লাভ করবে ঐ রকম ক'রে খতিয়ে দেখতে নেই। সাধন-ভজন তো আর আলু বেগুনের ব্যবসা নয় যে খতিয়ে দেখবে লাভ হল— কি লোকসান হল।

"সাধনভজনের বেলায় লাভ লোকসান যদি হয় তো তা একমাত্র সাধকের নিজের দোষের বা গুণের জন্য হয়। নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সঙ্গে চেষ্টা করলে সিদ্ধিলাভ নিশ্চয়ই হবে, আর লোক দেখানো জপ-ধ্যান করতো নিজে ফাঁকিতে পড়বে। আসলে সাধন-ভজন ক'রে যেতে হয়, আর চিন্তা করতে হয়, কতটুকু আন্তরিকতার সঙ্গে করছ, কতটুকু তোমার মন উদার ও সংস্কারমুক্ত হয়েছে, পরের দোষদর্শন না ক'রে কতটুকু সকলের গুণের দিকে তোমার দৃষ্টি যাচ্ছে, নিজেকে যেমন ভালোবাস তেমনি কতটুকু অপর সকলকে তুমি ভালোবাস, কতটুকু স্বার্থবুদ্ধি ও কামভাব তোমার ভেতর থেকে দূর হয়ে গেছে—এই সব। এগুলোই তো খতিয়ে দেখার এবং বিচার করার জিনিস। নইলে সাধন-ভজনও করছ, আর মনের মধ্যে কুসংস্কারগুলোকে জাগিয়েও রাখছ, এতে কিছু হবে না।

"তাই সাধন-ভজন করার সময় একান্তই যদি জানতে চাও যে কবে তোমার সিদ্ধিলাভ হবে, তা হলে একথাই মনে রাখবে যে,

১ মন ও মানুষ : স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

মনের সকল সংস্কার যেদিন দূর হবে সে'দিনই তোমার সিদ্ধিলাভ হবে। মনে সংকীর্ণতা থাকবে আর ভগবান্ লাভ করবে—এতো আর হয় না। শঙ্করাচার্য ঠিক এ ধরনের কথাই বলেছেন যে, জ্ঞানলাভ করা মানে অজ্ঞান দূর করা। আলোর প্রকাশ চিরকালই আছে, অজ্ঞান-রূপ আবরণের জন্যই অন্ধকার। তাই অন্ধকার দূর করার জন্য যেমন আলোর দরকার, অজ্ঞান দূর করার জন্য তেমনি সাধন-ভজন অর্থাৎ আত্মতত্ত্ব বিচার দরকার। ব্রহ্মজ্ঞান সর্বদাই আছে, সুতরাং তাকে সাধন-ভজন দিয়ে আর কি লাভ করবে বলো? যা নেই তাকে পাবার জন্যই চেষ্টা, কিন্তু যা সর্বদাই আছে তাকে পাবার জন্য কি আর চেষ্টা করবে, বলো? অজ্ঞান নাশের সঙ্গে সঙ্গেই জ্ঞানের প্রকাশ হয়।"

তরুণ ভক্ত সাধকেরা নিবিষ্ট হইয়া তাঁহার কথা শুনিতেছিলেন, তাঁহারা কহিলেন, "ওসবের ধারণা করা বড় শক্ত মহারাজ।"

উত্তর হইল, "এসবের ঠিক ঠিক ধারণা করতে গেলে চাবিকাটি দরকার।"

'এই চাবিকাঠিটি কি?'—এ প্রশ্নের উত্তরে অভেদানন্দজী কহিলেন, "ঐকান্তিকতা একনিষ্ঠা ভক্তি বিশ্বাস ব্যাকুলতা এ'গুলোই চাবিকাটি। উদ্দেশ্যের প্রতি মনের একমুখিতা থাকা চাই। তোমার মন কেবল ইষ্টকেই চাইবে দুনিয়ার আর কিছু চাইবে না। পার্থিব সব কিছু পড়ে থাকবে মনের বাইরে, তোমার মন থাকবে আত্মনিষ্ঠ হ'য়ে। মনের তখন আর আলাদা অস্তিত্ব কিছুই থাকবে না। মনকে এই আত্মনিষ্ঠ বা ব্রহ্মাবগাহী করার কৌশল জানার নামই চাবিকাঠি। 'গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং বরেণ্যং—আত্মা হৃদয়গুহায় অবরুদ্ধ কি—না লুকিয়ে আছেন। সেই গুহার দরজা খুলতে গেলে এই চাবিকাটি চাই।"

ঈশ্বরপ্রেম ও ঈশ্বরভাবনা কি করিয়া আত্মজ্ঞান ও অদ্বৈতবোধে প্রতিষ্ঠিত হয় তাহার একটি উদাহরণ অভেদানন্দজী প্রায়ই দিতেন। বলিতেন: "একজন সুফী তার বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে দরজায় আঘাত

করলে। ভেতর থেকে প্রশ্ন এল, 'বাইরে কে?' সুফী বললে, 'আমি তোমার বন্ধু।' বন্ধু গম্ভীরভাবে উত্তর দিলে, 'যাও বন্ধু, আমার টেবিলে দু'জনের স্থান হবে না।' সুফী বন্ধু তখন মনে গভীর দুঃখ নিয়ে ফিরতে বাধ্য হল, কিন্তু বিরহের আগুন তার হৃদয়কে পুড়িয়ে দিচ্ছিল। সে তাই ফিরল, ভয় ও শ্রদ্ধা নিয়ে তার বন্ধুর দ্বারে এসে আবার আঘাত করলে। ভেতর থেকে আগের মতোই উত্তর এল, 'বাইরে কে?' এবার সুফী বন্ধু উত্তর দিলে, 'হে প্রিয়তম, তুমি।' তখন দরজা খুলে গেল ও তার বন্ধু বললে, 'তোমার আমিত্ব যখন ঘুচে গেছে তখন ভেতরে এসো, কেন না আমার ঘরে দুজন আমির স্থান নেই।'

একদিন মন সম্পর্কে ভক্ত সাধকদের কহিলেন, "মানুষের মন আর কি না পারে বলো। মন এত বলীয়ান্ কেন? তার পিছনে সর্বশক্তিময় আত্মা আছেন বলে? চন্দ্র যেমন সূর্যের কাছ থেকে আলো ধার ক'রে জ্যোতিষ্মান্, মনও তেমনি। নইলে মন তো আসলে জড় একটা যন্ত্র, আত্মচৈতন্য তার পিছনে থেকে তাকে নিয়ন্ত্রণ করে বলেই সে কাজ করে। মন সব কিছু করে মানে আত্মাই মনকে প্রেরণা দেয়। মন তাই মাধ্যম বা যন্ত্র। কিন্তু আত্মাতে কোনো কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব প্রভৃতি গুণ বা অভিমান নেই, অথচ 'তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি', তাঁরই আলোকে দুনিয়ার সব কিছু আলোকিত। জীবজন্তু সবই তাঁর কাছ থেকে শক্তি ও প্রেরণা পেয়ে কাজ করে। দেদীপ্যমান সূর্য সকলের ওপর সমান ভাবে কিরণ দেয়। পক্ষপাতিত্ব তাতে কিছুমাত্র নেই। সূর্য কিরণ না দিলে আলোর অস্তিত্ব থাকতো না। আগুনই কি পেতে? আত্মাও তেমনি। মন আত্মার দ্বারী, সাধারণ লোক কিন্তু মনকেই কর্তা ভাবে, আর তখনি সে মনের বশীভূত হয় ও সৃষ্টি হয় যত কিছু

"সাধনা মানেই মনের 'অহং' কর্তৃত্বাভিমানকে নষ্ট করা, মনকে বুঝিয়ে দেওয়া যে, তুমি কর্তা নও, কর্তা হলেন শরীরী আত্মা—যিনি

শরীরে আছেন আবার জগতের সর্বত্র আছেন। যখন এই রকম ভাবতে পারবে তখনি তোমার মন বশীভূত হবে, তুমি মনের পারে যাবে। মনই মুক্তির অন্তরায়, আবার মনই মুক্তির সহায়ক। অন্তরায়—কেননা মনই কর্তা সেজে নিজে আত্মা থেকে পৃথক এ কথা মানুষকে জানিয়ে দেয়, আর সহায়ক—কেন না মনই—বুদ্ধিরূপে আত্মাকে জানিয়ে দেয়। বুদ্ধিবৃত্তিতে ব্রহ্মচৈতন্য প্রতিবিম্বিত হন, আর তাতে ক'রে বৃত্তির মধ্যে যে অজ্ঞান তা' নষ্ট হয়ে জ্ঞান স্বতঃ প্রকাশিত হয়। এই জ্ঞানই শুদ্ধজ্ঞান বা আত্মজ্ঞান—ইংরেজীতে যাকে বলে, সেল্‌ফ নলেজ বা গড্‌কনশাসনেস্‌। শ্রীশ্রীঠাকুর এই কথাকেই একটু ভিন্নভাবে বলেছেন। তিনি বলেছেন, মহামায়া অন্তঃপুর পর্যন্ত যেতে পারেন না, তিনি ব্রহ্মকে দূর থেকে দেখিয়ে দিয়ে অদৃশ্য হন। এই দেখিয়ে দেওয়ার কৃতিত্ব কিন্তু মনের, অর্থাৎ বুদ্ধির, মন বা বুদ্ধিই আবার মায়া বা মহামায়া। মহামায়ার সঙ্গে ব্রহ্মের ভেদ কেবল পার্থিব দৃষ্টিতে, পারমার্থিক দৃষ্টিতে দুই-ই এক[১]।"

ভক্তেরা প্রশ্ন করেন, "মহারাজ, শ্রীশ্রীঠাকুর বলেছেন মন প্রসন্ন হলে তা আত্মজ্ঞানও দিতে পারে। ব্রহ্ম মন-বুদ্ধির অগোচর, কিন্তু শুদ্ধ মনের গোচর, তাই কি?"

অভেদানন্দজী উত্তর দেন, "হ্যাঁ, তাই বৈ কি। মন প্রসন্ন হওয়া মানে মন শুদ্ধ হওয়া। মনের সংকল্প-বিকল্প বৃত্তি-দুটো চলে গেলেই মন শুদ্ধ হয়। সাধকের মন শুদ্ধ হলে আর মন থাকে না; তখন তা শুদ্ধচৈতন্যরূপে প্রতিভাত হয়। এটাকেই ভিন্নভাবে বলা হয়েছে যে, মন প্রসন্ন হ'লে তা-ই আত্মজ্ঞান দিতে পারে। একই কথা।"

অভেদানন্দজীর সকল কিছু তত্ত্ব উপদেশের মধ্যে জ্ঞানচর্চা ও আত্মজ্ঞান লাভের কথা শুনা যায়। কিন্তু তাঁহার সব কিছু বক্তব্যের পশ্চাৎপটে রহিয়াছে, মানবপ্রেম, জীবের জন্য অফুরন্ত ভালোবাসা।

"তিনি বলিতেন, এ যুগে বিবেকানন্দই জ্ঞানচর্চার জন্যে চেষ্টা করেছিলেন। দেশ অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছে এখন বেদান্ত উপনিষদের

১ মন ও মানুষ: স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

চর্চা চাই। আত্মজ্ঞান লাভ করতে হবে। তবেই মৃত্যুভয় থাকবে না—জগৎকে ভালোবাসতে পারবে। তা নয় খালি নিজে নিজের বউটি আর ছেলেটি। দুনিয়া ডুবুক আমার কি? এর ওষুধ হচ্ছে ভালোবাসা—তোমার নিজের মতো ক'রে ভালোবাসো তোমার প্রতিবেশীকে—এই ভালোবাসা এখন সন্ন্যাসীদের ভিতরেও নেই। তাই তো বেদান্ত চর্চা করতে হবে—গাছতলায় ব'সে নয়। এবং এ শুধু সন্ন্যাসীদের জন্যেও নয়। বাড়িতে, স্ত্রীপুত্রের ভিতর, পাড়া-প্রতিবেশীর মধ্যে প্রচার করতে হবে। প্রত্যেক মা প্রত্যেক ছেলেকে এই শেখাবে, তবে আমাদের দেশের মঙ্গল হবে।

ভক্তপ্রবর চিৎস্বরূপানন্দের মতে, অভেদানন্দের চরিত্রের ভিত্তি হইতেছে তাঁহার অপার মানবপ্রেম। এই দৃষ্টিকোণ হইতে স্বামীজীর মূল্যায়ন করিতে গিয়া তিনি বলিয়াছেন: এই মনীষা, এই প্রতিভা, এই সাহস, এই ক্ষুরধার বিচারবুদ্ধি, সুনিবিড় দার্শনিকতা, সুগভীর জ্ঞান যা তাঁর জীবনে সুনিহিত, সুবিহিত, সুষমাযুক্ত ঐক্যে পুষ্পিত হয়েছিল, এসবের উপরেও তাঁর চরিত্রের যে পরম মাধুর্য ছিল সেটি হচ্ছে তাঁর আশ্চর্য সরলতা, আর অকারণে সবাইকে ভালোবাসা। আজ যখন সে সব কথা ভাবি তখন মনে হয় তিনি যে কি ছিলেন তা জানি না। কেবল জানি, আমাদের সঙ্গে তাঁর ছিল একটি গভীর অন্তরের টান। তিনি ছিলেন প্রেমিক, সত্যিকার দরদী, তাই যা কিছু প্রাণবান্ তার প্রেরণা পাই তাঁর কাছ থেকে। বিশ্বের দরবারে প্রচার করতে গিয়ে ভোলেননি তিনি স্বদেশের দুঃখ, স্বজাতির ব্যথা। স্বল্প কথায় 'ইণ্ডিয়া অ্যাণ্ড হার পিপল, এ যা বলেছেন সেখানে চাপা থাকে নি দেশের দুঃখে কেমন ক'রে কেঁদেছিল তাঁর প্রাণ। তাঁর প্রেম জলধি ভৌগোলিক গণ্ডীতে আবদ্ধ করা যায় না। তিনি শুধু বাংলার নয় ভারতের নয়—নিখিল মানবের অন্তর-বেদীর নিরালায় যুগে যুগে পাতা তাঁর কালজয়ী সিংহাসন।

"মানুষ যে এত সরল হতে পারে তাঁকে না দেখলে তা কখনো বিশ্বাস করতুম না। কতবার তাঁকে দেখেছি। কুমার ঠাকুররূপে তাকিয়ে

আছেন ক্ষমাসুন্দর চক্ষে কত লোক এসেছে। ভক্তি জানিয়েছে, প্রণাম করেছে, কৃতকৃতার্থ হয়ে চলে গেছে। আবার কতজনে এ সোনার আদর্শ নির্মমভাবে অস্বীকার ক'রে গেছে। কিন্তু যাঁর সামনে এসব ঘটেছে, তাঁর হাসি—সেই দেবদুর্লভ হাসি কেউ ম্লান করতে পারে নি[১]।

স্বামী অভেদানন্দের দীর্ঘ কর্মময় জীবনে এবার ধীরে ধীরে আসিয়া পড়ে বিরতির পালা। এ সময়ে মাঝে মাঝে স্মিতহাস্যে অন্তরঙ্গ ভক্তদের দিকে তাকাইয়া কহিতেন, "জানো, এবার ঠাকুর আমায় পেনসন দিচ্ছেন। অনেক খেটেছে এই দেহটা, এবার একটু বিশ্রাম করে নিক্ কি বল ?"

দেহান্তের প্রায় বৎসর দেড়েক আগে হইতেই স্বামীজী নানা অসুখে ভুগিতে থাকেন। অন্তরঙ্গ ভক্ত ও সেবকেরা প্রাণপণ প্রয়াসে তাঁহার চিকিৎসা ও সেবা পরিচর্যার ব্যবস্থা করেন।

রোগশয্যায় শায়িত থাকিয়াও অভেদানন্দ তরুণ সাধনার্থীদের উপদেশ দানে বিরত হন নাই। যে কেহ তাঁহার নিকট জিজ্ঞাসু হইয়া উপস্থিত হইত, লাভ করিত সাধন উপদেশ, রামকৃষ্ণ-তনয়ের মুখে রামকৃষ্ণের স্মৃতিচারণ শুনিয়া জীবন সার্থক করিত।

এ সময়ে একদিন স্বামীজী বালকের মতো হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, —"দেশের সর্বত্যাগী নায়ক সুভাষ, তাকে দেখতে আমার বড় ইচ্ছে হয়েছে।"

এ সংবাদ পাওয়া মাত্র সুভাষচন্দ্র স্বামীজীর বেদান্ত মঠে আসিয়া উপনীত হন, নিবেদন করেন সশ্রদ্ধ প্রণাম। স্বামীজী তখন অত্যন্ত অসুস্থ, উঠিয়া বসিতে পারেন না। কিন্তু দেশের মুক্তি সংগ্রামের পুরোধা পুরুষ সিংহ সুভাষচন্দ্রকে দেখিয়া তিনি আনন্দে বিহ্বল হইয়া উঠিয়াছেন। সোৎসাহে বলিলেন, "এসো, এসো সুভাষ। তোমায় একবার আলিঙ্গন করি।"

কোনোমতে উঠিয়া সস্নেহে সুভাষচন্দ্রকে দুই হাতে বকে জড়াইয়া

১ মহারাজের কথা : চিৎস্বরূপানন্দ

ধরিলেন। গদ্‌গদ স্বরে কহিলেন, "আশীর্বাদ করি, তুমি বিজয়ী হও।" অপরিসীম শ্রদ্ধা নিয়া নম্র কিশোর বালকের মতো সুভাষচন্দ্র স্বামীজীর শয্যার পাশে বসিয়া রহিলেন, মাঝে মাঝে দেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে উভয়ের বাক্যালাপ হইতে লাগিল। ঘণ্টাখানেক পরে সুভাষচন্দ্র স্বামীজীকে প্রণাম করিয়া বিদায় নিলেন।

দেহান্তের আর বেশী দেরি নাই, এ কথা অভেদানন্দ নিজে ভালোভাবেই জানেন। মাঝে মাঝে অন্তরঙ্গ ভক্তদের বলেন, "কি গো, তোমরা আমার শেষ কৃত্য কোথায় করবে ?"

এটা ওটা নানা কথা বলার পর নিজেই নির্দেশ দেন, "সব চাইতে ভালো, ঠাকুরের চরণতলে শুয়ে থাকা।" ভক্তেরা বুঝিলেন, তিনি কাশীপুর শ্মশানে, ঠাকুর রামকৃষ্ণের সংকার স্থলের কথাটিই উল্লেখ করিতেছেন।

অবশেষে নির্ধারিত চিরবিদায়ের লগ্নটি আসিয়া যায়। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই সেপ্টেম্বর সমাধিযোগে মহাপ্রয়াণ করেন আত্মকাম সাধক স্বামী অভেদানন্দ।

অধ্যাত্মশিল্পী শ্রীরামকৃষ্ণ সযত্নে রচনা করিয়াছিলেন তাঁহার সাধক তনয়দের একটি মণিময় হার। সে হার হইতে একটি উজ্জ্বল মণি সেদিন খসিয়া পড়িল।

বেলুড় মঠের সন্ন্যাসীরা তাঁহাদের এই গুরুভাই সম্বন্ধে আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া তাই লিখিয়াছেন,[১] "তিনি (অভেদানন্দ স্বামী) ছিলেন বহির্ভারতে আমাদের জন্মভূমি ও তাহার ধর্ম সংস্কৃতির একজন প্রখ্যাত প্রবক্তা। তাঁর জীবনে সম্মিলিত হয়েছিল সুগভীর অধ্যাত্মশক্তি- এবং সেবানিষ্ঠা—এবং তার পুণ্যময় মহাজীবন নিঃশেষে নিবেদিত হয়েছিল মানবের পরম কল্যাণে। ঈশ্বরের ইচ্ছাক্রমে, তাঁর সদ্‌গুরুর কর্মব্রত উদ্‌যাপনের জন্য আবির্ভূত হয়েছিলেন স্বামী অভেদানন্দ। তারপর সে ব্রত সমাপ্ত ক'রে তিনি অন্তর্ধান করেছেন সেই আলোকেরই উৎসস্থলে যেখান থেকে তিনি নেমে এসেছিলেন এই ধরণীতে।"

১ দ্র ডিসাইপল্‌স অব রামকৃষ্ণ : অদ্বৈত আশ্রম

কৃষ্ণপ্রেম

সারা ইয়োরোপে তখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের তাণ্ডব শুরু হইয়াছে। ট্যাংক ও হাউইৎজের কামান নিয়া দুর্ধর্ষ জার্মান সেনা বেলজিয়াম ও ফ্রান্সের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে। বম্বার ও ফাইটার বিমান হইতে চালাইতেছে অশ্রান্ত গোলাবর্ষণ।

জলে স্থলে আকাশে ইংরেজ ও ফরাসী বাহিনীও মরণপণ করিয়া রুখিয়া দাঁড়াইয়াছে। শত্রুর উপর হানিতেছে প্রচণ্ড আঘাত।

দেশের অন্যান্য তরুণের মতো কেমব্রিজের প্রতিভাধর ছাত্র রোনাল্ড নিক্‌সনও সেদিন দেশরক্ষার জন্য উদ্বুদ্ধ। ইউনিভার্সিটির পড়া ছাড়িয়া দিয়া সোৎসাহে যোগ দিয়াছেন রয়েল এয়ার ফোর্সে। জার্মানীর ভয়াবহ আক্রমণ রোধ করার জন্য ইংরেজেরা সবেমাত্র একটি ক্ষুদ্র বিমান বাহিনী গড়িয়া তুলিয়াছেন। নিক্‌সন সেই বাহিনীরই অন্যতম বিমানচালক। দক্ষ ও দুঃসাহসী পাইলট রূপে অল্প দিনের মধ্যে সম্মানজনক একটি 'এইস'-ও তিনি লাভ করিয়াছেন।

হঠাৎ সেদিন কর্তৃপক্ষের গোপন নির্দেশ আসিল, জার্মান অধিকৃত বেলজিয়ামের একটা সমর ঘাঁটিতে শত্রু নূতন আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হইয়াছে, জড়ো করিয়াছে বিপুল সমর সম্ভার। অবিলম্বে ঐ ঘাঁটির উপর প্রচণ্ড আঘাত হানিতে হইবে।

গুটিকয়েক বম্বার প্লেন তৎক্ষণাৎ ক্ষিপ্রবেগে উড়িয়া চলিল সেই লক্ষ্যের দিকে। চালকরূপে রোনাল্ড নিক্‌সনও রহিলেন তাহার একটিতে।

বেলজিয়ামের আকাশে ঢুকিবার আগেই একটি গুপ্ত ঘাঁটি হইতে উড়িয়া আসে একদল জার্মান ফাইটার বিমান, ক্ষিপ্রবেগে করে নিক্‌সনের পশ্চাৎ-ধাবন। এতক্ষণ সেদিকে তিনি লক্ষ্যই করেন নাই। একমনে লক্ষ্যস্থলের দিকে উড়িয়া চলিয়াছেন, ককপিট-এ বসিয়া

দৃঢ় হস্তে থ্রটল ঠেলিয়া দিতেছেন বার বার, বিমানের গতি আরো তীব্র হইয়া উঠিতেছে।

হঠাৎ তাঁহার নজর পড়িল দূরে আকাশের কোণে, দুর্ধর্ষ জার্মান ফাইটারগুলি তাঁহাকে ঘেরাও করার জন্য ছুটিয়া আসিতেছে। একাকী এতগুলি শত্রুবিমানের সঙ্গে যুঝিয়া উঠা সম্ভব নয়। নিক্‌সন প্রমাদ গণিলেন।

মুহূর্ত মধ্যে এই সংকটকালে তাঁহার নয়ন সমক্ষে ভাসিয়া উঠে এক অতীন্দ্রিয় দৃশ্য। তুষারমৌলী এক উত্তুঙ্গ পর্বত সূর্যের রূপালী আলোয় ঝলমল করিতেছে, আর সেই পর্বতের কন্দর হইতে নির্গত হইতেছে শুভ্র-উজ্জ্বল স্বর্গীয় আলোকধারা। এই আলোকের তরঙ্গে ডুবিয়া যাইতেছে রোনাল্ড নিক্‌সনের সারা অস্তিত্ব।

ক্ষণপরেই এক দিব্য ভাবাবেশে আবিষ্ট হইয়া পড়েন তিনি। অর্ধ-বাহ্য অবস্থায় অনুভব করিতে থাকেন, কোথা হইতে একটা অজানা শক্তি তাঁহার দেহের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, অধিকার করিয়া বসিয়াছে তাঁহার ইচ্ছাশক্তি ও হস্তপদের ক্রিয়া।

ঐ শক্তি-ই এবার চালাইয়া নিতে থাকে নিক্‌সনের বম্বার প্লেনটিকে। উর্ধ্বে আরো উর্ধ্বে দূর আকাশে সেটি উঠিয়া যায়। তারপর ঘুরিয়া চলিতে থাকে বিপরীত দিকে।

বাহ্য জ্ঞান ফিরিয়া আসিলে নিক্‌সন চাহিয়া দেখেন। বিমানের ককৃপিটে তিনি আর বসিয়া নাই। রহিয়াছেন লণ্ডনের কাছাকাছি একটি সামরিক হাসপাতালে।

তাঁহার বিমানটি ইংল্যাণ্ডে নিজস্ব বিমান ঘাঁটিতে নিরাপদে অবতরণ করে। কিন্তু অবতরণ করার পর দেখা যায়, পাইলট নিক্‌সন মূর্ছিত অবস্থায় ককৃপিটের মধ্যে ঢলিয়া পড়িয়া আছেন। অতঃপর তাড়াতাড়ি তাঁহার চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়।

সেদিনকার অভিযানের সঙ্গী পাইলটদের অনেকেই হত বা নিহত হইয়াছে। কয়েকটি বৃটিশ বিমান হইয়াছে একেবারে বিধ্বস্ত। পাইলট নিকসন কি করিয়া শত্রু-ব্যূহের কাছাকাছি গিয়াও নিরাপদে

ফিরিয়া আসিলেন, এ এক পরম বিস্ময়। সঙ্গী পাইলটেরা কেউ কেউ দেখিয়াছিলেন, নিক্‌সনের বম্বার প্লেনটি আকাশে বহু উঁচুতে উঠিয়া কোথায় উধাও হইয়া গেল। তারপর দেখা গেল, সেটি বৃটিশ বিমান ঘাঁটিতে ফিরিয়া আসিয়াছে, আর নিক্‌সন পড়িয়া আছেন অচেতন অবস্থায়।

এয়ার মার্শাল নিজে সেদিন হাসপাতালে আসিয়া উপস্থিত, নিক্‌সনের শয্যায় পাশে বসিয়া করেন প্রশ্নের পর প্রশ্ন। সেদিনকার অভিযানে বৃটিশ বিমান বহর ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, তাই এ সম্পর্কিত তথ্য তিনি সংগ্রহ করিতে চান।

"তোমার বম্বার বিমান কি ক'রে ফিরে আসতে পারল দুর্ধর্ষ জার্মান ফাইটারগুলোর প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে"—প্রশ্ন করা হইল রোনাল্ড নিক্‌সনকে।

সরলভাবে নিক্‌সন খুলিয়া বলিলেন সেদিনের সকল কথা, একটা বিস্ময়কর দৈবী শক্তি হঠাৎ কি জানি কেন, আমায় অধিকার ক'রে বসেছিল। শুধু তাই নয়, আমায় পর্যুদস্ত ক'রে, হাতদুটিকে বাধ্য করেছিল ঘুরপথে পালিয়ে আসার জন্য।"

"দৈবী শক্তি? যতো সব অর্থহীন বাজে কথা।" তাচ্ছিল্যের স্বরে মন্তব্য করেন এয়ার মার্শাল। যাইবার সময় ডাক্তারকে বলিয়া গেলেন, পাইলট রোনাল্ড নিক্‌সনের স্নায়বিক চাঞ্চল্যের দিকে যেন সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়।"

নিক্‌সন কিন্তু মনে মনে হাসিলেন। তিনি যে নিশ্চিতরূপে জানেন, অযথা কোনো অলৌকিকত্বের অবতারণা তিনি করেন নাই। যে দিব্য ভাবাবেশে বেলজিয়ামের আকাশে উড়ন্ত অবস্থায় তিনি আবিষ্ট হইয়াছিলেন, সেই ধরনের ভাবাবেশ আরো কয়েকবার এই হাসপাতালে আসার পর তাঁহার হইয়াছে। স্পষ্টরূপে একাধিকবার তিনি দেখিয়াছেন সেই অলৌকিক দৃশ্য—সূর্য-করোজ্জ্বল সেই অভ্রভেদী পাহাড়ের চূড়া, আর সেই পাহাড় চূড়া হইতে নির্গত হইতেছে শুভ্র জ্যোতির প্রবাহ। শুধু তাহাই নয়, এখানে আসার

পর ঐ পাহাড়ের পরিচয়ও উদ্ঘাটিত হইয়াছে তাঁহার কাছে। অন্তরাত্মা হইতে কে যেন বারে বারেই অস্ফুটস্বরে বলিয়া উঠিতেছে, "হিমালয় দেখেছো তুমি সেদিনকার অলৌকিক দর্শনের মধ্যে। পবিত্র হিমালয়ের কন্দরে থাকেন যে সব যোগী ঋষি, তাঁদের কৃপা তুমি পেয়েছ। সেই কৃপাই সেদিন উদ্ধার করেছে তোমায় নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে।'

'হিমালয়', আর 'ভারতবর্ষ' এই দুইটি নাম ঘুরিয়া ঘুরিয়া উপস্থিত হইতেছে নিক্সনের মানসপটে। অব্যক্ত আনন্দের রোমাঞ্চ শিহরণ ঘটিতে থাকে বার বার। ভারত সম্পর্কে তেমন বিশেষ কিছু জানা নাই তাঁহার। কলেজ লাইব্রেরী হইতে বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কিত দুই একটি গ্রন্থ পড়িয়াছেন, আর পড়িয়াছেন থিয়োসফিস্ট অ্যালকট্ ও ব্লাভাৎস্কির কয়েকটি রচনা। হিমালয়ের শক্তিধর মহাত্মাদের কাহিনী অল্পস্বল্প তিনি জানেন বটে কিন্তু ইহা নিয়া কোনো দিনই মাথা ঘামান নাই। ইউনিভার্সিটির মেধাবী ছাত্র রোনাল্ড নিক্সন, ইংরেজী সাহিত্যের উপর বরাবরই তাঁহার প্রবল অনুরাগ। এই সাহিত্যেই তিনি ব্যুৎপন্ন হইয়াছেন, অনার্স নিয়া পাস করিয়াছেন। আপন খেয়াল খুশীমতো দুই চারিটি ধর্ম দর্শনের বই পড়িয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাতে তেমন কোনো আকর্ষণ বোধ করেন নাই। এবারকার এই অলৌকিক অভিজ্ঞতা কিন্তু নিক্সনের মানসিক স্তরে ঘটাইয়া দিল এক বিপর্যয়। ভারতবর্ষ, ভারতবর্ষের ধর্ম দর্শন ও সাধু মহাত্মাদের সম্বন্ধে জাগিয়া উঠিল এক নূতনতর মূল্যবোধ।

অলৌকিক অনুভূতি আজ আর তাঁহার কাছে ধোঁয়াটে কোনো বস্তু নয়। অলৌকিক কৃপা ও শক্তির অভিজ্ঞতা তাঁহার নিজ জীবনে স্পষ্টরূপে ধরা দিয়াছে। এই কৃপা এবং এই শক্তি শুধু তাঁহার প্রাণ রক্ষাই করে নাই, নূতনতর আত্মিক চেতনা জাগ্রত করিয়াছে তাঁহার জীবনে, উদ্বোধিত করিয়াছে নূতনতর বিশ্বাস ও মূল্যবোধ।

বার বারই রোনাল্ড নিক্সনের অন্তরে জাগে আলোড়ন, উদগ্র হইয়া উঠে প্রশ্নের পর প্রশ্ন,—'অলক্ষ্যে থেকে কেন ঐ কল্যাণময়

শক্তি এগিয়ে এসেছিলেন তাঁর প্রাণ বাঁচানোর জন্য? কে রয়েছেন ঐ শক্তির পেছনে? কি তাঁর প্রকৃত স্বরূপ? কোথায়, কোন্ পথে পাওয়া যাবে তার প্রত্যক্ষ পরিচয়?'

নাঃ, এসব প্রশ্নের উত্তর তাঁহাকে পাইতেই হইবে, করিতে হইবে সেদিনকার অলৌকিক অভিজ্ঞতার রহস্যভেদ। যুদ্ধের কাজে আর তাঁহার মন বসিল না, রয়েল এয়ার ফোর্সের কর্ম পরিত্যাগ করিয়া ফিরিয়া আসিলেন কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটিতে। বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ দুই জীবনের মোড়ই এবার ফিরিয়া গেল।

পড়াশুনার কাজে কিছুদিন তিনি ব্যাপৃত রহিলেন বটে, কিন্তু বেলজিয়ামের আকাশের সেই অলৌকিক ঘটনার স্মৃতি সতত জাগরূক রহিল তাঁহার অন্তরে। সেই সঙ্গে চলিল অন্তরের অন্তস্তলে বারংবার অবগাহন। দুর্জ্ঞেয় দিব্যালোকের হাতছানি কেবলই চঞ্চল করিয়া তোলে নিক্‌সনকে, একটা নূতনতর আত্মিক আস্বাদের জন্য সারা মনপ্রাণ তাঁহার ব্যাকুল হইয়া উঠিতে থাকে।

এই ব্যাকুলতা এবং ভাবান্তরের ভিতর দিয়া ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করে অধ্যাত্ম-জীবনের আকাঙ্ক্ষা। পূর্বে যাহা ছিল নিছক কৌতূহলের বস্তু, এবার তাহা আবির্ভূত হয় জীবনের প্রধান লক্ষ্যরূপে। অনির্দেশ্য নিয়তি নিক্‌সনকে অনিবার্যরূপে ঠেলিয়া নিয়া যায় তাঁহার পরম সম্ভাবনার দিকে। এ পথে অগ্রসর না হইয়া আর কোনো উপায়ান্তর নাই।

এই সময়ে একাগ্র চিত্তে ধর্ম সংস্কৃতির বহুতর গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে থাকেন নিক্‌সন। বিশেষ করিয়া ভারতের ধর্ম সাধনা ও সাধকজীবনের দিকে তাঁহার মন আরো গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়। থিয়োসফিস্টদের চাঞ্চল্যকর বহু গ্রন্থ পাঠ করেন, কিন্তু তাহাতে কৌতূহলের নিবৃত্তি যতটা হয় মন প্রাণ ততটা ভরিয়া উঠে না। বরং বৌদ্ধ দার্শনিকতা ও বৌদ্ধ সাধন সম্পর্কে তিনি বেশ কিছুকাল ব্যাপকভাবে পড়াশুনা করেন। লণ্ডনের এক প্রবীণ বৌদ্ধ সাধকের নির্দেশ নিয়া ধ্যান জপেও কিছুকাল নিবিষ্ট হন। কিন্তু ইহাতে

অধ্যাত্মজীবনের তৃষ্ণা তো তাঁহার মিটে না। আরো নিবিড় করিয়া পরম তত্ত্বকে যে তিনি আঁকড়িয়া ধরিতে চান। সূক্ষ্মতর আত্মিক উপলব্ধির জন্য, মুক্তির আস্বাদের জন্য রোনাল্ড নিক্‌সন অধীর হইয়া উঠেন।

অবশেষে তিনি স্থির করেন। ভারতে গিয়াই স্থায়ীভাবে এবার বসবাস করিবেন, সাক্ষাৎভাবে আসিবেন সেখানকার সিদ্ধ মহাপুরুষদের সান্নিধ্যে। ধর্ম ও দর্শনের তত্ত্ব আয়ত্ত করার সঙ্গে সঙ্গে শুরু করিবেন অধ্যাত্ম জীবনের নিগূঢ় সাধনা।

নিক্‌সন অচিরে উপস্থিত হন তাঁহার ধ্যানের ভারতে, খুঁজিয়া পান তাঁহার নিজস্ব সাধনার পথ। তাঁহার সেই পথ—বৃন্দাবনের গুরুপরম্পরা-ধৃত এক বিশিষ্ট বৈষ্ণবীয় পথ। সাধনজীবনে সন্ন্যাস নিয়া নিক্‌সন পরিগ্রহ করেন নূতন নাম—'কৃষ্ণপ্রেম।' উত্তরকালে এ নাম তাঁহার সার্থক হইয়া উঠে কৃষ্ণপ্রেমের সিদ্ধ সাধকরূপে ঘটে তাঁহার মহারূপান্তর। ভারত এবং ইয়োরোপ আমেরিকায় বহু মুমুক্ষু ও সাধনকামী নরনারীর পরমাশ্রয়রূপে তিনি খ্যাত হইয়া উঠেন।

রোনাল্ড নিক্‌সন, উত্তরকালের বহুজনবন্দিত বৈষ্ণব সাধক কৃষ্ণপ্রেম, ভূমিষ্ঠ হন ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই মে। ইংল্যাণ্ডের একটি শিক্ষিত, ধর্মপরায়ণ মধ্যবিত্ত পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন।

বালককাল হইতেই নিক্‌সনের মধ্যে দেখা যায় অসাধারণ মেধা ও প্রতিভার স্ফুরণ। যৌবনে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি অধ্যয়ন করেন এবং ইংরেজী সাহিত্যের স্নাতক পরীক্ষায় উচ্চতর সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হন।

কলেজে পড়াশুনা করার সময় হইতেই ধর্ম ও দর্শন সম্পর্কে তাঁহার কৌতূহল জাগিয়া উঠে এবং এ সময়ে খ্রীষ্টীয় ধর্ম, বৌদ্ধবাদ এবং থিয়োসফির কিছু কিছু গ্রন্থ তিনি পড়িয়া ফেলেন। আত্মিক

জীবনের যে সংস্কার এতদিন সুপ্ত ছিল, এবার তাহা ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করিতে থাকে। দুর্জ্ঞেয় লোকের রহস্য জানার জন্য নিক্‌সন চঞ্চল হইয়া উঠেন।

ঠিক এই সময়ে জার্মানীর আক্রমণের ফলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের দামামা বাজিয়া উঠে ; বৃটেনের অন্যান্য দেশপ্রেমিক যুবকদের মতো রোনাল্ড নিক্‌সনও যোগদান করেন প্রতিরক্ষা বাহিনীতে। রয়েল এয়ার ফোর্সে তিনি কমিশন প্রাপ্ত হন এবং অল্পকাল মধ্যে বিমান চালনায় দক্ষ হইয়া গ্রহণ করেন বোমারু বিমান চালনার গুরু-দায়িত্ব। এই সময়ে একদিনকার আকাশ অভিযানের সময় যে চাঞ্চল্যকর অলৌকিক অভিজ্ঞতা নিক্‌সনের ঘটে, তাহাই উন্মোচিত করে তাঁহার জীবনের নূতনতর অধ্যায়। ভারতীয় অধ্যাত্ম সাধনার রহস্য জানিবার জন্য তিনি ব্যগ্র হইয়া উঠেন।

ইংল্যাণ্ডে থাকিতে ভারতে বসবাসের যে সংকল্প রোনাল্ড নিক্‌সন করিয়াছিলেন, শীঘ্রই তাহা সিদ্ধ হইয়া উঠে। লখনৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী তখন লণ্ডনে উপস্থিত। এ সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগের জন্য তিনি একটি সুযোগ্য অধ্যাপকের খোঁজ করিতেছিলেন। এক মধ্যবর্তী বন্ধুর সাহায্যে নিক্‌সন ডঃ চক্রবর্তীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, প্রকাশ করিলেন মনের গোপন বাসনা। তিনি প্রতিভাধর তরুণ ইংরেজ অধ্যাপক তদুপরি ভারতের প্রতি, ভারতের ধর্ম সংস্কৃতির প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা অপরিসীম। উপাচার্য শ্রীচক্রবর্তী সানন্দে তাঁহাকে নিযুক্ত করিলেন ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপকের পদে।

অল্পদিনের মধ্যেই লখনৌতে পৌঁছিয়া রোনাল্ড নিক্‌সন যোগ দিলেন তাহার নূতন কাজে। নূতন অধ্যাপকের জন্য তাড়াতাড়ি কোনো ভালো বাসস্থানের ব্যবস্থা করা যাইতেছে না, উপাচার্য কহিলেন, "তুমি অবিবাহিত, একটিমাত্র লোক। তুমি আমার বাড়িতেই তো থাকতে পারো। যতদিন স্টাফ কোয়ার্টার তৈরি না

হয়, আমার এখানেই থাকো। অবশ্যি যদি তোমার নিজের দিক দিয়ে কোনো আপত্তি না থাকে।”

নিক্সন উত্তরে বলিলেন, “আপত্তি তো আমার নেই-ই বরং উৎসাহ আছে। আপনার বাড়িতে বাস করলে ভারতীয় জীবনযাত্রা সম্বন্ধে আমি জ্ঞান লাভ করতে পারবো এবং এখানকার রীতিনীতিও আয়ত্ত করা যাবে সহজে। এ তো আমার সৌভাগ্যের কথা।”

নিক্সনের বাসস্থান সম্পর্কে সেই ব্যবস্থাই করা হইল এবং ইহার মধ্য দিয়া অলক্ষ্যে তাহার জীবনধারায় ঘটিল এক দূরপ্রসারী পরিবর্তনের সূত্রপাত।

উপাচার্য ডঃ জ্ঞানেন্দ্র চক্রবর্তীর স্ত্রী মণিকাদেবী রোনাল্ড নিক্সনকে গ্রহণ করিলেন পরম স্নেহে এবং পুত্রজ্ঞানে। মণিকা-দেবীর মধ্যে নিক্সন কি দেখিলেন তাহা তিনিই জানেন, কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যেই দেখা গেল তিনি তাহাকে ‘মা’ বলিয়া ডাকিতে শুরু করিয়াছেন। আনন্দরূপিণী, সদা হাস্যময়ী, এই বর্ষীয়সী মহিলা ছিলেন সহজ নেতৃত্বের অধিকারিণী। এই অধিকার নিক্সনও সেদিন নিজের অলক্ষ্যে মানিয়া নিলেন।

মণিকাদেবী কহিলেন, “না বাবা, তোমার ঐ নিক্সন নামে আমি আর তোমায় ডাকছিনে। ভারতে এসেছো, ভারতের সব কিছুকে ভালোবেসে, তাই একটা ভারতীয় নামই তোমায় দেওয়া যাক্, কি বল ?

“বেশ তো মা, আপনার খুশী মতো, নূতন নামই তা হলে একটা দিন।” আনন্দে গদ্‌গদ হইয়া উত্তর দেন নিক্সন।

“হ্যাঁ, বাবা, আজ থেকে তোমায় আমি গোপাল বলে ডাকবো। ‘গোপাল’ এদেশের মায়েদের অন্তরের ধন। এমনটি পৃথিবীর আর কোথাও নেই।”

“মা, আমি আপনার গোপাল হয়েই থাকবো।” সোৎসাহে সম্মতি জ্ঞাপন করেন নিক্সন।

মণিকাদেবীর দুইটি কন্যা, কোনো পুত্রসন্তান নাই। এখন হইতে

এই তরুণ সুদর্শন ইংরেজ তনয়ের উপরই বর্ষিত হইতে থাকে তাঁহার মাতৃহৃদয়ের উদার অফুরন্ত অপত্যস্নেহ।

অধ্যাপনার কাজ শুরু করিয়া দেন রোনাল্ড নিক্সন, এই সঙ্গে তৎপর হইয়া উঠেন ভারতের ধর্ম ও সংস্কৃতির জ্ঞান আহরণে। বুদ্ধের জীবন ও বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে পূর্ব হইতেই তাঁহার একটা আকর্ষণ ছিল, এবার বৌদ্ধ সাহিত্যের অধ্যয়ন ও ধ্যান ধারণায় নিবিষ্ট হইলেন। কিছুদিনের মধ্যে উপলব্ধি করিলেন, মূল বৌদ্ধশাস্ত্র পালি ভাষায় লেখা, ইহার মর্মে প্রবেশ করিতে হইলে পালি শিক্ষা করা দরকার। বহু পরিশ্রম করিয়া, অল্প সময়ের মধ্যে ঐ ভাষা তিনি আয়ত্ত করিয়া ফেলেন। তারপর একে একে শেষ করেন বৌদ্ধবাদের প্রধান গ্রন্থগুলি। কিন্তু এই তত্ত্ব ও সাধনায় নিক্সন তৃপ্ত হইতে পারেন কই? সমগ্র জীবনের মূলে তাঁহার প্রচণ্ড নাড়া পড়িয়া গিয়াছে, আধ্যাত্মিক চেতনা জাগিয়া উঠিয়াছে প্রবলভাবে। নিক্সন এবার ভারতের সনাতন ধর্ম দর্শন ও সাধনার অনুধাবন করিতে চান, প্রবেশ করিতে চাহেন মর্মমূলে।

এখন হইতে বেদ উপনিষদ, গীতা অধ্যয়নে তিনি নিবিষ্ট হইয়া পড়েন। একাগ্রতা ও নিষ্ঠা তাঁহার জন্মগত বৈশিষ্ট্য, তাই সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপন্ন হইয়া মূল শাস্ত্রগ্রন্থগুলির তত্ত্ব তিনি উদ্‌ঘাটন করিতে থাকেন।

রোনাল্ড নিক্সন তখন শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃতী অধ্যাপকরূপেই সুপরিচিত নন, লখনৌর সমাজজীবন ও অভিজাত-চক্রের তিনি তখন এক বড় আকর্ষণ। সুগৌরকান্তি, দীর্ঘ সুঠাম দেহ, আয়ত নীল নয়ন দুটি অসামান্য বুদ্ধির দীপ্তিতে সদাই ঝক্‌ঝক্ করিতেছে। সাহিত্য, সংস্কৃতি, দর্শন, রাজনীতি যে কোনো বিতর্কে ফুটিয়া উঠে তাঁহার একটা নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী। তীক্ষ্ণোজ্জ্বল বুদ্ধি মুহূর্তে যে কোনো সমস্যার মূলদেশে গিয়া প্রবেশ করে।

শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা প্রতিভাধর তরুণ অধ্যাপক নিক্সনকে ভালোবাসেন, সমীহ করেন। ছাত্র ছাত্রীরা তাঁহার ব্যক্তিত্বে ও

পাণ্ডিত্যের ঔজ্জ্বল্যে মুগ্ধ। আর অভিজাত পরিবারের কন্যার মাতারা অনেকেই তখন লুব্ধ নেত্রে তাকাইয়া আছেন এই প্রিয়দর্শন তরুণ অধ্যাপকের দিকে।

বহিরঙ্গ জীবনে, সামাজিক উৎসব, নিমন্ত্রণ ও চা-চক্রে নিক্‌সনকে সদাই দেখা যায় হাস্যময় এবং প্রাণচঞ্চল। কিন্তু অন্তরের গোপন মর্মকোষে একটু নাড়া দিলেই বাহির হইয়া আসে তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ। একটু লক্ষ্য করিলেই বুঝা যায়, জীবনের গভীরতর স্তরে ডুবুরীর মতো কোন পরম ধন যেন তিনি হাতড়াইয়া ফিরিতেছেন, যা কিছু শাশ্বত, যা কিছু অমৃতময় তাহার জন্য সমগ্র জীবনচেতনা তাঁহার হইয়া রহিয়াছে কেন্দ্রীভূত। ভারতীয় সাধনা ও আত্মিক জীবনের সংস্কারের প্রতি একটা সহজ মমত্ব ও ঐক্যবোধ ধীরে ধীরে তাঁহার মধ্যে জাগিয়া উঠিতেছে।

উপাচার্য জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ছিলেন লখনৌর শিক্ষিত ও অভিজাত সমাজে শীর্ষ স্থানীয়, আর তাঁহার পত্নী, বর্ষীয়সী রূপসী মহিলা মণিকাদেবী ছিলেন সেই সমাজের মধ্যমণি। যে কোনো পার্টি, অ্যাট্-হোম এবং উৎসবের প্রাণ ছিলেন মণিকাদেবী। ভারতীয় খানদানী রীতিনীতি যেমন তিনি জানিতেন, তেমনি রপ্ত ছিলেন ইয়োরোপ ও আমেরিকার আধুনিক আদব কায়দায়। স্বামীর সঙ্গে বিশ্বের বহু স্থানে তিনি ঘোরাফেরা করিয়াছেন, শিক্ষা দীক্ষা ও সংস্কৃতির অনেক কিছু করিয়াছেন আহরণ। তাই পার্টি বা মজলিসে মণিকাদেবীর জুড়ি তখনকার লখনৌ শহরে আর ছিল না। যে কোনো মিলন সভা বা উৎসবে হাসি আনন্দের ফোয়ারা তিনি খুলিয়া দিতেন, গল্পগুজবে মাতাইয়া রাখিতেন সবাইকে।

এই সব উৎসবে রোনাল্ড নিক্‌সনও যোগ দিতেন সোৎসাহে, সবার সঙ্গে উপভোগ করিতেন সামাজিক জীবনের আনন্দ রঙ্গ। কিন্তু আসলে তাঁহার সবটা মন এবং সবটা দৃষ্টি পড়িয়া থাকিত হাস্যলাস্যময়ী মণিকাদেবীর উপর। নিক্‌সন লক্ষ্য করিয়াছেন,

মণিকাদেবীর বহিরঙ্গ জীবনের এই হৈ-হুল্লোড় ও হাসি উচ্ছ্বাসটাই তাঁহার বড় পরিচয় নয়, এই উচ্ছ্বাসের ভিতরকার স্তরে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে আর একটা রহস্যঘন জীবন, সে জীবন—আত্মিক চেতনায় প্রোজ্জ্বল, প্রেমভক্তির মাধুর্যে রসায়িত।

বেশ কিছুদিন যাবৎ, নিক্‌সনের অন্তর্দৃষ্টিতে এ বৈশিষ্ট্যটি ধরা পড়িয়াছে। আধুনিক ধরনের ফ্যাসানে সাজসজ্জা করেন মণিকাদেবী, মুখে সুগন্ধ পাউডার, ঠোঁটে লিপস্টিক মাখানো। সিগারেটের ধোঁয়া ছড়াইয়া এ টেবিলে হইতে ও টেবিলে ঘুরিতেছেন, আর হাসি গল্পে মাতাইয়া তুলিতেছেন বন্ধু বান্ধবী ও অভ্যাগতদের। কিন্তু এই রসরঙ্গের মধ্যে হঠাৎ এক সময়ে ঘটে ছন্দপতন। অদ্ভুত ভাবান্তর দেখা যায় তাঁহার চোখে মুখে, দ্রুতপদে হল্‌ঘর হইতে বাহির হইয়া আসেন, সরাসরি আপন কক্ষের এক কোণে গিয়া নিভৃতে করেন আত্মগোপন।

কি এই ভাবান্তরের রহস্য ? কেনই বা হঠাৎ এমনভাবে বন্ধু বান্ধবীদের হইতে নিজেকে তিনি বিচ্ছিন্ন করিয়া নেন ? নানা চিন্তা ও দুশ্চিন্তা খেলিয়া যায় নিক্‌সনের মনে। একি মণিকাদেবীর কোনো শারীরিক অসুস্থতা ? স্নায়বিক দৌর্বল্যের কোনো উপসর্গ ? যদি এসব কিছু না ঘটিয়া থাকে তবে হয়তো ইহার পিছনে রহিয়াছে কোনো অলৌকিক রহস্য। দুর্জ্ঞেয় অপার্থিব লোকের হাতছানি হঠাৎ কখন আসিয়া পড়ে, আর অমনি তিনি সরিয়া পড়েন লোকলোচনের সম্মুখ হইতে, একান্তভাবে নিজেকে গুটাইয়া নেন নিজস্ব গণ্ডীর মধ্যে।

নিক্‌সন মনে মনে স্থির করিলেন, মায়ের এই আকস্মিক অন্তর্ধানের রহস্য তাহাকে ভেদ করিতে হইবে, নতুবা তাঁহার নিজের মনের অশান্তি দূর হইবে না।

চক্রবর্তী ভবনে সেদিন এক বড় মজলিস বসিয়াছে। হাসি আনন্দ গানে গল্পে সবাই মশগুল, নিক্‌সন লক্ষ্য করিলেন, মণিকা-দেবী হঠাৎ কেমন যেন উন্মনা হইয়া পড়িলেন। তারপর নীরবে সবার পাশ কাটাইয়া তাড়াতাড়ি চলিয়া গেলেন নিজের কক্ষে।

মজলিস তখনো জমজমাট। কিছুক্ষণ বাদে নিক্‌সনও বিদায় নিলেন, সেখান হইতে ছুটিয়া আসিলেন তাঁহার মায়ের কাছে। দুয়ারে দাঁড়াইয়া দেখিলেন এক অদ্ভুত দৃশ্য। সুসজ্জিত কক্ষের এক কোণে মা ঋজুভঙ্গীতে-ধ্যানস্থ হইয়া বসিয়া আছেন, নয়ন দুটি নিমীলিত, দেহ নিস্পন্দ, বাহ্যচৈতন্য নাই।

নির্নিমেষে অবাক্ বিস্ময়ে এই ধ্যানাবিষ্টা মাতৃমূর্তির দিকে চাহিয়া আছেন রোনাল্ড নিক্‌সন। ভাবিতেছেন, এ কোন্ দৈবীলীলা? লখনৌর অভিজাত মহলের মক্ষীরানী মণিকাদেবীর একি অভাবনীয় নূতন রূপ! সব চাইতে আশ্চর্যের কথা, যে মাকে নিক্‌সন এমন প্রগাঢ়ভাবে শ্রদ্ধা করেন, ভালোবাসেন, তাঁহার এই মহিমময়ী রূপটি আজ অবধি তাঁহার কাছে ধরা পড়ে নাই! আত্মিক জীবনের অন্তঃসঞ্চারী ফল্গুধারাটি গোপনেই এতদিন বহিয়া চলিয়াছে, বাহিরের লোক ঘুণাক্ষরেও তাহা জানিতে পারে নাই।

ধ্যানাবস্থা হইতে ব্যুত্থিত হইলেন মণিকাদেবী, বাহ্যচেতনা এবার ধীরে ধীরে ফিরিয়া আসিল, আর কপোল বাহিয়া ঝরিতে লাগিল পুলকাশ্রুর ধারা। অতীন্দ্রিয়লোকের মধুময় দৃশ্য মণিকা-দেবী এতক্ষণ সম্ভোগ করিয়াছেন, তাহারই আনন্দ শিহরণে কম্পিত হইতেছে সর্বদেহ, নয়নে বহিতেছে দরবিগলিত ধারা।

খানিক বাদেই সুস্থ ও স্বাভাবিক হইয়া উঠেন মণিকাদেবী। তাড়াতাড়ি উপস্থিত হন ড্রেসিং টেবিলের সম্মুখে, অশ্রুসিক্ত কপোল মুছিয়া ফেলেন, নূতন করিয়া রুজ্ পাউডার লাগাইয়া আসিয়া দাঁড়ান ঘরের দুয়ারে।

নিক্‌সন তখনো সেখানে নীরবে নিস্পন্দভাবে দণ্ডায়মান। মা বাহিরে আসিতেই ঝটিতি অগ্রসর হইয়া নিবেদন করেন সশ্রদ্ধ প্রণাম, গদ্‌গদ স্বরে বলেন, "মা, তোমার অনুমতি না নিয়েই তোমার এই স্বর্গীয় দৃশ্য এতক্ষণ দেখছিলুম। আর ভাবছিলুম, মা হয়ে ছেলেকে কি ফাঁকিই তুমি এতদিন দিয়ে এসেছো। মায়ের ধনে ছেলেরই তো অধিকার। তাই না মা?"

সস্নেহে নিক্সনের চিবুকটি স্পর্শ করিয়া বলেন মণিকাদেবী, "গোপাল, তুমি তাহলে এসব দেখে ফেলেছো। ভালোই হল। সব কথা তোমায় খুলে বলবো, বাবা। কিন্তু আজ নয়, কাল বলবো সব খুলে। পার্টি চলছে আজ বাড়িতে। চলো তাড়াতাড়ি ওদের কাছে যাওয়া যাক্। সত্যি, বড্ডো অভদ্রতা হয়েছে আমার দিক থেকে। আমার বাড়িতে রিসেপশান, আর আমি এড়িয়ে রয়েছি ওদের, ছি-ছি।"

আবার অভ্যাগতদের মধ্যে আসিয়া হাজির হন মণিকাদেবী। হাস্যে লাস্যে ও সরস বাচন ভঙ্গীতে মাতাইয়া তোলেন বন্ধু বান্ধবীদের। তারপর অতিথিরা তৃপ্তমনে একের পর এক তাঁহার ভবন হইতে বিদায় নেন।

পরের দিন প্রাতরাশের পর নিক্সনকে একান্তে ডাকিয়া নেন মণিকাদেবী। বলেন, "গোপাল, এবার তোমায় সব কথা খুলে বলছি। তুমি ঠিকই ধরেছো, বেশ কিছুদিন যাবৎ বড়ো বদলে গেছি আমি। পুরোনো জীবনধারায় ছেদ পড়ে গিয়েছে।"

"তাই তো মা, এত কাছে থেকেও আমি তোমার খোঁজ পাচ্ছিনে।"—মন্তব্য করেন নিক্সন।

"গোপাল, আমাদের এই বহিরঙ্গ জীবনটা আসলে কিছু নয়। দেহ আর মনের আড়ালে রয়েছে—আত্মা। সেই আত্মিক স্তরে যখন তরঙ্গ ওঠে মানুষ তখন বদলে যায়; পরম আত্মা যিনি, ভগবান্ যিনি, তাঁর চরণে গিয়ে সে আছড়ে পড়ে। আমার জীবনে তাই ঘটতে শুরু করেছে।"

"মা, এটা কি ঘটেছে তোমার সঙ্গে আমার সাক্ষাতের পরে, না আগে? প্রশ্ন করেন নিক্সন।

"আগে থেকেই গোপাল। জানতো, আমার স্বামী শুধু এদেশের একজন শ্রেষ্ঠ শিক্ষাবিদ্‌ই নন, থিয়োসফি আন্দোলনের অন্যতম নেতা এবং একজন বড় দার্শনিক তিনি। তাঁর *সাঙ্ক থিয়োসফি নিয়ে*

আমিও মেতে ছিলাম বহুদিন। এ নিয়ে ইয়োরোপ আমেরিকায় কম ঘোরাঘুরিও করি নি। কিন্তু থিয়োসফির তত্ত্ব আর আলৌকিক কাহিনীতে আত্মার ক্ষুধা মিটল না, জীবনে এল না পরম শান্তি। স্বামী তাই ঝুঁকলেন বৈষ্ণব দর্শন ও ধ্যান ধারণার দিকে। আর আমি? ঝুঁকে পড়তে গিয়ে, আমি গেলাম একেবারে ডুবে। জন্মগত সংস্কার ছিল ভক্তিপ্রেমের, তাই কে যেন আমায় হিড়হিড় ক'রে টেনে নিয়ে গেল প্রেমের ঠাকুর শ্রীকৃষ্ণের চরণতলে। দীক্ষা নিলাম বৃন্দাবনে গিয়ে, রাধারমণজীউ মন্দিরের বালকৃষ্ণ দাস গোস্বামীর কাছ থেকে।”

“তা হলে, মা, তুমি এতদিন গোপনেই চালিয়ে যাচ্ছো তোমার সাধনভজন?”

“হ্যাঁ গোপাল, আমার এ ভজনময় জীবন বাইরে আমি প্রকাশ করিনে। কিন্তু বাবা, আমার ঠাকুর যে বড়ো দুষ্টু, বড়ো লীলা-চপল। স্থান নেই অস্থান নেই, সময় নেই অসময় নেই, হঠাৎ ডেকে নেন তাঁর কাছে। কৃষ্ণের চরণ থেকে নেমে আসে আলোর ধারা, আমার সবকিছু ওলোটপালোট হয়ে যায়, বাহ্যচৈতন্য হারিয়ে ফেলি। আমার দিক থেকে তেমন কিছুই করিনে আমি, আমার কৃষ্ণ নিজেই আমায় আকর্ষণ ক'রে নিচ্ছেন, বার বার অবগাহন করাচ্ছেন তাঁর অমৃত সায়রে।”

একি অদ্ভুত লীলাকাহিনী নিক্সন শুনিতেছেন তাঁহার মায়ের মুখে? আনন্দে বিস্ময়ে তিনি অভিভূত।

মা'কে প্রণাম করেন ভক্তিভরে, করজোড়ে বলেন, “মা, যে পথে তুমি অগ্রসর হয়েছো, সেই কৃষ্ণপথে আমায় নিয়ে যাও। মায়ের সম্পদেই তো ছেলের অধিকার।”

“গোপাল, তুমি ঠিকই বলেছো, কিন্তু এজন্য তো প্রস্তুতি চাই, বাবা। আমি এতদিন লক্ষ্য করেছি, বৌদ্ধ ধর্মসাহিত্য পড়ার ঝোঁক তোমার চলে গিয়েছে। এ দুটো বৎসর উপনিষদ আর গীতা তুমি গভীরভাবে পড়েছো।' ভালোই হয়েছে, হিন্দুধর্মের মূল তত্ত্বটি

তোমার জানা হয়েছে। এবার তুমি প্রেম ভক্তি-ধর্মের শাস্ত্র পাঠ করো, স্মৃতি পুরাণের কাহিনী জেনে নাও। সেই সঙ্গে শুরু করো রাধা কৃষ্ণের ধ্যান জপ ও ভজন। কৃষ্ণের কৃপা তোমার ওপর হবে, বাবা।"

রোনাল্ড নিক্সনের জীবনে এবার আসে এক নূতনতর ভাবের জোয়ার, এ জোয়ারে ভাসিয়া যায় তাঁহার বিগত জীবনের সকল কিছু সংস্কার ও ধ্যান ধারণা। কৃষ্ণতত্ত্ব ও কৃষ্ণ কাহিনী অনুধাবন করিতে থাকেন গভীরভাবে, কৃষ্ণপ্রেমের আলোকে আলোকিত হইয়া উঠে তাঁহার সমগ্র জীবন।

এ সময়ে লখনৌর জীবনে হঠাৎ ছেদ পড়িয়া যায়। মণিকা-দেবীর স্বামী জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদ গ্রহণ করেন। সপরিবারে তিনি চলিয়া আসেন বারাণসীতে। রোনাল্ড নিক্সন শুধু চক্রবর্তী পরিবারভুক্তই নন, জ্ঞানেন্দ্রনাথ ও মণিকাদেবীর তিনি পুত্রস্বরূপ। তাই নিক্সনও এই সময়ে লখনৌর কাজ ছাড়িয়া দিয়া গ্রহণ করেন বারাণসী বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ইংরেজী অধ্যাপকের পদ।

লখনৌর বন্ধু ও শুভানুধ্যায়ীরা উদ্বিগ্ন হইয়া উঠেন নিক্সনের জন্য। তাঁহারা চাপিয়া ধরেন, বলেন, কি অদ্ভুত খেয়ালীপনা তোমার বলতো? এখানকার ইউনিভার্সিটিতে যে সম্মান, যে টাকা পাচ্ছো বেনারসে গেলে তার অর্ধেকও তো তুমি পাবে না। এখানে পাচ্ছো আটশো টাকা, ওখানে তিনশোর বেশী তোমায় দেবে না। কি ক'রে চলবে তোমার?"

নিক্সন হাসিয়া উত্তর দেন, "একটা লোকের তিনশো টাকার বেশী কেনই বা দরকার হবে, বলতো? কোনো বিলাসিতা আমার নেই, সামান্য নিরামিষ আহার করি, কম্বলে শুয়ে থাকি। ঐ টাকাটাই তো আমার পক্ষে বেশী।"

"লখনৌতে থাকলে অদূর ভবিষ্যতে এখানকার ভাইস-চ্যান্সেলার হতে পারবে তুমি, সে কথাটা কি একবার ভেবে দেখেছো?"

সকৌতুকে বন্ধুদের কথা শুনিতেছেন নিক্‌সন, আর পাইপ টানিতেছেন। একরাশ ধোঁয়া ছাড়িয়া সহাস্যে কহিলেন, "তোমরা কি ভেবেছো, নিজের দেশ ছেড়ে আত্মীয় স্বজনদের মায়া কাটিয়ে সাত সমুদ্রের এপারে এদেশে আমি এসেছি শুধু একটা মোটা মাইনের চাক্‌রি নিতে, আর ভাইস-চ্যান্সেলার হতে? যে পরম পথের সন্ধানে ঘর ছেড়ে বেরিয়েছিলাম একদিন, সে পথ আমি পেয়ে গিয়েছি। আর তো আমার ফেরবার কথা ওঠে না।" একথা বলিয়া সকল বিতর্কের অবসান ঘটাইয়া দিলেন রোনাল্ড নিক্‌সন।

বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্বদিকে, লংকা পল্লীর অনতিদূরে, গঙ্গার তীরে, রাধাবাগ নামে এক বিরাট ভবন নির্মাণ করিলেন মণিকাদেবী ও উপচার্য জ্ঞানেন্দ্রনাথ। এখন হইতে এই ভবনটিকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠে একটা চমৎকার পরিবেশ। এই রাধাবাগে আরো কয়েকটি পাশ্চাত্য দেশের ভক্ত মণিকাদেবীর আশ্রয় গ্রহণ করেন, প্রেমভক্তি সাধনার পথে তাঁহারা অগ্রসর হন।

নিক্‌সনের জীবনে এবার আসে সাধনভজনের তীব্র আবেগ। আহার বিহারে শুরু করেন তীব্র কঠোরতা, রাধাকৃষ্ণের ভজন ও লীলা অনুধ্যানে দিন রাতের অধিকাংশ সময় কোথা দিয়া কাটিয়া যায়, তাহার হুঁশ থাকে না। কখনো গঙ্গাতীরের মৃত্তিকা গোফায় কখনো বা রাধাবাগের ছাদের নিভৃত কোণে ধ্যান ভজনে তিনি নিমগ্ন থাকেন। এ সময়ে কাশীর যেসব জিজ্ঞাসু ভক্তেরা রাধাবাগে যাইতেন, বিস্মিত হইতেন বিদেশী ভক্ত রোনাল্ড নিক্‌সনের সাধনার কঠোরতা ও নিষ্ঠা দর্শনে।

নিক্‌সনের সাধনভজন দিন দিন যত গভীর হইতেছে, মা মণিকাদেবীর সহিতও তেমনি গড়িয়া উঠিতেছে নিবিড় অন্তরঙ্গতা ও একাত্মতা। বৈষ্ণবীয় শাস্ত্রতত্ত্ব ও সাধনভজনের যে কোনো কূট প্রশ্ন বা রহস্যের সম্মুখীন হন, নিক্‌সন অমনি ছুটিয়া যান তাঁহার মায়ের কাছে। আর মায়ের এক একটি সংক্ষিপ্ত উক্তির মাধ্যমে মীমাংসা

হইয়া যায় সকল প্রশ্নের, সর্ব সংশয় তাঁহার ছিন্ন হয়। মায়ের এই অদ্ভুত অন্তর্দৃষ্টি দেখিয়া দিনের পর দিন তিনি বিস্মিত হন, তাঁহার তত্ত্বোজ্জ্বলা বুদ্ধির আলোকে সাধনপথে চলিতে অভ্যস্ত হইয়া পড়েন নিক্সন।

সেদিন মা কহিলেন, "গোপাল, এবার তুমি ভাগবত পড়ো, আর প্রতিদিন আমার সঙ্গে বসেই তা পড়ো।"

নিক্সনের আনন্দের আর অবধি নাই। মায়ের কাছে ভাগবত অধ্যয়ন করিবেন, কৃষ্ণলীলার গূঢ় রহস্য জানিয়া নিবেন তাঁহার সাধনজাত প্রজ্ঞার আলোকে। মণিকাদেবীর নির্দেশে একখণ্ড হিন্দি ভাষায় লিখিত ভাগবত কিনিয়া আনা হইল, শুরু হইল নিত্যকার পাঠ ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ।

উত্তরকালে কৃষ্ণপ্রেম বলিতেন, "মায়ের কাছে বসে ভাগবত পড়েছি, আর শুনেছি তাঁর মুখ থেকে নিগূঢ় লীলারসের ব্যাখ্যান। তার ওপরেই তো গড়ে উঠেছে আমার সমস্ত কিছু সাধনভজন।

১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিক। রাসপূর্ণিমার আর বেশী দেরি নাই। চক্রবর্তীদের রাধাবাগ ভবনে এ সময়ে আনন্দের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। রাস উৎসব এবার সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হইবে, তাহার প্রস্তুতির জন্য সবাই ব্যস্ত।

সেদিন নিত্যকার ভজন সারিয়া আসিয়া নিক্সন মাকে প্রণাম করিলেন, যুক্তকরে নিবেদন করিলেন তাঁহার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা। কহিলেন, "মা, আমি সংকল্প করেছি, বৈষ্ণব-মন্ত্রে সন্ন্যাস দীক্ষা নেবো।"

"বেশ তো গোপাল, এ তো খুব ভালো সংকল্প।" প্রসন্ন কণ্ঠে বলেন মা।

"হ্যাঁ, আরো স্থির করেছি, তোমার কাছ থেকেই আমি এ সন্ন্যাস নেবো।"

"তা কি ক'রে হয়, বাবা? আমি মন্ত্র দিতে পারি, কিন্তু সন্ন্যাস তো আমায় দিয়ে হবে না। আমি গৃহী, সন্ন্যাসী নই। শুধু সন্ন্যাসীই পারেন সন্ন্যাস দীক্ষা দিতে।"

"এত সব আমি জানিনে মা, জানতেও চাইনে। কিন্তু এটা স্থির, তোমার কাছ থেকে ছাড়া আর কারুর কাছে আমি সন্ন্যাস নেবো না।"

মা বুঝিলেন, গোপাল তাঁহার সংকল্পে অটল। দৃঢ়, ঋজু ও একনিষ্ঠ স্বভাব তাঁহার, মনে প্রাণে যে সংকল্প একবার স্থির করিয়াছে, তাহা হইতে তাঁহাকে বিচ্যুত করা কঠিন।

বেশ কিছুক্ষণ নীরবে নিমীলিত নয়নে মা বসিয়া রহিলেন, আননখানি এক দিব্য আভায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। অতঃপর কহিলেন, "গোপাল, তাই হবে। তোমার সংকল্প যাতে সিদ্ধ হয়, পরমপ্রাপ্তি যাতে সহজে ঘটে, তা-ই করবো। রাধারানীর অনুমতি এই মাত্র পেলাম। তবে সর্বাগ্রে আমায় যেতে হবে বৃন্দাবনে, সেখানে প্রভু বালকৃষ্ণ দাস গোস্বামীর কাছ থেকে আমি সন্ন্যাস নেবো। তারপর তোমায় সন্ন্যাস দেবার অধিকার আমি পাবো।"

সন্ন্যাস গ্রহণের পর মণিকাদেবীর নূতন নাম গ্রহণ করিলেন—যশোদা মাঈ। আর নিক্‌সনকে সন্ন্যাস দান করিয়া তিনি তাঁহার নামকরণ করিলেন—কৃষ্ণপ্রেম।

ইতিমধ্যে মনীষী শিক্ষাবিদ্ জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। তাঁহার তিরোধানের পর হইতে সাধিকা যশোদা মাঈর জীবনে শুরু হয় এক নূতনতর অধ্যায়। রাধাবাগের প্রাসাদোপম ভবন ত্যাগ করিয়া তিনি আশ্রয় নেন হিমালয়ের কোলে। আলমোড়ার চৌদ্দ মাইল দূরে মির্তোলায়, যাগেশ্বর শিবস্থানের কাছাকাছি অঞ্চলে ক্রয় করা হয় একটি নাতিবৃহৎ পাহাড়। এই পাহাড়ের উপর স্থাপিত হয় রাধাকৃষ্ণের একটি ক্ষুদ্র মন্দির এবং মন্দির ও সন্নিহিত আশ্রম-ভূমির নাম দেওয়া হয় উত্তর বৃন্দাবন।

আশ্রম এবং মন্দির নির্মাণের আগে কিছুদিন যশোদা মাঈ আলমোড়ায় বাস করিতে থাকেন। ধর্মপুত্র এবং শিষ্য কৃষ্ণপ্রেম সর্বদা ছায়ার মতো রহিয়াছেন তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে। একদিন যশোদা মাঈ কহিলেন, "গোপাল, ভিক্ষান্ন বড় শুদ্ধ অন্ন। তাছাড়া, সন্ন্যাস নেবার

পর ভিক্ষান্ন দিয়ে দেহ ধারণ করতে হয়। আমি চাই এখানে কিছুদিন তুমি ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন ক'রে থাকো।"

মায়ের আদেশ শুনিয়া কৃষ্ণপ্রেম মহা আনন্দিত। ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে নিয়া ভিক্ষা শুরু করিয়া দিলেন আলমোড়া শহরের গৃহস্থদের ঘরে। মুণ্ডিত মস্তক, গৈরিকধারী, সুগৌরকান্তি সন্ন্যাসীর গলায় বিলম্বিত পবিত্র তুলসীর মালা। প্রশস্ত ললাটে অঙ্কিত মধ্ব বৈষ্ণবদের দীর্ঘ ত্রিপুণ্ড্রক, মাঝখানে তার কৃষ্ণবর্ণ এক সরলরেখা। ঘননীল নয়ন দুটির দিকে পথচারীরা অবাক্ বিস্ময়ে চাহিয়া থাকে। ইংরেজ বৈষ্ণব সন্ন্যাসীর এই ভিক্ষাবৃত্তি আলমোড়ার ছোট শহরটিতে চাঞ্চল্য তুলিয়া দেয়।

অল্প দিনের মধ্যেই আলমোড়ার নরনারী যশোদা মাঈ এবং তাঁহার বিদেশী শিষ্য কৃষ্ণপ্রেমের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়ে। পাহাড়ের ঢালুতে অবস্থিত কুটিরটি পরিণত হয় ভক্ত মানুষ ও দীন দুঃখীজনের আশ্রয়স্থলরূপে।

প্রায় বৎসর খানেক বাদে মির্তোলার উত্তর বৃন্দাবন আশ্রম ও মন্দিরের নির্মাণ কার্য সম্পন্ন হয়। এবার গুরু যশোদা মাঈকে নিয়া কৃষ্ণপ্রেম স্থায়ীভাবে সেখানেই বসবাস করিতে থাকেন।

পাহাড়ের কোলে স্নিগ্ধ-মধুর শান্তিময় পরিবেশে রচিত এই পবিত্র আশ্রম। ঘন সবুজ বৃক্ষরাজির পটভূমিকা, তাহার সম্মুখে নির্মিত হইয়াছে একটি নাতিবৃহৎ মন্দির। মন্দিরের পূজা-কক্ষে শ্বেত প্রস্তরের বেদীতে বিরাজিত রাধাকৃষ্ণের নয়ন ভুলানো যুগলমূর্তি। এই যুগলমূর্তি এবং তাঁহাদের পূজা অর্চনা, আরাত ও ভোগরাগ প্রতিদিন অনুষ্ঠিত হয় পরম নিষ্ঠায়। শঙ্খ, ঘণ্টা ও ঝাঁঝর করতালের ধ্বনিতে সারা পাহাড় মুখরিত হইতে থাকে।

গোড়ার দিকে একটি পূজারী নিয়োগ করা হয় মন্দিরের পূজা ও বিগ্রহ সেবার জন্য। কিছুদিন পরে কৃষ্ণপ্রেম নিজেই পরম আগ্রহ ভরে এ কাজ নিজের স্কন্ধে তুলিয়া নেন। ঠাকুরের ভোগ রন্ধনের

ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিটি একসময়ে হঠাৎ অসুস্থ হইয়া পড়ে। এ অবস্থায় কৃষ্ণপ্রেমই গ্রহণ করেন ভোগ-প্রসাদ রান্নার সকল কিছু দায়িত্ব। কিছুদিন এমন নিষ্ঠা ও দক্ষতা নিয়া একাজ তিনি সম্পন্ন করেন যে সকলেই তাঁহার রান্না-করা প্রসাদের গুণগানে পঞ্চমুখ হইয়া উঠেন। ফলে ঠাকুরের ভোগ রন্ধনের কাজে কৃষ্ণপ্রেমই পাকাপাকিরূপে নিযুক্ত হইয়া পড়েন।

সাধিকা যশোদা মাঈ মাধ্ব বৈষ্ণব শাখার অন্তর্ভুক্ত, তদুপরি গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচারের প্রতি তাঁহার আকর্ষণ ছিল অত্যধিক। তাই ঠাকুর পূজা ও ঠাকুর সেবার প্রতিটি কাজ পবিত্রভাবে ও নিষ্ঠা সহকারে করার দিকে তাঁহার দৃষ্টি ছিল সদা জাগ্রত। মায়ের এই মনোভাব এবং এই নৈষ্ঠিকতার কথা কৃষ্ণপ্রেম জানিতেন। তাই এ বিষয়ে কোনো ত্রুটি বা স্খলন পতন প্রাণ থাকিতে তিনি ঘটিতে দিতেন না।

দোতলা মন্দিরের চারদিকে বিস্তারিত রহিয়াছে আশ্রম প্রাঙ্গণ। ঠাকুরের নিত্যপূজার জন্য ফুলের বাগান রচিত হইয়াছে সেখানে। মন্দিরের নিচতলায় আশ্রমিক সাধকদের বাসস্থান। আশেপাশে নির্মিত তিনটি কুটির। একটিতে স্থাপিত ক্ষুদ্র একটি পাঠাগার, আবার সেটিকে নবাগত অতিথিদের আশ্রয়কক্ষরূপেও ব্যবহার করা হয়। আর একটি ক্ষুদ্র কুটিরে রহিয়াছে স্থানীয় গরীব ছেলেমেয়েদের পড়ানোর ব্যবস্থা। গোড়ার দিকে, শরীর অসুস্থ না হওয়া অবধি, যশোদা মাঈ নিজেই ছেলেমেয়েদের পড়াইতে বসিতেন। স্নেহময়ী মায়ের ধর্মপুত্রদের মধ্যে ইউরোপ আমেরিকার সুশিক্ষিত ব্যক্তিরা যেমন ছিল, তেমনি ছিল মির্তোলা ও যাগেশ্বরের দীন দুঃখী ছেলে মেয়েরা। সবারই জন্য সদা উন্মুক্ত ছিল এই মহীয়সী জননী যশোদা মাঈর হৃদয়দ্বার।

আশ্রমের একপাশে স্বল্পব্যয়ে সাধুদের জন্য একটি ধর্মশালা তৈরি করা হয়। কৈলাস ও যাগেশ্বরের যাত্রী যে সাধু সন্ন্যাসীরা এ অঞ্চলে আসিতেন, তাঁহাদের অনেকে আশ্রয় নিতেন এখানে।

উত্তরকালে পাহাড়ের আরো একটু উঁচুতে একটি ছোট ডিসপেনসারীও স্থাপন করা হয়। রোগক্লিষ্ট দরিদ্র পাহাড়ীদের প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য এটি ব্যবহৃত হইতে থাকে।

আশ্রমের সন্নিহিত ঢালু জায়গার খাঁজে খাঁজে কিছুটা চাষের ব্যবস্থা হয়। স্থানীয় লোকদের নিয়া কৃষ্ণপ্রেম ও তাঁহার সহকর্মীরা ঐসব চাষের ক্ষেতে ফসল ফলাইতেন, আর একাজকে সবাই গণ্য করিতেন ঠাকুরের সেবারূপে।

ডাক্তার আর. ডি. আলেকজাণ্ডার ছিলেন কৃষ্ণপ্রেমের কেমব্রিজ-জীবনের বন্ধু। কৃষ্ণপ্রেমের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হইয়া তিনিও ভারতের ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতি আকৃষ্ট হন, স্বদেশ ছাড়িয়া এখানে উপস্থিত হন। কৃষ্ণপ্রেম কিন্তু এদেশে আসা মাত্রই বন্ধুকে তাঁহার পথ অনুসরণ করিতে দেন নাই। তাঁহাকে বলিয়াছেন, "অ্যালেক্, হঠাৎ ঝোঁকের বশে বা ভাবালুতার বশে, তুমি কিছু ক'রে বসো না। কিছুদিন অপেক্ষা করো, তোমার নিজের মতামতকে যাচাই করো, তারপর নাও স্থির সিদ্ধান্ত।"

আলেকজাণ্ডার একথায় রাজী হইলেন। উচ্চতর ডাক্তারী ডিগ্রি এবং চিকিৎসার দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা তাঁহার ছিল। লখনৌর এক বড় হাসপাতালে তিনি চাকুরী নিলেন, বেশ কিছুদিন সুনাম ও কৃতিত্বের সহিত কাজ চালাইয়া গেলেন। তারপর সে কাজে আর মন বসিল না, ভবিষ্যতের সকল কিছু উজ্জ্বল সম্ভাবনায় জলাঞ্জলি দিয়া শরণ নিলেন কৃষ্ণপ্রেমের কাছে, তাঁহার কাছ হইতে নিলেন বৈষ্ণবীয় মন্ত্র ও সন্ন্যাস দীক্ষা। নূতন নাম হইল—হরিদাস। মির্তোলা আশ্রমের চাষবাস আর ডিসপেনসারীর কাজ দেখাশুনার পর বাকিটা সময় হরিদাস অতিবাহিত করিতেন ঠাকুরের ধ্যান ভজনে। এই প্রতিভাধর নূতন শিষ্যের জীবনে কৃষ্ণপ্রেমের ত্যাগ তিতিক্ষা, সেবানিষ্ঠা ও ভক্তিপ্রেমের আদর্শ মূর্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

উত্তর বৃন্দাবনের অপর আশ্রমিক ছিলেন মাধব-আশীষ তাঁহার দীক্ষা গ্রহণের কাহিনীও বড় অদ্ভুত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এই

তরুণ ইংরেজ তনয় পশ্চিম বাংলায় আসেন সামরিক বিমানক্ষেত্রের গ্রাউণ্ড ইঞ্জিনিয়ার রূপে। তারপর একবার ছুটির সময় বেড়াইতে যান হিমালয় অঞ্চলে। সেখানে কৃষ্ণপ্রেমের জীবন-কথা শুনিতে পাইয়া ব্যাকুল হইয়া উঠেন, মির্তোলায় আসিয়া উপস্থিত হন কৃষ্ণ-প্রেমকে দর্শন করার জন্য। এই প্রথম দর্শন পরিণত হয় প্রগাঢ় শ্রদ্ধায় ও প্রেমে। অতঃপর আনুষ্ঠানিকভাবে শিষ্যত্ব ও সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া গুরুসেবা ও কৃষ্ণসেবায় উৎসর্গ করেন তনুমনপ্রাণ।

যশোদা মাঈর কনিষ্ঠা কন্যা মতিরানীও বাস করিতেন মির্তোলার আশ্রমে। যশোদা মাঈ তিরোধানের পরে কৃষ্ণপ্রেমের কাছ হইতেই তিনি গ্রহণ করেন মন্ত্রদীক্ষা ও সন্ন্যাস। মতিরানী যতদিন বাঁচিয়া ছিলেন কৃষ্ণপ্রেমকে ডাকিতেন 'ছোট-বা', অর্থাৎ ছোটবাবা বলিয়া। আনন্দ চঞ্চল মতিরানী সকল সাধুদেরই ছিলেন স্নেহভাজন, মির্তোলার আশ্রমের দিকে দিকে সদাই তিনি ঘুরিয়া বেড়াইতেন মুক্ত বিহঙ্গিনীর মতো। কৃষ্ণপ্রেমের এই শিষ্যা ও স্নেহের দুলালী বেশীদিন জীবিত থাকেন নাই, অকালে লোকান্তরে চলিয়া যান।

গুরু সেবা আর কৃষ্ণবিগ্রহের সেবা—এই দুইটি কৃত্যের উপর সিদ্ধ সাধিকা যশোদা মাঈ আরোপ করিতেন সর্বাধিক গুরুত্ব। তাই সেবা মাহাত্ম্যের এই তত্ত্বটি ছিল কৃষ্ণপ্রেমের জীবন সাধনার ভিত্তি। দীর্ঘকালের ত্যাগ তিতিক্ষা ও একৈকনিষ্ঠার মধ্য দিয়া এই সেবাকর্মে তিনি সিদ্ধ হইয়াছিলেন, গুরুকৃপায় লাভ করিয়াছিলেন পরমপ্রভু কৃষ্ণকে, জীবন হইয়াছিল কৃতকৃতার্থ।

কৃষ্ণপ্রেমের কাছে যশোদা মাঈর প্রতিটি কথা, প্রতিটি নির্দেশ ছিল বেদবাক্যের মতো। গুরুর প্রতিটি পদক্ষেপের দিকে, নিমেষ-পাতের দিকে, অনন্য নিষ্ঠা নিয়া তাকাইয়া থাকিতেন, আর নিজের সাধনজীবনকে গড়িয়া তুলিতেন, নিয়ন্ত্রিত করিতেন তাঁহারই ইচ্ছা অনুসারে। গুরুর সহিত একাত্মক হইয়া গিয়াছিলেন তিনি, ফলে সাধিকা যশোদা মাঈর জীবনে যে ইষ্টকৃপা ও সিদ্ধি স্ফুরিত

হইয়াছিল, অতিশয় সহজ ও স্বাভাবিকভাবে তাহাই আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল কৃষ্ণপ্রেমের জীবনে।

গুরুর কাছে তাঁহার এই আত্মসমর্পণ এবং গুরুর সঙ্গে তাঁহার এই একাত্মকতা সম্ভব হইয়াছিল কৃষ্ণপ্রেমের নিজস্ব বিশ্বাসের শক্তি ও একনিষ্ঠা ভক্তির ফলে। চরিত্রের এই দুইটি বৈশিষ্ট্যই কৃষ্ণপ্রেমকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল চরম ত্যাগের পথে। নিজের দেশ, আত্মপরিজন ও ধর্ম সংস্কৃতি ছাড়িয়া এই মহাবৈরাগী ঝাঁপ দিয়াছিলেন কৃষ্ণ-অনুরাগের সাগরে। সারা জীবনে আর পিছন ফিরিয়া তাকান নাই।

কৃষ্ণপ্রেম সম্পর্কে শ্রীঅরবিন্দ একবার তাঁহার শিষ্য স্যাডউইক্-কে এক পত্রে লিখিয়াছিলেন : "কৃষ্ণপ্রেমের মধ্যে একটা শক্তি ছিল যার বলে তিনি বহিরঙ্গ জীবনের চিন্তাস্রোত এবং ভাবাবেগ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে রাখতে পারতেন, পৌছুতে পারতেন শাশ্বত জ্ঞানের উৎসস্থলে। তাঁর এ শক্তি সত্যিই বড় প্রশংসার্হ। যদি তিনি জাগতিক চিন্তাস্রোতের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলতেন তাহলে হয়তো রমাঁ রলাঁ বা এই ধরনের সংস্কৃতিবান্ মনীষীদের স্তরেই তাকে পড়ে থাকতে হতো। কিন্তু কৃষ্ণপ্রেম আসলে জীবনকে দেখেছিলেন যোগদৃষ্টির দিক থেকে, সম্যক্ দৃষ্টির দিক থেকে, এবং তাঁর জীবনসাধনায় যে প্রস্তুতি নিয়ে তিনি অগ্রসর হয়েছিলেন তা সত্যিই বিস্ময়কর। ভক্ত এবং শিষ্যের প্রকৃত আত্মসমর্পণের ভাবটি দ্রুততার সহিত এবং পরিপূর্ণরূপে তিনি গ্রহণ করেছেন। তাই তাঁর সাধনা হয়েছে এমন সাফল্যমণ্ডিত। একটি আধুনিক মানুষের পক্ষে, তা সে শিক্ষিত ইয়োরোপীয়ই হোক আর ভারতীয়ই হোক, এ সাফল্য অর্জন করা অতি কঠিন। তার কারণ, আধুনিক মানুষের মধ্যে রয়েছে অত্যধিক বিচার বিশ্লেষণ, সংশয় এবং ছন্নছাড়া ভাব, ইচ্ছে থাকলেও এ থেকে সে মুক্ত হতে পারে না। ফলে সাধন জীবনে যে আলোক, যে শক্তি এগিয়ে আসছে, তা দেখে সে পিছু হটতে থাকে, তার ভেতরে সে দুর্বার বেগে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে না,

বলতে পারে না—যদি আমায় তোমার ভেতরে প্রবেশ করতে দাও, তবে এখনি আমি দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারি আমার নিজের বলতে যা আছে তার সব কিছুকে, আমার চৈতন্যকে নিয়ে যাও তোমার পরম পথ দিয়ে তোমার পরম সত্যে, তোমার ভাগবত সত্তায়। আমাদের ভেতর এ মনোভাব এবং এ প্রস্তুতি ঠিকই রয়েছে, কিন্তু সংশয় ও দৌর্বল্য করছে তার পথরোধ, একটা যবনিকা রচনা ক'রে আছে অন্তরাল। আমি আমার নিজের অভিজ্ঞতা এবং অন্যান্য সাধকদের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, সত্য উপলব্ধির পথ কখনোই এত দীর্ঘ হতে পারে না, সাধনার পথে এত ঘুরপাকও খেতে হয় না, যদি অত্যধিক বিচার বিশ্লেষণ ও সংশয়ের বাধা থেকে মুক্ত থাকা যায়। কৃষ্ণপ্রেমকে আমি প্রশংসা জানাই, তিনি অবলীলায় এবং অতি সহজে ঐ বাধা অতিক্রম করেছেন[১]।"

গুরুকৃপা এবং মাতৃস্নেহ এই দুই-ই কৃষ্ণপ্রেম লাভ করিয়াছিলেন যশোদা মাঈর নিকট হইতে। সন্ন্যাস দীক্ষা নিবার পূর্বে এবং পরে, বিভিন্ন সময়ে মায়ের মাধ্যমে বহুতর অলৌকিক লীলা তিনি দর্শন করিয়াছিলেন। ফলে কৃষ্ণ ভজনের আস্থা ও কৃষ্ণরতি তাঁহার হইয়াছিল গভীরতর। পরবর্তীকালে সিদ্ধপুরুষ কৃষ্ণপ্রেমের কৃপায় তাঁহার ভক্ত শিষ্যেরা ঐ ধরনের নানা অলৌকিক ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

যশোদা মাঈর নৈষ্ঠিক বৈষ্ণবজীবনের প্রতিটি খুঁটিনাটি সতর্কভাবে অনুসরণ করিতেন কৃষ্ণপ্রেম। এ সম্পর্কে কোনো শৈথিল্য বা আপোস রফার স্থান তাঁহার মনে স্থান পাইত না।

বিজ্ঞানী বশী সেন এবং তাঁহার স্ত্রী জারট্রুড এমারসন সেনের সঙ্গে যশোদা মাঈ ও কৃষ্ণপ্রেমের ঘনিষ্ঠতা ছিল। মির্তোলায় আসা যাওয়ার পথে মাঝে মাঝে তাঁহারা আলমোড়া শহরে মিঃ সেনের বাংলোতে অবস্থান করিতেন। সাধুদের নৈষ্ঠিকতার কথা শ্রীমতী

১ যোগী কৃষ্ণপ্রেম : দিলীপকুমার রায়

সেনের জানা ছিল। তাঁহারা আসিলেই বাংলোর বারান্দা ধুইয়া পুঁছিয়া নূতন রন্ধন পাত্র কিনিয়া যথাযোগ্য ব্যবস্থা করিয়া দিতেন। কৃষ্ণপ্রেম এবং যশোদা মাঈ স্বহস্তে রান্না করিতেন এবং ঠাকুরের ভোগ চড়াইয়া নিজেরা করিতেন প্রসাদ গ্রহণ। এ সময়ে বশী সেন মহাশয় কৃষ্ণপ্রেমের সঙ্গে সপ্রেম ভঙ্গীতে নানা ধরনের রঙ্গ রসিকতা করিতেন।

শ্রীমতী জারট্রুড সেন লিখিয়াছেন,[১] "সেদিন আমার স্বামী কৃষ্ণ-প্রেমকে ঠাট্টার সুরে বললেন, ভোগ রান্নার এসব ছ্যুৎমার্গী কাণ্ড যদি আমার বিধবা বৃদ্ধা ঠাকু'মা করতেন, তাহলে না হয় বুঝতাম! কিন্তু আপনি কেন এসব করতে যাবেন? আপনার আগেকার জীবনের পরিবেশ যে ছিল একেবারে পৃথক ধরনের। কেমব্রিজে পড়ার সময়, ছাত্রাবস্থায় নিশ্চয় প্রচুর গোমাংস আপনি খেয়েছেন, তবে আর এত সব গোঁড়ামী আর বাধানিষেধের মধ্যে আছেন কেন, বলুন তো?

"গোপাল কিন্তু একটুও বিরক্ত হলেন না এই ঠাট্টা শুনে। হেসে উঠলেন সঙ্গে সঙ্গে, আর এমন একটি উত্তর দিলেন, যা প্রত্যেকটি শ্রোতার অন্তরে জাগিয়ে তুলল প্রগাঢ় শ্রদ্ধা। এর পর আমার স্বামী আর কখনো এসব নিয়ে ঠাট্টা অথবা রসিকতা করেন নি। গোপাল বললেন, "এ যুগে ব্যক্তিগত এবং সামাজিক জীবনের সব কিছু সংযম আর নিয়ন্ত্রণই তো জানালা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হচ্ছে, আমার তো মনে হয়, এমন দুঃসময়ে নিজের ওপরে এ ধরনের সংযমের বাঁধ কিছুটা চাপিয়ে রাখা ভালো। তাছাড়া, আমার আগে যাঁরা এ পথ ধরে এগিয়েছেন, তাঁরা লক্ষ্যস্থলে ঠিকই পৌঁছে গেছেন। তাহলে আমার মতো লোক, যে সবায় এ পথে যাত্রা শুরু করেছে, তার পক্ষে কি বলা শোভা পায়—আমি এটা ক'রবো, ওটা ক'রবো না, এ নিয়ম মানবো, আর ওটা মানবো না? আমি তাই এ পথের সবটাই মেনে চলেছি।"

১ যোগী কৃষ্ণপ্রেম্ঃ ভূমিকা: জারট্রুড ইমারসন সেন

মির্তোলার আশ্রমে কোনো রেডিও বা খবরের কাগজ রাখা হইত না। কৃষ্ণ ও কৃষ্ণের আশ্রম নিয়া এককেন্দ্রিক জীবনযাপন করিতেন কৃষ্ণপ্রেম, সেখানে অবান্তর কোনো কিছুর প্রবেশাধিকার ছিল না। দেশ বিদেশের সমস্যা ও তৎসম্বন্ধীয় আলোচনার কোনো প্রয়োজন-বোধই তাঁহার ছিল না। তাছাড়া, কেনই বা থাকিবে? নিজে হইতে যে জীবনের উপর যবনিকা টানিয়া দিয়াছেন, সে সম্বন্ধে কোনো কৌতূহল বা অনুসন্ধিৎসা জাগ্রত থাকার তো কোনো কারণ নাই। শাশ্বত পরম সত্য, কৃষ্ণ, তাঁহার লক্ষ্যবস্তু। সেই লক্ষ্যে পৌঁছিতে হইলে সমগ্র জীবনটাকে পরিণত করিতে হইবে একটি ঋজু ক্ষিপ্রগতি ধনুঃশররূপে। আর সেই শরকে তীক্ষ্ণতর করিয়া তুলিতে হইবে পূজা অর্চনা ও ধ্যান ভজনের মধ্য দিয়া।

আলমোড়ায় সেনেদের বাংলোয় বসিয়া চা-পানের পর নানা কথাবার্তা হইতেছিল। জাতি বর্ণের প্রসঙ্গ উঠিলে কৃষ্ণপ্রেম কহিলেন, প্রাচীন যুগের জাতি বিভাগ প্রাচীন ভারতের অনেক কল্যাণসাধন করেছে, তাতে সন্দেহ নেই। আবার এটাও ঠিক যে, যে ধরনের জাতিবর্ণ বিভাগ আজকের দিনে রয়েছে তা আর টিঁকবে না, যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাকে বিদায় নিতে হবে। কিন্তু আমি জিজ্ঞেস করি, আজকাল অত্যধিক সংস্কার সাধন, শিল্পের প্রসার, পরিসংখ্যান এসব নিয়ে যে বাড়াবাড়ি আর পাগলামী চলছে, এর ফল শেষটায় কি কল্যাণকর হবে? মানুষকে কি শুধু সংখ্যাতত্ত্বে পরিণত করা হচ্ছে না? আত্মিক উন্নয়নের মূল্য কি ক্রমেই কমে আসছে না? ভারতের পক্ষে কি নিজের ঐতিহ্যের শেকড় আঁকড়ে ধরে প্রভূত কল্যাণের দিকে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়? পাশ্চাত্যের দ্বিতীয় শ্রেণীর নকলরূপেই কি তাকে গড়ে উঠতে হবে? হ্যাঁ, তবে এটা ঠিক, আমরা যে যা-ই বলি, পেছন থেকে ঠাকুরই যে টেনে চলেছেন তাঁর সুতো। তিনি যেমনি আমাদের চালাচ্ছেন, তেমনি চলছি আমরা। তিনি নাচান, আর আমরা নাচি—এইটেই হচ্ছে প্রকৃত কথা।"

চীন তখন ভারত আক্রমণ করিয়াছে। এ আক্রমণের ফল কি দাঁড়াইবে, একথা ভাবিয়া সবাই উদ্বিগ্ন। মিসেস সেনও এ সম্পর্কে তাঁহার দুশ্চিন্তা প্রকাশ করিতেছিলেন।

কৃষ্ণপ্রেম কিছুকাল নীরবে কি ভাবিতে লাগিলেন। তারপর প্রশান্ত কণ্ঠে আত্মবিশ্বাসের সুরে কহিলেন, "আপনাদের তো নিশ্চয় মনে আছে, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অর্জুনকে বধ করার জন্য অশ্বত্থামা হেনেছিলেন অমোঘ বাণ। সে বাণ ছিল ব্রহ্মাস্ত্র, কোনো কিছু দিয়েই তার প্রতিরোধ সম্ভবপর ছিল না। সেই সংকটে সারথীরূপী কৃষ্ণ তাঁর চরণ দিয়ে রথটি চেপে ধরলেন, সঙ্গে সঙ্গে রথের চাকা গেল বসে। গোটা রথটা নীচু হ'য়ে গেল, আর ঐ মারাত্মক বাণ উড়ে চলে গেল অর্জুনের মাথার ওপর দিয়ে। আমি বিশ্বাস করি, ভারতের যে-কোনো সংকটে কৃষ্ণ তেমনিভাবে তাঁর চরণ দিয়ে আমাদের চেপে ধরবেন—এদেশ রক্ষা পাবে। ভারতের আত্মা কখনো বিনষ্ট হতে পারে না।"

কৃষ্ণপ্রেম আরো বলিতেন, "ভারত হচ্ছে বিশ্বের একমাত্র দেশ যা পাশ্চাত্যের জড়বাদী সভ্যতার কাছে পরাজিত হয় নি, তলিয়ে যায় নি। কারণ, আজ অবধি তাকে বর্মের মতো ঘিরে রেখেছে, সদাই রক্ষা ক'রে চলেছে তাঁর অগণিত সিদ্ধ মহাপুরুষদের আত্মিক জ্যোতির কল্যাণ-বলয়।"

তাই আধুনিক তার্কিকেরা এ দেশের সাধু-সন্তদের পরগাছা বলিয়া অভিহিত করিলে তিনি শ্লেষের হাসি হাসিতেন, মন্তব্য করিতেন, "ভগবানের কৃপায় পাশ্চাত্য দেশে যদি এ ধরনের পরগাছা বেশী ক'রে জন্মাতো, তাহলে বোধহয় দু' দুটো বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ ধ্বংস থেকে ওদেশ রক্ষা পেতো।"

বারাণসীতে থাকার সময়ে কৃষ্ণপ্রেম একদিন বারাণসীর মাহাত্ম্য এবং শিবের জ্যোতির কথা বর্ণনা করিতেছিলেন। অতি আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত উন্নাসিক এক শ্রোতা কৃষ্ণপ্রেমকে প্রশ্ন করেন, "আচ্ছা বলুন দেখি, এই ধুলো কাঁকরময় বিশ্রী শহরে আপনি শ্রদ্ধা করবার মতো সত্যই কি কিছু পেয়েছেন?"

কৃষ্ণপ্রেমের চোখ মুখ দিব্য আভায় উদ্‌ভাসিত হইয়া উঠে। প্রসন্ন মধুর কণ্ঠে বলেন, "পেয়েছি বৈ কি, বন্ধু। পেয়েছি এখানে সোনার ধুলো কাঁকর, আর গঙ্গার স্বর্গীয় সংগীত!" প্রত্যয়-সমুজ্জ্বল সাধকের চোখ মুখের ভাব আর শ্রদ্ধাপূর্ণ উক্তি শুনিয়া প্রশ্নকর্তার মুখে কোনো কথা সরিল না।

গুরু যশোদা মাঈ সম্পর্কে একবার আমরা কৃষ্ণপ্রেমকে প্রশ্ন করিয়াছিলাম। কি তিনি পাইয়াছেন তাঁহার মায়ের কাছে, কিভাবে পাইয়াছেন, তাহাও জানিতে চাওয়া হইয়াছিল। প্রশান্ত কণ্ঠে তিনি উত্তর দিলেন, "আমার একটা বড়ো সুবিধে—মা, গুরু আর কৃষ্ণ, একই পথের ধাপ বেয়ে আমার কাছে এসে গেছেন। মা কি কোনোদিন সন্তানকে বর্জন করতে পারে? যত দুর্বল যত দুষ্কৃতই হোক না কেন, মা তাকে দু'হাত দিয়ে আগলে রাখবেন। আমার এই মা-ই আবার আমায় দিয়েছেন সাধন-আশ্রয়। তারপর সিদ্ধা মাতা আর সিদ্ধা গুরুর মাধ্যমে পরম প্রভু কৃষ্ণও এসেছেন আমায় কৃপা করতে। মার থেকে স্নেহরস ধারা যেমনি স্বাভাবিকভাবে এসেছে, আমিও তা পান করেছি স্বাভাবিকভাবে। জীবন আমার কৃতার্থ হয়ে উঠেছে। সর্বদাই ভেবে এসেছি, কৃষ্ণও যদি আমায় ত্যাগ করেন, মা—সদ্‌গুরুরূপী মা, আমায় কখনো ফেলে দেবেন না তাঁর আশ্রয় থেকে।"

১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে যশোদা মাঈর তিরোধানের পরে মির্তোলার আশ্রমে নামিয়া আসে শোকের কৃষ্ণচ্ছায়া। আর এ শোক তীক্ষ্ণ শায়কের মতো বিদ্ধ হয় গুরুগতপ্রাণ কৃষ্ণপ্রেমের বক্ষে। জীবনে এমন দুঃসহ আঘাত আর কখনো তিনি পান নাই।

এইসময়ে শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায়ের কাছে শোকসংবাদ জ্ঞাপন করিয়া তিনি লিখিয়াছিলেন, "...গলস্টোনের ব্যাধিতে মা মরদেহ ত্যাগ ক'রে চলে গেছেন। দেহান্তের সময় যে পরিপূর্ণ শান্তি বিরাজ করছিল তাঁর ভেতরে তা অবর্ণনীয়। কৃষ্ণ দর্শনের পরিতৃপ্তির আভা ছড়িয়ে পড়েছিল তাঁর চোখে মুখে, মনে হচ্ছিল

বিগত জীবনের বৎসরগুলো সব যেন ঝরে পড়ে গেছে তাঁর দেহ থেকে। আমি ঠিক জানি, তিনি এখনো আমাদের মধ্যে বিরাজ করছেন, এবং আগের চাইতে আরো ঘনিষ্ঠতর রূপেই রয়েছেন, তবু তাঁর দৈহিক সান্নিধ্য হারিয়ে ফেলার ক্ষতি যেন আমি সহ্য করতে পারছিনে। যদিও আমি জানি কৃষ্ণের অবিস্মরণীয় কথা —বৃন্দাবনের ব্রাহ্মণ পত্নীদের তিনি বলেছিলেন—দৈহিক সান্নিধ্য দিয়ে তো শ্রীভগবান্‌কে কখনো লাভ করা যায় না। মা আমাদের আগে থেকেই বলেছিলেন, তাঁর শেষ সময় আসন্ন। কিন্তু এত শীঘ্র যে তিনি চলে যাবেন তা ভাবতে পারি নি। তুমি তো জানো, মা আমার কাছে কোন্ পরমবস্তু ছিলেন—বিশ বছরের অধিক কাল তিনি ছিলেন আমার—সদ্‌গুরু, আর ছিলেন আমার মা। তিনি ছিলেন সেই কেন্দ্রটি, যার চারদিকে আমার সমগ্র জগৎ এতকাল আবর্তিত হয়েছে। এখনো তিনি সেই কেন্দ্ররূপেই বিরাজিতা রয়েছেন, কিন্তু দেহে তাঁকে দর্শন করতে পারছি না, এটাই হয়ে উঠেছে অসহনীয়।"

গুরু এবং গুরুতত্ত্বের আদর্শ সম্পর্কে কৃষ্ণপ্রেমের নিষ্ঠা ছিল অতুলনীয়। এ প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায় একটি মনোজ্ঞ বিবরণ দিয়াছেন। যশোদা মাঈ তখনো জীবিত, সে-বার তাঁহাকে নিয়া কৃষ্ণপ্রেম এলাহাবাদে অবস্থান করিতেছেন। দিলীপকুমারও তখন সেখানে, যশোদা মাঈ এবং অন্যান্য অভ্যাগতদের সম্মুখে বসিয়া সেদিন তিনি গাহিতেছিলেন শঙ্করাচার্যের রচিত প্রসিদ্ধ এক গুরুস্তোত্র। কৃষ্ণপ্রেম এই স্তোত্রসংগীত শুনিতে শুনিতে ভাবতন্ময় হইয়া গিয়াছেন।

সংগীত থামিলে, একজন ভক্ত শ্রোতা কৃষ্ণপ্রেমকে প্রশ্ন করিলেন, "গুরুর কৃপা লাভের প্রধান উপায় কি ?"

উত্তর হইল, "গুরুর প্রতি একাগ্রতা ও ভক্তিনিষ্ঠা।"

"প্রার্থনা ও ধ্যান ধারণা কি গুরুকে উদ্দেশ ক'রে করতে হবে, না শ্রীভগবান্‌কে ভেবে করতে হবে ?"

"দুই-ই করতে পারেন, ফল হবে একই। আসলে, দুই-ই যে এক বস্তু।"

এক কুটতার্কিক অধ্যাপক সেখানে উপবিষ্ট। কহিলেন, "তা কি ক'রে হবে? ভগবান্ একমেবাদ্বিতীয়ম্, তাঁর দ্বিতীয় কেউ নেই, আর গুরু আজকাল গজাচ্ছে পাড়ায় পাড়ায়। তাছাড়া, তন্ত্রসার তো সোজা বলে দিয়েছেন,—মধুলুব্ধ ভৃঙ্গ যেমন পুষ্প থেকে পুষ্পান্তরে ঘুরে ঘুরে মধু সংগ্রহ করে, তেমনি জ্ঞানলুব্ধ শিষ্যও এক গুরু থেকে আর এক গুরুর কাছে যাবে, আহরণ করবে জ্ঞান।"

কৃষ্ণপ্রেম বলিয়া উঠিলেন, "জানি মশাই, ও শ্লোকের কথা জানি। স্যর জন উডরফের তন্ত্রের বই-এ ঐ উদ্ধৃতি বারো বৎসর আগে আমি পড়েছি। কিন্তু উডরফ নিজেই বলেছেন, তান্ত্রিকদের মধ্যে উচ্চকোটি এবং সাধারণ, নানা স্তরের সাধক রয়েছেন। তাছাড়া, এ শ্লোকটিও তিনি সংকলন করেছেন— গুরৌ তুষ্টে শিবস্তুষ্টঃ, গুরুকে তুষ্ট করলেই শিবকে তুষ্ট করা হয়।"

তার্কিক অধ্যাপক তাঁহার খুঁটি কিছুতেই ছাড়িবেন না। বলিলেন, "আসল প্রশ্ন হচ্ছে, জ্ঞানান্বেষী সাধক বিভিন্ন গুরু থেকে জ্ঞান আহরণ করতে পারে কিনা?"

কৃষ্ণপ্রেম দৃঢ়স্বরে বলিয়া উঠিলেন, "মশাই, আপনার কিন্তু গোড়াতেই গলদ রয়েছে। শিক্ষক আর গুরুতে আপনি গোল পাকিয়ে ফেলেছেন। যে সাধক গুরুকে শুধু শিক্ষক বলে মনে করে, সে বহুগুরুর কাছে অবশ্য যেতে পারে। কিন্তু যে গুরুকে গুরুর দেহের বাইরে, সূক্ষ্মতর সত্তায় পেয়েছে, নিজের হৃদয়ের ভেতরে স্থাপন করেছে, সে কখনো স্বপ্নেও ভাবতে পারে না গুরুকে ত্যাগ করার কথা।"

যশোদা মাঈ এবার মুখ খুলিলেন। কহিলেন, "গোপাল, তুমি ঠিকই বলেছো। যে সাধ্বী স্ত্রী তার স্বামীকে সারা মনপ্রাণ দিয়ে ভালোবেসেছে, সত্যিকার ভালোবাসার স্বাদ পেয়েছে, ভালোবাসার তৃষ্ণা মেটাতে সে কি কখনো অপর কোথাও যায়, না যেতে পারে?"

সংশয়ী, তার্কিক অধ্যাপক একথার পর তাড়াতাড়ি সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন।

তিরোধানের পরও গুরু যশোদা মাঈর দৃষ্টি তাঁহার অধ্যাত্ম-তনয় কৃষ্ণপ্রেম হইতে সরিয়া যায় নাই। অন্তরঙ্গ ভক্ত ও বন্ধুদের কাছে কৃষ্ণপ্রেম এ সম্পর্কিত কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন।

সেদিন দণ্ডেশ্বরের ঝর্ণার পাশে যশোদা মাঈর মরদেহ ভস্মীভূত হইবার পর কৃষ্ণপ্রেম ও অন্যান্য ভক্তেরা আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন। সারা দিন দুশ্চিন্তা ও ছুটাছুটিতে কাটিয়াছে, দেহ অতিশয় পরিশ্রান্ত। শয্যায় শয়ন করার পর আসিল গভীর নিদ্রা। অভ্যাসমতো শেষ রাত্রে উঠিয়া প্রত্যহ তিনি ধ্যান ভজন করেন, কিন্তু সেদিন দেহ অবসন্ন, তাই যথাসময়ে নিদ্রা ভাঙে নাই। হঠাৎ এসময়ে তিনি শুনিতে পান বিদেহী যশোদা মাঈর কণ্ঠস্বর, "গোপাল, একি, এখনো ঘুমিয়ে আছো? ভজনে বসবার সময় যে চলে যাচ্ছে" একটু থামিয়া, আশ্বাসের সুরে মা আবার বলিলেন, "গোপাল, আমি কিন্তু এখনো আগের মতো তোমার পাশে রয়েছি।"

কৃষ্ণপ্রেম ধড়মড় করিয়া উঠিয়া পড়েন। মায়ের কণ্ঠস্বর শুনিয়া দুইচোখ সজল হইয়া উঠে, কাতর স্বরে বলিয়া উঠেন, "মা, যদি তুমি আমার পাশেই রয়েছো, তবে তোমায় দেখতে পাচ্ছিনে কেন? আর কি আমায় দেখা দেবে না?"

"না বাবা, ধাপের পর ধাপ এগিয়ে, তোমারই যে আসতে হবে আমার কাছে। তোমার সাধনা ঠিক মতো চালিয়ে যাও, এখানে এই লোকে এসে আমার দেখা পাবে।" অদৃশ্যলোকের ঐ বিশেষ চৈতন্য-স্তর হইতে যশোদা মাঈ ইহার পর আরো কিছুকাল তাঁহার গোপালকে নির্দেশাদি দিয়াছেন। পরবর্তীকালে, এই দৈবী কণ্ঠস্বর আর শোনা যায় নাই।

আমাদের প্রীতিভাজন ডঃ গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় তাঁহার একবারকার একটি অভিজ্ঞতার কথা প্রকাশ করিয়াছেন। কৃষ্ণপ্রেম

ও মতিরানী সে সময়ে বৃন্দাবনে গিয়াছেন। তাঁহাদের আহ্বান পাইয়া কাশী হইতে গোবিন্দগোপালও সেখানে গিয়া উপস্থিত হন। সবাই মিলিয়া কুঞ্জে কুঞ্জে ঘুরিতেছেন, ঠাকুর দর্শন করিতেছেন; ভজন কীর্তন ও অন্তরঙ্গ কথাবার্তায় দিন বেশ আনন্দে কাটিতেছে।

ইতিমধ্যে গোবিন্দগোপালের দাদার এক টেলিগ্রাম সেখানে হাজির। কৃষ্ণপ্রেমের সহিত তাঁহার দীর্ঘদিনের বন্ধুত্ব, তিনি সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইয়াছেন, মির্তোলায় ফিরিবার আগে কৃষ্ণপ্রেম যেন তাঁহার কাছে বৈদ্যনাথধামে একবার অবশ্য যান।

সেখানে যাওয়া সম্পর্কে সোৎসাহে আলাপ আলোচনা চলিতেছে, এসময়ে কৃষ্ণপ্রেম হঠাৎ কহিলেন, "তোমরা একটু অপেক্ষা করো, আমি ভেতর থেকে আসছি।"

কিছুক্ষণ পরে নিজকক্ষ হইতে বাহির হইয়া আসিয়া গম্ভীরকণ্ঠে তিনি কহিলেন, "মায়ের নির্দেশ এইমাত্র আমি পেলাম। বললেন, 'সরাসরি মির্তোলায় চলে যাও। সেখানে তোমাদের উপস্থিতির প্রয়োজন আছে। ব্যাপারটা খুব জরুরী।"

ত্রস্তব্যস্ত হইয়া কৃষ্ণপ্রেম মির্তোলায় গিয়া উপস্থিত হন। দেখেন, আগের দিন ভারপ্রাপ্ত পূজারীটি আশ্রম হইতে পলায়ন করিয়াছে। সেদিন তাঁহারা মির্তোলায় না পৌছিলে ঠাকুরের পূজা অর্চনা হইত না, এবং তাঁহাকে উপবাসীও থাকিতে হইত।

রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহের নানা লীলা বৈচিত্র্য উত্তর বৃন্দাবন আশ্রমের ভক্তেরা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

অধিকাংশ দিন ঠাকুরের ভোগ কৃষ্ণপ্রেম নিজেই অতিশয় শ্রদ্ধা সহকারে প্রস্তুত করিতেন। একদিন আশ্রমে খুব ভালো ঘৃত সংগৃহীত হইয়াছে। কৃষ্ণপ্রেম সযত্নে ইহা দিয়া হালুয়া তৈরি করিলেন। ভোগ নিবেদন করার পর দরজা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল, প্রাঙ্গণে বসিয়া সবাই শুরু করিলেন জপধ্যান। কিছুক্ষণ পরে কৃষ্ণপ্রেম হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইলেন, কহিলেন, "মনে হচ্ছে, ঠাকুর আজ ভোগ

আস্বাদন ক'রে খুশী হয়েছেন। চলতো, সবাই গিয়ে দেখি প্রসাদের অবস্থা কি। সত্য সত্যই আজ কিছুটা খেয়েছেন কিনা।"

যশোদা মাঈ পাশেই বসিয়াছিলেন। গোপালের কথা শুনিয়া তিনি নীরবে শুধু মুচকি হাসিলেন। অতঃপর আশ্রমিকেরা মন্দির কক্ষে ঢুকিয়া দেখেন, ঠাকুর স্থূল দেহীর মতো সত্য সত্যই সেদিন ভোগ গ্রহণ করিয়াছেন, শুধু তাই নয়, হালুয়ার বেশীটা অংশই প্রভু উড়াইয়া ফেলিয়াছেন, বালগোপালের কচি আঙুলের ছাপটি দেখা যাইতেছে স্পষ্টরূপে। এই দৃশ্য দেখিয়া সবাই মহা আনন্দিত। সোৎসাহে তাঁহারা শুরু করিলেন ভজন ও কীর্তন।

ঠাকুর এবং ঠাকুরানীর প্রেমলীলার বৈচিত্র্যও মাঝে মাঝে দেখা যাইত। একদিন প্রত্যূষে মন্দিরের দ্বার খুলিয়া কৃষ্ণপ্রেম ঘরে ঢুকিয়াছেন। শ্রীমূর্তির দিকে নজর পড়িতেই চমকিয়া উঠিলেন। একি অদ্ভুত দৃশ্য! কৃষ্ণের পায়ের সোনার নূপুর দুটি স্থানান্তরিত হইয়াছে রাধারানীর পায়ে, আর রাধারানীর সোনার হারটি চলিয়া আসিয়াছে কৃষ্ণের গলায়।

কৃষ্ণপ্রেম উচ্চ স্বরে সবাইকে ডাকিয়া আশ্রমের মন্দিরে জড়ো করিলেন। আগের রাত্রে আরতির পরে সর্বসমক্ষে শ্রীবিগ্রহের শয়ান দেওয়া হইয়াছে। তারপর সারা রাত তো মন্দিরের দুয়ার ছিল তালাবদ্ধ। ভক্তেরা মহা উল্লসিত, শ্রীবিগ্রহের এই মানুষী লীলার কথা নিয়া তাঁহারা সোৎসাহে আলোচনা করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণপ্রেমের চোখে মুখে দিব্য আনন্দের আভা। কহিলেন, "দ্যাখো দেখি ঠাকুর ঠাকুরানীর কি কাণ্ড! ভক্তের হৃদয় মঞ্চে, মন্দিরের বেদীতে, আর অপ্রাকৃত ব্রজধামে সবখানেই সেই একই লীলা-বিলাস।"

কৃষ্ণপ্রেমের সাধনার একটা বড় ধাপ—রাধারানীর কৃপাপ্রাপ্তি। এই কৃপা দিনের পর দিন তাঁহার সাধনজীবনের নানা প্রশ্নের মীমাংসা যেমন করিয়া দিত, তেমনি করিত আশ্রম জীবনের এবং বহিরঙ্গ জীবনের নানা কর্মের দিক্‌দর্শন।

কোনো ভক্ত কখনো দীক্ষাপ্রার্থী হইলে অথবা কোনো ভগবৎ-তত্ত্বের দিক্‌দর্শন প্রার্থনা করিলে কৃষ্ণপ্রেম বলিয়া উঠিতেন, "অপেক্ষা করো, রাধারানীর অনুমতি আগে নিয়ে নিই।" তারপর প্রবেশ করিতেন মন্দিরে, কিছুকাল ধ্যানাবিষ্ট থাকার পর ফিরিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসু ভক্তকে দিতেন তাঁহার প্রার্থিত সাহায্য।

জীবনের শেষ পর্যায়ে যাঁহারা তাঁহাকে দেখিয়াছেন, লক্ষ্য করিয়াছেন, তাঁহার জীবন যেন শ্রীরাধার ভাবেই আবিষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। কীর্তনে রাধার নাম, ভাষণে রাধা, আবার কাহাকেও অভিবাদন বা সম্বোধন করিতে হইলেও 'জয় রাধে'।

বন্ধুবর হেরম্ব মুখোপাধ্যায় একবার কয়েক মাস মির্তোলায় কৃষ্ণপ্রেমের অতিথিরূপে আহ্বান করেন এবং তাঁহার অশেষ স্নেহ ও কৃপালাভ করেন। এ সময়ে কৃষ্ণপ্রেমের প্রমুখাৎ রাধারানীর এক মনোজ্ঞ লীলা কাহিনী তিনি শুনিয়াছিলেন।

ভক্ত সুনীল এবং তাঁহার স্ত্রী আরতি দেবী মির্তোলার আশ্রমের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। কৃষ্ণপ্রেমের কাছে দীক্ষা প্রাপ্ত হইয়া তাঁহারা সাধনভজন করিতেন। সুনীল থাকিতেন এলাহাবাদে, আর মাঝে মাঝে অফিসের কাজে ছুটি নিয়া সপরিবারে উপস্থিত হইতেন গুরুর সকাশে।

সেবার উভয়েরই মনে প্রবল ইচ্ছা জাগিয়াছে, মির্তোলা আশ্রমে গিয়া কয়েকদিন কাটাইয়া আসিবেন। মাসের শেষ, হাতে তখন তেমন টাকাকড়ি নাই, পাথেয় কি করিয়া যোগাড় করা যায়?

ভক্তিমতী স্ত্রী আরতি এ সমস্যার সমাধান করিয়া দিলেন। হাতের সোনার বালা-জোড়া বিক্রয় করিয়া সংগ্রহ করিলেন রেল ভাড়ার টাকা। অতঃপর পরমানন্দে তাঁহারা মির্তোলার আশ্রমে চলিয়া আসিলেন।

কয়েকদিন পরের কথা। ঠাকুরের সেবা পূজা ও ভজনাদি শেষ হওয়া মাত্র কৃষ্ণপ্রেম আঙিনায় আসিয়া দাঁড়ান। হাতে তাঁহার এক জোড়া সোনার বালা। সুনীল ও আরতি কাছে আসিতেই স্নিগ্ধ

স্বরে কহিলেন, "আচ্ছা আরতি, তোমার বালা দু'গাছা কি করেছো বলতো? সত্যি ক'রে বলো।"

আরতির মুখে কোনো কথা নাই, সসংকোচে তিনি দাঁড়াইয়া আছেন।

স্মিতহাস্যে কৃষ্ণপ্রেম এবার কহিলেন, "ছাখো, রাধারানী এই মাত্র আমায় সব কথা জানিয়ে দিলেন। মির্তোলায় আসবার খরচ-পত্র তোমরা তাড়াতাড়ি জোটাতে পারছিলে না, তাই শেষটায় আরতির সোনার বালা বিক্রি করতে হয়েছে। তাইতো রাধারানী বললেন, 'আমার হাতের বালা জোড়া খুলে নাও, আরতিকে দিয়ে দাও। ওর হাত বড্ডো খালি দেখাচ্ছে।"

রাধারানীর নির্দেশমতো তাঁর ঐ অলংকার আরতি দেবীকে দিয়ে দেওয়া হল। ভক্তের তপস্যায় জাগ্রত উত্তর বৃন্দাবনের রাধারানী বিগ্রহ আরো বহুতর লীলা উত্তরকালে প্রকটিত করিয়াছেন।

১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের কথা। দাক্ষিণাত্যের কয়েকটি তীর্থ ভ্রমণের উদ্দেশ্যে কৃষ্ণপ্রেম সেবার মির্তোলা হইতে বাহির হইয়াছেন। প্রথমে মাদ্রাজ ও পণ্ডিচেরী হইয়া পৌছিলেন তিরুভন্নামালাই-এ মহর্ষি রমণের আশ্রমে। মহর্ষির জ্ঞানময় সাধন পথ এবং যশোদা মাঈর প্রেমের পথে পার্থক্য প্রচুর, তবুও এই আত্মজ্ঞানী মহাপুরুষের উপর চিরদিনই কৃষ্ণপ্রেমের অগাধ শ্রদ্ধা ছিল। মহর্ষিকে প্রণাম করিয়া দুই চারিটি প্রধান বিগ্রহ দর্শন করিয়া মির্তোলায় ফিরবেন, ইহাই তাঁহার মনোগত ইচ্ছা। মহর্ষি সন্দর্শনের মনোজ্ঞ অভিজ্ঞতার কাহিনীটি বিভিন্ন সময়ে অন্তরঙ্গ ভক্তদের কাছে কৃষ্ণপ্রেম বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার ঐ দর্শনের অব্যবহিত পরেই আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু, 'দাদাজী' ডুরাই স্বামী আইয়ার, তিরুভন্নামালাই-এ উপস্থিত হন। মহর্ষির ঘনিষ্ঠ মহল হইতে কৃষ্ণপ্রেমের দিব্য অনুভূতিময় অভিজ্ঞতার কথা তিনি শুনিয়াছিলেন। মহর্ষি এবং কৃষ্ণপ্রেমের তখনকার সাক্ষাৎকারের ঘটনাটি এইরূপ :

আহার ও বিশ্রামের পর কৃষ্ণপ্রেম মহর্ষির হলঘরে গিয়া তাঁহাকে প্রণাম নিবেদন করেন, নিচে একপাশে উপবিষ্ট হইয়া শুরু করেন ধ্যান মনন। মহর্ষি তাঁহার কৌচটিতে হেলান দিয়া শুইয়া আছেন। আয়ত নয়ন দুটির দৃষ্টি কোন্ দুর্জ্ঞেয় রহস্যলোকে উধাও হইয়া গিয়াছে। ঠোঁটের কোণে অর্ধস্ফুট প্রসন্নতার হাসি। ত্রিশ চল্লিশটি ভক্ত ও দর্শনার্থী তাঁহার সম্মুখে উপবিষ্ট। কেহ অবাক্ বিস্ময়ে এই আত্মজ্ঞানী মহাত্মার দিকে নির্নিমেষে চাহিয়া আছেন, কেহবা রত রহিয়াছেন প্রাত্যহিক এবং নিয়মিত ধ্যান জপে।

অল্পক্ষণের মধ্যেই কৃষ্ণপ্রেম দিব্য ভাবে আবিষ্ট হইয়া পড়েন। সঙ্গে সঙ্গে অন্তরের অন্তস্তল হইতে বার বার ধ্বনিত হইতে থাকে একটি অস্ফুট স্বরের প্রশ্ন—'কে তুমি? কে তুমি? কি তোমার প্রকৃত স্বরূপ?'

রাধাকৃষ্ণের প্রেমের একনিষ্ঠ সাধক কৃষ্ণপ্রেম, ভক্তিপ্রেম আর বিগ্রহ সেবায় দিনরাত থাকেন মশগুল। অন্তর্লোক হইতে উত্থিত ঐ প্রশ্ন শুনিয়া চমকিয়া উঠিয়াছেন বটে, কিন্তু গোড়ার দিকে তেমন আমল দেন নাই। কিন্তু তিনি এড়াইতে চাহিলেও, এ প্রশ্ন এবং নেপথ্যচারী প্রশ্নকর্তা তো তাঁহাকে ছাড়িতে চাহে না। আবার তাঁহার চৈতন্যের দ্বারে বার বার আসে করাঘাত। কে যেন বলিতে থাকে—কে তুমি, কে তুমি, কি তোমার স্বরূপ?

ভাবাবিষ্ট অবস্থাতেই উত্তর দিতে চেষ্টা করেন কৃষ্ণপ্রেম বলেন, "আমি কৃষ্ণের নগণ্য দাস মাত্র।"

আবার ধ্বনিত হয় দৈবী প্রশ্ন—"কে কৃষ্ণ, কে কৃষ্ণ?"

"কৃষ্ণ শ্রীনন্দের নন্দন। বংশীধর, রসময়, ভক্তের প্রাণধন।"

তবুও বিরাম নাই অন্তরাত্মা হইতে উত্থিত সেই দৈবী প্রশ্নের। এবার কৃষ্ণপ্রেম কৃষ্ণের স্বরূপ ও পরিচিতির পরিধি বাড়াইতে থাকেন, বলেন, "কৃষ্ণ অবতার, পরাৎপর, সারাৎসার। তবুও দৈবী প্রশ্নকর্তার নিরস্ত হইবার লক্ষণ নাই। অতঃপর অনন্যোপায় হইয়া কৃপাময়ী রাধারানীর শরণ নেন কৃষ্ণপ্রেম। রাধারানী বলিয়া দেন 'কৃষ্ণ ছাড়া

বিশ্ব সৃষ্টিতে দ্বিতীয় কোনো বস্তুর অস্তিত্ব নেই। তবে কৃষ্ণের পরিচয় কে দেবে? কে জ্ঞাপন করবে তাঁহার স্বরূপ আর মাহাত্ম্য? শুধু কৃষ্ণই যে বলতে পারেন কৃষ্ণের কথা। যতো বাচা নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসাসহ—মানুষের সাধ্য কি যে তাঁর সম্বন্ধে বলবে?"

পরের দিন প্রভাতে কৃষ্ণপ্রেম আশ্রমের হলঘরে মহর্ষির পায়ের কাছাকাছি বসিয়া আছেন। মহর্ষি একটু ঘুরিয়া বসিয়া তাঁহার দিকে করিলেন প্রসন্নমধুর দৃষ্টিপাত—অগাধ অতলস্পর্শী দৃষ্টি হইতে স্বর্গের সুধা যেন অঝোর ঝরিয়া পড়িতেছে। নীরবে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া মহর্ষি মুচকি হাসি হাসিলেন। সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণপ্রেমের কাছে মহর্ষির লীলা খেলাটি পরিষ্কার হইয়া উঠিল। উপলব্ধি করিলেন, গতকাল যে দৈবী প্রশ্ন বার বার তাঁহার অন্তস্তল হইতে উত্থিত হইয়াছে, মহর্ষিই ছিলেন তাহার পিছনে।

প্রসন্ন মনে, নয়ন নিমীলিত করিয়া, কৃষ্ণপ্রেম ধ্যানে বসিলেন। অল্পক্ষণের মধ্যে অনাস্বাদিতপূর্ব দিব্য আনন্দে তাঁহার সারা দেহমন-প্রাণ প্লাবিত হইয়া গেল।

এই আনন্দের আবেশ কিছুটা কাটিয়া যাইতেই মহর্ষির দিকে তাকাইয়া কৃষ্ণপ্রেম মনে মনে প্রশ্ন করিলেন, 'যদি এতটা কৃপাই আমায় করেছেন, হে মহাত্মন্, তবে এবার আমায় জানিয়ে দিন কে আপনি, কি আপনার স্বরূপ, কি আপনার তত্ত্ব?'

এই নীরব প্রশ্নটি করার পর মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখেন, এ কি অদ্ভুত কাণ্ড, মহর্ষি তাঁহার কৌচে নাই! এতগুলি ভক্ত ও দর্শনার্থীর দৃষ্টির সম্মুখ হইতে মুহূর্ত মধ্যে স্থূলদেহটি কোথায় উড়িয়া গেল? কোথায় তিনি অন্তর্হিত হইলেন? এ কি কৃষ্ণপ্রেমের দৃষ্টি বিভ্রম না মহর্ষিরই অলৌকিক লীলা?

নিজের চোখ দুইটি ক্ষণতরে নিমীলিত করিয়া কৃষ্ণপ্রেম আবার তাকাইলেন কৌচের দিকে। এ কি! এবার যে মহর্ষি সশরীরে জীবন্ত শিবের মতো সেখানেই উপবিষ্ট রহিয়াছেন। শুধু তাহাই নয়, কৃষ্ণপ্রেমের দিকে অপাঙ্গে স্মিতহাস্যে একটু তাকাইয়া মুখটি

ফিরাইয়া নিলেন অন্যদিকে। স্থূল শরীরের এই চকিত আবির্ভাব আর অন্তর্ধান, এই 'ঝাঁকি দর্শন', সেদিন কৃষ্ণপ্রেমকে কোন্ তত্ত্ব জানাইয়া দিয়া গেল? শ্রদ্ধায় বিস্ময়ে অভিভূত কৃষ্ণপ্রেম এ সময়ে অস্ফুট স্বরে আপন মনে কহিতে লাগিলেন, "মহর্ষি, আপনার কৃপায় আমি বুঝেছি;—স্থূল সূক্ষ্মের গণ্ডীর বাইরে, দ্বন্দ্বাতীতলোকে, আপনি রয়েছেন সদা বিরাজিত। আত্মজ্ঞানী হে মহাসাধক আপনাকে প্রণাম, বার বার প্রণাম।"

আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু, উচ্চকোটির গুপ্ত সাধক শ্রীএস, ডুরাইস্বামী আইয়ারের সহিত মহর্ষি রমণের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল।[১] কৃষ্ণপ্রেমের তিরুভন্নামালাই-এ যাওয়ার কিছুদিন পরে ডুরাইস্বামী মহর্ষি রমণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যান। সে সময়ে মহর্ষি কথা প্রসঙ্গে তাঁহাকে বলেন, "তুমি কি কৃষ্ণপ্রেমকে জানো? এবার সে এখানে এসেছিল।"

ডুরাইস্বামী উত্তরে বলেন, "আমি তাঁর কথা, তাঁর ত্যাগ তিতিক্ষার কথা, অনেক শুনেছি। আমার কয়েকটি বন্ধু কৃষ্ণপ্রেমকে অন্তরঙ্গ ভাবে জানেন। তবে আমার সঙ্গে তাঁর দেখা হয় নি কখনো।"

মহর্ষি রমণ কহিলেন, "দেখা ক'রো তার সঙ্গে। ত্যাগী, প্রাণ-সুন্দর পুরুষ—জ্ঞানী আর ভক্ত একাধারে সে দুই-ই।"

কয়েক বৎসর পরে ডুরাইস্বামীর সহিত কৃষ্ণপ্রেমের সাক্ষাৎ ঘটে কলিকাতায়, হিমাদ্রি পত্রিকার অফিসে। সে সময়ে উভয়ে উভয়কে ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে পাইয়া আনন্দে উচ্ছল হইয়া উঠেন।

তিরুভন্নামালাইর পর ত্রিচিনপল্লী হইয়া কৃষ্ণপ্রেম শ্রীরঙ্গমে উপনীত হন। এ স্থানে প্রভু রঙ্গনাথের সম্মুখে যে অলৌকিক দর্শন

১ এস ডুরাইস্বামী আইয়ার কর্মজীবনে ছিলেন মাদ্রাজ হাইকোর্টের শ্রেষ্ঠ অ্যাডভোকেট। শ্রীঅরবিন্দের অধ্যাত্ম-জীবনের অন্তরঙ্গ সহচর ছিলেন তিনি, আর ছিলেন মহর্ষি রমণের স্নেহধন্য, কৃপাধন্য। পরবর্তীকালে ডুরাইস্বামী যোগীশ্বর কালীপদ গুহরায়ের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসেন এবং তাঁহার কৃপাপ্রাপ্ত হন।

ও দিব্য অনুভূতি তিনি লাভ করেন, তাহার স্মৃতি জীবনে কোনো দিন তিনি ভুলিতে পারেন নাই। হঠাৎ কখনো কখনো মনের দুয়ার খুলিয়া গেলে, কৃষ্ণপ্রেম অন্তরঙ্গ মহলে এই অধ্যাত্ম-অভিজ্ঞতার কথা বিবৃত করিতেন।

পুণ্যতোয়া কাবেরীতে স্নান সমাপন করিয়া কৃষ্ণপ্রেম শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করিয়াছেন। শেষশায়ীপ্রভু রঙ্গনাথের মূর্তির দিকে কিছুক্ষণ মুগ্ধনেত্রে তাকাইয়া থাকার পর তাঁহার ধ্যাননেত্রে উদ্‌ভাসিত হইয়া উঠে এক অলৌকিক দৃশ্য। দেখেন, দিব্যালোকের তরল জ্যোতির ধারা সারা বিশ্ব সৃষ্টিতে ওতপ্রোত রহিয়াছে আর ঐ জ্যোতির সাগরে বিরাজিত রহিয়াছেন পরম প্রভু শ্রীকৃষ্ণ এবং রাধারানী। ঠাকুর আর ঠাকুরানীর চরণপদ্ম হইতে নিঃসৃত হইতেছে দিব্যপ্রেমের অনন্ত প্রবাহ—আর এই প্রবাহে সমস্ত বিশ্বসংসার হইয়া উঠিয়াছে প্রেমময় চৈতন্যময়।

উত্তরকালে যখনি কৃষ্ণপ্রেম এই দিনকার দিব্য উপলব্ধির কথা বলিতেন, তখনি মন্তব্য করিতেন, "ভারতের মন্দির ও সিদ্ধপীঠগুলো আধ্যাত্মিকতার এক একটি শক্তি-কেন্দ্র। নিষ্ঠা নিয়ে, অহংবোধ বিবর্জিত হয়ে, এসব পুণ্যস্থলীতে গিয়ে তপস্যা করলে পরম বস্তু পাওয়া যায় বৈ কি।"

নির্মোহ, অভিমানহীন, প্রেমিক মহাপুরুষ ছিলেন কৃষ্ণপ্রেম। তাঁহার চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্য সাক্ষাৎভাবে দেখার সুযোগ আমরা একবার পাইয়াছি এলাহাবাদে থাকার সময়ে কৃষ্ণপ্রেমের (তৎকালীন রোনাল্ড নিক্‌সন) সহিত শ্রীযুক্ত বীরেন ব্যানার্জির ঘনিষ্ঠতা জন্মে। এই ঘনিষ্ঠতা উত্তরকালে পরিণত হয় শ্রদ্ধায় ও ভালোবাসায়। বীরেন ব্যানার্জি মহাশয় কলিকাতার একটি প্রতিষ্ঠানের অফিসার ছিলেন। দূরে থাকেন বলিয়া কৃষ্ণপ্রেমের হিমালয় আশ্রমে সব সময়ে যাওয়া ঘটিত না, কিন্তু পত্রের মাধ্যমে সর্বদা যোগাযোগ রাখিতেন।

কলিকাতায় যোগীশ্বর কালীপদ গুহরায়কে বীরেনবাবু ভক্তি-

শ্রদ্ধা করিতেন এবং নিয়তই হিমাদ্রি পত্রিকার অফিসে, তাঁহার নিভৃত কক্ষে আসিয়া তাঁহার পুণ্যসঙ্গ লাভ করিতেন।

একদিন শ্রীগুহরায়ের কক্ষে বসিয়া লেখক দুই একটি ব্যক্তিগত কথা বলিতেছেন এমন সময়ে বীরেনবাবু সেখানে ঢুকিলেন। চেয়ারে বসার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীযুক্ত গুহরায় বলিলেন, "কি ব্যাপার? কয়েকদিন দেখি নি কেন? আপনাকে যেন এক নূতন মানুষ দেখ্‌ছি?"

"না-না নূতন আর কি হবো, যথা পূর্বং পরং", বলিয়া ব্যানার্জি মহাশয় ঢোক গিলিতেছেন।

"ফাঁস ক'রে দেবো নাকি আপনার গোপন প্রেমের কথা? এখানে বাইরের কেউ নেই।"

"কি যে বলছেন—" বলিয়া ব্যানার্জি মহাশয় তখন বিপন্নভাবে আমতা-আমতা করিতেছেন।

শ্রীযুক্ত গুহরায় উচ্চরবে হাসিয়া কহিলেন, "আরে, ভালো সন্দেশ, সবাইকে তা বেঁটে দিতে হয়। লুকোচ্ছেন কেন? কৃষ্ণপ্রেমের কাছে দীক্ষা নিয়েছেন, এতো ভালো কথা। কোথায় কিভাবে কোন্ ভঙ্গীতে বসে, কি মন্ত্র নিয়েছেন, সব যে আমার জানা।"

"আপনার কাছে, দাদা, কিছুই লুকোনা যায় না, তা দেখেছি। সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান্ যোগী আপনি। তা আমাদের মতো চুনোপুঁটিকে নিয়ে টানা-হ্যাচড়া করা কেন?"

"আপনি বুঝি ভাব্‌ছিলেন, লোকে বলবে—বীরেন ব্যানার্জি অনেক দিন বিলেতে ছিলেন, এখানে এসেও সাহেব-গুরু ছাড়া আর কাউকে পছন্দ করলেন না—এই তো? এ জন্যই তো এতো গোপনতা।" কৌতুকের সুরে বলেন শ্রীযুক্ত গুহরায়।

"না না, তা নয়। ভাবছিলুম, আমার মতো লোকের দীক্ষা, এ আর আপনাকে জানাবার মতো কি সংবাদ।"

"না না, এ খুব সুসংবাদ। আমি আপনাকে ভালোবাসি, তাই বিশেষ ক'রে খুশী হয়েছি এই দেখে যে, আপনি উপযুক্ত গুরু পেয়েছেন। কৃষ্ণপ্রেম খাঁটি বস্তু।"

বীরেন ব্যানার্জি মহাশয়ের বয়স হইয়াছে, শরীরও তেমন ভালো নয়, গুরুর কাছে সব সময়ে যাওয়া আসা করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব নয়। যোগীশ্বর কালীপদ গুহরায়ের প্রতি তাঁহার প্রচুর শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস, নির্ভরতাও ছিল। গুরুকে তিনি সব সময়ে কাছে পান না, তাই অনন্যোপায় হইয়া একদিন নিজের সাধন সম্পর্কিত একটি সমস্যায় গুহরায় মহাশয়ের পরামর্শ চাহিলেন।

শ্রীযুক্ত গুহরায় বলিলেন, "তা তো হয় না। আপনার গুরু কৃষ্ণ-প্রেমের কাছ থেকে তাঁর অনুমতি আনিয়ে নিন, নইলে আপনাকে আমি সাহায্য করি কি ক'রে ?"

কয়েকদিন পরে ব্যানার্জি মহাশয় বলিলেন, "গোপাল-দা'র (কৃষ্ণপ্রেমের) কাছে চিঠি দিয়েছিলাম, তিনি লিখেছেন,—বীরেন, তুমি যোগীবরের কাছ থেকে উপদেশ অবশ্যই নিতে পারো। তোমার কথা রাধারানীর কাছে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, তিনি জানালেন, এতে তোমার কল্যাণই হবে।"

শ্রীযুক্ত গুহরায় একথা শুনিয়া সহাস্যে কহিলেন, "এই দেখুন গুরু আপনার কৃষ্ণপ্রেমের প্রকৃত মহত্ত্ব। আমার কাছ থেকে আপনি নির্দেশ নিলে গুরু হিসেবে তাঁর আপত্তির কারণ নেই। আচ্ছা, সারা ভারতবর্ষে ক'জন গুরু এমন কথা, এমন মন খুলে বলতে পারেন ?"

বীরেন ব্যানার্জি মহাশয়ের সম্পর্কিত এই ঘটনাটি হইতে বুঝা যায়, প্রেমসাধনার কোন্ উত্তুঙ্গ স্তরে কৃষ্ণপ্রেম বিরাজিত ছিলেন, আর ভারতের উচ্চকোটির মহাত্মাদের সহিত তাঁহার যোগাযোগ ছিল কত ঘনিষ্ঠ।

সে-বার কিছুদিনের জন্য কৃষ্ণপ্রেম কলিকাতায় আসিয়াছেন। যোগীশ্বর কালীপদ গুহরায় এবং কৃষ্ণপ্রেম উভয়েরই উভয়কে দেখার প্রবল ইচ্ছা। হিমাদ্রি পত্রিকার অফিসে সাক্ষাতের ব্যবস্থা হইল, আমরা পূর্বাহ্নেই জানাইয়া দিলাম, কৃষ্ণপ্রেমের ভজন কীর্তন আমরা শুনিব। কয়েকটি ভক্ত-শিষ্য নিয়া, সন্ধ্যার পর 'জয় রাধে' বলিয়া

কৃষ্ণপ্রেম সেখানে উপস্থিত হইলেন। ন, দুই মহাত্মার মিলনে আনন্দের জোয়ার বহিয়া গেল।

কীর্তন শুরু হইয়াছে। ভাবাকুল নেত্রে কৃষ্ণপ্রেম গাহিতেছেন, আর তরুণ ভক্ত মাধবাশীষ বাজাইতেছেন মৃদঙ্গ। সারা দেহ-মন-প্রাণ দিয়া যে কীর্তন গাওয়া হয়, ভক্তের অন্তস্তল হইতে উৎসারিত হইয়া যে কীর্তন সারাসরি পৌঁছে গিয়া ইষ্টদেবের চরণ-কমলে, এ সেই প্রাণময় চৈতন্যময় কীর্তন। মরমী শ্রোতারা উপলব্ধি করিলেন, এই ভজন কীর্তন কৃষ্ণপ্রেমের ঠাকুর-সেবা ও ঠাকুর-পূজার এক প্রধান অন্যতম উপচার।

নয়ন মুদিয়া, গদ্‌গদ কণ্ঠে, করতাল জোড়া বাজাইয়া কৃষ্ণপ্রেম গাহিয়া চলিয়াছেন :

সুন্দরী রাধে আওয়ে ধনি।
ব্রজ রমণীগণ মুকুটমণি।

সারা হলঘরটি সুধী ভক্ত শ্রোতাদের সমাগমে ভরিয়া উঠিয়াছে। কোথাও তিলধারণের স্থান নাই, কাহারো মুখে একটি শব্দ নাই। ভাবতন্ময়, দীর্ঘবপু, শালপ্রাংশু মহাভুজ এই ইংরেজ বৈষ্ণবের দিকে নির্নিমেষে অবাক্ বিস্ময়ে শ্রোতারা সবাই চাহিয়া আছেন, আর ভাবিতেছেন রাধারানী এবং কৃষ্ণের কৃপা কি অঝোর ধারেই না ঝরিয়াছে এই মহাবৈষ্ণবের আধারে। এ গান শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ধরিলেন রাধা-প্রেমের ভিখারী কৃষ্ণের আর এক মর্মস্পর্শী গান :

কিশোরীর দাস আমি পীতবাস
ইহাতে সন্দেহ যার।
কোটিযুগ যদি আমারে ভজয়ে
বৃথাই সাধনা তার।

প্রায় রাত একটা অবধি ভজন কীর্তন চলিল। শ্রোতারা সবাই মন্ত্রমুগ্ধ, সার্থকনামা সাধকের চৈতন্যময় সংগীত তাঁহাদের পৌঁছাইয়া দিয়াছে রাধাকৃষ্ণ-প্রেমের দিব্যলোকে।

কীর্তনের শেষে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিলেন কৃষ্ণপ্রেম। একজন শ্রোতা কহিলেন, "রাধারানীর উদ্দেশে নিবেদিত আপনার গানগুলি অনেকেরই চোখে জল এনে দিয়েছে। আজকাল আপনি দেখছি, রাধাপ্রেমেই বেশী বিভাবিত।"

"রাধা কৃষ্ণশক্তি। রাধা আর কৃষ্ণে তফাত কোথায়? কৃপাময়ীর কৃপার বলেই যে কৃষ্ণকে ধরা ছোঁয়া যায়। আজকাল রাধারানীই চালাচ্ছেন আমায়, যা কিছু পাবার পাচ্ছি তাঁর কাছ থেকেই।"

আবার একজন শ্রোতা কৃষ্ণপ্রেমকে অনুরোধ করিলেন "কৃষ্ণ ভজনের পথ কি, সংক্ষেপে আমাদের একটু বলুন।"

তিনি উত্তর দিলেন, "পথ তো একটাই। সেটি হচ্ছে ঠাকুরের রাজপথ, সবারই তা চেনা। সব দিয়ে, সর্বময়কে পেতে হবে। তবে কে কিভাবে সে পথে এগুবে, সেইটাই প্রশ্ন। গীতায় ভগবান্ কৃষ্ণ তো নিজেই তাঁর কথাটি সহজ ক'রে পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছেন—

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাম্ নমস্কুরু।
মামেবৈশ্যসি সত্যম তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে।

—মনকে একাগ্র করো আমার দিকে, তোমার ভক্তি দাও আমায়, সব কিছু কর্ম অর্পণ করো আমার সেবা পূজায়, তাহলেই তুমি আসবে আমার কাছে, আমার প্রিয় হবে, এ প্রতিশ্রুতি তোমায় আমি দিচ্ছি।

আরো কয়েকবার দেখা হইয়াছিল কৃষ্ণপ্রেমের সঙ্গে। একদিন ভজন ও তত্ত্বালোচনা শুনিতে অনেকে সেখানে জড়ো হইয়াছেন। প্রসঙ্গক্রমে কৃষ্ণপ্রেমকে বলিলাম, "বেশ আছেন আপনারা হিমালয়ের কোলে মির্তোলায়। সমস্যা-জর্জর আধুনিক সমাজের ছোঁয়া সেখানে পৌঁছে না, কানে আসে না হিংসা ও আর্তির কণ্ঠস্বর। কৃষ্ণ আর রাধারানীকে নিয়ে পরমানন্দে রয়েছেন উত্তর বৃন্দাবনের আশ্রমিকেরা।"

সাধক কৃষ্ণপ্রেমের দৃষ্টি সদাই ছিল স্বচ্ছ, নির্মোহ এবং একাগ্র। ভাবালুতা আর সংশয়ী কূটতার্কিকতা দুইয়েরই উর্ধ্বে ছিলেন তিনি,

আর সাধনজাত সূক্ষ্ম অনুভূতির বলে যে কোনো প্রশ্নের মর্মমূলে পৌঁছিতে পারিতেন মুহূর্তমধ্যে। উত্তরে কহিলেন "এই পাগ্‌লাটে পৃথিবী থেকে দূরে আমরা রয়েছি, মানুষের হানাহানি আর হিংস্র কলরব সেখানে নেই, তা ঠিক। সাধনজীবনের পক্ষে সে পরিবেশ অনুকূল তা স্বীকার করতেই হবে। কিন্তু সেইটেই তো বড় কথা নয়। বড় কথা হচ্ছে, মনকে কেন্দ্রীভূত করে কৃষ্ণচরণে স্থায়ীভাবে ন্যস্ত করা, মিলিয়ে দেওয়া। ঐকৈকনিষ্ঠা আর একাগ্রতা নিয়ে 'এক'-কে ধরতে হবে, তাছাড়া তো অন্য পথ নেই। মাণ্ডুক্য উপনিষদের উপমাটি সব সাধকেরই মনে রাখা উচিত। 'ওম' হচ্ছে ধনু, আত্মা—শর, আর লক্ষ্য হচ্ছেন ভগবান্, ব্রহ্ম—যাঁর ভেতরে বিদ্ধ করতে হবে ঐ শর, মিশিয়ে দিতে হবে সম্পূর্ণরূপে। শরবৎ তন্ময়ো ভবেৎ—তা নইলে কিছুই হবে না। উত্তর বৃন্দাবন আর বৃন্দাবন বড় কথা নয়, বড় কথা তাঁর চরণে আত্মার আহুতি—পূর্ণাহুতি।"

সমাগত সবাইকে লক্ষ্য ক'রে প্রসন্ন মধুর স্বরে বলিলেন, "কৃষ্ণ আমাদের সবটা নিতে চান, আর দিতে চান নিজের সবটা একেবারে পুরোপুরি। আংশিক দেওয়া নেওয়া তাঁর ধাতে নেই। অখণ্ড পরম বস্তু কিনা, তাই। কৃষ্ণকে পেতে হলে, দুহাত দিয়ে তাঁর চরণ ধরতে হবে, একহাত কৃষ্ণের চরণে আর এক হাত নিজের দিকে—বিষয়ের দিকে, তা হলে কৃষ্ণপ্রাপ্তি কখনো হবে না।"

আবার প্রশ্ন করিয়াছিলাম কৃষ্ণপ্রেমকে, "কোন শাস্ত্র পাঠ ক'রে কৃষ্ণতত্ত্বের প্রকৃত সন্ধান আপনি পেয়েছেন ?"

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন, 'শ্রীমদ্ভাগবত'। এই মহান্ গ্রন্থ প্রথমে পড়েছি গুরুমায়ের কাছে, শেষেও পড়েছি তাঁরই কাছে। তাঁর সঙ্গে আমি এই পুরাণের প্রতিটি লাইন বার ক'রে বার পড়েছি, তাঁর শ্রীমুখ থেকে তত্ত্বোজ্জ্বলা ব্যাখ্যা শুনে উপলব্ধি করেছি কৃষ্ণের জীবন ও বাণীর রহস্য। আমি তো মনে করি, উপনিষদের হৃদয় হচ্ছে ভাগবত, আর উপনিষদের জ্ঞান-সায়রে ভাগবত যেন মধুময় শতদলের মতো ফুটে রয়েছে যুগযুগান্তের ভক্তদের কল্যাণে।"

ভারতের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য সম্পর্কে কৃষ্ণপ্রেম যেমন শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন, তেমনি তিনি বিশ্বাস করিতেন, এ যুগেও ভারতের মানুষ আধ্যাত্মিক সত্যের মূল্য বেশী দেয়।

শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায়কে একদিন তাই তিনি বলিয়াছিলেন, "গোড়ার দিকে ভারতের অন্তর্জীবন সম্বন্ধে সংশয় ও সন্দেহ কিছুটা ছিল। কিন্তু দীক্ষা নেবার পর সে সব দূরীভূত হল, দৃষ্টি আমার স্বচ্ছ হয়ে এল। দেখলাম, ভারতই বিশ্বের একমাত্র দেশ যেখানে দীর্ঘকাল যাবৎ বজায় রয়েছে সিদ্ধ সাধকদের রাজত্ব, কখনো সে রাজত্বে ছেদ পড়ে নি, আর এদেশের কোটি কোটি মানুষ তাকে শ্রদ্ধা ও সম্মান দিয়ে আসছে। প্রায় এক শতক আগে মানসিকতায় কিছুটা পরিবর্তন ঘটেছে। যদিও অধিকাংশ ভারতবাসী আজ অবধি প্রাচীন যুগের ধ্যান ধারণা ও আধ্যাত্মিক আদর্শের প্রতি অনুরক্ত, কিন্তু একদল আধুনিক শিক্ষিত লোক হঠকারী মনোবৃত্তি নিয়ে পাশ্চাত্যের লোকদের অনুসরণ ক'রে বলতে শুরু করেছে—হিন্দুধর্ম মধ্যযুগীয়, হিন্দুর দেবদেবীর পূজা আসলে গাছ পাথরের পূজা, হিন্দু সাধুরা সমাজের পরগাছা, আর হিন্দুর অবতারগণ শূন্যগর্ভ ধর্মনেতা। যারা এসব কথা বলছে, তারা পাশ্চাত্যের চোখ ঝলসানো মেকি বৈষয়িক সাফল্য দেখে মোহাবিষ্ট হয়েছে, তাদের আমি অনুকম্পার চোখে দেখি। কিন্তু সুখের কথা, সে সব লোকের সংখ্যা নিতান্ত মুষ্টিমেয়, ভারতের আত্মার স্পন্দন তাঁদের কানে কোনো দিন পৌঁছায় নি, অথচ একটু স্থির হয়ে কান পেতে শুনলে আজো ভারতের জনজীবনে তার সন্ধান মেলে। তাই দেখতে পাই, এক টুকরো গৈরিক-পরা যে কোনো সাধু এদেশের সাধারণ মানুষের কাছে পায় রাজোচিত সম্মান, শুধু পাশ্চাত্যের গোলামীতে অভ্যস্ত যারা, সংখ্যায় যারা খুবই কম, তারাই এঁদের অবজ্ঞা করে। আসল কথা, ভারতের সাধারণ মানুষ আজো সাধু-জীবনের পবিত্রতাকে সম্মান দেয়, ভক্তি ও জ্ঞানকে শ্রদ্ধা জানায়। যদি নিজে সে ভজন

১ যোগী কৃষ্ণপ্রেম ; রেমিনিসেন্সেস্ : দিলীপকুমার রায়

সাধন কিছু নাও করে, তবুও ভগবানের প্রতিনিধিরূপে যে সব সিদ্ধপুরুষ হাজার হাজার বছরের পুরাতন আত্মিক ঐশ্বর্য বহন ক'রে চলেছেন তাদের চরণে প্রণত হয়।

"কুম্ভমেলায় কি দেখ? লক্ষ লক্ষ নিরক্ষর দীন দরিদ্র লোক মাঘের প্রচণ্ড শীতে গঙ্গায় অবগাহন করছে, ছিন্নবাস পরিহিত সাধুদের পায়ে প্রণাম ক'রে নিজেদের ধন্য মনে করছে। শুধু কুম্ভ-মেলা কেন, যে কোনো হিন্দু পূজা পার্বণের পেছনে রয়েছেন ভগবান্ আর তার প্রতীক দেবদেবীর প্রেরণা।"

ভারতবর্ষে থাকিয়া ভারতের বৈরাগ্যময় তপস্যায় ব্রতী হইয়া কৃষ্ণপ্রেমকে মাঝে মাঝে কটুবাক্য শুনিতে হইয়াছে, নিগ্রহও ভোগ করিতে হইয়াছে।

একবার তিনি ট্রেনে চড়িয়া মাদ্রাজের দিকে যাইতেছিলেন। কামরায় এক পাশে বসিয়া একটি অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মহিলা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে তাকাইয়া আছেন। কৃষ্ণপ্রেমের পরনে গৈরিক বহির্বাস, মুণ্ডিত মস্তকে দীর্ঘ শিখা, গলায় তুলসীর মালা, আর হস্তের ঝুলিতে রহিয়াছেন ঠাকুরের বিগ্রহ—এটি তাঁহার নিত্যকার পূজার বিগ্রহ।

কৃষ্ণপ্রেমের কথাবার্তা শুনিয়া মহিলাটি বুঝিলেন ইনি একজন খাঁটি ইংরেজ। একটু বাদেই কৃষ্ণপ্রেমের দিকে রোষভরে তাকাইয়া তিনি গালাগালি শুরু করিলেন, "ধর্মত্যাগী অপদার্থ কোথাকার। তোমার কি লজ্জা নেই একটুও? কোন্‌মুখে পবিত্র খ্রীষ্টধর্ম ছেড়ে, নিজের আত্মীয়স্বজন ও দেশ ছেড়ে, এই সব বাজে দলে ঢুকেছো?"

মনে হইল মহিলাটি যেন ক্রোধে ক্ষেপিয়া গিয়াছেন। সঙ্গীয় সহযাত্রীরা চঞ্চল হইয়া এ উহার মুখের দিকে চাহিতেছেন। কৃষ্ণপ্রেম কিন্তু নীরব রহিয়াছেন, আর মিটিমিটি হাসিতেছেন।

মহিলাটি এবার আরো উত্তেজিত স্বরে কহিলেন, "আমি জিজ্ঞেস করি, কি পেয়েছো তুমি? কি পেয়েছো তোমার নিজের দেশ, ধর্ম, সংস্কৃতি সব কিছু ছেড়ে এসে?"

কৃষ্ণপ্রেম প্রশান্তভাবে ঝুলি হইতে ঠাকুরের শ্রীবিগ্রহটি বাহির করিলেন, তারপর সেটি হাতে নিয়া প্রাণখোলা হাসি হাসিয়া কহিলেন, "ম্যাডাম, পেয়েছি এটিকে—আমার কৃষ্ণকে আমি পেয়েছি এখানে এসে।"

মহিলাটির আর বাক্‌স্ফূর্তি হইল না, ঘাড় বাঁকাইয়া জানালার বাহিরে তাকাইয়া রহিলেন।

নিজের সাধ্য ও সাধনা বিষয়ে কৃষ্ণপ্রেম বলিয়াছেন, "আমার আদর্শ বা তত্ত্বকে চারটি কথায় প্রকাশ করা যায়,—'কিছুই চেয়ো না, দাও সর্বস্ব।' একসময়ে অধ্যাত্ম-জীবনের অনুভূতি ও দর্শনাদির জন্য মন বড় ব্যাকুল হতো। তারপর বুঝতে পারলাম, এসব চাইলে কৃষ্ণ বড় কৃপণ হয়ে পড়েন, পিছিয়ে যান। আরো উপলব্ধি করলাম, কৃষ্ণকে যখন ভালোবাসা দিচ্ছি, তখন তার মধ্যে দিব্য অনুভূতি লাভ করার লোভ জড়িত থাকবে কেন? কৃষ্ণ তাঁর ইচ্ছে মতো, আর আমার প্রয়োজন বুঝে, সেসব দেবেন। আলো হাওয়ার মতো সহজ ও মুক্ত হবে আমাদের ভালোবাসা।

"কেউ তাঁকে বলে নিরাকার, কেউ বলে সহস্রপাদ। আমার কাছে পর্যাপ্ত তাঁর ঐ দু'টি চরণ। কী অপূর্ব কী মধুময় তাঁর চরণ! ঐ চরণ দুটি হারিয়ে গেলে, তার বদলে ব্রহ্মানন্দ বা মুক্তিও আমার কাম্য নয়। পরম বস্তু বিশ্বসৃষ্টির বস্তুতেই রয়েছেন। কৃষ্ণ আনন্দময় না হলে এই বিশ্বে আনন্দে ওতপ্রোত থাকতো না, একথা যদি সত্য হয়, তবে আমি বলবো, কৃষ্ণ বস্তুময় এবং বাস্তব না হলে এই বিশ্বপ্রপঞ্চে বাস্তব বলে কোনো কিছু থাকতো না, অনুভবেও তা আসতো না। কৃষ্ণের বিগ্রহ কৃষ্ণের জ্যোতি, কৃষ্ণের মাধুর্য সবই আমার কাছে বাস্তব[১]।"

অনেক স্থলে, অনেকের কাছে, কৃষ্ণপ্রেম বার বার বলিয়াছেন, "প্রাপ্তি হলে, কৃষ্ণের দেখা পেলে, মায়া প্রপঞ্চ বলে আর কিছু

[১] যোগী কৃষ্ণপ্রেম : দিলীপকুমার রায় (পত্রাবলী)

থাকে না, যা কিছু চোখে পড়ে, যা কিছু অনুভবে আসে, অনুভবের বাহিরেও যা কিছু থাকে, সবই হয়ে যায় কৃষ্ণময়। কৃষ্ণের ভেতরেই সব কিছু রয়েছে, কৃষ্ণই বিরাজ করছেন সব কিছুকে নিয়ে। তিনিই ব্রহ্মানন্দ তিনিই নন্দ-নন্দন, তিনিই গোপীবল্লভ, আবার তিনিই কুরুক্ষেত্রের সারথী—তিনিই একাধারে সব কিছু[১]।"

সাধনা সম্পর্কে কৃষ্ণপ্রেমের ধারণা ছিল অতি স্বচ্ছ ও সুস্পষ্ট। সাধক-কবি দিলীপকুমার রায়কে এক পত্রে তিনি লিখিয়াছেন: "ধর্ম অথবা যোগ, যে নামেই আত্মিক সাধনাকে অভিহিত করা হোক না কেন, তার অর্থ কিন্তু শুধু একটিই। শক্তি লাভের জন্য কোনো কোনো সাধক বিশেষ ধরনের জ্ঞান আহরণে প্রয়াসী হয়, কখনো বা শুধু জ্ঞান লাভের জন্যই সচেষ্ট হন। এ কিন্তু যোগ নয়। সাধকের ভাবময়তা অনেক সময় মনোরম স্বর্গীয় সৌন্দর্যময় দৃশ্যের সৃষ্টি করে, এটাও যোগ নয়। কোনো কোনো সাধক তাঁদের ধ্যান ধারণার বলে অতীন্দ্রিয়, ধোঁয়াটে ধরনের চিন্তারাশিকে ফুটিয়ে তোলেন, তাও যোগের পর্যায়ে পড়ে না। দুর্গত মানবের সেবাকে যোগ বলে আমি অভিহিত করবো না, যদিও সিদ্ধ সাধকেরা বিশ্বের সর্বজীবকে এমন ভালোবাসার দৃষ্টিতে দেখে থাকেন, বুদ্ধের মতে—যে ভালোবাসা শুধু মায়ের বুক থেকে ঝরে পড়ে তাঁর একমাত্র সন্তানের জন্য। হঠযোগীর আসন মুদ্রা প্রাণায়ামের ফলে ব্যাঙের মতো বিস্ফারিত হওয়া আর ফেটে পড়া, তাকে তো প্রকৃত যোগের পর্যায়ে ফেলা যায়ই না। আসলে যোগের স্বরূপ হচ্ছে, কৃষ্ণে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ—এ সমর্পণে কোনো দাবি নেই, আকাঙ্ক্ষা নেই, কোনো বাসনার লেশমাত্র নেই, আছে কেবল নিজেকে নিঃশেষে বিলিয়ে দেওয়া।

---

১ কৃষ্ণপ্রেমের ব্যাখ্যাত তত্ত্বের পরিচয় মিলে প্রধানত তাঁহার রচিত তিনটি গ্রন্থে। এগুলির নাম—সার্চ ফর ট্রুথ, যোগ অব্ ভগবৎ-গীতা, যোগ অব্ কঠোপনিষদ্। ইহা ছাড়া 'এরিয়ান পাথ' সাময়িকীতে বিভিন্ন সময়ে বহু প্রবন্ধাদি তিনি লিখিয়াছেন। মুমুক্ষুদের কাছে লেখা তাঁহার মূল্যবান চিঠির সংখ্যাও কম নয়।

যেসব কাজ বা চিন্তা এই পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণকে সম্ভব ক'রে তোলে তাই হচ্ছে, সাধনা। আর এই পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণের ফলশ্রুতি হিসেবে যে আত্মিক বস্তু এগিয়ে আসে সাধকের সামনে, তাই হচ্ছে ভাগবতী লীলা।"

কৃষ্ণপ্রেমকে একবার প্রশ্ন করা হইয়াছিল, ভগবৎ-কৃপা বলিয়া কোনো বস্তু আছে কিনা এবং সে কৃপার প্রকৃত স্বরূপ কি?

তিনি উত্তর দিলেন, "আমি দ্ব্যর্থহীন সুস্পষ্ট দৃঢ় ভাষায় বলবো, ভগবৎ-কৃপা বিরাজ করছে সারা সৃষ্টি জুড়ে, আর সেই কৃপার মাধ্যমেই মানুষ পৌঁছুতে পারে কৃষ্ণের চরণে। মহাভারতের উদ্যোগ-পর্বে কৃষ্ণ পুরুষকার আর দৈবের মানুষের ইচ্ছাশক্তি আর ঐশ্বরীয় বিধানের কথা বলেছেন, পুরুষকার যেন ক্ষেত্রকর্ষণ, আর দৈব—আকাশের বৃষ্টি-ধারা। এ তুলনাটি পড়বার সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে হল, তাহলে তপস্যা হচ্ছে—বীজবপন, যে বীজ সাধক তার অভীপ্সা অনুযায়ী বপন করে থাকে। আর সেই বীজের ওপর যে বৃষ্টিধারা ঝরে পড়ে তা আসে ভগবানের কাছ থেকে।"

এই ভগবৎ কৃপাপ্রসঙ্গে বিশদভাবে আরো তিনি কহিলেন, "এই ধূলিধূসর কোলাহলময় পৃথিবীতে যখনই কেউ আত্মাহুতি দেয়, নিজেকে উজাড় ক'রে ঢেলে দেয় ভগবৎ প্রেমের আগুনে, তখনই ঘটে একটা অলৌকিক বিস্ফোরণ। তাই হচ্ছে ভগবৎ-কৃপার প্রকৃত স্বরূপ।

হরিদাস (ডাঃ আলেকজেণ্ডার) ছিলেন একবার অন্যতম শ্রোতা। রসিকতার সুরে তিনি কহিলেন, "উপমাটি চমৎকার সন্দেহ নেই। কিন্তু একজন শুধু শুধু ঐ আগুনের ভেতর নিজেকে নিঃশেষ ক'রে দেবে কেন? আমরা সবাই ঐ আগুনে ভস্ম হতে যাবো কেন?"

স্মিতহাস্যে কৃষ্ণপ্রেম বলিলেন, "এ মন্তব্যের উত্তর আমি অবশ্যই দিতে পারি। সূর্যের ভেতর যখনই যে কোনো জ্যোতিষ্ক প্রবেশ ক'রে বিলীন হয়ে যায়, তখনই তা বিশ্বজগতে সৃষ্টি ক'রে এক নূতন প্রাণদায়িনী শক্তি ও উত্তাপ। প্রকৃতপক্ষে কোনো আত্মাহুতিই তো এই পৃথিবীতে ব্যর্থ হয়ে যায় না।"

লোকচক্ষুর অন্তরালে, হিমালয় অঞ্চলের নিভৃত অঞ্চলে, প্রেম-ভক্তির সাধনায় দীর্ঘকাল নিরত ছিলেন কৃষ্ণপ্রেম। অতিমাত্রায় প্রচারবিমুখ ছিলেন এই বৈরাগী মহাপুরুষ, সহসা কাহাকেও শিষ্য করার সম্মতি তিনি দিতেন না। শহর বন্দর ও জনসংঘট্ট সতর্কভাবে এড়াইয়া চলা ছিল তাঁহার চিরন্তন অভ্যাস। কিন্তু ফুল ফুটিলে ভ্রমর আসিয়া জুটিবেই। তেমনি সাধক কৃষ্ণপ্রেমের সিদ্ধিময় জীবনের সৌগন্ধ আকর্ষণ করিয়া আনিয়াছিল শত শত ভক্ত ও মুমুক্ষুকে। ইউরোপ ও আমেরিকার বহু জিজ্ঞাসু শরণ নিয়াছিলেন তাঁহার কাছে। যুদ্ধোত্তর সমাজের হিংসা দ্বেষ ও অশান্তিতে উত্ত্যক্ত হইয়া অনেকে আসিতেন, অনেকে আসিতেন জড়বাদী আধুনিক সভ্যতার বন্ধ্যা জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া। ভাবুক ও স্বপ্নবিলাসী একদল বিদেশী আসিতেন রহস্যময় হিমালয়ের আশ্রমে সাধনভজন করার জন্য। ইঁহাদের অনেকেই হয়তো শেষ অবধি স্থায়ীভাবে এদেশে থাকিতে পারেন নাই কিন্তু কৃষ্ণপ্রেমের সান্নিধ্য ও উপদেশ তাঁহাদের জীবনে প্রেরণা যোগাইয়াছে, সাধনজীবনের দুয়ার খুলিয়া দিয়াছে।

সব চাইতে বিস্ময়কর, কৃষ্ণপ্রেমের প্রতি ভারতীয় ভক্ত ও মুমুক্ষুদের আকর্ষণ। সংখ্যায় ইঁহারা বিদেশী ভক্তদের চাইতে বেশী। সত্যকার বিশ্বাস ও নিষ্ঠা নিয়া ইঁহাদের অনেকেই কৃষ্ণপ্রেমকে আঁকড়িয়া ধরিয়াছিলেন, অগ্রসর হইয়াছিলেন প্রেম ভক্তিময় সাধন-পথে। এ প্রসঙ্গে লক্ষণীয়, ভারতের বহু আশ্রমেই ভারতীয় সাধকদের কাছে বিদেশী ভক্তদের ভিড় করিতে দেখা যায়, কিন্তু কোনো বিদেশী গুরুর কাছে ভারতীয় ভক্ত ও মুমুক্ষুরা শরণ নিতেছে, এমন দৃশ্য সহসা দৃষ্টিগোচর হয় না। কৃষ্ণপ্রেমের বেলায় এই ব্যতিক্রমটি দেখা গিয়াছে। শিক্ষিত অশিক্ষিত, ধনী নির্ধন, ব্রাহ্মণ শূদ্র, সর্বশ্রেণীর ভারতীয় ভক্তকে নির্বিচারে আশ্রয় দিয়াছেন কৃষ্ণপ্রেম, গড়িয়া তুলিয়াছেন তাঁহাদের অধ্যাত্মজীবন।

সাধনা ও সিদ্ধিময় জীবন এবার ধীরে ধীরে তাহার শেষ পর্যায়ে

আসিয়া পড়ে। কৃষ্ণপ্রেম এবার প্রস্তুত হইয়া বসিয়া আছেন চিরবিদায়ের প্রতীক্ষায়।

বহুদিনের পুরানো হুক্‌-ওয়ার্ম রোগ আবার সেদিন আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। শরীর হইতেছে জীর্ণ ও বিধ্বস্ত। চিকিৎসার কথা উঠিলেই সহাস্যে কৃষ্ণপ্রেম বলেন, "চিরদিন ঠাকুরই তো আমার ডাক্তার! আর কার কাছে যাবো, বলতো?"

অন্তরঙ্গ শিষ্য মাধবাশীষ ও অন্যান্য ভক্তেরা পীড়াপীড়ি করিয়া নাইনিতালের বড় ডাক্তারের কাছে তাঁহাকে নিয়া গেলেন, কিন্তু তেমন কিছু উন্নতি দেখা গেল না।

ভক্তেরা অনুনয় করিয়া কহিলেন, "গোপালদা, ঠাকুর ও রাধারানীর কাছে কত কথাই তো আপনি নিবেদন করেন, কখনো তাঁরা তা প্রত্যাখ্যান করেন না। এবার বলুন, আপনি যাতে ভালো হয়ে ওঠেন।"

স্মিতহাস্যে উত্তর দেন, "আয়ু বাড়ানোর কথা বলছো? একবার তো ঠাকুর বাড়িয়ে দিয়েছেন, সেই বাড়ানো মেয়াদই এখন চলছে।"

এ সময়ে দেহ সম্পর্কে একেবারে নির্বিকার হইয়া উঠিয়াছেন কৃষ্ণপ্রেম। কথাবার্তায় সদাই দেখা যায় আত্মস্থ ও নৈর্ব্যক্তিক ভাব। ভক্ত শিষ্যেরা আপ্রাণ চেষ্টায় সেবা পরিচর্যা করিয়া চলিয়াছেন। সকলেরই চোখে মুখে প্রবল উৎকণ্ঠার ছাপ। তাঁহাদের প্রশ্নের উত্তরে কৃষ্ণপ্রেম বলেন, "জানতো, ঠাকুরের হাতে দুটো ডোর রয়েছে, একটা ওপরের দিকে টানেন, আর একটা নিচের দিকে। এবার নিচেরটা টানবার পালা।"

১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই নবেম্বর কৃষ্ণপ্রেমের প্রতীক্ষিত বিদায় লগ্নটি আসিয়া যায়। প্রিয় ভক্ত ও সেবকদের দিকে তাকাইয়া ভাবাবিষ্ট অর্ধবাহ্য অবস্থায় মহাসাধক বলেন "মাই শিপ ইজ সেইলিং"—আমার জাহাজ এবার পাড়ি দিতে চলেছে। অতঃপর ছেদ পড়িয়া যায় মরজীবনের ধারায়, সার্থকনামা সাধক কৃষ্ণপ্রেম বিলীন হইয়া যান কৃষ্ণপ্রেমের মহাপারাবারে।

যামুনাচার্য

দশম শতাব্দীর তৃতীয় পাদ। দাক্ষিণাত্যে পাণ্ড্যরাজের সভায় এ সময়ে আচার্য বিদ্বজ্জন-কোলাহলের প্রবল প্রতাপ। রাজা এই পণ্ডিত শিরোমণিকে গভীরভাবে শ্রদ্ধা করেন, মান্য করেন গুরুর মতো। দেশের শ্রেষ্ঠ শাস্ত্রবিদ্‌দের প্রায়ই আহ্বান করিয়া আনা হয়, রাজসভায় আচার্য কোলাহলের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয় তাঁহাদের তর্কদ্বন্দ্ব। এইসব তর্কসভার পরিচালনায় পাণ্ড্যরাজের উৎসাহ উদ্দীপনার অবধি নাই। রাজ্যের জ্ঞানীগুণীরা সেখানে আমন্ত্রিত হইয়া আসেন, আর তাঁহাদের সমক্ষে, তুমুল উত্তেজনার মধ্যে, তর্কশূরেরা একে অন্যকে আক্রমণ করিতে থাকেন।

প্রতি ক্ষেত্রেই জয়ী হইতে দেখা যায় শক্তিমান্ ক্ষুরধারবুদ্ধি আচার্য কোলাহলকেই। সভার শেষে রাজা পরম সমাদরে তাঁহার সভা-পণ্ডিতের গলায় অর্পণ করেন পুষ্পমাল্য, রাজকোষ হইতে দান করেন প্রচুর অর্থ। শুধু তাহাই নয়, রাজার বিধান অনুসারে তর্কে পরাজিত পণ্ডিতেরা পরিণত হন আচার্য কোলাহলের সামন্ত পণ্ডিত রূপে এবং এই পণ্ডিত সম্রাট্‌কে প্রতি বৎসর তাঁহারা প্রেরণ করেন সম্মান-দক্ষিণা।

সেদিন নিজের ভবনে বসিয়া আচার্য কোলাহল তাঁহার হিসাবের খাতাটি দেখিতেছিলেন। হঠাৎ তিনি বড় গম্ভীর হইয়া পড়েন, তখনি ভারপ্রাপ্ত শিষ্য বন্‌জিকে সেখানে ডাকাইয়া আনেন।

রুষ্টস্বরে আচার্য বলেন, "বন্‌জি, তুমি যে এতটা অকর্মণ্য তা আমার জানা ছিল না। আজ তিন বৎসর যাবৎ পণ্ডিত ভাষ্যাচার্য আমার বাৎসরিক সামন্ত-কর দেয় নি, তা তুমি জানো?"

হিসাবের খাতাটির দিকে একবার তাকাইয়া শিষ্য বন্‌জি নিরুপায়ভাবে তখন মাথা চুলকাইতেছেন। আচার্য এবার ক্রুদ্ধস্বরে

বলিয়া উঠেন, "শোন, কালই তুমি ভাষ্যাচার্যের গৃহে যাও। বকেয়া পাওনা কড়ায় গণ্ডায় আদায় ক'রে নিয়ে এসো। নতুবা আমার এখানে তোমার স্থান নেই।"

"আজ্ঞে, কয়েক বৎসর ক্ষেতে শস্য হয় নি বলে ভাষ্যাচার্য আপনার পাওনা টাকা বাকী ফেলেছেন। বার বার তাগাদা দিয়েছি আমি, কিন্তু কোনো ফল হয় নি।"

"একটা ফল অবশ্যই হয়েছে। দেখে এসো গিয়ে, ঐ তল্লাটের লোকেরা ইতিমধ্যেই বলাবলি শুরু ক'রে দিয়েছে, 'ভাষ্যাচার্য আর আজকাল সামন্ত-কর দিচ্ছেন না, হয়তো রাজপণ্ডিত দিগ্‌বিজয়ী কোলাহলের বশ্যতা থেকে তিনি মুক্ত হয়েছেন।' আর তারা এটা বলতে পারছে, বন্‌জি, তোমারই মূর্খামির জন্যে।"

পরের দিনই গুরুর প্রতিনিধি হিসাবে বন্‌জি ভাষ্যাচার্যের চতুষ্পাঠীতে গিয়া উপস্থিত। আচার্য গ্রামান্তরে এক শিষ্যের বাড়িতে গিয়াছেন, কাল ফিরবেন। প্রবীণ পড়ুয়ারা কোথায় বেড়াইতে গিয়াছে। চতুষ্পাঠীতে আচার্যের আসনের কাছে বসিয়া শাস্ত্র পাঠে রত শুধু দ্বাদশ বৎসরের পড়ুয়া বালক, যামুন।

বন্‌জি ঘরে ঢুকিয়াই রুক্ষস্বরে প্রশ্ন করে, "ওরে ছোক্‌রা, তোদের আচার্য কোথায় পালিয়েছেন, বল্‌তো।"

"কে আপনি? এত বাজে বকছেন কেন? আচার্য পালাতে যাবেন কেন? কার ভয়ে?" ক্রুদ্ধস্বরে উত্তর দেয় যামুন।

"আমি পণ্ডিত বন্‌জি, রাজপণ্ডিত বিদ্বজ্জন-কোলাহলের শিষ্য। তোর গুরুর সামন্ত-কর তিন বৎসরের বাকী পড়েছে, তিনি তা খেয়ে বসে আছেন। জানিস তো, এ টাকা আদায় না দিলে রাজার আদেশে তোদের চতুষ্পাঠী উঠে যাবে!"

ক্রোধে উত্তেজনায় বালক পড়ুয়া যামুনের শরীর তখন থরথর করিয়া কাঁপিতেছে। দৃঢ়স্বরে সে উত্তর দেয়, "ছাখো বন্‌জি, আমার বুঝতে বাকী নেই, তোমার আচার্য দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিত হতে পারেন, বিদ্বজ্জন-কোলাহল উপাধি তাঁর থাকতে পারে, কিন্তু বিদ্যা বস্তুটি

তাঁর ভেতরে আদৌ নেই। আর তাঁর ছাত্র তুমি যে একটি গণ্ডমূর্খ, তা তোমার বচন ও বাচনভঙ্গীতেই প্রকাশ পাচ্ছে।"

"এতবড় স্পর্ধা তোর, ছোকরা! সামনে দাঁড়িয়ে যা-তা বলে যাচ্ছিস। আচার্য কোলাহল যে কে, কি তাঁর প্রতাপ, তা তুই জানিসনে। জানে তোর গুরু। যাক্, এই আমি বলে দিয়ে যাচ্ছি, এ চতুষ্পাঠী আমি মাটিতে মিশিয়ে দিয়ে তবে ছাড়বো।"

"তা তোমার যা সাধ্য তা করতে পারো। কিন্তু এটা জেনে রেখো, তোমার গুরু যে বিদ্যাহীন, আমার একথাটি পরম সত্য।"

"তার মানে?" মারমুখী হয়ে রুখে দাঁড়ায় বন্জি।

বিদ্যা অখণ্ড বোধ এনে দেয়, সমদর্শিতা দেয়, বিনয় দেয়। সর্বভূতকে বেঁধে নেয় স্নেহ প্রেমের ডোরে। সে বিদ্যা তোমার আচার্যের নেই। আরো শুনে নাও মূর্খ! বিদ্ হচ্ছে আত্মজ্ঞানের আলো, ঐশ্বরীয় আলো, এ আলো যিনি পেয়েছেন তিনিই হচ্ছেন বিদ্বান্। তোমার আচার্য দুর্ভাগা, কূট তার্কিকতার ভাগাড়ে পড়ে তাই কেবলই খাবি খাচ্ছেন।"

বন্জি ক্ষিপ্তপ্রায় হয়, চতুষ্পাঠী হইতে বাহির হইয়া আসে। চীৎকার করিয়া গালমন্দ করিতে থাকে জঘন্য ভাষায়।

বালক পড়ুয়া যামুন এবার প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়ায়, দৃঢ় সংযত কণ্ঠে বলিয়া ওঠে, "শোন বন্জি। তোমার গুরুর এই অন্ধ অহমিকা এবং ঔদ্ধত্য আমি ভেঙে দেবো, সংকল্প করেছি। প্রতিপক্ষ হিসাবে আমি তাঁকে তর্কযুদ্ধে আহ্বান করছি। রাজসভায় এই তর্ক অনুষ্ঠিত হবে একথাটি তাঁকে এবং পাণ্ড্যরাজকে তুমি জানিয়ে দেবে।"

বিস্ময়ে বাক্‌রোধ হয় বন্জির। এ বালক কি পাগল? বারো বৎসরের একটা নবীন পড়ুয়া, অর্বাচীন ছোকরা, তর্কবিচারে আহ্বান করছে দক্ষিণ ভারতের শ্রেষ্ঠ রাজপণ্ডিতকে? তবে কি বন্জি এতক্ষণ একটা পাগলের সঙ্গে ঝগড়া ও চেঁচামেচি করিতেছে?

সংযত ও প্রশান্ত কণ্ঠে বালক যামুন আবার জানায়, "বন্জি, আমার কথাকে বালকের কথা বলে উড়িয়ে দিয়ো না যেন। আচার্য

নাথমুনি আমার পিতামহ, আর ঈশ্বরমুনি আমার পিতা। আমাদের বংশের ওপর প্রভু শ্রীরঙ্গনাথের কৃপা ও বর রয়েছে। আরো শুনে রাখো, বন্‌জি. আমার গুরুর কৃপায় বহুতর শাস্ত্র আমি ইতিমধ্যে আয়ত্ত করেছি। আচার্য কোলাহলকে তর্কে আহ্বান করার শক্তি আমি ধারণ করি। শাস্ত্রতত্ত্ব বা কূটপ্রশ্ন যে কোনো দিক দিয়ে আমি তাঁকে ধরাশায়ী করতে পারবো, এ বিশ্বাসও আমার আছে।"

পণ্ডিত বন্‌জি রাগে গজ্‌গজ্‌ করিতে করিতে তখনি স্থান ত্যাগ করে, ত্বরায় উপনীত হয় রাজধানীতে। সরাসরি রাজসভায় গিয়া নিবেদন করে ভাষ্যাচার্যের ছাত্রের সব কথা।

সকল কিছু শোনার পর আচার্য কোলাহল ক্রোধে ফাটিয়া পড়েন, এ ঔদ্ধত্যের সমুচিত দণ্ড দিবার জন্য রাজাকে বলিতে থাকেন। সভাসদেরাও বালকের ধৃষ্টতায় কম বিস্মিত হন নাই।

পাণ্ড্যরাজ গম্ভীর স্বরে বলেন, "আমার মনে হয়, শুধু একটি বালক পড়ুয়ার কথা নিয়ে এত উত্তেজিত হয়ে ওঠা আমাদের পক্ষে ঠিক নয়। চতুষ্পাঠীর যিনি পরিচালক সেই ভাষ্যাচার্যের কাছে আমি দূত পাঠাচ্ছি। সে জেনে আসুক, ভাষ্যাচার্য নিজে এ-বিষয়ে কি বলতে চান। হয় তিনি তাঁর ছাত্রের হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করুন, নয়তো পরিষ্কার ক'রে জানিয়ে দিন তর্কবিচার সম্পর্কে তাঁর মতামত।" বিশেষ পত্রী দিয়ে তখনি এক দূতকে প্রেরণ করা হইল।

এদিকে শিক্ষালয় হইতে ফিরিয়া আসার পরই ভাষ্যাচার্য যামুনের মুখ হইতে সকল কথা শুনিলেন। ভয়ে তাঁহার মুখ শুকাইয়া গেল। কহিলেন, "বৎস যামুন, এ তুমি অত্যন্ত অসমীচীন কাজ করেছো। আচার্য কোলাহল দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিত, তাছাড়া, অত্যন্ত আত্মম্ভরীও বটে। অচিরে সে প্রতিহিংসা গ্রহণ করবে। এবার আমার এবং আমার এ চতুষ্পাঠীর দুর্দশার সীমা থাকবে না।"

প্রবীণ ও নবীন ছাত্রেরা একে একে সেখানে আসিয়া জড়ো হইয়াছে। সবারই চোখে মুখে আতঙ্কের ছায়া, চতুষ্পাঠীর উপরে রাজরোষ ঘনাইয়া আসিতেছে, এবার আর কাহারো নিস্তার নাই।

যুক্তকরে নিবেদন করে যামুন, "প্রভু, আমায় আপনি ক্ষমা করুন। যে সব কথা আমি বন্‌জিকে বলেছি, তা বলেছি তার ঔদ্ধত্যের সমুচিত জবাব দেবার জন্যে, আর আপনার সম্মান রক্ষার জন্যে।"

"যামুন, তুমি সংসার বিষয়ে অনভিজ্ঞ। আচার্য কোলাহলকে রাজা শ্রদ্ধা করেন গুরুর মতো, রাজসভায় তাঁর বিপুল প্রতিপত্তি, তাঁর শিষ্যকে কঠোরভাবে বলা ও চটিয়ে দেওয়া তোমার উচিত হয় নি। অনেক জটিলতা ও বিপদের সৃষ্টি করলে তুমি।"

"প্রভু, আপনার মান সম্ভ্রমের মুখ চেয়েই তো আমি এ বিপদের ঝুঁকি নিয়েছি। তাছাড়া, আমার অন্তরাত্মা থেকে কে যেন বার বারই বলছে, 'কোনো ভয় নেই। তোমার মেধা ও প্রতিভা দিয়ে গুরুর সম্মান রক্ষা করো, আত্মম্ভরী আচার্য কোলাহলের সম্মুখীন হও। জয় তোমার সুনিশ্চিত।"

আচার্য কিছুকাল চুপ করিয়া রহিলেন, কহিলেন, "বৎস, প্রভু শ্রীরঙ্গনাথের প্রিয় ভক্ত, সিদ্ধ মহাত্মা, নাথমুনির পৌত্র তুমি। তাছাড়া, আমি তো জানি, ঈশ্বরপ্রদত্ত কি অমানুষী প্রতিভা নিয়ে তুমি জন্মেছো, মাত্র বারো বৎসর বয়সে কি বিপুল শাস্ত্রজ্ঞান তুমি আয়ত্ত করেছো। হয়তো ঈশ্বরের কোনো অভিপ্রায় রয়েছে এই ব্যাপারে। তোমার মাধ্যমেই হয়তো আচার্য কোলাহলের দম্ভ চূর্ণ হবে, অত্যাচার দূর হবে, এদেশের সারস্বত জীবন হয়ে উঠবে শুদ্ধতর, পবিত্রতর।

"আমায় আশীর্বাদ করুন, প্রভু। আপনার প্রসাদে যেন জয়যুক্ত হই আমি"—গুরুর চরণ বন্দনা করিয়া প্রার্থনা জানায় যামুন।

গুরু আশীর্বাদ করিলেন বটে, কিন্তু মন হইতে আতঙ্ক দূর হইল না। দৈবী কৃপা ছাড়া আসন্ন বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার আর কোনো উপায় নাই।

পরের দিন ভোর হইতে না হইতেই পাণ্ড্যরাজের দূত আসিয়া উপস্থিত। পণ্ডিত ভাষ্যাচার্য পত্রীর উত্তরে পরিষ্কার ভাষায় জানাইয়া দিলেন,—তাঁহার ছাত্র বালক হইলেও অমানুষী প্রতিভা ও বিদ্যাবত্তার

অধিকারী। যথাসময়ে প্রস্তাবিত তর্ক-বিচারের সভায় সে উপস্থিত থাকিবে।

সারা পাণ্ড্যরাজ্যে এ সংবাদ দাবানলের মতো ছড়াইয়া পড়িল। আচার্য কোলাহল বহুলশ্রুত দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিত, সেই মহারথীকে বিচারদ্বন্দ্বে আহ্বান করিয়াছে এক বারো বৎসরের বালক। এর চাইতে আশ্চর্যকর কথা আর কি হইতে পারে।

আচার্য কোলাহল ছিলেন অতিমাত্রায় বিদ্যাদর্পী, ধরাকে তিনি সরা জ্ঞান করিতেন। কাজেই পাণ্ড্য রাজসভায় এবং রাজধানীর বুধ-সমাজে তাঁহার শত্রুর অভাব নাই। অনেকে ভাবেন, দৈবের বিধানে যদি কোলাহলের পতন ঘটে, তবে কি চমৎকারই না হয়!

সর্বত্র জটলা শুরু হইয়া যায়, কে জানে এই বালক প্রতিদ্বন্দ্বী ঐশ্বরীয় শক্তিতে শক্তিমান্ কিনা। নতুবা এত স্পর্ধা তার! সারা দেশের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতকে পরাজিত করার সাহস তাহার কি করিয়া হইল?

বালক তর্কযোদ্ধা যামুন যে বিস্ময়কর পাণ্ডিত্য ও প্রতিভার অধিকারী, রাজা ইতিমধ্যে একথা জানিয়াছেন। কিন্তু কি করিয়া সে দুর্ধর্ষ তর্কশূর কোলাহলের সঙ্গে আঁটিয়া উঠিবে, সে কথাটিই তিনি ভাবিয়া পাইতেছেন না।

রাজা ও রানী সেদিন বাগানে বেড়াইতেছেন, উভয়ের মধ্যে বিতর্ক উঠিল, তর্কসভায় কে হইবে জয়ী?

রাজার ধারণা রাজসভায় দিগ্‌বিজয়ীর সম্মুখে দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে বালক ভয়ে মূর্ছা যাইবে। রানী কিন্তু ভাবেন ভিন্নরূপ। বলেন, "মহারাজ আমার কিন্তু কেবলই মনে হচ্ছে, এ বালক ঐশ্বরীয় শক্তিতে শক্তিমান্। যে ভাবে সাহস ক'রে সে তর্কযুদ্ধে নামতে আসছে তাতে আমার মনে হয়, প্রতিপক্ষকে অবশ্য সে হারিয়ে দেবে, মহারাজ।"

"এটা তার সাহস, না দুঃসাহস, না হাস্যকর প্রয়াস, তা কে বলবে?" সহাস্যে মন্তব্য করেন রাজা।

"মহারাজ, দুদিন থেকে বার বারই আমার মনে চিন্তার ঝলক খেলে যাচ্ছে। বারো বৎসর বয়সেই তো বালক অষ্টাবক্র রাজা জনকের সভাপণ্ডিত আচার্য বন্দীকে হারিয়েছিলেন শাস্ত্রীয় তর্কে। আর আচার্য শঙ্কর? ষোল বৎসর বয়সেই হলেন তিনি ভারতজয়ী পণ্ডিত। আমার দৃঢ় ধারণা, মহারাজ এ বালক ঐ ধরনের ঐশ্বরীয় শক্তির অধিকারী। সে জিতবেই জিতবে।"

"যদি সে না জেতে, তবে?"

"তবে আমি আপনার দাসীদের দাসী হয়ে থাকবো মহারাজ,"—বাজী ধরে বসেন রানী।

কথায় কথায় পাণ্ড্যরাজেরও জেদ চড়িয়া যায়। উত্তেজিত কণ্ঠে বলেন, "তা হলে রানী, তুমিও শুনে নাও আমার শপথ। যদি বালক যামুন জয়ী হয়, আমি তৎক্ষণাৎ দান করবো তাকে আমার রাজ্যের অর্ধেক অংশ। দেখা যাক, কে জয়ী হয় এই বিচারে।"

রাজা ও রানীর এই বাজী ধরার কথা অচিরে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে, জনসাধারণের কৌতূহলের সীমা থাকে না।

রাজার প্রেরিত স্বর্ণখচিত শিবিকায় আরোহণ করিয়া যামুন রাজধানী মাতুরায় উপনীত হইলেন। শুধু রাজধানীই নয়, রাজ্যের দূর দূরান্তের কৌতূহলী মানুষেরাও ভিড় করিয়াছে রাজসভায়। শাস্ত্রবিদ্ আচার্য, শিক্ষিত ও অশিক্ষিত বহু নাগরিকই সেদিন সভায় মিলিত হইয়াছে সেদিনকার অসম ও অদ্ভুত তর্কযুদ্ধ দেখার জন্য। উত্তেজনা ও উন্মাদনার অবধি নাই।

বালক যামুন ধীর গম্ভীরভাবে সভাকক্ষে উপস্থিত হয়, নতশিরে রাজা ও রানীকে জ্ঞাপন করে তাহার শ্রদ্ধা। এই ক্ষুদ্র বালকের দিকে এতক্ষণ কৌতূহল ভরে তাকাইয়া ছিলেন আচার্য কোলাহল। এবার রানীর দিকে মুখ ফিরাইয়া তাচ্ছিল্যের হাসি হাসিয়া প্রশ্ন করেন, "আলওয়ান্দারা?" অর্থাৎ, এই বালকই কি করবে আমায় পরাজিত?

বালক পণ্ডিতের প্রতি পরিপূর্ণ আস্থা জ্ঞাপন করিয়া রানী দৃঢ়

স্বরে বলিয়া উঠেন, "আলওয়ান্দার," অর্থাৎ, হাঁ, এই বালকই তো করবে পরাজিত।[১]

রাজসভায় তিল ধারণের স্থান নাই, উৎসাহ উদ্দীপনায় সবাই চঞ্চল, প্রতীক্ষায় রহিয়াছে তর্কযুদ্ধের।

পাণ্ড্যরাজ নির্দেশ দিবার সঙ্গে সঙ্গে আচার্য কোলাহল শুরু করেন তাঁহার প্রশ্ন। পাণিনি ও অঘোরকোষ হইতে কয়েকটি প্রশ্ন প্রথমে তিনি উত্থাপন করেন। ঋজু, দীপ্ত ভঙ্গীতে দাঁড়াইয়া অবলীলায় যামুন তাহার উত্তর দেন। মীমাংসার দক্ষতায় এবং বাচনভঙ্গীর চমৎকারিত্বে দর্শকেরা প্রীত হইয়া উঠেন। ঘন ঘন করতালিতে সভাগৃহ মুখর হইয়া উঠে।

এবার যামুনের প্রশ্ন করার পালা। যামুন কিন্তু বেশ বুঝিতে পারিয়াছেন, দিগ্‌বিজয়ী আচার্য কোলাহল তাঁহাকে আদৌ কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী পণ্ডিতের সম্মান দেন নাই। গণ্য করিয়াছেন এক নগণ্য বালক পড়ুয়ারূপে, তাই এবার নিজের প্রশ্নবাণ নিক্ষেপের আগে কোলাহলকে তিনি চটাইয়া দিলেন। কহিলেন, "আচার্য, আপনার প্রশ্নগুলোর কোনো গুরুত্ব নেই। আপনি বোধহয় আমাকে ক্ষুদ্রকায় বালক ভেবে অবজ্ঞা করেছেন। আরো ভেবেছেন, আপনার মতো বিরাটকায় হলে এবং বিরাট উদর থাকলেই পাণ্ডিত্য হয় অগাধ। তবে কি আমরা ধরে নেবো, একটা বিশালকায় হাতি আপনার চাইতে বড় পণ্ডিত?"

সভায় হাসির হররা বহিয়া যায়, আর সেই সঙ্গে গণ্ডগোলও বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

যামুন আবার কহিলেন, "আচার্যবর, আপনার বোধহয় জানা আছে, অষ্টাবক্র মুনি যখন জনকের সভাপণ্ডিত বন্দীকে পরাভূত করেন, তখন তাঁর বয়স ছিল বারো বৎসর। কাজেই বয়সের কথা ভেবে আমার সঙ্গে যেন প্রশ্নোত্তর করবেন না।"

১ **বেদান্তদর্শনের ইতিহাস (১ম ভাগ): প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী শংকর-মঠ, বরিশাল।**

পাণ্ড্যরাজ হাসিয়া কহিলেন, "ও সব কথা থাক। এবার রাজ-পণ্ডিতকে প্রশ্ন করা হোক। সত্যকার তর্কবিচার চলুক।"

রাজার নির্দেশ মানিয়া নিয়া যামুন এবার উঠিয়া দাঁড়ান, বলেন, "আচার্য কোলাহল, আপনাকে আমি তিনটি অতি সাধারণ প্রশ্ন করবো। আপনি সাধ্যমতো উত্তর দিন সভার সমক্ষে। আমার প্রথম বক্তব্য : আপনার মাতা বন্ধ্যা নন। এ-বাক্যটি আপনি খণ্ডন করুন।"

আচার্য কোলাহল তো হতবাক্। একি অদ্ভুত হেঁয়ালিপূর্ণ বাক্য! নিজের মাতার পুত্ররূপে জলজ্যান্ত তিনি রাজসভায় বসিয়া আছেন, কি করিয়া তিনি বলিবেন যে তাঁহার মাতা বন্ধ্যা? নাঃ, এ কোনো প্রশ্নই নয়। উত্তরও ইহার কিছু দেওয়া যায় না।

শ্লেষাত্মক হাসি হাসিয়া যামুন বলেন, "এবার আমার আর দুটি বাক্য শুনুন আচার্যবর। আমি বলছি, পাণ্ড্যরাজ সম্পূর্ণরূপে নিষ্পাপ। আপনি এটি খণ্ডন করুন। আমার শেষ বাক্য—আমাদের রানীমাতা, যিনি এখানে সিংহাসনে উপবিষ্টা রয়েছেন তিনি সবিত্রীর মতো সাধ্বী। আপনি আমার এ বাক্যটিও খণ্ডন করুন।"

আচার্য কোলাহল বিভ্রান্ত ও বিব্রত হইয়া পড়েন। অভিযোগের সুরে রাজাকে বলিয়া উঠেন, মহারাজ, এ দুটি বাক্য খণ্ডন করতে হলে আমায় প্রমাণ করতে হবে, আপনি পাপী এবং আমাদের রানীমা সতী সাধ্বী নন। না—না, এ বড় ধৃষ্ট প্রশ্ন, বড় কূট এবং হেঁয়ালিপূর্ণ প্রশ্ন। আমি এর উত্তর দেব না।"

পণ্ডিত কোলাহলের পক্ষীয় পণ্ডিত এবং ছাত্রেরা সভামধ্যে চেঁচামেচি শুরু করিয়া দেয়,—এসব প্রশ্ন অশালীন, অসমীচীন। কোলাহলের বিরোধীরাও মহাউত্তেজিত। তাহারা বার বার জেদ করিতে থাকে, প্রশ্ন যখন করা হইয়াছে—তাহার খণ্ডন অবশ্যই করিতে হইবে। দুই পক্ষের এই বাদানুবাদে রাজসভা মুখর হইয়া উঠে।

সবাইকে শান্ত হইতে আদেশ দিয়া রাজা কহিলেন, "বেশ তো,

আচার্য কোলাহল যখন উত্তর দিতে অসমর্থ হয়েছেন, এবার প্রতিপক্ষ যামুনই তাঁর নিজের প্রশ্ন খণ্ডন করবেন।"

যামুন উঠিয়া দাঁড়ান, রাজা বুধমণ্ডলীকে অভিবাদন জানাইয়া বলেন, "এবার তাহলে আমার প্রস্তাব একটি একটি ক'রে আমিই খণ্ডন করছি। আচার্য কোলাহল তাঁর মাতার একমাত্র পুত্র, তবুও আমি বলবো, তাঁর মাতা বন্ধ্যা। শ্রেষ্ঠ ধর্ম-শাস্ত্রকার মনু বিধান দিয়েছেন, একমাত্র পুত্রের পিতা একাধিক পুত্র লাভের জন্য পুনরায় বিবাহ করতে পারে। শাস্ত্রকার চেয়েছেন, পুত্রদের মধ্যে একটি যেন বেঁচে থাকে এবং গয়ায় গিয়ে পিণ্ড দিতে সক্ষম হয়। মেধাতিথির ভাষ্যেও আমরা দেখি—একঃ পুত্রোঽপুত্রো বা। সুতরাং আচার্য কোলাহলের মাতাকে বন্ধ্যা বলা যেতে পারে।"

সভাকক্ষে গুঞ্জন উঠে। অনেকেই বলিতে থাকেন, "যেমন কূট প্রশ্ন, তেমনি কৌশলপূর্ণ খণ্ডন। বেশ বেশ!"

যামুন অতঃপর বলা শুরু করেন, "এবার রাজার নিষ্পাপত্বের কথায় আসছি। সংহিতার একটি শ্লোকে মনু বলেছেন, প্রজার রক্ষণাবেক্ষণের পরিবর্তে রাজা প্রজার কাছ থেকে কর গ্রহণ করেন। প্রজার উৎপন্ন বস্তুর ষষ্ঠাংশ তাঁর প্রাপ্য; এই উৎপন্ন বস্তু বলতে ভৌতিক এবং আধ্যাত্মিক দুই-ই বুঝায়। কাজেই একথা বলা যেতে পারে যে, রাজা তাঁর প্রজাদের পাপপুণ্যেরও এক ষষ্ঠাংশ গ্রহণ ক'রে থাকেন। আপনারা বলুন, রাজ্যের প্রজারা কি নিষ্পাপ? তারা যদি নিষ্পাপ না হয়ে থাকে, তবে রাজাও তো নিষ্পাপ নন।"

"এবার মহারানীর সাধ্বীত্বের কথা। মনু বলেছেন, অভিষেক-অনুষ্ঠানের সময় রাজার দেহে বিরাজ করতে থাকেন সূর্য, চন্দ্র, ইন্দ্র, বরুণ প্রভৃতি অষ্টদিক্‌পাল। তদনুযায়ী রাজ্ঞী রাজার এবং তাঁর অভ্যন্তরস্থিত অষ্টদিক্‌পাল, উভয়েরই মহিষী। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে কি ক'রে বলবো, তিনি সাবিত্রী সমা সাধ্বী[১]?"

বালক পণ্ডিতের প্রতিভা ও শাণিত বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্যে সবাই

চমৎকৃত। সবাই উপলব্ধি করিলেন, শাস্ত্রপারঙ্গম তো তিনি বটেই, ব্যাখ্যান কৌশল, কূটবুদ্ধি ও চাতুর্যেও তিনি অপরাজেয়।

প্রতিপক্ষ দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত কোলাহল নীরবে নত মস্তকে বসিয়া আছেন আর সভাকক্ষের সবাই যামুনকে জানাইতেছেন তাঁহাদের সোল্লাস অভিনন্দন।

অতঃপর রাজার আদেশে শুরু হয় বেদ, উপনিষদ ও ধর্মশাস্ত্রের দুরূহ তত্ত্ব ও দার্শনিকতার বিচার-দ্বন্দ্ব। আচার্য কোলাহলের সে উৎসাহ, ও আত্মবিশ্বাস, সে দম্ভ আর নাই। সারস্বত জীবনের দীপশিখাটি কে যেন এক ফুৎকারে নিভাইয়া দিয়াছেন। কোনো-ক্রমে হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া তিনি শাস্ত্রের জটিল তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে চাহিতেছেন, আর প্রতিভাধর বালক প্রতিদ্বন্দ্বীর এক একটি তীক্ষ্ণ প্রশ্নবাণে হইতেছেন বিপর্যস্ত। বিচারের শেষের দিকে তর্কশূর কোলাহল একেবারে ভাঙিয়া পড়িলেন। এবার সমবেত বুধমণ্ডলীর সমর্থন লাভের পর পাণ্ড্যরাজ ঘোষণা করিলেন, এ বিচারে যামুন জয়লাভ করিয়াছেন।

তখনি চারিদিকে ধ্বনিত হয় বালক পণ্ডিত যামুনের সাধুবাদ ও জয়ধ্বনি, জয়মাল্য অর্পিত হয় তাঁহার কণ্ঠে।

রাজ্ঞীর আনন্দের অবধি নাই। পার্শ্বে উপবিষ্ট হৃতমান, নতশির, আচার্য কোলাহলের দিকে তাকাইয়া শ্লেষের সুরে বলিয়া উঠেন, "আলওয়ান্দার, আলওয়ান্দার।" অর্থাৎ, আচার্য তা'হলে এই বালকই শেষটায় পরাজিত করল আপনার মতো দিক্‌পাল আচার্যকে।

তর্কবিচার সভা ভঙ্গ হইল। অতঃপর পাণ্ড্যরাজ রানীর নিকট যে শপথ করিয়াছিলেন তাহা রক্ষা করিলেন, যামুনকে প্রদান করিলেন রাজ্যের অর্ধাংশ।

পাণ্ড্যরাজের বিচার সভায় সেদিনকার এই বিজয়ী বালক পণ্ডিতই উত্তরকালের দেশবরেণ্য মহাসাধক যামুনাচার্য। ভক্তিবাদের ভাস্বর আলোকস্তম্ভরূপে দশম শতকের দাক্ষিণাত্যে ঘটে তাঁহার অভ্যুদয়। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের মহান্ উদ্‌গাতা ও ধারক বাহকরূপে

তিনি পরিচিত হইয়া উঠেন। আচার্য রামানুজের প্রেরণাদাতা ও আরাধ্য পূর্বসূরীরূপে সারা ভারতে অর্জন করেন অতুলনীয় কীর্তি।

দক্ষিণ ভারতে মাদুরাইর এক বিখ্যাত বিষ্ণুভক্ত ব্রাহ্মণ পরিবারে যামুনাচার্যের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম ঈশ্বরমুনি। পিতামহ নাথমুনি ছিলেন এক দিক্‌পাল পণ্ডিত, ভক্তিসিদ্ধ মহাপুরুষ বলিয়াও চারিদিকে তাঁহার খ্যাতি ছিল।

শঙ্কর মঠের স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী এই মনীষী ও সাধক সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "দশম শতাব্দী হইতে বিশিষ্টাদ্বৈত সাধনার স্রোত প্রবল বেগে প্রবাহিত হইয়া ভবিষ্যতে মহাপ্লাবনের সূচনা করিতে লাগিল। মহাপুরুষ শ্রীনাথমুনি এই দার্শনিক যজ্ঞের প্রথম পুরোহিত। অন্যূন ৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের প্লাবন সূচিত হয়। যামুনাচার্যের সময় নাথমুনির সাধনার ফল ফলিতে আরম্ভ হয় এবং রামানুজের সাধনায় সেই ফল পরিপূর্তি লাভ করে। নাথমুনির হৃদয়ে যে প্লাবনের সূচনা হয়, সেই প্লাবনই পরবর্তীকালে সমস্ত ভারতকে প্লাবিত করিয়াছে[১]।"

দক্ষিণী ভক্তসমাজে নাথমুনি শ্রীবৈষ্ণব সমাজের প্রথম আচার্য-রূপে সম্মানিত। তাঁহার সম্পর্কে প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব আচার্য বেঙ্কটনাথ লিখিয়াছেন,—'সমস্ত অজ্ঞান-অন্ধকারের বিনাশক আমাদের এই দর্শন নাথমুনির দ্বারা সূচিত, যামুনের বহু প্রয়াসের মাধ্যমে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, আর রামানুজের দ্বারা সম্যক্‌রূপে বিস্তারিত[২]।'

নাথমুনি 'ন্যায়তত্ত্ব' নামে একটি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন বলিয়া বেঙ্কটনাথ উল্লেখ করিয়াছেন, এবং কিছু কিছু উদ্ধৃতির অনুবাদও তিনি দিয়াছেন। কিন্তু ঐ গ্রন্থ আর পাওয়া যায় নাই। অধ্যাপক শ্রীনিবাসচারীর মতে, ঐটি হইতেছে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ মতের প্রথম আধুনিক গ্রন্থ[৩]।

১ বেদান্ত দর্শনের ইতিহাস : স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, শঙ্কর মঠ, বরিশাল।

২ সঙ্কল্পসূর্যোদয় : বেঙ্কটনাথ

৩ দ্য ফিলসফি অব বিশিষ্টাদ্বৈত : জি. এন. শ্রীনিবাসচারী, আদেয়ার।

উত্তরজীবনে নাথমুনি শ্রীরঙ্গনাথের এক অন্তরঙ্গ সিদ্ধভক্ত ও শ্রীরঙ্গমের শ্রেষ্ঠ আচার্যরূপে বিপুল খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীসম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ আচার্য রামানুজ তাঁহার স্তোত্ররত্ন ও অন্যান্য রচনায় পূর্বসূরী নাথমুনির কথা সশ্রদ্ধভাবে উল্লেখ করিয়াছেন, প্রশস্তি গাহিয়াছেন অকুণ্ঠভাবে।

নাথমুনির একমাত্র পুত্র ঈশ্বরমুনি। এই পুত্রটিকে পরম স্নেহে ও আদরে তিনি লালন করেন, বড় হইয়া উঠিলে সযত্নে নিজের কাছে রাখিয়া নানা শাস্ত্রে তাঁহাকে পারঙ্গম করিয়া তুলেন। শাস্ত্রজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে পুত্র ঈশ্বরের জীবনে দেখা দেয় প্রবল বিষ্ণুভক্তি, ইষ্টদেব বিষ্ণুর অর্চনা ও সাধনায় তিনি নিবিষ্ট হইয়া পড়েন। পুত্রের বিদ্যাবত্তা ও সাধননিষ্ঠা দর্শনে নাথমুনির অন্তর তৃপ্তি ও আনন্দে ভরিয়া উঠে।

অতঃপর তরুণ কৃতী পুত্রকে বিবাহ দেওয়াইয়া নাথমুনি তাহাকে সংসারাশ্রমে প্রবিষ্ট করেন এবং কয়েক বৎসর পরে, ৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ভূমিষ্ঠ হয় এক সুদর্শন, সুলক্ষণযুক্ত পৌত্র। ক্ষুদ্র স্বল্পবিত্ত সংসারে এ যেন দিবালোকের এক ঝলক আলোক-রশ্মি। সারাগৃহ আনন্দে উল্লাসে পূর্ণ হইয়া উঠে।

এই পৌত্রের নাম রাখা হয় যামুন, বালককাল হইতেই প্রকাশ পায় তাহার অসাধারণ মেধা ও প্রতিভা। একবারটি যাহা কিছু শ্রবণ করে, আর কখনো সে তাহা বিস্মৃত হয় না। শুধু তাহাই নয়, এক এক সময়ে অতীত বিষয় সম্পর্কে নূতন নূতন প্রশ্ন তুলিয়া শিক্ষকদের সে অবাক্ করিয়া দেয়।

ঈশ্বরমুনি শাস্ত্রবিদ্ ব্রাহ্মণ বংশের যোগ্য প্রতিনিধি হইয়া উঠিয়াছেন। পরম আদরের পৌত্র যামুনও গড়িয়া উঠিতেছেন সহজাত শুভ সংস্কার নিয়া। আগামী কয়েক বৎসরের মধ্যেই সে যে এক কৃতী পড়ুয়া হইয়া উঠিবে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। কিন্তু এসময়ে নাথমুনির সংসার জীবনে নিপতিত হয় দৈবের এক নির্মম আঘাত। আকস্মিক এক কঠিন রোগে ভুগিয়া প্রিয় পুত্র ঈশ্বরমুনি ইহলোক ত্যাগ করেন।

একমাত্র পুত্রের এই বিয়োগ ব্যথায় নাথমুনি মুহ্যমান হইয়া পড়েন হৃদয়ে জাগিয়া উঠে তীব্র বৈরাগ্যের আগুন। সংকল্প স্থির করিয় ফেলেন, এবার চিরতরে সংসার ত্যাগ করিবেন, সন্ন্যাস নিয়া শুর করিবেন কঠোর তপস্যা, প্রভু রঙ্গনাথজীর পবিত্র পীঠে অবস্থান করিয়াই কাটাইয়া দিবেন জীবনের বাকী দিনগুলি।

গৃহের লোকদের ভরণপোষণের মোটামুটি ব্যবস্থা করার পর বালক পৌত্র যামুনকে তিনি পাঠাইয়া দিলেন গুরুগৃহে। কুলপ্রথা অনুযায়ী এ বয়সে সবাই তাঁহারা শাস্ত্রপাঠ সমাপ্ত করিয়াছেন গুরুর সন্নিধানে বাস করিয়া। যামুনের জন্যও সেই ব্যবস্থাই করা হইল। পণ্ডিত ভাষ্যাচার্য একজন খ্যাতিমান্ শাস্ত্রবিদ্, সদাচারী ও বিষ্ণুভক্ত বলিয়াও তাঁহার সুনাম রহিয়াছে। যামুনকে তাঁহার আশ্রয়ে রাখিয়া নাথমুনি নিশ্চিন্ত হইলেন। তারপর একদিন শ্রীরঙ্গমে উপনীত হইয়া গ্রহণ করিলেন বৈষ্ণবীয় সন্ন্যাস।

বিষ্ণু আরাধনার সঙ্গে সঙ্গে নিগূঢ় যোগ সাধনায়ও ব্রতী হন নাথমুনি। অতঃপর কয়েক বৎসরের মধ্যে শ্রীরঙ্গম অঞ্চলে সাধক হিসাবে তাঁহার খ্যাতি ছড়াইয়া পড়ে। যোগে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, তাই সাধক মহলে তাঁহার সম্ভ্রমের সীমা ছিল না, সবাই তাঁহাকে অভিহিত করিত নাথমুনি নামে।

এদিকে অল্পকাল মধ্যে বালক যামুন পরিচিত হইয়া উঠেন ভাষ্যাচার্যের চতুষ্পাঠীর অন্যতম অগ্রণী ও প্রতিভাধর ছাত্ররূপে। এই নবীন পড়ুয়ার প্রতি পণ্ডিত ভাষ্যাচার্যের স্নেহ মমতার সীমা ছিল না। ঈশ্বরমুনির ঘরের ছেলে যামুন, স্বভাবতই পিতা ও পিতামহের সাত্ত্বিকী সংস্কার ও সহজাত মেধা নিয়া সে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। তদুপরি দিনের পর দিন প্রকাশ পাইতেছে তাঁহার মননশক্তি ও প্রতিভার চমৎকারিত্ব। গোড়া হইতেই আচার্য বুঝিয়া নিয়াছেন, তাঁহার এই বালক পড়ুয়া ঈশ্বরপ্রদত্ত অসামান্য প্রতিভার অধিকারী, কালে অবশ্যই সে গণ্য হইবে দিক্‌পাল পণ্ডিতরূপে। তাই স্বভাবতই

ভাষ্যাচার্য যামুনকে প্রাণ ঢালিয়া এতদিন পড়াইয়াছেন। গড়িয়া তুলিয়াছেন এক সর্বশাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিতরূপে।

ছাত্র যামুনকে কেন্দ্র করিয়া আচার্য অনেক কিছু আশা করিয়াছেন, ভবিষ্যতের সুখ স্বপ্ন দেখিয়াছেন। কিন্তু সে যে সেদিন হঠাৎ এমন করিয়া দুর্ধর্ষ পণ্ডিত কোলাহলের সহিত সংঘর্ষ বাধাইয়া বসিবে এবং সে সংঘর্ষে জয়ী হইবে, এ কথা তাঁহার মনে কোনোদিন স্থান পায় নাই।

এবার ভাষ্যাচার্যের আনন্দ আর ধরে না। দর্পী অত্যাচারী আচার্য কোলাহল পাণ্ড্যরাজ্য ছাড়িয়া দূরে পলায়ন করিয়াছে। বালক শিষ্যের বিজয়ে ভাষ্যাচার্যের নিজের খ্যাতি প্রতিপত্তি যেমন বাড়িয়াছে, তেমনি জাঁক বাড়িয়াছে তাঁহার চতুষ্পাঠীর।

বিজয়ী নবীন পণ্ডিত যামুনের জীবনের ধারা এবার বহিয়া চলে এক নূতনতর খাতে। নিজে তিনি বালক, রাষ্ট্রীয় কর্মের কোনো অভিজ্ঞতা নাই। তাই পাণ্ড্যরাজের অভিভাবকত্ব ও সহায়তায় পরিচালনা করিতে থাকেন তাঁহার নবলব্ধ রাজ্যের সমস্ত কিছু দায়িত্ব। এই সঙ্গে বহিয়া চলে তাঁহার সারস্বত জীবনের ধারা। দেশ দেশান্তর হইতে শাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিতেরা আসিয়া জড়ো হন তাঁহার রাজধানীতে এই পণ্ডিতদের সাহচর্যে যামুন গড়িয়া তোলেন এক শাস্ত্রপারঙ্গম বুধমণ্ডলী।

ক্রমে যৌবনে পদার্পণ করেন রাজা যামুন। শক্তি, আত্মবিশ্বাস ও প্রতিভার মূর্তবিগ্রহ তিনি। পার্শ্ববর্তী রাজন্যদের উপর স্বভাবতই তাঁহার প্রভাব ধীরে ধীরে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। রাজ্যের আয়তন অচিরে বৃদ্ধি পায়, রাজকীয় বিত্ত বিভব হয় পুঞ্জীভূত এবং ভোগ-বিলাসের পরিবেশ সৃষ্টি হয় তাঁহার চারিদিকে। দশ বারো বৎসরের মধ্যে যামুন পরিণত হন এক ধনজন পরিপূর্ণ রাজ্যের অধীশ্বররূপে।

ভাগ্যচক্রের আবর্তনে রাজশক্তি ও রাজ্যবৈভবের দিকেই তিনি আকৃষ্ট হইয়া পড়েন।

আরো কয়েক বৎসর অতীত হইলে স্বভাবতই যামুন বিস্মৃত হন তাঁহার প্রথম জীবনের সাত্ত্বিকী, সদাচারী, তপোনিষ্ঠ চিত্তবৃত্তির কথা। রাজ্যের প্রসার ও প্রভাবের জন্য, ধন মান ও বিলাস বৈচিত্র্যের জন্য দিন দিন তিনি উৎসাহী হইয়া উঠেন। প্রথম জীবনের পরম সম্ভাবনার উপর ধীরে ধীরে নামিয়া আসে বিস্মৃতির যবনিকা।

এভাবে প্রায় তেইশ বৎসর কাল পরমানন্দে তিনি রাজদণ্ড পরিচালনা করেন এবং সর্বত্র পরিচিত হইয়া উঠেন এক কৌশলী রাজনীতিবিদ্ ও দক্ষ শাসকরূপে। রাজ্যের পরিধি তাঁহার দিনের পর দিন আরো বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

গৃহত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস নিবার পরও নাথমুনি কিন্তু পৌত্র যামুনের কথা বিস্মত হন নাই। বরং তাঁহার কল্যাণময় দৃষ্টি সতত নিবদ্ধ রহিয়াছে তাঁহারই দিকে। সিদ্ধপুরুষের উপলব্ধিতে আসিয়া গিয়াছে যামুনের আত্মিক জীবনের পরম সম্ভাবনার কথা। ধ্যান বলে তিনি জানিয়াছেন, ভক্তিধর্মের এক মহান্ নেতারূপে ভবিষ্যতে ঘটিবে তাঁহার অভ্যুদয়, সহস্র সহস্র সাধক লাভ করিবে তাঁহার পরমাশ্রয়। তাছাড়া, ইহাও তিনি জানিয়াছেন, যামুনের তপস্যা, তাঁহার সিদ্ধি, তাঁহার দার্শনিকতা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের এক দৃঢ় ভিত্তিভূমি গড়িয়া তুলিবে, সারা ভারতের ধর্ম-সংস্কৃতির আন্দোলনে ঘটাইবে এক কল্যাণময় পদক্ষেপ।

যামুন রাষ্ট্র পরিচালনার কাজ নিয়া সদা ব্যস্ত। কিন্তু দিব্য দৃষ্টি সহায় নাথমুনি যে দেখিয়াছেন, তাঁহার সহজাত সাত্ত্বিকী সংস্কার, ত্যাগ বৈরাগ্য ও কৃচ্ছ্রময় তপস্যার সংস্কার, জীবনের গভীরতর খাতে বহিয়া চলিয়াছে অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার মতো। সে প্রচ্ছন্ন ধারার আত্মপ্রকাশের আর বেশী দেরি নাই। লগ্নটি প্রায় আসিয়া পড়িয়াছে।

এদিকে নাথমুনির নিজের মহাপ্রয়াণের দিনটিও নিকটবর্তী হয়। বিদায়ের দিন অন্তরঙ্গ শিষ্য, উচ্চকোটির ভক্তিসিদ্ধ সাধক, মানাক্কাল নম্বিকে নিভৃতে নিজের শয্যার পাশে ডাকাইয়া আনিলেন। কহিলেন, "নম্বি, তোমার ওপর বহু কর্তব্যের ভারই বহুবার চাপিয়েছি। এবার চাপিয়ে দেবো একটি ঐশ্বরীয় কাজের দায়িত্ব।"

"আজ্ঞা করুন প্রভু, এ দাস যে কোনো কঠিন কাজে পিছপাও হবে না।" জোড়হস্তে নিবেদন করেন নম্বি

"তা জানি বৎস। এবার মন দিয়ে শোনো আমার কথা। আমার সময় পূর্ণ হয়েছে, আজই আমি এই দেহের খোলস ছেড়ে যাচ্ছি। কিন্তু তার আগে দক্ষিণদেশের সহস্র সহস্র ভক্তের, বিশেষ ক'রে শ্রীসম্প্রদায়ের অনুগামীদের একটা আশ্রয় গড়ে তোলার কথা আমি ভাবছি। নম্বি, তুমি আমার পৌত্র, রাজা যামুনকে তো জানো ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, তাঁর ওখানে আমি কয়েকবার গিয়েছি। সদাচারী এবং ধার্মিক রাজা, তা স্বীকার করতে হবে।"

"শোনো নম্বি, যতই ভালো হোক, রাজত্ব নিয়েই সে মজে আছে। তা থেকে তাঁকে টেনে বার করতে হবে।"

"সে কি কথা প্রভু, এ আপনি কি বলছেন ?"

"হ্যাঁ নম্বি, তাই করতে হবে এবং তোমাকেই তা করতে হবে। প্রভু রঙ্গনাথ আমায় তাঁর স্বরূপ দেখিয়ে দিয়েছেন। একটা শক্তিধর মহাবৈরাগী প্রচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে রাজা যামুনের ভেতরে। সে জানে না যে সে ঈশ্বর প্রেরিত মহাসাধক। বহুজনের উদ্ধারকারী সে। কিন্তু আপন স্বরূপ সে বিস্মৃত হয়েছে, ডুবে আছে বিষয়ের পঙ্কে। তাকে সেই পঙ্ক থেকে টেনে তুলতে হবে, জানিয়ে দিতে হবে তাঁর প্রকৃত পরিচয়, বুঝিয়ে দিতে হবে ঐশ্বরীয় কার্যের গুরুদায়িত্বের কথা।"

"কিন্তু, প্রভু, আমায় দিয়ে কি ক'রে এই দুরূহ কাজ সম্পন্ন হবে, তা আমি বুঝে উঠতে পারছিনে।"

"তুমিই এটা করবে, বৎস। রাজা যামুন সব সময়ে রাজকার্যের জটিল জালে আবদ্ধ। তাঁকে কৌশলে তোমায় ভুলিয়ে আনতে

হবে শ্রীরঙ্গনাথের চরণতলে। তাঁর ভেতরকার সুপ্ত শক্তিকে জাগিয়ে তুলতে হবে। রঙ্গনাথের কৃপায় তুমি ভক্তিসিদ্ধ হয়েছো। তোমার পবিত্র সঙ্গ দেবে যামুনকে কিছুদিনের জন্য। দেখবে মুক্তি আস্বাদনের লোভে উন্মত্তের মতো বেরিয়ে আসবে সে তার সোনার পিঞ্জর থেকে। যে-কোনো উপায়ে তাঁকে টেনে বার ক'রে এনো, নম্বি, গুরু হিসেবে এই আমার শেষ নির্দেশ তোমার প্রতি।"

"আপনার আজ্ঞা এ দাস শিরোধার্য করছে, প্রভু।"

বৃদ্ধ নাথমুনির অন্তর তৃপ্তিতে ভরিয়া উঠে। চোখে মুখে ছড়াইয়া পড়ে দিব্য আলোকের আভা, হৃদ্‌পদ্মে প্রভু রঙ্গনাথজীর ধ্যান করিতে করিতে প্রবিষ্ট হন নিত্যলীলার মহাধামে।

মানাক্কাল নম্বি অচিরে উপনীত হন যামুনের রাজধানীতে। নাথমুনির প্রিয়তম শিষ্য তিনি, তাছাড়া শ্রীরঙ্গমের এক খ্যাতনামা সাধক তিনি। যামুনের সহিত পূর্ব হইতেই তিনি সুপরিচিত। সভাগৃহে নম্বির দর্শন পাওয়া মাত্র সসম্ভ্রমে যামুন জ্ঞাপন করেন অভ্যর্থনা, পিতামহের অন্তিম সময়ের কথা শ্রবণ করেন তাঁহার কাছে। তারপর রাজ-অতিথি ভবনে নম্বির যথোচিত অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করিয়া লিপ্ত হইয়া পড়েন জরুরী কাজে।

ইতিমধ্যে কয়েকদিন কাটিয়া গিয়াছে, কিন্তু রাজা যামুনের সঙ্গে কোনো কথাবার্তা বলার সুযোগই নম্বি পাইতেছেন না। মন্ত্রীর কাছে দরবার করিয়াও রাজার সহিত সাক্ষাৎ করা সম্ভব হইতেছে না।

লোকের কানাঘুষায় শুনিলেন, প্রতিবেশী একটি দুষ্ট রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধের আয়োজন চলিতেছে, যামুন তাই অতিমাত্রায় ব্যস্ত। এজন্যই ভক্ত নম্বিকে কোনো সময় দেওয়া তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইতেছে না।

নম্বি এবার তাঁহার কার্যক্রম স্থির করিলেন। গুরু নাথমুনি বলিয়া গিয়াছেন, প্রয়োজন বোধে ছলাকলার আশ্রয় নিবে, সেই অনুসারে এক কৌশলপূর্ণ উপায়ও তিনি গ্রহণ করিলেন।

সেদিন রাজার সহিত সাক্ষাৎ ঘটিল। যামুন সৌজন্য

ও বিনয় দেখাইয়া কহিলেন, "ভক্তপ্রবর, আমি একটা আসন্ন যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে মহাব্যস্ত, ইচ্ছা সত্ত্বেও আপনার মতো বৈষ্ণব সাধকের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে পারছিনে।"

নম্বি একথার সুযোগ নিতে ছাড়িলেন না। সবিনয়ে কহিলেন, "মহারাজ, যুদ্ধের প্রস্তুতি সব চাইতে বড় কথা—অর্থ, সমরোপকরণ ও সেনা বাহিনী। আপনার তো কিছুরই অভাব নেই।"

"ভক্তবর, বড় রকমের উদ্যোগ আয়োজনে কোনো কোনো দিকে অভাব তো কিছুটা থাকবেই। প্রতিপক্ষ অতি খল এবং শক্তিশালী। তাকে চকিতে আক্রমণ ক'রে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করতে চাই আমি। নতুবা বিষদাঁত বার বার গজাবে, আর অযথা আমাদের কামড়াতে আসবে।"

"অভিজ্ঞ-রাজনীতিকের মতোই কথা বলছেন আপনি।" প্রশংসার সুরে বলেন নম্বি।

"যত সত্বর হয়, একটি বৃহৎ অশ্বারোহী বাহিনী আমি গড়ে তুলতে চাই, এই বাহিনী নিয়ে তড়িৎবেগে আক্রমণ করা যায়, আকস্মিক ও তীব্র আক্রমণে শত্রুসেনা হয় ছিন্নভিন্ন। কিন্তু এই বাহিনীকে বড় ক'রে তুলতে হলে বিদেশ থেকে আনা দরকার অজস্র বলবান্ ও বেগবান্ অশ্ব। এর জন্য প্রচুর অর্থ চাই। রাজকোষে টান পড়ে গিয়েছে। এ সম্পর্কিত ব্যবস্থাদি নিয়ে একটু ব্যতিব্যস্ত রয়েছি আমি। একটু অপেক্ষা করুন, অবসর ক'রে নিয়ে আপনার সঙ্গে আবার আলাপ করবো।"

"মহারাজ, প্রচুর অর্থ হলেই তো আপনার সব সমস্যা মিটে যায়।"

"তা যায় বৈ কি। কিন্তু হঠাৎ তা চাইলেই তো আর এ বস্তু পাওয়া যায় না।"

নম্বি এবার ছাড়েন তাঁহার অমোঘ বাণ। কহেন, "মহারাজ, অর্থের জন্য ভাবনা নেই। প্রচুর অর্থ আমার কাছে গচ্ছিত রয়েছে, হ্যাঁ, বিপুল পরিমাণ ধনরত্ন রয়েছে, এবং আপনিই হচ্ছেন তার

একমাত্র উত্তরাধিকারী। এ ধনসম্পদ আপনার হাতে ন্যস্ত ক'
আমি দায়িত্ব থেকে রেহাই পেতে চাই, মহারাজ।"

মুহূর্তে যামুনের আয়ত নয়ন দুটি ঝক্‌ঝক্ করিয়া উঠে, উৎসা
উদ্দীপনায় খপ্ করিয়া নম্বির হাত দুটি তিনি ধরিয়া ফেলেন
বলেন, "বলুন, তাড়াতাড়ি বলুন, কার অর্থ? কে-ই বা দান করেছে
আমাকে?"

"মহারাজা, আপনার পিতামহ নাথমুনি সাংসারিক আশ্র
দরিদ্র ছিলেন বটে, কিন্তু সন্ন্যাস নেবার পর বিপুল অর্থের মালি
হন তিনি। শ্রীরঙ্গমের পুণ্যভূমিতে নিভৃতে তপস্যা করার কা
দৈব কৃপায় বিপুল ধনরত্ন তিনি প্রাপ্ত হন। সে সব গচ্ছিত রয়ে
আপনারই জন্য। নাথমুনির ঐশ্বর্য তাঁর একমাত্র পৌত্র ছাড়া আ
কে পাবে বলুন তো?"

"কোথায় আছে সে ধন, মহাত্মন্, কে জানে তার সন্ধান? বলু
বলুন, সব আমায় অকপটে খুলে বলুন।" রাজা যামুনের এবা
ধৈর্য ধারণ করা দায়।

প্রশান্ত কণ্ঠে উত্তর দেন নম্বি, "মহারাজ, একমাত্র আমিই জানি
সে গুপ্তধনের সন্ধান। যদি পেতে চান, আর দেরি না ক'
আমার সঙ্গে চলুন।"

উৎসাহে যামুন চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছেন। বলেন, "এখুনি আ
আমার দেহরক্ষীদের তৈরি হতে নির্দেশ দিই, যানবাহনের ব্যবস্থাদি
করতে বলি।"

উত্তরে নম্বি কহিলেন, "মহারাজা, গুপ্তধনের স্থানটি হচ্ছে দূরে
শ্রীরঙ্গম অঞ্চলে। আর সেখানে আপনাকে যেতে হবে একলা
আমার সঙ্গে এবং গোপনে ছদ্মবেশে। বেশী জানাজানি হলে কি
সব বেহাত হয়ে যাবে। ওখান থেকে ফেরবার সময় লোকলস্কর
যানবাহনের ব্যবস্থার জন্য আপনাকে ভাবতে হবে না।"

যামুন তাঁহার রাজকার্যের ভার কিছুদিনের জন্য মন্ত্রীর উপ
ন্যস্ত রাখিলেন। প্রচার করিয়া দিলেন, শরীর পীড়াগ্রস্ত, তা

কিছুদিন তিনি প্রাসাদের অভ্যন্তরে থাকিয়া বিশ্রাম নিবেন, কেহ যেন এ কয়টি দিন তাঁহাকে বিরক্ত না করে।

সেইদিনই গভীর রাত্রে নম্বিকে সঙ্গে নিয়া যামুন গোপনে ত্যাগ করেন রাজপ্রাসাদ। সাধারণ নাগরিকের ছদ্মবেশে উভয়ে রওনা হন পুণ্যভূমি শ্রীরঙ্গমের দিকে।

পথে চলিতে চলিতে নম্বি কহিলেন "মহারাজ, সারাটা পথ পদব্রজে অতিক্রম করতে হবে। আমি স্থির করেছি, প্রতিদিন তিন ক্রোশের বেশী আমরা অগ্রসর হবো না। কারণ, আপনার পক্ষে বেশী শ্রম সহ্য করা কঠিন।"

যামুন রাজপ্রাসাদের বিলাসবাসনে অভ্যস্ত, পদব্রজে চলার অভ্যাস মোটেই নাই, নম্বির কথায় তৎক্ষণাৎ সায় দিলেন।

তিন ক্রোশ অন্তর এক একটি গ্রামে পৌঁছিয়া উভয়ে বিশ্রাম করিতেন। তারপর ভক্ত নম্বি শুরু করিতেন তাঁহার ইষ্টসেবার কাজ। স্নান বন্দনাদি শেষ করিয়া ঠাকুরের প্রসাদ রন্ধন করিতেন, তারপর পূজা ও ভোগ নিবেদনের পর রত হইতেন গীতাপাঠে। ভাবাপ্লুত কণ্ঠে উচ্চ স্বরে প্রতিদিন তিন অধ্যায় তিনি পাঠ করিতেন, আর পাশে বসিয়া যামুন তাহা শ্রবণ করিতেন

নম্বি ভক্তিসিদ্ধ পুরুষ। গীতা পাঠ শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে সারা দেহ তাঁর পুলকাঞ্চিত হইয়া উঠে। চোখে মুখে ফুটিয়া উঠে দিব্য জ্যোতির আভা, অপার্থিব আনন্দে তিনি ভরপুর হইয়া উঠেন।

যামুন সবিস্ময়ে পরম ভক্তের এই আনন্দঘন মূর্তির দিকে চাহিয়া থাকেন। অন্তরে বার বার লাগে দোলা, ভাবিতে থাকেন, অপার আনন্দের অধিকারী এই নম্বি, স্বর্গীয় আনন্দের আস্বাদ লাভ ক'রে জীবন তাঁর হয়েছে ধন্য, কৃতার্থ। গীতাপাঠ, বহুতর শাস্ত্রপাঠ, যামুন আগে বহু করেছেন। কিন্তু স্বাধ্যায়কে এমন ক'রে ইষ্ট চিন্তনের সঙ্গে মিশিয়ে মধুর ক'রে তো কখনো তুলতে পারেন নি! তাছাড়া, রাজকার্যে লিপ্ত হবার পর থেকে একের পর এক মায়া বন্ধনের মধ্যে

জড়িয়ে পড়েছেন যামুন। দিব্যলোকের আনন্দ ও প্রসাদ থেকে রয়েছেন বঞ্চিত।'

মহাপুরুষ নম্বির পাঠ যেন চৈতন্যময়। উচ্চারিত এক একটি শ্লোক যেন উন্মোচিত করে ঈশ্বর চেতনার এক একটি দিব্য স্তর। পরমপ্রভু শ্রীকৃষ্ণের মহাবাণী বার বার অনুরণিত হয় যামুনের অন্তরে —ভক্তি নিয়ে এসো, শরণাগতি নিয়ে এসো আমার কাছে, আমি তোমায় দেবো পরাশান্তি, দেবো পরামুক্তি। এ বাণী মন-ভোলানো প্রাণ-গলানো। এ বাণী যে অমোঘ।

সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ে আসে তীব্র অনুশোচনা। যে বিষয় বিভব ক্ষণস্থায়ী, যে দেহ ভঙ্গুর ও মরণশীল তাহা নিয়াই নির্বোধের মতো সময় কর্তন করিয়াছেন এতদিন। আর নয়, এবার ছিন্ন করিতে হইবে এই বন্ধন-ডোর, শুরু করিতে হইবে অমৃতময় জীবনের পথসন্ধান।

ছয় দিনের পথে অষ্টাধ্যায়ী গীতা নম্বি পাঠ করিলেন, এই পাঠ যামুনের অন্তরে জাগাইয়া তুলিল দিব্যলোকের স্পর্শ, কাজ করিল মন্ত্রচৈতন্যের মতো। 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' ঘটিল রাজা যামুনের বিষয় বিমোহিত জীবনে।

সপ্তম দিনের প্রত্যূষে উভয়ে পৌঁছিয়া গেলেন শ্রীরঙ্গমে। কাবেরীতে স্নান সমাপনের পর নম্বি যামুনকে উপস্থিত করিলেন শ্রীবিগ্রহ রঙ্গনাথজীর সম্মুখে। প্রেমাপ্লুত স্বরে কহিলেন, মহারাজ, এই দেখুন আপনার পিতামহ নাথমুনির গুপ্ত ভাণ্ডার। এই ভাণ্ডারের সন্ধান আপনাকে দেবো বলে আমি প্রতিশ্রুত ছিলাম আমার গুরুর কাছে, আজ তা পালিত হল।"

বিগ্রহ দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে যামুন প্রেমাবেশে আত্মহারা হইয়া গেলেন। দরদর ধারে ঝরিতে লাগিল পুলকাশ্রু। রঙ্গনাথজীর জ্যোতির্ময়, আনন্দঘন মূর্তি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল তাঁহার হৃদয়াকাশে। বাহ্যচৈতন্য হারাইয়া মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন মন্দিরতলে।

সেইদিন হইতে যামুন পরিণত হন এক নূতন মানুষে। রাজা যামুনের এবার মৃত্যু ঘটিয়াছে, সেস্থলে জাগিয়া উঠিয়াছে ভক্তিপ্রেম পথের এক ভিখারী সাধক।

রাজসিংহাসন ও রাজবৈভব যামুন চিরতরে ত্যাগ করিলেন, পিতামহ নাথমুনির পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া গ্রহণ করিলেন সন্ন্যাস। প্রেম, ভক্তি ও প্রপত্তির পথে, ইষ্টপ্রাপ্তির পথে, শুরু হইল তাঁহার অভিযাত্রা।

রাজধানী হইতে স্বজনেরা, পাত্রমিত্রেরা, যামুনকে ফিরাইয়া নিতে আসিলেন। কিন্তু অনুনয় ও অশ্রুজল ত্যাগী ভক্তের সংকল্প টলাইতে পারিল না। স্মিতহাস্যে তিনি উত্তর দিলেন, "যে রাজ্য, যে বিষয়বৈভব নিয়ে এতদিন দিন কাটিয়েছি তা ক্ষণস্থায়ী, মূল্যহীন। এবার এক নূতন রাজার অধীনে কাজ নেবো। সে রাজার দ্বিতীয় নেই, আর রাজ্য তাঁর সারা সৃষ্টি জুড়ে,—অখণ্ড, অনন্ত, শাশ্বত সে রাজ্য। সে রাজ্যের রাজাই শুধু দিতে পারেন অমৃতত্ব আর অখণ্ড দিব্য আনন্দ। পরমপ্রভু শ্রীবিষ্ণুই সেই রাজা,—আর তাঁর জাগ্রত বিগ্রহ এই শ্রীরঙ্গনাথ। এখন থেকে আজীবন আমি থাকবো তাঁরই সেবক হয়ে।"

আত্মপরিজন ও শুভানুধায়ীরা বুঝিলেন বৈরাগ্যবান্ সাধককে সংসার জীবনে আর ফিরাইয়া নিবার উপায় নাই, হতাশ হইয়া তাঁহারা দেশে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

শ্রীরঙ্গমের ভক্ত-সমাজে, বিশেষত বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীদের মধ্যে, আনন্দের জোয়ার বহিয়া যায়। সকলেরই মনে আশা জাগিয়া উঠে, ভক্তি প্রেমের যে পথটি নাথমুনি প্রবর্তন করিয়া গিয়াছেন, প্রতিভাধর যামুনের সাধনা ও সিদ্ধিতে সে পথটি এবার আরো প্রশস্ততর হইবে, হইবে আরো আলোকোজ্জ্বল।

শ্রীরঙ্গনাথের সেবা পূজায় যামুন এবার প্রাণমন ঢালিয়া দেন। সেই সঙ্গে চলে ভক্তিমার্গীয় সাধনতত্ত্ব ও দর্শনের গবেষণা ও গ্রন্থ-রচনা। কয়েক বৎসরের মধ্যে এক ভক্তিসিদ্ধ মহাপুরুষরূপে তিনি

পরিচিত হইয়া উঠেন। শ্রীরঙ্গমের ভক্তগোষ্ঠীর নেতারূপে, বিশিষ্টা-দ্বৈতবাদের শ্রেষ্ঠ আচার্যরূপে, সারা দাক্ষিণাত্যে বিস্তারিত হয় তাঁহার খ্যাতি প্রতিপত্তি।

অমানুষী প্রতিভা নিয়া আচার্য যামুন জন্মিয়াছেন, বহুপূর্ব হইতেই সর্বশাস্ত্রে তিনি পারঙ্গম। এবার তাঁহার সেই পাণ্ডিত্য ও নেতৃত্বের দক্ষতা ঐশ্বরীয় কার্যে নিয়োজিত হইল।

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের এক বিস্তৃততর দার্শনিক ব্যাখ্যা আচার্য যামুন উপস্থাপিত করিলেন। পিতামহ নাথমুনি যে দার্শনিকতার প্রবর্তন করেন, তাহার ভিত্তিকেই তিনি করিলেন দৃঢ়তর। যামুনাচার্যের পরবর্তীকালে তাঁহার নাতিশিষ্য রামানুজের অবদানের ফলে এই বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ পরিগ্রহ করে এক পূর্ণতর অবয়ব, আত্মপ্রকাশ করে আচার্য শঙ্করের প্রতিপক্ষীয় সুসম্বদ্ধ দার্শনিক মতবাদরূপে।

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের ধারা এদেশে সুপ্রাচীন কাল হইতে বহমান। ব্রহ্মসূত্রে আচার্য আশ্মরথ্যকে উল্লেখ করা হইয়াছে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী-রূপে। মহাভারতে পাঞ্চরাত্রমতের কথা বর্ণিত আছে, ঐ মতবাদে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের ছায়াটিকে স্পষ্টরূপে দেখা যায়।

ব্রহ্মসূত্রের বিষ্ণুপর ব্যাখ্যার সূচনা দশম শতকে। নাথমুনি ও যামুনাচার্যের পরে একাদশ শতকে রামানুজের আবির্ভাব ঘটে এবং তাঁহার বিষ্ণুসাধনা ও দার্শনিক ব্যাখ্যার মাধ্যমে প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠে বিশিষ্টাদ্বৈত মতের ভক্তিবাদ।

কিন্তু একথা ভুলিলে চলিবে না, নাথমুনি যামুন ও রামানুজের ভক্তিবাদের উৎস আড়বার সাধকদের জীবনসাধনা। তামিলদেশে ভক্ত আড়বারগণ আবির্ভূত হন ঐতিহাসিক যুগের অনেক পূর্বে। শ্রীবৈষ্ণবেরা বলেন, প্রাচীন আড়বার আচার্যদের অভ্যুদয় ঘটে দ্বাপর যুগের শেষের দিকে। এই অভ্যুদয়ের ধারা এবং গুরু-পরম্পরা কলিযুগ অবধি বহিয়া চলে।

ভক্তিসিদ্ধ প্রাচীন আড়বারদের মধ্যে রহিয়াছেন: কাঞ্চীর পোইহে, মল্লাপুরীর পুদত্ত, ময়লাপুরের পে, মহীসারের তিরুমিড়িশি।

পরবর্তীকালের উল্লেখযোগ্য হইতেছেন—শঠকোপ, মধুর কবি, কুলশেখর, পেরিয়া, অণ্ডাল প্রভৃতি। ইঁহাদের প্রেমভক্তিময় জীবনের কাহিনী ও রচিত স্তবগাথা হাজার হাজার বৎসর যাবৎ দাক্ষিণাত্যকে ভক্তিরসে সিঞ্চিত করিয়াছে। অগণিত নরনারীর জীবনে আনিয়াছে ভক্তি, প্রেম ও শরণাগতির প্রেরণা।

আড়বারদের এই ভক্তিবাদ এবার নবতর রূপ পরিগ্রহ করিল যামুনাচার্যের সাধনা, সিদ্ধি ও দার্শনিক তত্ত্বের মধ্য দিয়া।

প্রাচীন আড়বার ও তাঁহাদের উত্তরসূরী বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী সাধক ও দার্শনিকদের প্রসঙ্গে স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী লিখিয়াছেন :

—প্রাচীন আলোয়ারগণ যে ভক্তির স্নিগ্ধ শান্ত ভাবপ্রবাহে অবগাহন করিয়া পূতপবিত্র হইয়াছেন, সেই ভক্তিপ্রবাহের সহিত দার্শনিকতার সম্মিলনে পুণ্যতীর্থের সৃষ্টি হইয়াছে। যামুনাচার্যের সময় হইতেই ইঁহাদের মধ্যে দার্শনিক প্রতিভার বিকাশ হইয়াছে। একদিকে যেমন আলোয়ারগণ ভক্তিবাদের প্রসার করিয়াছেন, অন্যদিকে তেমন দ্রমিড়াচার্য গুহদেব, টঙ্ক, শ্রীবৎসাঙ্ক প্রভৃতি আচার্যগণ দর্শনের মহিমা প্রকটিত করিয়াছেন। যামুনাচার্যের পূর্বে বেদান্তদর্শনের ভাষ্যকার দ্রমিড়াচার্য আপনার প্রতিভার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। শ্রীবৎসাঙ্ক মিশ্র, টঙ্ক প্রভৃতি আচার্যগণ ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। 'সিদ্ধিত্রয়' নামক গ্রন্থে যামুনাচার্য প্রাচীন আচার্যগণের নামোল্লেখ করিয়াছেন। ভাষ্যকার দ্রমিড়াচার্য, টীকাকার টঙ্ক ও শ্রীবৎসাঙ্ক প্রভৃতি আচার্যগণ শ্রীসম্প্রদায়ভুক্ত। আচার্য ভর্তৃপ্রপঞ্চ, ভর্তৃহরি, ব্রহ্মদত্ত শঙ্কর প্রভৃতি নির্বিশেষ ব্রহ্মবাদী। আচার্য ভাস্কর ভেদাভেদবাদী। যখন নির্বিশেষ ব্রহ্মবাদের ও ভেদাভেদবাদের অভ্যুদয় হইয়াছে, তখন স্বীয় মত প্রতিষ্ঠার জন্যই যামুনাচার্যের দার্শনিক ক্ষেত্রে অবতরণ। দশম শতাব্দী দার্শনিক প্রতিভার যুগ, সকলক্ষেত্রেই নবজীবনের সূত্রপাত হইয়াছে। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদও তখন আপনার প্রতিষ্ঠার জন্য অগ্রসর হইয়াছে।

—অনেকে মনে করেন, শঙ্করের জ্ঞানবাদে ব্যভিচারের সূত্রপাত হইলে, আচার্য রামানুজ প্রভৃতির আবির্ভাব হয়; কিন্তু আমাদের মনে হয় এই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। কারণ, যামুনাচার্যের অবতরণ কালেই বাচস্পতির আবির্ভাব কাল। বাচস্পতির মহিমা যখন সমস্ত দেশে পরিব্যাপ্ত হইতেছিল, তখনই রামানুজের আবির্ভাব। একাদশ শতাব্দীতে বাচস্পতির প্রতিভা সমস্ত ভারতে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। ভারতের আচার্যগণ সকলেই অবতার। ধর্মের গ্লানি না হইলে অবতার অবতীর্ণ হন না। জীবন চরিতকার-গণ অবতারের ফলে ধর্মের গ্লানি অঙ্গীকার করিয়া লইয়াছেন। আচার্য রামানুজ ও মধ্ব প্রভৃতি আবির্ভাবের কারণ শাঙ্করমতের গ্লানি। কিন্তু রামানুজ ও মধ্বের যুগে শাঙ্কর সম্প্রদায়ের প্রতিভার আরও অধিকতর স্ফূর্তি হইয়াছে। যে মতের গ্লানি হয়, তাহার স্ফূর্তি অসম্ভব। যদি শাঙ্কর মতের গ্লানি হইত, তাহা হইলে দার্শনিক মনীষার প্রস্ফুরণ হইতে পারিত না। আমাদের বিবেচনায় যখন শাঙ্কর মতের প্রাধান্য সুস্থিত হইয়াছে, তখন প্রতিদ্বন্দ্বী মতবাদ সকল স্বীয় প্রতিষ্ঠার জন্য শাঙ্কর মত আক্রমণ করিয়াছেন।

…—প্রবল শত্রুকে পরাজিত করিবার জন্যই সমধিক প্রচেষ্টার আবশ্যকতা, যদি শাঙ্করমতের গ্লানিই আরম্ভ হইয়াছিল। তাহা হইলে যামুনাচার্য, রামানুজাচার্য প্রভৃতি আচার্যগণ বদ্ধপরিকর হইয়া শাঙ্করমত খণ্ডন করিতেন না। বিশেষত যামুনাচার্য নির্বিশেষ ব্রহ্মবাদী আচার্যগণের নামোল্লেখ করিয়া তাহাদের মত নিরসনের জন্যই 'প্রকরণ প্রক্রমে'র আবশ্যকতা স্বীকার করিয়াছেন। প্রবল যোদ্ধাকে পরাজিত করিবার জন্যই এরূপ চেষ্টা স্বাভাবিক।

—শাঙ্করমতের প্রবলতায় ও ভাস্করমতের অভ্যুদয়ে বিষ্ণুভক্তিবাদ স্থাপনের জন্যই যামুনাচার্যের প্রয়াস। যখন শঙ্করের জ্ঞানবাদে সমস্ত দেশ প্লাবিত, তখনই যামুনাচার্যের দার্শনিক ক্ষেত্রে অবতরণ। দক্ষিণ ভারতে তৎকালে সকল সম্প্রদায়ই আপন আপন মতবাদের

প্রতিষ্ঠার জন্য লালায়িত। যামুনাচার্যও বৈষ্ণবমতের প্রতিষ্ঠার জন্য দার্শনিক ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন।

যামুনাচার্যের রচিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে প্রধান—সিদ্ধিত্রয়ম। বিশিষ্টাদ্বৈত সিদ্ধান্ত ইহাতে সুন্দররূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। তাঁহার অপর রচনাবলীর নাম—স্তোত্ররত্নম্, আগমপ্রামাণ্যম্ এবং গীতার্থ সংগ্রহ।

আচার্য যামুন তাঁহার দার্শনিক ব্যাখ্যায় প্রধানত শঙ্করের নির্বিশেষ ব্রহ্মাত্মবাদকে আক্রমণ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মতে চেতন ও অচেতন সকল বস্তুই হইতেছে ব্রহ্মের শরীর, আর ব্রহ্ম সেই শরীরের আত্মা এবং অধিষ্ঠাতা। শরীর ও শরীরীকে এক বলিয়া ধরা হইয়া থাকে, কাজেই ব্রহ্ম স্বরূপত এক এবং অদ্বিতীয়। তরঙ্গ, ফেনা ও বুদ্বুদ প্রভৃতি অংশ থাকা সত্ত্বেও সমুদ্রকে এক ও অখণ্ড বলিয়া গণ্য করা হয়; তেমনি জীব, জগৎ ও ঈশ্বর প্রভৃতির অনেকত্ব থাকিলেও সমষ্টিভূত সত্তা, পুরুষোত্তম নারায়ণ এক এবং অখণ্ড।

আচার্য যামুন আরও বলেন, ঈশ্বর পুরুষোত্তম; সৃষ্ট জীব হইতে তিনি শ্রেষ্ঠ। ঈশ্বর পূর্ণ, জীব অণু অংশ। ঈশ্বর ও জীব নিত্য পৃথক। তাঁহার মতে, মুক্ত জীব ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করে, কিন্তু ঈশ্বরভাব লাভ করিতে সক্ষম হয় না।

ব্রহ্ম ও জীবের ভেদের কথা বলিতে গিয়া তিনি বলিয়াছেন—এই দুইয়ে স্বজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদ নাই। কিন্তু স্বগত ভেদ রহিয়াছে। তাঁহার মতে, 'মৌলিক পদার্থ তিনটি,—চিৎ, অচিৎ ও পুরুষোত্তম। চিৎ—জীব, অচিৎ—জগৎ, আর পুরুষোত্তম—ব্রহ্ম। ব্রহ্ম সবিশেষ—সগুণ, অশেষ কল্যাণ গুণের নিলয়, সর্বনিয়ন্তা। জীব তাঁহার চির দাস।'

সাধক যামুনের প্রাণের আকাঙ্ক্ষা, তিনি থাকিবেন পরম প্রভুর ঐকান্তিক নিত্যকিঙ্কর হইয়া। দাস্য ও পরাভক্তিতে তিনি

অভিলাষী, কাজেই সবিশেষ ব্রহ্ম এবং তাঁহার মূর্ত ব্রহ্মরূপই তাঁহার ধ্যেয়।

তাঁহার এই দার্শনিক সিদ্ধান্ত প্রধানত ব্রহ্মপুরাণ হইতে তিনি গ্রহণ করিয়াছেন। ঐ পুরাণে মহামুনি পরাশর চিৎ, অচিৎ ও ঈশ্বর সম্বন্ধে যে দিগ্‌দর্শন দিয়াছেন। আচার্য শ্রদ্ধাভরে তাহার গুণকীর্তন করিয়াছেন।[১]

যামুনাচার্যের স্তোত্ররত্নে পরাভক্তি ও শরণাগতির তত্ত্বটি বড় মনোরম ফটিয়া উঠিয়াছে। প্রাণের আকূতি উঘারিয়া ভক্তিসিদ্ধ মহাপুরুষ বলিতেছেন :

মথনাথ যদস্তি যোঽস্ম্যহং
সকলং তদ্ধি তবৈব মাধব।
নিয়তং স্বমিতি প্রবুদ্ধধীরথ বা
কিংনু সমর্পয়ামি তে॥

—হে নাথ, হে মাধব, যা কিছু আমি, যা কিছু আমার সকলই যে তোমার প্রভু? যদি কখনো আমার এরূপ জ্ঞান হয় যে,—সকলই সবসময়ে একান্তভাবে তোমার—তবে আমার কোন্ বস্তু কি ক'রে করবো তোমায় সমর্পণ?

"এই শরণাপত্তির সহিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের সাদৃশ্য আছে।—কি দিব আমি, যে ধন তোমারে দিব, সেই ধন তুমি। আচার্য যামুন সর্বস্ব তাহাতে বিকাইয়া দিয়াছেন, আর বৈষ্ণব কবি যাহা কিছু সকলই নারায়ণ রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। যামুনাচার্যের ভাব—তবৈবাহং! বৈষ্ণব কবির ভাব অনেকটা পরিমাণে—মমৈব ত্বং।

"ঈশ্বরের সহিত জীবের পিতা, মাতা, তনয়, সুহৃদ্ সকল সম্বন্ধই সম্ভব, কিন্তু দাস্য ভাবই যামুনাচার্যের মতে শ্রেষ্ঠ। এক স্তোত্রে তিনি প্রার্থনা করিতেছেন, "হে প্রভু, তোমার প্রতি দাস্য ভাবই সকল ভাবের শিরোমণি। একমাত্র দাস্যসুখে আসক্ত ব্যক্তির গৃহে

---

১ ভাগবতধর্মের প্রাচীন ইতিহাস, ২য় খণ্ড : স্বামী বিদ্যারণ্য, (প্রাচ্যবাণী মন্দির)

কীটজন্মও সার্থক, তবুও অন্যবুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তির গৃহে চতুর্মুখ ব্রহ্মা হইয়া জন্মানোও কাম্য নয়।[১]

প্রভু শ্রীরঙ্গনাথের সেবা, দাস্য ও বিশিষ্টাদ্বৈত সিদ্ধান্তের প্রচার, এইসব নিয়া দীর্ঘকাল অতিবাহিত হইয়াছে। এবার যামুনাচার্য পৌঁছিয়াছেন বার্ধক্যের কোঠায়। মনে কেবলই দুশ্চিন্তা, ভক্তি-বাদের যে ভিত্তি তিনি রচনা করিয়াছেন, তাহার উপর সৌধ গাড়িয়া তুলিবে কে? দার্শনিক সিদ্ধান্তগুলিকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা দরকার সে কাজের উপযোগী ভক্তি ও প্রতিভাই-বা সমকালীন কোন্ সাধকের আছে?

এসব নানা চিন্তায় আচার্যের অন্তর আলোড়িত হয়। কাঁদিয়া কাঁদিয়া রঙ্গনাথজীর চরণে দিনের পর দিন নিবেদন করেন, "প্রভু, ভক্ত নিয়েই তোমার সংসার, দেখো ভক্তিধৃত শ্রীসম্প্রদায় যেন তোমার কৃপা হতে বঞ্চিত হয় না। ভক্তি, প্রপত্তি ও দাস্যভাবের মাহাত্ম্য প্রকটিত হোক, এই যে আমার অন্তরের একমাত্র আকুতি!"

কিছুদিনের মধ্যেই প্রভু বরদরাজের অন্তরঙ্গ ভক্ত কাঞ্চীপূর্ণের সহিত শ্রীরঙ্গম মন্দিরে যামুনাচার্যের দেখা। কথাপ্রসঙ্গে কাঞ্চীপূর্ণ কহিলেন, "আচার্যবর, শাঙ্কর বেদান্তী যাদবপ্রকাশের কৃতী ছাত্র লক্ষ্মণের কথা আমি আপনাকে বলতে চাই। অদ্বৈত সিদ্ধান্তে সে পারঙ্গম, কিন্তু কি বিস্ময়কর ভক্তি ও সংস্কার নিয়ে সে জন্মেছে। তেমনি রয়েছে অমানুষী প্রতিভা। বেদান্তের বিষ্ণুপর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ নিয়ে দিনরাত রয়েছে সে মগ্ন হয়ে। লক্ষ্মণকে আমি তার বাল্যকাল থেকে জানি, যৌবনেও তাকে দেখছি অন্তরঙ্গভাবে। আমার কোনো সন্দেহ নেই আচার্য, বরদরাজের সে কৃপাপ্রাপ্ত, ভক্তি আন্দোলনের সে এক চিহ্নিত নায়ক।"

আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া বলেন যামুনাচার্য, "কাঞ্চীপূর্ণ, প্রভু রঙ্গনাথজীর চরণে বার বার মিনতি জানিয়েছি আমি, শ্রীসম্প্রদায়ের

১ বেদান্ত দর্শনের ইতিহাস, ১ম ভাগ।

একটি উপযুক্ত ভাবী নেতার জন্য। আশা হচ্ছে, প্রভুর কৃপাপ্রসাদ আমরা পেয়ে গিয়েছি। তোমার আজকের সুসংবাদে আমি পরম আনন্দিত।”

কাঞ্চীপূর্ণ আরো জানান, “আচার্য, অধ্যাপক যাদবপ্রকাশের সঙ্গে লক্ষ্মণের বার বার মতদ্বৈধ ঘটেছে দ্বৈত ও অদ্বৈতবাদের সিদ্ধান্ত নিয়ে। আমার মনে হয়, উভয়ের ছাড়াছাড়ি হবার আর বেশী দেরি নেই।”

যামুন বলিলেন, “অতি উত্তম কথা। কাঞ্চীপূর্ণ, কিছুদিন যাবৎ আমি ভাবছি, কাঞ্চীতে গিয়ে প্রভু বরদরাজকে একবার দর্শন ক'রে আসবো।”

“আচার্য। সেই সুযোগে আমরা কাঞ্চীর ভক্তেরা, আপনাকে নিয়ে আনন্দ করতে পারবো।” সোৎসাহে বলে উঠেন কাঞ্চীপূর্ণ।

যামুনাচার্য সেদিন বরদরাজ বিগ্রহ দর্শনে আসিয়াছেন। স্নান তর্পণ ও পূজাদি সমাপ্ত হইয়াছে। অন্তর তাঁহার দিব্য আবেশে ভরপুর। এবার কাঞ্চীপূর্ণ ও অন্যান্য ভক্তদের সঙ্গে নিয়া ফিরিয়া চলেন নিজের আবাসে।

ভাবমত্ত অবস্থায় ধীরে ধীরে পথ চলিতেছেন, হঠাৎ কাঞ্চীপূর্ণ তাঁহাকে বলিয়া উঠেন, “আচার্য, দেখুন দেখুন, বেদান্তকেশরী যাদবপ্রকাশ এদিকে এগিয়ে আসছেন, সঙ্গে রয়েছে তাঁর কৃতী শিষ্যদল। আমাদের প্রিয়ভাজন ভক্ত-প্রবর লক্ষ্মণও রয়েছেন তাঁর সঙ্গে।

যামুনাচার্য রাস্তার একপাশে সরিয়া দাঁড়ান। অদূরে অধ্যাপক যাদবপ্রকাশ তাঁহার ছাত্রদল নিয়া পদব্রজে চলিয়াছেন, আর তাঁহার হাতটি ন্যস্ত রহিয়াছে লক্ষ্মণের স্কন্ধদেশে।

মহাপুরুষ যামুনাচার্য একদৃষ্টে ভাবময় নেত্রে চাহিয়া আছেন লক্ষ্মণের দিকে। আচার্যের চোখে মুখে ছড়াইয়া পড়িয়াছে প্রসন্ন মধুর হাসির আভা।

কাঞ্চীপূর্ণ হর্ষভরে বলেন, “আচার্য আপনি অনুমতি দিলে

লক্ষ্মণকে আমি ডেকে নিয়ে আসি, আপনার আশীর্বাদ গ্রহণ ক'রে সে ধন্য হোক।"

"না কাঞ্চীপূর্ণ, তার প্রয়োজন নেই। লক্ষ্মণকে আমি আশীর্বাদ ইতিমধ্যেই করেছি। তাঁর ভেতরে পরাভক্তির উন্মেষের জন্য আমার দৃষ্টি দিয়েই করেছি শক্তিপাত। এই লক্ষ্মণই যে শ্রীসম্প্রদায়ের ভাবী নায়ক, একথা আজ আমি জেনেছি অভ্রান্তভাবে। অযথা তার সঙ্গে এসময়ে বাক্যালাপ করলে অদ্বৈত বেদান্তী যাদবপ্রকাশের সঙ্গে নূতন ক'রে এখানে তর্কযুদ্ধ হবে, আমার অন্তরের প্রসন্নমধুর ভাবটি নষ্ট হবে। শ্রীবরদরাজের দর্শন অভীষ্ট ফল আমি হাতে হাতে এখানে পেয়ে গেছি।"

উত্তরকালে যাদবপ্রকাশের ঐ প্রতিভাদীপ্ত প্রধান ছাত্রেরই অভ্যুদয় ঘটে আচার্য রামানুজরূপে, বিশিষ্টাদ্বৈত মতের প্রখ্যাত প্রবক্তারূপে। ভারতের দার্শনিক সমাজে গ্রহণ করেন তিনি কালজয়ী আসন।

শ্রীরঙ্গমে ফিরিয়া আসিয়াছেন যামুনাচার্য। কিন্তু হৃদয়ে তাঁহার জাগিয়া রহিয়াছে ভক্ত পণ্ডিত লক্ষ্মণের লাবণ্যময় রূপ। পবিত্রতা, তেজস্বিতা আর বিষ্ণুভক্তির যে দিব্য আভা আচার্য তাঁহার আননে দেখিয়া আসিয়াছেন, আর তাহা ভুলিতে পারেন কই?

লক্ষ্মণের সাধনপ্রস্তুতি যাহাতে পূর্ণাঙ্গ হইয়া উঠে, অচিরে যাহাতে সে শ্রীসম্প্রদায়ের দায়িত্ব গ্রহণ করে—এই প্রার্থনাটি যামুন আকুল অন্তরে নিবেদন করেন পরমপ্রভুর চরণে। লক্ষ্মণকে একান্ত-ভাবে নিজজন রূপে প্রাপ্ত হইবেন, এই উদ্দেশ্যে এ সময়ে এক স্তোত্রও তিনি রচনা করেন। শ্রীসম্প্রদায়ের ভক্তদের মধ্যে এই স্তোত্রটি আজো স্মরণীয় হইয়া আছে।

অল্পদিনের ব্যবধানে শ্রীরঙ্গমে বসিয়া আর এক শুভ সংবাদ প্রাপ্ত হন যামুনাচার্য। সম্প্রতি লক্ষ্মণের সহিত তাঁহার গুরু যাদবপ্রকাশের তীব্র মতভেদ দেখা দিয়াছে এবং উভয়ের মধ্যে ঘটিয়াছে বিচ্ছেদ।

পরম ভক্ত প্রবীণ আড়বার সাধক কাঞ্চীপূর্ণের প্রতি লক্ষ্মণ চিরদিনই অতিশয় শ্রদ্ধাবান্। এবার তিনি এই সিদ্ধ মহাত্মারই আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারই নির্দেশমতো করিতেছেন সাধন-ভজন, শ্রীবরদরাজের সেবা-অর্চনা ও শাস্ত্রপাঠ।

লক্ষ্মণের প্রাণের আকাঙ্ক্ষা, সিদ্ধ মহাত্মা কাঞ্চীপূর্ণের নিকট তিনি দীক্ষা গ্রহণ করিবেন। কিন্তু এ আকাঙ্ক্ষা তাঁহার পূর্ণ হয় নাই। মহাত্মা বার বার কেবলই তাঁহাকে এড়াইয়া চলিতেছেন।

যতবারই কাঞ্চীপূর্ণকে লক্ষ্মণ চাপিয়া ধরেন, তিনি বলেন, "বৎস, আমি প্রভু বরদরাজের কাঙাল ভক্ত। তাছাড়া, আমি যে জাতে শূদ্র, তোমার মতো পবিত্রদেহ ব্রাহ্মণকে আমি দীক্ষা দেব কি ক'রে? সর্বোপরি কথা, প্রভুর কাছ থেকে আমি জেনেছি, তোমার গুরুকরণ হবে অন্যত্র। এবং তার আর বেশী দেরি নেই।"

তবুও লক্ষ্মণ কিন্তু মহাত্মা কাঞ্চীপূর্ণকেই জ্ঞান করেন গুরুরূপে, ত্রাতারূপে। তাঁহারই নির্দেশমতো নিত্যকার সাধনভজন করেন, পবিত্র, শালকূপ হইতে জল বহিয়া আনিয়া স্নান করান বরদরাজ শ্রীবিগ্রহকে। এই বিগ্রহের অর্চনা ও ধ্যান জপে তন্ময় হইয়া থাকেন।

এদিকে বৃদ্ধ যামুনাচার্য শ্রীরঙ্গমের মঠে গুরুতর পীড়ায় শয্যাশায়ী হইয়া পড়িয়াছেন। নিজে স্পষ্টতই বুঝিয়া নিয়াছেন, শেষের দিনের আর বেশী দেরি নাই। এবার প্রধান ও অন্তরঙ্গ ভক্ত মহাপূর্ণকে ডাকিয়া কহিলেন, "আমার বিদায়ের লগ্ন প্রায় সমাগত। এ সময়ে শ্রীসম্প্রদায়ের ভক্তিবাদের, ভবিষ্যৎ ভেবে ব্যাকুল হয়েছি। বাচস্পতি মিশ্রের অভ্যুদয় ঘটেছে, শাঙ্কর মত তিনি নিপুণভাবে প্রপঞ্চিত করছেন। এর বিরুদ্ধে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ আর কতদিন যুঝতে পারবে, টিকে থাকতে পারবে?"

"আপনার নির্দেশের দিকেই তো আমরা চেয়ে আছি, মহাত্মন্"—উত্তরে বলেন মহাপূর্ণ।

"ভাবছি কেবল ভক্তশ্রেষ্ঠ লক্ষ্মণের কথা। শুনেছো বোধহয়, যাদবপ্রকাশের সঙ্গে সকল সম্বন্ধ সে ছিন্ন করেছে, আশ্রয় নিয়েছে কাঞ্চীপূর্ণের কাছে। শ্রীবরদরাজের সেবায় করছে সে দিন যাপন। তুমি শিগ্‌গীর কাঞ্চীতে চলে যাও। তাঁকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে এসো শ্রীরঙ্গমে। দেহান্ত হবার আগে আমার মনের সংকল্প ক'টি তার কাছে বলে যেতে চাই।"

আশ্বাস দিয়ে মহাপূর্ণ বলেন, "আচার্যবর, আমি এক্ষুনি রওনা হচ্ছি কাঞ্চীতে। কালবিলম্ব না ক'রে লক্ষ্মণকে আপনার কাছে উপস্থিত করছি।"

কাঞ্চীতে পৌঁছিয়াই প্রভু বরদরাজের মন্দিরে প্রণাম নিবেদন করিতে গেলেন মহাপূর্ণ। সেখানে ভক্তদের কাছে শুনিলেন, শ্রীবরদরাজের স্নান অভিষেক সম্পন্ন করানো লক্ষ্মণের নিত্যকার প্রধান সেবা কর্ম—আর দেরি নাই, এখনি তিনি সেখানে আসিয়া পড়িবেন।

মহাপূর্ণ আর ধৈর্য ধরিতে পারিতেছেন না। পথের দিকে একটু অগ্রসর হইতেই দেখিলেন, লক্ষ্মণ ধীরপদে মন্দিরের দিকে আসিতেছেন, মুখে গুন্‌গুন্ করিয়া গাহিতেছেন বিষ্ণুর স্তবস্তুতি আর মাথায় বহিয়া আনিতেছেন পবিত্র জলের বৃহৎ ভাণ্ড।

নিকটে গিয়া প্রসন্নমধুর কণ্ঠে মহাপূর্ণ গাহিয়া উঠিলেন যামুনাচার্যের রচিত এক অপূর্ব স্তোত্র। এ স্তোত্রের ভাব ভাষা ও মধুর ঝঙ্কার লক্ষ্মণের অন্তরে জাগাইয়া তোলে দিব্য উন্মাদনা। সাশ্রুনয়নে প্রশ্ন করেন, "মহাত্মন্, এ অমিয়মাখা স্তোত্র কোথায় পেলেন আপনি, শ্রীবিষ্ণুর কৃপাধন্য কোন মহাপুরুষের রচনা এটি, দয়া ক'রে আমায় বলুন।"

"এ যে আমার প্রভু যামুনাচার্যের রচনা। শ্রীসম্প্রদায়ের সেই মধ্যমণি ছাড়া আর কার হৃদয়ে হবে এমনতর দিব্য জ্যোতির বিচ্ছুরণ? আর কে পরিবেশন করবে এমন অমৃত?"

"রঙ্গনাথজীর প্রিয়তম সেবক, মহাত্মা যামুনাচার্যের চরণ দর্শনের

অভিলাষ আমার অনেক দিন থেকে। ভাগ্যহীন আমি, তাই বঞ্চিত রয়েছি এতদিন। আপনি তাঁর নিজজন, কৃপা ক'রে আমায় নিয়ে যাবেন তাঁর আশ্রয়ে ?"

"বৎস, আমি যে আচার্য প্রভু যামুনের কাছে থেকেই এসেছি তোমার কাছে। তোমার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য তিনি ব্যাকুল, তোমার পথ চেয়েই-যে রয়েছেন। তাছাড়া, তিনি এখন অন্তিম শয়নে শায়িত। বৎস, তাঁর দর্শন যদি পেতে চাও, আর এক মুহূর্ত বিলম্ব ক'রো না।"

ক্রমাগত চারদিন পথ চলার পর দেখা গেল প্রভু শ্রীরঙ্গনাথের মন্দির। কাবেরীর অপর তীরে পৌঁছিয়াই উভয়ে হইলেন বজ্রাহতের মতো স্তম্ভিত। দক্ষিণী বৈষ্ণব জগতের শ্রেষ্ঠপুরুষ যামুনাচার্য আর ইহজগতে নাই। সহস্র সহস্র শোকার্ত নরনারী তাঁহার মরদেহটি বেষ্টন করিয়া ক্রন্দন করিতেছে, আর মঠের ভক্ত শিষ্যেরা রত রহিয়াছে তাঁহার শেষকৃত্যের কাজে।

আচার্যের চন্দনলিপ্ত, পুষ্পশোভিত দেহের সম্মুখে লক্ষ্মণ সাষ্টাঙ্গ প্রণাম নিবেদন করিলেন। উঠিয়া দাঁড়াইতেই লক্ষ্য পড়িল তাঁহার হস্তের দিকে। দেখিলেন, তিনটা অঙ্গুলি তাঁহার মুষ্টিবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে।

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে সেবকদের দিকে তাকাইতেই তাঁহারা কহিলেন, "তিনটি সংকল্প সিদ্ধির বিষয়ে আচার্য প্রভু অন্তিম শয্যায় বিশেষ ভাবে চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন, তারই চিহ্ন রয়ে গিয়েছে ঐ বদ্ধ অঙ্গুলি তিনটিতে।"

একথার সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল, ভক্তপ্রবর লক্ষ্মণ এক দিব্যভাবে আবিষ্ট হইয়া পড়িয়াছেন। ঐ আবেশের মধ্যেই, অর্ধবাহ্য অবস্থায় তিনি উচ্চারণ করিলেন ক্রমান্বয়ে তিনটি সংকল্প বাণী। কহিলেন, "বিষ্ণুভক্তিময় দ্রাবিড় বেদের প্রচার করবো আমি, জ্ঞানহীন জনগণের মধ্যে বিতরণ করবো সেই ভক্তির সুধা। লোকরক্ষার

ব্রত নিয়ে আমি রচনা করবো তত্ত্বজ্ঞানময় শ্রীভাষ্য। আর পুরাণরত্ন বিষ্ণু পুরাণের রচয়িতা পরাশর মুনির নামে চিহ্নিত ক'রে আমি গড়ে তুলবো ভক্তিবাদের এক শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাতাকে।"

অন্তরঙ্গ ভক্ত শিষ্যেরা লক্ষ্য করিলেন এক অবিশ্বাস্য দৃশ্য! ঐ সংকল্প বাণীর একটি উচ্চারিত হইতেছে, আর সঙ্গে সঙ্গে কোন্ এক অদৃশ্য পুরুষের অলৌকিক শক্তির ইঙ্গিতে একে একে খুলিয়া যাইতেছে প্রাণহীন যামুনাচার্যের তিনটি বদ্ধ অঙ্গুলি।

সকলেই উপলব্ধি করিলেন, ভক্তপ্রবর লক্ষ্মণই যামুনাচার্যের সেই ভাবী উত্তরাধিকারী, ঈশ্বরের চিহ্নিত সেই মহানায়ক যিনি এবার গ্রহণ করিবেন শ্রীসম্প্রদায়ের নেতৃত্বভার।

দেখা গেল, দেহান্তের পরও আচার্য যামুন নিজের সংকল্পে রহিয়াছেন অবিচল, আর ঐশ বিধানের অমোঘতর তত্ত্বটিও তিনি এই সময়ে ইঙ্গিতে ভক্তদের সবাইকে বুঝাইয়া দিয়া গেলেন।

শেষকৃত্য শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কাবেরীর বিশাল তটভূমি মুখর হইয়া উঠে সহস্র কণ্ঠের স্তবগানে। তারপর অন্তরঙ্গ ভক্তেরা ভাঙিয়া পড়েন শোকার্ত কান্নায়।

জাগ্রত বিগ্রহ শ্রীরঙ্গনাথের শ্রেষ্ঠ কিঙ্কররূপে এতদিন শ্রীরঙ্গমে বিরাজিত ছিলেন যামুনাচার্য। দক্ষিণী ভক্তিবাদের ছিলেন এক চির-ভাস্বর আলোকস্তম্ভ, আজ সেই স্তম্ভটির ঘটিল শোকাবহ তিরোধান।

গোস্বামী লোকনাথ

প্রেমভক্তিধর্মের এক শক্তিধর নায়করূপে শ্রীগৌরাঙ্গ সবেমাত্র নবদ্বীপে আবির্ভূত হইয়াছেন। বৈষ্ণবসাধক ও ভক্ত নরনারী দলে দলে শরণ নিতেছেন তাঁর চরণতলে। বর্ষীয়ান্ সর্বজন শ্রদ্ধেয় বৈষ্ণবনেতা অদ্বৈত আচার্য, শ্রীবাস পণ্ডিত, অবধূত নিত্যানন্দ প্রভৃতিকে একে একে তিনি করিয়াছেন আত্মসাৎ।

শ্রীবাসের কীর্তনের অঙ্গন প্রভু এবং তাঁহার মরমী পরিকরদের মিলন স্বর্গ। এই স্বর্গে নিত্য নূতন উদ্‌ঘাটিত হইতেছে লীলানাট্য, আর রসবিলাসের বৈচিত্র্য। প্রকাশিত হইতেছে তাঁহার চমকপ্রদ ভগবত্তা-ভাব।

পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকের নবদ্বীপ কীর্তিত ছিল ভারতের এক শ্রেষ্ঠ বিদ্যাকেন্দ্ররূপে। উচ্চতর টোল ও চতুষ্পাঠীগুলিতে বিরাজ করিতেন দিক্‌পাল পণ্ডিত, তার্কিক ও দার্শনিকেরা। শতশত প্রতিভাধর ছাত্র ইঁহাদের সান্নিধ্যে থাকিয়া গ্রহণ করিত নব্যন্যায়, স্মৃতি ও বেদ-বেদান্তের পাঠ। প্রাচ্যের এই অক্সফোর্ডে আসিয়া জড়ো হইত সমকালীন ভারতের পণ্ডিত পড়ুয়ারা। তাই তখনকার দিনে নবদ্বীপের সারস্বত জীবনের যে কোনো তরঙ্গ, যে কোনো তর্ক বিচার, যে কোনো ধর্ম সংস্কৃতির আন্দোলন, অচিরে ছড়াইয়া পড়িত দেশের সর্বত্র এবং সমাজজীবনের সর্বস্তরে।

শ্রীগৌরাঙ্গের নূতন প্রেমধর্মের জোয়ার তখন ঢেউ তুলিয়াছিল দেশের দিগ্‌বিদিকে। সুদূর উত্তর বাংলার তালখড়ি গ্রামেও এ ঢেউ সেদিন পৌঁছিয়া গিয়াছিল।

তালখড়ি চতুষ্পাঠীর তরুণ পণ্ডিত লোকনাথ চক্রবর্তী লোকমুখে গৌরাঙ্গের আবির্ভাব কাহিনী শুনিলেন; শুনিয়া হৃদয় তাঁহার অপার ানন্দে ভরিয়া উঠিল। এই গৌরাঙ্গ যে তাঁহারই প্রিয় বন্ধু বিশ্বম্ভর

মিশ্র. উভয়ে তাঁহারা প্রায় সমবয়সী। লোকনাথ যখন আচার্য অদ্বৈতের কাছে ভাগবত অধ্যয়নে রত, বিশ্বম্ভর তখন গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে ব্যাকরণ পাঠ করেন, উভয়ের মধ্যে কত ঘনিষ্ঠতা, কত হৃদ্যতাই না ছিল। সেই বিশ্বম্ভর আজ আবির্ভূত হইয়াছেন গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের মহানায়করূপে, শ্রেষ্ঠ সাধকেরা তাঁহাকে জ্ঞান করিতেছেন ভগবানরূপে। এই জন্যই তো লোকনাথের আনন্দের অবধি নাই।

বিষয়-বিরক্ত, নৈষ্ঠিক বৈষ্ণবসাধক, লোকনাথ পণ্ডিত নিজের সংকল্প স্থির করিয়া ফেলিলেন। সংসার হইতে চিরবিদায় নিয়া উপনীত হইলেন নবদ্বীপে।

প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ নিজ ভবনের অলিন্দে বসিয়া আছেন। গঙ্গাধর, মুরারি, শ্রীরাম প্রভৃতি অন্তরঙ্গ ভক্তেরা সম্মুখে উপবিষ্ট। প্রভু ভাবাবেশে মত্ত হইয়া কখনো কৃষ্ণকথা কহিতেছেন, কখনো বা কৃষ্ণ-বিরহের আর্তিতে হইতেছেন মুহ্যমান। এক এক সময়ে তাঁহাকে দেখা যাইতেছে অতিশয় চিন্তাকুল, গম্ভীরবদন।

সন্ন্যাস নিবার সংকল্প প্রভু ইতিমধ্যে স্থির করিয়া ফেলিয়াছেন। অন্তরঙ্গ কয়েকজন ভক্তকে বুঝাইয়াছেন, কৃষ্ণের বিরহে উন্মত্ত হইয়া তিনি নিজে ঘরসংসার ত্যাগ না করিলে কৃষ্ণের জন্য লোকে ব্যাকুল হইবে কেন? সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী না হইলে বিষয়ী লোকে তাঁহার কথা শুনিতে চাহিবে কেন? তাই মাঝে মাঝে প্রভুকে গম্ভীর হইতে দেখিয়া ভক্তদের প্রাণ শুকাইয়া যাইতেছে। বিষণ্ণ অন্তরে ভাবিতে-ছেন, হয়তো আসন্ন বিচ্ছেদের আর দেরি নাই।

এমনি সময়ে দীর্ঘ পথ পরিব্রাজনের পর শ্রান্ত ক্লান্তদেহে ভক্ত-প্রবর লোকনাথ সেখানে আসিয়া উপস্থিত। ছিন্ন তরুর মতো, বিরহখিন্ন লোকনাথ লুটাইয়া পড়েন প্রভুর পদতলে।

বাহু প্রসারিয়া প্রভু তাঁহাকে প্রেমভরে আলিঙ্গন দিলেন। প্রাণ তাঁহার পরম আনন্দে উচ্ছলিত। কৃষ্ণের চিহ্নিত ভক্ত লোকনাথের হৃদয়ে জাগিয়াছে কৃষ্ণপ্রেমের আর্তি, সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া তাই সে ছুটিয়া আসিয়াছে তাঁহার কাছে।

বার বার শ্রীগৌরাঙ্গ গদ্‌গদ স্বরে বলিতে থাকেন, "লোকনাথ, আমার প্রাণের লোকনাথ, তুমি এসে গিয়েছো! আহা, কৃষ্ণের কি কৃপা। হারানো বন্ধুকে আজ আবার আমি ফিরে পেলাম।"

নব ভাবে উদ্দীপিত হইয়া প্রভু এবার শুরু করেন তাঁহার নর্তন কীর্তন। প্রভুর দিব্যলাবণ্যময় রূপ, ভাবের প্রমত্ততা, আর ঘন ঘন সাত্ত্বিক প্রেমবিকার দর্শনে লোকনাথ আনন্দে একেবারে আত্মহারা। বহুদিনের সুখস্বপ্ন আজ তাঁহার সফল। কৃষ্ণপ্রেমের মূর্তবিরহ শ্রীগৌরাঙ্গের মধুময় সান্নিধ্যে এবার তিনি আসিয়া পড়িয়াছেন, তাঁহার দিব্যপ্রেমে হইয়াছেন ভরপুর। লোকনাথের নয়ন মন প্রাণ আজ সার্থক হইয়া উঠিয়াছে।

গভীর রাত্রে কীর্তন, কৃষ্ণকথা এবং ইষ্টগোষ্ঠী শেষ হইল। প্রভু কহিলেন, "লোকনাথ, বহুদূর থেকে পদব্রজে তুমি এসেছো, পথশ্রান্ত তুমি। আজ গৃহে গিয়ে বিশ্রাম নাও। কাল প্রভাতে আমাদের সাক্ষাৎ হবে। অন্তরঙ্গ কথা, প্রাণের গোপন কথা, তোমায় তখন বলবো। লোকনাথ, কৃষ্ণের কি অপার মহিমা, তোমার মত বন্ধুর সঙ্গে আবার আমার মিলন ঘটিয়ে দিয়েছেন। কৃষ্ণের কাজে তোমায় দিয়ে আমার বড় প্রয়োজন। কাল তোমায় সব খুলে বলবো।"

প্রভুর এই স্নেহপূর্ণ বাণী শোনার পর ঘরে গিয়া লোকনাথ সারা রাত আর ঘুমাইতে পারেন নাই। অনির্বচনীয় আনন্দে চিত্ত তাঁহার উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে। প্রভুর স্নেহপূর্ণ কথা কয়টির অনুরণন চলিতেছে তাঁহার অন্তরে।

রাত্রি প্রভাত হইতেই লোকনাথ শ্রীগৌরাঙ্গের কাছে গিয়া উপস্থিত হন। চরণ বন্দনা করিয়া উঠিয়া দাঁড়ান, প্রভু তাঁহাকে জড়াইয়া ধরেন সস্নেহ আলিঙ্গনে। প্রসন্ন কণ্ঠে বলেন, লোকনাথ, তুমি মহাভাগ্যবান্। কৃষ্ণের কর্মে অবিলম্বে তোমায় নিযুক্ত হতে হবে। নবদ্বীপে আর তোমার থাকার আবশ্যক নেই, তুমি বৃন্দাবনে চলে যাও। কৃষ্ণের প্রেমমাধুর্যে মণ্ডিত লীলাস্থলীগুলো আজো

লোকচক্ষুর অন্তরালে রয়ে গিয়েছে। বহু বৎসরের ব্যবধানে সেই সব পুণ্যস্থল হয়েছে অরণ্যে পরিণত। তুমি এগুলো উদ্ধারের ভার নাও। এখন থেকে তপস্যা আর কৃষ্ণলীলা-তীর্থের উদ্ধার এই দুটি হোক তোমার নিত্যকার পবিত্র কর্ম।”

লোকনাথের মাথায় যেন বজ্রাঘাত হয়। একি নিষ্ঠুর কথা কহিতেছেন গৌরসুন্দর। করজোড়ে কহিলেন, “প্রভু, বড় আশা ক'রে, ঘরসংসার ছেড়ে দিয়ে নবদ্বীপে এসেছি, তোমার ভুবনমোহন লীলা দর্শন করবো, আর ভিখিরির মতো পড়ে থাকবো একধারে। আর তুমি আমার সে আশায় এমন ক'রে বাজ হানছো? তোমার দর্শনলাভের পরেই এমন ক'রে কেন আমায় দূরে ঠেলে দিচ্ছো? আমার কোন্ দোষে এমন নির্মম হলে তুমি।”

“আমি নির্মম কোথায় লোকনাথ? তোমায় যে কৃষ্ণের কর্মের ভার দিয়েছি, এছাড়া বৈষ্ণবের আর কি ঈপ্সিত বস্তু থাকতে পারে, বলতো?”

“না প্রভু, তুমি যাই বলো, আমি বুঝতে পারছি, তোমার বিশাল হৃদয়ে নগণ্য লোকনাথের জন্য এতটুকু স্থানও নেই। তাই তাঁকে এমনভাবে করছো অপসারিত।”

প্রভু উত্তরে বলেন, “লোকনাথ, বৃন্দাবনই যে আমার হৃদয়। সেই বৃন্দাবনেই তো আমি তোমায় স্থাপন করছি স্থায়ীভাবে। কৃষ্ণ বলেছেন, বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছামি। সেই বৃন্দাবনে চিরদিন কৃষ্ণসঙ্গী হয়ে, কৃষ্ণধ্যানে বিভোর হয়ে, তুমি থাকবে। একি কম সৌভাগ্যের কথা? লোকনাথ যে বৃন্দাবনের কৃষ্ণ আর বৃন্দাবন-লীলা তোমার উপজীব্য, সেই বৃন্দাবনেই তো তোমায় পাঠাচ্ছি।”

“প্রভু, এত কঠিন হয়ো না তুমি। আমায় এ সময়ে দূর ক'রে দিয়ো না।” ক্রন্দন করিয়া বলেন লোকনাথ।

প্রভু আবার প্রবোধ দিয়া বলেন, “আমার কথা মন দিয়ে শোনো লোকনাথ। নিত্যবৃন্দাবন সিদ্ধ বৈষ্ণবের আস্বাদ্য, সবার জন্য তো য়। কিন্তু ভৌম বৃন্দাবন আস্বাদ্য সকল ভক্ত নরনারীর। আমি

চাই, ভৌম বৃন্দাবনকে তোমার সাধনা ও কর্ম দিয়ে জাগিয়ে তোল, তার দুয়ার উন্মোচন ক'রে দাও ভক্ত ও পাষণ্ডী সবাইর জন্য। ভেবো না লোকনাথ, বৃন্দাবনে আমিও যাবো, আর যাবে আমার প্রাণপ্রিয় ভক্তেরা। সবাই মিলে প্রকটিত করবো কৃষ্ণলীলার পবিত্র পীঠস্থান-গুলি। লীলা মহাত্ম্যের প্রচার ক'রে জীবন করবো সফল।"

সঙ্গে সঙ্গে প্রভু বৃন্দাবন বাসের নির্দিষ্ট স্থান এবং দিনচর্যার ইঙ্গিতও দিয়া দিলেন। এসম্পর্কে ভক্ত নিত্যানন্দ দাস তাঁহার রচিত প্রেম-বিলাস-এ লিখিয়াছেন :

চীরঘাট বাসস্থলী কদম্বের সারি।
তার পূর্ব পাশে কুঞ্জ পরম মাধুরি।
তমাল বকুল বট আছে সেই স্থানে।
বাস করে সেই স্থানে সুখ পাবে মনে॥
বাসস্থলী বংশীবট নিধুবন স্থান।
ধীর সমীরণ মধ্যে করিবে বিশ্রাম॥
যমুনাতে স্নান কর, অযাচক ভিক্ষা।
ভজন স্মরণ কর জীবে দেহ দীক্ষা॥

প্রভুর দর্শন ও কৃপালাভের পরই এই বিচ্ছেদ বিরহের চিন্তা অসহনীয়। অন্তরঙ্গ ভক্তদের নিয়া প্রাণপ্রিয় প্রভু নবদ্বীপে আনন্দের মেলা বসাইয়া দিয়াছেন, উৎসারিত করিতেছেন প্রেমভক্তি রসের দুর্লভ প্রবাহ। এসব ছাড়িয়া নির্জন অরণ্যসঙ্কুল বৃন্দাবনে কি করিয়া দিন অতিবাহিত করিবেন, লোকনাথ ভাবিয়া পান না। এই সঙ্গে প্রভুর আজ্ঞার কথা এবং কৃষ্ণলীলাস্থল উদ্ধারের ঐশ্বরীয় ব্র[illegible] উদ্‌যাপনের গুরুত্বও বিস্মৃত হওয়া যায় না। বৃন্দাবনে বাস করিতে অবশ্যই তিনি যাইবেন। কিন্তু প্রভুর পুণ্যময় দর্শন ও সঙ্গ যে তাঁহার আরো কিছুদিন চাই।

সজল নয়নে প্রভুর নিকট ভিক্ষা করিলেন আর কয়েকটি দিনের মধুময় সান্নিধ্য। প্রভু সম্মত হইলেন। পাঁচদিন নবদ্বীপের প্রেম-লীলা প্রাণ ভরিয়া দর্শন করিলেন লোকনাথ, তারপর রওনা হইলেন

বৃন্দাবনধামে। এ জীবনে প্রভুর সঙ্গে আর তাঁহার সাক্ষাৎ হয় নাই। প্রভুর আদিষ্ট ঐশ কর্মের উদ্‌যাপন এবং প্রভুর নির্দেশিত পন্থায় কৃষ্ণভজন হইয়াছিল তাঁহার দীর্ঘ জীবনের উপজীব্য।

লোকনাথের বৃন্দাবন যাত্রার কথাবার্তা যখন চলিতেছে, গদাধর পণ্ডিতের নবীন শিষ্য ভূগর্ভ তখন কাছেই ছিলেন দণ্ডায়মান। বৃন্দাবনে গিয়া সাধনভজন করিবেন, এই ইচ্ছাটি তাঁহার মনে বহুদিন যাবৎ প্রচ্ছন্ন ছিল। ভূগর্ভ দেখিলেন, তাঁহার পক্ষে এ এক পরম সুযোগ। কহিলেন, "প্রভু, আপনার আজ্ঞা যদি মিলে, তবে আমিও পণ্ডিত লোকনাথের সঙ্গী হয়ে বৃন্দাবনে যেতে পারি। তাঁর পার্শ্বচর হয়ে আপনার মনোমতো কার্য এ অধম কিছুটা সম্পন্ন করতে পারবে। সে হবে আমার পরম সৌভাগ্য।"

সহায়সম্পদহীন অবস্থায় বৃন্দাবনে গমনের পর লোকনাথের একটি সঙ্গী থাকিবে এতো অতি উত্তম কথা। প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ তাই মহাআনন্দিত। সোৎসাহে ভূগর্ভকে লোকনাথের সহযাত্রী হইবার অনুমতি দিলেন. প্রভুর অনুমতির পর গদাধর পণ্ডিতেরও কোনো আপত্তি রহিল না। ত্বরায় উভয়কে প্রভু রওনা করিয়া দিলেন তাঁহার আদিষ্ট কর্ম উদযাপনের জন্য।

ভক্তদের সঙ্গে কীর্তনরঙ্গে গৌরাঙ্গপ্রভু প্রায়ই প্রমত্ত হইয়া উঠিতেন, সাত্ত্বিকপ্রেম বিকারের ফলে হারাইয়া ফেলিতেন বাহ্যজ্ঞান। আবার দিব্যভাবেও প্রায়ই থাকিতেন আবিষ্ট। কিন্তু লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, প্রেরিত পুরুষরূপে ঐশ ব্রত উদ্‌যাপন করিতে তিনি আসিয়াছেন, যে কর্মসূচী গ্রহণ করিয়াছেন, শত ভাবাবেশ বা প্রমত্ততার মধ্যেও সে লক্ষ্য ও সে দায়িত্ব তিনি বিস্মৃত হন নাই, তাহা হইতে এতটুকুও বিচ্যুত হন নাই।

আচার্য অদ্বৈত, শ্রীবাস প্রভৃতির সহায়তায় প্রভু নবদ্বীপে তুলিয়াছেন বৈষ্ণব আন্দোলনের বিপুল ভাবতরঙ্গ।

অবধূত নিত্যানন্দকে আত্মসাৎ করিয়া তাঁহাকে গৃহী করিয়াছেন এবং ব্রতী করিয়াছেন বাংলার বৈষ্ণবীয় সংগঠনের কাজে।

আর বাসুদেব সার্বভৌম, স্বরূপ, রায় রামানন্দ এবং রাজা প্রতাপরুদ্রের মাধ্যমে দৃঢ়মূল করিয়া তুলিয়াছেন উড়িষ্যার ভক্তি-আন্দোলন।

সর্বশেষে তিনি লোকনাথ, রূপ, সনাতন প্রভৃতিকে বৃন্দাবনের গোস্বামীরূপে বসাইয়া দিয়া গড়িয়া তুলিয়াছেন নবযুগের বৃন্দাবন। বৃন্দাবনের ভক্তি সাম্রাজ্যের পত্তন ও প্রসার হইয়াছে ঐ গোস্বামীদের তপস্যা ও কর্মে। ইহার ফলে ভৌম বৃন্দাবনের কৃষ্ণলীলাস্থলের উদ্ধার যেমন সম্ভব হইয়াছে, তেমনি বৃন্দাবনের পবিত্রতা ও মাধুর্য প্রতিফলিত হইয়াছে সারা ভারতের জনমানসে।

ঐশ্বরীয় কর্ম প্রভু অপূর্ব দূরদর্শিতার সহিত নিষ্পন্ন করিতেন, এবং ঐ কর্মসূচীর প্রতিটি ধাপের প্রতি সতত নিবদ্ধ থাকিত তাঁহার তীক্ষ্ণ সজাগ দৃষ্টি।

প্রিয় সুহৃদ্ ও প্রিয় ভক্ত লোকনাথকে সুদূর বৃন্দাবনে পাঠানোর সিদ্ধান্তের পিছনেও ছিল সেই দূরদর্শিতা এবং অন্তর্দৃষ্টি।

বৃন্দাবনের কৃষ্ণলীলাস্থলীর পুনরুদ্ধার কর্মে গোস্বামী লোকনাথ ছিলেন প্রথম পথিকৃৎ। তাঁহার অক্লান্ত চেষ্টায় দুর্গম অরণ্যে শুরু হইয়াছিল সহস্র ভক্তের সমাগম। উত্তরকালে রূপ, সনাতন ও শ্রীজীব প্রভৃতি প্রতিভাধর গোস্বামীরা প্রেমধর্মের প্রাণকেন্দ্র বৃন্দাবনে গৌড়ীয় ধর্ম সংস্কৃতির যে বিরাট সৌধ গড়িয়া তুলিয়াছেন, লোকনাথই প্রস্তুত করিয়াছিলেন তাহার ভিত্তিভূমি।

কঠোর বৈরাগ্য, কৃষ্ণময় তপস্যা এবং বিগ্রহসেবার অনন্য নিষ্ঠা নিয়া কাঙাল বৈষ্ণব সাধকের যে জ্বলন্ত মূর্তি নিজ জীবনে তিনি দেখাইয়া যান, দীর্ঘদিন তাহা গৌড়ীয় গোস্বামী ও সাধককুলের কাছে ছিল স্মরণীয়।

আরও একটি বিশিষ্ট অবদান ছিল লোকনাথ গোস্বামীর। উত্তরকালের গৌড়ীয় ধর্মের অন্যতম প্রাণপুরুষ নরোত্তমের তিনি

ছিলেন দীক্ষাগুরু। সদা আত্মগোপনশীল মহাবৈরাগী লোকনাথকে তিতিক্ষাপরায়ণ সাধক নরোত্তম যেভাবে তাঁহার দীক্ষাগুরুরূপে লোক-লোচনের সম্মুখে আনয়ন করেন, আজো গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সমাজে তাহার স্মৃতি অম্লান রহিয়াছে।

গোস্বামী লোকনাথের জন্ম হয় আনুমানিক ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে যশোহর জেলার তালখড়ি গ্রামে। পিতার নাম পদ্মনাভ চক্রবর্তী, মাতা সীতাদেবী।

পদ্মনাভ খ্যাতনামা পণ্ডিত ছিলেন। যৌবনে নবদ্বীপে থাকিয়া তিনি বিদ্যা অর্জন করেন এবং বৈষ্ণব আচার্য শ্রীঅদ্বৈতের নিকট বৈষ্ণবীয় ধর্মে দীক্ষালাভ করেন। গৃহে ফিরিয়া পদ্মনাভ এক চতুষ্পাঠী স্থাপন করেন, দেশের সে অঞ্চলে সুপণ্ডিত আচার্য এবং ভক্তিমান্ সাধক বলিয়া তিনি পরিচিত হইয়া উঠেন। লোকনাথ গোস্বামী তাঁহার তৃতীয় সন্তান।

বালক বয়সে লোকনাথ পিতার চতুষ্পাঠীতেই শিক্ষা লাভ করেন। চৌদ্দ বৎসর বয়সেই দেখা যায়, সংস্কৃত সাহিত্য ও শাস্ত্রে তাঁহার সন্তোষজনক ব্যুৎপত্তি হইয়াছে। অতঃপর উচ্চতর শিক্ষার জন্য প্রেরিত হন নবদ্বীপে। এস্থানে আসিয়া লোকনাথ শাস্ত্র অধ্যয়নে রত হন এবং পিতার আদেশে তাঁহার গুরু অদ্বৈত আচার্যের কাছে শুরু করেন ভাগবত পাঠ। অদ্বৈতের পাঠচক্র ও কীর্তন সভায় তাঁহার ঘনিষ্ঠ সঙ্গী ছিলেন গদাধর। অদ্বৈতের শাস্ত্র ব্যাখ্যা ও বৈষ্ণবসাধনার প্রভাবে পড়িয়া লোকনাথ কৃষ্ণভজনে ও কৃষ্ণতত্ত্ব অধ্যয়নে উৎসাহী হইয়া উঠেন।

অতঃপর কয়েক বৎসরের মধ্যে লোকনাথ ভাগবতের তত্ত্বে অধিকার লাভ করেন। কৃষ্ণ আরাধনা ও কৃষ্ণপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা অন্তরে জাগিয়া উঠে দুর্নিবারভাবে। এসময়ে আচার্য অদ্বৈত এই স্নেহভাজন তরুণকে কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষা দেন। এই দীক্ষার পর হইতেই

লোকনাথের অন্তর্জীবনে আসে দূরপ্রসারী পরিবর্তন। প্রেমভক্তি রস উপজিত হয় তাঁহার সাধনসত্তায়, তত্ত্বানুসন্ধান ও সাধনভজে তিনি নিবিষ্ট হইয়া পড়েন।

নবদ্বীপের ছাত্রজীবনেই লোকনাথ তরুণ বিশ্বম্ভরের ঘনি সান্নিধ্যে আসেন। উভয়েই ছিলেন প্রায় সমবয়সী এবং শুদ্ধস তাই অচিরে উভয়ের মধ্যে গড়িয়া উঠে অচ্ছেদ্য সখ্যতার বন্ধন।

নবদ্বীপের পাঠ সাঙ্গ হইলে লোকনাথ যশোহরে স্বগ্রাম তাল খড়িতে ফিরিয়া যান, চতুষ্পাঠী খুলিয়া শুরু করেন অধ্যাপক বৃত্তি সুপণ্ডিত অধ্যাপক এবং কৃষ্ণভক্ত আচার্যরূপে ধীরে ধীরে সে অঞ্চ তাঁহার সুনাম ছড়াইয়া পড়ে।

জনশ্রুতি আছে, এসময়ে পণ্ডিত বিশ্বম্ভর, উত্তরকালের শ্রীচৈতন্য প্রভু, একবার তালখড়িতে আসিয়া উপস্থিত। পণ্ডিত হিসা বিশ্বম্ভর তখন পূর্ববাংলার কয়েকটি অঞ্চলে পরিভ্রমণ করিতেছিলেন।

নবদ্বীপ হইতে বিশ্বম্ভর পণ্ডিতের আগমনের কথা শুনিয়া লোক নাথের পিতা পদ্মনাভ গ্রামের উপান্তে গিয়া উপস্থিত হন, নবী পণ্ডিতকে আতিথ্য গ্রহণ করান তাঁহার গৃহে। প্রাক্তন সুহৃদ্ এ নবদ্বীপের প্রতিভাধর নবীন পণ্ডিত বিশ্বম্ভরের আগমনে লোকনাথে আনন্দ আর ধরে না। ছাত্র জীবনের কথা নবদ্বীপের পুরাতন ক প্রভৃতি আলোচনায় উভয়ে মত্ত হইয়া পড়েন।

এই সাক্ষাতের কয়েক বৎসর পরেই বিশ্বম্ভরের জীবনে ঘ বিরাট রূপান্তর। তীক্ষ্ণধী, বিদ্যাদর্পী, নবীন পণ্ডিত পরিণত হন এ নূতন মানুষে। নূতন প্রেমভক্তি আন্দোলনের মহানায়করূ নবদ্বীপের সাধক ও পণ্ডিতসমাজে সৃষ্টি করেন তিনি বিরা চাঞ্চল্যের। অচিরে অগণিত বৈষ্ণব ভক্তের দিগ্‌দিশারী ও আশ্রয় দাতারূপে তিনি কীর্তিত হইয়া উঠেন।

এই সময়েই লোকনাথ ব্যাকুল হইয়া উঠেন প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গে দর্শনের জন্য। জননী সীতাদেবী বহুপূর্ব হইতেই বুঝিয়া নিয়াছে পুত্র তাঁহার সত্যকার বৈরাগ্যবান্ সাধক, তাঁহার কৃষ্ণরতি ও কৃ

়ারাধনার জের এখানেই থামিবে না। কৃষ্ণের বাঁশী অতি সত্বরই ়কদিন তাঁহাকে টানিয়া নিবে ঘর-সংসারের বাহিরে।

জননী সীতাদেবী ও জনক বৃদ্ধ পণ্ডিত পদ্মনাভের ভাগ্য ভাল, ়রুণ লোকনাথের গৃহত্যাগের শোক তাঁহাদের সহ্য করিতে হয় াই। পুত্র বিরাগী হওয়ার পূর্বেই, অল্পদিনের ব্যবধানে তাঁহারা লাকান্তরে চলিয়া যান।

লোকনাথের জ্যেষ্ঠ দুই ভ্রাতা ইতিমধ্যে বিবাহ করিয়া সংসারী ইয়াছেন, লোকনাথ তখনো অবিবাহিত। এসময়ে তাঁহার বয়স প্রায় পঁচিশ বৎসর। এই তরুণ বয়সেই অন্তরে জাগিয়া উঠিয়াছে তীব্র নর্বেদ, মন তাঁহার একান্তভাবে পড়িয়া রহিয়াছে নবদ্বীপে। সেখানে প্রেমধর্মের নব উদ্‌গাতা, তাঁহার প্রাক্তন সুহৃদ্ গৌরচন্দ্রের উদয় ়টিয়াছে, ভক্তিপ্রেমের আলোকে সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে বাংলার ়মসাবৃত অধ্যাত্মগগন। সে আলোকের হাতছানি লোকনাথকে াজ পাগল করিয়া তুলিয়াছে।

অগ্রহায়ণ মাসের এক নিশীথ রাত্রে সমাগত হয় তাঁহার জীবনের ়রম লগ্ন। ইষ্টদেবের অমোঘ হাতছানিটি তাঁহাকে ব্যাকুল করিয়া তালে। কৃষ্ণ-কৃষ্ণ বলিয়া ঘরের বাহিরে আসিয়া দাঁড়ান লোকনাথ। াদব্রজে ছুটিয়া চলেন অন্ধকারময় পথ প্রান্তর দিয়া। দীর্ঘপথ অতিক্রম ়রিয়া তৃতীয় দিবসে উপস্থিত হন নবদ্বীপে, প্রভুর দর্শন লাভে হন ়তকৃতার্থ। তারপর মাত্র পাঁচদিনের ব্যবধানে প্রভুর আকস্মিক ়চ্ছায় ও নির্দেশে চিরদিনের জন্য চলিয়া যান বৃন্দাবনধামে।

বৃন্দাবনের যাত্রাপথে লোকনাথ ও ভূগর্ভকে প্রায় তিনমাস অতিবাহিত করিতে হয়। তখনকার দিনে পথঘাট মোটেই নিরাপদ ছল না, কাজেই লোকনাথ ও ভূগর্ভকে বিপদসঙ্কুল নানা অঞ্চল এড়াইয়া বহুপথ ঘুরিয়া বৃন্দাবনে উপস্থিত হইতে হয়।

এই তিনি মাসে লোকনাথ ও ভূগর্ভ উভয়ে উভয়কে ঘনিষ্ঠভাবে চিনিয়াছিলেন, আবদ্ধ হইয়াছেন অচ্ছেদ্য একাত্মকতার বন্ধনে।

বৃন্দাবনে বাস করার সময়েও উভয়ের এই প্রীতির বন্ধন অক্ষুণ্ণ ছিল শাস্ত্রবিদ্ প্রেমিক বৈষ্ণব লোকনাথ ছিলেন প্রভুর লুপ্ততীর্থ উদ্ধারের প্রধান ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি, আর ভূগর্ভ পণ্ডিত ছিলেন তাঁহার সদা সহচর ও বিশ্বস্ত সহকারী।

উভয়ে মিলিয়া মথুরা ও ব্রজমণ্ডলের নানা স্থানে পরিভ্রমণ শুরু করেন এবং এই সঙ্গে চলে লীলাস্থলীসমূহের অনুসন্ধান। পুরাণ শাস্ত্র ও জনশ্রুতির ইঙ্গিত গ্রহণ করিয়া বহুতর স্থানে তাঁহারা ঘোরাফেরা করিতে থাকেন। কিন্তু মথুরা, বৃন্দাবন ও ব্রজমণ্ডলের বিস্তৃত অঞ্চল তখন অরণ্যে আবৃত, পথঘাট দুর্গম, তস্কর ও দস্যুদের দ্বারা উপদ্রুত। নিঃসহায় বৈরাগীদ্বয় কি করিয়া এই কার্য সম্পন্ন করিবেন ভাবিয়া পান না।

স্থানীয় সাধুদের কাছে পুরাণবর্ণিত কৃষ্ণলীলাস্থলসমূহের কিছু কিছু সন্ধান পাওয়া যায় বটে, তাহার প্রামাণিকতা প্রতিপন্ন করা কঠিন হইয়া পড়ে।

এই অঞ্চল অরণ্যে পরিণত হওয়ার পর কিছু সংখ্যক নিম্নশ্রেণীর লোক ও বুনো জাতি এখানে আসিয়া বসবাস স্থাপন করিয়াছে। প্রাচীন পুরাবৃত্ত বা ঐতিহ্যের খবর ইহারা রাখে না। বংশ পরম্পরায় কোনো জনশ্রুতিও ইহাদের মধ্যে প্রচলিত নাই।

এই সব অসুবিধা সত্ত্বেও লোকনাথ ও ভূগর্ভ বিপুল নিষ্ঠা ও অধ্যবসায় নিয়া প্রভুর আদিষ্ট কর্ম সম্পন্ন করিতে থাকেন।

বৃন্দাবনের লুপ্ততীর্থ উদ্ধার ও দর্শনের জন্য আচার্য অদ্বৈত ও নিত্যানন্দ প্রভু কম পরিশ্রম করেন নাই। কিন্তু ব্রজমণ্ডলে তাঁহারা বাস করিয়াছেন অল্প দিনের জন্য। তাই সত্যকার কোনো অনুসন্ধান চালানো তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। লোকনাথ ও ভূগর্ভ এখানে আসিয়াছেন স্থায়ী অধিবাসী হিসাবে, আর শিরোধার্য করিয়া নিয়াছেন লুপ্ততীর্থ উদ্ধারের মহাব্রত। যত শ্রমসাধ্য, যত কষ্টপূর্ণ ও বিপদসঙ্কুলই হোক, আপ্রাণ চেষ্টায় এ ব্রত যে তাঁহাদের উদ্‌যাপন করিতে হইবে

অনাহারে অনিদ্রায় দেহ ক্লিষ্ট হইয়া পড়িতেছে। জনমানবহীন দুর্গম গভীর বনে কত দিন ও রাত্রি কাটাইতে হইতেছে, কিন্তু কোনো কিছুতেই তাঁহাদের ভ্রূক্ষেপ নাই। যখন যেখানে যে জনশ্রুতি ও শাস্ত্রীয় ইঙ্গিতের সন্ধান মিলিতেছে অপার নিষ্ঠায় সব লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতেছেন, আর তীর্থচারী সাধু মহাত্মাদের সাহায্য নিয়া চলিতেছে সেগুলির তথ্য নিরূপণ ও সনাক্তকরণ।

মথুরা ও ব্রজমণ্ডলের পৌরাণিক ইতিহাস ও ঐতিহ্য অতি প্রাচীন। রামায়ণেই আমরা মথুরার উল্লেখ প্রথম পাই। তখনকার দিনে এটি প্রচলিত ছিল মধুপুরী নামে। মহর্ষি বাল্মীকি বলিতেছেন,—ইয়ং মধুপুরী রম্যা মধুরা দেব নির্মিতা।[১] এই মধুপুরী পরে মধুরাই হইয়াছে এবং তাহারই অপভ্রংশ,—মথুরা। পরবর্তীকালে এই নাম অনুসরণ করিয়াই দাক্ষিণাত্যে গড়িয়া উঠিয়াছে মধুরাই বা মাদুরা নগরী।

পুরাণশাস্ত্র মতে, মধু দৈত্য স্থাপন করেন মধুরাই। তখনকার দিনে এই অঞ্চলে আর্য প্রভাব প্রসারিত হয় নাই। মধু দৈত্যের অনুজ শত্রুঘ্ন মধুপুরী বা মধুরা অধিকার করেন। তখন হইতে এই অঞ্চল আর্যদের অধিকারে আসে এবং আর্য সভ্যতার এক বিশিষ্ট কেন্দ্ররূপে পরিচিত হইয়া উঠে। পরবর্তীকালে শূরসেন বংশীয় আর্যেরা এখানে বসতি স্থাপন করেন এবং শক্তিমান্ রাজবংশরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

শূরসেন-ক্ষত্রিয়বংশে কালক্রমে আবির্ভাব ঘটে প্রসিদ্ধ নৃপতি যযাতির। ইহার পুত্র যদুর অধস্তন বংশীয় যাদবেরা মথুরায় পরাক্রান্ত হইয়া উঠেন। এই যাদবদেরই বৃষ্ণি শাখায় আবির্ভূত হন অবতার পুরুষ—বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ।

---

১ রামায়ণ, উত্তরকাণ্ড ৮৩

যাদবদের অন্যতম শাখা ভোজ বংশের প্রধান, রাজা কংস, মথুরার রাজসিংহাসন অধিকার করেন। বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের সহিত কংসের সংঘর্ষ ঘটে এবং তিনি নিহত হন। এই সময় হইতেই ভারতের রাষ্ট্রীয় ও সমাজজীবনে মথুরা এবং ব্রজমণ্ডলের খ্যাতি প্রতিপত্তি প্রচারিত হইতে থাকে।

ভারত যুদ্ধের পর সম্রাট্ যুধিষ্ঠির অর্জুনের পৌত্র পরীক্ষিৎকে স্বীয় রাজ্যভার প্রদান করিয়া মহাপ্রস্থানের পথে চলিয়া যান। যাত্রার পূর্বে মথুরামণ্ডলের রাজারূপে অভিষিক্ত করেন শ্রীকৃষ্ণের প্রপৌত্র বজ্রনাভকে। ভক্তিমতী মাতার প্রেরণায় বজ্রনাভ প্রপিতামহ শ্রীকৃষ্ণের স্মৃতিপূজার ব্যবস্থায় তৎপর হইয়া উঠেন।[১] তাঁহার উদ্দীপনা ও প্রয়াসের ফলে সৃষ্টি হয় শ্রীকৃষ্ণের কয়েকটি পবিত্র বিগ্রহ। ইহাদের নাম যথাক্রমে—শ্রীগোবিন্দ, শ্রীমদনগোপাল এবং শ্রীগোপীনাথ। রাজা বজ্রনাভের উৎসাহ ও প্রযত্নে এবং ভক্তিমান্ আচার্যদের সহায়তায় এই বিগ্রহদের অর্চনা ও ভোগরাগের পদ্ধতি প্রবর্তিত হয়। ব্রজমণ্ডল ও মথুরার সাধকগণ দীর্ঘদিন এই বিগ্রহদের সেবা পূজা করিতে থাকেন এবং জাগ্রত বিগ্রহরূপে জনগণের কাছে ইঁহারা পরিচিত হইয়া উঠেন। এই সময়ে ভক্তিমান্ সাধু মহাত্মাদের প্রচেষ্টায় প্রভু শ্রীকৃষ্ণের বহুতর লীলাস্থল নূতন করিয়া আবিষ্কৃত হয় এবং গণ্য হয় পবিত্র তীর্থরূপে।

পরবর্তীকালে কলির প্রভাবে এই সব বিগ্রহ ও তীর্থ লুপ্ত হইয়া যায়। বিশেষ করিয়া জৈন ও বৌদ্ধধর্মের প্রভাব এবং হিন্দু বৌদ্ধের সংঘর্ষের ফলে ব্রজমণ্ডল ও মথুরার ধর্ম সংস্কৃতির উপর নিপতিত হয় প্রচণ্ড আঘাত। এ সময়ে জনজীবন যেমন বিপর্যস্ত হয়, তেমনি ক্ষতিগ্রস্ত হয় অজস্র তীর্থ, মঠ, মন্দির ও সাধনপীঠ। ইতিহাসের পাঠকমাত্রেই জানেন, চীনা পরিব্রাজকদের লেখনীতে হিন্দুতীর্থ মথুরা গণ্য হইয়াছে একটি বৌদ্ধনগরীরূপে।[২]

---

১ শ্রীশ্রীবৃন্দাবন রহস্য : রামযাদব বাগচী

২ মথুরা : গ্রাউস

কালক্রমে মথুরা ও ব্রজমণ্ডলের জনবসতি কমিয়া যায়। সারা অঞ্চল দুর্গম অরণ্যে পরিবৃত হইয়া পড়ে।

মথুরার রাজকীয় বৈভব ও প্রভাব যাহাই থাকুক, বৃন্দাবন কিন্তু পৌরাণিক যুগে প্রধানত একটি বনরূপেই বিরাজ করিত। বহু সাধু মহাত্মা এবং ভক্তিমান্ গৃহীদের আশ্রম ও আবাস ছড়ানো ছিল এই জনপদের আশেপাশে এবং সর্বত্র।

স্কন্দ পুরাণের মথুরাখণ্ডে সংক্ষেপে বৃন্দাবনের একটি মনোরম বর্ণনা আমরা পাই।

বৃন্দাবনং সুগহনং বিশালং বিস্তৃতং বহু।
মুনীনামাশ্রমৈঃ পূর্ণং বন্যবৃন্দসমন্বিতম্॥

বৃন্দাবনের বৈশিষ্ট্য ও ঐতিহাসিক বিবর্তন সম্পর্কে ইতিহাসবিদ্ লেখক শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র লিখিয়াছেন :

—৮৪ ক্রোশ পরিমিত স্থান লইয়া এই বিশাল বন অবস্থিত। এখনও ইহার দ্বাদশটি বন ও চতুর্বিংশ তপোবন তীর্থস্থানে পরিণত। পূর্বকালে এইসব বনভাগে মুনির আশ্রম ছিল। সাধকেরা নিজমনে সাধনভজন করিতেন, আর জঙ্গলের মধ্যে আভীর প্রভৃতি অনুন্নত এবং অন্য বন্যজাতির বাসভূমি ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ছিল। শেষে পশ্চিম সীমান্তের গিরিপথ দিয়া যখন মুসলমান বাহিনী ধন লুণ্ঠনের প্রত্যাশায় দলে দলে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিতে লাগিল মথুরা নগরীর উপকণ্ঠে বলিয়া সে সব আক্রমণের ফল বৃন্দাবনের উপর ফলিতেছিল।

—গজনীপতি মাহ্‌মুদ যখন বহুদিন ধরিয়া মথুরা লুণ্ঠন করেন, দেব-বিগ্রহ ভগ্ন করিয়া দুর্ভেদ্য অভ্রভেদী মন্দিরসমূহ ভূমিসাৎ করেন তখন বৃন্দাবনও ফলভোগে বঞ্চিত হয় নাই। বৃন্দাবন পরিক্রমার অন্তর্গত একটি বনের নাম মহাবন। উহার রাজা মাহ্‌মুদের নিকট পরাজিত ও পদানত হইয়াও রক্ষা পান নাই; তিনি যখন প্রজাবর্গের দারুণ হত্যাকাণ্ড সম্মুখে দেখিলেন, তখন নিজ স্ত্রী-পুত্রের হত্যাসাধন

করিয়া অবশেষে আত্মহত্যা দ্বারা নিজের উদ্ধারসাধন করেন। সে দৃশ্য দেখিয়া বৃন্দাবন হইতে বহুলোক পলায়ন করে।

ক্রমে পাঠানেরা দিল্লী গৌড় প্রভৃতি নানাস্থানে রাজতক্ত পাতিয়া দেশ শাসন করিতে লাগিলেন। বৃন্দাবনের জঙ্গল আরও শ্বাপদসঙ্কুল হইয়া রহিল। তীর্থানুসন্ধিৎসু নির্ভীক সাধুরা ব্যতীত সে বনে আর কেহ ভ্রমণ করিতে আসিতেন না। সে জঙ্গলে শুধু বন্যেরাই বাস করিত।

—দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে গৌড়াধিপ লক্ষ্মণ সেনের সভা কবি জয়দেব যখন বৃন্দাবন দর্শনে আসেন তখন বৃন্দাবন শুধু অরণ্যই ছিল। তাঁহার কোমলকান্ত পদাবলীতে বৃন্দাবনের যে রসময়ী ললিতকান্তি ফুটিয়া উঠিয়াছিল তাহা কেবল প্রেমরসিকের কল্পনারই সামগ্রী। এখন যেমন শ্রীবৃন্দাবন নির্বিঘ্ন ভক্ত সাধকের শেষাশ্রয়রূপে জনকোলাহলের মধ্যেও শান্তিনিকেতনে পরিণত হইয়াছে, পাঠান রাজত্বকালে উহার সে দশা ছিল না। বাঙালীর একটা গৌরবের কথা এই, তাহারাই বৃন্দাবনের বনজঙ্গলে আবাদ করিয়া ভক্তির পত্তন করিয়াছিলেন।

—বাঙালী যখন এই নববৃন্দাবনের সৃষ্টি করেন, তখন বাংলা-দেশের এক সুবর্ণযুগ। পাঠান বিজয়ের উদ্দাম আক্রোশ প্রশমিত হইয়াছে আর পরাক্রান্ত পাঠান নৃপতিগণ স্বাধীনভাবে বঙ্গের শাসনদণ্ড পরিচালন করিতেছেন। তখন বিখ্যাত হুসেন শাহ গৌড়ের সিংহাসনে সমাসীন; দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠিত; অন্নপণ্য সর্বত্র সুলভ; শিল্পকলার সমধিক উন্নতিতে বঙ্গদেশ খ্যাত। হুসেনের রাজদরবার প্রতিভাসম্পন্ন হিন্দু অমাত্য এবং কৃতী ও পণ্ডিত দ্বারা সমালঙ্কৃত। নবদ্বীপ, চন্দ্রদ্বীপ, বিক্রমপুর প্রভৃতি বহুস্থানের শিক্ষা-সদনে সহস্র সহস্র বিদ্যার্থীর জ্ঞান-পিপাসা মিটিতেছিল। বাঙালী কোনো বিষয়ে পরমুখাপেক্ষী ছিল না। একমাত্র ধর্মক্ষেত্রে নানাবিধ ব্যভিচার ও অবনতি দেখা যাইতেছিল

১ সপ্তগোস্বামী : সতীশচন্দ্র মিত্র

—এমন সময় নবদ্বীপে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাব হইল। অপরিণত বয়সে তাঁহার অলৌকিক শক্তিপ্রভাবে সকল সমস্যা ও সকল বিকারের অভিনব সমাধান হইয়াছিল। ইহাই, শুধু বঙ্গীয় কেন, ভারতীয় ইতিহাসের একটি নবযুগ। সে যুগে ইতিহাসের যে নূতন ধারা প্রবাহিত হইয়াছিল, তাহার একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল বৃন্দাবন। শ্রীগৌরাঙ্গদেব স্থায়ীভাবে বৃন্দাবনে বাস না করিলেও তাহারই প্রেরণায় তাঁহারই ব্যবস্থায়, তাঁহার প্রেরিত ভক্ত-সম্প্রদায়ের একাগ্র চেষ্টায় শ্রীবৃন্দাবনে বাঙালীর নূতন উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল। সেই ঔপনিবেশিকদিগের একমাত্র সাধনা—ভক্তির রাজ্য প্রতিষ্ঠা, ভক্তিবাদের ভিত্তিপত্তন এবং লীলা-ধর্মের প্রবর্তন।

—সেই ঔপনিবেশিকদের অগ্রদূত হইয়াছিলেন—শ্রীলোকনাথ গোস্বামী; ছায়ার মতো তাঁহার সহচর ছিলেন, অন্য এক বাঙালী ব্রাহ্মণ—শ্রীভূগর্ভ গোস্বামী।

বৃন্দাবনে পৌঁছানোর প্রায় দুই মাস পরে লোকনাথ সংবাদ পাইলেন, প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ ভক্তজনদের কাঁদাইয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন। নূতন নাম নিয়াছেন শ্রীচৈতন্য। পুরীতে কিছুদিন অবস্থান করার পর প্রভু বহির্গত হইয়াছেন দাক্ষিণাত্যের তীর্থভ্রমণে। তীর্থদর্শন আর নবতর প্রেমভক্তি ধর্মের প্রচার দুই-ই চলিতেছে সমভাবে।

প্রভুর ত্যাগবৈরাগ্যময় সন্ন্যাসমূর্তি দর্শনের জন্য লোকনাথ ও ভূগর্ভ ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। বৃন্দাবনের কাজ কিছুদিনের জন্য স্থগিত রাখিয়া উভয়ে রওনা হইলেন দক্ষিণ ভারতের দিকে।

কিন্তু প্রভু শ্রীচৈতন্য সদাই রহিয়াছেন ভ্রাম্যমাণ। তন্ন তন্ন করিয়া দক্ষিণের বহু তীর্থ ও সাধনপীঠে লোকনাথ ও ভূগর্ভ তাঁহাকে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, কিন্তু দর্শন মিলিল না।

এদিকে শ্রীচৈতন্য পুরীধামে আসিয়া প্রেমভক্তি আন্দোলনের ভিত্তিভূমি গড়িয়া তুলিতে তৎপর হইয়াছেন। শক্তিমান্ বৈষ্ণব

সাধকেরা কেন্দ্রীভূত হইতেছেন তাঁহার চারিদিকে। অতঃপর প্র
গৌড়ে গিয়া রূপ, সনাতনকে আত্মসাৎ করিলেন, বৃন্দাবনে তাঁহা
আসার কথা ছিল কিন্তু তাহা হইয়া উঠিল না।

পরবর্তী বৎসরে প্রভু বৃন্দাবনে উপস্থিত হইলেন বটে, কি
লোকনাথ, ভূগর্ভ তখন সেখানে নাই। উভয়ে দক্ষিণদেশের তী
তীর্থে তখনো প্রভুর দর্শনের আশায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন
কিছুদিন পরে বৃন্দাবনে প্রত্যাবর্তন করিয়াই শুনিলেন প্রভু শ্রীচৈত
ভাবাবিষ্ট অবস্থায় ব্রজমণ্ডলের নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া রও
হইয়াছেন প্রয়াগের দিকে।

উন্মত্তের মতো লোকনাথ ও ভূগর্ভ ছুটিয়া চলিলেন প্রভু
ধরিবার আশায়। পথে রাত্রির অন্ধকার নামিয়া আসিল। শ্রা
ক্লান্ত দেহে উভয়ে আশ্রয় নিলেন এক বৃক্ষতলে।

গভীর রাত্রে লোকনাথ দর্শন করিলেন এক চাঞ্চল্যকর স্বপ্ন
জ্যোতির্ময় মূর্তিতে প্রভু আবির্ভূত হইয়াছেন তাঁহার সম্মু
তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া প্রসন্নমধুর কণ্ঠে কহিতেছেন :

তোমার নিকটে নিরন্তর আছি আমি।
বৃন্দাবন হৈতে কোথা না যাইহ তুমি॥
প্রয়াগ হইতে আমি যাব নীলাচল।
শুনিতে পাইবে মোর বৃত্তান্ত সকল॥

(নরোত্তম বিলাস

এই স্বপ্ন দর্শনের মধ্য দিয়া ভক্ত লোকনাথের বিরহখিন্ন হৃদ
কৃপাময় প্রভু বুলাইয়া দিলেন শান্তির প্রলেপ। লোকনাথের গ
বাহিয়া ঝরিতে লাগিল পুলকাশ্রু। প্রভুর বাণী শিরোধার্য করি
সংকল্প গ্রহণ করিলেন, এ-জীবনে আর কখনো বৃন্দাবন
করিয়া কোথাও যাইবেন না, প্রভুর আদিষ্ট কর্ম উদ্‌যাপন ও
ধ্যান মননেই করিবেন দিনযাপন।

শ্রীবিগ্রহ সেবার একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা বেশ কিছুদিন যা

জাগ্রত হইয়াছে লোকনাথের অন্তরে। কিন্তু কোথায় কোন্ শ্রীবিগ্রহ প্রকট হইবেন সেবা পূজার জন্য, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না। সেদিন প্রয়াগের পথ হইতে ফিরিবার কালে ব্রজমণ্ডলের কিশোরী কুণ্ডে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। পবিত্র কুণ্ডে স্নান করার সময় লোকনাথ তাঁহার ইষ্টদেবের কৃপায় লাভ করিলেন এক পরম সুন্দর বিগ্রহ—শ্রীরাধাবিনোদ। এখন হইতে এই বিগ্রহের সেবা ও ধ্যান জপ হইয়া উঠে তাঁহার ব্যক্তিগত সাধনজীবনের প্রধান উপজীব্য।

শ্রীবিগ্রহ কৃপাভরে দর্শন দিয়া সেবা প্রকট করিয়াছেন বটে কিন্তু তাঁহার ভক্তের কাঙালত্ব তো মোচন করেন নাই। প্রভুর সেবায় আসন, শয্যা, সাজপোশাক ভোগরাগ অনেক কিছু উপকরণ দরকার। নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণব লোকনাথের পক্ষে এসব জোটানো কঠিন, কোন অর্থ সম্বলই যে তাঁহার নাই। অরণ্যচারী সাধু তিনি, দিন রাত বনে বনে লুপ্ত তীর্থ উদ্ধারের জন্য ঘুড়িয়া বেড়ান, একখানা পর্ণকুটিরও তাঁহার নাই।

বনের অধিবাসীরা সাধুবাবাকে ভালোবাসে, তাহারা প্রস্তাব দেয়, "বাবাজী, নিজে তুমি যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়াও, থাকা খাওয়ার কোনো ঠিক নেই; কিন্তু ঠাকুর যখন কৃপা ক'রে এসেছেন তোমার কাছে, তাঁকে তো ভালোভাবে রাখতে হবে। আমরা তোমায় একটা কুঁড়েঘর বেঁধে দিচ্ছি, সেখানে ঠাকুরের সেবা পূজা তুমি করতে থাকো।"

লোকনাথ উত্তর দেন, "বাবা, আমি যেমন বনচারী আমার ঠাকুরও যে তাই। যতদিন আমি বনে বনে ঘুরে বেড়াবো, তিনিও থাকবেন সঙ্গে সঙ্গে। আমি থাকবো বৃক্ষতলে আর আমার ঠাকুর থাকবেন বৃক্ষের কোটরে।"

সেই ব্যবস্থাই আপাতত চলিতে থাকে। রোজ প্রত্যুষে উঠিয়া লোকনাথ ভক্তিভরে বনতুলসী ও বনফুল তুলিয়া আনেন, নিবিষ্ট হইয়া সম্পন্ন করেন শ্রীবিগ্রহের পূজা। বেলা হইলে অরণ্যের শাক-

পাতা ফল কুড়াইয়া আনিয়া প্রস্তুত করেন ভোগরাগ। ইষ্টবিগ্রহকে শয়ান দেন পুষ্পশয্যায়, ঘুম পাড়ান তাঁহাকে বৃক্ষপল্লবের বাতাস দিয়া। নিত্যকার সেবা পূজা ও জপ ধ্যানের শেষে সহচর ভূগর্ভকে নিয়া সারা দিনের মতো বাহির হইয়া পড়েন লুপ্ত, অবজ্ঞাত ও প্রচ্ছন্ন লীলাস্থলীর সন্ধানে।

কিন্তু এক একদিন এই অনুসন্ধান কর্মে দূরদূরান্তে চলিয়া যাইতে হয়, বিগ্রহ সেবায় উপস্থিত হয় নানা অন্তরায়। অবশেষে তিনি গ্রহণ করেন এক নূতনতর ব্যবস্থা। শণের গোছা পাকাইয়া এক ঝোলা তৈরী করেন, তাহারই মধ্যে স্থাপিত করেন শ্রীবিগ্রহকে। তারপর সেটি কণ্ঠে ঝুলাইয়া ঘুরিয়া বেড়ান নিত্যকার কর্মে।

লোকনাথের পবিত্র চরিত্র, সেবা নিষ্ঠা, বৈষ্ণবীয় দৈন্য ও প্রেমাবেশ দেখিয়া বনবাসীরা ক্রমে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হয়। ধীরে ধীরে দূর জনপদ হইতে দুই একটি করিয়া ভক্ত তাঁহার নিকট আসিতে থাকে।

বিগ্রহের সেবা পূজার জন্য তাহাদের কেহ কেহ অনেক সময়ে ফল মূল ইত্যাদি কিনিয়া আনিত। লোকনাথ সানন্দে প্রভুর ভোগ লাগাইতেন, তারপর ঐসব বিতরণ করিয়া দিতেন ভক্ত ও বনবাসী দরিদ্র ব্যক্তিদের মধ্যে। সেবা পূজায় কোনো উপচার বা ভেট তিনি একদিনের তরেও সঞ্চয় করিতেন না। প্রাপ্তিমাত্রেই তাহা বিতরিত হইয়া যাইত।

বৈষ্ণবীয় দৈন্য ও ত্যাগ তিতিক্ষার মূর্ত বিগ্রহ লোকনাথের আদর্শ জীবন সম্পর্কে ভক্তিরত্নাকর লিখিয়াছেন :

> যে বৈরাগ্য তার তা' কহিতে অন্ত নাই।
> শ্রীরাধাবিনোদ কৃপা কৈলা এই ঠাঁই॥
> ফলমূল শাক অন্ন যবে যে মিলয়।
> যত্নে তাহা শ্রীরাধাবিনোদে সমর্পয়॥
> বর্ষা শীতাদিতে এই বৃক্ষতলে বাস।
> সঙ্গে জীর্ণ কাঁথা অতি জীর্ণ বহির্বাস॥

আপনি হইতা সিক্ত অতি বৃষ্টি নীরে।
ঠাকুরে রাখিতা এই বৃক্ষের কোটরে॥
অন্য সময়েতে জীর্ণ ঝোলায় লইয়া।
রাখিতেন বক্ষে অতি উল্লসিত হিয়া॥

(৫ম তরঙ্গ)

এই বৈরাগ্যময় তপস্যা ও কর্মনিষ্ঠার ফল ক্রমে ফলিতে আরম্ভ করে। একের পর এক কতকগুলি লুপ্ত ও বিস্মৃত তীর্থের উদ্ধার সাধন করেন লোকনাথ। সারা ব্রজমণ্ডলে এবার সাড়া পড়িয়া যায়। গৌড়ীয় সাধক লোকনাথ গোস্বামীর প্রতি পতিত হয় ভক্তসমাজের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি। তাঁহার নিজের ব্যাপক অনুসন্ধানের সঙ্গে মিলিত হয় প্রভু শ্রীচৈতন্যের দিগ্‌দর্শন। ব্রজমণ্ডলে আসিয়া প্রভু ভাবপ্রমত্ত অবস্থায় কয়েকটি লীলাস্থল ও শ্রীকুণ্ডের আবিষ্কার করেন, স্থানীয় সাধু-সন্ন্যাসী ও জনসাধারণ এগুলি সম্পর্কে নূতন করিয়া সজাগ হন, শ্রদ্ধান্বিত হন।

লোকনাথের এই একনিষ্ঠ প্রয়াসের সঙ্গে শুধু প্রভু শ্রীচৈতন্যের আবিষ্কারই যুক্ত হয় নাই, পরবর্তীকালে আগত রূপ গোস্বামী ও সনাতন গোস্বামীর কর্মতৎপরতাও অশেষভাবে তাঁহার কার্যের সহায়ক হইয়া উঠে।

পুরীধাম হইতে শক্তি সঞ্চারিত করিয়া প্রভু শ্রীচৈতন্য রূপ ও সনাতনকে ব্রজমণ্ডলে পাঠাইয়া দিয়াছেন। এই দুই গোস্বামী অশেষ শাস্ত্রবিদ্ পরিচালন-দক্ষতা এবং অভিজ্ঞতাও তাঁহাদের যথেষ্ট। ইহাদের আগমনের পর লোকনাথ গোস্বামীর কর্মভার অনেকটা কমিয়া গেল, আগেকার মতো বন বনান্তরে ছুটাছুটি করার প্রয়োজনীয়তা আর তেমন রহিল না।

রূপ ও সনাতনকে ডাকিয়া লোকনাথ তাঁহার নিজের উদ্ধার-করা লুপ্ত তীর্থগুলি বুঝাইয়া দিলেন, শাস্ত্র ও পুরাণের তথ্যের সহিত মিলাইয়া এবং এই দুই মনীষীকে দিয়া অনুমোদন করাইয়া নূতন

তীর্থগুলির মাহাত্ম্য প্রকটিত করিলেন। কতকগুলি নূতন নূতন নামকরণও এ সময়ে করা হইল। পরবর্তীকালে রঘুনাথ গোস্বামীর প্রচেষ্টায় শ্যামকুণ্ড রাধাকুণ্ডের উদ্ধারসাধন সম্পূর্ণ হয় এবং সারা ব্রজমণ্ডল তীর্থ, বিগ্রহ এবং কুণ্ডের মাহাত্ম্যে পূর্ণ হইয়া উঠে।

ব্রজমণ্ডল সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসু, শ্রীমৎ নারায়ণ ভট্ট নামক এক সাধক 'শ্রীব্রজভাব বিলাস' গ্রন্থের রচয়িতা। এই গ্রন্থে তিনি লিখিয়া গিয়াছেন যে, প্রভু শ্রীচৈতন্যের আদিষ্ট কর্ম উদ্‌যাপন করিতে গিয়া লোকনাথ গোস্বামী তিনশত তেত্রিশটি বন ও তীর্থ আবিষ্কারে সমর্থ হন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, নারায়ণ ভট্টের এই গ্রন্থ রচিত হয় রূপ গোস্বামীর ও সনাতন গোস্বামীর জীবিতকালে। সেই সময়ে শ্রীচৈতন্যের এই দুই প্রধান পরিকরের অনুমোদন ছাড়া ব্রজ সম্পর্কিত গ্রন্থাদির প্রকাশ সম্ভব ছিল না। কাজেই লোকনাথের আবিষ্কৃত লীলাস্থলের এ সংখ্যাটিকে মোটামুটিভাবে ঠিক বলিয়া ধরিয়া নেওয়া যাইতে পারে।

অতঃপর গৌড়ীয় ভক্তসমাজের উপর পতিত হইল মহা দুর্দৈবের আঘাত, প্রভু শ্রীচৈতন্য নীলাচলে লীলা সংবরণ করিলেন।

এসময়ে ভক্তপ্রবর রঘুনাথদাস বিষাদখিন্ন হৃদয়ে কাঁদিতে কাঁদিতে উপস্থিত হইলেন বৃন্দাবনে। লোকনাথ, রূপ, সনাতন, গোপাল ভট্ট, রঘুনাথ ভট্ট প্রভৃতি বৃন্দাবনে আগে হইতেই অবস্থান করিতেছেন, ভক্তিপ্রেম সাধনার আলোক প্রজ্বলিত করিয়াছেন। প্রভু চৈতন্যের এই প্রতিভাধর পরিকরদের ঐকান্তিক সাধনা ও কর্মের ফলে ভৌম বৃন্দাবনে পত্তন হইল এক নবতর ভক্তি সাম্রাজ্যের। এই ভৌম বৃন্দাবনের প্রথম ও বরেণ্য পথিকৃৎ লোকনাথ গোস্বামী।

"এখন যেখানে বৃন্দাবনের গোকুলানন্দ আশ্রম, সেইস্থানে বনের মধ্যে লোকনাথের কুঞ্জ ছিল। তাহা পথ হইতে দূরে, বৃক্ষবল্লরীর আড়ালে, নিভৃত নিলয়ে অবস্থিত। সহজে তাহা খুঁজিয়া বাহির করা যাইত না। লোকনাথও বিশেষ প্রয়োজন না হইলে কুঞ্জ ছাড়িয়া কোথাও যাইতেন না; যাঁহার সন্ধানে বৃন্দাবনে আসিয়াছেন, তাঁহারই

ধ্যানধারণায় পূজার্চনায় তাঁহার দিবা বিভাবরী অতিবাহিত হইত। তখন রূপ গোস্বামীই সমগ্র ব্রজমণ্ডলের কর্তা, বিপন্নভক্তের সহায়, নিরাশ্রয়ের আশ্রয় ছিলেন। পাণ্ডিত্যের ভিত্তিতে সেখানে যে একপ্রকার বৈষ্ণব বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল, শ্রীরূপ তাহার কর্ণধার। কত দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত নবমতের মূল ধ্বংস করিবার জন্য গোস্বামিগণের বিদ্যা পরীক্ষা করিতে আসিতেছেন, তাঁহাদের সঙ্গে বিচার বা জয়পরাজয় রূপের ব্যবস্থায় হইত; কোনো কিছু নূতন বিধি নিষেধ প্রবর্তিত করিতে হইলে, তাহা রূপই সকলের পরামর্শ লইয়া করিতেন। এ সব ব্যাপারে লোকনাথের সময়ক্ষেপ করিতে হইত না। তিনি নিজের সাধনভজন ও দেবসেবা লইয়াই থাকিতেন।"[১]

বৃন্দাবন ও ব্রজমণ্ডলের গোস্বামীরা এক একজন ছিলেন প্রদীপ্ত ভাস্করের মতো। প্রতিভা, শাস্ত্রবিদ্যা কৃচ্ছ্রসাধন ও ভজননিষ্ঠা নিয়া ভক্তি আন্দোলনের যে মহান্ কেন্দ্র তাঁহারা স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহার যশঃপ্রভায় চারিদিক আলোকিত হইয়া উঠিয়াছিল।

শ্রীচৈতন্যের প্রচারিত প্রেমভক্তি ধর্মের মূলে ছিল ভাগবতে বর্ণিত পরমপুরুষ রসময় কৃষ্ণের তত্ত্ব। এই তত্ত্ব রূপ, সনাতন, গোপাল ভট্ট, রঘুনাথদাস প্রভৃতি প্রোজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছিলেন তাঁহাদের মনীষা ও তপস্যার মধ্য দিয়া। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধনা ও দার্শনিকতার বৈশিষ্ট্য সে সময়ে শুধু গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের জীবনকেই উদ্দীপিত ও প্রভাবিত করে নাই, সারা ভারতের সমক্ষেও তুলিয়া ধরিয়াছে প্রেমভক্তি সাধনার এক নূতনতর আলোকবর্তিকা।

কিন্তু বৃন্দাবনের এই দূরপ্রসারী প্রভাব ও ঔজ্জ্বল্য খুব বেশী দিন বর্তমান থাকে নাই। প্রভু শ্রীচৈতন্যের অপ্রকটের পরে প্রবীণ নেতৃদ্বয় নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত লীলা সংবরণ করিয়াছেন। অতঃপর বৃন্দাবনে—একে একে নিভিল দেউটি। প্রথমে সনাতন, তার পরে রূপ ও রঘুনাথ ভট্ট করিলেন মহাপ্রয়াণ। রঘুনাথদাস গোস্বামী

১ সপ্তগোস্বামী: সতীশচন্দ্র মিত্র

শ্রীচৈতন্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লীলাপরিকর, প্রেমভক্তি সাধনার এক মূর্ত বিগ্রহ। কিন্তু তিনি তখন নিজেকে একান্তভাবে গুটাইয়া নিয়াছেন। রাধাকুণ্ডের নিকটে বসিয়া রত রহিয়াছেন কঠোর তপস্যায়, বৃন্দাবনের সাধক ও ভক্তেরা তাঁহার পুণ্যময় সঙ্গ হইতে বঞ্চিত। এসময়ে বৃন্দাবনের সাধন প্রদীপ জ্বালাইয়া রাখিয়াছেন প্রধানত তিন গোস্বামী—লোকনাথ, গোপাল ভট্ট ও শ্রীজীব। শ্রীজীব বিপুল মনীষা ও শাস্ত্র জ্ঞানের অধিকারী, সংগঠন শক্তিও তাঁহার অসাধারণ। রূপ গোস্বামীর তিরোধানের পর হইতে তিনিই বৃন্দাবনের ভক্তি সাম্রাজ্যের প্রধান পরিচালক ও ব্যবস্থাপক। গোপাল ভট্ট গোস্বামী পূর্বাশ্রমে ছিলেন শাস্ত্রবিদ্ শুদ্ধাত্মা ব্রাহ্মণ। বৃন্দাবনে আসিয়া তিনি বৈষ্ণবধর্মের সংহিতা রচনা করিয়া সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছেন। এই সর্বজনীন শ্রদ্ধা ও প্রভু শ্রীচৈতন্যের মনোনয়ন তাঁহাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে গুরুস্থানীয় মহাপুরুষরূপে। এই গোস্বামীদের মধ্যে লোকনাথ ছিলেন সকলের চাইতে বয়োবৃদ্ধ, ত্যাগ তিতিক্ষা, ভজন-নিষ্ঠা ও ভজনসিদ্ধির দিক দিয়া বরেণ্য।

ইতিমধ্যে বৃন্দাবনের গোস্বামীরা প্রায় অর্ধশতক ব্যাপিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতবাদের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন, বহুতর শাস্ত্রগ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। কিন্তু গৌড়ে এসবের প্রচার তেমন হয় নাই। গৌড় প্রভু শ্রীচৈতন্যের দেশ। যে দেশে সর্বপ্রথম তিনি রচনা করেন নিগূঢ় প্রেমধর্মের মধুচক্র, সেখানে কি তাঁহার পরিকরদের ভক্তিশাস্ত্র ও ভক্তিসাহিত্যের প্রচার ঘটিবে না, নব উজ্জীবন সাধিত হইবে না? লোকনাথ, শ্রীজীব প্রভৃতি বড় চিন্তিত হইয়া উঠিয়াছিলেন, মনে দুঃখও পাইতেছিলেন।

এই প্রচার ও উজ্জীবনের কর্ম বড় দুরূহ, বড় দায়িত্বপূর্ণ। এই কর্মভার গ্রহণের জন্য চাই এমন সব সাধক যাঁহারা কর্মকুশল তত্ত্ববিদ্ এবং আপন আপন সাধনা ও সিদ্ধির আলোকে প্রেমধর্মের উদ্দীপনা সৃষ্টি করিতে পারেন, লক্ষ লক্ষ মানুষকে চালিত করিতে পারেন অধ্যাত্মজীবনের পথে।

কিছুদিনের মধ্যে আশার রশ্মি দেখা গেল। ত্যাগ বৈরাগ্য ও মুমুক্ষার আর্তি নিয়া বৃন্দাবনে একে একে উপস্থিত হইলেন তিনটি চিহ্নিত সাধক—শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দ। প্রাণের আবেগে নিজ নিজ প্রদেশ হইতে বৃন্দাবনে তাঁহারা ছুটিয়া আসিলেন, নিপতিত হইলেন গোস্বামী প্রভুদের পদপ্রান্তে।

উত্তরকালে এই তিন নবীন সাধক গৌড়ীয় বৈষ্ণব আন্দোলনে সংযোজন করেন নূতনতর অধ্যায়। শ্রীনিবাস রাঢ় বঙ্গে সহস্র সহস্র ভক্তকে আশ্রয় প্রদান করেন। শ্যামানন্দের প্রভাবে উড়িষ্যায় শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত নবধর্ম বিস্তৃতি লাভ করে, আর নরোত্তম উত্তর বঙ্গ এবং আসামে বহাইয়া দেন ভক্তিপ্রেমের জোয়ার।

শ্রীনিবাস গোপাল ভট্ট গোস্বামীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া ধন্য হন, আর শ্যামানন্দ দীক্ষালাভ করেন শ্রীজীবের কাছে। নরোত্তমের গুরুকরণ তখনো সম্ভব হয় নাই। গোস্বামী লোকনাথের তপস্যাপূত সমুজ্জ্বল মূর্তি নরোত্তমের অন্তরপটে চিরতরে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে। বার বার নরোত্তম তাঁহার চরণে লুটাইয়াছেন, অশ্রুজলে তাঁহার কুটিরের মৃত্তিকা সিক্ত করিয়াছেন দীক্ষা প্রাপ্তির জন্য। কিন্তু লোকনাথ কৃপার দুয়ার উন্মোচন করেন নাই। তাঁহার সংকল্প ছিল—কখনো কাহাকেও শিষ্য করিবেন না, এখনো সেই সংকল্পে আছেন অবিচল। নরোত্তমের তাই মনঃকষ্টের অবধি নাই।

শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দ এই তিন প্রতিভাধর নবীন বৈষ্ণবকে শাস্ত্র শিক্ষার ভার নিয়াছেন শ্রীজীব। রূপ, সনাতনের স্নেহধন্য উত্তরসাধক শ্রীজীব, প্রভু শ্রীচৈতন্যের অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদের প্রধান প্রবক্তা ও ব্যাখ্যাতা তিনি। তাছাড়া ব্রজমণ্ডলের বৈষ্ণবগোষ্ঠীর নায়ক ও প্রধান পরিচালকরূপেও তিনি চিহ্নিত। নবাগত প্রতিভাধর শিষ্যত্রয় অপরিসীম শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা নিয়া তাঁহার কাছে অধ্যয়ন করিতেছেন ভক্তিপ্রেম ধর্মের শাস্ত্রতত্ত্ব।

শিক্ষাগুরু শ্রীজীবের প্রবল ইচ্ছা, তাঁহার এই তিনটি ত্যাগী ও

প্রতিভাধর শিষ্যকে নিয়োজিত করিবেন প্রভু শ্রীচৈতন্যের ধর্মের প্রচার ও প্রসারকল্পে। কিন্তু নরোত্তমকে নিয়া গোল বাধিয়াছে। দীক্ষা গ্রহণ না করিয়া বৃন্দাবন হইতে তিনি এক পা-ও নড়িবেন না। মনে মনে গুরুরূপে বরণ করিয়াছেন গোস্বামী লোকনাথকে, কিন্তু তাহার কৃপা লাভের কোনো চিহ্নই দেখা যাইতেছে না।

শ্রীজীব এবং বৃন্দাবনের বিশিষ্ট বৈষ্ণব সাধুরা ব্যাপারটির গুরুত্ব বুঝেন। নরোত্তমের মতো প্রতিভাধর নবীন সাধকের প্রচেষ্টা ব্যতীত গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধন ও শাস্ত্রতত্ত্বের প্রচার সফল হইবে না। সবাই মিলিয়া লোকনাথ গোস্বামীকে চাপিয়া ধরিলেন, অনুনয় করিলেন— তিনি কৃপা না করিলে তো নরোত্তমকে নব পরিকল্পিত কর্মভার দেওয়া সম্ভব হইতেছে না। তাঁহার কাছে দীক্ষা পাইলে তবেই সে বৃন্দাবন ত্যাগ করিবে।

একান্তে তপস্যারত, নিগূঢ় ভজনানন্দে মত্ত, গোস্বামীর সেই একই কথা—শিষ্য গ্রহণের দায়িত্ব এ-জীবনে তিনি আর গ্রহণ করিবেন না, আর যে প্রতিজ্ঞা ইতিপূর্বে করিয়াছেন, কোনো মতেই তাহা তিনি ভাঙিতে পারিবেন না।

নরোত্তমের বাড়ি রাজসাহী জেলার পদ্মাতীরস্থ খেতরী গ্রামে। পিতা কৃষ্ণানন্দ মজুমদার ছিলেন প্রভাবশালী জমিদার। রাজা উপাধি ছিল তাঁর, আর ছিল বহু লক্ষ টাকার বিষয় বৈভব।

নরোত্তমের মাতা নারায়ণী দেবী অতিশয় ধর্মপ্রাণা। দীর্ঘদিন সন্তান লাভে বঞ্চিত হইয়া তিনি বহুতর ব্রত পূজার অনুষ্ঠান করেন এবং দেবতার কৃপায় লাভ করেন পুত্র নরোত্তমকে। শুভ সাত্ত্বিক সংস্কার নিয়া নরোত্তম জন্মগ্রহণ করেন, তাই বাল্যকাল হইতেই তাঁহার জীবনে দেখা যায় ত্যাগ বৈরাগ্য ও ধর্মপরায়ণতা। বিশেষ করিয়া প্রভু চৈতন্যের জীবন ও আদর্শ তাঁহাকে উদ্দীপিত করিতে থাকে। অতঃপর তরুণ বয়সে পিতার প্রাসাদের রাজতুল্য ধন, ঐশ্বর্য ও ভোগবিলাসময় জীবন ত্যাগ করিয়া বাহির হইয়া পড়েন মুক্তির সন্ধানে।

বৃন্দাবনে আসার পর শ্রীজীবের স্নেহ ও আশীর্বাদ লাভে নরোত্তম ধন্য হন, তাঁহার প্রসাদে বৈষ্ণবীয় শাস্ত্রতত্ত্বে পারঙ্গম হইয়াও উঠেন। শ্রীজীব জানেন, নরোত্তম উত্তরবঙ্গের রাজতুল্য জমিদারের সন্তান, প্রচুর বিত্ত বিভবের উত্তরাধিকারী। সেজন্যই যে তিনি তাঁহাকে এত স্নেহ করিতেন তাহা নয়। নরোত্তম জন্ম-বৈরাগী, রাজতুল্য বিষয় বৈভব ত্যাগ করার শক্তি তিনি রাখেন, নরোত্তম প্রতিভাধর নবীন শাস্ত্রবিদ্, নরোত্তম কৃচ্ছ্রব্রতী ভজননিষ্ঠ সাধক। তাই শ্রীজীবের এত প্রিয় তিনি। এই প্রিয় নবীন সাধকের উপর তাঁহার অনেক আশা, অনেক ভরসা। ঐশ্বরীয় কর্মের অনেক ভার তাঁহার উপর তিনি চাপাইতে চান। তাই শ্রীজীব তাঁহাকে গড়িয়া পিটিয়া তুলিতেছেন, পরিচিত করাইয়া দিতেছেন শ্রেষ্ঠ সাধুদের সঙ্গে।

শ্রীজীবের কৃপা ও স্নেহ মিলিয়াছে। এবার নরোত্তমের চাই গোস্বামী লোকনাথের কৃপাদীক্ষা। এই দীক্ষা লাভ করিতে পারিলে তবেই জীবন তাঁহার কৃতার্থ হইতে পারে। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নরোত্তম বহু চেষ্টাই করিয়াছেন, কিন্তু এ যাবৎ কোনো ফলোদয় হয় নাই। লোকনাথ-প্রভু তাঁহার প্রতিজ্ঞায় অটল, এদিকে ভক্ত নরোত্তমও পণ করিয়া বসিয়াছেন, শিষ্যত্ব নিতে হইলে নিবেন একমাত্র তাঁহারই কাছে।

নরোত্তম স্থির করিলেন, দীক্ষা সম্পর্কে এবার শেষ চেষ্টায় ব্রতী হইবেন। লোকনাথের কুঞ্জ ছিল বৃন্দাবনের এক প্রান্তে, এক নিভৃত অরণ্যে। এই কুঞ্জের অনতিদূরে লোকনাথ কঠোর ভজনসাধনের জন্য এক ঝুপড়ি বাঁধিলেন। দিন রাতের অধিকাংশ সময় জপ ধ্যানে অতিবাহিত হইত, কিছুটা সময় ব্যয় করিতেন শ্রীজীবের নিকট শাস্ত্র অধ্যয়নে, অবশিষ্ট সময়ে নিবিষ্ট থাকিতেন বহু আকাঙ্ক্ষিত গুরুমূর্তির ধ্যানে॥

স্বল্পভাষী, তপস্যারত লোকনাথ গোস্বামীর নিকটে তিনি কখনো আসিতেন না, কথাবার্তাও বলিতেন না। মৃদুস্বরে ইষ্টনাম গাহিয়া

গাহিয়া টহল দিতেন তাঁহার কুঞ্জের চারিদিকে। সর্বদা লক্ষ্য রাখিতেন সদা ভজনশীল লোকনাথকে কেহ যেন বিরক্ত না করে। তাঁহার নির্দিষ্ট দিনচর্যার ব্যাঘাত না জন্মায়।

কিছুদিন এভাবে চলিল। অতঃপর নরোত্তম উদ্ভাবন করিলেন গুরুসেবার এক বিচিত্র উপায়। লোকনাথ প্রত্যূষে উঠিয়া নিকটস্থ বনের এক নির্দিষ্ট স্থানে শৌচে যাইতেন। নরোত্তম স্থির করিলেন, এখন হইতে গুরুর মেথরের কাজটি তিনি গ্রহণ করিবেন, ইহাতে একদিকে বৃদ্ধ গুরুর পরিচর্যা যেমন করা হইবে, তেমনি তাঁহার নিজেরও হইবে অহমিকার বিনাশ। উত্তরবঙ্গের শ্রেষ্ঠ ভূম্যধিকারীর পুত্র তিনি, এতকাল দেশে রাজতুল্য সম্মানে থাকিয়া আসিয়াছেন, অকল্পনীয় ভোগবিলাসের মধ্যে বর্ধিত হইয়াছেন। লোকের কাছে রাজসম্মান প্রাপ্তির ফলে অন্তরে যে অহংবোধ দানা বাঁধিয়াছে, এই ত্যাগ বৈরাগ্যের জীবনেও হয়তো তাহা একেবারে যায় নাই, সূক্ষ্মভাবে রহিয়া গিয়াছে। বৃন্দাবনে আসার পরেও লক্ষ্য করিয়াছেন, মন্দিরের পূজারী ও সাধু সন্ন্যাসী, যাঁহারা তাঁহার পূর্বাশ্রমের সংবাদ জানেন, বেশ কিছুটা সমীহ করেন তাঁহাকে, সম্ভ্রমও দেখাইয়া থাকেন। ইহার সূক্ষ্ম প্রতিক্রিয়া কি কিছু তাঁহার জীবনে সৃষ্ট হইতেছে না? নাঃ—এবার গুরুর মেথরের কাজের মধ্যে দিয়া সেটিকে নিশ্চিহ্ন করিবেন।

সংকল্প অনুযায়ী কাজ শুরু করিয়া দিলেন। প্রত্যহ চারদণ্ড রাত্রি থাকিতে নির্দিষ্ট বনের প্রান্তে উপস্থিত হইতেন, স্থানটিকে কণ্টকশূন্য করিয়া ঝাঁটা দিয়া ভালোভাবেই মার্জন করিতেন। নিকটেই রাখিয়া দিতেন সদ্য তোলা এক ভাণ্ড জল। তারপর ঝাঁটা গাছটি এককোণে পুঁতিয়া রাখিয়া সরিয়া পড়িতেন সেখান হইতে। আবার বেশ খানিকটা বাদে ফিরিয়া আসিয়া কোদালির সাহায্যে স্থানটি ময়লা-মুক্ত করিয়া ফেলিতেন। এমনভাবে অন্তরালে আত্মগোপন করিয়া নরোত্তম দিনের পর দিন চালাইয়া যান তাঁর গুরুসেবা।

প্রথম দিনেই লোকনাথ গোস্বামী বুঝিলেন, কেহ অলক্ষ্যে থাকিয়া তাঁহার সেবা করিতে চাহিতেছে। ভাবিলেন, স্থানীয় বুনো লোকদের অনেকে তাঁহাকে সাধু বাবাজী বলিয়া জানে। হয়তো কাহারো খেয়াল হইয়াছে বৃদ্ধ সাধুর একটু সহায়তা করা, তাই এসব করিতেছে।

এভাবে মাসের পর মাস অতিবাহিত হয়, শেষে বৎসর গড়াইয়া যায়। কৃষ্ণভাবে সদা বিভাবিত, আপনভোলা লোকনাথ গোস্বামীর মনে হঠাৎ একদিন একটা ধাক্কা লাগে। ভাবেন, 'কাজটি তো আমার পক্ষে বড় গর্হিত হচ্ছে। কোনো ভক্ত হয়তো সাধু সেবার জন্য এই মেথরের কাজ অবলীলায় ক'রে যাচ্ছে, কিন্তু আমি নিজে সর্বস্ব ছেড়ে বৈরাগ্য অবলম্বন করেছি, কৃষ্ণ ভজনে মত্ত রয়েছি, সেই আমি কেন তার এই সেবা নেবো, কেনইবা নিজেকে এভাবে পাপে জড়াবো। না—না, এ তো হতে পারে না! আজই নিশ্চয় এর প্রতিবিধান করতে হবে।'

রাত্রি শেষ হইবার পাঁচ ছয় দণ্ড বাকী, সেই সময়ে লোকনাথ বনের ঐ নির্দিষ্ট স্থানটির কাছে গিয়া এক বৃক্ষের আড়ালে গোপনে দাঁড়াইয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পরেই অদূরে দেখা গেল এক মনুষ্য মূর্তি। সারা বন তখনো অন্ধকারাচ্ছন্ন, লোকটি কে তাহা বুঝিতে পারা যাইতেছে না।

লোকনাথ গোস্বামী হাঁক দিয়া কহিলেন, "কে তুমি ওখানে কি করছো, বল। ভয় নেই, এসো আমার কাছে।"

লোকটির দিক হইতে কোনোই সাড়া শব্দ নাই। নীরবে ধীর পদে সে নিকটে আসিয়া উপস্থিত হয়, তারপর অকস্মাৎ লুটাইয়া পড়ে লোকনাথের চরণতলে।

অন্ধকারের ঘোর তখনো কাটে নাই, তাই ভূলুণ্ঠিত ব্যক্তিটি উঠিয়া দাঁড়ানোর পরও লোকনাথ তাঁহাকে চিনিতে পারেন নাই। আবার সহজ কণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন, "কে তুমি বাবা?"

নতশিরে লোকটি উত্তর দেয়, "আমি নরোত্তম।"

"তুমি! তা হলে রোজ তুমিই একাজ করছো," সবিস্ময়ে বলিয়া উঠেন গোস্বামী লোকনাথ।

"আজ্ঞে হ্যা, প্রভু, আপনার কোনো বিঘ্ন না জন্মিয়ে যদি কিছু সেবা করতে পারি, এজন্য এ কাজটুকু করছি।"

"রাজতুল্য জমিদারের পুত্র হয়ে এই মেথরের কাজ তুমি করছো, বাবা। না, না, নরোত্তম, এতো ঠিক নয়। এতো আমি চলতে দিতে পারিনে," ব্যাকুল স্বরে বলেন লোকনাথ।

"প্রভু, আমি কাঙাল আশ্রয়হীন, অতি অভাজন। আপনার চরণে আত্মসমর্পণ ক'রে আছি। আপনি ছাড়া আমার আর গতি নেই। অন্তত এটুকু সেবা আমায় করতে দিন।" কাকুতি জানান নরোত্তম।

"হুঁ!" বলিয়া গোস্বামী লোকনাথ গম্ভীর হইলেন, নিষ্পলক নেত্রে তাকাইয়া রহিলেন করুণাপ্রার্থী তরুণ ভক্তের দিকে।

নরোত্তম এবার হৃদয়ে কিছুটা বল পাইয়াছেন। জোড়হস্তে কহিতে লাগিলেন, "প্রভু, রাজসংসারে আমি জন্মেছি, কিন্তু সে সংসার-সুখ কোনো দিনই আমায় তৃপ্তি দিতে পারে নি। কৃষ্ণকৃপার লোভ, মহাপ্রভুর কৃপার লোভ আমায় হাতছানি দিয়ে বাইরে টেনে এনেছে। কিন্তু বৃন্দাবনধামে এসেও ভজনের প্রকৃত পথ খুঁজে পাচ্ছিনে, পাষাণে বার বার মাথা কুটে মরছি। গুরু কৃপা না হলে তো মহাপ্রভুর কৃপা, ইষ্টের কৃপা মিলবে না। আপনার চরণেই নিজেকে উৎসর্গ ক'রে আমি অপেক্ষা ক'রে আছি। আপনি যদি নির্দয় হন, এ ছার দেহ তবে বৃন্দাবনের রজেই দেবো বিসর্জন।"

গোস্বামী লোকনাথের অন্তর বিগলিত হইয়াছে, নয়ন হইয়াছে করুণার্দ্র। মৃদুস্বরে আপন মনে কহিলেন, "নরোত্তম, আমি বুঝেছি, তুমি মহাপ্রভুর আপন জন, তাঁর কৃপার অধিকারী। তাঁর পবিত্র কর্মের চিহ্নিত পুরুষ তুমি। কিন্তু বৎস, নিজের প্রতিজ্ঞা আমি নিজে কি ক'রে ভাঙি। একি কঠিন পরীক্ষায় কৃষ্ণ আমায় ফেলেছেন।"

লোকনাথের চরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম নিবেদন করিলেন নরোত্তম

তারপর একটি, গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া নতশিরে ধীরপদে সেখান হইতে চলিয়া গেলেন।

পরের দিনই কিন্তু দেখা গেল, নরোত্তমের অমানুষী আর্তির ফল ফলিয়াছে। নিত্যকার কুঞ্জ পরিক্রমা সমাপণ করিয়া তিনি নিজের ভজন-কুটিরে ফিরিতেছেন এমন সময়ে লোকনাথ তাঁহাকে নিকটে আহ্বান করিলেন। গোস্বামী প্রভুর চোখে মুখে প্রসন্নতার আভা। নরোত্তম নূতন আশায় বুক বাঁধিলেন, অনুভব করিলেন, হিমালয়ের হিমবাহ ধীরে ধীরে গলিতে শুরু করিয়াছে, শতধারে এবার উহা ঝরিয়া পড়িবে প্রাণদায়িনী ঝর্ণারূপে।

অতঃপর লোকনাথ নরোত্তমকে একদিন তাঁহার ভজনকুঞ্জে ডাকাইয়া আনেন। বলেন, "বৎস, কয়েকটা শপথ তোমায় নিতে হবে আমার কাছে। আজ হতে ভোগবিলাসের কোন সম্পর্ক রাখবে না, এমনকি চিন্তায়ও তার স্থান দেবে না। আর আজীবন থাকতে হবে তোমায় ব্রহ্মচারী হয়ে।"

বৈরাগ্য সাধনার সকল কঠোর পথই যে লোকনাথ একান্তভাবে অনুসরণ করিয়া চলিয়াছেন। এ শপথ উচ্চারণে তাই এক মুহূর্ত বিলম্ব করিলেন না।

লোকনাথ করুণাভরা কণ্ঠে কহিলেন, "নরোত্তম, বৎস, তুমি নরোত্তমই বটে। তোমার মত যোগ্য শিষ্যকে উপলক্ষ্য ক'রেই কৃষ্ণ আমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করালেন। আমি তোমায় দীক্ষা দেব। আগামী শ্রাবণী পূর্ণিমার তিথিতে তুমি পাবে তোমার ইষ্টমন্ত্র।"

নরোত্তম আনন্দে আত্মহারা, সাশ্রুনয়নে তৎক্ষণাৎ লুটাইয়া পড়েন লোকনাথের চরণে। তারপর এই সুসংবাদ জানানোর জন্য বাহির হইয়া পড়েন শ্রীজীব ও অন্যান্য বৈষ্ণব সাধকদের ভজন-কুটিরের দিকে।

বহু আকাঙ্ক্ষিত দীক্ষা লাভ করিলেন নরোত্তম। এবার সোৎসাহে রত হইলেন সদগুরুর সর্বাত্মক সেবায়। এই সঙ্গে গুরুর উপদেশ

নিয়া নিগূঢ় অন্তরঙ্গ প্রেমসাধনার ক্রমগুলি তিনি অতিক্রম করিতে লাগিলেন।

নরোত্তম বিশ্বাস করিতেন গুরুর অর্জিত সাধনা ও সিদ্ধির উত্তরাধিকারী হইতে হইলে চাই সেবা পরিচর্যার মাধ্যমে গুরুর সহিত একাত্মতা গড়িয়া তোলা। আত্মিক সাধনার এই মূল সূত্রটি ধরিয়া, আপ্রাণ চেষ্টায় এখন হইতে তিনি অগ্রসর হইতে থাকেন। নরোত্তমের এই গুরু সেবা ও গুরু পরিচর্যার কাহিনী সারা ব্রজমণ্ডলের গল্পকাহিনীর বস্তু হইয়া উঠে।

শিষ্য নরোত্তম এক বিরাট শুদ্ধসত্ত্ব আধার, আর গুরু লোকনাথ গোস্বামীও ব্রজরসের সিদ্ধ মহাত্মা, তদুপরি দিব্য করুণা ধারার বিরাট উৎস তিনি। গুরুর কৃপা তাই একবার ঝরিয়া পড়িল অঝোরধারে। যে নিগূঢ় ব্রজরস সাধনার পদ্ধতি নিজে অনুসরণ করিয়া লোকনাথ সিদ্ধ হইয়াছিলেন, সযত্নে যথাযথভাবে তাহাই শিখাইয়া দিলেন তাঁহার একমাত্র শিষ্যকে।

নরোত্তম আর নর রহিলেন না, তপস্যার বলে আর গুরুর কৃপা বলে হইয়া উঠিলেন দেব-মানব। বৃন্দাবনের পথেঘাটে দেব-দেউলে তাঁহার তপঃসিদ্ধ, আনন্দঘন মূর্তিটি যে একবার দর্শন করিত সেই শির নত করিত সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধা সহকারে।

শ্রীজীব গোস্বামী নরোত্তমকে পূর্ব হইতেই অশেষভাবে স্নেহ করিয়া আসিতেছেন। লোকনাথের নিকট হইতে কৃপাদীক্ষা প্রাপ্তির পর নরোত্তম যে নিগূঢ় ব্রজরস সাধনায় পারঙ্গম হইয়াছে, ইহা তাঁহার দৃষ্টি এড়ায় নাই। গোস্বামী এবং সিদ্ধ মহাত্মাদের মহলে শ্রীজীব প্রস্তাব তুলিলেন, সিদ্ধ সাধক নরোত্তমকে দান করা হোক 'ঠাকুর' উপাধি। অতঃপর গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজে যাহাতে তিনি গুরু স্থানীয় সাধক পুরুষরূপে সম্মান প্রাপ্ত হন, এই জন্যই তাঁহার এই প্রস্তাব। সানন্দে সকলেই ইহাতে সম্মতি দিলেন এবং এখন হইতে সাধু নরোত্তম হইলেন—নরোত্তম ঠাকুর। বৃন্দাবনে এসময়ে ঠাকুর বলিতে লোকে বুঝিত বরেণ্য বৈষ্ণব সাধক নরোত্তমকে। নরোত্তমের

এই স্বীকৃতি ও মর্যাদার ভিতর দিয়া সাধক-সমাজে বিশেষভাবে ফুটিয়া উঠিল সিদ্ধ মহাত্মা লোকনাথ গোস্বামীর অবদানের প্রকৃত মাহাত্ম্য।

"লোকনাথ ক্রমে জরাগ্রস্ত এবং স্থবির হইয়া পড়িতেছিলেন; পূজার্চনার সকল রীতি রক্ষা করিতে পারেন না, জপ সংখ্যাও প্রত্যহ পূর্ণ হয় না। তবুও তিনি স্বাবলম্বনের পূর্ণ মূর্তি, কাহারও অপেক্ষা করিতে চাহিতেন না। নরোত্তম যে এত সেবা করিতেন, তবুও তিনি পরবশ হইলেন না। নরোত্তমের যখন গৃহে ফিরিবার ব্যবস্থা হইল তিনি তাহাকে অম্লান বদনে অনুমতি দিলেন, অথচ দ্বিতীয় শিষ্য গ্রহণ করিলেন না। নরোত্তমই তাঁহার একমাত্র শিষ্য।

লোকনাথের আর একটি বিশেষত্ব ছিল। তিনি আপনার কথা কাহাকেও কিছু বলিতেন না। কোনো প্রকারে কেহ তাঁহার কোনো গুণগাথা গায় তাহা তিনি পছন্দ করিতেন না। তিনি নিজে কোনো শাস্ত্রগ্রন্থ লিখেন নাই, অথচ রূপ, সনাতন ও গোপাল ভট্ট প্রভৃতি গোস্বামিগণের সাধনতত্ত্বের অনেক সারাংশ তাঁহার নিকট হইতেই গৃহীত।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ যখন বৃন্দাবনের সকল ভক্তগণের উপদেশ ও আনুকূল্যে তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত রচনা করিতে-ছিলেন, তখন লোকনাথও তাঁহাকে অনেক সাহায্য করেন, কিন্তু গ্রন্থ মধ্যে তাঁহার নিজের কোনো প্রসঙ্গ উল্লেখ করিতে তিনি বারংবার নিষেধ করিয়াছিলেন। এজন্য সেই বিরাট গ্রন্থে সে যুগের বহু কথা, বহু ঘটনা চোখের জলের কালিতে লিখিত হইয়াছিল, তাহার মধ্যে লোকনাথের কোনো কথা নাই। সে-যুগে এমন আত্মগোপন গোপাল ভট্ট ব্যতীত গোস্বামীপাদদিগের মধ্যেও আর কেহ করেন নাই। লোকনাথ গোস্বামীর জীবদ্দশায় কোনো লেখক তাঁহার কোনো কথা কোনো গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিতে সাহস করেন নাই। এই জন্যই লোকনাথ চরিত্রের অনেক তথ্য মনুষ্য নেত্রের

পথবর্তী হইবার অবসর পাইতেছে না। লোকনাথের মতো নিস্পৃহ, সর্বত্যাগী মহাপুরুষ অতি বিরল[১]।”

বৃন্দাবনে গোস্বামীদের প্রতিভা, উৎসাহ ও কর্মনিষ্ঠার ফলে বহুতর বৈষ্ণব শাস্ত্র রচিত ও সংগৃহীত হইয়াছে। শ্রীজীব গোস্বামী ও অন্যান্য উচ্চকোটির সাধুরা স্থির করিয়াছেন এই অমূল্য শাস্ত্র সম্পদ গৌড়ে পাঠানো হইবে। ইহার দায়িত্বভার গ্রহণ করিবেন শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দ, শ্রীজীবের তিন প্রতিভাধর ছাত্র। ইঁহাদের জন্য ব্যবস্থা করা হইবে উপযুক্ত যানবাহন ও রক্ষীদল।

লোকনাথ গোস্বামীর বয়স তখন প্রায় একশত বৎসর। বৃন্দাবনের প্রাচীনতম সিদ্ধপুরুষ তিনি। তাঁহার কুঞ্জে আসিয়া শ্রীজীব তাঁহার প্রস্তাব উপস্থাপিত করিলেন। কহিলেন, “শ্রীনিবাস ও শ্যামানন্দের সঙ্গে নরোত্তমকেও আমরা গৌড়ে পাঠাতে চাই। এদের মতো কঠোরতপা ভক্ত সাধকই বৈষ্ণব শাস্ত্র এবং বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারে সমর্থ। মহাপ্রভুর আরব্ধ আজ সম্পন্ন করার জন্য এদের গৌড়ে যাওয়া প্রয়োজন।”

গোস্বামী লোকনাথ সোৎসাহে সমর্থন করিলেন এই প্রস্তাব। কহিলেন, “শ্রীজীব, তোমাদের এই ব্যবস্থাপনায় মহাপ্রভুর কর্ম সিদ্ধ হবে, জীবের কল্যাণ সাধিত হবে। এতো অতি আনন্দের সংবাদ। নরোত্তমকে গৌড়ে যাবার অনুমতি অবশ্যই আমি দেবো।”

বিদায়কালে প্রাণপ্রিয় শিষ্যকে লোকনাথ গোস্বামী কহিলেন, “বৎস নরোত্তম, আমি প্রাণভরে আশীর্বাদ করি, তোমার এই নূতন ব্রত সুসম্পন্ন হোক। তুমি আমার একমাত্র শিষ্য, সার্থকনামা শিষ্য। যখন যেখানে থাকো, বিষয় সংস্পর্শ সম্পূর্ণরূপে বর্জন ক'রে, তা থেকে দূরে থাকবে। ভজনানন্দে ও অষ্টপ্রহরীয় লীলা অনুধ্যানে করবে দিন যাপন।”

আসন্ন বিচ্ছেদের কথা স্মরণ করিয়া নরোত্তম শোকাকুল হইয়া উঠিয়াছেন, কপোল বাহিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িতেছে। তাঁহাকে

১ লোকনাথ গোস্বামী : সতীশচন্দ্র মিত্র

প্রবোধ দিয়া লোকনাথ আবার কহিলেন, "বৎস, তোমায় আমি শিষ্য করেছি, নিজের দীর্ঘ দিনের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ ক'রে। আমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়েছে তোমার ভক্তি ও পুণ্যের বলে। আজ আমি তোমার কৃতবিদ্যতা ও সাধনোজ্জ্বলা বুদ্ধি দেখে পরম সন্তুষ্ট। যে কয়দিন বেঁচে আছি, আর কাউকে আমি শিষ্য করবো না। আমার শিক্ষা দীক্ষা ও সাধনের প্রদীপকে একলাটি তুমিই রাখবে জ্বালিয়ে।"

জোড়হস্তে কাতরকণ্ঠে নরোত্তম বলেন, "প্রভু, আশীর্বাদ করুন, গৌড়ের কর্মব্রতের ফাঁকে ফাঁকে এ অধম যেন আপনার চরণ দর্শন ক'রে যেতে পারে।"

"না বৎস," সুস্পষ্ট ভাষায় বলেন লোকনাথ গোস্বামী, "তোমার আর বৃন্দাবনধামে আসবার প্রয়োজন নেই। তোমার আমার এই শেষ দেখা।"

গুরুগত প্রাণ ভক্ত নরোত্তমের মাথায় যেন বজ্রাঘাত হয়। তৎক্ষণাৎ মূর্ছিত হইয়া তিনি ভূমিতলে পতিত হন।

কিছুকাল পরে বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিলে গুরুদেবের চরণে প্রণিপাত করিয়া ভিক্ষা মাগেন তাঁহার পাদুকা দুইটি। এই পাদুকা শিরে ধারণ করিয়া নিষ্ক্রান্ত হন বৃন্দাবন হইতে।

অতঃপর তপঃসিদ্ধ মহাপুরুষ লোকনাথ গোস্বামী আর বেশী দিন জীবিত থাকেন নাই। আনুমানিক ১৫৮৮ খ্রীষ্টাব্দে নির্ধারিত চিরবিদায়ের ক্ষণটি আসিয়া যায়। ইষ্টদেব শ্রীরাধাবিনোদের বিজয়-মূর্তির দিকে সজল নয়নদুটি নিবদ্ধ করিয়া নরলীলায় ছেদ টানিয়া দেন চিরতরে। বৃন্দাবনের নব উজ্জীবনের জন্য যে প্রথম আলোক-বর্তিকাটি প্রভু শ্রীচৈতন্য স্বহস্তে জ্বালাইয়া দিয়াছিলেন, সেদিন তাহা নির্বাপিত হইয়া যায়।

রূপ গোস্বামী

শ্রাবণ মাসের বর্ষণ-জর্জর নিশীথ রাত্রি। ঝুপ্ ঝুপ করিয়া অঝোর-ধারে বৃষ্টি পড়িতেছে, সেই সঙ্গে রহিয়াছে উদ্দাম ঝড়ের হাওয়া। এই দুর্যোগের রাত্রে রামকেলি হইতে একটি তাঞ্জাম চলিয়াছে গৌড় শহরের দিকে। পথঘাট পিচ্ছিল, বাহকেরা খুব সতর্কপদে চলিতেছে।

তাঞ্জামের ভিতরে চিন্তিত মনে বসিয়া আছেন সন্তোষ দেব, সুলতান হুসেন শাহের রাজস্ব বিভাগের অধিকর্তা। সুলতানের জরুরী তলব আসিয়াছে তাড়াতাড়ি হাজির হওয়ার জন্য। তাই ভরা বর্ষার এই মধ্য রাত্রেই এভাবে তাঁহাকে ছুটিতে হইয়াছে।

হঠাৎ অসময়ে কেন এই তলব? দপ্তরের কোনো গোলযোগ? বড় ধরনের কোনো তহবিল তছরুপ? না সুলতান গোপনে কোনো সামরিক অভিযানে যাইতেছেন, এজন্য কোষাগার খোলার জন্য অধিকর্তাকে এমন তাড়াতাড়ি ডাকিয়া নেওয়া? জরির কিংখাবে মোড়া তাঞ্জামের ভিতরে, তাকিয়া হেলান দিয়া বসিয়া আছেন সন্তোষ দেব। গড়গড়ার নলটি মুখে বসানো। চিন্তিত মনে মাঝে মাঝে সেটি টানিয়া চলিয়াছেন, বাদশাহী অম্বুরি তামাকের ধোঁয়া ও সুবাস ছড়াইতেছে চারিদিকে।

ঘন অন্ধকারময় রাজপথ হঠাৎ প্রদীপ্ত হইয়া উঠে বজ্র বিদ্যুতের আলোকে। একটা প্রকাণ্ড বৃক্ষ ঝড়ে ভাঙিয়া পড়িয়াছে, আড়াআড়ি ভাবে পতিত হওয়ায় রাস্তাটি প্রায় বন্ধ। পথ চলিবার উপায় নাই। রাজপথের একপাশে সারি সারি পর্ণকুটির, রজকেরা এগুলিতে বাস করে। রাজপুরীর কাজকর্ম করিয়া সংসার চালায়।

রাজপথ বন্ধ, তাই বাহকেরা তাঞ্জামটি নিয়া একটি পর্ণকুটিরের ছাঁচতলা ঘেঁষিয়া ধীরপদে চলিতেছে, বর্ষণের ফলে সেখানে তখন

জমিয়া গিয়াছে হাঁটুজল, জল ঠেলিয়াই ধীরে ধীরে বাহকদের চলিতে হইতেছে।

তাঞ্জামে উপবিষ্ট অবস্থায় সন্তোষদেবের কানে পৌঁছিল পর্ণ-কুটিরের ভেতরকার আওয়াজ। গভীর রাত্রে এমন ঘোর বর্ষায়, কে পথ চলিয়াছে তাহা নিয়া চলিয়াছে ধোপা ও ধোপানীর কথাবার্তা।

পুরুষ কণ্ঠের প্রশ্ন, "অন্ধকারে, সপ্‌সপ্‌ শব্দে হাঁটুজল ঠেলে কে যাচ্ছে, কে জানে ?

নারীকণ্ঠের মন্তব্য শোনা যায়, "কে আর হবে ? হয় কুকুর, বা চোর। নয়তো রাজার কোনো গোলাম। এ ঘোর দুর্যোগে আর কেউ তো বেরুবে না।"

"না গো, কুকুর নয়, চোরও নয়। কয়েকটা মানুষের পায়ের জল-ঠেলা শব্দ পাচ্ছি। হয়তো কোনো হতভাগা রাজকর্মচারী রক্ষীদল নিয়ে পথ চলেছে জরুরী তলব পেয়ে।"

তাঞ্জামের ভিতর অর্ধশায়িত ছিলেন সন্তোষদেব, ক্ষিপ্রভাবে তিনি উঠিয়া বসেন। দম্পতির কথাগুলি যেন তাঁহাকে দংশন করে বৃশ্চিকের মতো। কুকুর বা তস্কর বা রাজার গোলাম। একই পর্যায়ভুক্ত এসব। দরিদ্র নিরক্ষর দম্পতির কথা বটে, স্থূল ধরনের মন্তব্য বটে, কিন্তু কথাগুলি তো মোটামুটিভাবে অসত্য নয়। রাজার গোলামী হলেও, এ গোলামী ঘৃণ্য, অসহ্য। সোনার খাঁচা বা লোহার খাঁচা, বন্দী পাখির জীবনে একই দুর্ভাগ্য বহন করিয়া আনে।

ক্ষুণ্ণ মনে নিজের সমগ্র জীবনের দিকে দৃষ্টিপাত করেন সন্তোষ-দেব। বিষয় বৈভব যথেষ্ট অর্জন করিয়াছেন, রাজ সরকারে প্রচুর সম্মান। সুলতানের অনুগৃহীত বলিয়া দেশের সবাই সমীহ করে, সম্ভ্রম দেখায়। কিন্তু এই মান-ঐশ্বর্যময় জীবন এখনও তো দাসত্বের শৃঙ্খলে বাঁধা। মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় দীর্ঘ দিন জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিয়াছেন। কিন্তু আজো তাহা করায়ত্ত হয় নাই। এই ব্যর্থ জীবন, বন্ধ্যা জীবন, আজ সত্যই তাঁহার পক্ষে বড় দুর্বহ। নাঃ আর নয়, এবার রাজ-প্রশাসনের উচ্চপদ ছাড়িয়া, বিত্তবিষয় সবকিছু বিলাইয়া দিয়া

বাহির হইবেন মুমুক্ষার পথে। ইষ্টদর্শনের জন্য, কৃষ্ণলাভের জন্য করিবেন মরণ পণ।

সেদিনকার এই উদ্দীপনা ও আর্তি সন্তোষদেবের জীবনে ঘটায় রূপান্তর। রাজানুগ্রহ ও রাজসেবা চিরতরে তিনি ত্যাগ করেন, কৃষ্ণ-সেবায় সমগ্র জীবন করেন নিয়োজিত। সারা ভারতের এক শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব নেতারূপে, মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের অন্যতম প্রধান পার্ষদরূপে তিনি কীর্তিত হইয়া উঠেন, পরিগ্রহ করেন প্রভুর প্রদত্ত রূপ গোস্বামী নাম। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের অন্যতম অধিনায়ক রূপে বৃন্দাবনে যে ভূমিকা তিনি গ্রহণ করেন আজো তাহা অবিস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে।

রূপ গোস্বামীর পূর্বপুরুষ ছিলেন দাক্ষিণাত্যের বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। এক সময়ে কর্ণাটের কোনো অঞ্চলে ইঁহারা রাজত্ব করিতেন। পরবর্তীকালে ইঁহাদের একটি অধস্তন পুরুষ গৌড়ে আসিয়া রাজ সরকারে কর্ম গ্রহণ করেন এবং স্থায়ীভাবে গৌড়েই বসবাস করিতে থাকেন।

এই বংশের মুকুন্দদেব ছিলেন গৌড়ের বাদশাহের এক সুদক্ষ ও আস্থাভাজন উচ্চ কর্মচারী। ইঁহার পুত্রের নাম কুমারদেব। শাস্ত্র-বিদ্ বৈষ্ণব বলিয়া তাঁহার খ্যাতি ছিল। কুমারদেব তিনটি নাবালক পুত্র রাখিয়া অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন। পিতামহ মুকুন্দদেবকে গ্রহণ করিতে হয় তিন পৌত্র, অমর, সন্তোষ ও বল্লভকে মানুষ করার দায়িত্বের ভার।

অমর সন্তোষ ও বল্লভ উত্তরকালে প্রভু শ্রীচৈতন্যের কৃপা ও আশ্রয় লাভ করেন এবং প্রভু তাঁহাদের নূতন নামকরণ করেন, যথাক্রমে—সনাতন, রূপ ও অনুপম। অনুপম তাঁহার একমাত্র পুত্র শ্রীজীবকে রাখিয়া অকালে ইহলোক ত্যাগ করেন। আর উত্তরকালে সনাতন ও রূপের অভ্যুদয় ঘটে শ্রীচৈতন্যের অন্তরঙ্গ পার্ষদরূপে, বৃন্দাবনের ভক্তি সাম্রাজ্যের নিয়ন্তারূপে।

পিতামহ মুকুন্দদেব সনাতন ও রূপের শিক্ষার সুবন্দোবস্ত করিতে কোনো ত্রুটি করেন নাই। রামকেলিতে রামভদ্র বাণী-বিলাসের নিকট তাঁহারা ব্যাকরণ পাঠ সমাপ্ত করেন। তারপর তাঁহাদের নবদ্বীপে পাঠানো হয়, সেখানে রত্নাকর বিদ্যাবাচস্পতি এবং বাসুদেব সার্বভৌমের নিকট অধ্যয়ন করেন উচ্চতর শাস্ত্র।

মুকুন্দদেব বিচক্ষণ ব্যক্তি। বুঝিলেন, শুধু শাস্ত্রবিদ্যায় রাজ-সরকারে উচ্চপদ মিলিবে না, এজন্য চাই ফার্সী ও আরবী ভাষার শিক্ষা। সপ্তগ্রামের শাসক সৈয়দ ফকরুদ্দীন মুকুন্দদেবের বন্ধু, ফার্সী ও আরবীতে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। তাঁহার তত্ত্বাবধানে থাকিয়া উভয় ভ্রাতা ঐ ভাষা দুইটি যত্ন সহকারে অধ্যয়ন করিলেন। অল্প সময়ের মধ্যে ব্যুৎপন্ন হইয়াও উঠিলেন।

দরবারে পিতামহের প্রতিপত্তি ছিল, তাই অল্পবয়সে সনাতন রাজকার্যে ঢুকিয়া পড়িলেন। প্রখর বুদ্ধি, প্রতিভা ও কর্মকুশলতার গুণে অধিকার করিলেন মুখ্য সচিবের পদ। ছোটভাই রূপকে তিনি ঢুকাইয়া দিয়াছিলেন রাজস্ব বিভাগে, বিদ্যাবুদ্ধি ও পরিচালন দক্ষতায় অল্পসময়ে তিনি সুলতানের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন, উন্নীত হইলেন রাজস্ব অধিকর্তার উচ্চপদে।

গৌড়ের সন্নিহিত গ্রাম রামকেলিতে উভয় ভ্রাতা বাস করিতেন। পদমর্যাদা, বিত্ত এবং শিক্ষাদীক্ষার দিক দিয়া তাঁহারা অগ্রণী। ধর্ম এবং সমাজের নেতৃত্বও ছিল তাঁহাদেরই করায়ত্ত। রামকেলিতে তাঁহাদের ভবনে প্রায়ই আগমন ঘটিত শাস্ত্রবিদ্ ব্রাহ্মণদের, ধর্মীয় আলোচনা ও বিচার অনুষ্ঠিত হইত সোৎসাহে। রূপ ও সনাতনের বিদ্যা ও বৈদগ্ধ্য সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। ব্রাহ্মণ এবং সাধু সজ্জনের ভিড় লাগিয়াই থাকিত তাঁহাদের গৃহে, আদর আপ্যায়ন দানধ্যানে রূপ ও সনাতন সকলের সন্তোষ বিধান করিতেন।

রামকেলির এই পরিবেশ হইতে বাহির হইলেই দেখা যাইত রূপ সনাতনের আর এক রূপ। সেখানে তাঁহারা গৌড়ের বাদশাহের আস্থাভাজন ও অতি অন্তরঙ্গ উচ্চ কর্মচারী। দরবারের মুসলিম

পরিবেশের রূপান্তরিত মানুষ তাঁহারা। চোগা চাপকান সমন্বিত পোষাক, আরবী ফার্সী বুলির চমৎকারিতা, এবং মুসলমানী আদপ কায়দা দেখিয়া বুঝিবার উপায় নাই যে তাঁহারা নিষ্ঠাবান্ হিন্দু এবং সনাতন ধর্মের ধারক ও বাহক।

বৈষ্ণবীয় সংস্কার পূর্ব হইতেই বর্তমান ছিল রূপ ও সনাতনের বংশে। এবার উভয় ভ্রাতার মধ্যে এই সংস্কার ধীরে ধীরে প্রবল হইয়া উঠে। প্রেমভক্তির রসধারায় অন্তর অভিসিঞ্চিত হয়, কৃষ্ণকৃপা ও কৃষ্ণপ্রাপ্তির জন্য প্রাণমন হয় অধীর চঞ্চল। মুক্তির আকুতি আর বিষয় বৈরাগ্য ক্রমে দুর্বার হইয়া উঠে।

সারা গৌড়দেশে তখন নবদ্বীপের চাঞ্চল্যকর সংবাদ ছড়াইয়া পড়িয়াছে। শ্রীচৈতন্যের অভ্যুদয়ের কথা, প্রেমভক্তি ধর্মের নবতন আন্দোলনের কথা, অন্যান্য স্থানের মতো রামকেলিতেও আলোচিত হইতেছে। ভক্ত মানুষ, মুক্তিকামী মানুষ, নূতনতর আবেগ আর নূতনতর আশায় অধীর হইয়া উঠিয়াছে।

সনাতন ও রূপ এসময়ে প্রভু শ্রীচৈতন্যের চরণাশ্রয় চাহিয়া পত্র দিলেন। প্রভু জানাইলেন, এখন নয়, আরো কিছুদিন তোমরা অপেক্ষা কর।

অতঃপর সন্ন্যাস গ্রহণের পর প্রভু নিজেই একদিন বৃন্দাবন গমনের ছলে রামকেলিতে আসিয়া উপস্থিত। রূপ ও সনাতন ছুটিয়া গেলেন তাঁহার পদপ্রান্তে, সংসার ত্যাগের জন্য উভয়ে অস্থির হইয়া পড়িয়াছেন। এবারও প্রভু বাধা দিলেন, কহিলেন, আরো কিছুকাল ধৈর্য ধারণ কর।

প্রভুর সেদিনকার দিব্য দর্শন ও আশীর্বাদ লাভের পর হইতেই বিষয় বিতৃষ্ণায় দুই ভ্রাতার মন ভরিয়া উঠিয়াছে। অতঃপর কি করিয়া নিগড় কাটিয়া ফেলিয়া মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলিবেন, এই চিন্তাই কেবল করিতেছেন।

মনের এই নির্বিন্ন অবস্থায় সেদিনকার দুর্যোগময় রাত্রে রূপের সর্বসত্তায় এক প্রচণ্ড নাড়া পড়িয়া গেল। সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া

ফেলিলেন,—চিরতরে করিবেন গৃহত্যাগ। প্রভু শ্রীচৈতন্তের পদাশ্রয় গ্রহণ করিয়া হইবেন কান্থা করঙ্গধারী বৈষ্ণব, অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করিবেন কৃষ্ণভজনে।

রূপ এবং সনাতন দুই ভ্রাতা নিতান্ত আকস্মিকভাবে রাজ-ঐশ্বর্য ত্যাগ করিয়া বৈরাগী হন নাই এবং মন্ত্রবলে প্রেমভক্তি রসের রহস্য জ্ঞাত হন নাই। এজন্য সংসার জীবনে, উচ্চ রাজপদে থাকার কালে দীর্ঘ প্রস্তুতির মধ্য দিয়া তাঁহাদের চলিতে হইয়াছে। এ প্রস্তুতির মূল্য নিরূপণ না করিলে তাঁহাদের ত্যাগপূত জীবনের মূল রহস্যের সন্ধান পাওয়া যাইবে না। ভক্তি রত্নাকর বলিতেছেন :

সদা সর্বশাস্ত্র চর্চা করে দুইজন।
অনায়াসে করে দোহে খণ্ডন স্থাপন॥
ন্যায়সূত্র ব্যাখ্যা নিজকৃত যে করয়।
সনাতন রূপ শুনিলে সে দৃঢ় হয়॥

গবেষক ও ইতিহাসকার সতীশচন্দ্র মিত্র সনাতন ও রূপের শাস্ত্রচর্চার চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন :

শুধু নিজেরা দুইজনে তর্ক করিয়া কোনো মত খণ্ডন বা নূতন মত স্থাপন করিতেন, তাহা নহে, অন্য পণ্ডিতেরাও কেহ ন্যায়শাস্ত্রের কোনো নূতন ব্যাখ্যা করিলে তাহা উভয় ভ্রাতাকে জানাইয়া এবং অনুমোদিত করিয়া না লইলে কাহারও চিত্ত স্থির হইত না। এইভাবে উচ্চ রাজকার্য হইতে যেটুকু অবসর মিলিত, ভ্রাতৃদ্বয় তাহা শাস্ত্র-চর্চায় অতিবাহিত করিতেন। সনাতনের গুরুদেব বিদ্যা-বাচস্পতি মহাশয় সাধারণত নবদ্বীপ-সংলগ্ন বিদ্যানগরে বাস করিতেন। যখন তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা পুরীতে এবং পিতা কাশীতে যান, তখন তিনি সময় সময় দীর্ঘকাল গৌড়ে আশ্রয় লইতেন। দূরদেশ হইতে যে সব শাস্ত্রদর্শী পণ্ডিত সুব্রাহ্মণ আসিতেন, রাজাজ্ঞাতেই আসুন বা সনাতনের আহ্বানেই আসুন, দুই ভ্রাতা পরম যত্নে রামকেলির বাড়িতে তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিতেন এবং সশ্রদ্ধ আপ্যায়নে সকলকে পরিতুষ্ট করিতেন। এজন্য তাঁহারা

অজস্র অর্থব্যয়ে কখনো কুণ্ঠিত হইতেন না। রামকেলিতে চতুষ্পাঠী বসিয়াছিল, সংস্কৃত শাস্ত্রের পঠনপাঠন হইত। তাঁহারা সে সকল অনুষ্ঠানের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এইরূপ নানাভাবে রামকেলিতে বহু ব্রাহ্মণ আসিতেন, সুদূর কর্ণাটদেশ হইতেও তাঁহাদের নিজ সম্প্রদায়ভুক্ত বৈদিক ব্রাহ্মণেরা আসিতেন। সুগন্ধ কুসুম ফুটিলে তাহার সৌরভামোদে চারিদিক হইতে ভৃঙ্গকুল আসিয়া থাকে, তেমনি তাঁহাদেরও যশ সর্বত্র বিকীর্ণ হইয়াছিল। সমাগত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের অনেকেরই জন্য তাঁহারা বাসস্থানের ব্যবস্থা করিয়া দিয়েছিলেন।

"কর্ণাট দেশাদি হইতে আইলা বিপ্রগণ॥
সনাতন রূপ নিজ দেশস্থ ব্রাহ্মণে।
বাসস্থান দিলা সবে গঙ্গা সন্নিধানে॥
ভট্টগোষ্ঠী বাসে 'ভট্টবাটী' নামে গ্রাম।
সকলে শাস্ত্রজ্ঞ, সর্বমতে অনুপম॥"

কলিকাতার নিকটবর্তী আধুনিক ভট্টপল্লী বা ভাটপাড়ার মত রামকেলির পার্শ্বে ভাগীরথী তীরেও আর একটি ভট্টবাটী গ্রাম হইয়াছিল; এখন তাহার চিহ্ন পর্যন্ত নাই।

তাঁহারা যে অবসরকালে কেবল শাস্ত্রচর্চা লইয়াই থাকিতেন, তাহা নহে, ধর্ম সাধনায়ও তাঁহারা পশ্চাদ্‌পদ ছিলেন না। একদিনেই মানুষ নূতন করিয়া গড়িয়া উঠে না। সকল প্রতিভারই উন্মেষ পূর্ব জীবনে হইয়া থাকে। যদি কেহ ভাবিয়া থাকেন, মুসলমান নৃপতির কর্মচারী রূপ সনাতন বৃন্দাবনে গিয়া একদিনেই অসাধারণ পণ্ডিত ও ভক্তচূড়ামণি হইয়াছিলেন, তাহা মিথ্যা কথা। উভয় ভ্রাতা অসাধারণ পণ্ডিত পূর্ব হইতেই ছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের ভক্তির উন্মেষ কর্মজীবনেই হইয়াছিল, নতুবা তাঁহাদিগকে দেখিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নীলাচল হইতে ছুটিয়া রামকেলিতে আসিতেন না। উভয় ভ্রাতা অতি ভক্তিনিষ্ঠার সহিত শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন করিতেন এবং বৃন্দাবনলীলার অনুষ্ঠানও প্রায়শ করিতেন।

বৃন্দাবনলীলার বহু বিগ্রহ রামকেলি গ্রামের নানাস্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, এজন্য ঐ গ্রামের অন্য নাম, কৃষ্ণকেলি। রামকেলিতে তাঁহাদের আবাস বাটীর চারিধারে শ্যামকুণ্ড, রাধা কুণ্ড, বিশাখা কুণ্ড —এই নামে কতকগুলো সরোবর রহিয়াছে। তাহাদের সাধনভজন সম্বন্ধে ভক্তিরত্নাকরে আছে—

বাড়ীর নিকটে অতি নিভৃত স্থানেতে।
কদম্বকানন রাধাশ্যাম কুণ্ড তা'তে॥
বৃন্দাবনলীলা তথা করয়ে চিন্তন।
না ধরে ধৈরয নেত্রে ধারা অনুক্ষণ॥

এখানেও তাঁহারা বিগ্রহ সেবা করিতেন, এখানেও তাঁহারা সাধুসঙ্গ ও সাধুসেবা করিতেন। সময়ে সময়ে তাহা করিতে না পারিয়া বিরক্ত ও বিষণ্ণ হইতেন। বিষয়ী রাজার সেবা এবং রাজকার্য পরিচালনা করিতে গিয়া যখন পদে পদে তাঁহাদের অনুকূল পথের অন্তরায় উপস্থিত হইত, তখন তাঁহারা অবিরত অনুতাপানলে দগ্ধ হইতেন, উহাতেই তাঁহাদের বৈরাগ্যের পথ উন্মুক্ত করিয়াছিল।

রূপ এবং সনাতন দুই ভাইয়েরই প্রতিভার বিকাশ দেখা দিয়াছিল তাঁহাদের যৌবন উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে। এই সঙ্গে মিলিত হইয়াছিল সংস্কৃত শাস্ত্র এবং আরবী ফার্সী-সাহিত্যের পারদর্শিতা। তারপর উভয়ে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিলেন নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য নিয়া। "দর্শনশাস্ত্রে সনাতনের এবং কাব্য ব্যাকরণাদিতে রূপের কিছু বিশেষ অধিকার ছিল। যৌবনেই লোকের কবিত্বের উন্মেষ হয়, রূপেরও তাহা হইয়াছিল। তিনি গৌড়ে থাকিতেই তাঁহার দুইখানি কাব্য হংসদূত ও উদ্ধব-সন্দেশ রচনা করেন। অগ্রজ অপেক্ষা রূপ বোধহয় পারসীক ভাষায় অধিকতর পারদর্শিতা লাভ করিয়া ছিলেন। তাঁহার কাব্যানুরক্তির ইহাও অন্যতম কারণ। তাঁহার ভাষার মধ্যে যে কোমল কাব্যকলার মধুর নিক্কণ অনুভূত হয়,

তাহাতে পারস্য সাহিত্যের ঋণ অস্বীকার করা যায় না। তরুণ বয়সে সপ্তগ্রামে থাকিয়া উভয় ভ্রাতায় তথাকার প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও শাসনকর্তা, সৈয়দ ফকরউদ্দীনের নিকট থাকিয়া পারসীক ভাষা শিক্ষা করেন।

"সনাতনের বিদ্যাবুদ্ধি ও কার্যদক্ষতায় মুগ্ধ হইয়া সুলতান হুসেন শাহ তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা রূপকে রাজস্ব বিভাগে উচ্চ পদ প্রদান করেন। ঐ বিভাগের কার্যে যেরূপ সূক্ষ্ম সন্ধান, কার্যকুশলতা এবং লোকপরিচালনের ক্ষমতা থাকা প্রয়োজনীয় রূপের তাহা ছিল। তিনি স্থূলকায় ছিলেন, তাঁহার মুখাবয়বে এমন একপ্রকার কঠোর তেজস্বিতা প্রচ্ছন্ন ছিল যে তাঁহাকে দেখিলেই লোক মস্তক অবনত করিত। সুকুমার দেহ সনাতনের প্রশান্ত মূর্তি ও ভাবগাম্ভীর্য দেখিয়া লোকে তাঁহাকে ভক্তি করিত, রূপের মুখপ্রতিভা দেখিয়া সকলে তাহাকে ভয় করিত। রূপের মতো ব্যক্তি লোকপাল হইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। বৃন্দাবনে গিয়া তিনিই তথাকার সর্বময় কর্তা হইয়াছিলেন। তাঁহার মতো রাশভারী লোকদিগের অন্তঃকরণে কোনো নীচতা বা সংকীর্ণতা আসিতে পারে না, তাঁহারা সর্বত্রই সর্বকার্যে বিশ্বাসী ও প্রতিপত্তিশালী হন।

"রাজকার্যে রূপের অপ্রতিহত ক্ষমতা ও বিশ্বস্ততার জন্য সুলতান হুসেন শাহ তাঁহাকে সাকর বা সাকের (বিশ্বস্ত) মল্লিক" এই সম্মান-সূচক নাম এবং উপাধি দিয়াছিলেন। তিনি সকল কার্যই বলদর্পের সহিত করিতেন। তাঁহার সংকল্প স্থির হইতে বিলম্ব হইত না ; সংকল্প হওয়া মাত্র উহা তিনি কার্যে পরিণত করিতে দৃঢ় চেষ্টা করিতেন। রাজস্ব সচিবরূপে রূপ যে রাজা প্রজা সকলের নিকট হইতে প্রীতি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহা বলাই বাহুল্য। তিনি এমন সুন্দরভাবে পারসীক লিখিতে, পড়িতে ও অনর্গল বলিতে পারিতেন এবং সকল মুসলমান কর্মচারীর সহিত মিশিয়া কার্য নির্বাহ করিতেন যে সাকর মল্লিক মুসলমান বা হিন্দু ছিলেন, তাহা কেহ বুঝিতে পারিত না। নানাভাবে বিধর্মীদিগের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে

মিশিতে গিয়া তিনি ও তাঁহার ভ্রাতারা সকলেই কতকটা ম্লেচ্ছাচারী হইয়া গিয়াছিলেন। রাজকার্যে তাঁহাদের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হইত এবং মুসলমানী হাবভাবে তাঁহাদিগকে আত্মগোপন করিতে বাধ্য হইতে হইলেও তাঁহারা নিজগৃহে কখনও শাস্ত্রচর্চা পরিত্যাগ করেন নাই। তাঁহারা পণ্ডিতগণকে পাইলে দর্শনাদি শাস্ত্র লইয়া ঘোর তর্কবিতর্ক করিতেন।"[১]

সেদিন সুলতানের সহিত সাক্ষাতের পরই রূপ রামকেলিতে ফিরিয়া আসিলেন আর কালবিলম্ব না করিয়া সরাসরি উপস্থিত হইলেন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সনাতনের কক্ষে। তারপর নিবেদন করিলেন নিজ সংকল্পের কথা।

সব কিছু শোনার পর সনাতন গম্ভীর হইয়া উঠেন। প্রশান্ত কণ্ঠে বলেন, "তোমার বক্তব্য সবই আমি শুনলাম। কিন্তু আমি তো এতে সম্মতি দিতে পারিনে, ভাই। আমি জ্যেষ্ঠ, আমি স্থির ক'রে রেখেছি, প্রথমে আমিই করবো সংসার ত্যাগ। আগে আমায় যেতো দাও। পরে সুযোগমতো তুমি একদিন চলে আসবে।"

নিজ সিদ্ধান্তে রূপ অটল। যুক্তকরে বলেন, "জীবনের সকল কিছু ব্যাপারে আপনি আমার শিক্ষাদাতা, প্রেরণাদাতা। আপনাকে আমি শুধু বড় ভাই রূপেই দেখি না, গুরুস্থানীয় বলে মনে করি। সব কাজ করি আপনারই উপদেশ ও নির্দেশ মতো। কিন্তু এবারটি আমার নিজের প্রাণের আবেগ অনুযায়ী চলতে দিন।"

সনাতন ধীর স্থির বিচক্ষণ। উত্তর দেন, "আবেগের কথা তুমি বলছো বটে, কিন্তু যুক্তি বা শালীনতার কথাও তো জড়িত রয়েছে এতে। তুমি যদি আগে সংসার ছাড়ো, লোকে আমায় কি বলবে বলতো? আমি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, বয়সও আমার যথেষ্ট হয়েছে। এই বয়সে রাজকার্য থেকে অবসর নেওয়াই তো আমার উচিত। তাছাড়া, মহাপ্রভুর উপদেশ মতোই এতকাল আমি সংসারে রয়ে

১ রূপ গোস্বামী: সতীশচন্দ্র মিত্র

গিয়েছি, আর তো আমি ধৈর্য ধারণ করতে পারছিনে। আমাকে বৈরাগ্য গ্রহণ করতেই হবে।"

এবার নিজ যুক্তিতর্কের জাল বিস্তার করেন রূপ। দৃঢ়স্বরে নিবেদন করেন, "রাজ সরকারে আপনি অত্যন্ত দায়িত্বপূর্ণ কাজ নিয়ে রয়েছেন। শান্তির সময়ে প্রশাসনের ব্যাপারে, যুদ্ধবিগ্রহে সর্বদাই বাদশাহ্ আপনার মতামতকে মূল্যবান মনে করেন। আপনার পরামর্শ নেন। তাই নয় কি?"

"হ্যাঁ, একথা যথার্থ।"

"বিশেষ ক'রে এ সময়ে উড়িষ্যারাজের সঙ্গে বাদশাহের ঘোর মনান্তর চলছে, যে কোনো সময়ে একটা যুদ্ধ বেধে যেতে পারে।"

"হ্যাঁ, সে সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।"

"তাই তো এ সময়ে আপনি রাজকর্ম ত্যাগ করলে বাদশাহ ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠবেন। তারপর আবার আমি যখন চলে যাবো, তিনি ভাববেন, আমরা ষড়যন্ত্র করেছি, একযোগে কাজে ইস্তাফা দিয়ে বাদশাহকে বিপদে ফেলবার চেষ্টা করছি। তার ফলে আমাদের আত্মীয়স্বজনদের উপর ঘোর অত্যাচার চলতে থাক্‌বে। কাজেই আমার প্রস্তাবটিই আপনি মেনে নিন।"

সনাতন এবার কিছুটা নরম হইয়াছেন। এই সুযোগে রূপ আবার কহিলেন, "সংসারের এবং আত্মীয়-কুটুম্বদের ভরণপোষণের ব্যবস্থা সব আমি তাড়াতাড়ি সেরে ফেলছি। এ নিয়ে আপনাকে ভাবতে হবে না। আমি চলে যাবার পর আপনি যাতে সহজে এখান থেকে নিষ্ক্রান্ত হতে পারেন সে ব্যবস্থাও আমি ক'রে যাবো।"

রূপের প্রার্থনা এবার মঞ্জুর হইল। সনাতন প্রাজ্ঞ এবং বিচক্ষণ বটে, কিন্তু সংসারের ব্যবস্থাপনা নিয়া তিনি কোনো মাথা ঘামাইতেন না, প্রধানত রূপই এসব কাজ করিতেন। এবার উভয়ে মিলিয়া রুদ্ধদ্বার কক্ষে বেশ কিছুক্ষণ পরামর্শ চলিল এবং কার্যক্রম সম্বন্ধে একমত হইলেন।

সকলের সঙ্গে দেনা পাওনার হিসাব রূপ তাড়াতাড়ি মিটাইয়া ফেলিলেন। রামকেলি রাজধানী গৌড়ের অতি নিকটে, সেখানে আত্মপরিজনদের আর থাকা তেমন নিরাপদ নয়। তাহাদের কিছু সংখ্যককে পাঠানো হইল চন্দ্রদ্বীপের প্রাসাদে বাকলায়। ফতেহাবাদের প্রেমভাগে আর একটি ভবন তাঁহাদের ছিল, সেখানেও সরাইয়া দিলেন অনেককে। ধন সম্পত্তি সমস্ত কিছু গুছাইয়া নেওয়া হইল। বিগ্রহ সেবা, কুলগুরু, ব্রাহ্মণ ও প্রাপকদের অসুবিধা না হয় এজন্য দরাজ হাতে করিলেন এককালীন দান। চৈতন্য চরিতামৃতে এই বিলি ব্যবস্থা সম্পর্কে বলা হইয়াছে :

শ্রীরূপ গোসাঞি তবে নৌকাতে ভরিয়া।
আপনার ঘর আইলা বহু ধন লঞা॥
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবে দিল তার অর্ধ ধনে।
এক চৌঠি ধন দিল কুটুম্ব ভরণে॥
দণ্ডবন্ধ লাগি চৌঠি সঞ্চয় করিল।
ভাল ভাল বিপ্রস্থানে স্থাপ্য রাখিল॥

তাছাড়া, সংকট সময়ে সনাতনের প্রয়োজন হইতে পারে ভাবিয়া এক মুদির কাছে রূপ দশ হাজার টাকা গচ্ছিত রাখিলেন।

ইতিমধ্যে রূপ শ্রীচৈতন্যের সন্ধান নিবার জন্য নীলাচলে লোক পাঠাইয়াছিলেন। শুনিলেন, প্রভু ঝাড়িখণ্ডের পথে বৃন্দাবনের দিকে রওনা হইয়া গিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে পথে মিলিত হইবেন, এবং একত্রে বৃন্দাবনে পৌছিবেন এজন্য রূপ আগ্রহী। তাই তাড়াতাড়ি হাতের কাজ সারিয়া নিয়া পদব্রজে ধাবিত হইলেন ঝাড়িখণ্ডের অরণ্য পথে। সঙ্গে চলিলেন মুমুক্ষু কনিষ্ঠ ভ্রাতা অনুপম।

কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর শুনিলেন, হুসেন শাহ সনাতনের বৈরাগ্য প্রবণতায় ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, এবং তিনি মুখ্য সচিবের কাজ ত্যাগ করিবেন একথা বলায় তাঁহাকে নিক্ষেপ করিয়াছেন কারাগারে। তৎক্ষণাৎ পথ হইতে রূপ একটি লোক মারফত পত্রী পাঠাইলেন। লিখিলেন, সনাতন যেন এ সংকটে, প্রয়োজন বোধে, মুদির নিকট

গচ্ছিত রাখা টাকাটা কাজে লাগান এবং উৎকোচ দিয়া কারাগার হইতে মুক্ত হইয়া আসেন।

মুক্তিলাভের ঐ পন্থাটি গ্রহণ করা ছাড়া সনাতনের আর উপায় ছিল না। অতঃপর কারাগার হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া তিনি শ্রীচৈতন্যের চরণাশ্রয় লক্ষ্য করিয়া যাত্রা করেন। দীর্ঘপথ অতিক্রম করার পর কাশীতে পৌঁছিয়া লাভ করেন তাঁহার দর্শন। এই দর্শনের সময়েই সনাতনকে করেন প্রভু আত্মসাৎ।

রূপ এবং বল্লভ প্রয়াগে পৌঁছিয়া শুনিলেন, শ্রীচৈতন্য বৃন্দাবন হইতে ফিরিবার পথে সেখানে উপস্থিত হইয়াছেন। প্রভুর বহু আকাঙ্ক্ষিত দর্শন এবার সম্ভব হইবে, আশ্রয় মিলিবে তাঁহার চরণতলে। রূপের আনন্দ আর ধরে না।

শ্রীচৈতন্য বিন্দুমাধব মন্দিরে আসিয়াছেন। ভাবাবিষ্ট অপরূপ আনন্দঘন মূর্তি, মুখে মধুর কণ্ঠের কৃষ্ণনাম। সহস্র সহস্র ভক্ত এই দেবমানবকে দর্শন করিতে আসিয়াছে। আনন্দে অধীর হইয়া, তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া ভক্ত ও দর্শনার্থীরা নাচিতেছে গাহিতেছে। এক বিরাট জনসংঘট্ট সেখানে।

দূর হইতে প্রভুর দিব্য ভাবাবেশ দেখিয়া রূপের সারা দেহ পুলকাঞ্চিত হইয়া উঠে, নয়নে বহিতে থাকে অশ্রুধারা। কিন্তু সেই বিপুল জনসমুদ্রে প্রভুর সম্মুখীন হইবেন কি করিয়া? এক দক্ষিণী ভক্ত ব্রাহ্মণের গৃহে সেদিন শ্রীচৈতন্যের ভিক্ষার নিমন্ত্রণ ছিল। তিনি সেখানে উপস্থিত হইলে রূপ ও বল্লভ দুই ভ্রাতা গিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। প্রভু তো মহাউল্লসিত। বার বার কহিতে থাকেন, "কৃষ্ণের কি অপার করুণা তোমাদের ওপর। বিষয়কূপ থেকে এবার দু'জনকে উদ্ধার করলেন। আহা কি ভাগ্যবান্ তোমরা দু'ভাই।"

প্রভু ত্রিবেণীর তীরে ভক্ত গৃহে বাস করিতেছেন। রূপ এবং বল্লভও নিকটস্থ এক কুটিরে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

বৈদিক যজ্ঞে পারঙ্গম, শাস্ত্রবিদ্ বল্লভ ভট্ট সে-সময়ে ত্রিবেণীর

অদূরে এক গ্রামে অবস্থান করিতেছিলেন। শ্রীচৈতন্য ও তাঁহার গৌড়দেশাগত দুই নবাগত ভক্তকে ভট্টজী সেদিন তাঁহার গৃহে নিমন্ত্রণ করিলেন।

রূপের দিব্যকান্তি ও ভাবাবেশ দেখিয়া বল্লভ ভট্ট মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন। সানন্দে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে যাইবেন, রূপ অমনি চকিতে দূরে সরিয়া গেলেন, "না—না, ভট্টজী, আমায় কেন আপনি স্পর্শ করছেন? আমি অস্পৃশ্য পামর। এতকাল কাটিয়ে এসেছি পাপকর্মে। আমি তো আপনার স্পর্শযোগ্য নয়!"

বিলাস ও ঐশ্বর্যে চিরলালিত, ক্ষমতার চূড়ায় বসিয়া থাকিতে সদা অভ্যস্ত, রূপের এই দৈন্য ও বৈরাগ্যভাব দেখিয়া শ্রীচৈতন্য মহা সন্তুষ্ট। অদূরে বসিয়া মিটিমিটি হাসিতেছেন তৃপ্তির হাসি।

দশদিন প্রয়াগে প্রভুর পুণ্যময় সান্নিধ্যে অবস্থান করেন রূপ। এই দশদিনেই প্রভু তাঁহার সাত্ত্বিক আধারে উজাড় করিয়া ঢালিয়া দেন বৈষ্ণবীয় সাধনার নিগূঢ় তত্ত্ব। ব্রজরসের পরমতত্ত্ব ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেন তাঁহার নিজ মুখে।[১]

শ্রদ্ধা ভক্তি ও কৃষ্ণসেবার মাহাত্ম্য বর্ণনা করেন প্রভু। তারপর ভক্তি সাধনার, ক্রম, কৃষ্ণভক্তিরসের বৈচিত্র্য, এবং সর্বোপরি কান্তা-ভাব সম্পন্ন মধুর রসের দিক্‌দর্শন করেন। শুধু তাহাই নয়, কৃপাভরে নবীন সাধক রূপের আধারে, করেন শক্তি সঞ্চারিত।

কৃষ্ণভক্তি ভক্তিতত্ত্ব রসতত্ত্ব প্রান্ত।
সব শিখাইলা প্রভু ভাগবত সিদ্ধান্ত॥
রামানন্দ পাশে যত সিদ্ধান্ত শুনিলা।
রূপে কৃপা করি তাহার সব সঞ্চারি॥
শ্রীরূপ হৃদয়ে প্রভু শক্তি সঞ্চারিলা।
সর্বতত্ত্ব নিরূপিয়া প্রবীণ করিলা॥

(চৈ-চরিতামৃত)

১ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়: কবি কর্ণপুর

রূপের হৃদয় মন স্বর্গীয় আনন্দে পূর্ণ হইয়া উঠে, প্রভুর কৃপায় জীবন হয় কৃতকৃতার্থ। এবার প্রভু বারাণসীর দিকে যাইবেন, প্রেমালিঙ্গন ও আশীর্বাদ দিয়া কহিলেন, "রূপ "তুমি বৃন্দাবনে যাও। যে তত্ত্ব লাভ করলে, বৃন্দাবনের পবিত্র ধামে এবার তা স্ফুরিত হয়ে উঠুক, এই আমি চাই।"

অতঃপর রূপ ও অনুপম বৃন্দাবনে চলিয়া আসিলেন। এখানে পৌঁছিয়াই ভক্তপ্রবর সুবুদ্ধি রায়ের সঙ্গে তাঁহাদের সাক্ষাৎ ঘটিল।

সুবুদ্ধি রায় ছিলেন গৌড়ের এক প্রভাবশালী ভূম্যধিকারী। বাদশাহ হুসেন শাহ তাঁহার প্রথম জীবনে, যখন সহায় সম্পদহীন ভাগ্যান্বেষী যুবক মাত্র, তখন তিনি সুবুদ্ধি রায়ের অধীনে এক নগণ্য চাকুরী গ্রহণ করেন। কোনো অপরাধে লিপ্ত থাকায় সুবুদ্ধি রায় তাঁহার উপর ক্রুদ্ধ হন এবং চাবুক মারিয়া তাঁহাকে শাস্তি দেন। ঐ চাবুকের ক্ষতের দাগ দীর্ঘদিন পরেও একেবারে মিলাইয়া যায় নাই। উত্তরকালে এই হুসেনের ভাগ্য পরিবর্তিত হয়, তিনি গৌড়ের বাদশাহ হইয়া বসেন।

হুসেন শাহের বেগম একদিন স্বামীর পৃষ্ঠে ক্ষতের দাগ দেখিয়া বিস্মিত হন এবং উহার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। পুরাতন দিনের ঘটনাদি বাদশাহ বিবৃত করেন এবং উল্লেখ করেন প্রাক্তন মনিব সুবুদ্ধি রায়ের বেত্রাঘাতের কথা। বেগম তো একথা শুনিয়া মহা উত্তেজিত। জেদ ধরিয়া বসেন, সুবুদ্ধি রায়কে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হোক। হুসেন শাহ কিন্তু এ দণ্ড দিতে সম্মত হন নাই। বলেন প্রাক্তন অন্নদাতার প্রাণনাশ করা তাঁহার দ্বারা সম্ভব হইবে না। অতঃপর বেগম ও ওমরাহ্‌রা সবাই মিলিয়া স্থির করেন, প্রাণনাশের বদলে সুবুদ্ধি রায়ের ধর্মনাশ করা হোক। এই প্রস্তাব অনুযায়ী, অপরাধীর মুখে কুখাদ্য পুরিয়া দেওয়া হইল।

জাতিভ্রষ্ট মর্মাহত সুবুদ্ধি রায় তখন বিত্ত বিষয় ছাড়িয়া কাশীতে শাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিতদের কাছে উপস্থিত হন, জানিতে চাহেন জাতি নাশের

জন্য প্রায়শ্চিত্তের বিধান। পণ্ডিতেরা বলেন, এজন্য তপ্তঘৃত পান করিয়া তাঁহাকে আত্মহত্যা করিতে হইবে।

প্রভু শ্রীচৈতন্য তখন কাশীধামে উপস্থিত হইয়াছেন, তাঁহাকে ঘিরিয়া ভক্ত সমাজে জাগিয়া উঠিয়াছে প্রবল উদ্দীপনা। সুবুদ্ধি রায় শ্রীচৈতন্যের চরণে নিপতিত হইলেন, কাঁদিয়া কহিলেন "প্রভু, আপনি স্বয়ং ঈশ্বর। আমায় বলুন, জাতি নাশের পাপ স্খালনের জন্য কি প্রায়শ্চিত্ত আমায় করতে হবে।"

প্রভু কহিলেন, "একবার কৃষ্ণনাম যত পাপ হরে, জীবের কি সাধ্য আছে তত পাপ করে? তোমার কোনো ভয় নেই। তুমি বৃন্দাবনে যাও, সেখানকার পবিত্র রজে প্রত্যহ গড়াগড়ি দাও, আর কৃষ্ণনামের জপধ্যানে জীবন সার্থক ক'রে তোল। এই হল তোমার প্রায়শ্চিত্তের বিধান।"

সুবুদ্ধি রায়ের প্রাণে এবার নূতন আশা সঞ্চারিত হয়। বৃন্দাবনে আসিয়া শুরু করেন ত্যাগ তিতিক্ষাময় বৈষ্ণব জীবন।

গৌড় বাদশাহের অন্যতম প্রধান কর্মচারী রূপকে সুবুদ্ধি রায় ভালো করিয়াই চিনিতেন। বৈরাগী হইয়া তিনি শ্রীচৈতন্যের শরণ নিয়াছেন এবং বৃন্দাবনে আসিয়াছেন জানিয়া তাঁহার আনন্দের আর অবধি নাই।

ছুটিয়া আসিয়া রূপ ও অনুপমকে প্রেমভরে জড়াইয়া ধরিলেন, ঘুরিয়া ঘুরিয়া দর্শন করাইলেন পবিত্র দ্বাদশ বন।

প্রভু শ্রীচৈতন্যের কৃপার কথা, শ্রীকৃষ্ণের লীলা মাহাত্ম্যের কথা আলোচনা করিয়া কিছুদিন আনন্দে কাটিয়া গেল।

লোকনাথ ও ভূগর্ভ তখন ব্রজমণ্ডলের অভ্যন্তর ভাগে অরণ্যে ঘোরাঘুরি করিতেছেন, ইঁহাদের সঙ্গে রূপ ও অনুপমের এসময়ে সাক্ষাৎ হয় নাই। প্রায় একমাস বৃন্দাবনে বাস করার পর রূপের মন উচাটন হইয়া উঠিল। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সনাতন চিরদিন তাঁহার পথপ্রদর্শক ও পরিচালক। গুরুর মতো রূপ তাঁহাকে শ্রদ্ধা করেন। সেই সনাতন এখনো বাদশাহের কারাগারে রহিয়াছেন না মুক্ত

হইয়াছেন, সে সংবাদ তাঁহার জানা নাই। মনের দুশ্চিন্তা কোনো-মতেই হয় না। অবশেষে অনেক কিছু ভবিয়া চিন্তিয়া দুই ভ্রাতা কিছুদিনের জন্য বৃন্দাবন ত্যাগ করিলেন, বাহির হইয়া পড়িলেন সনাতনের সন্ধানে। পদব্রজে চলিলেন কাশীর দিকে।

সনাতন ইতিমধ্যে কারাগার হইতে মুক্ত হইয়াছেন কাশীতে গিয়া লাভ করিয়াছেন শ্রীচৈতন্যের কৃপা। সেখান হইতে ভিন্ন পথে তিনি বৃন্দাবনে পৌঁছিলেন, রূপের সহিত সাক্ষাৎ ঘটিল না। কাশীতে পৌঁছাইয়া সনাতনের সংবাদ পাইয়া রূপ প্রকৃতিস্থ হইলেন। প্রভু চৈতন্যের কৃপা তিনি লাভ করিয়াছেন, একথা জানিয়া আনন্দে মন প্রাণ ভরিয়া উঠিল।

অনুজ অনুপম ছিলেন ইষ্ট শ্রীরামচন্দ্রের উপাসক। বৃন্দাবনে থাকা সম্পর্কে তিনি তখনো মন স্থির করিতে পারেন নাই। রূপকে কহিলেন, গৌড়ের দিকে তাঁহার মন চলিতেছে, এসময়ে সনাতনও সংসার ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিয়াছেন, রূপ যদি আর একবার কিছুদিনের জন্য গৌড়ে যান, বিষয় সম্পর্কিত শেষ বিলি ব্যবস্থা করিয়া আসেন তবে বড় সুবিধা হয়।

কনিষ্ঠ ভ্রাতার অনুরোধে রূপকে রাজী হইতে হইল, উভয়ে প্রত্যাবর্তন করিলেন গৌড়দেশে। সেখানে পৌঁছানোর পর ঘটিল এক মহাদুর্দৈব, অল্প কিছু দিনের মধ্যে এক মারাত্মক রোগে ভুগিয়া অনুপম ইহলোক ত্যাগ করিলেন।

প্রিয় অনুজের এই শোকাবহ মৃত্যু রূপকে ফেলিয়া দিল নানা সাংসারিক দায়িত্ব ও সমস্যার মধ্যে। এদিকে প্রভু শ্রীচৈতন্যের চরণ দর্শনের জন্য, তাঁহার পুণ্যময় সান্নিধ্যের জন্য, মন তাঁহার অধীর হইয়া উঠিয়াছে। তাই যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি এখানকার সমস্যা মিটাইয়া ফেলিয়া পদব্রজে ছুটিয়া চলিলেন নীলাচলে।

আগে হইতেই রূপ মনে মনে স্থির করিয়া আসিয়াছেন, ভক্ত হরিদাসের কুটিরে তিনি আশ্রয় নিবেন, তারপর সুযোগমতো করিবেন

প্রভুর চরণ দর্শন। দীর্ঘদিন গৌড় দরবারে থাকায় ম্লেচ্ছ স্পর্শদোষ তাঁহার ঘটিয়াছে, তাই প্রভু শ্রীচৈতন্যের নিষ্ঠাবান্ উচ্চবর্ণের ভক্তদের গৃহে অবস্থান করা তাঁহার পক্ষে ঠিক নয়।

প্রবীণ ভক্ত হরিদাসের কুটিরে পৌছিতেই বাহু প্রসারিয়া রূপকে তিনি জ্ঞাপন করেন আন্তরিক সংবর্ধনা। স্নেহভরে কহেন, "রূপ, তুমি আসবে, তা আমরা সবাই জানি। মহাভাগ্যবান্ তুমি, প্রভু সাগ্রহে তোমার প্রতীক্ষা করছেন, বার বার বলছেন তোমারই কথা।"

প্রভু শ্রীচৈতন্যের দিনচর্যা ছিল প্রত্যহ সকালবেলায় অন্তরাল-বাসী পরম ভক্ত হরিদাসকে দর্শন দেওয়া। জগন্নাথদেবের উপল ভোগের সময় প্রভু সেখানে স্বগণসহ উপস্থিত থাকিতেন। তারপরই চলিয়া আসিতেন হরিদাসের নিভৃত কুটিরে। এখানে অন্তরঙ্গ পার্ষদ ও ভক্তদের নিয়া চলিত ইষ্টগোষ্ঠী এবং প্রেমরস তত্ত্বের আলোচনা।

হরিদাসের কুটিরে প্রভু পদার্পণ করার সঙ্গে সঙ্গে রূপ ছুটিয়া আসিলেন, নিবেদন করিলেন দণ্ডবৎ প্রণাম। আলিঙ্গন ও কুশল প্রশ্নাদির পর পরমানন্দে সবাই প্রভুকে ঘিরিয়া বসিলেন, ভাগবত ও কৃষ্ণকথার জোয়ার বহিতে লাগিল।

পুরীধামের রথযাত্রা তখন আসন্ন। গৌড়ীয়া ভক্তদল প্রভুর দর্শন ও সান্নিধ্যের লোভে পদব্রজে দীর্ঘপথ অতিক্রম করিয়া আসিয়াছেন। প্রভুর সহিত মিলনের পর মাতিয়া উঠিয়াছেন আনন্দরঙ্গে। এই ভক্তদের মধ্যে রহিয়াছেন প্রবীণ বৈষ্ণবাচার্য শ্রীঅদ্বৈত, নিত্যানন্দ প্রভৃতি।

সেদিন কয়েকটি অন্তরঙ্গ ভক্ত সঙ্গে নিয়া প্রভু হরিদাসের কুটিরে আসিয়াছেন। রূপকে আলিঙ্গন দানের পর অদ্বৈত ও নিত্যানন্দকে কহিলেন, "কৃষ্ণের আহ্বানে রূপ বিষয় কূপ ছেড়ে চলে এসেছে। আপনারা দু'জন তাঁকে আশীর্বাদ দিন, কৃষ্ণের ভজনে সে যেন সিদ্ধ হয়, আর কৃষ্ণভক্তি রসের গ্রন্থ লিখে যেন সাধন করতে পারে জীবের মঙ্গল।"

গৌড়ীয় নেতারা, রামানন্দ রায়, স্বরূপ দামোদর প্রভৃতি এই

প্রতিভাধর নূতন ভক্তকে স্থাপন করেন তাঁহাদের প্রাণভরা আশীর্বাদ। রূপের চেহারার একটা বিশেষ মাধুর্য ও কমনীয়তা ছিল, আর তাই স্বভাবে ছিল বিনয় ও দৈন্যের পরাকাষ্ঠা। অচিরে প্রভুর গৌড়ীয়া ও ওড়িশী ভক্তদের তিনি পরম প্রিয় হইয়া উঠিলেন।

প্রভু তাঁহার ভক্তগোষ্ঠী সঙ্গে যেখানে যেখানে উপস্থিত হন, দিব্য আনন্দের স্রোত বহিয়া যায়। ভক্তিপ্রেমের দিব্য ভাবাবেশে সবাই মাতোয়ারা হইয়া উঠেন। কখনো শ্রীমন্দির চত্বরের কীর্তনে, কখনো সমুদ্র স্নানে, কখনো বা গুণ্ডিচা মার্জনে, দিনের পর দিন চলে উৎসব আর আনন্দ-হুল্লোড়।

ভক্ত হরিদাসের মতো রূপও নিজেকে দৈন্যভরে মনে করেন ম্লেচ্ছাধম, তাই শ্রীজগন্নাথের মন্দিরের ভিতরে কখনো যান না। দূর হইতেই দর্শন ও প্রণাম করেন। প্রভুর নর্তন কীর্তন ও পুণ্যময় নানা অনুষ্ঠানে প্রবল জনসংঘট্ট হয়, সেসব স্থানও রূপ সযত্নে পরিহার করিয়া চলেন। দূর হইতে প্রভু ও ভক্তগোষ্ঠীর আনন্দলীলা মুগ্ধনেত্রে দর্শন করেন, প্রণাম জানান বার বার।

কিন্তু রাতের অধিকাংশ সময়ই কাটে হরিদাসের নিরালা ভজন-কুটিরে। এখানে নামমূর্তি হরিদাস প্রায় সময়ে নিবিষ্ট থাকেন তাঁহার সংকল্পিত নামজপের সাধনায়। আর এককোণে একান্তে বসিয়া রূপ ব্যাপৃত থাকেন রসশাস্ত্রের অবগাহনে আর গ্রন্থরচনায়।

প্রত্যহ জগন্নাথদেবের ভোগরাগ সম্পন্ন হইবার পর একান্তবাসী ভক্তদ্বয় হরিদাস আর রূপের জন্য প্রসাদ পাঠানো হয়। ঐ প্রসাদ গ্রহণ করিয়া উভয়ে নিরত হন নিজ নিজ নির্দিষ্ট সাধনায় ও কর্মে।

"রূপ গোস্বামী আজন্ম সুকবি। একাধারে এমন কবিত্ব, পাণ্ডিত্য ও ভক্তি অতি কম দেখা যায়। গৌড়ে থাকিতে তিনি হংসদূত ও উদ্ধব-সন্দেশ নামক কাব্য রচনা করেন, উহা পরে বৃন্দাবনে শেষ হইয়া প্রচারিত হয়। গৃহত্যাগ করিয়া আসিবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক নাটক লিখিতে থাকেন। উহাতে তিনি কৃষ্ণের

ব্রজলীলা ও অন্যান্য লীলা একত্র লিখিবেন বলিয়া স্থির করেন। পরে নীলাচলে আসিবার সময় স্বপ্নাদেশে ও মহাপ্রভুর আজ্ঞায় পৃথক পৃথক দুইখানি নাটক রচনার পরিকল্পনা স্থির হয়। শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা-বিষয়ক নাটকের নাম দিয়াছিলেন 'বিদগ্ধ মাধব' এবং তাঁহার পুরলীলা-বিষয়ক নাটকের নামকরণ হয় 'ললিত মাধব'। নীলাচলে আসিবার পর হইতে তিনি অধিকতর একাগ্রতার সহিত এই দুইখানি নাটক একই সময়ে লিখিতেছিলেন। হরিদাস ঠাকুরের শান্তরসাস্পদ কুটিরে এবং সপার্ষদ মহাপ্রভুর সঙ্গগুণে ও আশীর্বাদের ফলে রূপের স্বাভাবিক কবিত্ব প্রতিভা বিশেষভাবে স্ফুরিত হইয়াছিল। গ্রন্থদ্বয়ের অধিকাংশই নীলাচলে বসিয়া লিখিত হয়, পরে বৃন্দাবনধামে গিয়া প্রথমে বিদগ্ধ মাধব ও তৎপরে ললিত মাধব সমাপ্ত হয়।"

নীলাচলের বৃহত্তম ও মহত্তম অনুষ্ঠান রথযাত্রা আসিয়া যায়। লক্ষ লক্ষ ভক্ত নরনারী ভারতের নানা দিগ্‌দেশ হইতে এই সময়ে মহাধামে আগত হয়, শ্রীজগন্নাথের বিজয়যাত্রা দেখিয়া প্রাণমন সার্থক করে। এই রথযাত্রার আর এক বড় আকর্ষণ—দেবমানব প্রভু শ্রীচৈতন্যের উপস্থিতি ও নৃত্য কীর্তন।

রথ টানা শুরু হইলে ভক্ত ও পার্ষদদের নিয়া প্রভু রথাগ্রে কীর্তন করিতে থাকেন। সাত্ত্বিক প্রেমবিকারের ঐশ্বর্য প্রকটিত হয় তাঁহার গৌরকান্তি দিব্যশ্রীমণ্ডিত দেহে। এ অপার্থিব মূর্তি ও ভাবমত্ততা দেখিয়া অগণিত দর্শনার্থী আনন্দে উদ্বেল হইয়া উঠে।

রথাগ্রে প্রভুর দেবদুর্লভ নৃত্য ও উদ্দণ্ড কীর্তন রূপ প্রাণ ভরিয়া দূর হইতে দর্শন করেন, দিব্য ভাবের আবেশে প্রমত্ত হইয়া উঠেন। জীবন মন সার্থক জ্ঞান করিয়া প্রত্যাবর্তন করেন ভজন-কুটিরে।

প্রভুর ইচ্ছা অনুসারে নীলাচলে তিনি বাস করেন প্রায় দশমাস।

১ সপ্ত গোস্বামী : সতীশচন্দ্র মিত্র

তাঁহার জীবনে এই দশটি মাসের মূল্য অপরিসীম। প্রভুর শ্রীচৈতন্যের প্রেমময় সান্নিধ্যে, তাঁহার অন্তরঙ্গ পার্ষদদের স্নেহময় পরিবেশে, অবিরাম অন্তরে তাঁহার বহিয়া চলে দিব্যরসের প্রবাহ। শুধু তাহাই নয়, কৃষ্ণভক্তি ও কৃষ্ণপ্রেম লীলাবিষয়ক যে সব গ্রন্থ লেখানোর জন্য প্রভু ইচ্ছুক তাহারও প্রস্তুতি এসময়ে ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠে। কৃষ্ণতত্ত্ব ও ব্রজরসতত্ত্বের উৎস সন্ধানটি প্রভুর কৃপায় এসময়ে রূপ প্রাপ্ত হন। প্রয়াগে থাকিতে যে অমৃতময় তত্ত্বোপদেশ প্রভু দিয়াছিলেন, তাহাই এবার নূতনতর উদ্দীপনা নিয়া উদ্‌গত হইতে থাকে তাঁহার অন্তস্তল হইতে।

সুকবি, প্রতিভাধর ও সুপণ্ডিত রূপ প্রভুর নির্দেশে কৃষ্ণলীলা ও কৃষ্ণরসের নাটক লিখিতেছেন। কিন্তু কাব্যপ্রতিভা থাকিলেই কৃষ্ণরসের, ব্রজরসের, পরমতত্ত্ব উদ্‌ঘাটন করা যায় না, কৃষ্ণলীলার প্রকৃত মাহাত্ম্য ও ফুটাইয়া তোলা যায় না। এজন্য একদিকে চাই ব্রজরসের সম্যক্ উপলব্ধি আর চাই রসনাট্যের আঙ্গিক ও সিদ্ধান্ত বিষয়ে নির্ভুল প্রয়োগনৈপুণ্য।

শ্রীচৈতন্য ইতিপূর্বেই রূপের সাধন-আধারে তাঁহার শক্তি সঞ্চারিত করিয়াছেন। এবার সেই শক্তির-স্রোতকে উৎসারিত ও বিস্তারিত করিতে চান জনকল্যাণে।

প্রভুর ব্রজরসতত্ত্বের দুই পরম রসজ্ঞ পার্ষদ—রামানন্দ রায় এবং স্বরূপ দামোদর। প্রভু স্থির করিলেন, এই দুই বিদগ্ধ ও প্রবীণ পার্ষদকে তিনি নিয়োজিত করিবেন রূপের নব রচিত কাব্যের রস আস্বাদনে ও মূল্য নিরূপণে।

রামানন্দ রায় রসতত্ত্বের শাস্ত্রে বাহ্যত শ্রীচৈতন্যেরও উপদেষ্টা। দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের কালে প্রভু এই মরমী সাধককে আত্মসাৎ করেন, তাঁহার মুখ দিয়া প্রকাশিত করেন মধুর রস এবং নিগূঢ় ভজনের মর্মকথা।

রামানন্দ শ্রীচৈতন্যকে বলিতেন, "প্রভু, ব্রজরসতত্ত্ব, কান্তাভাব ও রাধাতত্ত্বের মহিমা আমি কি জানি? আমি তোমার কাষ্ঠপুত্তলী,

আমায় তুমি যেভাবে নাচাও, যেভাবে বলাও, তাই আমি করি, আর তাই বলি।"

প্রভু দৈন্যভরে উত্তর দিতেন, "রায় আমি শুষ্ক সন্ন্যাসী। মহাভাবময়ী শ্রীরাধিকার রসতত্ত্ব আমি কি জানি? আহা, সে তত্ত্ব যে তুমিই আমায় শেখালে।"

উভয়ের এই মতদ্বৈধ আর আনন্দ-কলহ প্রায়ই চলিত, আর অন্তরঙ্গ পার্ষদ ও ভক্তেরা মিটিমিটি হাসিতেন।

রামানন্দ রায় উড়িষ্যার এক শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব, কৃষ্ণরস তত্ত্বে পারঙ্গম এবং যশস্বী নাট্যকার। প্রভু শ্রীচৈতন্যের দর্শন লাভের পূর্বে তিনি সংস্কৃত ভাষায় 'জগন্নাথ বল্লভ' নাটক রচনা করিয়া যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। প্রেমভক্তির সাধনায় আগে হইতেই তিনি অনেক দূর অগ্রসর ছিলেন, এবার শ্রীচৈতন্যের আশ্রয় নিয়া সেই সাধনায় হইয়াছেন সিদ্ধকাম।

প্রভুর অন্যতম শ্রেষ্ঠ পার্ষদ স্বরূপ দামোদরও কৃষ্ণতত্ত্ব ও ব্রজরসের এক শ্রেষ্ঠ মর্মজ্ঞ সাধক এবং ধারক বাহক। শুধু তাহাই নয়, স্বরূপের আরও গুণ আছে, তিনি—'সংগীতে গন্ধর্বসম শাস্ত্রে বৃহস্পতি'।

তাঁহার মধুর রসের সংগীতে শ্রীচৈতন্য ভাবোন্মত্ত হইতেন, আবার তাঁহারই প্রবোধবাক্যে ও সংগীতে হইতেন আশ্বাসিত, লাভ করিতেন বাহ্যজ্ঞান।

স্বরূপের আরো বৈশিষ্ট্য ছিল। তিনি একদিকে যেমন রসজ্ঞ এবং নিগূঢ় মধুর রসের সাধক, তেমনি বৈষ্ণব সাহিত্যে সুপণ্ডিত এবং কঠোর, সূক্ষ্ম সমালোচনার জন্য প্রখ্যাত।

মহাভাবের মূর্ত বিগ্রহ ছিলেন প্রভু শ্রীচৈতন্য, তাই প্রেমভক্তি-ধর্মের কোনো বাক্য বা রচনার বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত বা রসাভাব কখনো সহ্য করিতে পারিতেন না। তাই সদা পার্শ্বচর ও মরমী ভক্ত স্বরূপকে তিনি নিয়োজিত করিয়াছিলেন বৈষ্ণবীয় রসতত্ত্বের নিরূপণে এবং পরীক্ষাকর্মে—

গ্রন্থশ্লোক গীত কেহো প্রভু আগে আনে।
স্বরূপ পরীক্ষা কৈলে পাছে প্রভু শুনে।

এমনি দুই উচ্চকোটির সাধক ও ব্রজরসের তত্ত্বজ্ঞ এবার রূপের রচনা শ্রবণ করিবেন, সূক্ষ্মভাবে পরীক্ষা করিবেন।

প্রভু একদিন রথাগ্রে নৃত্যকীর্তন করিতেছেন। হঠাৎ ভাবপ্রমত্ত হইয়া 'কাব্য প্রকাশের' যঃ কৌমারহর ইত্যাদি বাক্যসূচক শ্লোকটি উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। নিভৃত মধুময় পরিবেশ, আর একান্ত-চিত্ত কান্তা আর কান্তের নিভৃত মধুর মিলনের রস এই শ্লোকটিতে উৎসারিত।

প্রভুর অন্তরের ভাব বুঝিয়া স্বরূপ দামোদর তখনই এই রসের অনুসারী এক মধুর সংগীত রচনা করিলেন, তখনি প্রভুকে গাহিয়া শুনাইলেন, প্রভু অত্যন্ত খুশী হইয়া উঠিলেন।

পরের দিন শ্রীচৈতন্য রায়-রামানন্দ, স্বরূপ প্রভৃতিকে সঙ্গে নিয়া হরিদাস ও রূপকে দেখিতে আসিয়াছেন। হঠাৎ তাঁহার নজরে পড়ে হরিদাসের কুটিরের চালে গুঁজিয়া-রাখা একটি তালপত্র।

প্রভু অত্যন্ত কৌতূহলী হইয়া উঠেন, বলেন, "নিয়ে এসো দেখি, কি রয়েছে ওতে।"

রূপ বড় লাজুক এবং বিনয়ী, কহিলেন, "না প্রভু, ওটা তোমার দেখবার যোগ্য কিছু নয়।"

"তা হোক, নিয়ে এসো আমার কাছে।"

তালপত্রটি তাড়াতাড়ি খুলিয়া আনা হইল এবং দেখা গেল, এটিতে লিখিত রহিয়াছে রূপের সদ্য রচিত কয়েকটি প্রেমরসে উচ্ছল মনোরম শ্লোক।

গতকাল প্রভু কান্তা ও কান্তের নিভৃত মিলন সম্পর্কে যে শ্লোকটি বলিয়া উঠেন এবং স্বরূপ যাহা গীতচ্ছন্দে রূপায়িত করিয়া শোনান, এটি সেই ভাবেরই দ্যোতক। কালিন্দী পুলিনে নিভৃতে কৃষ্ণ ও রাধার মিলনানন্দের কথা লিখিয়াছেন রূপ তাঁহার অতুলনীয় ভাব, ভাষায় এবং ছন্দে।

এই তালপত্রের রচনাটি প্রভু সবাইকে নিয়া সোৎসাহে শুনিলেন, আর বার বার মুক্তকণ্ঠে করিতে লাগিলেন গুণগান। "আহা, আহা, এমন রসবস্তু তো সচরাচর পাওয়া যায় না। রূপ, তুমি আমাদের আজ সত্যই বড় আনন্দ দিলে।"

প্রভুর এই উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় রূপের কাব্যপ্রতিভার প্রতি স্বরূপ রামানন্দ প্রভৃতির দৃষ্টি সেদিন বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইল।

আর একদিন প্রভাতে প্রভু হরিদাসের কুটিরে আসিয়াছেন। সঙ্গে আছেন স্বরূপ, রামানন্দ প্রভৃতি বিশিষ্ট ভক্তবৃন্দ।

প্রভু জানেন, রূপের কাব্য রচনা কিছুটা বেশ অগ্রসর হইয়াছে। এ কাব্য যে মধুর রসের এক উৎসরূপে গণ্য হইবে, অন্তর্যামী প্রভুর তাহা অজানা নাই।

আজ ভক্তপ্রবর রূপের মহিমা তিনি বাড়াইতে চান এবং বিশেষ করিয়া স্বরূপ ও রামানন্দের মতো রস-বিচারকদের স্বীকৃতি দিয়া তাঁহাকে নব প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করিতে চান।

সোৎসাহে প্রভু নিজেই একদিন রূপের খাতাপত্র টানিয়া বাহির করিলেন, কিছু কিছু অংশ তিনি পাঠ করিলেন। ভাষার লালিত্যে, রসের পারিপাট্যে ও শাস্ত্র-সিদ্ধান্তে এ রচনা সত্যিই অপরূপ।

প্রভু বিশেষ করিয়া বিদগ্ধ মাধবের পাণ্ডুলিপি হইতে একটি রমণীয় শ্লোক সবাইকে শুনাইতে লাগিলেন। এ শ্লোকটির মর্ম:

> 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' এই দুটি বর্ণ—
> আহা, কি অমৃত দিয়েই না হয়েছে সৃষ্ট!
> রসনায় যখন এ নামের হয় উচ্চারণ—
> হৃদয়ে উদ্গত হয় শত রসনা লাভের বাসনা।
> কর্ণে শ্রবণ করলে স্পৃহা ওঠে জেগে—
> কোটি কোটি কর্ণের জন্য।
> আর চেতনায় যখন এ নামের হয় স্ফুরণ।
> জীবের সর্ব ইন্দ্রিয় হয় যে পরাভূত!

ভক্তেরা আনন্দে উল্লসিত হইয়া উঠেন, আর এক বাক্যে সবাই প্রশস্তি গাহিতে থাকেন, নাম মাহাত্ম্যের এমন মধুর শ্লোক তো সহসা শুনা যায় না!

প্রভু শ্রীচৈতন্যের চোখ মুখ তৃপ্তির আনন্দে ভরিয়া উঠিয়াছে, প্রসন্ন অন্তরে বার বার রূপকে জানাইতেছেন আশীর্বাদ।

স্বরূপ এ সময়ে রামানন্দ রায়কে সার কথাটি বুঝাইয়া দিলেন। প্রভুর অন্তরের ইচ্ছা জানিয়া রূপ এক মহান্ কর্মে ব্রতী হইয়াছেন, শুরু করিয়াছেন কৃষ্ণলীলার নূতন নাটক রচনা।

প্রভু নির্দেশ দিলেন, "রূপ, সবাই তোমার রচনা শুনে উল্লসিত হয়ে উঠেছে। তোমার নূতন নাটক থেকে কিছু কিছু অংশ পড়ে শোনাও।"

রূপ সংকোচে আড়ষ্ট হইয়া আছেন, জোড়হস্তে নিবেদন করেন, "প্রভু, ম্লেচ্ছাধম আমি, কৃষ্ণলীলা নাট্য আমি কি লিখবো? শুধু লিখছি, তোমার ইচ্ছেটি জেনে।"

"না—না রূপ। তোমার রচনার কিছু কিছু অংশ রামানন্দ আর স্বরূপকে আজ পড়ে শোনাও।"

নাটক পাঠ শুরু হইল। স্বরূপ ও রামানন্দ তো মহাবিস্মিত। ভাষা, রস ও সিদ্ধান্ত সব দিক দিয়াই এ কাব্য অতি চমৎকার। প্রভু উপযুক্ত লোকের উপরই দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছেন। উপস্থিত সবাই ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন। প্রভুর দৃষ্টি বিশেষভাবে রামানন্দের দিকে নিবদ্ধ। রামানন্দের সারা অন্তর আনন্দে বিস্ময়ে ভরিয়া উঠিয়াছে। রূপকে লক্ষ্য করিয়া গদ্‌গদ স্বরে তিনি উচ্চারণ করিলেন প্রশস্তিবাণী:

কবিত্ব না হয় এই অমৃতের ধার।
নাটক-লক্ষণ সব সিদ্ধান্তের সার।
প্রেম পরিপাটি এই অদ্ভুত বর্ণন।
শুনি চিত্ত-কর্ণের হয় আনন্দ ঘূর্ণন।

(চৈ-চরিতামৃত, অন্ত্য)

রামানন্দ মরমী ও শাস্ত্রবেত্তা, নিজের নাটক 'জগন্নাথ বল্লভ'-এ সতর্কভাবে নিগূঢ় ও সূক্ষ্ম রসতত্ত্বের মীমাংসা তিনি করিয়াছেন। রূপের নাটকাংশ শুনিয়া তিনি সত্যই বিস্মিত। বুঝিলেন, এ কাজের পশ্চাতে রহিয়াছে প্রভু শ্রীচৈতন্যের প্রেরণা ও ঐশী ইঙ্গিত। নতুবা এমন বস্তু নবাগত ভক্ত রূপের লেখনীতে পরিবশিত হওয়া তো সম্ভব নয়। প্রভুর দিকে তাকাইয়া এবার সহাস্যে কহিলেন :

ঈশ্বর তুমি যে চাহ করিতে।
কাষ্ঠের পুত্তলী তুমি পার নাচাইতে॥
মোর মুখে যে সব রস করিলে প্রচারণে।
সেই রস দেখি এই ইঁহার লিখনে॥
ভক্তকৃপায় প্রকাশিতে চাহ ব্রজরস।
যারে করাও সে করিবে, জগৎ তোমার বশ॥

(চৈ-চরিতামৃত, অন্ত্য)

প্রভুর দিব্য প্রেরণা, কৃপা ও রসজ্ঞ বৈষ্ণবদের স্বীকৃতি রূপ লাভ করিয়াছেন। তাঁহার প্রতি সকলের আস্থা জাগিয়া উঠিয়াছে। এবার প্রভু তাঁহাকে বিদায় দিতে মনস্থ করিলেন।

সকলের আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া রূপ সেদিন বৃন্দাবনে রওনা হইতেছেন, এ সময়ে প্রভু কহিলেন :

ব্রজে যাই রস শাস্ত্র কর নিরূপণ।
লুপ্ত সব তীর্থ তার করিহ প্রচারণ॥
কৃষ্ণসেবা রসভক্তি করহ প্রচার।
আমিও দেখিতে তাহা যাব একবার॥

বৈষ্ণব শাস্ত্রের লিখন ও প্রচার, তীর্থ উদ্ধার ও বিগ্রহ সেবা এবং কৃষ্ণভক্তির পথে ভক্ত জনসমাজকে চালিত করা, এই তিনটি ঐশীকর্মের সূচনা ও প্রসার শ্রীচৈতন্য তাঁহার বৃন্দাবন সংগঠনের মধ্য দিয়া করিতে চাহিয়াছিলেন। সেই কথাটিই তাঁহার চিহ্নিত সেবক, প্রতিভাধর রসতত্ত্বের ব্যাখ্যাতা, রূপের মনে সেদিন দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত করিয়া দিলেন।

রূপ ও সনাতনের যুক্ত প্রতিভা এবং কর্মনিষ্ঠার ফল কয়েক বৎসরের মধ্যে ফলিতে দেখা যায়।—"উভয়ে কঠোর সাধনায় ও শাস্ত্রালোচনায় আত্মনিয়োগ করিয়া পরিমূর্ত প্রেমিকের আদর্শ স্বরূপ শীঘ্রই সর্বজাতীয় ভক্তের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। একদিকে যেমন দৈন্যমূর্তির অন্তরালে পাণ্ডিত্যের বিকাশ হইতে লাগিল, অন্যদিকে তেমনিই রাগানুগা ভক্তির দিব্যোন্মাদ তাঁহাদিগকে সকলের স্মরণীয় ও বরণীয় করিয়া তুলিল। একভাবে যেমন কাহারও মনে কোনো আধ্যাত্মিক সমস্যা উপস্থিত হইলে তিনি তাহার সমাধানের প্রত্যাশায় উঁহাদের দীর্ঘ কুটিরের দ্বারস্থ হইতেন, অন্যভাবে তেমনই কেহ মানবরূপী দেবতা দেখিয়া জীবন চরিতার্থ করিবার জন্য তাঁহাদের দর্শন লাভের জন্য লালায়িত হইতেন। তাঁহাদের ভবনকুঞ্জ মানব্-কুলের পবিত্র তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হইল।

"কত ভক্ত ও শিষ্য আসিলেন। তাহাদের সাহায্যে ভারতবর্ষের নানা প্রদেশ হইতে অসংখ্য শাস্ত্রগ্রন্থ সংগৃহীত হইয়া বৃন্দাবনে আসিল। উঁহাদের সাহায্যে সনাতনের বিচার শক্তি ও রূপের কবিত্ব প্রতিভা নূতন নূতন শাস্ত্রপথ পাইয়া গিরিনদীর মতো ক্ষিপ্রগতিতে ছুটিয়া চলিল। তাঁহাদের লিখিত, সংকলিত ও ব্যাখ্যাত ভক্তি-গ্রন্থসমূহ বিশ্বমানবের সার সম্পত্তি হইতে লাগিল।...

"মহাপ্রভু সনাতনকে বৃন্দাবনধামে পাঠাইবার সময় বলিয়া দিয়াছিলেন যে তিনি যেন শ্রীধামে তাঁহার দীন ভক্তবৃন্দের আশ্রয়-স্থল হন। কিন্তু সে কার্য তাঁহার একনিষ্ঠ কনিষ্ঠ ভ্রাতা দ্বারাই বিশেষ-ভাবে সাধিত হইয়াছিল। সনাতন কিছু আত্মহারা গম্ভীর প্রকৃতির লোক, সাধারণ কর্মপটুতা রূপেরই অধিক ছিল। উপযুক্ততার অনুপাতে মানুষের কর্মভার আপনিই জুটিয়া থাকে। চৈতন্যদেবের প্রবর্তনায় বা প্রচারিত উপদেশের ফলে যেমন দলে দলে ভক্তগণ নানাদিক হইতে বৃন্দাবনে আসিতেছিলেন, রূপ অগ্রণী ও উদ্যোগী হইয়া তাঁহাদের সকলের তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন। যিনি যেমন প্রকৃতির লোক, তাহাকে সেইভাবে কুটির বাঁধিয়া বাস করিতে দিয়া,

সকলের অভাব অভিযোগের সুমীমাংসা করিয়া রূপ গোস্বামী বৃন্দাবনের ভক্তমণ্ডলীর কর্তা হইয়া বসিলেন। এই কর্তৃত্বই গোস্বামী নামের সার্থকতা রাখিল। কাজের লোক চিনিয়া লইতে কাহারও বিলম্ব হয় না। নূতন ভক্ত কেহ আসিলে তিনি সর্বাগ্রে রূপকেই খুঁজিয়া বাহির করিতেন। প্রবাসী ভক্তেরা অঙ্গুলি দিয়া তাঁহাকেই দেখাইয়া দিতেন; কোনো পর্ব উৎসব অনুষ্ঠানের প্রস্তাব হইলে রূপই তাহার ব্যবস্থা করিতেন। এই প্রকার নানারূপে রূপ শ্রীকৃষ্ণ-রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনের রাজা, রূপ হইলেন তাঁহার রাজপ্রতিনিধি। রূপের নাম শীঘ্রই দেশে প্রচারিত হইল, শত শত ভক্ত তাঁহার অনুবর্তন করিয়া ব্রজমণ্ডলে এক সঙ্ঘ গড়িলেন। লোকে রূপের কথায় উঠিত বসিত এবং তাঁহার উপদেশের ফলে জ্ঞান ও সাধনার পথে অগ্রসর হইয়া ধন্য হইত। কে বড়, কে ছোট তাহা সকলে জানিত না, রূপ-সনাতন এই জোড়া নামে সকলে রূপেরই প্রাধান্য স্বীকার করিত। সমাজের প্রতি এমন অবাধ প্রতিপত্তি কম শক্তির পরিচায়ক নহে[১]।"

প্রভু শ্রীচৈতন্য শ্রীবিগ্রহ সেবার যে নির্দেশ দিয়াছিলেন রূপ ও সনাতন তাহা একদিনের তরেও বিস্মৃত হন নাই। লুপ্ততীর্থ উদ্ধারের পরিকল্পনার সঙ্গে তাঁহারা লুপ্ত শ্রীবিগ্রহের পুনরাবির্ভাবের কথাও একান্তমনে ব্যাকুলভাবে ভাবিতেছিলেন।

বৃন্দাবনে কাজ শুরু করার পর দীর্ঘ বৎসর গত হইয়াছে। রূপ ও সনাতনের পরে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন গোপাল ভট্ট, রঘুনাথ ভট্ট প্রভৃতি পণ্ডিত ও সাধকগণ। শ্রীচৈতন্যের লীলা সংবরণের পরে রঘুনাথ দাস প্রভৃতি বিশিষ্ট ভক্তেরাও বৃন্দাবনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গৌড়ীয় গোস্বামীদের তপস্যা, পাণ্ডিত্য, ও সংগঠনের গুণে বৃন্দাবন পরিণত হইল ভারতের এক শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবকেন্দ্র রূপে।

১ রূপ গোস্বামী : সতীশচন্দ্র মিত্র

ইতিমধ্যে ব্রজমণ্ডলের প্রাচীন এবং হারাইয়া যাওয়া পবিত্র বিগ্রহগুলির অনুসন্ধান প্রবলভাবে চলিতেছিল, এই সঙ্গে মিলিত হইয়াছিল সনাতন রূপ প্রভৃতির আর্তি ও ব্যাকুল প্রার্থনা। এ প্রার্থনার ফল অচিরে ফলিল। সনাতন গোস্বামী মথুরার চৌবেজীর গরীব বিধবার নিকট হইতে মদনগোপাল বিগ্রহ সংগ্রহ করিয়া আনিলেন। শ্রীবিগ্রহ কৃপাভরে চৌবে ঘরনীকে স্বপ্ন দেখাইয়া নিজেই নিজেকে সঁপিয়া দিলেন কাঙাল ভক্ত সনাতনের করে।

মদনগোপাল বিগ্রহের পর গোস্বামীদের করায়ত্ত হয় গোবিন্দদেব বিগ্রহ। ব্রজমণ্ডলের প্রসিদ্ধ এবং সুপ্রাচীন অষ্টমূর্তির মধ্যে এইটি সর্বপ্রধান। শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র বজ্রনাভের আমলের পরে এই বিগ্রহ আত্মগোপন করেন। রূপ গোস্বামীর অলৌকিকী প্রয়াসই এই পবিত্র ঐতিহ্যময় বিগ্রহকে লোকলোচনের সম্মুখে প্রকটিত করে এবং তিনিই পরম আনন্দে গ্রহণ করেন ইঁহার সেবা পূজার দায়িত্ব।

এই গোবিন্দদেবের উদ্ধার সাধনের কাহিনী আজো ব্রজমণ্ডলের জনমানসে জাগরূক রহিয়াছে, আজো পরম জাগ্রত বিগ্রহরূপে ইনি বিরাজিত রহিয়াছেন ভারতের প্রেমিক সাধকদের অন্তরপটে।

প্রাচীন শাস্ত্রায় গ্রন্থাদি ঢুঁড়িয়া রূপ গোস্বামী জানিয়াছিলেন, বৃন্দাবনের যোগপীঠে রাজা বজ্রনাভের এই শ্রীবিগ্রহটি বিরাজ করিতেন। কান্থা-করঙ্গধারী সনাতন ও রূপ যখন বৃন্দাবনের অরণ্যে প্রান্তরে তীর্থ উদ্ধারের জন্য ঘুরিয়া বেড়াইতেন, তখন হইতেই গোবিন্দদেব রূপের হৃদয়-সিংহাসন জুড়িয়া বসেন। কিন্তু কোথায় প্রাচীনকালের সেই যোগপীঠে, কোথায় কোন্ নদীগর্ভে বা দুর্গম বনে সেই বিগ্রহ আত্মগোপন করিয়া আছেন, তাহা কে বলিবে?

যখন যেখানে থাকিতেন কাঙাল বৈষ্ণব রূপ জপধ্যান শেষে রোজ জানাইতেন আকুল প্রার্থনা, "হে প্রভু, হে প্রাণনাথ, কোথায় তুমি লুকিয়ে আছো, আমায় তার সন্ধান দাও, এই ভক্তাধমের প্রাণ রক্ষা করো।"

এই প্রার্থনা একদিন ইষ্টদেব শুনিলেন, তাঁহার কৃপার উদ্রেক

হইল। সেদিন যমুনা তীরে বসিয়া সজল নয়নে শ্রীগোবিন্দের স্মরণ করিতেছেন, এমন সময়ে সেখানে আবির্ভূত হয় দিব্য লাবণ্যময় শ্যামকান্তি এক চঞ্চল ব্রজবালক।

"হেই বাবাজী, বসে বসে নিদ্ যাচ্ছো, না তোমার গোবিন্দের ধেয়ান করছো? গোবিন্দ তো হোথায়। ঐ গোমাটিলার ভেতরে।"

ধ্যানাবেশ কাটিয়া যায় রূপ গোস্বামীর, চমকিয়া আসন হইতে উঠিয়া দাঁড়ান। ব্যাকুল স্বরে প্রশ্ন করেন, "ভাই, গোমাটিলার কোথায় লুকিয়ে আছেন তিনি, কে আমায় তা বলে দেবে?"

"কেন, বাবাজী আমি বাতিয়ে দেবো তোমায়। জানতো ঐ গোমাটিলার এক জায়গায় রোজ তুপুরবেলায় একটা গাই চরতে আসে, আর ঠিক ঐ জায়গাতেই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে তুধ ঢেলে দিয়ে যায়। ওরই নিচেই তো রয়েছেন তোমার গোবিন্দজী।"

অপার্থিব আনন্দে প্রাণ-মন অধীর হইয়া উঠে, অর্ধবাহ্য অবস্থায় গোস্বামী ভাবিতে থাকেন, একি সত্যি সত্যিই কোনো ব্রজবালক, না দিব্যলোকের কোনো অধিবাসী? না স্বয়ং শ্রীগোবিন্দই ছদ্মবেশে হইয়াছেন আবির্ভূত? তীব্র-রসাবেশ জাগিয়া উঠে রূপ গোস্বামীর সারা দেহে মনে, তখনি তিনি মূর্ছিত হইয়া পড়েন।

জ্ঞান ফিরিয়া আসিলে দেখেন, সেই সুদর্শন বালক আর নাই, কোথায় সে অন্তর্হিত হইয়াছে।

ব্যগ্রভাবে রূপ গোস্বামী তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া যান সন্নিহিত গ্রামে। সবাইকে প্রশ্ন করেন গোমাটিলার রহস্যের কথা, গাভীর নিত্যকার তুগ্ধ ক্ষরণের কথা।

ব্রজবাসীরা সোৎসাহে বলিতে থাকে, "হাঁ, বাবাজী, তুমি তো ঠিক কথাই বলছো। অনেক বৎসর ধরে আমরা যে দেখে আসছি, গাই-এর তুধ ঠিক একটা জায়গাতে নিয়মিতভাবে ঝরে পড়ে। ওখানে কোনো দেবতা আছেন নিশ্চয়।"

আনন্দাশ্রু বহিতে থাকে রূপ গোস্বামীর নয়নে। সারা দেহ

ভাবাবেশে বার বার কণ্টকিত হইতে থাকে। আকুল প্রার্থনা জানান গ্রামের লোকদের কাছে, "ভাই সব, তোমরা চল। সবাই মিলে আমায় সাহায্য দাও। ঐ স্থান থেকে বার হয়ে আসবেন আমাদের সকলের প্রাণপ্রিয় ঠাকুর, শ্রীগোবিন্দদেব।"

বাবাজীর এই উৎসাহ ও প্রেরণায় সবাই উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠে, সমবেত চেষ্টায় শুরু হয় খননের কাজ। সেই দিনই আবিষ্কৃত হন শ্রীগোবিন্দের পবিত্র বিগ্রহ।

ঐ গোমাটিলাই যে দ্বাপর যুগের যোগপীঠ এবং ঐ বিগ্রহই যে বজ্রনাভ মহারাজের প্রতিষ্ঠিত ও পূজিত গোবিন্দদেব শাস্ত্রবাক্য উদ্ধৃত করিয়া রূপ গোস্বামী গ্রামবাসীদের কাছে, সাধু সন্ত ও ভক্তজনের কাছে, একথা প্রমাণিত করিলেন।

গোস্বামীর তপস্যার ফলে গোবিন্দদেব নিজে কৃপা করিয়া প্রকটিত হইয়াছেন, একথা অচিরে সারা ব্রজমণ্ডলে ছড়াইয়া পড়ে। দলে দলে ভক্ত ও সাধু সজ্জনেরা সেখানে সমবেত হইতে থাকেন, সবাই মিলিয়া অনুষ্ঠান করেন এক বিরাট ভাণ্ডারার।

উত্তরকালে রূপ সনাতনের সহকর্মী রঘুনাথ ভট্টের এক ধনবান শিষ্য গোবিন্দদেবের একটি সুন্দর মন্দির ও জগমোহন নির্মাণ করিয়া দেন।[১]

বৃন্দাবনের গৌড়ীয় গোস্বামীদের শাস্ত্র প্রণয়ন, সংকলন এবং প্রকাশনার বিস্তার ও গভীরতা দেখিলে বিস্মিত না হইয়া পারা যায় না। সহায়-সম্পদহীন এই কাঙাল ভক্তেরা দীর্ঘদিনের সাধনা ও

১ উড়িষ্যার রাজা প্রতাপরুদ্রের পুত্র, পুরুষোত্তম জানা, রূপ গোস্বামীর তিরোধানের কিছু পূর্বে এই মন্দির-বিগ্রহের পাশে একটি রাধিকা-মূর্তি স্থাপন করেন। মন্দিরটি পরবর্তীকালে জীর্ণ হইয়া পড়িলে অম্বরের রাজা মানসিংহ ইহার স্থলে লাল পাথরের কারুকার্যময় এক সুবৃহৎ মন্দির নির্মাণ করিয়া দেন। অতঃপর অওরঙ্গজেব এটির প্রধান অংশ ভগ্ন করিয়া দিলে মন্দিরের সৌন্দর্য ও বৈভব নষ্ট হয়।

কর্মনিষ্ঠায় যে শাস্ত্র-সম্পদ গড়িয়া তোলেন, তাহার তুলনা ইতিহাসে বিরল।

বৈষ্ণব ইতিহাসের গবেষক ও ব্যাখ্যাতা সতীশচন্দ্র মিত্র লিখিয়াছেন: ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমপাদে ইঁহারা যে ধর্ম গড়িয়া দেশময় তুমুল আন্দোলন তুলিয়াছিলেন, তাহার প্রবাহ কয় শতাব্দী পরে হইতে পারিত, তাহা কে জানে? কারণ বঙ্গের যাঁহারা শক্তিশালী বা সমৃদ্ধিশালী লোক, সমাজে যাঁহারা কুলীন বলিয়া চিহ্নিত, বঙ্গীয় সমাজের উচ্চস্তরের সেই ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য প্রভৃতি জাতির অধিকাংশই তখন শাক্ত মতাবলম্বী—তাঁহারা গৌড়ীয় বৈষ্ণবমতের ঘোর শত্রু ছিলেন। পাণ্ডিত্য প্রতিভায় বংশ পরম্পরায় যে ব্রাহ্মণগণ সর্বত্র খ্যাতিসম্পন্ন, ধর্মসাধনা অপেক্ষাও আচার-নিষ্ঠায় যাঁহাদের অধিক আগ্রহ, তাঁহারা সকলেই নবমতকে অশাস্ত্রীয় এবং অনাচরণীয় বলিয়া উপেক্ষা করিতেছিলেন। সুতরাং প্রবর্তক প্রভুদিগের অন্তর্ধানের পর এক তাঁহাদের ধর্মকে বাঁচাইয়া রাখা গুরুতর সমস্যার বিষয় ছিল। এদেশে শাস্ত্রের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠাপিত না হইলে কোনো ধর্মই টিকিবে না; এই পণ্ডিতের দেশে যেখানে সেখানে তর্ক-যুদ্ধে সকলকে পরাজিত করিয়া নিজমত স্থাপন করিতে না পারিলে, সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইবে—এ রহস্য চৈতন্য বুঝিতেন। ভাবের বন্যায় জলোচ্ছ্বাস আসিতে পারে, কিন্তু কালে শুষ্ক বালুকায় তাহা শুকাইয়া যাওয়া বিচিত্র নহে। তাহাকে দৃঢ় মৃত্তিকার খাতে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে না পারিলে, ইহা সুপেয় সলিলপূর্ণ গভীর জলাশয়ে পরিণত হইয়া চিরপিপাসুর তৃষ্ণা নিবারণে সমর্থ হইবে না।

—এই জন্যই শ্রীচৈতন্য নিজ ভক্তের মধ্য হইতে বাছিয়া বাছিয়া লোক পাঠাইয়া তাঁহাদের দ্বারা বৈষ্ণবমতের শাস্ত্রগঠন ও সংকলন করাইয়াছিলেন। জগতের সকল জাতির নেতৃবৃন্দের মধ্যে যিনিই উপযুক্ত লোক নির্বাচনে সুপটু এবং গুণগ্রাহী ও সূক্ষ্মদর্শী তিনি জগতে জয়লাভ করিয়াছেন। চৈতন্যমতের সাফল্যের ইহাই প্রধান কারণ।

—তিনি যাহাদিগকে মোহিনী মূর্তিতে আত্মসাৎ করিয়া শক্তি সঞ্চারিত করিয়াছিলেন, তাঁহার সেই বাছা বাছা ভক্তেরা নিখিল হিন্দু শাস্ত্রের আকর স্থান হইতে রত্নোদ্ধার করিয়া নব প্রবর্তিত গৌড়ীয় মতকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের নিকট লোকে সর্বপ্রথমে পাণ্ডিত্যে পরাজিত হইয়া মস্তক অবনত করিয়াছিলেন, তবে তো নবমতের বিজয়ে পতাকা উড়িয়াছিল। নতুবা আজ শ্রীচৈতন্যের ধর্মের কি পরিণতি হইত, কে বলিবে? যে সব সংসারত্যাগী অসাধারণ শাস্ত্রদর্শী দৈন্যবেশী সন্ন্যাসী ভক্তেরা বৃন্দাবনকে কেন্দ্রস্থল করিয়া, তথায় বসিয়া অসংখ্য দার্শনিক গ্রন্থ লিখিয়া বৈষ্ণবধর্মের ভিত্তিমূল রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান ছিলেন তিনজন—শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপ গোস্বামী এবং উহাদের ভ্রাতুষ্পুত্র ও শিষ্য শ্রীজীব গোস্বামী। সনাতন তাঁহার ধর্মকে ও ভক্তিবাদের সিদ্ধান্তকে সনাতন-ধর্মমতের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া প্রমাণিত করিয়াছেন। রূপ সে ধর্মের সাধন-প্রণালীর রূপ নির্ণয় করিয়াছেন, আর শ্রীজীব তাঁহার বিবিধ সন্দর্ভে তত্ত্বব্যাখ্যা করিয়া সে ধর্মকে চিরজীবী করিয়া গিয়াছেন।

এই গোস্বামীদের মধ্যে ত্যাগে, তপস্যায়, সংগঠন শক্তিতে, শাস্ত্র ও কাব্য রচনায় রূপ গোস্বামী ছিলেন অনন্যসাধারণ। কিন্তু তাঁহার শ্রেষ্ঠতম অবদান তাঁহার কৃষ্ণলীলা এবং কৃষ্ণরসে রসায়িত কাব্য ও নাটক।

"রূপ গোস্বামী আজন্ম কবি এবং অল্পবয়সেই পরম পণ্ডিত। তাঁহার হস্তাক্ষর যেমন মুক্তাপঙ্‌ক্তির মতো সুন্দর তাঁহার ভাষাও তেমনি মার্জিত, অলংকৃত এবং নিরুপম কবিত্বপূর্ণ। তাঁহার রচনা সর্বত্রই গভীর চিন্তাশীলতার পরিচয় দেয়; নব নব ভাব ও সুন্দর শব্দ-সমাবেশে তাঁহার শ্লোকগুলি বিষয়ানুরূপ গাম্ভীর্যে বিমণ্ডিত হইয়া কাব্য রসকলায় ভরপুর থাকে। সেই গুরুগম্ভীর শব্দ সম্ভারে ভারাক্রান্ত শ্লোকগুলি পড়িবামাত্র রূপ গোস্বামীর লেখনীপ্রসূত

বলিয়া ধরিতে পারা যায় এবং অর্থের উপলব্ধি হইবামাত্র উহাদের কবিত্ব-কৌশলে মুগ্ধ হইতে হয়। এমন ভাবুক, এমন লেখক যৌবনাবধি কেন যে মুসলমান শাসকের রাজস্বসচিব হইয়া তৃপ্ত ছিলেন তাহা বিস্ময়ের বিষয়। পারিপার্শ্বিক অবস্থার দোষে প্রমত্ত কবিকেও প্রচণ্ড বৈষয়িক করিতে পারে, ইহা তাহারই দৃষ্টান্ত। সংসারকে যে ভালো করিয়া ধরিতে জানে, কর্মবাসনার সমাপ্তি হইলে সেই আবার সংসারকে ভালো করিয়া ছাড়িতে পারে। মরিচা কাটিয়া গেলে সকল ধাতুরই ঔজ্জ্বল্য প্রকাশ পায়; বিষয় মরীচিকার হাতে নিস্তার পাইয়া রূপ যে নবজীবন পাইয়াছিলেন, তাহার ঔজ্জ্বল্যে সমগ্র ভারতবর্ষ উদ্ভাসিত হইয়াছে।

"রাজকর্মচারী থাকিবার কালেও তিনি কখনও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সঙ্গে শাস্ত্রচর্চায় বিরত হন নাই, তাঁহার কবি প্রতিভা কখনও সম্পূর্ণ লুক্কায়িত থাকে নাই। সংসার ছাড়িয়া বৃন্দাবনে আসিবার পর যখন তিনি রাশি রাশি শাস্ত্রগ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া তাহা লইয়া তদ্‌গতচিত্ত থাকিতেন, তখন তাহার চিন্তার ধারা স্বভাবত উছলিয়া পড়িত, ভাষা আসিয়া দাসীর মতো উহা বহন করিয়া লোকশিক্ষার জন্য গ্রন্থিত করিয়া রাখিত। কত কাব্য নাটক, কত স্তোত্র বা মন্ত্র কবিতা, কত সারার্থ-ব্যাখ্যা বা শাস্ত্র সংগ্রহ যে তাঁহার লেখনী মুখে প্রকাশিত হইত, তাহা বলিবার নহে। রূপ গোস্বামী বহু প্রকারের বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। শ্রীজীব গোস্বামী স্বপ্রণীত 'লঘুতোষণী' গ্রন্থে নিজ বংশের পরিচয় কালে ঐ সকল গ্রন্থের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন।[১]

কাব্য, নাটক, রসগ্রন্থ, স্তোত্র, ভাণিকা এবং শাস্ত্রসংগ্রহ পুস্তক সব মিলাইয়া রূপ গোস্বামী ষোলখানা গ্রন্থ প্রণয়ন ও সংকলন করেন। বিদগ্ধমাধব এবং ললিতমাধব এই নাটক দুইটিতে নায়ক শ্রীকৃষ্ণের বিদগ্ধ এবং ললিত এই দুইটি মাধুর্যময় রূপে এবং রাধা ও প্রধানা সখীদের সহিত তাঁহার মিলনলীলা বর্ণনা তিনি করিয়াছেন।

১ রূপ গোস্বামী : সতীশচন্দ্র মিত্র

মধুর রস যে সাধকদের উপজীব্য, এই নাটক দুইটিতে তাঁহাদের জন্য পরিবেশিত হইয়াছে কৃষ্ণের অনুপম ভাবমূর্তি ও নিগূঢ় প্রেমতত্ত্ব। কিন্তু রূপ গোস্বামীর গ্রন্থসমূহের মধ্যে সর্বপ্রধান হরিভক্তি রসামৃত-সিন্ধু এবং উজ্জ্বল নীলমণি। রসগ্রন্থ নামে এই দুইটি প্রসিদ্ধ।

ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর রচনায় সনাতন এবং রূপ এই দুই ভ্রাতারই অবদান রহিয়াছে। সনাতনই সেখানে শাস্ত্ররহস্যের বিচারকর্তা এবং রূপ তাঁহার নির্দেশ এবং সম্মতি নিয়া তত্ত্ব ও সিদ্ধান্ত স্থির করিয়াছেন, দীর্ঘ বৎসরের পরিশ্রমে এই মহাগ্রন্থ লিখিয়াছেন। এজন্য তিনিই ইহার রচয়িতারূপে পরিচিত। এই গ্রন্থে ভক্তিরসের বিভিন্ন ধারার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ তিনি দিয়াছেন এবং ভক্তির স্বরূপ ও প্রকারভেদ নির্ণয় প্রসঙ্গে উপস্থাপিত করিয়াছেন গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতবাদ।

ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে রূপ গোস্বামী শান্ত দাস্য প্রভৃতি সব রসের বর্ণনা দিয়াছেন, কিন্তু মধুর রস অত্যন্ত গূঢ় বলিয়া তাহার আলোচনা করিয়াছেন সংক্ষেপে। এই গূঢ় রসের বিস্তৃত ব্যাখ্যা পাওয়া যায় তাঁহার উজ্জ্বল নীলমণিতে। ভক্তি সমুদ্র হইতে নীলমণিতুল্য মধুর অথবা উজ্জ্বলরস আহরণ করিয়াছেন বিদগ্ধ লেখক, তাই ইহার নামকরণ করিয়াছেন—উজ্জ্বলনীলমণি। মধুর রসের বিস্তৃত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে এ গ্রন্থ ভরপুর।

শাস্ত্রসংগ্রহ গ্রন্থসমূহের মধ্যে রূপ গোস্বামীর লঘুভাগবতামৃত বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এটি আসলে সনাতন গোস্বামীর মহান্ গ্রন্থ বৃহৎ ভাগবতামৃতের সংক্ষেপণ। বিদগ্ধ রূপের মতে ভাগবতামৃত দুই প্রকারের,—কৃষ্ণামৃত ও ভক্তামৃত। গ্রন্থটি তাই বিভক্ত করা হইয়াছে দুই ভাগে। শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ নির্ণয়, অবতার তত্ত্বের আলোচনা এবং কৃষ্ণ অবতারের শ্রেষ্ঠত্ব এই গ্রন্থে তিনি প্রতিপাদিত করিয়াছেন। মথুরামণ্ডলে শ্রীকৃষ্ণ এখনো নিত্যলীলা করিয়া চলিয়াছেন, এবং দেবতারা সদাই তাহা দর্শন করেন,—এই তত্ত্বটি তিনি উপস্থাপিত করিয়াছেন শাস্ত্র পুরাণের বহুতর উদ্ধৃতি দিয়া।

বৈষ্ণবীয় সাধনা ও সিদ্ধির মূর্ত বিগ্রহ ছিলেন রূপ গোস্বামী। কোমলতা ও কঠোরতা, বৈরাগ্য ও অনুরাগ, বৈধী এবং রাগানুগা সাধনার ধৃতি, একসঙ্গে অপরূপ বৈশিষ্ট্য নিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছিল তাঁহার মহাজীবনে। ভক্তি ও জ্ঞানের ঘটিয়াছিল বিরাট সমন্বয়।

নিজস্ব সাধনজীবনে তিনি ছিলেন ডোরকৌপীনধারী দিনাতিদীন বৈষ্ণব। তৃণের অপেক্ষা নীচু এবং তরু অপেক্ষা সহিষ্ণু—মহাপ্রভুর এই বৈষ্ণবীয় আদর্শ রূপায়িত হইয়াছিল তাঁহার মধ্যে। কিন্তু এই সঙ্গে ছিল তাঁহার ধর্মীয় আদর্শ রক্ষার নিষ্ঠা ও অনমনীয়তা। শিষ্য ও ভক্তদের মধ্যে বিন্দুমাত্র শৈথিল্য বা স্খলন পতন ঘটিলে মুহূর্তমধ্যে প্রকটিত হইত তেজস্বী সিদ্ধপুরুষের অগ্নিগর্ভ মূর্তি, রুদ্ররোষে তিনি ফাটিয়া পড়িতেন। বৃন্দাবনের ভক্তসমাজে তাই রূপ গোস্বামী গণ্য হইতেন এক অনন্যসাধারণ বৈষ্ণব নায়করূপে।

দিক্‌পাল পণ্ডিত এবং অতুলনীয় কৃষ্ণরসবেত্তা ছিলেন রূপ-গোস্বামী। বৈষ্ণবীয় দৈন্য ও বিনয় ছিল তাঁহার চরিত্রের বড় বৈশিষ্ট্য, আর প্রতিষ্ঠা তাঁহার দৃষ্টিতে ছিল—শূকরী বিষ্ঠা। ভারতের দিগ্‌দিগন্ত হইতে কত ধর্মনেতা, কত দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিত বৃন্দাবনে আসিতেন, রূপ গোস্বামীর কাছে উপস্থিত হইতেন তর্ক-বিচারের জন্য। তিনি কখনো এজাতীয় দ্বন্দ্বে লিপ্ত হইতেন না, সানন্দে তৎক্ষণাৎ লিখিয়া দিতেন জয়পত্র। প্রতিদ্বন্দ্বী বুক ফুলাইয়া স্থানত্যাগ করিলে রূপ রত হইতেন তাঁহার শাস্ত্ররচনায় অথবা ভজনসাধনে।

একবার আচার্য বল্লভ ভট্ট রূপ গোস্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন। ভট্টজী বিষ্ণুস্বামী সম্প্রদায়ের প্রখ্যাত নেতা এবং ভক্তি-পুরাণ শাস্ত্রে সুপণ্ডিত। রূপ গোস্বামী তখন নিজের কুটিরে ভক্তিরসামৃতের পুঁথি রচনায় নিবিষ্ট আছেন, আর শ্রীজীব তাঁহার পাশে বসিয়া একটি পাখা হাতে নিয়া ভক্তিভরে তাঁহাকে ব্যজন করিতেছেন। রূপ ভট্টজীকে সসম্মানে অভ্যর্থনা জানান, একপাশে আসন বিছাইয়া বসিতে দেন।

কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর ভট্টজী রূপ গোস্বামীর সন্থ লিখিত পুঁথির দুই চারিটি শ্লোক শুনিতে চাহিলেন। রূপ মঙ্গলাচরণের দুই একটি শ্লোক পাঠ করার সঙ্গে সঙ্গে বল্লভ ভট্ট শাস্ত্রীয় বিতর্ক তুলিলেন, কহিলেন, "গোস্বামীজী, এ শ্লোকে ত্রুটি রয়েছে দেখতে পাচ্ছি, একটু সংশোধন ক'রে নেওয়া সঙ্গত।"

"অতি উত্তম কথা," তখনি সানন্দে বলিয়া উঠেন রূপ গোস্বামী। "আপনি দয়া ক'রে নিজে সংশোধন ক'রে দিলে বড়ই উপকৃত বোধ করবো। আপনি কাজটা এখানে বসে শেষ করুন। এদিকে আমার আবার ঠাকুর সেবার কাজ আছে, বেলা হয়ে যাচ্ছে, আমি যমুনায় স্নান সমাপন ক'রে আসছি।"

পুঁথিটি তেমনিভাবে খুলিয়া রাখিয়া প্রশান্ত মনে, অবলীলায়, রূপ গোস্বামী চলিয়া গেলেন।

শ্রীজীব কিন্তু এতক্ষণ চুপচাপ একপাশে উপবিষ্ট ছিলেন। ভট্টজী লেখনীটি হাতে নিয়া পাণ্ডুলিপি সংশোধনে উদ্যত হইতেই তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। কঠোর স্বরে কহিলেন, "আচার্য, একটু অপেক্ষা করুন। আগে স্থির হোক সংশ্লিষ্ট এ শ্লোকটিতে কোনো ত্রুটি আছে কিনা। আমাদের গোস্বামী প্রভু দৈন্যের অবতার। আপনি সম্পূর্ণ-রূপে ভ্রান্ত, একথা জেনেও আপনার অহংবোধকে উনি এভাবে কিছুটা প্রশ্রয় দিচ্ছেন।"

"কে হে তুমি অর্বাচীন! তোমার স্পর্ধাতো দেখ্‌ছি কম নয়। তুমি জানো, আমি কে?"

"আজ্ঞে, আপনার পরিচয় শুনেছি।"

"তবে? এমন সাহস পেলে কোথায়।"

"আচার্যবর, এ সাহস এসেছে গুরুকৃপায়। আপনি যাঁর লেখা সংশোধন করতে যাচ্ছেন, তাঁর কাছেই হয়েছে আমার দীক্ষা আর শাস্ত্র শিক্ষা। সে শিক্ষার এক কণাও আয়ত্ত করতে পারি নি। তবুও তাঁর প্রসাদে আমার মতো অর্বাচীনই বৃন্দাবনে আগত দুই চারিটি দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিতকে পর্যুদস্ত করেছে।"

"হুম্।" ভিতরকার ক্রোধ ও উত্তেজনা অতিকষ্টে সংযত করিয়া বল্লভ ভট্ট কহিলেন, "বেশ, গোস্বামীর এই শ্লোকটি যে সঙ্গত তার কারণ দর্শাও।"

"আপনি আদেশ করলে দেখাতে পারি বৈ কি।" একথা বলিয়া প্রতিভাধর তরুণ পণ্ডিত শ্রীজীব প্রাচীন শাস্ত্র হইতে ঐ শ্লোকের যথার্থতা সপ্রমাণ করিলেন।

আচার্য বল্লভ ভট্ট কিছুক্ষণ তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া রহিলেন, তারপর পাণ্ডুলিপিটি সশব্দে বন্ধ করিয়া দিয়া বিদায় নিলেন।

পথিমধ্যে রূপ গোস্বামীর সঙ্গে ভট্টজীর দেখা। আচার্য এসময়ে বড় গম্ভীর বদন। কহিলেন, "গোস্বামী মহারাজ, আপনার কুটিরে উপবিষ্ট ঐ তরুণ বৈষ্ণবটি কে?"

"কেন বলুন তো? ঐটি আমার শিষ্য, শ্রীজীব।"—সন্দিগ্ধ স্বরে উত্তর দেন রূপ। বল্লভ ভট্ট এবার বিষন্ন স্বরে সংক্ষেপে বর্ণনা করেন শ্রীজীব সম্পর্কিত ঘটনার কথা। তারপর ধীর পদে সেখান হইতে প্রস্থান করেন।

কুটিরের আঙিনায় পা দিয়াই রূপ গোস্বামী কঠোর স্বরে শ্রীজীবকে নিকটে ডাকিলেন। প্রেমবিলাস এই বিস্ফোরণশীল পরিস্থিতির বর্ণনায় বলিতেছেন:

শ্রীরূপ ডাকিয়া কহে শ্রীজীবের প্রতি।
অকালে বৈরাগ্য বেশ ধরিলে মূঢ়মতি॥
ক্রোধের উপরে ক্রোধ না হইল তোমার।
তে কারণে তোর মুখ না দেখিব আর॥

শ্রীজীব নতশিরে নীরবে দাঁড়াইয়া আছেন। মুহূর্তমধ্যে তিনি উপলব্ধি করিয়াছেন নিজের অপরাধের গুরুত্বের কথা। সত্যিই তো, ক্রোধ ত্যাগ না করিলে সর্বত্যাগী বৈরাগী হওয়া, শ্রীকৃষ্ণের চরণে নিবেদিত-প্রাণ ভক্ত হওয়া তো সম্ভব নয়!

রূপ গোস্বামী এবার কহিলেন, "তুমি কি ভেবেছো, বল্লভ ভট্ট যে ভ্রান্ত, একথা আমি বুঝি নি। সব বুঝেই আমি তাঁকে প্রশ্রয় দিয়েছি,

তাঁর কাছে নতি স্বীকার করেছি। অনেক দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিতকেই বৃন্দাবনে আমি বিনা-তর্কে জয়পত্র দিয়ে দিয়েছি। তোমার তো এসব অজানা নেই। মহাপ্রভুর পবিত্র ধর্ম যে প্রচার করবে, তার তো তোমার মতো আচরণ থাকা উচিত নয়। শুধু ক্রোধ নয়, সূক্ষ্ম অহংবোধও তোমার এ মনোভাবে প্রচ্ছন্ন রয়েছে। এগুলো পরিহার যদি করতে পারো, তবেই আসবে আমার কাছে, নতুবা নয়।”

প্রাণাধিক ভ্রাতুষ্পুত্র এবং নিজের হাতে গড়া দিক্‌পাল শিষ্য শ্রীজীব বৃন্দাবনের ভক্তি সাম্রাজ্যের তিনি ভবিষ্যৎ অধ্যক্ষ। সেই শ্রীজীবকে এক মুহূর্তে বিতাড়িত করিতে রূপ গোস্বামীর সেদিন এতটুকুও বাধে নাই। বৈষ্ণবীয় নীতি ও নিষ্ঠা বিষয়ে এমনি বজ্রকঠোর ছিলেন তিনি।

গুরুকে প্রণাম করিয়া, ক্রন্দন করিতে করিতে জীব গোস্বামী প্রবেশ করেন বৃন্দাবনের এক জনমানবহীন দুর্গম জঙ্গলে। সেখানে লতাপাতা দিয়া এক পর্ণকুটির বাঁধিয়া শুরু করেন নূতনতর কৃচ্ছ্র ও তপস্যা। সংকল্প করেন, যে শোধন ও রূপান্তর গুরু দাবি করিয়াছেন তাহা সাধিত না হইলে লোকালয়ে আর কখনো ফিরিয়া আসিবেন না, জীবনপাত করিবেন এই অরণ্যে।

কয়েক মাস অতিবাহিত হইয়া গেল। অত্যধিক কঠোরতার মধ্য দিয়া শ্রীজীব দিনাতিপাত করিতেছেন। দূর গ্রাম হইতে কেহ কখনো আসিয়া যদি কিছু খাদ্য দেয়, তাহা দিয়াই জীবনধারণ করেন। এক একদিন কোনো রাখাল বা ভক্ত বনবাসী একমুষ্টি গম নিয়া হয়তো উপস্থিত হয়। তাহাই চূর্ণ করিয়া জলসহ তিনি পান করেন। আবার নিমগ্ন হন দীর্ঘ সময়ের জপ ধ্যানে।

হঠাৎ একদিন এই বনের প্রান্তস্থিত গ্রামে সনাতন গোস্বামীর আগমন ঘটে। গ্রামের সবাই প্রাচীন মহাত্মা সনাতনের ভক্ত ও অনুরাগী। নানা কুশল প্রশ্নাদির পর নবীন বৈরাগীর কথাটি প্রকাশ হইয়া পড়ে। কৌতূহলী সনাতন তখনি বহির্গত হন তাঁহার খোঁজে।

দর্শন পাওয়া মাত্র শ্রীজীব লুটাইয়া পড়েন পিতৃব্যের চরণতলে, নিবেদন করেন তাঁহার দুর্ভাগ্যের কথা। স্নেহে করুণায় সনাতনের হৃদয় বিগলিত হইল, সান্ত্বনা দিলেন নানা ভাবে কিন্তু রূপের মনোভাব কি, সঠিকভাবে তাহা জানেন না। তাই তাঁহার সম্মতি না নিয়া শ্রীজীবকে নিজের সঙ্গে নিতে সাহসী হইলেন না।

বৃন্দাবনে আসার পর রূপের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইতেই সনাতন প্রশ্ন করিলেন, "তোমার ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর রচনা কতটা এগিয়েছে? সমাপ্ত হতে আর বিলম্ব কত?"

রূপ গোস্বামী উত্তর দিলেন, "কাজ তো অনেকটা অগ্রসর হয়েছে। এতদিন সমাপ্ত হয়ে যেতো যদি শ্রীজীব কাছে থাকতো, আর তার সাহায্য পেতাম। তাকে তো সেদিন হঠাৎ এ স্থান ত্যাগ করতে হয়েছে।"

"আমি সব শুনেছি। বনে ভ্রমণ করার সময় শ্রীজীবের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎও ঘটেছে। আহা! অনাহারে, অনিদ্রায় ও কঠোর তপস্যায় তার যা হাল হয়েছে, তার দিকে আর তাকানো যায় না। অতি শীর্ণ, অতি দুর্বল তার দেহ। দেখলাম, কোনো মতে প্রাণটুকু মাত্র রয়েছে।

সনাতনের অন্তরের কথা এবং তাঁর ইঙ্গিতের মর্ম রূপ বুঝিলেন। সনাতন শুধু তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাই নয়, তাঁহার গুরুস্থানীয়—তাঁহার হৃদয়ের দেবতা। তাই স্থির করিলেন, আর নয়, এবার শ্রীজীবকে ক্ষমা করিতে হইবে। প্রায়শ্চিত্ত তাহার ইতিমধ্যে অনেকটা হইয়াছে।

সেই দিনই পত্রী পাঠাইয়া শ্রীজীবকে ডাকাইয়া আনিলেন, সেদিনকার অপরাধটি তখনি মার্জনা করা হইল। গুরুর করুণা লাভ করিয়া শ্রীজীব যেন পুনর্জীবন প্রাপ্ত হইলেন।

এই ঘটনার মধ্য দিয়া সারা বৃন্দাবনের ভক্তসমাজে একটা ত্রাসের সঞ্চার হইয়াছিল এবার তাহা দূর হইল। সবাই হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন।

বৃন্দাবনে প্রভু শ্রীচৈতন্যের আদিষ্ট কর্ম উদ্‌যাপনে রূপ সনাতন নিজেদের জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। কাঙাল কান্থা করঙ্গিয়া এই দুই বৈরাগী পত্তন করিয়াছেন এক বিরাট ভক্তি সাম্রাজ্যের। বিশেষ করিয়া তাঁহারা চিহ্নিত হইয়াছেন প্রভু প্রচারিত ভক্তি-প্রেমধর্মের চিহ্নিত অধিনায়করূপে। তৎকালীন ভক্ত সমাজের অন্যতম মুখপাত্র কৃষ্ণদাস কবিরাজ এই দুই গোস্বামীর মূল্যায়ন করিতে গিয়া লিখিয়াছেন :

সনাতন কৃপায় পাইনু ভক্তির সিদ্ধান্ত।
শ্রীরূপ কৃপায় পাইনু রসভার প্রান্ত॥

প্রায় অর্ধশত বৎসরের বিপুল উদ্যম ও প্রয়াসের ফলে ভক্তিধর্ম ও রসতত্ত্বের বিরাট শাস্ত্র ভাণ্ডার রচিত হইয়াছে, গঠিত হইয়াছে নিগূঢ় সাধনার সিদ্ধিতে সমুজ্জল সাধকগোষ্ঠী। সর্বাপেক্ষা আনন্দের কথা. এই শাস্ত্রভাণ্ডার এবং এই সাধকগোষ্ঠীর কুশলী ও প্রতিভাধর নেতারূপে ধীরে ধীরে অভ্যুদয় ঘটিতেছে শ্রীজীবের। রূপ গোস্বামীও সনাতন গোস্বামী উভয়ে প্রাচীন হইয়াছেন, দীর্ঘদিনের কৃচ্ছ্র ও পরিশ্রমে স্বাস্থ্যও তাঁহাদের ভাঙিয়া পড়িতেছে। এবার তাই উন্মুখ হইয়া আছেন শেষের দিনটির জন্য।

অল্পকালের মধ্যে. আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথিতে বৃদ্ধ সনাতন গোস্বামী সবাইকে শোকসাগরে ভাসাইয়া দেহত্যাগ করিলেন। দেবপ্রতিম জ্যেষ্ঠভ্রাতা, শিক্ষাগুরু এবং রূপের জীবনের সর্বকর্মের উদ্যোক্তা ও নায়ক ছিলেন সনাতন গোস্বামী। তাই এই বিচ্ছেদ রূপের পক্ষে বড় মর্মান্তিক। কাঁদিয়া কাঁদিয়া সনাতনের শেষকৃত্য সমাপন করিলেন, সাড়ম্বরে ভাণ্ডারা অনুষ্ঠানও সমাপ্ত হইয়া গেল। তারপর রূপ গোস্বামী প্রবেশ করিলেন তাঁহার নিভৃত ভজনকুটিরে।

জীবনের অবশিষ্ট কয়েকটি মাস এই কুটির হইতে তাঁহাকে বাহির হইতে দেখা যায় নাই, ইষ্টধ্যানে ও ইষ্টনাম জপে নিরন্তর থাকিতেন তিনি অভিনিবিষ্ট।

১৫৫৪ খ্রীষ্টাব্দের চিহ্নিত ক্ষণে মহাসাধকের চির বিদায়ের লগ্নটি আসিয়া যায়, প্রাণপ্রভু গোবিন্দদেবের শ্রীবিগ্রহের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া প্রবিষ্ট হন নিত্যলীলায়। ভারতের অধ্যাত্ম-আকাশ হইতে খসিয়া পড়ে প্রেমভক্তি সাধনার এক অত্যুজ্জ্বল নক্ষত্র।

তন্ত্রাচার্য শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব

উনবিংশ শতাব্দীর ভারতে ধর্ম-সংস্কৃতি, শিক্ষা ও রাষ্ট্রচিন্তায় এক নব জাগৃতির সূচনা হয়। এই জাগৃতির প্রধান উৎসটি সেদিন বিরাজিত ছিল বাংলাদেশে। পাশ্চাত্যের শিক্ষা ও ধ্যান ধারণায় তখন নব্যপন্থী বাঙালীর জীবন প্রভাবিত। শিক্ষিত মহলে আধুনিক বিচারবুদ্ধি, যুক্তিনিষ্ঠা ও বস্তুতান্ত্রিকতা দিন দিন প্রবল হইয়া উঠিতেছে। ধর্ম, সমাজ ও রাজনীতিতে শুরু হইয়াছে নূতন মূল্যায়ন। ইহাতে একদিকে সুফল যেমন ফলিয়াছে, কুফলও কম দেখা দেয় নাই। নব্যপন্থীদের বেশীর ভাগই উন্নাসিক ও উগ্রমতবাদী। ভারতের ধর্ম-সংস্কৃতির অনেক কিছুই তাঁহাদের মতে হেয় ও কুসংস্কাচ্ছন্ন, তাই অনেক কিছুই নস্যাৎ করিয়া দিতে তাঁহারা উৎসাহী হইয়া উঠিয়াছেন।

মানস সংকটের এই দুর্দিনে আবির্ভাব ঘটে সনাতন ধর্মের ধারক বাহক একদল শক্তিধর আচার্য ও সাধকের। শাশ্বত ভারতের প্রাণ-স্পন্দন তাঁহারা উৎকর্ণ হইয়া শুনিয়াছেন, দু'চোখ ভরিয়া দেখিয়াছেন তাঁহাদের ধ্যানের ভারতকে, আকণ্ঠ পুরিয়া পান করিয়াছেন প্রাচীন শাস্ত্র, সাধনা ও তত্ত্বজ্ঞানের সুধা। তারপর অবতীর্ণ হইয়াছেন ভারত-ধর্মের উজ্জীবন ও বিস্তার সাধনে। এই শক্তিধর আচার্য ও সাধকদের অন্যতম শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব।

শক্তি সাধনায় শিবচন্দ্র সিদ্ধ হন, তারপর তন্ত্রের পরম তত্ত্বের প্রচারে ব্রতী হইয়া তন্ত্রকুশল একদল সাধককে তিনি উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলেন। শিবচন্দ্র ও তাঁহার পূর্ণাভিষিক্ত শিষ্য স্যর জন উড্রফ, শুধু ভারতেই নয়, সারা বিশ্বে তন্ত্রশাস্ত্র ও তন্ত্রসাধনার যে বিজয়-কেতন উড়াইয়া গিয়াছেন, এদেশের ধর্ম-সংস্কৃতির ইতিহাস কোনোদিন তাহা বিস্মৃত হইবে না।

৮

১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে, অবিভক্ত বাংলার নদীয়া জেলার কুমারখালিতে, শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব ভূমিষ্ঠ হন। গৌরী নদী বিধৌত এই গ্রামটিতে তখন ছিল বহু সম্পন্ন গৃহস্থ ও সাধু সজ্জনের বাস। নিকটবর্তী গ্রাম ভাঁড়ারায় থাকিয়া সাধনভজন করিতেন মরমিয়া সাধক লালন ফকির। দ্বিজটা সন্ন্যাসী, সনাতন গোস্বামী, মহাত্মা সোনাবঁধু, পাগল হরনাথ প্রভৃতি সিদ্ধ সাধকদের অধ্যুষিত ছিল এই অঞ্চল।

কুমারখালির ভট্টাচার্য বংশ চিরদিনই সাধনা ও শাস্ত্রচর্চার জন্য প্রসিদ্ধ। এই বংশেরই অতুজ্জ্বল রত্ন, তন্ত্রাচার্য শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব। পিতার নাম চন্দ্রকুমার তর্কবাগীশ। মাতা—চন্দ্রময়ী দেবী। পিতামহ কৃষ্ণসুন্দর ভট্টাচার্য ছিলেন একজন বিশিষ্ট তন্ত্রশাস্ত্রবিদ্, তান্ত্রিক ক্রিয়া অনুষ্ঠানেও তাঁহার দক্ষতা ছিল অসাধারণ।

এই ভট্টাচার্যদের আদিনিবাস ছিল ফরিদপুর জেলার কুমার-নদের তীরে পহিশালা গ্রামে। পরবর্তীকালে নদীয়ার কুমারখালিতে তাঁহারা বসবাস করিতে থাকেন। এ বংশের পিতৃপুরুষদের মধ্যে কামদেব. জয়দেব ও নিমানন্দ ভট্টাচার্যের তন্ত্রসাধনার খ্যাতি দীর্ঘদিন প্রচারিত ছিল।

শিবচন্দ্রের হাতেখড়ি হয় সাধক-সাহিত্যিক কাঙাল হরিনাথের কাছে। উত্তরকালেও শিবচন্দ্রের সাধনা ও সাহিত্যচর্চার উপর কাঙালের প্রভাব কিছুটা বিস্তারিত হয়।

পাঁচ বৎসর বয়সে বালককে স্থানীয় স্কুলে ভর্তি করিয়া দেওয়া হয়। এখানে জলধর সেন ছিলেন তাঁহার অন্যতম সহপাঠী।

কুমারখালি স্কুলে শিবচন্দ্র পড়াশুনা করিতেছেন, মেধাবী ছাত্র বলিয়া শিক্ষকদের প্রিয় হইয়াও উঠিয়াছেন, কিন্তু ইতিমধ্যে হঠাৎ সামান্য একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া তাঁহার জীবনের গতি পরিবর্তিত হইয়া গেল।

আজন্ম সুহৃদ্ জলধর সেন ইহার এক বিবরণ দিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন :

শিবচন্দ্রের পিতা, আমাদের চন্দ্রকাকা, অত্যন্ত তেজস্বী ব্রাহ্মণ ছিলেন। শিবচন্দ্র তখন চরিতাবলী পড়েন।

সেই সময় চন্দ্রকাকা একদিন শিবকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'ও কি পড়িস্‌রে শিব?'

শিবচন্দ্র বলিলেন,—'ডুবালের গল্প।'

'ডুবালের গল্প? দেখি,' এই বলে বইখানা হাতে নিয়ে চার পাঁচ লাইন পড়ে সেটি দূরে নিক্ষেপ করে, বললেন,—'এইসব বুঝি পড়া হয়?' দেশে আর মানুষ নেই, মহাপুরুষ নেই—পড়িস কিনা ডুবালের গল্প। যাঃ কাল থেকে আর তোকে স্কুলে যেতে হবে না। এই ডুবালেই দেখছি দেশটা ডুবালে।

তেজস্বী ব্রাহ্মণের যে কথা সেই কাজ। পরদিন থেকে শিবচন্দ্র আর স্কুলে গেলেন না।

ইংরেজী স্কুলে পড়াশুনা করা এবং তাহার প্রতিশ্রুতিময় সম্ভাবনা শেষ হইয়া গেল। অতঃপর পিতা শিবচন্দ্রকে নবদ্বীপের এক চতুষ্পাঠীতে পাঠাইয়া দেন এবং সেখানেই গড়িয়া উঠে শিবচন্দ্রের শাস্ত্র-সাধনার ভিত্তি।

ব্যাকরণ, কাব্য, অলংকার অল্পকালের মধ্যেই তিনি আয়ত্ত করিয়া ফেলেন। বিশেষ করিয়া এই কিশোর ছাত্রের সহজাত কবিত্বের খ্যাতি স্থানীয় পণ্ডিত মহলে ছড়াইয়া পড়ে।

নবদ্বীপের সারস্বত জীবন তখন ছিল চাঞ্চল্যময় এবং প্রাণবন্ত। দেশবিদেশ হইতে প্রতিভাধর ছাত্রেরা এখানকার টোলে শাস্ত্রপাঠ করিতে আসিতেন। এ সময়কার স্মৃতিচারণ করিতে গিয়া শিবচন্দ্র উত্তরকালে তাঁহার বাল্যকালের সহজাত কবিত্ব শক্তির এক মনোজ্ঞ বর্ণনা দিয়াছেন :

নবদ্বীপের হর ভট্টাচার্য মহাশয়ের বার্ষিক শ্রাদ্ধ তত্রত্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিতসমাজে একটা বিশেষ বার্ষিক ব্যাপার বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। এই ব্যাপার শীতকালে অনুষ্ঠিত হইত। পৌষ কি মাঘমাসে তাহা আমার মনে নাই, উক্ত শ্রাদ্ধে নবদ্বীপ ও তাহার প্রান্তবর্তী

গ্রাম-সমূহের অধ্যাপক ও ছাত্রসমাজ সাদরে নিমন্ত্রিত হইতেন; বলা অধিক যে ব্যাকরণ, সাহিত্য, স্মৃতি ও ন্যায়শাস্ত্রের সকল টোলেই মাসাবধি পূর্ব হইতে ছাত্রগণ তর্কবিচারে 'শান' দিতে আরম্ভ করিতেন। উহা যেন ছাত্র সমাজের একটা বার্ষিক পরীক্ষার সময়, কে কাহাকে পরাজয় করিয়া নিজে কৃতী হইবে সে জন্য সকলেই বিশেষ ব্যস্ত।

আমার সেরূপ ব্যস্ততার কোনো কারণ ছিল না। ব্যাকরণের ছাত্র আমি,—আমার বিচার আচার কিসের? অন্যান্য ছাত্রগণের সহিত আমিও সেদিন নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়াছিলাম। গিয়া দেখি বিশাল সভা প্রাঙ্গণে কোথাও ন্যায়ের, কোথাও স্মৃতির, কোথাও সাহিত্যের, কোথাও ব্যাকরণের ছাত্রগণের দলে দলে একেবারে বিচার বিতর্কের দাবানল জ্বলিয়া উঠিয়াছে। সাত আট শত ছাত্র, দুই শতের অধিক অধ্যাপক—নানা শাস্ত্রের ভাষাভেদে বিচারের স্থানটি বিষম কোলাহলে পরিপূর্ণ। কেবল অধ্যাপক মধ্যস্থগণই যাহা কিছু নিস্তব্ধ। চতুর্দিকে পাঁচশতেরও অধিক শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ ও ভদ্রগণ শ্রোতা দর্শকরূপে দণ্ডায়মান।

তখনও পাকা টোলের ছাত্রগণ আসিয়া উপস্থিত হন নাই। এই টোলের ছাত্রসংখ্যা তখন শতাধিক এবং সকল ছাত্রই মৈথিলী ব্রাহ্মণ। কবিতার পাদপূরণ করিতে পারিতাম বলিয়া আমার কিছুটা খ্যাতি ছিল। আমি উপস্থিত হইবা মাত্রই সভার কর্তৃপক্ষগণ একটি দৃশ্য পদার্থ স্বরূপে আমাকে বিশেষ আদর করিয়া তদানীন্তন অধ্যাপক সমাজের শীর্ষস্থানীয় হরমোহন তর্ক চূড়ামণি, প্রসন্নকুমার ন্যায়রত্ন, ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন প্রভৃতি অধ্যাপকগণ সভার মধ্যস্থলে যেখানে উপবিষ্ট ছিলেন আমাকে তাঁহাদের নিকট আনিয়া বসাইয়া দিলেন।

আমি যেমন গিয়া বসা, অমনই সমস্যা পূরণের তরঙ্গ উঠিল। অধ্যাপকগণ অনেকেই এক একটি প্রশ্ন করিলেন, তাহার সকল-গুলিরই উত্তর দিতে লাগিলাম। এই কৌতুক দেখিবার নিমিত্ত

তারিণীচরণ চট্টোপাধ্যায় (ভারতবর্ষের ইতিহাস প্রণেতা ও সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যাপক) আনন্দবাবু প্রভৃতি তখনকার গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ আসিয়া আমাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইলেন।

এই সময় দেখিলাম—পাকা টোলের ছাত্রমণ্ডলী সেই সভায় আসিতেছেন। সে এক অদ্ভুত অপরূপ দৃশ্য। সকলেই হিন্দুস্থানী বস্ত্র পরিহিত, গলে রুদ্রাক্ষমালা, কপালে রক্তচন্দনের তিলক ত্রিপুণ্ড্র, মস্তকের শিখায় এক একটি জবাপুষ্প; অধিকাংশই সুদীর্ঘ মূর্তি এবং গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ—হন্ হন্ করিয়া দ্রুতপদে বিচারোন্মুখ স্ফুরিত ওষ্ঠাধরে তাঁহাদের সেই সভা প্রবেশ মনে করিলেও এক অপূর্ব দৈব দৃশ্য বলিয়াই বোধ হয়। যাহা হউক, তাঁহারা সভার মধ্যস্থলে আসিয়া মণ্ডলাকারে বসিলেন।

বিচারের চেষ্টা হইতেছিল কিন্তু সম্মুখেই আমার পাদপূরণের ঘটাঘট্ট এবং সুখ্যাতির গৌরবটা যেন তাঁহাদের কিছু অসহ্য বোধ হইল। তাঁহারা বিচারের দিক হইতে আমার দিকেই দৃষ্টি প্রসারণ করিলেন এবং হরমোহন তর্কচূড়ামণি মহাশয়কে বলিলেন, "আমরা একবার ইহার পরীক্ষা করিব। আমাদের প্রদত্ত সমস্যা যদি পূরণ করিতে পারে, তবেই ইহাকে কবি বলিয়া স্বীকার করিব, অন্যথায় নহে।"

এতদিন পর্যন্ত কখনও সমস্যা পূরণে আমার কোনো রূপ ভয়, বিভীষিকা বা আতঙ্ক উপস্থিত হয় নাই। কিন্তু আজ এই সকল মৈথিলী ছাত্রগণের এই ভীম ভৈরব মূর্তি আর ন্যায়শাস্ত্রের প্রখর বিদ্যার স্ফূর্তি, এই দুই দেখিয়া আমার মনে ভয়ের উদয় হইয়াছিল।

তাঁহারা ত্বরিত পদে আমার নিকট আসিয়া আকৃষ্ট মুষ্টি প্রসারণ পূর্বক সদম্ভে প্রশ্ন করিলেন, "সূচ্যগ্রে ষট্কুপং তদুপরি নগরী, তত্র গঙ্গা প্রবাহ।" অর্থাৎ একটি সূচের অগ্রভাগে ছয়টি কূপ, তাহার উপর এক নগরী, তাহাতে গঙ্গাপ্রবাহ।

শুনিয়া তো আমার চক্ষুস্থির। এ পর্যন্ত পাদপূরণের সময়ে

কখনও বিশেষ সময় লইয়া কোনোদিন কিছু চিন্তা করি নাই, প্রশ্ন শুনিবামাত্র তাহার উত্তর যখন যাহা মনে আসিয়াছে তখন তাহাই দিয়াছি, কিন্তু আজিকার প্রশ্নে সে চিন্তার আবশ্যক হইল বলিয়া লজ্জায় ভয়ে আড়ষ্ট হইলাম।

একটু চিন্তার পর আমার উত্তরের উপক্রম দেখিয়া পাণ্ডিত্য, এবং চাতুর্যের চূড়ামণি হরমোহন তর্কচূড়ামণি মহাশয় তখন আমাকে সাবধানতার ইঙ্গিতপূর্বক কহিলেন, "মুখে উত্তর করিও না, কাগজে লিখিতে হইবে।" ইহা বলিয়া দোয়াত কলম কাগজ আমার কাছে সরাইয়া দিলেন।

আমি একবার ঊর্ধ্বে দৃষ্টিপাত করিয়া সর্বান্তঃকরণে জগদম্বাকে স্মরণ করিয়া কবিতা লিখিলাম। আমার লেখা শেষ হইলে, চূড়ামণি মহাশয় আমার হাত হইতে কাগজখানি লইয়া শ্লোকটি মনে মনে পড়িয়া দেখিলেন, দেখিয়া তখন উহা মুষ্টিবদ্ধ করিয়া তারিণীচরণ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত যাবতীয় ভদ্রগণকে ডাকিয়া বলিলেন, "আপনাদিগকে একবার ইহার মধ্যস্থ হইতে হইবে। মৈথিল সমাজের সহিত নবদ্বীপ সমাজের চিরকাল বিদ্যার স্পর্ধা, তজ্জন্য আমি বলিতেছি, আজ মৈথিলী ছাত্র সমাজ এই বালকের প্রতি যে ভয়ঙ্কর কূট সমস্যার কঠোর বজ্র নিক্ষেপ করিয়াছেন, তাহা আপনারা স্বচক্ষে দেখিলেন, স্বকর্ণে শুনিলেন। এখন বঙ্গীয় বালকের দ্বারা এই মৈথিলী অধ্যাপকগণের কূট সমস্যার উত্তর যাহা হইল তাহা এই কাগজে লেখা আমার হাতে। আগে আমি উহা পড়িতে দিব না। ইহারা যে শ্লোকের এক চরণে আজিকার এই প্রশ্ন করিয়াছেন অবশ্য তাহার আরও তিন চরণ আছে—ইহা ধ্রুব নিশ্চিত। উঁহাদের দেশে এই সমস্যার উত্তরে সেই তিন চরণে কি লেখা আছে, তাহা না দেখিয়া না শুনিয়া আমরা আমাদের উত্তর উঁহাদিগকে দেখিতে দিব না। সেই তিন চরণ কি, অগ্রে আমাদিগকে বলুন।"

তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের কূট কৌশলে বাধ্য হইয়া তাঁহাদিগকে

উহা বলিতে হইল, দুই কবিতার সমালোচনার জন্য উহাও কাগজে লিখিয়া লইলেন। সেই তিন চরণের ভাব মাত্র আমার মনে আছে —অর্থাৎ চন্দ্র সূর্যের যদি গতি স্তব্ধ, জলে যদি অগ্নি জ্বলে, পর্বতের শিখরে যদি পদ্ম প্রস্ফুটিত হয়, তবেই এরূপ প্রশ্ন হয়।

তাঁহাদের সেই শ্লোকের ব্যাখ্যা সাধারণকে বুঝাইয়া দিয়া চূড়ামণি মহাশয় তখন আমার সমস্যা পূরণের শ্লোকটি আমাকে পাঠ করিতে বলিলেন। আমি উহা পড়িলাম এবং উহার অর্থও সাধারণকে বুঝাইয়া দিলাম। শ্লোকটির কিছুমাত্র এখন মনে নাই, তবে যাহা মনে আছে তাহা এই--মনুষ্য জীবনের অতি সূক্ষ্মাগ্র মনই সুতীব্র সূচ্যগ্রস্বরূপ, তাহারই উপরিভাগে ছয়টি কূপ—কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য; তদুপরি নগরী এই বিশাল সংসার, তন্মধ্যে গঙ্গা প্রবাহ—ইহলোক পরলোকে নিরন্তর যাতায়াত।

ইহা শুনিয়া মৈথিলীগণ নিজেরাই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিলেন, "আমাদের যাহা শ্লোক আছে, এ শ্লোকের নিকট তাহা সমস্যাপূরণ বলিয়াই গণ্য নহে।"

তখন তর্কচূড়ামণি মহাশয়ও বলিতে লাগিলেন, "তবে বল, তোমাদের দেশের প্রসিদ্ধ, প্রবীণ ও প্রাচীন অধ্যাপকগণ দ্বারা যাহা হয় নাই, আমাদের বঙ্গদেশের দশ এগার বৎসরের বালকের দ্বারা তাহা সম্পন্ন হইল। ইহাও জানিয়া রাখিবে, এই বালক আমাদের নবদ্বীপ সমাজের গৌরব পতাকা।"

মৈথিলীগণ সানন্দে তাঁহার সে কথা স্বীকার করিয়া সহাস্য বদনে আমাকে যথেষ্ট আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন, "বালক আজ শুধু কবি নয়, 'কবিরত্ন' বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়া বাঙালীর—বিশেষত নবদ্বীপ পণ্ডিতসমাজের মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন।

এ সভাতেই বালককালে সর্বসম্মতিক্রমে আমার কবিরত্ন উপাধি লাভ হইল[১]।

---

১ বীরাচারী তন্ত্রসাধক শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব: বসন্তকুমার পাল, হিমাদ্রি কা ২৯শে পৌষ, ১৩৭২

সংকোচবশত নবদ্বীপের প্রবীণ পণ্ডিতদের প্রদত্ত এই উপাধি কিন্তু শিবচন্দ্র জীবনে কখনো ব্যবহার করেন নাই।

শিবচন্দ্রের মেধা ও প্রতিভা দেখিয়া এ সময়ে যে সব অধ্যাপক বিস্মিত হন তাঁহাদের মধ্যে দু'একজন প্রস্তাব করেন, শিবচন্দ্রকে সংস্কৃত কলেজে পড়ানো হোক। কিন্তু শিবচন্দ্রের রক্ষণশীল পিতা ও পিতামহের সম্মতি মিলিল না, কারণ সেখানেও ইংরেজীর ছোঁয়াচ রহিয়াছে। নবদ্বীপের টোলেই উচ্চতর পাঠ তিনি সমাপ্ত করিলেন। পারঙ্গম হইয়া উঠিলেন ব্যাকরণ, সাহিত্য, স্মৃতি ও দর্শনশাস্ত্রে।

সংস্কৃত টোলের অধ্যয়ন শেষে শিবচন্দ্র কলিকাতায় গিয়া বিদ্যাসাগর উপাধি পরীক্ষা দেন, এই পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণও হন। কিন্তু এই বিদ্যাসাগর উপাধি গ্রহণেও তাঁহাকে সে সময়ে রাজী করানো যায় নাই।

তিনি দৃঢ়স্বরে সাইকে বলেন, "ভেবে দেখলাম, আমার গুরু-স্থানীয় জীবনানন্দ বিদ্যাসাগর মহাশয় বেঁচে থাকতে 'বিদ্যাসাগর' উপাধি ব্যবহার করা আমার পক্ষে সমীচীন হবে না। এতে তাঁর অসম্মান করা হবে। কাজেই এ উপাধি আমি বর্জন করছি।"

সমবেত পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁহার এ কথা শুনিয়া মহা সমস্যায় পড়িলেন। অতঃপর অনেক কিছু ভাবিয়া চিন্তিয়া তাঁহারা শিবচন্দ্রকে ভূষিত করিলেন বিদ্যার্ণব উপাধিতে। উত্তরকালে এই উপাধি দ্বারাই জনসমাজে তিনি পরিচিত হইয়া উঠেন।

পরীক্ষা, উপাধি, এসব সম্পর্কে তরুণ শিবচন্দ্রের আর যেন তেমন উৎসাহ নাই। বরং এই বয়সেই অধ্যাত্মজীবনের আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিয়াছে তাঁহার অন্তরে। জন্মান্তরের শুভ সংস্কার নিয়া জন্মিয়াছেন, তদুপরি রহিয়াছে পিতা ও পিতামহের শাস্ত্রজ্ঞান ও সাধনার বীজ। বংশের বৈশিষ্ট্য হইতেছে তান্ত্রিক সাধনা—এই সাধনার দিকেই তিনি নিয়ত আকৃষ্ট হইতেছেন। জগজ্জননী তারা-মায়ের অমোঘ আহ্বান হৃদয়ে দোলা দিতেছে বার বার।

'বিদ্যাসাগর' উপাধি ত্যাগের সময় শিবচন্দ্র তাঁহার তারা-মায়ের

উদ্দেশ্যে একটি কবিতা লিখেন। তরুণ বিদ্যার্থী কিভাবে অধ্যাত্ম-জীবনের পথে এ সময়ে মোড় নিতেছেন, এই ভাবময় কবিতাটিতে তাহার চিহ্ন পরিস্ফুট :

ভাইরে! আর কি কর বিদ্যার সাধন
মহাবিদ্যা মাকে ভুলে ?
যাত্রা কর সেই পরীক্ষায় তারানামের
নিশান তুলে॥
তারা বিদ্যা, তারা শিক্ষা, তারা বিশ্ববিদ্যালয়।
শাস্ত্র তারা, ছাত্র তারা, স্বয়ং গুরু তারাময়॥
যত দেখ দর্শন শাস্ত্র (ওরে) তারার দর্শন
কিছুতেই নয়।
ওরে, সব অদর্শন, যদি আমার তারা মায়ের
দর্শন না হয়॥
তারা পদাম্বুজ প্রান্তে যারা করে তারা লয়।
এই তারাতেই তারা দেখে যায়রে
তারা তার আলয়॥
তারা মায়ের মায়া বলব কি ভাই।
হ'লে পরে মহা প্রলয়।
শব হয় এসব, তবু সে সব—ভাইরে
মা মোর কোলে লয়॥
ভাই—এ সময় ভাই! সময় থাকতে বল
—জয় জয় তারার জয়।
যে বলে সেই তারার জয় জয়, সেই
করে সেই তারার জয়॥
তাই—তারা হয়েও তারার জয় নাই,
কেবল তারার ছেলের জয়।
অধিকন্তু, তারার জয়ে—তারা হয় রে
মৃত্যুঞ্জয়।

অধ্যাত্ম-জীবন গঠনের স্পৃহা ক্রমেই বাড়িয়া উঠিতেছে। তাই শিবচন্দ্র এবার অধ্যাত্ম-ভারতের মর্মকেন্দ্র কাশীতে গিয়া উপস্থিত হন। শাস্ত্র পাঠ, ধর্মদর্শনের আলোচনা ও সাধনভজন সব কিছুরই সুযোগ-সুবিধা এখানে রহিয়াছে। শিবচন্দ্র এই সুযোগ সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করার জন্য তৎপর হইয়া উঠেন। প্রসিদ্ধ বেদান্তী, শতাধিক বর্ষীয় আচার্য, রামরাম স্বামীর নিকট এ সময় তিনি বেদান্তের পাঠ নিতে থাকেন।

আগম নিগমের রহস্যবেত্তাও কাশীধামে কয়েকজন আছেন। ইহাদের পদপ্রান্তে বসিয়া তন্ত্রশাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্ব শিক্ষা করিতে শিবচন্দ্র সচেষ্ট হন।

অসামান্য মেধা ও প্রতিভা নিযা তিনি জন্মিয়াছেন। তাই অল্প সময়ের মধ্যে ষড়দর্শনের মর্ম এবং সাধনভজনের বিভিন্ন পন্থা সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করিতে তাঁহাকে দেখা যায়।

কাশী হইতে ফিরিয়া আসিয়া শিবচন্দ্র নিজ জীবনের লক্ষ্য এবং আদর্শ স্থির করেন। তন্ত্রতত্ত্ব ও তন্ত্র সাধনায় পারঙ্গম হইবার জন্য হন কৃতসংকল্প।

পিতামহ কৃষ্ণসুন্দর ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ তান্ত্রিক। তন্ত্রশাস্ত্র ও তান্ত্রিক ক্রিয়ায় তাঁহার পারদর্শিতার কথা সারা নদীয়া জেলায় পরিব্যাপ্ত। শিবচন্দ্র তাঁহারই নিকট হইতে তন্ত্রসাধনার পাঠ নেওয়া স্থির করিলেন।

কৃষ্ণসুন্দর আনন্দে উল্লসিত হইয়া উঠেন, বলেন, "শিব, তুমি যে আমাদের বংশের ঐতিহ্য অনুযায়ী শক্তিসাধনায় রত হতে চাও, তন্ত্রতত্ত্ব আয়ত্ত করতে চাও, এ অতি উত্তম কথা। জানতো, আমাদের বংশেই জন্মেছেন তন্ত্রসিদ্ধ মহাপুরুষ কামদেব, জয়দেব, নিমানন্দ প্রভৃতি। এদের শক্তি বিভূতির কথা আজো মধ্য বাংলার সাধক ও পণ্ডিতেরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে থাকেন। এই সব সিদ্ধ-পুরুষদের ধারা তোমার ভেতর দিয়ে বয়ে চলুক, এই তো আমি চাই। কিন্তু এজন্য তোমাকে চলতে হবে একটা সুনির্দিষ্ট পথ অনুসরণ ক'রে।"

শিবচন্দ্র উত্তরে বলেন, "কি করতে হবে, আজ্ঞা করুন। শক্তি আরাধনার জন্য আমি বদ্ধপরিকর। আরও স্থির করেছি, তন্ত্র সাধনা সম্বন্ধে লোকের মনে, বিশেষ ক'রে এ যুগের শিক্ষিত মানুষের মনে, যে ভুল ধারণা আছে তা দূরীভূত করবো।"

"এজন্য তো প্রস্তুতি চাই, ভাই।"

"আপনি আমায় নির্দেশ দিন কি করতে হবে, এজন্য জীবন দিতেও আমি কুণ্ঠিত হবো না।"

"দুটো কাজ তোমায় করতে হবে। তুমি আনুষ্ঠানিক দীক্ষা গ্রহণ করো, তন্ত্রাভিষেক গ্রহণ করো এবং তন্ত্রোক্ত ক্রিয়া সম্যক্‌ভাবে আয়ত্ত করো। এই সঙ্গে তন্ত্রের প্রকৃত শাস্ত্রতত্ত্ব ও গূঢ় রহস্যের সঙ্গে পরিচিত হয়ে ওঠো।"

"এ সম্পর্কে আপনি যা করতে বলবেন, যেখানে যেতে বলবেন, আমি সেজন্য প্রস্তুত।"

"কোথাও তোমায় যেতে হবে না। আমাদের এই গৃহেই রয়েছে প্রাচীন তন্ত্রশাস্ত্রের বহুতর প্রাচীন পুঁথি। পিতৃপুরুষেরা এগুলো বহুকাল ধরে সংগ্রহ ক'রে আসছেন বাংলার প্রাচীন তন্ত্রাচার্যদের কাছ থেকে। নেপাল ও তিব্বত থেকেও আনীত হয়েছে তালপত্রে ভূর্জপত্রে লেখা কিছুসংখ্যক মূল্যবান পুঁথি। এগুলো তুমি আমার কাছে বসে অধ্যয়ন করো। শক্তি সাধনার শাস্ত্রীয় ভিত্তি দৃঢ় ক'রে তোল। আমি আশীর্বাদ করছি, অচিরে তুমি তন্ত্রসিদ্ধ হও, পরিণত হও তন্ত্রের বিশিষ্ট আচার্যরূপে।"

অভিজ্ঞ ও প্রবীণ তান্ত্রিক বলিয়া পিতামহ কৃষ্ণসুন্দরের সুনাম ছিল। শিবচন্দ্র আবিলম্বে তাঁহার নিকট হইতে গ্রহণ করিলেন শাক্তী দীক্ষা। এই সঙ্গে শুরু করিলেন আগম নিগম শাস্ত্রের চর্চা। প্রাচীন ও দুর্লভ যে সব পুঁথি গৃহে সযত্নে সঞ্চিত ছিল, এবার সেগুলি তিনি যত্ন সহকারে পাঠ করিতে থাকেন। ফলে তন্ত্রের শাস্ত্রীয় ভিত্তিটি তাঁহার জীবনে দৃঢ়তর হইয়া উঠে। শুধু তাহাই নয়, কয়েক বৎসরের মধ্যে কৌল সাধন ও কৌল শাস্ত্রের প্রকৃত স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে তিনি সফলকাম হন।

এই সময় ভেড়ামারা গ্রামের চিন্তামণি দেবীর সহিত শিবচন্দ্রের বিবাহ হয়। কিন্তু এই পত্নী বেশী দিন জীবিত থাকেন নাই, একটি শিশু কন্যা রাখিয়া তিনি লোকান্তরে চলিয়া যান। পরবর্তীকালে পিতা চন্দ্রকুমারের আগ্রহে ও নির্দেশে আবার শিবচন্দ্রকে গার্হস্থ্য জীবনে প্রবেশ করিতে হয়। ঐ স্ত্রী ছিলেন কুমারখালি গ্রামের কন্যা, নাম—মনমোহিনী দেবী।

আজীবন ঘর সংসারে অবস্থিত রহিয়াছেন শিবচন্দ্র, দেশের মানুষ ও সমাজকে ভারতের আত্মিক-জীবনের প্রেরণায় করিয়াছেন উদ্বোধিত, আর তন্ত্রতত্ত্বের প্রচারে করিয়াছেন আত্মনিয়োগ। কিন্তু তাঁহার সমস্ত কিছু অস্তিত্ব, সমস্ত কিছু কর্মোদ্যমের অন্তরালে সদা-বিরাজিত রহিয়াছেন তাহার ইষ্টদেবী সর্বমঙ্গলা মা। এই মায়ের কৃপায় ও মায়ের সাধনায় তাঁহার জীবন হইয়াছে দিব্য আনন্দ ও চৈতন্যে ভরপুর। উত্তর জীবনে এক তন্ত্রসিদ্ধ মহাপুরুষরূপে ঘটিয়াছে তাঁহার অভ্যুদয়।

তরুণ বয়সেই আপন জীবনের আদর্শ ও লক্ষ্য শিবচন্দ্র স্থির করিয়া ফেলেন। তন্ত্রসাধনায় সিদ্ধকাম হইবেন এবং তন্ত্রশাস্ত্রের প্রকৃত স্বরূপ ও মাহাত্ম্য সর্বত্র প্রচার করিবেন—এই সংকল্পটি তাঁহার মনে ধীরে ধীরে দানা বাঁধিয়া উঠে।

জন্মগত সংস্কারের প্রভাবে শিবচন্দ্র স্বভাবতই মাতৃসাধনায় উদ্বুদ্ধ। ভট্টাচার্য বংশের পুরাতন তান্ত্রিক ঐতিহ্য এবং নিমানন্দ প্রভৃতি সিদ্ধ কৌলদের কাহিনী বাল্যকাল হইতে দৃঢ়মূল হইয়া বসিয়া গিয়াছে তাঁহার অন্তরে। এবার তাঁহাদেরই অনুসৃত সাধনপন্থা তিনি গ্রহণ করিলেন একনিষ্ঠভাবে।

এই তন্ত্র সাধনা শুরু করার কয়েক বৎসরের মধ্যেই সিদ্ধিলাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠেন শিবচন্দ্র। শিবধাম বারাণসীতে বেদান্তী যোগী তান্ত্রিক বৈষ্ণব সকল সাধকেরই আনাগোনা। প্রকাশ্যে এবং প্রচ্ছন্ন-ভাবে মাঝে মাঝে প্রাচীন ও শক্তিধর তন্ত্রসাধকেরা এখানে আসিয়া

অবস্থান করেন। উচ্চকোটি সাধক মহলে প্রায়ই ব্যাকুলভাবে খোঁজাখুঁজি করেন শিবচন্দ্র। ইহাদের আস্তানা বাহির করিয়া, ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে বাস করেন, শিক্ষা করেন সাধনার নানা নিগূঢ় পদ্ধতি।

শিবচন্দ্রের প্রধান শিষ্য এবং দীর্ঘ দিনের সহচর দানবারি গঙ্গোপাধ্যায় বলিয়াছেন, "কাশীধামে থাকার কালে একবার দেখা যায়—জটাজুট সমন্বিত, রক্তচক্ষু, এক অতি প্রাচীন তান্ত্রিক মহাত্মার পিছনে পিছনে শিবচন্দ্র ঘোরাফেরা করিতেছেন। এ সময়ে মণি-কর্ণিকার শ্মশানে অমাবস্যার নিশীথ রাত্রে কয়েকটি নিগূঢ় ক্রিয়াও এ সময়ে ঐ মহাত্মার সাহায্য নিয়া অনুষ্ঠান করেন। নিজের দৃঢ় সংকল্প, দুর্জয় সাহস ও একনিষ্ঠার ফলে শিবচন্দ্র মহাত্মাটির বিশেষ কৃপা লাভ করেন এবং তন্ত্রসাধনার কয়েকটি সিদ্ধি তাঁহার করায়ত্ত হয়।

অতঃপর কাশী হইতে শিবচন্দ্র স্বগ্রাম কুমারখালিতে ফিরিয়া আসেন। এখন হইতে জগন্মাতার দর্শনের জন্য তিনি অধীর হইয়া উঠেন, মত্ত হন প্রচণ্ড সাধন সমরে। দেখি, ছেলে হারে কি মা হারে—এই ভাব! সারা দিন রাতের অধিকাংশ সময় কাটিয়া যায় মাতৃপূজায় আর মাতৃধ্যানে। আর অমাবস্যার নিশি আসিলেই, গভীর রাত্রের সূচীভেদ্য অন্ধকারের মধ্যে উপবেশন করেন গ্রামের উপান্তে মহাশ্মশানে। চারিদিকে কঙ্কাল করোটির ছড়াছড়ি, আর মাঝে মাঝে দুই একটি চিতার আগুনে দগ্ধ হইতেছে শবদেহ।

তন্ত্রোক্ত সাধন-উপচার সঙ্গে নিয়া শিবচন্দ্র শ্মশানে বসিয়া সমাপ্ত করেন তাঁহার নিগূঢ় ক্রিয়া অনুষ্ঠান। 'তারা তারা' শব্দে উত্থিত হয় তাঁহার ভীমভৈরব আরাব। তারপর স্বরচিত সাধন সংগীতের মধ্য দিয়া শুরু হয় তাঁহার প্রাণের আকুতি। ইষ্টদেবীর চরণে সিদ্ধির সংকল্প নিবেদন করেন বার বার :

স্বয়ম্ভু-শয়নে নিদ্রা পরিহরি, —
ষড়দলে সুষুম্না পথ ভেদ করি,
জাগো জাগো, মহা-যোগ যোগেশ্বরী,
সে যোগ সংযোগে জা-গো।

ঢুলু ঢুলু আঁখি উন্মীলন করি,
চাহগো চিন্ময়ি! নিদ্রা পরিহরি,
ব'স দিগম্বর-হৃদে দিগম্বরী,
ঘুচাও মা বিরাগ॥
নব অনুরাগে মাত মাতঙ্গিনি!
মহাকাল-হৃদে কাল কাদম্বিনী
দোল দোল দিগম্বর নিতম্বিনি;
পুরাও যে সোহাগ।
সোহাগের ভরে সাদরে অধরে,
ধর কাদম্বিনী করাম্বুজ পরে,
মাতি শিবানন্দে, মাতাও শিবচন্দ্রে
(দাও) স্বধাম-সমাধি যোগ।
কুল মন্ত্রময়ি! কুল তন্ত্র মাঝে
কুল কুণ্ডলিনি! কুলযন্ত্র বাজে
সে কুল-কুণ্ডলে, এলোকেশী সাজে
একবার সাজগো!
লয়ে কুল-নাথে কুল সমী কুলে
কুল যজ্ঞে পূর্ণাহুতি দাও মা! কুলে
সে আহুতি তরে ও যন্ত্র কুহরে।
জানত মা! আজ জা-গো।

অনন্ত কোটি বিশ্বের মহাবিস্তারে, অনাদ্যন্ত এ সৃষ্টিতে শিবচন্দ্রের আরাধ্যা জননী মহাকালীর লীলা বিস্তারিত। ব্রহ্মানন্দের লহরী লীলায় নিরন্তর চলে তাঁহার লীলাবিলাস। এ লীলা বৈচিত্র্যের বর্ণনা দিয়াছেন শিবচন্দ্র অন্তরের ভাব গদ্‌গদ ভাষায়। শুধু ভাবের ঐশ্বর্য নয়, বাংলা গদ্যের নিটোল মাধুর্য ও বলিষ্ঠতার প্রকাশ দেখি তাঁহার এই বর্ণনায়:

"আমরি মরি মরি। কি মধুর ভৈরব নিস্তব্ধতা। আর কিন্তু

অনন্তশান্তি প্রস্রবণ। আনন্দময়ী মায়ের আমার ব্রহ্মানন্দ লহরী যেন কৈবল্যধাম হতে নিষ্যন্দিত হয়ে এই ধরাধাম বিপ্লবিত করেছে। আমরি! আমরি! অমাবস্যার মহানিশার এই নবনীরদ নিবিড় নীল সৌন্দর্য সাগরে পূর্ণিমার পূর্ণেন্দু চন্দ্রিকা কি আজ জলবুদ্বুদ বিন্দু বলিয়া বোধ হয় না? উর্ধ্বে এই অনন্ত আকাশ, নিম্নে এই বিশাল বিস্তীর্ণ ধরিত্রীমণ্ডল—ইহারই আবার মধ্যস্তরে কখন শূন্য, কখন পূর্ণ, কখন বায়ু, কখন অগ্নি, কখন মেঘ, কখনও বিদ্যুৎ, কখন বৃষ্টি, কখন রশ্মি—কত রঙ্গে কত তরঙ্গ কতবার আসছে, কতবার যাচ্ছে, কার সাধ্য তাহার ইয়ত্তা করে?

"শুধুই কি এই? এর মধ্যে আবার কত চন্দ্র সূর্য কত গ্রহপুঞ্জ নক্ষত্রলোক স্তরে স্তরে সুসজ্জিত। জ্যোতিষ্কমণ্ডলের এই সমুজ্জ্বল জ্যোতিঃপুঞ্জ এক জ্বলছে আর নিভ্ছে, যেন সুবর্ণময় কুসুমস্তবক খচিত প্রসারিত নীলাম্বরের উদ্দীপ্ত অঞ্চল বায়ুবেগে একবার উড়ছে, একবার পড়ছে—আর সেই সঙ্গে সঙ্গে এই চন্দ্র সূর্য এবং গ্রহ নক্ষত্র জ্যোতিষ্কদামও যেন অয়ন ঋতু তিথি ভেদে এক একবার জ্বলে উঠছে, অঞ্চলের পরিবর্তনে আবার যেন নিভে যাচ্ছে—কখন দিন, কখন রাত্রি, কখন সন্ধ্যা, কখন বা মধ্যাহ্ন। কখন শীত, কখন গ্রীষ্ম, কখন শরৎ, কখন বসন্ত, কখন পূর্ণিমা, কখন অমাবস্যা, কত নিত্য নব পরিবর্তন এ অঞ্চলে একবার উঠছে একবার পড়ছে—অথচ লোকে দেখছে—আকাশ কেবল শূন্য শূন্য বই আর কিছুই নয়। এমন অসীম পূর্ণতা কি আর কোথাও সম্ভবে?

"এই অসীম অনন্ত আকাশের নামই অম্বর—অসম্বর স্বরূপিণী দিগম্বরী মা আমার এই অম্বরে গা ঢাকা দিয়েছেন। পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতনী যাকে নিজের আবরণ করেছেন, সে যদি শূন্য হয় তবে আর পূর্ণ কার নাম? উর্ধ্বে দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া বলি তা'ত হল -আবরণ বলেই কি এমন ক'রে গা ঢাকা দিতে হয় যে—স্বর্গ, মর্ত, রসাতল, আকাশ পাতাল—কোথাও আর খুঁজে সন্ধান পাবার উপায় নাই। তুমি গা ঢাকাই দাও আর যাই করো, ও অসম্বর স্বপ্রকাশ স্বরূপ

তোমার অম্বরে কি গা ঢাকে মা? আমার কিন্তু দেখে বোধ হয়, খেলার ঘোরে উন্মাদিনী বালিকা যখন আপন ভাবে আপনি আত্মহারা হ'য়ে বসনভূষণ দূরে ফেলে খেলতে খেলতে এক দিগন্ত হতে অন্য দিগন্তে ছুটে পালায়, তেমনি কি জানি কি খেলার ঘোরে, আপন ভাবে বিভোর হ'য়ে, মা তুই তোর এই দিগম্বর ছুঁড়ে ফেলে উন্মাদিনী উলঙ্গিনী সেজে যেন কোন নিভৃত দিগন্তে গিয়ে কোথায় আবার কি খেলা খেলছিস্। তাই তোর অভাবে তোর বসন এই পূর্ণ আকাশও আজ শূন্য হয়ে পড়ে আছে, অম্বরের অঞ্চলে এই স্তরে স্তরে কত চন্দ্র সূর্য গ্রহ নক্ষত্র প্রকৃতির সোহাগের হিল্লোলে ও অভিমানে ধূলায় পড়ে গড়াগড়ি দিচ্ছে।"

বড় ভয়ঙ্করা, বড় মধুরা, বড় স্নেহময়ী শিবচন্দ্রের এই ইষ্টদেবী। এই দেবীকে সাধনসমরে পরাভূত করিতে হইবে, সাধক শিবচন্দ্রের হৃদয়সাগরে ঘটাইতে হইবে তাঁহার জ্যোতির্ময় পূর্ণ প্রকাশ ঃ

কে রে, শ্যামা ত্রিভঙ্গিনী।
অলস আবেশে খল খল হাসে,
একাকিনী তবু সমর রঙ্গিণী।
প্রেমে টলমল অরুণ কমল,
মদে ঢল ঢল ত্রিনয়নী।
গলিত বসনে, দলিত রসনে
মধুর হাসনে মন্মোহিনী।
মুক্ত মহাকালে, নৃত্য তালে তালে,
নিত্য লীলাময়ী উন্মাদিনী।
শিবচন্দ্র হৃদি—আনন্দ জলধি
তরল তরঙ্গে চন্দ্রাননী।

"নাচ মা মোর এলোকেশী"—ভাবের ঘোরে এই গান প্রায়ই গাহিয়া উঠিতেন শিবচন্দ্র। হৃদয়াকাশের অন্তহীন গহ্বর, আর বিশ্ব

সৃষ্টির আদি অন্তহীন মহাবিস্তার, এই দুইয়েতেই রহিয়াছে পরাশক্তি জগজ্জননীর এলোকেশ বিস্তারিত। সর্বত্রই শিবচন্দ্র দর্শন করেন, মহামায়ার মায়া। আদরের সন্তান তাঁহার ভাবরসে আপ্লুত হইয়া মাকে এই মায়া প্রসঙ্গে যাহা বলিয়াছেন, অধ্যাত্ম-সাহিত্যে তাহার তুলনা খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। তিনি বলিয়াছেন :

"মা, তুমি মায়া বিজয়িনী কিন্তু মায়া বিধ্বংসিনী নও, যেহেতু তুমি মা, ত্রিলোকলোচনের আলোকরূপিণী, মায়া তোমার নিবিড় অন্ধকারময়ী তমঃ শক্তি, আঁধার আলোকের শরণাগত, তাই মায়া তোমার চরণাশ্রিতা, ভাব দেখিয়া আমার বোধ হয়, মা! এই মায়াই তোমার আলুলায়িত কেশপাশ, তাই নিত্য-লীলায় নিত্যধামে, তোমার ঐ নিত্য মূর্তির উপাদান কুঞ্চিত কেশকলাপরূপে অনিত্য জগৎ প্রসবিত্রী মায়াকেও তুমি স্থান দিয়াছ, মায়া তোমারি ইচ্ছায় উৎপন্না, তোমারই অবলম্বনে অবস্থিতা। তুমি যদি তোমার শ্রীঅঙ্গে তাহার অবস্থান অঙ্গীকার করিয়া স্থান না দিতে, তবে কি মায়ার সত্তা বলিয়া জগতে কোনো পদার্থ থাকিত? তবে কি মায় কেশরূপে হেলিয়া দুলিয়া, তোমার সোহাগ ভরে ঢলিয়া ঢলিয়া চর চুম্বনের অধিকার পাইত? .

"মায়া লীলার অভিনয়ে কেশরূপে পরিণত তোমারই সচেত কেশকলাপ যখন সংযত মস্তকে সম্বদ্ধ ছিল...তখন ভাবিয়া দেখিল ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি, সংহার যাঁহাদিগের এক এক কটাক্ষের ফল তাঁহারা যাঁহার চরণতলে ধূলায় লুণ্ঠিত—আমরা তাঁহার মস্তকে বাস করি, ইহা অপেক্ষা বিষম ধৃষ্টতার বিষয় আর কি আছে ভক্ত বলিয়া ত্রিজগৎ যাঁদের চরণাম্বুজের মকরন্দ মধুপানে নিত অধিকারী—আমরা তাঁহার নিত্য দেহের নিত্যসঙ্গী অঙ্গীভূত হইয়াও সে চরণ সেবায় নিত্য বঞ্চিত, ইহা অপেক্ষা বিধির বিড়ম্বন তো আর নাই। ভাবিয়া চিন্তিয়া, কেশপাশ সহসা যেন চরণতলে খসিয়া পড়িল। কেবল পড়িল তাহা নহে, না জানি কি কি মাধুর্যে রসাস্বাদে চরণযুগল বেড়িয়া ধরিল, আর মকরন্দ মধুপানে ভাবের

ভরে বিভোর হইয়া হেলিয়া দুলিয়া, ঢলিয়া ঢলিয়া নাচিতে নাচিতে খেলিতে লাগিত, ফুল্ল কমলে ভ্রমরমালা মধুমত্ত হইয়া যেন ঝাঁকে ঝাঁকে উড়িয়া একবার এপাশে একবার ওপাশে ঝঙ্কার দিয়া পড়িতে লাগিল, মঞ্জীররব সংশিঞ্জিত চরণাম্বুজ বেড়িয়া যেন সেই নৃত্যের তালে তালে আপন গান সংযোজিত করিল।

"চির নিগড় বন্ধনগ্রস্ত সংসার কারারুদ্ধ জীব আমরা, তাই তোর মুক্ত কুন্তলকলাপকান্তি ত্রিতাপ তপ্ত হৃদয়ে শান্তির অনন্তধারা ঢালিয়া দেয়। কেশপাশ হেলিতেছে দুলিতেছে, খেলিতেছে আর তারই সঙ্গে সঙ্গে নাচিয়া নাচিয়া প্রেমানন্দে ঢলিয়া পড়িতেছে। ঐ পতিতপাবন বন্ধনমোচন দৃশ্য দেখিয়া প্রাণ যেন আনন্দে নাচিয়া উঠে।

বলিব কি মা! কালোরূপে ঐ এলো চুলে কেমন যে দেখায় মা! তাহা বলিবার নহে, শুনাইবারও নহে, দেখাইবারও নহে, কেবল প্রাণ ভরিয়া দেখিবার কথা। কিন্তু মা! দেখিবে কে? প্রাণে তুমি না জাগিলে নয়নে তোমায় দেখা যায় না। মুক্ত জীব না হইলে কেহ কি কখন মুক্তকেশীর স্বরূপ রূপ দর্শনের অধিকারী হয়? এই জন্য এলোকেশী রূপে নৃত্যনিরতা মায়ের স্বরূপ দর্শন লালসায় সাধককুল সর্বদা লালায়িত। যে ভক্তের নয়নে মুক্তকেশী পাগলী মেয়ের আহ্লাদ-বিহ্বল রূপের ক্ষণপ্রভা মুহূর্তের জন্য পতিত হইয়াছে, তাহার মন আর বিশ্বের কোনো রূপেই আকৃষ্ট হয় না। তাহার চিত্ত মধুকর করুণাময়ীর চরণ সরোজের মধুপানে নিরন্তর বিভোর হইয়া থাকে। বহুবিধ সন্তাপে তাপিতচিত্ত জীব যদি একবার কালভয় নিস্তারিণী কালীর অভয় চরণে শরণাগত হয়, বিবিধ সমস্যা সমাকীর্ণ সংসারক্ষেত্রে আর তাহাকে বিড়ম্বিত হইতে হয় না। ব্যথিতপ্রাণ সন্তানকুলকে এই রহস্যময় তত্ত্বকথা স্মরণ করাইয়া অভয়দান করিবার জন্যই অভয়ামায়ের এই মুক্ত কেশলীলা[১]।"

মাঝে মাঝে অতীন্দ্রিয় দিব্য দর্শন ঘটিতেছে। চকিতে আবির্ভূত

১. হিমাদ্রি পত্রিকা ১৩ই মাঘ ১৩৭৩

হইয়া জগজ্জননী, তাঁহার আদরিণী মা সর্বমঙ্গলা, আবার তেমনি চকিতে হইতেছেন অন্তর্হিত। কত ভাবে, কত ঐশ্বর্যেই না দর্শন দেন ষড়ৈশ্বর্যময়ী। কখনো আসেন রণঙ্গিণী বেশে। কখনো করুণাময়ী বরাভয়দায়িনী, কখনো বা তিনি স্নেহপীযূষময়ী সত্যকার জননী। ধ্যানসিদ্ধ মহাপুরুষ মায়ের এই লীলাময়ী রূপ দর্শনের কথা বিবৃত করিয়াছেন তাঁহার সংগীতে :

এই দেখছি শ্যামাঙ্গিনী
হচ্ছে আবার হেমাঙ্গিনী।
এই দেখ্‌ছি মা রক্তবস্ত্রা,
অমনি দেখি উলঙ্গিনী।
এই যে মা তোর বেণী বদ্ধ,
আবার দেখি মুক্তকেশী।
এই দেখি ভ্রূকুটী ভঙ্গী,
আবার দেখি আসছে হেসে।
এই দেখি মা তীক্ষ্ণ অসি,
শোভিছে বাম করোপরে।
এই দেখি মা জপের মালা,
ঘুরিছে ঐ দক্ষিণ করে।
এই দেখি মা সিংহাসনে,
আবার দেখি পদ্মাসনে।
আবার দেখি ঘোর শ্মশানে,
নাচছ শব শিবাসনে।
এই দেখি কিশোরী, মাগো,
হচ্ছ আবার ষোড়শী।
অমনি ভীমা ধূমাবতী,
অমনি রম্যা রূপসী।
এই দেখি মা দৈত্যের জিহ্বা,
ধরেছ ওই বাম করে।

আবার দেখি দক্ষিণ হস্তে
অভয় দিচ্ছ অমরে।
এই দেখি মেতেছ, মাগো!
শত্রুর সনে সমরে।
আবার দেখি পুত্র স্নেহে,
ঝরছে দুধ ওই পয়োধরে।
এই দেখি মা ত্রিনয়নে,
চন্দ্র সূর্য অগ্নি জ্বলে।
আবার দেখি সেই নয়নে,
করুণা কটাক্ষ গলে।

মায়ের করুণা কটাক্ষ আর রুদ্র রোষ দুইকেই মায়ের দান হিসাবে শিরোধার্য করিতেন সাধক শিবচন্দ্র। সর্বমঙ্গলা মায়ের আদরের দুলাল রূপে পরিচিত ছিলেন তিনি। কিন্তু তাঁহার এই আদরের দুলালকে মা জীবনে কম দুঃখকষ্ট দেন নাই, পরীক্ষার আগুনেও কম দহন করেন নাই। কিন্তু মাতৃগতপ্রাণ সাধক সকল কিছু সহ্য করিয়াছেন অম্লানবদনে।

তখন শিবচন্দ্র স্বগৃহ কুমারখালিতে বাস করিতেছেন। মাতৃ-পূজায় আর মাতৃধ্যানে সদাই তিনি বিভোর থাকেন। সংসারের আয় তেমন কিছুই নাই, আকাশবৃত্তি গ্রহণ করিয়া আছেন, যেদিন যাহা কিছু মায়ের ভোগরাগের জন্য উপস্থিত হয় তাহাতেই গৃহের সবাই করেন উদরপূর্তি।

প্রায় দুই দিন হয় অন্ন সংস্থান নাই। কোনো মতে দুই একটি ফল সংগ্রহ করিয়া দেবী সর্বমঙ্গলার ভোগ দেওয়া হইতেছে।

সব চাইতে বিপদ শিশুকন্যা কালীকুমারীকে নিয়া। তাহার খাদ্য যোগাড় না করিলে তো চলিবে না। পত্নী চিন্তামণি দেবী তাই অনাহারে দুশ্চিন্তায় প্রায় ভাঙিয়া পড়িয়াছেন। এদিকে মাতৃমণ্ডপে বসিয়া ভাবাবিষ্ট সাধক শিবচন্দ্র ইষ্টবিগ্রহের সম্মুখে পরমানন্দে গাহিয়া চলিয়াছেন:

কবে গো, আনন্দময়ী ! এ দীনে সে দিন দিবে ?
যে দিন—দিন রাত্রি হবে, রাত্রি আমার দিন হবে।
নিশাচরে দিবাচরে, সমান হবে চরাচরে,
দিবাকর নিশাকর করে, আলোক আঁধার হবে।
সম্পদ বিপদ হবে, বিপদ সম্পদ রবে,
স্বজন বিজন হবে, বিজন স্বজন হবে।
পিতামাতা ভ্রাতা জায়া, অসার সংসার মায়া,
ঘুচিবে সব ছায়া কায়া, আসা যাওয়া সমান হবে।
সংসার শ্মশান সাজিবে, শ্মশান সংসার হবে,
নদীতট শয্যা হবে, ভার্যা হবে চিতা যবে।[১]

উদাত্ত কণ্ঠের গান ও ভাবাবেশ শেষ হইতেছে না, পত্নী ক্রন্দনরত শিশুকন্যাকে কোলে নিয়া মণ্ডপে এক একবার ঝগড়া করিতে গিয়াছেন, আবার ফিরিয়া আসিতেছেন।

অবশেষে গান থামিলে, পত্নী সম্মুখে আসিয়া কহিলেন, "এসব তো বেশ শুনলাম। কিন্তু দুটো ভাতের সংস্থান কি ক'রে হবে ? তুমি নিজে দুদিন উপবাসী রয়েছো। শিশু মেয়েটাকে এ দুদিন যদিইবা কিছু খেতে দেওয়া হয়েছে। আজ তার কোনো ব্যবস্থাই নেই।"

প্রশান্ত স্বরে উত্তর দেন শিবচন্দ্র, "ছাখো, মা সর্বমঙ্গলা তাঁর এ সৃষ্টিটা তোমার আমার সঙ্গে পরামর্শ ক'রে করেন নি, চালাচ্ছেনও নিজেরই ইচ্ছেমতো। চালাবার শক্তিও তার আছে।"

"এসব তো অনেক বড় কথা, তাঁর সৃষ্টির কথা। আমাদের মতো ক্ষুদ্র মানুষের কথা ভাববার সময় আছে কি তাঁর ?"

"কি হাস্যকর কথা বলছো তুমি। এই অনন্ত কোটি গ্রহ তারায় যেমন আছেন তিনি, তেমনি আছেন অণুপরমাণুতে। তার তো কোনো কিছুকেই ভুলবার উপায় নেই। মা আমার সর্বমঙ্গলা। ব্যবস্থা একটা করেছেনই তিনি।"

---

১. গীতাঞ্জলি : শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব

কথা কয়টি শেষ হইতে না হইতেই গ্রামের পোস্টমাস্টার শশধর চক্রবর্তী সেখানে আসিয়া হাজির।

"কি মনে ক'রে ভাই?" স্মিতহাস্যে প্রশ্ন করেন শিবচন্দ্র।

উত্তরে বলেন পোস্টমাস্টার, "ঠাকুরমশাই, আপনার একটা টেলিগ্রাম মনিঅর্ডার, আর চিঠি আছে। পিয়নের অসুখ, আজ সে কাজে বেরোয় নি। তাই বাড়ি যাবার পথে আপনার এ দুটো আমি নিজেই দিয়ে যাচ্ছি।"

এই টাকা ও চিঠিটি পাঠাইয়াছেন উত্তরপ্রদেশেস্থিত গোরখপুরের এক ভক্ত। তিনি লিখিয়াছেন, 'গভীর রাতে ঘুমিয়ে আছি, হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। দেখলাম, জ্যোতির্ময়ী মূর্তিতে দেবী সর্বমঙ্গলা মণ্ডপ আলো ক'রে বসে আছেন। আর আমার দিকে তাকিয়ে বলছেন, কুমারখালিতে আমার ছেলে শিবচন্দ্রকে শিগগীর একশো টাকা তুমি পাঠিয়ে দাও। বাড়ির সবার উপবাসে মরবার অবস্থা।'

"এই নাও এবার," পত্নীর দিকে টাকাটা ঠেলিয়া দিলেন শিবচন্দ্র। "মায়ের ভোগরাগের ব্যবস্থা মা নিজেই ক'রে নিলেন। বুঝলে তো, সন্তানের ওপর মায়ের দৃষ্টিটি ঠিকই থাকে।"

সৃষ্টি স্থিতি লয়ের মূলে রহিয়াছেন পরাশক্তি মহামায়া, কৈবল্যে আর লীলায় সর্বত্র সর্বকালে তাঁহারই পরমসত্তা ক্রিয়াশীল। সিদ্ধ সাধক শিবচন্দ্রের দিব্য অনুভূতির এই তত্ত্বটি তাঁহার হৃদয়ের এক স্বতোৎসারিত সংগীতে ফুটিয়া উঠিয়াছে। তিনি গাহিয়াছেন:

কৈবল্যের সেই নিত্য লীলায়
লীলাময়ী আমারই মা।
মহাকালের হৃৎকমলে তালে তালে
নাচছে শ্যামা।
শিবের বামে জীবের বামে আমারই
সেই একই মা,
সর্বত্র সমদক্ষিণা, বামা হয়েও নন মা
বামা।

শক্তি স্বরূপিণী মা মোর, জীবেরও মা,
শিবেরও মা।
কি জীব, কি শিব, দুই-ই হন শব,
কোলে যদি না করেন মা,
জননে জননী মা মোর, ধারণে হন
ধাত্রী মা।
কারণে ক্রিয়া শক্তি, কার্যে ফল-
বিধাত্রী মা।
জীবনে জীবনী-শক্তি, মৃত্যুরূপা
মরণে, মা।
সাধনায় সাধনা, মুক্তি দানে মুক্ত-
কেশী—মা।
কোলের ছেলে কোলে করে, দোলে
মা মোর কি শুধু মা।
আপন কোলে আপনি দোলে, আনন্দ
হিল্লোলে মা।
আপন মুখে আপন নাম ঐ,
গেয়ে বেড়ায়, আমারই মা,
মায়ের কেবা আপন, কেবা হয় পর,
আর কিছু নাই সবই যে মা
কোন্ মা তুমি, কে মা তুমি, সে কথায়
আর কাজ কি বা ?
যে মা, সে মা, হও মা! তুমি বলতে
দাও মা! 'জয় মা শ্যামা'।

কাশীধামের সেই ঈশ্বর প্রেরিত প্রাচীন তন্ত্রসিদ্ধ পুরুষের কাছ হইতে নিগূঢ় ক্রিয়া গ্রহণ করার পর হইতেই শিবচন্দ্রের নয়নসমক্ষে

অভীষ্ট সাধনের বর্ত্মটি খুলিয়া যায়। মরণপণ সংকল্প নিয়া শেষ পর্যায়ের প্রয়াসে তিনি ব্রতী হন।

এ সময়ে কৈলাস ও মানস সরোবরে বৎসরাধিক কাল তিনি অবস্থান করেন এবং সেখানেও লাভ করেন এক উচ্চকোটির কৌল-সাধকের কৃপা। সেখানে অনুষ্ঠান করেন কঠোর তপস্যার।

তারপর জ্বালামুখী, বিন্ধ্যাচল, কামাখ্যা প্রভৃতি দেবীপীঠে মাতৃ-আরাধনা সম্পন্ন করিয়া প্রত্যাগত হন নিজ গৃহে। এখানে সর্বমঙ্গলা মণ্ডপে বসিয়া ধ্যানরত অবস্থায় বীরাচারী মহাসাধকের জীবনে আসে তাঁহার বহু প্রার্থিত পরমপ্রাপ্তির লগ্ন। জ্যোতিঃঘন, ষড়ৈশ্বর্যময়ী জগজ্জননী আবির্ভূতা হন তাঁহার নয়নসম্মুখে।

মহাকৌল শিবচন্দ্রের হৃদয় দহরে ফুটিয়া উঠে একমেবোদ্বিতীয়ম্ পরমসত্তার মহাপ্রকাশ। সেই প্রকাশের সম্মুখে শিব শিবানীতে পার্থক্য নাই, ব্রহ্ম ও শক্তিতে সদা রহিয়াছে অভেদ দর্শন, ধ্যেয় ও ধ্যাতা সেখানে একাকার। এই পরম উপলব্ধির কথা উত্তর জীবনে ঝঙ্কৃত হইয়াছে মহাসাধকের কণ্ঠে :

পূজার আগে সোহং, পরে সোহং,
মধ্যে যে ত্বং, সে ও অহংময় ;
নইলে তোমার অঙ্গন্যাসে, আমার কিবা আসে ?
আমার অঙ্গন্যাসে তোমার কিবা হয় ?
প্রেম জাগে যখন, আর কি তখন,
তোমায় আমায় সাধনা হয়,
তখন অভেদ সম্বন্ধে—,
মাতি প্রেমানন্দে,
ব্রহ্মময়ীর পূজায় পূজক ব্রহ্মময়[১] ॥

সাধনার সিদ্ধি ও ইষ্টদর্শন হইয়াছে, শিবচন্দ্রের অন্তরপটে মাঝে মাঝে ঘটিতেছে জ্যোতির্ময়ী জগজ্জননীর আবির্ভাব। আবার

১ গীতাঞ্জলি (১ম) : শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব

চকিতে হইতেছে তাঁহার অদর্শন। এ সময়কার ব্যবহারিক জীবনে শিবচন্দ্র বহুতর কর্ম নিয়া ব্যাপৃত থাকিতেন। কখনো তন্ত্রতত্ত্বের প্রচারে, কখনো বা ইষ্টদেবীর পূজা অনুষ্ঠানে, তিনি মত্ত থাকিতেন। কখনো তৎপর হইয়া উঠিতেন দেশমাতৃকার পূজারী মুক্তিসংগ্রামীদের সমর্থনে। কিন্তু যে কর্মেই নিয়োজিত থাকুন, অন্তরে জগজ্জননীর স্মরণ মনন অনুধ্যান চলিত নিরন্তর।

পণ্ডিত রাধাবিনোদ গোস্বামী উত্তরকালে শিবচন্দ্রের স্মৃতিতর্পণ করিতে গিয়া তাঁহার এ সময়কার মনোভাবের চিত্র দিয়াছেন[১]ঃ "দিদিমার সহিত তাঁহার (বিদ্যার্ণবের) সর্বমঙ্গলা মন্দিরে আমারও যাতায়াত ছিল। কিন্তু আমি তখন ছোট। মনে পড়ে, সেই সময়েই একবার তিনি খুব ধুমধামের সহিত পাঁচখানি দুর্গাপূজা করিয়াছিলেন। যাহা হোক, পরে আমি যখন স্কুলে পড়ি, সেই সময়ে একদিন তাঁহার আলোচনা সভায় যোগদান করার সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল। সেদিন তিনি অনেক ভালো কথা বলিয়াছিলেন। পরে তাঁহার 'তন্ত্রতত্ত্বে' সেই সকল আলোচনা পড়িয়া আমি মুগ্ধ হইয়াছিলাম। তিনি আলোচনা করিতেছিলেন, আর মাঝে মাঝে তারা, 'তারা, তারা ব্রহ্মময়ী' বলিয়া ধ্বনি করিয়া উঠিতেছিলেন। বার কয়েক শুনিবার পর আমি ফস্ করিয়া বলিয়া বসিলাম,—বেশ তো বলিতেছেন, কিন্তু মাঝে মাঝে অমন চিৎকার করিয়া উঠিতেছেন কেন? বলিয়াই তৎক্ষণাৎ আমি সংকুচিত হইয়া পড়িলাম। কোথায় সামান্য গ্রাম্য বিদ্যালয়ের অর্বাচীন তরুণ ছাত্র আমি, আর কোথায় হাইকোর্টের চিফ জাস্টিস, সারপেণ্ট পাওয়ার প্রভৃতির লেখক, উডরফ সাহেবের গুরু, ভারতের অদ্বিতীয় সংস্কৃত বক্তা, তন্ত্রাচার্য শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব মহাশয়।"

উপস্থিত সবাই সচকিত হইয়া উঠিয়াছেন বালকের ঐ মন্তব্যে। ভাবিতেছেন, শিবচন্দ্র এবার হয়তো ক্রুদ্ধ হইয়া বালককে তিরস্কার করিবেন। কিন্তু কার্যত দেখা গেল অন্যরূপ।

১ স্মৃতি তর্পণ : তন্ত্রাচার্য শিবচন্দ্র, গৌরভাবিনী, মাঘ-চৈত্র ১৩৬৩।

চক্ষু নিমীলিত করিয়া কিছুক্ষণ শিবচন্দ্র নীরব রহিলেন, তারপর বালকের দিকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে তাকাইয়া মৃদুস্বরে কহিলেন, "ঠিক বলেছিস তুই। তারা—তারা ব'লে কত ডাকছি, কত কেঁদে মরছি, কিন্তু ছেলের কথায় যখন তখন সে বেটি তো সাড়া দেয় না। সব সময়ে তো পাইনে তার দর্শন!" বলিতে বলিতে শিবচন্দ্রের চক্ষু দুইটি অশ্রুসজল হইয়া আসিল। ভক্ত ও দর্শনার্থীরা মাতৃসাধকের দিব্যভাবমণ্ডিত আননের দিকে নির্নিমেষে চাহিয়া রহিলেন।

কুমারখালির প্রবীণ ভক্তসাধক কাঙাল হরনাথ এবং তরুণ শিবচন্দ্রের অন্তরঙ্গতা ছিল অতি গভীর। এই অন্তরঙ্গতার প্রভাব শিবচন্দ্রের উপর বিশেষভাবে পতিত হয়, তাঁহার তন্ত্রধৃত জীবনে বাল্যকাল হইতেই দেখা দেয় উদারতা ও অসাম্প্রদায়িকতা। তাই কালী ও কৃষ্ণের অভেদ তত্ত্ব তাঁহার ভিতরে অতি সহজভাবে স্ফুরিত হইয়া উঠে।

কাঙাল হরনাথ শিবচন্দ্রের পিতার কাছে মন্ত্র দীক্ষা নিয়াছিলেন, আবার শিবচন্দ্র শৈশবে হাতেখড়ি নিয়াছিলেন হরনাথেরই কাছে। উভয় পরিবারে তাই ঘনিষ্ঠ আত্মিক যোগ ছিল।

শুদ্ধা ভক্তির সাধনায় কাঙাল হরনাথ উচ্চাবস্থা লাভ করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার লেখায় গানে ও উপদেশে সমন্বয়মূলক প্রেমধর্ম প্রচার করিয়া বেড়াইতেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ফিকিরচাঁদ সংসদে বাল্যকালে শিবচন্দ্র প্রায়ই যাতায়াত করিতেন, কাজেই হরনাথের ভক্তিভাব অনেক পরিমাণে তাঁহাকে রসায়িত করিয়াছিল।

উত্তর জীবনে শিবচন্দ্র তন্ত্রসাধক ও তন্ত্রশাস্ত্রবিদ্‌রূপে খ্যাত হইয়া উঠেন। স্বদেশ এবং হিন্দুধর্মের উজ্জীবনের জন্য নানা কল্যাণকর প্রয়াসের সহিত তিনি যুক্ত হইয়া পড়েন। এ সময়ে কাঙাল হরনাথের সহিত প্রায়ই তাঁহাকে পরামর্শ করিতে দেখা যাইত। কি করিয়া শাক্ত ও বৈষ্ণবের বিবাদ ও মনোমালিন্য মেটানো যায়, কি করিয়া

জড়বাদী পাশ্চাত্য সভ্যতার প্লাবন হইতে সনাতন ধর্মকে রক্ষা করা যায়, উভয়ে সেই পন্থা উদ্ভাবনের চেষ্টা করিতেন।

মনীষী বঙ্কিমচন্দ্র এ সময়ে কৃষ্ণচরিত্র রচনা করেন, নিজের মতবাদ ও যুক্তি তর্ক বিশ্লেষণের মধ্য দিয়া কৃষ্ণ-চরিত্রের এক আধুনিক ব্যাখ্যা তিনি স্থাপন করেন।

বঙ্কিমের এই ব্যাখ্যার সহিত শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব একমত হন নাই, তিনি তৎক্ষণাৎ ইহার এক সমালোচনা লিখিয়া ফেলেন। প্রবীণ সাধক হরনাথকে পড়িতে দিয়া জানিতে চাহেন তাঁহার অভিমত।

হরনাথ বলেন, "তুমি শক্তিমান্ সাধক, তত্ত্ব জানো। এ ধরনের সমালোচনায় শুধু দোষ ত্রুটি উদ্‌ঘাটিত হয়। এসব না লিখে বরং প্রকৃত তত্ত্ব, প্রকৃত রস উদ্‌ঘাটন কর। কৃষ্ণলীলা মাধুর্যের রস পরিবেশন কর সর্বজনের কল্যাণে। তাতে কাজ বেশী হবে।"

শিবচন্দ্র তৎক্ষণাৎ এ কথা মানিয়া নিলেন। অতঃপর কিছুদিনের মধ্যে রচনা করিলেন 'রাসলীলা'। তন্ত্রসিদ্ধ মহাপুরুষের এই গ্রন্থটি পড়িলে বুঝা যায়, পরম বস্তুতে কোনো ভেদ নাই, তাঁহার রসের ধারায় পরিতৃপ্ত হয় জাতি বর্ণ নির্বিশেষে বিশ্বের সকল মানুষ।

কাঙাল হরনাথ যখন ইহলোক ত্যাগ করেন, তখন শিবচন্দ্র তাঁহার ভক্তদের সঙ্গে কাঁধ মিলাইয়া মরদেহটি সংকারের জন্য বহন করিয়া নিয়া যান। রক্ষণশীল ব্রাহ্মণদল অধ্যুষিত কুমারখালিতে তাঁহার এই কার্যটি অনেকের কাছে নিন্দনীয় বলিয়া গণ্য হয়। কিন্তু তত্ত্ববিদ্ সাধক শিবচন্দ্র সেদিকে দৃক্‌পাত করেন নাই।

প্রখ্যাত মরমিয়া সাধক লালন ফকীর সে-বার কুমারখালিতে শিবচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন।

লালন নিকটেই থাকেন। সাধক হিসাবে শিবচন্দ্রের প্রতিষ্ঠার কথা, তাঁহার শাস্ত্র রচনা ও বাগ্মিতার কথা, তিনি শুনিয়াছেন। বয়স

হিসাবে সিদ্ধ ফকীর লালন শিবচন্দ্র হইতে বড়। কিন্তু নিজেই সখ্যতা দেখাইতে আসিয়াছেন, পদব্রজে উপস্থিত হইয়াছেন শিবচন্দ্রের দুর্গামণ্ডপের সম্মুখে।

শিবচন্দ্র তো মহা আনন্দিত, পরম সমাদরে এই সিদ্ধ ফকীরকে অভ্যর্থনা জানাইলেন। স্মিত হাস্যে কহিলেন, "বড় অনুগ্রহ আমার ওপর।"

"অনুগ্রহ নয়- দর্শন। হেথায় দর্শন করতে এলাম আমার দাদাঠাকুরকে।" সারল্যভরা হাসি হাসিয়া বলেন লালন। "তাছাড়া, পড়শী তো আমরা বটেই। সেই মনের মানুষ যে জন, তাঁকে ঘিরেই তো আমরা সব পড়শীরা দিন গুজরান করছি। আপনি যার জন্য ফকীর, আমিও তাঁর জন্যই। তাই না দাদাঠাকুর ?"

বাউল বেশী লালন ফকীরের কাঁধে ঝোলা, হাতে একতারা। আর বীরাচারী মাতৃসাধক শিবচন্দ্রের পরিধানে একটি গৈরিক বসন, সারা দেহ ভস্মলিপ্ত, কপালে বৃহৎ রক্ত চন্দনের ফোঁটা আর ত্রিপুণ্ড্রক। দুই-ই ফকীর বই কি। গ্রামের লোকেরা লালনের আগমনবার্তা পাইয়াই ছুটিয়া আসিয়াছে। সর্বমঙ্গলার মণ্ডপের সম্মুখে দুই সাধককে ঘিরিয়া কৌতূহলী হইয়া দাঁড়াইয়া আছে সংলাপ শোনার প্রতীক্ষায়।

শিবচন্দ্র গদ্গদ স্বরে বলেন, "ফকীর, তোমায় পেয়ে আনন্দ আমার উথলে উঠ্ছে, সে আনন্দ প্রকাশ করার ভাষাও ফেলেছি হারিয়ে। যাক্, এসেছো যখন, প্রাণের পিপাসা মেটাও, বিলাও তোমার বাউল গানের সুধা।"

একতারা বাজাইয়া নাচিয়া নাচিয়া গান ধরেন লালন ফকীর :

আমি একদিনও না দেখলাম তারে।
আমার বাড়ির কাছে আরশীনগর
—পড়শী বসত করে।

গ্রাম বেড়ে তার অগাধ পানি,
ও তার নাই কিনারা নাই তরণী পারে।

মনে বাঞ্ছা করি দেখবো তারে,
কেমনে সে গাঁয়ে যাই রে।
কি কব পড়শীর কথা, ও তার
হস্তপদ স্কন্ধমাথা নাই রে।
ও সে ক্ষণেক ভাসে শূন্যের উপর
ক্ষণেক ভাসে নীরে।
পড়শী যদি আমায় ছুঁতো
ও মোর যম যাতনা সকল যেতো দূরে।
সে আর লালন একখানে রয়,
তবুও লক্ষ যোজন ফাঁক্ রে।

শিবচন্দ্র বিহ্বল হইয়া গিয়াছেন, প্রিয় ভক্ত দানবারিকে ডাকিয়া উৎফুল্ল কণ্ঠে কহিলেন, "দানু, দানু, প্রাণ ভরে শোন, কি অপূর্ব গান ফকীরের। সিদ্ধপুরুষ ছাড়া এ গান কে গাইতে পারে?"

বলিহারের রাজার কৌল সাধনার উপর অত্যন্ত শ্রদ্ধা ছিল। তিনি স্থির করিলেন, আচার্য শিবচন্দ্রকে বরণ করিবেন তাঁহার সভা-পণ্ডিতরূপে। ভাবিলেন, সেই সুযোগে তাঁহার উপদেশ নিয়া অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য তান্ত্রিক ক্রিয়া অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা যাইবে।

বহু অনুনয় বিনয় করিয়া শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণবকে বলিহারে নিয়া যাওয়া হইল। সেখানে থাকিয়া শিবচন্দ্র বেশ কিছুদিন রত হইলেন শাস্ত্রচর্চা ও তপস্যায়। কিন্তু অতঃপর সভাপণ্ডিতের বৃত্তি তাঁহার অসহ্য হইয়া উঠিল। হঠাৎ একদিন সেখানকার বাস উঠাইয়া দিয়া ফিরিয়া আসিলেন কুমারখালির নিজ আবাসে।

ভক্ত পরিবৃত হইয়া তিনি থাকিতেন। ঘরে স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি ছিল, তারপর ছিল ইষ্টদেবীর পূজার দায়িত্ব। তাই শিবচন্দ্রকে এই সময়ে প্রতিমাসে বহু অর্থ ব্যয় করিতে হইত। বলিহারের সভাপণ্ডিত হিসাবে প্রতিমাসে বাঁধাধরা একটা মোটা আয় ছিল, এবার তাহাও বন্ধ হইয়া গেল।

আত্মীয় বন্ধুবান্ধবেরা চিন্তিত হইয়া উঠিলেন, সংসারের বিপুল ব্যয়-ভার এবার কি করিয়া চলিবে? শিবচন্দ্র উত্তর দিলেন, "মায়ের অভয় পদে যে শরণ নিয়ে আছে, তার আবার ভয় কি? নাঃ—এখন থেকে কোনো ব্যক্তি বিশেষের অর্থ সাহায্যের ওপর আর আমি নির্ভর করবো না। আমার মা সর্বমঙ্গলা যা হোক একটা ব্যবস্থা করবেন বৈ কি।"

অতঃপর সংসারের ব্যয় এবং সর্বমঙ্গলার ভোগ রাগ ও পূজা অর্চনার ব্যয় নির্বাহ হইত নিতান্তই ইষ্টদেবীর অনুগ্রহে। যেদিন যেমন অর্থের দরকার হইত, তাহা উপস্থিত হইত দূর দূরান্তের ভক্ত ও অনুরাগীদের নিকট হইতে।

দ্বারভাঙ্গার মহারাজা কামেশ্বর সিং বরাবরই তন্ত্রসাধনার অনুরাগী ছিলেন। উচ্চকোটির সাধক মহলে তাঁহার যাতায়াত ছিল এবং সুযোগ পাইলেই ক্রিয়াবান্ সাধকদের নিকট হইতে তিনি উপদেশ গ্রহণ করিতেন।

কামেশ্বর সিংজী একবার তারাপীঠে মহাত্মা বামাক্ষেপার নিকট উপস্থিত হন এবং অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য শ্মশানে বসিয়া অভিচার অনুষ্ঠানের প্রার্থনা জানান।

ক্ষেপা তাঁহাকে আশীর্বাদ দিয়া বলেন, "তুমি তন্ত্রসাধক শিবচন্দ্রের কাছে যাও, তিনি শক্তিমান্, তান্ত্রিক নিগূঢ় অনুষ্ঠানেও দক্ষ। তাঁর কৃপা পেলে সিদ্ধ হবে তোমার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা।"

নির্দেশমতো, কিছুদিনের মধ্যে কামেশ্বর সিংজী কুমারখালিতে শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণবের কাছে আসিয়া উপস্থিত। ক্ষেপার কথা শুনিয়া এবং মহারাজার আন্তরিক ইচ্ছার পরিচয় পাইয়া শিবচন্দ্র তাঁহাকে সাহায্য করিতে রাজী হন। অচিরে গভীর নিশাযাগে স্থানীয় শ্মশানে অনুষ্ঠিত হয় মহাকালীর আরাধনা। শিবচন্দ্রের ব্যক্তিত্ব ও সাধনবিভূতি দেখিয়া কামেশ্বর সিংজী মুগ্ধ হন, পরিণত হন তাঁহার এক অনুরাগী ভক্তরূপে।

অতঃপর আরও কয়েকবার কামেশ্বর সিংজী আচার্য শিবচন্দ্রের

সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং তন্ত্রের সাধন ও তত্ত্ব সম্পর্কে উপদেশ লাভ করেন। একবার শিবচন্দ্রের দেওঘরে অবস্থানের কালে তিনি তাঁহার সহিত মিলিত হন এবং সেখানকার শ্মশানে বসিয়া সম্পন্ন করেন তাঁহার উত্তরসাধকের কর্ম।

সিদ্ধ কৌল শিবচন্দ্রের শ্মশান সাধনার তথ্য খুব কমই জানা গিয়াছে। তাঁহার উত্তর সাধকদের প্রদত্ত যৎসামান্য সংবাদ হইতে এ সম্পর্কে একটা মোটামুটি চিত্র দাঁড় করানো যায়।

তাঁহার শ্মশান সাধনা ছিল তিথি ও যোগ সাপেক্ষ। এই যোগ যে কখন সমাগত হইবে তাহা অপরে জানিত না। এই শুভ লগ্ন যখন উপস্থিত হইত তখন তিনি শ্মশানভূমিতে গমন করিয়া সাধনা করিবার জন্য অস্থির হইয়া পড়িতেন। মাতৃতত্ত্বপিপাসু শিষ্যগণ যখন তাঁহার সহিত গমন করিতেন, শিক্ষাদানকল্পে যাহা আবশ্যক সকলকেই তাহা প্রদর্শন করিতেন, তবে উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন শিষ্য না হইলে কখনো সঙ্গে লইতেন না বা সাধনার সময় নিকটে থাকিতে সম্মতি দিতেন না।

—হাওড়া শিবপুরের শশধর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সিদ্ধ কৌল বামাক্ষ্যাপার আশ্রম তারাপীঠে কিছুদিন অবস্থান করেন। ক্ষেপা একদিন তাঁহাকে আদেশ করিলেন 'ওরে, তুই কুমারখালির পণ্ডিত শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণবের কাছে যা, সেখানে তুই সায়েস্তা হবি।'

—ভাগ্যবান্ সাধক এই আদেশ প্রাপ্তির পর বিদ্যার্ণবের গৃহে সমাগত হইয়া তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন, তারপর সর্বদা ভক্তি প্রণত হইয়া তাঁহার নিকট সাধনা বিষয়ে নানা শিক্ষা গ্রহণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে কিছুকাল অতিবাহিত হইবার পর একদা যখন শ্মশান সাধনার সুযোগ উপস্থিত হইল, তিনি গুরুদেবের সহিত নিশীথে সাধনার জন্য গৌরীতটে শ্মশানে উপস্থিত হইলেন। সাধনার কোনও প্রক্রিয়া কয়েকবার-এই শিষ্যকে প্রদর্শন করার পরও যখন যথাযথ অনুষ্ঠানে তিনি অক্ষম হইলেন, তখন সেই নিস্তব্ধ শ্মশানেই ঠাকুর সক্রোধে শিষ্যকে চিমটা দ্বারা প্রহার করিলেন। তারপর

আবশ্যকীয় ক্রিয়া ও সাধনায় তত্ত্বপিপাসু শিষ্যকে কৃতিবান্ করিয়া নিশা শেষে গৃহে ফিরিলেন।

—ইহা ছাড়াও ঘোর নিশীথে কথনও কখনও কোনো শ্মশানে বসিয়া শ্মশানবাসিনী শ্যামা মায়ের আরাধনায় তিনি নিমগ্ন থাকিতেন। সেখানে যে কি প্রকার ক্রিয়াকলাপ অনুষ্ঠান করিতেন, কিভাবে যোগ সমাধিতে মগ্ন হইয়া থাকিতেন, তাহা আর অন্য কেহ জানিতে পারিত না ; যদি কিছু জানা সম্ভব তাহা তাঁহার ভাগ্যবান্ শিষ্য দানবারি গঙ্গোপাধ্যায়ই একমাত্র জানিতে পারিতেন।

কয়েকজন জার্মান পণ্ডিত সে-বার বারাণসীতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। ভারতীয় সাধনা ও ধর্ম সংস্কৃতির সম্বন্ধে ইঁহারা অতিশয় অনুসন্ধিৎসু। শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব তথন বারাণসীতে অবস্থান করিতেছেন, সারা উত্তর ভারতে তাঁহার তথন প্রচুর খ্যাতি। তান্ত্রিক ও ক্রিয়াবান এই সিদ্ধ মহাপুরুষকে জার্মান পণ্ডিতেরা সোৎসাহে দর্শন করিতে আসিলেন। সবাই তাঁহারা ভালো সংস্কৃত জানেন, কাজেই কথাবার্তায় কোনো অসুবিধা হইল না। তাঁহাদের প্রশ্নের উত্তরে শিবচন্দ্র ভারতীয় সাধনার বৈচিত্র্য ও গভীরতা, বিশেষত প্রত্যক্ষ দর্শন ও অনুভূতির মর্মকথা বুঝাইয়া বলিলেন।

তন্ত্রের আলোচনা উঠিল এবং এই সাধনধারার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তিনি এক মনোজ্ঞ ভাষণ দিলেন। এই ভাষণে বর্ণনা করিলেন তাঁহার নিজের উপলব্ধি এবং শাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্ব।

জার্মান পণ্ডিতেরা একমনে তাঁহার ভাষণ শুনিতেছেন, আর নির্নিমেষে চাহিয়া আছেন তাঁহার মুখের দিকে।

বিদায়ের সময় সবাই একে একে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া এই সিদ্ধ মহাত্মার চরণ বন্দনা করিলেন, পরমানন্দে গ্রহণ করিলেন তাঁহার সস্নেহ আশীর্বাদ।

শিবচন্দ্রের অন্তরঙ্গ ভক্তশিষ্য এবং তাঁহার বহু নিগূঢ় ক্রিয়ার উত্তরসাধক ছিলেন কুমারখালির দানবারি গঙ্গোপাধ্যায়। গুরুর

জীবনের বহু ঘটনায় প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন তিনি। তিনি বলিয়াছেন, "দীর্ঘকাল ঠাকুরের সঙ্গ করেও তাঁকে বুঝতে পেরেছি বলে মনে হয় না। তাঁর সাধনজীবনের কার্যকলাপ যা কিছু দেখেছি, তা থেকে আমার এই ধারণা জন্মেছে যে, তিনি ছিলেন মহাশক্তি মহামায়ার কৃপাপ্রাপ্ত সাধক, বিপুল শক্তি-বিভূতির উৎস।

"বীরাচারী, দক্ষিণাচারী, বামাচারী সব তন্ত্রসাধকেরাই আসতেন তাঁর কাছে। প্রত্যেককেই যাঁর যাঁর নিজস্বধারা ও প্রণালী অনুযায়ী প্রক্রিয়া তিনি দেখিয়ে দিতেন। নিগূঢ় উপদেশ পেয়ে তাঁরা কৃতার্থ হতেন। সত্যকার সাধনকামীদের প্রতি তিনি ছিলেন পরম কৃপালু, হাতে কলমে তাঁদের শিক্ষা দিতেন, অনেক সময় শ্মশানে বসে সারা রাত্রি ব্যস্ত থাকতেন তাঁদের নিয়ে। বহুবার নিজে সঙ্গে থেকে এসব আমি দেখেছি।

"কাশীতে দেখেছি—ভারতের নানা প্রদেশ থেকে শুধু শাক্তই নয়, আরো অন্য সম্প্রদায়ের সাধক—শৈব, সৌর, বৈষ্ণব, গাণপত্য, আসতেন তাঁর কাছে উপদেশপ্রার্থী হয়ে। সবারই আধ্যাত্মিক সমস্যার সমাধানে হাসিমুখে সাহায্য করতেন গুরুদেব।"

শিবচন্দ্রের মাতৃপূজার অনুষ্ঠানাদি সংখ্যায় যেমন অজস্র ছিল, তেমনি ছিল জাঁকজমকপূর্ণ ও ব্যয়বহুল। কিন্তু সব সময়েই দেখা যাইত মায়ের প্রসাদে প্রয়োজনীয় অর্থ পূর্বাহ্ণেই হইত সংগৃহীত হইয়াছে ভক্তদের খেদের কোনো কারণ থাকিত না।

একবার শিবচন্দ্র মহা আড়ম্বরের সহিত পঞ্চ-দুর্গোৎসবের অনুষ্ঠান করেন। তাঁহার এই পূজা যেমনি অভিনব, তেমনি বৈচিত্র্যপূর্ণ। সারা বাংলার ঘরে ঘরে এই রাজসিক মহাপূজার কাহিনী প্রচারিত হয় এবং দূরদূরান্ত হইতে অগণিত ভক্ত সাধক ও কৌতূহলী দর্শক তাঁহার পূজাক্ষেত্রে আসিয়া জড়ো হন।

শিবচন্দ্রের এই পঞ্চদুর্গার মূর্তিতে ছিল পাঁচটি বিভিন্ন ভঙ্গীর রূপকল্পনা। এগুলি যথাক্রমে: সিংহে আরূঢ়া মহিষমর্দিনী, আর সম্মুখে আরাধনারত শ্রীরামচন্দ্র ও তাঁহার পরিকরগণ বাংলার

দশপ্রহরণধারিণী দেবী-দুর্গা ; চণ্ডীতে বর্ণিত শ্রীদুর্গা ; নবদুর্গা পরিবৃতা লক্ষ্মী সরস্বতী ইত্যাদি সহ মহিষমর্দিনী দেবী ; চৌষট্টি যোগিনী এবং দশমহাবিদ্যা বেষ্টিতা—মহাচণ্ডী।

শিবচন্দ্রের পরিকল্পিত এই মহাপূজার মর্মকথা এবং তাৎপর্য—অগণিত শক্তি ও প্রতীকের মূলে রহিয়াছে এক এবং অখণ্ড পরমাশক্তি।

এই মহাপূজায় কাশীধাম ও বাংলার প্রখ্যাত পণ্ডিত ও সাধকেরা উপস্থিত ছিলেন এবং এ পূজা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল দেশের প্রভাবশালী ভূম্যধিকারীদের অকৃপণ সহায়তায়।

বাহ্য পূজার প্রয়োজনের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দিতেন শিবচন্দ্র। তাছাড়া, দেবীপূজায় তন্ত্রোশাস্ত্রোক্ত কোনো খুঁটিনাটি অনুষ্ঠান ও উপচার বাদ দিবার কথা তিনি ভাবিতে পারিতেন না। শাস্ত্রোক্ত আরাধনায় জনমানসে দেবী স্ফুরিতা হইয়া উঠেন এবং মৃন্ময়ী চিন্ময় রূপ পরিগ্রহ করেন, একথাটি বার বার তিনি বলিতেন। পূজা সম্পর্কে শিবচন্দ্র লিখিয়াছেন :

"যাঁহার শক্তি আমাতে সংক্রামিত করিতে হইবে, তাঁহার তত্ত্ব-সাগরে আমার আত্মঅস্তিত্ব একেবারে ডুবাইয়া দিতে হইবে। নতুবা তাঁহার সে শক্তি কিছুতেই আমাতে সংক্রামিত হইবার নহে। যাঁহার ভাবে যিনি যতদূর আত্মহারা হইয়াছেন তিনি তাঁহাতে ততদূর তন্ময়ত্ব লাভ করিয়াছেন; যতদূর তন্ময়তা সিদ্ধি হইয়াছে, ততদূরই শক্তি তাঁহাতে সংক্রামিত হইয়াছে। শক্তিরাজ্যে ইহা নৈসর্গিক নিয়ম।

"মাকে ডাকিবার, বিবিধ উপচারে অর্চনা করিবার, এবং তাঁহার ভাবে আত্মহারা হইবার মতো শক্তি হৃদয়ে সঞ্চয় করিবার পর মায়ের প্রতিমায় তাঁহার আবির্ভাবের কথা বিচার করা আবশ্যক। তুমি দেখ প্রতিমার পূজা, কিন্তু যিনি স্বয়ং পূজা করেন, অলৌকিক দৃষ্টি বলে তিনি কিন্তু দেখিতে পান—অচেতন প্রতিমা যন্ত্রে চৈতন্যময়ীর পূর্ণ আবির্ভাব। প্রাণ প্রতিষ্ঠার পর হইতে বিসর্জনের পূর্ব পর্যন্ত

সাধকের সিদ্ধাঞ্জনস্নিগ্ধ নয়নে মৃন্ময়ী প্রতিমা তখন চিন্ময়ীর স্বরূপে আবির্ভূত হইয়া নিত্য নব লাবণ্যময়ী ব্রহ্মময়ী বিশ্বজননীর ব্রহ্মময় কান্তিচ্ছটা উদগীরণ করে।”

“মায়ের ভক্ত তাঁহার অন্তর হইতে চিন্ময়ীর যে জ্যোতির আনিয়া মৃন্ময়ীতে সংযোজিত করেন, মৃন্ময়ীতে পূজা শেষ করিয়া আবার সেই চিন্ময়ীর জ্যোতিঃ চিন্ময়ীতে সংযোজিত করেন। তখন বাহিরের মণ্ডপে যেমন ভুবনভরা রূপের ছটা, অন্তরের মণ্ডপেও দেখি তেমনই অনুপম সৌন্দর্য-ঘটা।”

বিশ্বজননীর লীলা সদাই তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তজনের হৃদয়ে। চকিত আবির্ভাব ও অন্তর্ধানে, আলোয় আঁধারে, বহু বিচিত্র রসে এই লীলা উচ্ছলিত। মায়ের এই লীলা তাঁহার জীবনে কোন্ রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে সে সম্পর্কে শিবচন্দ্র বলিতেছেন, “মা আমাদের যেমন ভিতরে তেমনি বাহিরে, যেমন বাহিরে তেমনি ভিতরে। কিছুদিন এইরূপে ভিতরে বাহিরে আসা যাওয়া করিতে করিতে প্রাণের কপাট যেদিন একেবারে খুলিয়া যাইবে, সেইদিন আমার আবাহন বিসর্জন একেবারে জন্মের মতো ঘুচিয়া যাইবে। বাহিরে চাহিলে যেদিন ভিতরের মূর্তি আমি দেখিতে পারিব, ভিতরে চাহিলে যেদিন বাহিরের মূর্তি দেখিব, ভিতরে বাহিরে,—বাহিরে ভিতরে যেদিন এক হইয়া যাইবে, সেইদিন মা আমার আসা যাওয়া ঘুচাইয়া চরণ দুখানি গোছাইয়া স্থির হইয়া বসিবেন। অশান্ত নৃত্যকালী সেইদিন আমার শান্ত হইবেন কিংবা কি জানি অন্তরে বাহিরে খোলাপথ পাইয়া হয়তো আনন্দময়ী আরও ছুটাছুটি করিবেন। কিন্তু সে ছুটাছুটি করিলেও সেদিন আমি আর তাঁহাকে আনিবও না, লইবও না, তিনি আপনি আনন্দে আপনি আসিবেন, আর আপনি যাইবেন—আপনি নাচিবেন, আপনি গাইবেন, আপন খেলা আপনি খেলিবেন, আমি সেই সঙ্গে সঙ্গে তাল দিয়া ‘জয় মা—জয় মা’ বলিয়া নাচিয়া বেড়াইব।”

শিবচন্দ্রের অনুরাগী ভক্ত এবং তাঁহার জীবনের বহু ঘটনা ও অনুষ্ঠানের প্রত্যক্ষদর্শী, শ্রীবসন্তকুমার পাল তাঁহার কুলকুণ্ডলিনী-পূজার বিবরণ দিতে গিয়া লিখিয়াছেন :

পরমসিদ্ধ, মাতৃসাধন সুধার অর্ণব, শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণবের আরাধিতা সর্বমঙ্গলা দেবীর নিত্যকার পূজার সহিত অন্যতম অপরিহার্য অবশ্য অনুষ্ঠান-অঙ্গ তন্ত্রোক্ত বিধানে কুলকুণ্ডলিনী শক্তির পূজা এবং ভোগ ব্যবস্থিত ছিল। উহার উপচারাদির মধ্যে প্রধান ছিল কাঁচা দুগ্ধ, উৎকৃষ্ট জাতীয় সুপক্ক কদলী ও পরমান্ন প্রভৃতি। এই পূজাটি অনুষ্ঠিত হইত শিবমন্দিরে শিবসন্নিধানে। ভোগ নিবেদন সমাপন করিয়া শিবচন্দ্র নিমীলিতনেত্রে ধ্যান নিমগ্ন হওয়ার অনতিকাল মধ্যেই কোথা হইতে কুলকুণ্ডলিনী স্বরূপিণী একটি বৃহৎ গোক্ষুরসর্প (সাড়ে চার ফুট পাঁচ ফুট লম্বা) আসিয়া দুগ্ধ, পরমান্ন ও পাত্রস্থিত নিবেদিত আহার্য ভোজনে রত হইত। কখনও কখনও সঙ্গে আর একটি শ্বেত সর্পের আগমনও হইত, অবশ্য শ্বেতসর্পটি প্রত্যহ দেখা যাইত না। পরিতোষ সহকারে ভোগ প্রসাদ আহারান্তে সর্পটি ফণা বিস্তারপূর্বক ধ্যানে উপবিষ্ট শিবচন্দ্রের মস্তকের উচ্চতায় সমান উর্ধ্বে উঠিয়া দণ্ডায়মান অবস্থায় ফোঁস ফোঁস শব্দে দুলিতে থাকিত।

অর্ধোন্মীলিত নেত্রে ভাবাবিষ্ট শিবচন্দ্র—"আয় মা, আয় মা, এলি ? ব্রহ্মময়ী তারা মা আমার, আয় আয়"—ধ্বনি করিতে করিতে সম্মুখে হস্ত সম্প্রসারণপূর্বক কুণ্ডলিনী স্বরূপা অজগরটির মস্তকে হাত বুলাইয়া দিলে উহা তাঁহার ক্রোড়ে উঠিয়া এবং কুণ্ডলী পাকাইয়া বিরাট ফণাটি বিস্তারপূর্বক হিস্ হিস্ শব্দে ডানে বামে দুলিতে থাকিত। আবার ক্ষণকাল পরেই বিদ্যার্ণব ঠাকুরের কখনও দক্ষিণবাহু কখনও বামবাহু জড়াইয়া ধরিয়া ক্রমে উপরে উঠিয়া তাঁহার কণ্ঠ সংলগ্ন হইয়া পুনঃ ফণা বিস্তার করিয়া তাঁহার বুকের সহিত মাথাটি লাগাইয়া যেন কান পাতিয়া থাকিত।

মনে হইত, সর্পটি যেন বিদ্যার্ণব হৃদয়ের গভীরতম অন্তস্তল-উত্থিত মর্মোচ্ছ্বাস ধ্বনি শ্রবণ করিবার জন্য এভাবে তাঁহার বক্ষসংলগ্ন হইয়া

থাকিত। আর বিদ্যার্ণব ঠাকুর মাঝে মাঝে ভাব নিমগ্ন অবস্থায়ই "তারা তারা তারা" বলিয়া তারায় আত্মহারা হইয়া তারস্বরে ধ্বনি দিতে থাকিতেন।

এইরূপে বারকয়েক ধ্বনি দেওয়ার পর পুনঃ সর্পের মস্তকে হস্ত সঞ্চালন করিলে সর্পটি এবার বিদ্যার্ণবের কণ্ঠ হইতে শিরে উঠিয়া দুই-চারবার বিস্তৃত ফণায় দোল দিয়া ধীরে ধীরে সম্মুখস্থ শিবের লিঙ্গমূর্তিটির শীর্ষে আরোহণ করিত, পূর্ববৎ ফণা বিস্তার করিয়া, ক্ষণকাল থাকিয়া, কোথায় আবার অদৃশ্য হইয়া যাইত।

সর্পটি চলিয়া যাইবার পর শিবচন্দ্র ভোগের ভুক্তাবশিষ্ট হইতে প্রসাদ লইয়া "তারা তারা" ধ্বনি করিতে করিতে সাশ্রুনয়নে তাহা গ্রহণ করিতেন। প্রথম প্রথম সকলেই তাঁহাকে এই প্রসাদ গ্রহণে বিরত থাকিবার জন্য আকুতি ও অনুরোধ করিত—কিন্তু তিনি নির্ভয়ে মায়ের প্রসাদ খাইয়া ফেলিতেন। নিঃসন্দেহে দুঃসাহসিক ছিল এই কার্য।[১]

তন্ত্রসাধন, তন্ত্রসিদ্ধি ও তন্ত্রশাস্ত্রের তত্ত্বের আলোকে ভাস্বর হইয়া উঠিয়াছিল শিবচন্দ্রের জীবন। এবার এই ভাস্বর জীবনে দেখা দেয় আচার্যের ভূমিকা। আচার্যরূপে জনকল্যাণের তিনটি বৃহৎ কর্মসূচী তিনি গ্রহণ করেন।

প্রাচীন তন্ত্রসাধনার অবনতি এদেশে বহু শত বৎসর যাবৎ শুরু হইয়াছে। এই অবনতি নিম্নতম পর্যায়ে আসিয়া পৌঁছিয়াছে বৌদ্ধ-তান্ত্রিকতার শেষ যুগে। সাধনার ভিতরে ঢুকিয়া পড়িয়াছে নানা বীভৎসতা, নিষ্ঠুরতা ও যৌন কদাচার। শাস্ত্রের ভিতরে দেখা দিয়াছে নানা বিভ্রান্তি ও অপব্যাখ্যা। ফলে এই নিগূঢ় মুক্তি-সাধনা সম্পর্কে জনসাধারণের মনে এই যুগে সঞ্চারিত হইয়াছে ঘৃণা, সন্দেহ ও অহেতুক আতঙ্ক।

এই অধঃপতন ও অপব্যাখ্যার কবল হইতে তন্ত্রসাধনা ও তন্ত্রশাস্ত্রকে মুক্ত করার জন্য তৎপর হইয়া উঠিলেন শিবচন্দ্র।

এই কার্য সাধন করিতে হইলে সাধনা এবং শাস্ত্রের প্রকৃত স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করা আবশ্যক। তাই সাধনকামী শিষ্যদের সম্মুখে তিনি তুলিয়া ধরিলেন নিজের বীরাচারী ও শুদ্ধতর ক্রিয়াসমন্বিত সাধনা! কাশীতে থাকা কালে ভারতের কৌল সাধক এবং পণ্ডিত মহলে শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণবের তন্ত্রসিদ্ধির কথা প্রচারিত হয় এবং বহু মুমুক্ষু ভক্ত তাঁহার নিকট আশ্রয় গ্রহণ করিতে আসেন, দীক্ষা ও উপদেশ পাইয়া তাঁহারা ধন্য হন।

প্রকৃত তন্ত্রশাস্ত্র এবং তন্ত্রতত্ত্বের প্রচার না হইলে তন্ত্র সম্পর্কে লোকের ভয় এবং সন্দেহ দূর হইবে না, অনুরাগও আসিবে না। তাই নিজের নিভৃত সাধনচক্র হইতে শিবচন্দ্রকে বাহিরে আসিতে হইল, অমিত উৎসাহ ও কর্মশক্তি নিয়া প্রচারকর্মে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন।

সর্বপ্রথমে কাশীধামে উচ্চকোটির সাধক ও শাস্ত্রবিদ্‌দের নিয়া শিবচন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন সর্বমঙ্গলা সভা। এই সভার মাধ্যমে, শিবচন্দ্র এবং তাঁহার সহযোগী মনীষী ও সাধকদের চেষ্টায় তন্ত্রের শুদ্ধতর রূপটির সহিত সাধক ও ভক্ত জনগণের পরিচয় সাধিত হইতে থাকে।

শিবচন্দ্র একাধারে ছিলেন সিদ্ধপুরুষ, শাস্ত্রবিদ্‌, কবি ও বাগ্মী, কাজেই তাঁহার ব্যক্তিত্বের আকর্ষণ ছিল অপরিসীম। বিশেষ করিয়া জনজীবনে তাঁহার বাগ্মিতার প্রভাব ছিল বিস্ময়কর। বাংলা, সংস্কৃত এবং হিন্দিতে অনর্গলভাবে তিনি বক্তৃতা দিতে পারিতেন। তাঁহার জ্ঞানের গভীরতা, ভাষার আবেগময় ঝঙ্কার এবং তেজোদৃপ্ত উদ্দীপনায় সহস্র সহস্র শ্রোতা বিমুগ্ধ হইয়া যাইত, গ্রহণ করিত উচ্চতর জীবন সাধনার প্রেরণা।

এই সময়ে সারা উত্তর ভারতে সনাতন ধর্মের উজ্জীবনের জন্য এক প্রবল ভাবতরঙ্গ উত্থিত হয়। এই তরঙ্গের শীর্ষে অধিষ্ঠিত দেখি ধর্ম সংস্কৃতির ধারক বাহক একদল প্রতিভাধর পুরুষকে। ইঁহাদের

মধ্যে অগ্রণী—শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব, স্বামী কৃষ্ণানন্দ, শশধর তর্কচূড়ামণি, কালিবর বেদান্তবাগীশ প্রভৃতি।

শিবচন্দ্র এবং ইঁহাদের সমবেত চেষ্টায়, বিশেষত ইঁহাদের বাগ্মিতা ও লেখনীর প্রভাবে, ভারতের ধর্ম ও সংস্কৃতি সম্পর্কে শিক্ষিত সমাজে নূতন মূল্যবোধ জাগিয়া উঠে, হিন্দু ধর্মের শাশ্বত ও সর্বজনীন রূপের প্রতি সকলের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়।

শিবচন্দ্রের আবাল্য বন্ধু জলধর সেন তাঁহার অসাধারণ বাগ্মিতা সম্পর্কে বলিয়াছেন, "সাধু-ভাষায় এমন ওজস্বিনী বক্তৃতা ক'রে ঘণ্টার পর ঘণ্টা শ্রোতৃবর্গকে মন্ত্রমুগ্ধ ক'রে রাখবার শক্তি সত্যসত্যই শিবচন্দ্রের ছিল। সে সময়ে আরও একজনের সে শক্তি ছিল, তিনি পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন। উভয়ের বক্তৃতার একটা পার্থক্য এই ছিল যে, শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন চলতি ভাষায় বক্তৃতা করতেন, আর শিবচন্দ্র সাধুভাষায় বলতেন। বাংলা ভাষা যে কতদূর শক্তিসম্পন্ন, বাংলা ভাষার মাধুর্য যে কতদূর মনোমদ, যাঁরা বাগ্মীপ্রবর শিবচন্দ্রের বক্তৃতা শুনেছেন তাঁরা সেকথা অকুণ্ঠিত চিত্তে স্বীকার করবেন।"

তন্ত্রের প্রকৃত স্বরূপ ও মাহাত্ম্য প্রচারে উদ্বুদ্ধ হইয়া শিবচন্দ্র রচনা করিলেন 'তন্ত্রতত্ত্ব'। এই মহান্ গ্রন্থ তাঁর সারস্বত জীবনের এক মহান্ কীর্তি। তন্ত্রশাস্ত্রের প্রাচীনত্ব, মহত্ত্ব এবং প্রামাণিকতা এই গ্রন্থে তিনি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এই সঙ্গে চেষ্টা করিয়াছেন তন্ত্র সম্পর্কে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিদের অশ্রদ্ধা ও অবিশ্বাস দূর করিতে। এই গ্রন্থে তন্ত্রসিদ্ধ মহাপুরুষ শিবচন্দ্র একথাও প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে তন্ত্রের সহিত বেদ, দর্শন প্রভৃতির ও পুরাণের কোনো বিরোধ নাই। শুধু তাহাই নয়, তন্ত্র, বেদান্ত, বৈষ্ণব শাস্ত্র প্রভৃতি সকলেরই মধ্যে হিন্দু সাধনার পরমতত্ত্ব প্রতিফলিত, এই উদার সার্বভৌম মতও তিনি ইহাতে উপস্থাপিত করিয়াছেন। এই উদার শুভবুদ্ধি ও অখণ্ড জীবনবোধ শিবচন্দ্রকে চিহ্নিত করিয়া দেয় সমকালীন ভারতের এক অসামান্য ধর্মনেতা রূপে।

কবি, সাহিত্যিক ও তত্ত্বদর্শী শিবচন্দ্রের রচনার সংখ্যা কম নয়।

সাহিত্যিক মূল্যায়নের দিক দিয়াও এগুলি বৈশিষ্ট্যের দাবি রাখে। তাঁহার রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—তন্ত্রতত্ত্ব (১ম ও ২য় ভাগ), গঙ্গেশ (নাটক), দুর্গোৎসব (২খণ্ড), মা, কর্তা ও মন (১ম, ২য়) রাসলীলা (১ম, ২য়), গীতাঞ্জলি (১ম, ২য়), শৈব গীতাবলী, ভাগবতী তত্ত্ব, স্বভাব ও অভাব, পীঠমালা, স্তোত্রমালা, এবং দশমহাবিদ্যা স্তোত্র।

কৌল তত্ত্ব ও সাধনার ধারক বাহক 'শৈবী' নামক একটি পত্রিকাও কয়েক বৎসর তিনি সম্পাদনা করিয়াছিলেন।

বাংলার মানস ও সমাজ বিবর্তনে তন্ত্রের সাধন ও দার্শনিকতার প্রভাব অস্বীকার করার উপায় নাই। যুগে যুগে এ প্রভাব সক্রিয় হইয়া রহিয়াছে। শিবচন্দ্র তন্ত্রসিদ্ধ মহাপুরুষ এবং তন্ত্রশাস্ত্রের বিশিষ্ট প্রবক্তা, বিশেষ করিয়া উনবিংশ শতকের তন্ত্র-উজ্জীবনের চিহ্নিত নেতা। তাই বাংলায় তন্ত্রধৃতির বৈশিষ্ট্যটি স্মরণ রাখিয়াই তিনি অবতীর্ণ হইয়াছিলেন তাঁহার জীবন ব্রত উদ্‌যাপনে।

এ প্রসঙ্গে বাংলার সাহিত্য ও সমাজ মানসের সুধী সমালোচক অধ্যাপক মোহিতলাল মজুমদারের বক্তব্য অনুধাবনযোগ্য :

—তন্ত্র বলিতে যাহা বুঝায় তাহা বহু দেশের বহুকালের সাধন পদ্ধতির অঙ্গীভূত হইয়াছিল। প্রাক্ ঐতিহাসিক যুগেও ইহার প্রচার ছিল। উহা প্রাক্ বৈদিক তো বটেই। উহারই নানা রূপ ভেদ, নানা জাতির সাধনায় ঘটিয়াছে ; এককালে জগতের সকল সুপ্রাচীন সমাজে উহা প্রচলিত ছিল। সেই মূল তত্ত্বকে বহন করিয়া অতঃপর নানা যুগের নানা ধর্ম অল্পবিস্তর তান্ত্রিকতা আশ্রয় করিয়াছে। এ কথা সত্য হইলেও, বাংলার সম্বন্ধে দুইটি বিশেষ কথা অনুধাবন করিবার আছে। প্রথমত—এই বাংলার ভূমিতে উহা একটি নিরবচ্ছিন্ন ধারায় বহিয়া আসিয়াছে এবং এই বাংলাতেই ঐ সাধনার চরমোৎকর্ষ ঘটিয়াছে। দ্বিতীয়ত—তন্ত্র অর্থে যে সাধনতত্ত্ব বা পদ্ধতিই বুঝাক না কেন এবং যে কালে যে ধর্মের

সহিত যুক্ত হইয়া উহা একটি বিশিষ্ট রূপ ধারণ করুক না কেন, সেই সকল মত ও সাধনপন্থা এই বাংলায় একটি বিশিষ্ট বাঙালী পন্থায় রূপান্তরিত হইয়াছে। তেমন আর কোথাও হয় নাই। অতএব এমন কথা বলা যাইতে পারে যে, ঐ তন্ত্রও এই বাংলাদেশে একটা বিশেষ ভাববীজকে আশ্রয় করিয়াছে। এক কথায়, শৈবতান্ত্রিক বা বৌদ্ধতান্ত্রিক বা তিব্বতীয়, চীনা তান্ত্রিক অথবা আরও কোনো আদিম অসংস্কৃত তান্ত্রিক সাধনা কোনো এককালে বাংলায় প্রবেশ করিয়া থাকিলেও, বাঙালীর নিজের একটা তন্ত্র ছিল—সেই তন্ত্রে সকল তন্ত্রই বাঙালী তন্ত্র হইয়া উঠিয়াছে। এই বাঙালী তন্ত্রের সর্বশেষ জয় ঘোষণা আমরা দেখিয়াছি বাংলার শাক্ত ও বৈষ্ণব সাধনার অভ্যুদয়ে, বাংলার সহস্র সার্বিক সাধনার যে একটি বিশেষ সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহার পূর্ণ পুষ্পিতরূপ উহাই।[১]

সিদ্ধ কৌল শিবচন্দ্রের প্রচারিত তান্ত্রিকতায় বাংলার তন্ত্র-সাধনার সেই উদার ও সর্বসমন্বিত রূপ, সেই পুষ্পিত ও ফলিত রূপ, আমরা দেখিতে পাই।

মহামায়া জগদম্বার স্বরূপ ব্যাখ্যা করিতে গিয়া সাধক শিবচন্দ্র লিখিয়াছেন :—মা! স্বরূপতঃ তোমার কোনো অংশই কখনও একেবারে দুইভাগে ঢাকা পড়িতে পারে না; কারণ একভাগে তুমি চিরকাল আবৃতা, আচ্ছাদিতা—লুক্কায়িতা অন্তর্হিতা, আর অন্যভাগে তুমিই নিবারণসুন্দরী—তুমি স্বপ্রকাশ জ্যোতির্ময়ী নিখিল আবরণের আবরণরূপিণী ব্যোমব্যাপিনী দিগম্বরী। যে ভাগ তোমার পশ্চাৎবর্তী তাহাই মা!—মায়া রাজ্য; আর যাহা মায়ার অতীত তত্ত্ব তাহাই তোমার সম্মুখবর্তী। মহাবিদ্যার দৃষ্টিপাতে অবিদ্যার আঁধার ঘুচিয়া যায়, তাই তোমার সম্মুখে মায়া দাঁড়াইতে পারে না। কিন্তু মা! এ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ডের একমাত্র উপাদান মায়া তবে কাহার আশ্রয়ে দাঁড়াইবে? তাই তো মায়া তোমার চরণে শরণাগতা, অভয়পদের

১ বাংলা ও বাঙালী : মোহিতলাল মজুমদার

চিরাশ্রয়ে নিরাপদে রক্ষিতা ; তাই মা ! মায়ার অতীতা হইয়াও স্বয়ং তুমি মায়াময়ী মহামায়া[১]।

জগজ্জননীর অখণ্ড অদ্বৈতসত্তার উদ্ভাসন দেখা দিয়াছে সাধক শিবচন্দ্রের জীবনে। স্নেহময়ী ইষ্টদেবী আর পরাৎপরা মহাশক্তি এবার তাঁহার উপলব্ধিতে এক এবং অখণ্ড হইয়া গিয়াছেন। তাই তিনি বলিতেছেন :

—মূলে তিনি ব্রহ্মময়ী, বৃক্ষে তিনি মায়াময়ী, পুষ্পে তিনি জগন্ময়ী আবার ফলে তিনি মুক্তিময়ী ; ব্রহ্ম, ঈশ্বর, মায়া, অবিদ্যা এই চারি তাঁহারই স্বরূপ। একা তিনিই এই চতুর্ভাগে বিভক্ত হইয়া চরাচর জগতে আনন্দ লীলায় অভিনেত্রী, আপন আনন্দে আপনি মাতিয়া তিনি উন্মাদিনী, আপনি জন্মিয়া, আপনি মরিয়া, আপন শ্মশানে আপনি নাচিয়া, আপন শবে শিব হইয়া আপনি তিনি বিলাসিনী। আপনি পুরুষ আপনি প্রকৃতি, আপনি মহাকাল যুবতী, আপনি রতি, মতি, গতি পরমানন্দ নন্দিনী। আপনি মায়া, আবার আপনি অমায়া, আপনি মায়ারূপিণী ; আপনি বিদ্যা, আপনি অবিদ্যা, আপনি সাধ্যাসনাতনী, বেদ বেদান্ত পুরাণ তন্ত্র যাহাকে তুমি জিজ্ঞাসা করিবে, তিনি তাঁহার এই অদ্বৈত বিভূতির সুস্পষ্ট সাক্ষ্য প্রদান করিবেন।

—সাধক সেই শাস্ত্রীয় আস্তিক্য দৃষ্টিতেই তাঁহার বিদ্যা এবং অবিদ্যা উভয়রূপে ব্রহ্মাণ্ডলীলা দেখিয়া, কি বন্ধনে কি মোচনে, উভয় দশাতেই মায়ের কোলে বসিয়া থাকেন, তিনি সেই সোহাগে গলিয়া গিয়া সেই অভিমানে কঠিন হইয়া, আদরে মায়ের কোলে বসিয়া, বন্ধনে বদ্ধ দুটি হাত মায়ের হাতে ধরিয়া দিয়া গদ্‌গদ স্বরে বলিতে থাকেন "মা ! তুই বড় পাগলী মেয়ে।"

তন্ত্র অর্বাচীন নয়, সুপ্রাচীন—সনাতন তন্ত্র বেদবহির্ভূত নয়, বেদেরই অংশ। বৈদিক ঋষিদের অনেককেই তন্ত্রের মন্ত্রশক্তির

১ মা (১ম ভাগ) : শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব

সহায়তা গ্রহণ করিতে দেখা গিয়াছে। তাই বেদ ও তন্ত্রকে পৃথক করিয়া দেখা অতিশয় ভ্রমাত্মক—একথাটি শিবচন্দ্র বার বার তাঁহার লেখায় ও ভাষণে জোর দিয়া বলিয়াছেন :

—ভগবান্ ভূতভাবন নিজেই বলিয়াছেন : 'মথিত্বা জ্ঞানদণ্ডেন বেদাগম মহোদধি',—আমি জ্ঞানদণ্ডদ্বারা বেদশাস্ত্ররূপ মহাসমুদ্র মন্থন করিয়া তন্ত্ররূপ অমৃতের উদ্ধার করিয়াছি।..."

—বেদ বেদাঙ্গ বেদান্ত যদি তন্ত্রের পূর্বে না থাকিবে তবে বেদশাস্ত্র-সমুদ্রের মন্থন সম্ভবে কিরূপে? এতাবৎ যিনি তন্ত্রের প্রচারকর্তা, তিনিই তো নিজ মুখে বলিয়াছেন : বেদের পর তন্ত্রের প্রচার। তবে আর তন্ত্র আধুনিক বলিয়া নূতন কথাটা কি শুনাইলে ভাই? কিন্তু তাই বলিয়া মনে করিও না ৪০ হইতে ৭০ বৎসর যাহাদের পরমায়ুর পূর্ণ সংখ্যা তাহাদের পক্ষেও আধুনিক। ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-স্থিতি সংহার যাঁহার এক কটাক্ষের ফল, তন্ত্রের এ আধুনিকতা তাঁহার চক্ষেই শোভা পায়। দ্বিনেত্রের উপর যাঁহার ত্রিনেত্র উদ্ভাসিত, তন্ত্রের স্বরূপ তাঁহার দৃষ্টিতেই প্রতিবিম্বিত, ভগবানের আজ্ঞা, শব্দব্রহ্ম এবং পরব্রহ্ম উভয়েই আমার নিত্যদেহ। হিন্দুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া যথাশাস্ত্র তন্ত্রে বিশ্বাস করিতে হইলে ব্রহ্মের সচ্চিদানন্দ স্বরূপে আর শব্দব্রহ্মরূপে শাস্ত্রকে তাঁহারই নিত্যমূর্তি বলিয়া অবনতমস্তকে মানিয়া লইতে হইবে। তাহাতে কি বেদ, কি পুরাণ, কি তন্ত্র, কি জ্যোতিষ —ইহাদের সকলকেই ভগবানের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বলিয়া জানিতে হইবে। শাস্ত্রসকল যে এক কেন্দ্রবন্ধনে আবদ্ধ তাহার একটি বন্ধন ছিন্ন করিলেই সমস্তই বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবে। কাহারও সাধ্য নাই ইহার কোনো একটির বিপর্যয় ঘটাইতে পারে।

—বেদ-মূলকতা না থাকিলে যেমন কোনো শাস্ত্রের প্রামাণ্য নাই, কোনো শাস্ত্রের প্রামাণ্য না থাকিলেও তদ্রূপ বেদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নাই। বিশেষতঃ তন্ত্রশাস্ত্র মন্ত্রশাস্ত্র; মন্ত্রই বেদের জীবনীশক্তি বা পরমাত্মা। সুতরাং তন্ত্রশাস্ত্রের অভাব হইলে, বেদ তো তখন চেতনাহীন। বেদেও লোকের যেমন অধিকার, তন্ত্রেও তেমনিই।

আসলে বৈদিক হইয়া যেমন বেদ বুঝিতে হয়, তান্ত্রিক হইয়া তেমনি তন্ত্র বুঝিতে হয়। সেইরূপ উপনয়ন সংস্কারে সংস্কৃত হইয়া যেমন প্রকৃত ব্রাহ্মণ হইতে হয়, সাধনা করিয়া তেমনি সিদ্ধ হইতে হয়। মন্ত্রশাস্ত্র যদি বেদের আত্মা হয়, তবে আর বেদের পর তন্ত্রের সৃষ্টি—ইহা সঙ্গত কিরূপে ?....

—স্বয়ং মহাদেব হইতে আরম্ভ করিয়া ঋষিগণ পর্যন্ত সকলেই বেদের অনুসরণ-কর্তা ভিন্ন কর্তা কেহ নহেন। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, রামচন্দ্র প্রভৃতি ভগবদবতার এবং অন্যান্য দেবগণ যুগযুগান্তে সময়ে সময়ে বেদের প্রকাশক হইয়াছেন এইমাত্র। শাস্ত্র প্রচারের সময় সকল ঋতু মাস বৎসরাদির ন্যায় স্ব স্ব চক্রবর্তেই ঘুরিয়া আসিতেছে, তাই বেদেও তন্ত্রমন্ত্রের উল্লেখ দেখিতে পাই।

—বেদে তন্ত্রমন্ত্রের উল্লেখ শুনিয়া হয়তো অনেকেই চমকিত হইবেন। প্রকৃতপক্ষে আমরা তন্ত্রকে একমাত্র মন্ত্রশক্তিরই লীলা খেলা—সাধনাসিদ্ধির আকর—ভিন্ন আর কিছু বুঝি না। সেই মন্ত্র-শক্তিই বেদের সঞ্জীবনী। অন্যান্য শাস্ত্র বেদের অঙ্গ হইলেও মন্ত্রশক্তি বেদের পরমাত্মা। জগৎপিতা ও জগজ্জননীর প্রশ্নোত্তরে তাহাই আগম ও নিগম মূর্তিতে পুনঃপ্রকটিত হইয়াছে মাত্র। বেদ ও তন্ত্র উভয়ের যথাশাস্ত্র অধিকারী যিনি, তিনি একথা কখনও অস্বীকার করিতে পারিবেন না।

তন্ত্রশাস্ত্র যে বেদ ভিত্তিক, বেদেরই 'অন্তর্ভুক্ত, এবিষয়ে শিবচন্দ্র নিঃসংশয় ছিলেন। তাই লিখিয়াছেন[১] :

—হিন্দুজাতির একমাত্র আশ্রয় বেদবৃক্ষ—তান্ত্রিক পঞ্চোপাসনা উহারই পঞ্চশাখা। এই বিশাল শাস্ত্রবৃক্ষ সহস্র মন্বন্তর কল্পকল্পান্তরের প্রাচীন। জীবাত্মা পরমাত্মায় যে ভেদ, বেদ ও তন্ত্রে সেই ভেদ অর্থাৎ আত্মার অস্তিত্বে যেমন মনের (ন্যায় মতে জীবাত্মার) অস্তিত্ব, তন্ত্রের অস্তিত্বেও সেইরূপ বেদের অস্তিত্ব। জীবদেহে পরমাত্মা যেমন বিশুদ্ধ চিৎশক্তি, শাস্ত্রদেহেও তন্ত্র তদ্রূপ মন্ত্রময়ী চিৎশক্তি।

১ তন্ত্রতত্ত্ব, ১ম ভাগ : শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব

জীবাত্মায় যেমন সগুণ মনঃশক্তির প্রক্রিয়াসকল নিত্য প্রবাহিত, বেদেও তদ্রূপ স্বত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই ত্রিগুণ অধিকারানুরূপ জ্ঞানময় শক্তিসকল নিত্য অধিষ্ঠিত। মারণ, উচাটন ইত্যাদি ব্যাপারের অধিকাংশ তন্ত্রোক্ত প্রক্রিয়া অথর্ববেদে কথিত হইয়াছে। আবার বেদোক্ত অনেক মন্ত্রই তান্ত্রিক উপাসনায় নির্দিষ্ট হইয়াছে। ইহার পর বেদের যে শত সহস্র শাখা লুপ্ত হইয়াছে তাহাতে কত শত তান্ত্রিক উপাসনাতত্ত্ব বিলীন হইয়াছে, কাহার সাধ্য তাহার ইয়ত্তা করিবে? অন্য উদাহরণ নিষ্প্রয়োজন, বেদের সর্বস্ব সার সম্পত্তি প্রণবও যে তন্ত্রমন্ত্রাতিরিক্ত নহে সাধকবর্গ মন্ত্রতত্ত্বে তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাইবেন।

তন্ত্র সাধনায় মন্ত্রের চৈতন্যময় ক্রিয়াশক্তির গুরুত্ব অত্যন্ত বেশী —একথাটি শিবচন্দ্র তাঁহাদের শিষ্যদের কাছে বার বার বলিতেন। আরও বলিতেন: "সাধকের আত্মশক্তি বায়ু স্থানীয় এবং মন্ত্রশক্তি অগ্নিস্থানীয়, এজন্য তাঁহার আত্মশক্তি নিমেষ মধ্যে তাহাকে বিপুল করিয়া তুলিতে পারে। শাস্ত্র যত কেন দূর পারাবার না হয়, একমাত্র ভেলা যেমন অগ্রসর হইয়া তোমাকে তাহার পারান্তরে লইয়া যাইবে, তদ্রূপ জ্ঞান, যোগ, সমাধিতত্ত্ব যত কেন দূরান্তর না হয় মন্ত্রময়ী মহাদেবী মূর্তিমতী হইয়া তোমার হাত ধরিয়া তাহার অপর পারে লইয়া যাইবেন। জ্ঞান, যোগ, সমাধি যাহারই কেন অনুষ্ঠান না কর, দেখিবে তাহার সকলের মধ্যেই সর্বেশ্বরী আনন্দময়ী মুক্তকেশী মা আমার আনন্দে হাসিয়া হাসিয়া নাচিতেছেন। তাঁহারই অশ্রান্ত নৃত্যভরে আমার জ্ঞানের সমুদ্রে প্রেমের তরঙ্গ উদ্বেলিত হইয়া পড়িতেছে।"

তন্ত্র গৃহ আর শ্মশান, যোগ ও ভোগ এই দুটিকেই যুক্তভাবে একীভূত সত্তায় দেখিতে শিখায়। জগৎ সৃষ্টির প্রতিটি ধূলিকণায় ব্রহ্মময়ী জগজ্জননীর বিভূতি ও স্বরূপ দর্শন করিয়া তন্ত্রাচারী বীর সাধক আনন্দে উদ্বেল হইয়া উঠে। তারপর দ্বৈত হইতে তাঁহার উত্তরণ ঘটে অদ্বৈতে, লীলা হইতে পৌঁছে গিয়া অদ্বৈতে। এই তত্ত্ব

ব্যাখ্যা করিতে গিয়া শিবচন্দ্র বলিয়াছেন, "অন্ধকার না থাকিলে যেমন আলোকের স্বরূপ অবগত হওয়া যাইত না তদ্রূপ এই নাম রূপাত্মক দ্বৈত ব্রহ্মাণ্ড না থাকিলে অদ্বৈত তত্ত্বও অবগত হওয়া যাইত না, দ্বৈতাদ্বৈত বিচার করিবার কর্তাও কেহ থাকিত না, প্রয়োজনও হইত না। মৃত্তিকা বুঝিতে হইলেই, যে দেশে ঘট কুম্ভ কুম্ভকার কিছুই নাই সেই দেশে গিয়া বুঝিতে হইবে, এরূপ নহে। বুদ্ধি থাকিলে ঘট সম্মুখে রাখিয়াই বুঝিতে হইবে যে, ইহা স্বরূপতঃ মৃত্তিকা বই আর কিছুই নহে; এইরূপে মৃত্তিকা তত্ত্ব যিনি বুঝিয়াছেন তিনি ঘট দেখিয়া বিস্মিত হন না. অধিকন্তু ব্রহ্মময়ীর অনন্ত শক্তি দেখিয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়া নামরূপ সকল ভুলিয়া প্রতিরূপে সেইরূপ দেখিতে থাকেন—যেরূপে এই বিশ্বরূপ ডুবিয়া গিয়া ব্রহ্মরূপের আবির্ভাব হয়, তুমি আমি ঘট দেখিলেও জ্ঞানী যেমন তাহাকে মৃত্তিকা বই আর কিছুই দেখেন না, তদ্রূপ তুমি আমি স্ত্রীপুত্র পরিবারময় সংসার দেখিলেও তান্ত্রিক সাধক তাহাতে ব্রহ্মময়ীর স্বরূপ বই আর কিছুই দেখেন না।"

কালপ্রবাহের ফলে, যুগপরিবর্তনের প্রভাবে, তন্ত্রসাধনা এবং তন্ত্রশাস্ত্রের মধ্যে অনেক কিছু অবাঞ্ছনীয় বস্তু ঢুকিয়া পড়িয়াছে। তাহার ফলে তন্ত্র ও কৌলসাধকদের বিরুদ্ধে পুঞ্জীভূত হইয়া রহিয়াছে সন্দেহ, ঘৃণা এবং অপপ্রচার। ইহার প্রতিবিধান কিরূপে হইবে? তন্ত্রসাধনা ও তন্ত্রশাস্ত্রকে ত্যাগ করিলে তো প্রকৃত সমস্যার সমাধান হইবে না। বরং ইহাদের পরিশুদ্ধ করিয়া নিতে হইবে, সাধনালব্ধ সত্যের কষ্টিপাথরে যাচাই করিয়া নিতে হইবে। এক কথায় তন্ত্রকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে তাঁহার স্বমহিমায়, স্থাপন করিতে হইবে প্রকৃত সাধনার্থীদের পূজাবেদীর উপর।

আচার্য শিবচন্দ্র তাই বলিয়াছেন, "পথে প্রান্তরে শ্রান্ত পথিকের বিশ্রামের শান্তিনিকেতন এই যে কোটি কোটি অশ্বত্থ বটবৃক্ষ দিগ্ দিগন্তে শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া কি লৌকিক পথিক পরমার্থ পথিক লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি সাধু সন্ন্যাসী সাধক সিদ্ধমহাপুরুষ-

গণকে আশ্রয় দিয়া রক্ষা করিতেছে, কত যোগী যোগীন্দ্র, ঋষি মহর্ষি মুনিগণের সাধনা সিদ্ধ এই সকল স্থাবর গুরুতরুগণের চরণ প্রান্তে নিত্য নিবেদিত ত হইতেছে ; সেই বিশাল বৃক্ষের প্রান্তরে অন্ধকারে সর্বস্ব অপহরণের জন্য চোর দস্যুদল, কোঠরে বা শাখা-প্রশাখায় শরীর ঢাকিয়া কখনও কি লুক্কায়িত থাকে না ? এখন সেই অপরাধেই কি যেখানে দেখিব অশ্বত্থ বটবৃক্ষ, সেইখানেই তাহাকে সমূলে ছেদন করিতে হইবে ? কোনো রমণী কখনও যদি ব্যভিচারিণী হয়, এই অপরাধে বিবাহ প্রথা উঠাইয়া দেওয়া যেমন বুদ্ধিমানের কাজ নহে, বর্তমান সমাজেও অত্যাচারী স্বেচ্ছাচারীদিগের দোষে সর্বমঙ্গলরূপ শাস্ত্রভাণ্ডার তন্ত্রশাস্ত্রকে ত্যাগ করাও তাহাই।"

কালের প্রভাবে পুণ্যময় ভারতে ধর্ম এবং আত্মিক সাধনার অবনতি ও অবক্ষয় শুরু হইয়াছে, আর শক্তিবিভূতিধর সিদ্ধ তান্ত্রিক মহাপুরুষেরা দিন দিন দুর্লভ হইতেছেন। কিন্তু প্রকৃত শ্রদ্ধা এবং প্রকৃত দৃষ্টি দিয়া দেখিতে জানিলে এই সিদ্ধ মহাত্মাদের দর্শন এখনও মিলে। এখনও প্রচ্ছন্ন অস্তিত্ব হইতে, অন্তরাল হইতে, মাঝে মাঝে তাঁহারা প্রকট হন। এ সম্পর্কে নিজের অভিজ্ঞতা ও দর্শনের ভিত্তিতে শিবচন্দ্র মুমুক্ষুদের আশ্বাস দিয়া বলিয়াছেন :

"এখনও তান্ত্রিক সিদ্ধ সাধক মহাপুরুষগণ নিজ নিজ তপঃপ্রভাবে ভারতের দিগ্‌দিগন্ত প্রজ্বলিত করিয়া রাখিয়াছেন, এখনও ভারতের শ্মশানে প্রতি অমাবস্যার ঘোরে মহানিশায় প্রজ্বলিত চিতাগ্নির সঙ্গে সঙ্গে ভৈরব ভৈরবীগণের জ্বলন্ত দিব্যজ্যোতি নৈশতমসা বিদীর্ণ করিয়া গগনাঙ্গন আলোকিত করে, এখনও শ্মশানের জলমগ্ন মৃত ও পচিত শবদেহ সাধকের মন্ত্রশক্তি প্রভাবে পুনর্জাগ্রত হইয়া সিদ্ধ সাধনায় সাহায্য করে, এখনও তান্ত্রিক যোগিগণ দৈব দৃষ্টি প্রভাবে এই মর্তলোকে বাস করিয়া দেবলোকের অতীন্দ্রিয় কার্য সকল প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। এখনও ভবভয়ভীত প্রণত শরণাগত ভক্ত সাধককে মুক্ত করিবার জন্য ভক্তভয়ভঞ্জিনী মুক্তকেশী মহা-শ্মশানে দর্শন দিয়া থাকেন। এখনও ব্রহ্মময়ীর সেই ব্রহ্মাদি বন্দিত

পদাম্বুজে ব্রহ্মরন্ধ্র স্থাপন করিয়া সাধক ব্রহ্মস্বরূপে মিশিয়া যান, এখনও মন্ত্রশক্তির অদ্ভুত আকর্ষণে পর্বতনন্দিনীর সিংহাসন টলিয়া থাকে। মুক্তিপুরীর শ্রান্ত যাত্রী সাধকের পক্ষে ইহাই চিরপ্রশস্ত রাজপথ, শয্যাশায়ী মুমূর্ষু অন্ধের পক্ষে ইহা অন্ধকার বই আর কিছুই নহে; কিন্তু অন্ধ, নিশ্চয় জানিও—এ অন্ধকার তোমারই নয়নপথে।"

প্রকৃত নিষ্ঠাবান্ ও ক্রিয়াবান্ তন্ত্রসাধকের জন্য শিবচন্দ্র যন্ত্র, অভিষেক, অভিচার ইত্যাদির ব্যবস্থা করিতেন, আর সাধারণ মাতৃ-সাধক ভক্তদের বেলায় জোর দিতেন মাতৃনাম জপের উপর। তিনি বলিতেন: "মাতৃনামে তারকব্রহ্ম নাম, এ নাম জাতিবর্ণ নির্বিশেষে সবাইকে উদ্ধার করে। তেমনি তন্ত্রসাধনা নিবিচারে কোল দেয় সবাইকে।—"পারের ঘাটে নৌকায় উঠিতে যেমন জাতি বিচার নাই, গঙ্গার জলে স্নান করিতে যেমন পুণ্যাত্মা পাপাত্মার বিচার নাই, কাশীধামে মৃত্যু হইলে নির্বাণ মুক্তির অধিকারে যেমন স্থাবর জঙ্গম কীট পতঙ্গ কাহারও কোনো তারতম্য নাই, তদ্রূপ এই ভবসাগরের পারের নৌকায় জ্ঞানগঙ্গার পবিত্র জলে ব্রহ্মাণ্ডময় বারাণসী তান্ত্রিকদীক্ষায় দীক্ষিত হইতে কাহারও কোনো বাধা নাই। অধিক কি, কাহাকেও আত্মসাৎ করিতে অগ্নির যেমন আপত্তি নাই, তদ্রূপ কাহাকেও ব্রহ্মসাৎ করিতেও তন্ত্রের কোনো আপত্তি নাই, তাই তান্ত্রিক দীক্ষা ত্রৈলোক্য নিস্তারের অদ্বিতীয় এবং অমোঘ উপায়।"

শিবচন্দ্রের সাধনা, সিদ্ধি ও তত্ত্বোজ্জ্বলা বুদ্ধি তাঁহার জীবনে ফুটাইয়া তুলিয়াছিল সত্যকার পরমবোধ ও সমদর্শিতা। মহাকালীর আরাধনা ও শ্মশান-সাধকের আরাবে প্রমত্ত হইয়া উঠিতেন যে শিবচন্দ্র, তিনিই কৃষ্ণ-উপাসনা ও গোপীপ্রেমের কথা বলিতে বলিতে পুলকাঞ্চিত হইতেন, বক্ষ প্লাবিত হইত অশ্রুজলে।

তিনি বলিতেন, "আজও ভারতবর্ষের সে শুভদিনের সুপ্রভাত

হয় নাই, যাহাতে আমরা স্বাধীনভাবে গোপী প্রেমের বিনিময়ে ভগবানের তত্ত্বনির্ণয় নির্বিঘ্নে নিঃসংকোচে সাধারণের সমক্ষে খুলিয়া দিতে পারি।”

জননী সর্বমঙ্গলার সিদ্ধ সাধক, মহাকালীর পরমতত্ত্বের সংবাহক, শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব অবলীলায় গোপীপ্রেম সম্বন্ধে যে উচ্ছ্বসিত প্রশস্তি গাহিয়াছেন তাহা যে কোনো মহাবৈষ্ণবের লেখনীতেও দুর্লভ। তিনি লিখিয়াছেন :

—গোপীগণ নিজ নিজ হৃদয়কুম্ভ লইয়া প্রেমের জল আনিতে শ্যাম সরোবরের অভিমুখে ধাবিত হইয়াছেন, সে অগাধ প্রেমের জলে কামের কুম্ভ ডুবাইয়াছেন, দেখিতেছেন—তাহাতে একা গোপী কেন? অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের সুরাসুর নরনারী ঐ ত্রিতাপহরণ বারিদবরণ বারি সঞ্চয়ের জন্য তাঁহার কূলে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন, কেহ ডুবিয়াছেন, কেহ ডুবিতেছেন, কেহ ডুবাইতেছেন, আবার কেহ ডুবিবেন, কেহ ডুবাইবেন, যিনি একবার আসিয়াছেন তিনি আর ফিরিয়া যাইবেন না, যদিও কেহ ফিরিয়া যান, যেমন আসিয়াছিলেন তেমন আর ফিরিয়া যাইবেন না।

—শ্যাম সাগরের অগাধ জলে কামের কান্তি এবার ধুইয়া গিয়া প্রেমিকের প্রেমময় অঙ্গপ্রত্যঙ্গে শ্যামকান্তি ছড়াইয়া পড়িবে। তখন কি সাগরে কি নগরে, কি গহনে, কি পবনে, কি ভুবনে, শ্যামময় নয়ন হইয়াছে অথবা নয়নময় শ্যাম হইয়াছেন, বাঁশী বাজাইয়া মন হরণ করিয়া মনের অধীশ্বর আপনি আসিয়া মনের স্থান পূরণ করিয়াছেন, মনের সঙ্গে প্রাণকেও আকর্ষণ করিয়াছেন, এখন অবশিষ্ট বহির্মুখ দেহ বৃত্তি অন্তর্মুখ হইতে পারে না, হইলেও অন্তস্তাড়িত বহিঃনির্বাসিত কামকে বহিঃপ্রেম তরঙ্গের মতো প্রতিঘাতে লাঞ্ছিত মূর্ছিত করা যায় না, তাই সে বহির্মুখ দেহবৃত্তি বাহিরে আকর্ষণ করিয়া যোগীন্দ্রগণের অন্তরের নিধি বৃন্দাবনের নিকুঞ্জকাননে প্রেমমন্থর নটবর ত্রিভঙ্গ মধুর শ্যামসুন্দর আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন, তাই গৃহপিঞ্জর ভগ্ন করিয়া কুলবিহঙ্গী গোপিনীকুলকে কুলনাথ আজ প্রেমসাগরের অকূল কূলে

আকর্ষণ করিয়াছেন। কাহার সাধ্য তাহার জলে আত্ম অস্তিত্ব আর রাখিতে পারে ?

প্রকৃত শাক্ত ও বৈষ্ণবের মধ্যেকার কোনো পার্থক্যকে শিবচন্দ্র কোনোদিন আমল দিতেন না। স্বরচিত পদাবলীতে যে তত্ত্ব তিনি উদ্ঘাটিত করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার সিদ্ধ জীবনের সমদর্শিতা ও অভেদদর্শনের পরিচয় আমরা পাই। তিনি লিখিয়াছেন :

শ্যাম ভক্ত আর শ্যামা ভক্ত,
আপনাকে দাও তাঁরই কাছে।
ওরে দাস হয়ে যাও প্রভুর পাছে,
ছেলে হয়ে রও মায়ের কাছে।
যারে শ্যামের বাঁশী বাজল প্রাণে,
তার কি আবার দু'কুল আছে ?
নাচ্‌ছে, শ্যামার অসি অট্টহাসি—
ভাঙ্গল কুল সে কুলের মাঝে।
কুলের মাঝে কুলের মা যে,
কুলকুণ্ডলিনী সাজে।
সে কুলের কাণ্ডারীর হাতে।
ঐ যে কুলের বাঁশী বাজে॥

কৈলাস ধাম আর বৈকুণ্ঠ ধাম সিদ্ধপুরুষের ধ্যাননেত্রে এক হইয়া গিয়াছে, জগজ্জননী উমা হইয়া উঠিয়াছেন রাসেশ্বরী—কৃষ্ণশক্তির সহিত একাত্মকা এবং একীভূতা। তাঁহার স্বরচিত নাটকে এই তত্ত্বের ব্যঞ্জনা পাই :

তপনে মা'র প্রভাশক্তি গগনে মায়ের মহিমা।
চন্দ্রমায় চন্দ্রিকা মা মোর, অণুতে মা অণিমা॥
পবনে মা বেগশক্তি, দহনে মোর দাহিকা মা।
জলে মায়ের শীতলতা, মধুরে মা'র মধুরিমা॥
ধরিত্রীর ধারণা শক্তি, জগদ্ধাত্রী আমারই মা।

বিধাতার বিধাতৃশক্তি, বিষ্ণুর স্থিতি-শক্তি মা।
মহারুদ্রের মহারৌদ্রী মহাশক্তি সেই আমার মা।
ব্রহ্মলোকে সাবিত্রী মা, বৈকুণ্ঠবাসিনী রমা॥
কৈলাসধামে, বাবার বামে, আমার মা-ই সেই গৌরী উমা।
আবার সেই—গোলোকধামে, শ্যামের পাশে
রাসেশ্বরী আমারই মা॥[১]

দীক্ষায়, শিক্ষায় এবং বংশগত ঐতিহ্য ও সংস্কারে শিবচন্দ্র ছিলেন নির্ভেজাল তান্ত্রিক। কিন্তু তৎসত্ত্বেও বৈষ্ণব সাধনার প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ছিল অপরিসীম।

গ্রামে মদনমোহনের একটি মন্দির ছিল, প্রতি বৎসর ঠাকুরের রথযাত্রা উৎসব সেখানে অনুষ্ঠিত হইত। মন্দির হইতে রথ মেলার দূরত্ব প্রায় এক মাইল। একটি বৃহৎ চৌদোলায় শ্রীবিগ্রহকে চড়ানো হইত, গ্রামবাসী ভক্তেরা সেটিকে কাঁধে তুলিয়া পরিক্রমণ করিতেন সমস্তটা পথ।

সেবার শিষ্যগণসহ তন্ত্রাচার্য শিবচন্দ্রও কাঁধে নিয়াছেন ঠাকুরের ঐ চৌদোলা। একে সেটি অত্যন্ত ভারী, তদুপরি একাজে তাঁহার মোটেই অভ্যাস নাই। কিছুটা পথ অগ্রসর হওয়ার পর গুরুভার চৌদোলার চাপে তাঁহার শরীর বাঁকিয়া গেল, ঘন ঘন হাঁফাইতে লাগিলেন।

এ সময়ে পাশ হইতে এক ব্যক্তি রসিকতা করিয়া মন্তব্য করিলেন, "আরে, একি আর মায়ের তুলালের কাজ?"

ক্লান্ত দেহে পথ চলিতে চলিতে শিবচন্দ্র তৎক্ষণাৎ দিলেন একথার এক সরস উত্তর, "আমি তো না হয় শুধু এক জায়গায় বেঁকে গেছি। কিন্তু বৃন্দাবনের তুলাল আর মা-যশোদার তুলাল, যাঁকে আমরা কাঁধে করেছি, তাঁর কি অবস্থা বলতো? তিনি তো নিজেই হয়েছেন ত্রিভঙ্গ মূর্তি—তিন জায়গায় বেঁকে গিয়েছেন। আমি কিন্তু

১ গজেশ (নাটক): শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব

ভাই, বহু চেষ্টা ক'রেও এখন অবধি অতটা বেঁকে যেতে পারি নি।" একথায় মদনমোহনের মিছিলের মধ্যে একটা হাসির উচ্ছ্বাস বহিয়া গেল।

প্রথম পরিচয়ের পর হইতে শিবচন্দ্রের আকর্ষণে লালন ফকীর মাঝে মাঝে কুমারখালিতে আসিয়া উপস্থিত হইতেন। দুই সাধকের মিলনে বহিয়া যাইত দিব্য আনন্দের তরঙ্গ।

লালন জাতিতে মুসলমান, ফকীর বাউলদের তিনি মধ্যমণি। কিন্তু জাতের বিচার তাঁহার কাছে কিছু নাই। একবার তাঁহাকে নিয়া গ্রামে একটু চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইল।

বহুদূরের পথ হইতে লালন ফকীর সেদিন আসিতেছিলেন। গ্রামে প্রবেশ করার পথেই পড়িল স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের টোল। সেখানে একটু বিশ্রাম করিবেন ভাবিয়া লালন বহির্বাটীর ঘরটিতে ঢুকিয়া পড়িলেন, এক কোণে বসিয়া পণ্ডিতমশাই একমনে ধূমপান করিতেছিলেন, লালন ফকীরের দিকে চোখ পড়িতে তড়াক্ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, রাগে গর্‌গর্ করিতে করিতে হুঁকাটি উপুড় করিয়া সবটা জল ফেলিয়া দিলেন।

নিমেষ মধ্যে লালন ব্যাপারটি বুঝিয়া নিলেন, পণ্ডিতমশাই জাত যাওয়ার ভয়ে ভীত, তাই তাড়াতাড়ি হুঁকার জল তাঁহাকে ফেলিয়া দিতে হইল। মনে মনে তিনি আহত হইলেন বটে, কিন্তু মুখে কিছুই বলিলেন না, ধীর পদে রওনা হইয়া গেলেন শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণবের চণ্ডীমণ্ডপের দিকে।

লালনকে পাইয়া শিবচন্দ্র আনন্দে উচ্ছল, দুই বাহু প্রসারিয়া তাঁহাকে কোল দিলেন। তারপর বিশ্রাম এবং জলযোগের পর শুরু হইল লালনের স্বরচিত বাউল সংগীত। ইতিমধ্যে ফকীরের আগমন বার্তা চারিদিকে রটিয়া গিয়াছে, মণ্ডপের সম্মুখে জড়ো হইয়াছে বহু কৌতূহলী দর্শক।

করজোড়ে দাদাঠাকুরকে নমস্কার জানাইয়া লালন এবার গান ধরিলেন:

সবে বলে লালন ফকীর হিন্দু কি যবন ?
লালন ব'লে আমার আমি না জানি সন্ধান ॥
এক ঘাটেতে আসা যাওয়া।
একই পাটনী দিচ্ছে খেওয়া।
তবুও কেউ খায়না কারও ছোঁয়া,
—ভিন্ন জল কোথাতে পান ?
বিবিদের নাই মুসলমানী।
পৈতা যার নাই সেও বাম্‌নী ॥
দেখরে ভাই দিব্যজ্ঞানী
দুই রূপ করলেন কিরূপ প্রমাণ।

শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব হাসিয়া বলেন, "ফকীর, তুমি সিদ্ধপুরুষ, তোমার আবার জাত কি ? ঈশ্বর আর তার সৃষ্টি, সব তোমার চোখে যে একাকার হয়ে গিয়েছে।"

"দাদাঠাকুর, মানুষের মনের মণিকোঠায় যিনি বসে আছেন, তিনি যে সকলের, আর সকলেই যে তাঁর। এই সাদা কথাটা কেউ বুঝে না বলেই তো যত গোল।"

একতারায় ঝঙ্কার তুলিয়া, ভক্তিরসে রসায়িত হইয়া, লালন আবার গাহিতে থাকেন :

ভক্ত কবীর জাতে জোলা,
প্রেম ভক্তিতে মাতোয়ালা।
ধরেছে সে ব্রজের কালা,
দিয়ে সর্বস্ব তার।
এক চাঁদে হয় জগৎ আলো।
এক বীজে সব জন্ম হলো।
ফকীর লালন ক'য়, মিছে কলহ
কেন করিস্‌ সদাই ?

গোঁড়া রক্ষণশীল দলের কিছু সংখ্যক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সেখানে উপস্থিত ছিলেন। লোকের কানাঘুষায় ইতিমধ্যে তাঁহারা শুনিয়াছেন,

স্মৃতিরত্নের বহির্বাটীর ঘটনার কথা। তাঁহারা বলেন, "মুসলমান লালনের স্পর্শদোষ এড়ানোর জন্য হুঁকোর জল ফেলে দেওয়া হয়েছে, তাতে দোষ কি হয়েছে? বর্ণাশ্রম আর আচার বিচার সব লোপ পেলে হিন্দুধর্মের রইল কি?"

এবার শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণবকে লক্ষ্য করিয়া তাঁহারা বলেন, "আচ্ছা, মা-সর্বমঙ্গলার দুয়ারের সামনে মুসলমান লালন ফকীরকে দিয়ে বর্ণাশ্রম বিরোধী এই যে সব গান আপনি গাওয়াচ্ছেন, এটা কি ভালো হচ্ছে?"

শিবচন্দ্র উত্তরে কিছু বলিবার আগেই লালন ভাবাবেশে নাচিয়া নাচিয়া আবার গান ধরেন :

ধর্ম-প্রভু জগন্নাথ
চায়না রে সে জাত অজাত।
ভক্তের অধীন সে রে।
যত জাত-বিচারী দুরাচারী,
যায় তারা সব দূর হয়ে।
লালন ক'য়, জাত হাতে পেলে
পুড়াতাম আগুন দিয়ে রে।

আগুন দিয়া পোড়ানো হইবে 'জাত'-কে? এসব কি কথা? বর্ণাশ্রম ধর্মের চাঁইদের কয়েকজন উত্তেজিত হইয়া উঠেন, নিন্দা সমালোচনা শুরু করেন।

শিবচন্দ্র সতেজে উঠিয়া দাঁড়ান। সবাইকে নীরব হইতে ইঙ্গিত করিয়া বলিতে থাকেন, "ছাখো, জাতিভেদ মানা বা না মানা যার যার নিজের ব্যক্তিগত কথা। এ নিয়ে নিন্দা সমালোচনা বা ঝগড়া বিবাদ থাকবে কেন? বহিরঙ্গ জীবনে যত ভেদ বিভেদই আমরা দেখি না কেন, মূলত সর্ববস্তু ও সর্বজীব এক। একই ব্রহ্মময়ী মা সবার ভেতরে রয়েছেন অনুস্যূত। হিন্দুর বেদ, তন্ত্র ও দর্শনে রয়েছে সেই পরম এক এবং অদ্বিতীয়ের কথা। মুসলমান ধর্মও বলেছে—লা ইলাহা ইল্লা আল্লাহ। আল্লাহ ছাড়া অপর কোনো ঈশ্বর নেই

—তিনিই হচ্ছেন অদ্বিতীয় সত্তা। তবে, এ নিয়ে বৃথা এতো বাদ বিসম্বাদ কেন, বলতো ?”

অতঃপর বেদ ও আগম নিগম হইতে বহুতর শাস্ত্রবাক্য উদ্ধৃত করিয়া সবাইকে তিনি বুঝাইয়া দিলেন, হিন্দুর ব্রহ্মবাদ ও পরা-শক্তিবাদের আসল কথা—অভেদ তত্ত্ব। এই তত্ত্বের উদারতা ও সর্বজনীনতা উপলব্ধি না করিলে হিন্দুধর্ম রক্ষা করা সম্ভব হইবে না। নিন্দুক ও সমালোচকেরা এবার নীরব হইয়া গেল।

লালন ফকীর সিদ্ধ বাউল, সদানন্দময় পুরুষ, বহিরঙ্গ জীবনের অনেক কিছু ঝড় ঝাপটার বহু উর্ধ্বে তিনি বিচরণ করেন। লালন কহিলেন, “দাদাঠাকুর, পাহাড়ের ওপরে উঠে গেলে নিচের সব কিছু সমান দেখা যায়, তোমার তাই হয়েছে। তুমি পাহাড়ের চূড়ায় উঠে বসে আছো, আর আপন ভাবে আপনি রয়েছো মশগুল। তাইতো, মাঝে মাঝে তোমায় নামিয়ে আনি আমাদের এই মাটিতে, এতো বিতর্ক, এতো হৈ-হুল্লোড় ক'রে তোমায় হুঁশে আনি, তোমার ভেতরকার প্রেমরস টেনে বার করি।”

প্রেমাবিষ্ট সিদ্ধপুরুষ শিবচন্দ্র ফকীরকে আবদ্ধ করেন প্রেম-আলিঙ্গনে, টানিয়া নেন বুকের মধ্যে।

“আবার আসবো দাদাঠাকুর, আবার প্রাণভরে তোমার কথা শুনবো,”—একথা বলিয়া লালন সেদিনকার মতো বিদায়গ্রহণ করেন।

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দ। বঙ্গভঙ্গের আগুন তখন দাবানলের মতো বাংলার দিকে দিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে। প্রখ্যাত নেতা ও বাগ্মী সুরেন্দ্র-নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এসময়ে কুষ্টিয়ায় আসিয়াছেন স্বদেশী মেলায় ভাষণ দিবার জন্য। তাঁহার পার্শ্বে উপবিষ্ট আছেন রুদ্রাক্ষ ও রক্তচন্দনে বিভূষিত তেজোদৃপ্ত শিবচন্দ্র।

সুরেন্দ্রনাথ বক্তৃতা দিলেন ইংরেজীতে, যুক্তি-তর্ক, ভাবময়তা ও রাষ্ট্রচেতনায় তাহা অনুপম। কিন্তু গ্রামাঞ্চলের খব কম লোকেরই

তাহা বোধগম্য হইল। এবার শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব উঠিলেন তাঁহার বক্তব্য বলার জন্য। প্রায় দশ সহস্র নরনারী শহরের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে সমবেত হইয়াছে, তাহাদের সম্মুখে জগন্মাতা আর দেশমাতার ঐক্যবোধ জাগাইয়া তুলিয়া উদাত্ত কণ্ঠে, সাধু বাংলা ভাষায়, প্রাণ-উন্মাদনাকারী ভাষণ দিতে তিনি শুরু করেন, শ্রোতারা ভাবের উচ্ছ্বাসে উদ্বেল হইয়া উঠে।

সিংহ-পুরুষ শিবচন্দ্র ওজস্বিনী ভাষায় কহিলেন, "দেশমাতা আর জগন্মাতায় কোনো ভেদ নেই। অখিল ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিনী হয়ে রয়েছেন মা ব্রহ্মময়ী। এই ধরিত্রী ও তার অংশ ভারতবর্ষ সেই ব্রহ্মময়ীরই অংশ ছাড়া আর কিছু নয়। জগজ্জননী মহামায়া যেমন বিশ্বাতীতা, তেমনি আবার বিশ্বগতাও বটেন। তাই ধ্যানদৃষ্টিতে দেখা যায়; দেশমাতার ভেতরেই রয়েছেন চৈতন্যরূপা ব্রহ্মময়ী।"

স্বদেশের এই চৈতন্যময় সত্তার কথাটি বজ্র নির্ঘোষে ঘোষণা করিয়া আবার তিনি কহিলেন, "এই আমাদের 'মা'-টি, ইনি কিন্তু শুধু মাটি নন—ইনি, হলেন প্রকৃত 'মা'-টি। এই 'মা'-টিকে খাঁটি ক'রে ধরতে হবে। নান্য পন্থা বিদ্যতে অয়নায়। এই 'মা'-টিকে এতদিন আমরা চিনতে পারি নি, একে ছেড়ে দিয়ে বসে আছি, তাই তো আমরা মাটি হতে বসেছি। শিবহীন দক্ষযজ্ঞ বিনাশের পর এমনি ক'রেই মায়ের অঙ্গচ্ছেদ হয়েছিল।"

শিবচন্দ্রের এই ভাষণ শুনিয়া জনতার মধ্যে প্রবল উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়, জয়ধ্বনি ও করতালিতে সভাপ্রাঙ্গণ মুখরিত হইয়া উঠে। প্রধান বক্তা সুরেন্দ্রনাথ বিস্ময় বিস্ফারিত নয়নে সাধক শিবচন্দ্রের দিকে চাহিয়া থাকেন।

সেদিনকার ঐ স্মরণীয় বক্তৃতা সম্পর্কে পণ্ডিত রাধাবিনোদ বিদ্যাবিনোদ লিখিয়াছেন, "তাঁহার সেই ছন্দোময়ী ভাষার কি মাধুর্যময়ী তেজস্বিতা, আর তাঁহার সেই উদাত্ত কণ্ঠের কি কমনীয় নমনীয়তা। তিনি উচ্ছ্বসিত হইয়া ললিত উদাত্ত কণ্ঠে বক্তৃতা করিতেছিলেন, মনে হইতেছিল যেন পুণ্য সলিলা জাহ্নবী কল-

তরঙ্গভঙ্গে নাচিয়া নাচিয়া ছুটিয়া চলিয়াছেন। তদুপরি তাঁহার ত্রিপুণ্ড্রক লাঞ্ছিত গৌরবর্ণ ললাটস্থিত রক্ততিলকের আভা, আয়ত নেত্র সমুদ্ভাসিত তপ্তকাঞ্চন বিনিন্দিত মুখমণ্ডলের সেই প্রশান্ত জ্যোতি, আবক্ষ-লম্বিত কাঁচ পাথর সমন্বয়ে গ্রথিত রঙবেরঙের বিচিত্র রুদ্রাক্ষের মালা, সর্বোপরি আজানুলম্বিত সেই রক্তগৈরিক, সবগুলি মিলিয়া তাঁহাকে এক অনির্বচনীয় শ্রী প্রদান করিয়াছিল।

"তিনি বক্তৃতা প্রদান করিতেছিলেন ভাবে বিভোর হইয়া। আর তাঁহার দুই আয়ত নেত্র বহিয়া দর-বিগলিত ধারায় অশ্রু নির্গত হইয়া তাঁহার বক্ষোদেশ প্লাবিত করিতেছিল। মহাকবি ভবভূতির বজ্রাদপি কঠোরানি মৃদুনি কুসুমাদপি ইত্যাদি উক্তি যে বর্ণে বর্ণে সত্য, সেদিন সেকথা আমরা সম্যক্ বুঝিতে পারিয়াছিলাম। বুঝিয়াছিলাম, শিবচন্দ্র সত্যই একজন লোকোত্তর-চরিত পুরুষ।"

কাশী ও বৈদ্যনাথধাম শিবচন্দ্রের খুব প্রিয় ছিল। কাশীতে নানা গুপ্ত শক্তিপীঠে বিশেষ করিয়া মণিকার্ণিকার শ্মশানে কৌলপদ্ধতি অনুসারে বহু নিগূঢ় তান্ত্রিক ক্রিয়া তিনি সম্পন্ন করিয়াছিলেন। পরবর্তীকালে, সর্বমঙ্গলা সভা স্থাপনের পর দীর্ঘদিন কাশীই ছিল তাঁহার প্রধান কর্মকেন্দ্র। সেখানে অবস্থান করিয়া উত্তর ভারতের তন্ত্রাচারী সাধকদের সঙ্গে তিনি যোগাযোগ রক্ষা করিতেন এবং সর্বমঙ্গলা সভার মাধ্যমে তন্ত্রশাস্ত্রের প্রচারে তৎপর থাকিতেন।

তপস্যার জন্য কয়েকবার তিনি বৈদ্যনাথধামে অবস্থান করেন। এই সময়ে শুধু সেখানকার বাঙালী সমাজেই নয়, স্থানীয় পণ্ডিত এবং পাণ্ডাদের মধ্যেও, তাঁহার প্রভাব ছড়াইয়া পড়ে। ইঁহাদের অনেকে তাঁহাকে শিবকল্প মহাপুরুষ বলিয়া মনে করিতেন, দেবতা জ্ঞানে শ্রদ্ধা ও সমীহ করিতেন।

বৈদ্যনাথধামের শ্মশানটি ছিল শিবচন্দ্রের অতি প্রিয় সাধন-স্থান। কৃষ্ণা চতুর্দশী বা অমাবস্যার নিশীথ রাত্রে এই প্রাচীন শ্মশানে গিয়া তিনি উপস্থিত হইতেন, সারা রাত্রি ব্যাপিয়া অনুষ্ঠান করিতেন

তাঁহার সংকল্পিত ক্রিয়া এবং অভিচার। মাঝে মাঝে কৌলপন্থার শ্রেষ্ঠ ক্রিয়া শবসাধনাও তিনি সেখানে সম্পন্ন করিতেন।

গঙ্গাপ্রসাদ ফলাহারী নামে এক শক্তিমান্ তান্ত্রিক সাধক সেই সময়ে বৈদ্যনাথধামে বাস করিতেন। শিবচন্দ্রের শক্তি বিভূতি ও তন্ত্রশাস্ত্রের জ্ঞান সম্পর্কে অবগত হইয়া গঙ্গাপ্রসাদজী তাঁহার খুব অনুরক্ত হইয়া পড়েন। শ্মশানের কয়েকটি নিগূঢ় অনুষ্ঠানে তিনি যোগ দেন শিবচন্দ্রের সহকারীরূপে।

শিবচন্দ্র যখন যেখানেই বাস করুন না কেন, ইষ্টদেবী সর্বমঙ্গলার অর্চনা ও ভোগের ব্যাপারে কখনো কোনো ত্রুটি হইতে পারিত না। তাঁহার এই তান্ত্রিকী পূজার উপচার ও বিধিবিধান ছিল নানা রকমের এবং এগুলি সম্পর্কে কখনো কোনো ত্রুটিবিচ্যুতি ঘটিবার উপায় ছিল না। পূজা, ভোগরাগ, আরতির প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি তান্ত্রিক প্রণালী অনুসারে সম্পন্ন করা হইত। কুমারী পূজা এবং শিবাভোগ প্রদানও ছিল শিবচন্দ্রের নিত্যকার কর্ম। ভোগ প্রসাদ গ্রহণে শিবাদল যদি কখনো দেরি করিত, সজল নয়নে 'আয় আয়' বলিয়া শিবচন্দ্র তাহাদের ডাকিতে থাকিতেন এবং তারপরেই ঘটিত তাহাদের আবির্ভাব। নীরবে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে প্রসাদ গলাধঃকরণ করিয়া তাহারা সরিয়া পড়িত।

শিবচন্দ্রের আচার্য জীবনে কৃপালীলার প্রকাশ বহুবার দেখা গিয়াছে। শুধু ভক্ত ও মুমুক্ষু মানুষই তাঁহার আশ্রয় নেয় নাই, ঈশ্বর-বিমুখ এবং সংশয়বাদী দুরাত্মারাও তাঁহার চরণে ঠাঁই নিয়াছে, দীক্ষা ও শিক্ষার মধ্য দিয়া শুরু করিয়াছে উন্নততর জীবন।

কালীধন চট্টোপাধ্যায় ছিলেন এমনই এক ব্যক্তি। হাওড়ার ব্যাঁটরা গ্রামে তিনি বাস করিতেন। দেব দ্বিজে কোনোদিনই তাঁহার ভক্তি শ্রদ্ধা ছিল না; অতিমাত্রায় ছিলেন আত্মম্ভরী ও ঈশ্বরদ্বেষী। সাধু সন্তের দেখা পাইলেই তাঁহাদের সম্বন্ধে নিন্দা ও বক্রোক্তি শুরু করিতেন, কখনো কখনো অপমান করিতেও ছাড়িতেন না।

শিবচন্দ্র তখন কিছুদিনের জন্য হাওড়ার শিবপুরে অবস্থান করিতেছেন। এই খ্যাতনামা তন্ত্রসিদ্ধ পুরুষকে দর্শনের জন্য প্রতিদিন সেখানে ভিড় জমিয়া উঠিত।

কালীধন চট্টোপাধ্যায়কে মাঝে মাঝে ঐ দিক দিয়া যাওয়া আসা করিতে হইত। অদূরে দাঁড়াইয়া তিনি এই জনসংঘট্ট দেখিতেন এবং শিবচন্দ্র সম্পর্কে করিতেন নানা শ্লেষাত্মক উক্তি। শিবচন্দ্রের বিশিষ্ট শিষ্য যতীন মুখোপাধ্যায়ের সহিত কালীধনের বন্ধুত্ব ছিল। যতীনবাবু একদিন কহিলেন, "সাধুকে ভালো ক'রে ঘনিষ্ঠভাবে না দেখে তাঁর সম্পর্কে মন্তব্য করা কি ভালো হে? কালীধন, তুমি একদিন আমার সঙ্গে ঠাকুরের কাছে চল। তাঁর দিব্যমূর্তি একটিবার দর্শন করলে, আর ওজস্বিনী বাণী শুনলে, তোমার এত সব লম্ফঝম্ফ আর থাকবে না।"

কালীধনের মুখে তাচ্ছিল্যের হাসি। বলেন, "নিজের পায়ে যার জোর নেই, সে-ই লাঠি ভর দিয়ে হাঁটে। সাধুর ওপর নির্ভর করে তারাই, যারা দুর্বল, আর নেই কোনো আত্মবিশ্বাস। তাছাড়া, ভাই, ঠিক ক'রে বলতো, তোমার এই তান্ত্রিক গুরুর শক্তি কতটা, আর কি তিনি আমায় দিতে পারেন?"

"তিনি সেই শান্তি দিতে পারেন, যা আজ অবধি কোথাও তুমি পাও নি। আর যদি তার চেয়ে আরো বড় কিছু চাও, ঈশ্বর দর্শন চাও, তাঁর কৃপায় তাও হতে পারে। মা-সর্বমঙ্গলার আদরের দুলাল শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব। মায়ের কাছে যা যিনি সুপারিশ করবেন তাই যে তুমি পাবে ভাই।"

"যাই বল না কেন, মাথায় জটা, পরনে গৈরিক, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, ঐ সব সাধু সন্ন্যেসী দেখলেই রাগে আমার পিত্তি জ্বলে যায়। থাক্ ভাই, ওসব আসরে যেতে আমায় আর অনুরোধ ক'রো না।"

"কালীধন, একবার আমার গুরুকে দর্শন ক'রেই এসোনা। সারা জীবনটা তো পাষণ্ডের মতোই কাটালে, পাপও ঢের তুমি করেছো। একবার ভগবানের রাজ্যের এ দিকটাও একটু ছাখোনা। তুমি শক্ত

লোক, আত্মবিশ্বাসী লোক, এ সাধু তো তোমার মতো লোককে দর্শনমাত্র গিলে খাবেন না।”

কি জানি কেন, কালীধনের সুমতি হইল, বন্ধুর সঙ্গে উপস্থিত হইলেন সিদ্ধ মহাপুরুষ শিবচন্দ্রের আবাসে।

কালীধনকে দেখামাত্র আচার্য শিবচন্দ্র তাঁহাকে কাছে ডাকিলেন, স্নেহপূরিত কণ্ঠে কহিলেন, “ওরে আয়, আয়। আমার কাছে আয়। মায়ের পাগল ছেলে যে তুই, এতদিন মাকে ভুলে কোথায় ছিলি? তোর সঙ্গে একটিবার দেখা না ক'রে যে এ জায়গা আমি ছাড়তেই পারছিলুম না। আয় আয়।”

মুহূর্ত মধ্যে কালীধনের নয়ন সমক্ষে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল সিদ্ধপুরুষের জ্যোতির্ময় দিব্যমূর্তি। অন্তরাত্মা হইতে কে যেন ডাকিয়া বলিল, ‘অকূলে পথহারা হয়ে এযাবৎ কেবলি তুই ঘুরে বেরিয়েছিস্, পাপ-প্রবৃত্তির তাড়নায় দিক্‌ভ্রান্ত হয়েছিস্ বার বার। এবার মিলেছে তোর পরমাশ্রয়। এই পরম দয়াল মহাত্মার চরণে তুই শরণ নে, লাভ কর্ পরমা পরম শান্তি।”

অহংকার, বিচারবুদ্ধি বা বিতর্কের কোনো অবকাশ রহিল না। আবেশে কালীধনের সারা দেহ ঘন ঘন কম্পিত হইতেছে, দুই চোখে ঝরিতেছে অশ্রুধারা, ছুটিয়া গিয়া পতিত হইলেন শিবচন্দ্রের আসনের সম্মুখে, কিছুক্ষণের জন্য বাহ্যজ্ঞান রহিল না।

অতঃপর আচার্য শিবচন্দ্রের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া কালীধন চট্টোপাধ্যায় শুরু করেন তন্ত্রানুসারী সাধন-ক্রিয়া। গুরুর কৃপায় উত্তরকালে পরিণত হন এক বিশিষ্ট সাধকরূপে।

তন্ত্র-অনুরাগী সাধকদের শিবচন্দ্র সাধারণত সংসারে থাকিয়াই সাধন করিতে বলিতেন। সে-বার এক সন্ন্যাসকামী দীক্ষিত শিষ্যকে তিনি বলিয়াছিলেন, “দেবাদিদেব স্বয়ং বলেছেন, গৃহস্থ আশ্রমে থেকেও ভক্ত সাধকেরা সিদ্ধি লাভ করতে পারে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, ঘর-সংসারে জড়িয়ে থেকে কেবলই ধন বৃদ্ধি ক'রে যেতে হবে। সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী সাধন ও গুরুকৃপার বলে ব্রহ্মলাভ

ক'রে থাকে, আবার সংসার-আশ্রমী সাধকের হৃদয়ে ব্রহ্মতত্ত্বের স্ফুরণ হলে গোটা সংসারটাই হয়ে পড়ে ব্রহ্মময়।

"সংসার ছেড়ে অত দূরের পথ পর্যটন করা কলিযুগের জীবের পক্ষে সহজসাধ্য নয়, তাই তন্ত্রশাস্ত্র বলেছেন, সংসারে বাস ক'রেই বাড়িয়ে তোল ব্রহ্মদৃষ্টি। যে সব সাধক গৃহী হয়েও বৈরাগ্যবান্ এবং কায়মনোবাক্যে সন্ন্যাসী, তাঁরাই তো সত্যকার শ্মশানবাসী। শব আর কঙ্কালে পূর্ণ পূতিগন্ধময় মহাশ্মশানে তাঁরাই তো চৈতন্যরূপী মহাশিব।

"জগজ্জননী মহামায়া অনাদি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে তাঁর মায়ারূপী কেশপাশ এলিয়ে দিয়েছেন, সবাইকে ভোলাচ্ছেন তাঁর মায়ায়। আবার ছাখো, ঐ কেশপাশ ছুঁয়ে আছে তাঁর চরণ দু'টি। ঐ চরণে রয়েছে যে তাঁর কৃপা, যে কৃপায় হয় সিদ্ধি আর মুক্তি। সংসারে থেকে ক্রিয়াবান্ সার্থক তান্ত্রিক হও, মহামায়ার চরণ ধরে পড়ে থাকো, মায়ার কেশপাশে আর জড়িয়ে পড়তে হবে না।"

শিবচন্দ্রের করুণালীলার অপর একটি ঘটনা শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার পাল বর্ণনা করিয়াছেন।

একদিন কুমারখালিতে সর্বমঙ্গলার মন্দিরে বসিয়া ভক্ত শিষ্যদের সাহত তিনি নানা তত্ত্বালাপ করিতেছেন। হঠাৎ সেখানে এক জরুরী তারবার্তা আসিয়া উপস্থিত। যশোরের নলডাঙ্গার জমিদার এটি প্রেরণ করিয়াছেন, তাঁহার পুত্র হঠাৎ এশিয়াটিক কলেরায় আক্রান্ত হইয়াছে এবং জীবনের কোনো আশা নাই, শিবচন্দ্র যেন কৃপা করিয়া তাঁহাকে রক্ষা করেন।

এই পরিবারটির উপর শিবচন্দ্রের গভীর স্নেহ ছিল। কিছুক্ষণ নীরবে থাকিবার পর তিনি সর্বমঙ্গলার একটি বিশেষ পূজা অনুষ্ঠানের জন্য তৎপর হইয়া উঠিলেন।

তখন রাত্রি হইয়া গিয়াছে। ঘন অন্ধকারে চারিদিক সমাচ্ছন্ন। দানবারি গঙ্গোপাধ্যায় এবং অন্যান্য ভক্তেরা আচার্যের নির্দেশ পাইয়া

অতি সত্বর প্রয়োজনীয় বহুবিধ উপচার সংগ্রহ করিয়া আনিলেন। কিন্তু একজোড়া বোয়াল মৎস্য কোনোমতেই জোটানো গেল না।

কথাটি শিবচন্দ্রের কানে যাওয়া মাত্র তিনি কহিলেন, "চিন্তার কোনো কারণ নেই। এখনি কাউকে পাঠিয়ে দাও কুণ্ডুবাবুদের পুকুরে, মাছ পেতে দেরি হবে না।" এই নির্দেশ অনুযায়ী মৎস্য অনতিবিলম্বে ধরিয়া আনা হইল, এবার শিবচন্দ্র তাঁহার সহকারীদের নিয়া রুদ্ধদুয়ার মন্দিরে শুরু করিলেন মায়ের অর্চনা।

পূজা শেষে হোমকুণ্ডে দেওয়া হইল পূর্ণাহুতি। রাত্রি তখন শেষ হইয়া আসিয়াছে, শিবচন্দ্র মন্দিরকক্ষ হইতে বাহিরে আসিয়া সহাস্যে কহিলেন, "আর ভয় নেই, মা সর্বমঙ্গলার কৃপায় ছেলেটির প্রাণরক্ষা হয়েছে। এবার কয়েকদিনের ভেতরই সে সুস্থ হয়ে উঠবে।"

তিন দিন পরেই কুমারখালিতে আর একটি তারবার্তা আসিয়া উপস্থিত। লেখা রহিয়াছে, রোগীর সংকট কাটিয়া গিয়াছে, ঠাকুরের কৃপাদৃষ্টি যেন তাহার উপর নিবদ্ধ থাকে।

শিবচন্দ্রের আচার্য জীবনে, তন্ত্রশাস্ত্র প্রচারের কাজে, বড় সহায়ক ছিলেন তাঁহার দীক্ষিত ও কৃপাপ্রাপ্ত শিষ্য স্যর জন উডরফ। তন্ত্র সাধনা ও তন্ত্রশাস্ত্রের পুনরুজ্জীবন ঘটুক, শুদ্ধ বীরাচারী তন্ত্রসাধনা আবার পূর্ব গৌরবে অধিষ্ঠিত হোক, এই প্রার্থনাই শিবচন্দ্র বার বার নিবেদন করিতেন জননী সর্বমঙ্গলার কাছে। আরো চাহিতেন, শুধু ভারতেই নয়, সারা বিশ্বে এই মাতৃসাধনার বীজ ছড়াইয়া পড়ুক এবং এই সাধনার মাধ্যমে ভারতের ধর্ম সংস্কৃতির জয়গৌরব ঘোষিত হোক দিগ্‌বিদিকে।

শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণবের প্রণীত তন্ত্রতত্ত্বের ইংরেজী অনুবাদ সম্পন্ন করান শিষ্য উডরফ। তন্ত্ররহস্য উদ্‌ঘাটনের জন্য ইংরেজী ভাষায় আরো কয়েকটি মহামূল্যবান গ্রন্থও তিনি রচনা করেন, আজো তাহা সারা বিশ্বের শিক্ষিত সমাজের সম্মুখে তন্ত্রের বিজয় বৈজয়ন্তী

উড্ডীন করিয়া রাখিয়াছে।[১] এই গ্রন্থগুলি উডরফ রচনা করেন তাঁহার ছদ্মনামে। আভালন নাম দিয়া এগুলি প্রকাশিত হয়।

এ সব গ্রন্থে তন্ত্রের তত্ত্ব এবং ধর্মসাধনায় তন্ত্রের বৈজ্ঞানিক উপযোগিতার উপর উডরফ জোর দিয়াছিলেন। নিগূঢ় রহস্যে ঘেরা তন্ত্রসাধনার প্রতি এতকাল বিশ্বের শিক্ষিত সমাজে যে ভীতি ও অবজ্ঞা ছিল, উডরফের প্রয়াসে তাহার কিছুটা দূর হয়।

শিবচন্দ্র ও উডরফের যুগ্ম প্রচার প্রয়াস, রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের যুগ্ম সত্তাকে স্মরণ করাইয়া দেয়। রামকৃষ্ণ-শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণের অধ্যাত্মবাদকে সারা জগতের সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়াছিলেন, অদ্বৈত বেদান্তের যুগোপযোগী ব্যাখ্যার মধ্য দিয়া গুরুর মহিমা ঘোষণা করিয়াছিলেন। উডরফও তেমনি আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন স্বীয় গুরু তন্ত্রাচার্য শিবচন্দ্রের শাস্ত্রপ্রচার কর্মের ধারক বাহকরূপে। তাঁহার রচনার মাধ্যমে তন্ত্রের মাহাত্ম্য নূতন করিয়া ঘোষিত হইয়াছিল, বিশ্বের জ্ঞানী-গুণী মহলে শুরু হইয়াছিল তন্ত্রচর্চার ব্যাপক প্রয়াস। উডরফ বিবেকানন্দের মতো বিরাট আধ্যাত্মিক পুরুষ ছিলেন না, একথা ঠিক, কিন্তু ভারতীয় অধ্যাত্মশাস্ত্রের প্রচারকল্পে তাঁহার নিষ্ঠা ও দক্ষতার কথা অস্বীকার করার উপায় নাই।

ইংরেজী ভাষায় রচিত উডরফের তন্ত্রসাহিত্য ইউরোপ ও আমেরিকার মনীষীদের মধ্যে তন্ত্রতত্ত্ব ও তন্ত্রসাধনা সম্পর্কে প্রবল অনুসন্ধিৎসার সৃষ্টি করিয়াছিল। তখনকার দিনের 'ইন্টার ন্যাশনাল জার্নাল অব তান্ত্রিক অর্ডার ইন আমেরিকা' প্রভৃতি পত্রিকা এই অনুসন্ধিৎসা ও গবেষণার পরিচয় দিয়াছে।

উডরফের মাধ্যমে শিবচন্দ্রের সহিত প্রসিদ্ধ কলাতত্ত্ববিদ্ ই. বি.

১ এ বিষয়ে উডরফের প্রধান সহযোগী ছিলেন অধ্যাপক প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় (বর্তমানের প্রখ্যাত তান্ত্রিক সন্ন্যাসী স্বামী প্রত্যাত্মানন্দ), এবং শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল মজুমদার

হ্যাভেল এবং ডঃ আনন্দ কুমারস্বামীর পরিচয় সাধিত হইয়াছিল এবং তাঁহারা উভয়েই তন্ত্রাচার্যের ভাবধারায় যথেষ্টরূপে প্রভাবিত ও অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন।

শিবচন্দ্রের মুখে তন্ত্রের প্রকৃত স্বরূপ এবং ভারতীয় অধ্যাত্মতত্ত্ব এবং নন্দনতত্ত্বের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ শুনিয়া ডঃ কুমারস্বামী মুগ্ধ হন। শুধু তাহাই নয়, কিছুদিন পরে হিন্দুধর্ম গ্রহণের জন্য তিনি আগ্রহী হইয়া উঠেন। ভট্টপল্লীর রক্ষণশীল পণ্ডিতেরা কুমারস্বামীর হিন্দুধর্মে আশ্রয় নিবার প্রস্তাব সমর্থন করেন নাই। তাঁহারা বিধান দেন, কুমারস্বামী খ্রীষ্টান, শাস্ত্রমতে ম্লেচ্ছকে হিন্দুরূপে গ্রহণ করা সম্ভব নয়।

এসময়ে শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব অগ্রসর হইয়া আসেন ডঃ কুমারস্বামীর সহায়তায়। বহুতর প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থ হইতে উদ্ধৃতি দিয়া তিনি প্রমাণ করেন, ম্লেচ্ছের হিন্দুকরণ এবং ম্লেচ্ছের পক্ষে হিন্দুধর্মের আশ্রয় গ্রহণ মোটেই অশাস্ত্রীয় নয়। তাছাড়া, তন্ত্রশাস্ত্রের উদার বিধানের কথা উল্লেখ করিয়াও কুমারস্বামীর হিন্দুত্ব গ্রহণের প্রস্তাব তিনি জোরালো ভাবে সমর্থন করেন। দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেন, আর্য-অনার্য, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, সাধু পাষণ্ডী সবাই মাতৃতত্ত্ব ও তন্ত্রশাস্ত্রের অধিকারী সাধক। জগজ্জননীর কোলে উঠিবার দাবি অস্বীকার করার কোনো উপায় নাই।

শোনা যায়, বিদ্যার্ণবের এই উদার এবং শাস্ত্রীয় যুক্তিতর্ক সমন্বিত ঘোষণার পর কুমারস্বামীর হিন্দুধর্ম গ্রহণে আর কেউ কোনো বাধা জন্মান নাই।

আর্টস্কুলের অধ্যক্ষ ই. বি. হ্যাভেলের সহিত বিচারপতি উডরফের ঘনিষ্ঠতা ছিল। ভারতীয় চারুকলার মর্ম উদ্‌ঘাটনের জন্য হ্যাভেল এক সময়ে খুব ব্যাকুল হইয়া উঠেন। এসময়ে উডরফের পরামর্শে তিনি শরণ নেন শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণবের।

তন্ত্রতত্ত্বের আলোকে শিবচন্দ্র ভারতীয় নন্দনতত্ত্ব, চারুকলা এবং ভাস্কর্যের অপরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করেন সুধী গবেষক হ্যাভেলের

কাছে। এই সব ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ শুনিয়া হ্যাভেলের বহু সংশয়ের নিরাকরণ হয়, ভারতীয় নন্দনতত্ত্বের মর্মকথা জ্ঞাত হইয়া তিনি আনন্দে অধীর হইয়া উঠেন।

অতঃপর উডরফের ভবনে হ্যাভেল এবং কুমারস্বামী মাঝে মাঝে শিবচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন। তন্ত্রতত্ত্ব ও নন্দনতত্ত্বের নানা নিগূঢ় বিষয় প্রতিভাধর শিবচন্দ্র এই সময়ে সংস্কৃত ভাষায় অনর্গল-ভাবে বলিয়া যাইতেন, আর উডরফ এবং তাঁহার সংস্কৃতের শিক্ষক হরিদেব শাস্ত্রী ঐ দুই সুধী জিজ্ঞাসুকে তাহা ইংরেজীতে বুঝাইয়া দিতেন।

বিদ্যার্ণবের তত্ত্ব ব্যাখ্যা এবং উপদেশ এই সময়ে গভীরভাবে হ্যাভেলকে প্রভাবিত করে। হিন্দু দেবদেবীর সূক্ষ্মতর দিব্য অস্তিত্ব ও মাহাত্ম্য সম্পর্কে নূতনতর চেতনা ও শ্রদ্ধা তাঁহার মধ্যে জাগিয়া উঠে। শোনা যায়, এসময়ে হ্যাভেল তান্ত্রিক ঐতিহ্যযুক্ত কোনো কোনো দেবদেবীর ভাস্কর্যমূর্তি দর্শনে ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়িতেন। কখনো বা অর্ধবাহ্য অবস্থায়, পদ্মাসন করিয়া বসিয়া পড়িতেন তাঁহাদের সম্মুখে। এ সময়ে হ্যাভেলকে এই আসন হইতে উঠাইয়া আনিতে গিয়া আর্টস্কুলের সহযোগীরা হইতেন গলদ্‌ঘর্ম।

হ্যাভেল সরলভাবে বন্ধুমহলে বলিতেন, তন্ত্রাচার্য শিবচন্দ্রের প্রসাদেই ভারতীয় ভাস্কর্যের বহু নিগূঢ় রহস্য তাঁহার দৃষ্টি সমক্ষে উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। এজন্য তাঁহার কৃতজ্ঞতার সীমা ছিল না।

শিবচন্দ্রের আচার্য জীবনের এক অত্যুজ্জ্বল অধ্যায়, শিষ্য স্যর জন উডরফকে দীক্ষা দেওয়া এবং তন্ত্র প্রচারে তাঁহাকে উদ্বুদ্ধ করা।

ব্যারিস্টারী ছাড়িয়া উডরফ তখন কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতির পদ গ্রহণ করিয়াছেন। কিছুদিনের জন্য তিনি অস্থায়ী প্রধান বিচারপতি পদেও নিযুক্ত হইয়াছিলেন। হিন্দু সাধনা ও

ভারত তন্ত্রের প্রতি চিরদিনই তাঁহার প্রবল অনুসন্ধিৎসা। এসময়ে হাইকোর্টের প্রবীণ ভকীল অটলবিহারী ঘোষের সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠতা জন্মে। অটলবিহারী ছিলেন 'আগম অনুসন্ধান সমিতি'র একজন বিশিষ্ট সদস্য। কিছুদিনের মধ্যে উডরফ এই সমিতির সংস্রবে আসেন এবং তন্ত্রসাধনার রহস্য সম্পর্কে কৌতূহলী হইয়া উঠেন। তাঁহার এই কৌতূহল ক্রমে পরিণত হয় সত্যকার অনুসন্ধিৎসায় এবং তন্ত্রের মূল গ্রন্থ পাঠ করার জন্য তিনি ব্যস্ত হইয়া পড়েন।

এজন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন, সংস্কৃত ভাষা ভালোভাবে শিক্ষা করা। হাইকোর্টের সরকারী দোভাষী, হরিদেব শাস্ত্রী, সংস্কৃতে সুপণ্ডিত এবং ইংরেজীতেও তাঁহার দক্ষতা আছে। উডরফ তাঁহাকেই নিযুক্ত করিলেন নিজের শিক্ষকরূপে। তাঁহার মতো প্রতিভাধর ব্যক্তির পক্ষে এই ভাষা আয়ত্ত করিতে বিলম্ব হয় নাই, অল্পদিনের মধ্যেই ভারত এবং তিব্বতের কতকগুলি দুরূহ তন্ত্রগ্রন্থ তিনি অধ্যয়ন করিয়া ফেলিলেন।

তন্ত্রের সাধন রহস্য অবগত হওয়ার ইচ্ছাও ক্রমে তাঁহার দুর্বার হইয়া উঠে। কিন্তু শুধু গ্রন্থ পাঠে তাহা আয়ত্ত করা সম্ভব নয়। এজন্য চাই দক্ষ ক্রিয়াবান্ কৌল সাধকের সাহায্য ও কৃপা। তেমন মহাপুরুষের সন্ধান কোথায় পাইয়া যায়? এখন হইতে এ চিন্তাই উডরফের চিত্তকে আলোড়িত করিতে থাকে। সংস্কৃতের শিক্ষক হরিদেব শাস্ত্রীকে মাঝে মাঝে এবিষয়ে প্রশ্ন করেন, অনুরোধ জানান দক্ষ কোনো তন্ত্রাচার্যের সন্ধান দিবার জন্য।

দৈবযোগে উপস্থিত হয় এক পরম সুযোগ। হাইকোর্টের একটি মামলার ব্যাপারে হিন্দুশাস্ত্রের, বিশেষত তন্ত্রশাস্ত্রের, কতকগুলি প্রশ্নের উপর আলোকপাতের জন্য কাশী হইতে আহ্বান করা হয় পণ্ডিত শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণবকে।

হরিদেব শাস্ত্রী সহাস্যে উডরফকে বলেন, "আপনি একটি উচ্চকোটির তন্ত্রবিদের সন্ধান চাচ্ছিলেন, এবার তিনি এসে গিয়েছেন।"

"কে বলুন তো, শাস্ত্রীজী," ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করেন উডরফ।

"শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণবের কথাই আমি বলছি। হাইকোর্টের কাজ উপলক্ষে তিনি কলকাতায় এসেছেন। এই সুযোগে আপনি তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলুন। আমার মনে হয়, আপনার মনে তন্ত্রসাধনার জন্য যে গভীর আগ্রহ জন্মেছে, তা মিটতে পারে এঁরই সাহায্যে।"

"তাঁকে আজই তবে নিয়ে আসুন আমার গৃহে।"

"তবে একটা কথা, স্যর, ইনি কিন্তু ইংরেজী ভাষা জানেন না মোটেই। এরূপ আচার্য আপনার পছন্দ হবে কিনা, জানিনে।"

"ইংরেজী না-জানা শাস্ত্রবিদ্‌ই তো আমি চাই। তাঁর ভেতরে রয়েছে নির্ভেজাল বস্তু।"

হরিদেব শাস্ত্রীর সাহায্য নিয়া উডরফ নিজের ভবনেই সাক্ষাতের ব্যবস্থা করিলেন আচার্য শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণবের সঙ্গে। যথাসময়ে বিদ্যার্ণব সেখানে উপস্থিত হইলে সসম্ভ্রমে তাঁহাকে আনিয়া বসাইলেন নিজের ড্রয়িংরুমে।

তন্ত্রাচার্যের প্রথম দর্শনেই উডরফ অভিভূত হন। শক্তি-সাধনা ও তত্ত্বজ্ঞানের মূর্ত বিগ্রহ তাঁহার সম্মুখে উপবিষ্ট। আয়ত নয়ন দুটি শাণিত ছুরিকার মতো ঝক্‌ঝক্ করিতেছে। মাথায় দীর্ঘ কেশের গুচ্ছ, ললাটে বৃহৎ সিঁদুরের ফোঁটা এবং রক্তচন্দনের তিলক। কণ্ঠে বিলম্বিত রুদ্রাক্ষ ও স্ফটিকের কয়েক লহর মালা। পরিধানে একটি গৈরিক রঞ্জিত আলখাল্লা। নির্নিমেষ নয়নে এই বীরাচারী সিদ্ধ কৌলের দিকে উডরফ চাহিয়া আছেন।

ক্ষণপরেই শুরু হয় তন্ত্রশাস্ত্র সম্পর্কে উভয়ের দীর্ঘ আলোচনা। উডরফ তাঁহার এক একটি প্রশ্ন উত্থাপন করেন, আর শিবচন্দ্র তৎক্ষণাৎ অবলীলায় তাঁহার সমাধান জ্ঞাপন করেন, সমর্থন টানিয়া আনেন প্রাচীন শাস্ত্রের ভূরি ভূরি উদ্ধৃতি হইতে।

বিস্ময়ে হতবাক্ হইয়া গিয়াছেন স্যার জন উডরফ। ভাবেন, শুধু শাস্ত্রবিদ্যা আহরণ করিয়া এমনতর তাত্ত্বিক দিক্‌দর্শন তো কেহ দিতে পারেন না। অলৌকিক শক্তি ও অলৌকিক প্রজ্ঞা রহিয়াছে এঁর

মহাপুরুষের প্রতিটি উচ্চারিত বাক্যের পিছনে। প্রতিটি বাক্য যেন মন্ত্রচৈতন্য দিয়া আবির্ভূত হইতেছে, উডরফের সর্বসংশয় ভঞ্জন করিয়া দিতেছে সঙ্গে সঙ্গে।

বিদায়ের কালে শিবচন্দ্র কহিলেন, "সাহেব, আপনার ভেতরে জন্মান্তরের শুভ সংস্কার রয়েছে, নতুবা তন্ত্র সম্বন্ধে এরূপ শ্রদ্ধা, আর অনুসন্ধিৎসা তো সম্ভব নয়।"

বিদ্যার্ণব কাশীধামে চলিয়া গেলেন, কিন্তু উডরফের মানসপটে দীপ্যমান রহিল সিদ্ধকৌল মহাপুরুষের সেই তপস্যাপূত মূর্তি ও তাঁহার শাস্ত্রীয় ভাষণের স্মৃতি।

তন্ত্রশাস্ত্রের নানা তথ্য ও তন্ত্র সম্পর্কিত প্রশ্ন এ-সময়ে উডরফের মনে জাগিয়া উঠিত। এগুলির মীমাংসা অবশ্য চাই। হরিদেব শাস্ত্রীর মাধ্যমে এসব প্রশ্ন তিনি কাশীতে শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণবের কাছে প্রেরণ করিতেন, উত্তরে তিনিও সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার বক্তব্য জানাইয়া দিতেন, করিতেন জটিল তত্ত্ব ও রহস্যের মীমাংসা।

অতঃপর কয়েক মাসের মধ্যেই উডরফ তাঁহার সংকল্প স্থির করিয়া ফেলিলেন। হরিদেব শাস্ত্রীকে কহিলেন, "শাস্ত্রীজী, আমার অন্তরে আচার্য শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণবের প্রথম দর্শনের স্মৃতি চিরউজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। কোনোমতেই তাঁকে ভুলতে পারছিনে। স্থির করেছি, তাঁর কাছ থেকেই আমি দীক্ষা নেবো।"

"একি অদ্ভুত কথা আপনি বলছেন, স্যর উডরফ? তান্ত্রিক দীক্ষা নেবার তাৎপর্য নিশ্চয় কিছুটা আপনি জানেন?" সবিস্ময়ে বলিয়া উঠেন হরিদেব শাস্ত্রী।

"তা জানি বৈ কি। তান্ত্রিক আচার অনুষ্ঠান ও ক্রিয়া আমায় সম্পন্ন করতে হবে নিখুঁতভাবে, এ জীবনের অনেক কিছু সংস্কার, আচার আচরণ ত্যাগ করতে হবে। তাতে আমি মোটেই পশ্চাদ্‌পদ হবো না।"

"তা যেন বুঝলুম। কিন্তু বিদ্যার্ণব মশাইর সম্মতি তো আগে

নেওয়া চাই। ভিন্ন দেশ, ভিন্ন জাতি, ভিন্ন ধর্ম সংস্কৃতি আপনার। সহজে যে তিনি আপনাকে সাধন দেবেন, তন্ত্রের গূহ্য তত্ত্ব ও ক্রিয়া শেখাবেন, তা তো আমার মনে হচ্ছে না।"

"শাস্ত্রী, সেই জন্যই তো আপনাকে আমার উকিল নিযুক্ত করা। আমার হয়ে আপনি বিদ্যার্ণবকে জোর ক'রে বলুন। আমার দিক থেকে আমি মন স্থির ক'রে ফেলেছি। এমন কি, আমার স্ত্রীর অনুমতিও মিলে গিয়েছে।"

"এসব প্রশ্নের মীমাংসা দূর থেকে হয় না। তাহলে, বরং চলুন, আমরা দুজনে মিলে কাশীতে যাই। সেখানে গিয়ে বিদ্যার্ণবকে আপনি আপনার প্রার্থনা জানাবেন। আমিও যথাসাধ্য বলবো।"

"এ অতি উত্তম কথা। চলুন তা হলে কাশীতে গিয়ে তাঁকে আমি সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাই।"

কয়েকদিনের মধ্যেই উভয়ে উপনীত হইলেন কাশীধামে। শিবচন্দ্র তখন পাতালেশ্বরে অবস্থান করিতেছেন। এই সময়ে তাঁহার সর্বমঙ্গলা সভার জয়জয়কার চারিদিকে। দেশের দিগ্‌দিগন্ত হইতে তন্ত্রসাধনার অনুরাগীরা জড়ো হইতেছেন তাঁহার কাছে। ধনী দরিদ্র, শিক্ষিত অশিক্ষিত সকল ভক্তকেই তিনি দিতেছেন তাঁহার সাহায্য ও কৃপাপ্রসাদ।

শিবচন্দ্রের ভবনে গিয়া উডরফ ও হরিদেব শাস্ত্রী শুনিলেন, সেদিন সাড়ম্বরে মায়ের পূজা অনুষ্ঠিত হইতেছে। বিদ্যার্ণব মহাশয় অত্যন্ত ব্যস্ত, সাহেবকে পূজা শেষ না হওয়া অবধি ঘণ্টা তিনেক অপেক্ষা করিতে হইবে।

ভক্ত সেবকেরা উডরফ ও শাস্ত্রীজীকে পরম সমাদরে অভ্যর্থনা জানান এবং একটি নিভৃত কক্ষে নিয়া বসাইয়া দেন। অদূরে গৃহের অভ্যন্তরে দেবীর পূজা ও হোম অনুষ্ঠিত হইতেছে, কানে আসিতেছে সিদ্ধ কৌল শিবচন্দ্রের উচ্চারিত মন্ত্র, আর আবেগ কম্পিত কণ্ঠের ঘন ঘন আরাব—তারা, তারা, তারা।

পূজা-অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়া গেল। রক্ত গৈরিক পট্টবাস পরিহিত শিবচন্দ্র ধীরপদে সেই কক্ষে আসিয়া উপস্থিত হন, তাম্রকুণ্ড হইতে ভস্ম নিয়া লেপন করিয়া দেন উডরফ এবং হরিদেব শাস্ত্রীর ললাটে।

মুহূর্ত মধ্যে উডরফের সর্বসত্তায় সঞ্চারিত হয় এক অলৌকিক শক্তির প্রবাহ। একটা বিদ্যুতের তরঙ্গ যেন তাঁহার সারা দেহকে বিপর্যস্ত করিয়া ফেলে, প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ থরথর করিয়া কাঁপিতে থাকে, বাহ্যচৈতন্য বিলুপ্ত হইবার উপক্রম হয়।

এই সময়ে শিবচন্দ্রের ইঙ্গিতে হরিদেব শাস্ত্রী তাঁহাকে দুই হাতে জড়াইয়া ধরেন, পার্শ্বস্থিত তক্তপোশে শোয়াইয়া দেন।

কিছুক্ষণ বাদেই উডরফের সংবিৎ ফিরিয়া আসে, সুস্থ এবং স্বাভাবিক হইয়া উঠিয়া শিবচন্দ্রকে নিবেদন করেন সশ্রদ্ধ প্রণাম। শিবচন্দ্রের আশীর্বাদ ও কুশল প্রশ্নাদি শেষ হইলে শুরু হয় আসল কথাবার্তা।

উডরফ নিবেদন করেন, "ঠাকুর, কলকাতায় প্রথম যেদিন আপনাকে দর্শন করি, সেদিন থেকেই আমার মন জুড়ে বসে আছে তন্ত্রসাধনার আকাঙ্ক্ষা। তাই আজ আপনার শরণ নিতে এসেছি।"

শিবচন্দ্রের আয়ত নয়নদ্বয় আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠে। প্রসন্ন কণ্ঠে বলেন, "সাহেব, আপনার ওপর জগন্মাতার আশীর্বাদ নিরন্তর বর্ষিত হোক। আপনি ভাগ্যবান, তাতে সন্দেহ নেই। জগন্মাতার সন্তান তো এ জগতে কতোই রয়েছে, কিন্তু মাতৃসাধনার জন্য এমন ব্যাকুল হয়ে ওঠে কয়জন ?"

"আমার দিক দিয়ে বন্ধন ও বাধাবিঘ্ন অনেক, তা আমি জানি," অকপটে বলেন উডরফ। "কিন্তু, আমার একান্ত প্রার্থনা, কৃপা ক'রে সে সব আপনি দূর ক'রে দিন। তন্ত্র সাধনার আলোক দিয়ে জীবন আমার ধন্য করুন।"

"সাহেব, গোড়াতেই আমি বলে রাখতে চাই, এই সাধনা ও তত্ত্ববিদ্যা গুরুমুখী। শ্রদ্ধাবান্ হয়ে, ত্যাগতিতিক্ষা নিয়ে, গুরুর কাছে পুরোপুরিভাবে আত্মসমর্পণ করতে হবে, তবেই সিদ্ধি হবে করায়ত্ত। তাতো সহজ কথা নয়।"

"আমি আপনার চরণে নিজেকে উৎসর্গ করতে চাই। শক্তি সাধনার আলো জ্বেলে আপনি আমায় পথ দেখিয়ে দিন এই আমার প্রার্থনা।'

এবার স্নেহমধুর কণ্ঠে শিবচন্দ্র কহিলেন, "সাহেব, আমি হরিদেব শাস্ত্রীর কাছে শুনেছি, আপনি সুপণ্ডিত এবং প্রকৃত তত্বান্বেষী। এ খুবই আনন্দের কথা। কিন্তু আপনাকে বিশেষভাবে আমার দুই একটা নির্দেশ দেবার আছে।"

"বলুন। যথাসাধ্য আমি তা পালন করবো।"

"আমাদের এই ভারতবর্ষ পুণ্যময় হয়েছে, প্রজ্ঞানময় হয়েছে শত শত যোগী ঋষি ও সিদ্ধ মহাত্মাদের পুণ্য ও জ্ঞানের আলোকে। উচ্চকোটির এই সব সাধক প্রচ্ছন্ন রয়েছেন এদেশের হিমালয় অঞ্চলে, গঙ্গা, যমুনা, কাবেরীর তটে তটে, রয়েছেন বহুতর তীর্থ ও জাগ্রত মহাপীঠে। প্রকৃত শ্রদ্ধা নিয়ে, যুক্তপাণি হয়ে, তাঁদের সন্ধানে বেরুলে আজকের দিনেও তাঁদের সাক্ষাৎ মিলে। আপনি হিমালয় অঞ্চলে গিয়ে এঁদের দু-চার জনকে খুঁজে বার করুন, তাঁদের কাছ থেকে আশীর্বাদ ও উপদেশ নিন্। তাই হবে আপনার সাধনার বড় প্রস্তুতি।" এই প্রস্তুতির পর স্থির করা যাবে, তন্ত্রদীক্ষা আপনি নেবেন কিনা, কার কাছে নেবেন।"

শ্রদ্ধাভরে শিবচন্দ্রকে প্রণাম করিয়া উডরফ কলিকাতায় চলিয়া আসিলেন। এখন হইতে তাঁহার ধ্যান জ্ঞান হইয়া উঠিল সিদ্ধ মহাত্মাদের অনুসন্ধান ও কৃপালাভ। এজন্য অজস্র চিঠিপত্র তিনি লিখিতে লাগিলেন, সাধু মহল সম্পর্কে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদেরও পাঠাইলেন দিকে দিকে।

কাশীতে সেদিন শিবচন্দ্রের ভবনে এক অলৌকিক দিব্য অনুভূতি লাভ করেন উডরফ। এই অনুভূতির পুণ্যময় স্মৃতিটি উত্তরকালে তাঁহার অন্তরে চির জাগরূক ছিল।

এ সম্পর্কে স্যার জন উডরফ শিবচন্দ্রের প্রধান শিষ্য দানবারি গঙ্গোপাধ্যায়কে বলিয়াছিলেন, "কাশীতে ঠাকুর শিবচন্দ্রের ভবনে

সেদিন উপস্থিত হবার পরেই এক দিব্য অনুভূতিতে আমার বাহ্যজ্ঞান প্রায় লোপ পেয়ে যায়। একটা বিদ্যুতের প্রবাহ যেন আকস্মিক-ভাবে আমার দেহের ভেতরে প্রবেশ করে, ছড়িয়ে পড়ে প্রত্যেকটি অঙ্গে প্রত্যঙ্গে। মনে হতে থাকে, সারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যেন চক্রাকারে ঘূর্ণিত হচ্ছে আর অপসৃত হয়ে যাচ্ছে সৃষ্টির নিঃসীম মহাকাশে। মনের ক্রিয়া তারপর স্তব্ধ হয়ে গেল।

"কিছুক্ষণ বাদে দেখা গেল চৈতন্যের পুনরাবির্ভাব, ধীরে ধীরে ফিরে এলাম নিজের অভ্যন্তরে, একটা দিব্য পরিবেশে। বিদ্যুতের মতন দ্যুতিমান একটা বিরাটায়তন ওঙ্কার রূপায়িত হয়ে উঠল আমার নয়ন সমক্ষে। তার ভেতরে নিরন্তর ভেসে বেড়াচ্ছিল পবিত্র মাতৃবীজ সমন্বিত দিব্যোজ্জ্বল মন্ত্ররাশি। হরিদেব শাস্ত্রী আমায় পরে বলেছিলেন, আমার অর্ধবাহ্য অবস্থা লক্ষ্য ক'রে ঠাকুর শিবচন্দ্র ইঙ্গিতে শাস্ত্রীজীকে নির্দেশ দিয়েছিলেন আমাকে শুইয়ে দিতে। কিছুক্ষণ পরে অবশ্য আমার সংবিৎ ফিরে এসেছিল, তখন ঠাকুরের উপদেশ পেয়ে আমি ধন্য হয়েছিলাম।"

উডরফ তখন কলিকাতায়। হাইকোর্টের দীর্ঘ অবকাশ আসিয়া পড়িয়াছে। এ সময়ে তাঁহার এক সংবাদদাতার নিকট হইতে চিঠি পাইলেন, হরিদ্বারের কাছাকাছি অঞ্চলে এক ব্রহ্মবিদ্ মহাত্মার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।

আর কালবিলম্ব না করিয়া তিনি হরিদ্বারের দিকে রওনা হইয়া গেলেন। সঙ্গে চলিলেন তাঁহার দোভাষী হরিদেব শাস্ত্রী এবং আরো দুই তিনটি সাধনকামী বন্ধু।

হরিদ্বারের নিকটস্থ এক পর্বতের নিভৃত কন্দরে ঐ মহাত্মার দর্শন পাওয়া গেল। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর সমাধি হইতে তিনি ব্যুত্থিত হইলেন, হাতছানি দিয়া সবাইকে ডাকিয়া নিলেন তাঁহার নিজের আসনের কাছে।

অপার শান্তির প্রবাহ যেন স্তব্ধ হইয়া রহিয়াছে এই প্রাচীন

তাপসের গুহাস্থিত জীবনে। দিব্য আনন্দের আলো দু'চোখ হইতে ঠিকরাইয়া পড়িতেছে, সমগ্র গুহার পরিবেশকে করিয়া তুলিয়াছে স্নিগ্ধমধুর ও শান্তিময়।

স্নেহপূর্ণ স্বরে মহাত্মা উডরফকে প্রশ্ন করিলেন, "বেটা, মনে হচ্ছে তুমি এদেশের নও, বিদেশ থেকে এসেছো। কি তোমার মনোবাঞ্ছা, খুলে বল।"

"বাবা, ভগবৎ দর্শনের জন্য প্রাণ বড় অধীর হয়ে উঠেছে। কিন্তু এ দর্শনের পথ বড় কঠিন, বড় বিপদসঙ্কুল। এ পথে সদ্‌গুরুর দর্শন যদি না মিলে, তিনি যদি হাত ধরে না নিয়ে যান, তবে তো একেবারে উপায় নেই। আমি তাই গুরুর সন্ধানে বেরিয়েছি। আপনি আমায় কৃপা করুন, এ বিষয়ে সাহায্য করুন।"

"দেখো বেটা, ভগবানের লীলা কত বিচিত্র, কত চমৎকার। সাত সমুদ্রের পারে তোমার দেশ। সংস্কার, জন্ম, পরিবেশ সব ভিন্‌দেশী। আর তিনি তোমায় এদেশে টেনে এনে গুরুর সন্ধানে ঘোরাচ্ছেন অরণ্যে পর্বতে।"

অতঃপর মহাত্মা উডরফকে গুহার এক নিভৃত কোণে নিয়া বসাইলেন, স্পর্শ করিলেন তাঁহার ব্রহ্মদণ্ডে। এ যেন এক অবিশ্বাস্য ইন্দ্রজাল। উডরফের চিত্তপটে একের পর এক ফুটিয়া উঠিল বহুতর বিচিত্র দৃশ্য। এ সব দৃশ্য যেন পূর্বজন্মে নিজ জীবনে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন অনির্বচনীয় আনন্দে প্রাণ ভরিয়া উঠিল।

মহাত্মা স্মিতহাস্যে বলিলেন, "বেটা, এসব দৃশ্য যা দেখলে সবই তোমার নিজ জীবনের। বহুপূর্বে জন্মান্তরের ধারায় এসব ঘটনা ঘটেছে। এই ঘটনা পরম্পরার ভেতর দিয়েই গড়ে উঠেছে তোমার সংস্কার, আর তোমার অন্তর্জীবন। এর ফলেই সমুদ্র পার হয়ে, অজানা আনন্দের হাতছানিতে, তুমি এদেশের দেবভূমিতে এসে পৌঁছেছো। যথেষ্ট সুকৃতি তোমার রয়েছে, বেটা।"

দিব্য আনন্দের স্রোত বহিয়া চলিয়াছে উডরফের শিরায় শিরায়। উদ্দীপনায় অধীর হইয়া জোড়হস্তে কহিলেন, "বাবা, শুনেছি ব্রহ্মবিদ্

গুরু শিষ্যের তিন জন্মের সংস্কার ও সাধন ফল দেখে তারপর দীক্ষা দেন। দেখতে পাচ্ছি, আমার বহুজন্মের ওপর আপনার দিব্য দৃষ্টি রয়েছে প্রসারিত। তবে আপনিই এ অধমকে দীক্ষা দিয়ে কৃতার্থ করুন।”

“না বেটা, আমি তোমার গুরু নই। একাধারে শাস্ত্রবিদ্, জ্ঞানী, কর্মী ও শক্তি সাধনায় পারঙ্গম সাধক হবেন তোমার গুরু। তিনি তোমার কাছাকাছিই রয়েছেন। শুভলগ্ন উপস্থিত হলে তাঁর কৃপা তুমি পাবে।”

মহাত্মা এবার নীরব হইলেন, ধুনির সম্মুখে বসিয়া শুরু করিলেন তাঁহার ধ্যান মনন। অতঃপর উডরফ ও তাঁহার সঙ্গীরা প্রণাম নিবেদন করিয়া গুহা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

এবার সন্ধান আসিল হৃষিকেশের এক প্রখ্যাত যোগীর। গঙ্গার অপর পারে, ঘন অরণ্যে আবৃত এক কুঠিয়ায়, এই যোগী দীর্ঘদিন তাঁহার তপস্যায় নিমগ্ন রহিয়াছেন। দুইজন ভক্তিমান্ সঙ্গী নিয়া উডরফ তাঁহার সকাশে উপস্থিত হইলেন।

প্রণাম করার সঙ্গে সঙ্গে যোগী সহাস্যে কহিলেন, “বেটা, কেন তুমি বৃথা এদিকে ওদিকে ঘুরে মরছো, বলতো? হিমালয়ের ব্রহ্মবিদ্ মহাত্মাদের দর্শন করছো, ভালো কথা। এ দর্শনে পুণ্য হয়, মন স্থির হয়, প্রত্যাহার ও ধ্যান ধারণা আপনি এসে যায়।”

“সেইজন্যেই তো এখানে আমার আসা, মহারাজ,”—যুক্তকরে নিবেদন করেন উডরফ।

“কিন্তু বেটা, তোমার তপস্যার স্থান তো এটা নয়, তোমার গুরুও এখানকার কেউ নন। এখানকার উচ্চকোটির মহাত্মারা পরাজ্ঞানের উৎস, কর্ম বা শাস্ত্র প্রচারের ধার তাঁরা ধারেন না। তোমার ভেতরের দিকে তাকিয়ে দেখতে পাচ্ছি, তোমার সাধনার সঙ্গে কিছুটা ঐশ্বরীয় কর্মও যুক্ত রয়েছে। তোমার স্থান তাই এখানে নয়, লোকালয়ে। তপস্যা ও জনকল্যাণ, দুই-ই তোমায় করতে হবে সমভাবে।”

নানা চিন্তায় বিহ্বল হইয়া পড়েন উডরফ। ব্যবহারিক জীবনের সূক্ষ্ম বিচার বিশ্লেষণে তিনি অতিমাত্রায় কুশলী। তীক্ষ্ণধী ব্যারিস্টার হিসাবে এক সময়ে তিনি সুপরিচিত ছিলেন। তারপর কলিকাতা হাইকোর্টের এক বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ বিচারপতিরূপে তাঁহার খ্যাতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু এই সিদ্ধ মহাত্মাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলিয়া কোনো স্থির সিদ্ধান্তেই যে আসিতে পারিতেছেন না।

ভাবিলেন, শিবচন্দ্র সিদ্ধ কৌল সাধক। নিজেই তিনি আগ্রহ করিয়া উডরফকে পাঠাইয়াছেন এই সব ঈশ্বরকল্প মহাত্মার সন্ধানে। এক্ষেত্রে বুঝিয়া নিতে হইবে, শিবচন্দ্র চাহিতেছেন, তাঁহার চাইতে বেশী শক্তিধর কোনো মহাপুরুষের নিকট উডরফ দীক্ষা গ্রহণ করুন। কিন্তু এখানে আসার পর উডরফের অভিজ্ঞতা হইয়াছে অন্য রকমের। এই মহাত্মাদের মতে, শিবচন্দ্রের মতো জ্ঞানবান্ ও কর্মী পুরুষই তাঁহার গুরু হওয়ার উপযুক্ত।

সংশয় ও বিপরীতধর্মী চিন্তাস্রোতে চিত্ত যখন বিভ্রান্ত এবং আলোড়িত, এমন সময়ে, উত্তরাখণ্ডে থাকিতেই, আর এক ব্রহ্মজ্ঞ যোগী পুরুষের সংবাদ পান উডরফ।

গুপ্তকাশীর নিকটস্থ এক পর্বতগুহায় ইনি বাস করেন। স্থানীয় সাধক ও জনসাধারণের বিশ্বাস ইঁহার বয়স তিন চার শত বৎসরের কম নয়।

নিকটস্থ এক অরণ্যে উডরফ ও তাঁহার সঙ্গীরা তাঁবু ফেলিলেন। বিশ্রাম ও আহারাদির শেষে উপনীত হইলেন যোগীরাজের গুহায়।

বেশ কিছুক্ষণ সেখানে অপেক্ষা করার পর মহাত্মার ধ্যান ভাঙিল। ইঙ্গিতে দর্শনার্থীদের তিনি নিকটে ডাকিলেন। প্রণামান্তে উডরফ শুরু করিলেন তত্ত্বজ্ঞানের দুই চারিটি প্রশ্ন।

যোগীরাজ সহাস্যে মৃদুস্বরে কহিলেন, "বেটা, তোমার ভেতরে ঈশ্বর দর্শনের ব্যাকুলতা রয়েছে ঠিকই, কিন্তু অহংবোধ আর সংশয় সৃষ্টি করেছে দুস্তর বাধা।"

"বাবা, আপনার কথা অতি যথার্থ। আমি অন্ধ পথিক। কৃপা

করে আমায় আপনি চক্ষুষ্মান করুন। আমায় পথ দেখিয়ে দিন। তত্ত্ববিদ্ গুরুর সাহায্য না পেলে, এক পা'ও যে আমি অগ্রসর হতে পারছিনে। সেই গুরুর সন্ধানে বেরিয়েছি, কিন্তু তিনি রয়ে গেছেন নাগালের বাইরে।"

যোগীরাজ উত্তরে বলিলেন, "বেটা, তুমি অন্ধ, একথা ঠিক। তত্ত্বজ্ঞান যাঁর জীবনে ফুটে ওঠে নি, সে অন্ধই বটে। কিন্তু তোমায় জিজ্ঞেস করি, এর আগে যে দুই মহাত্মার কাছে গিয়েছিলে, তাঁরা তো তোমার বিধিনির্দিষ্ট গুরুর ইঙ্গিত ঠিকই দিয়েছেন। সেই চক্ষুষ্মান্ মহাত্মাদের বাক্যে তো তুমি কান দাও নি। অন্ধের মতো পথ চলছো, আর হোঁচট খাচ্ছো।"

বিস্ময় বিস্ফারিত নয়নে বৃদ্ধ যোগীরাজের দিকে তাকাইয়া থাকেন উডরফ। উপলব্ধি করেন, এই ঈশ্বরকল্প মহামানবের দৃষ্টির বাহিরে কোনো কিছুই নাই।

করজোড়ে কহিলেন, "বাবা, কৃপা ক'রে আমায় বলুন, কি আমি করবো, কার কাছে শরণ নেবো।"

"শোন বেটা। আগের দুই সর্বজ্ঞ মহাত্মা যা বলেছেন, তার ওপরে আমার আর কিছু বলার নেই। এবার স্বস্থানে ফিরে যাও, সদ্গুরু তুমি সেখানে বসেই পাবে। আরো একটা কথা মনে রেখো। জীবন ক্ষণস্থায়ী, এর একটি মুহূর্তও বিনা সাধনভজনে অপচয় ক'রো না। শিগ্গীর গিয়ে সদ্গুরুর আশ্রয় নাও, তাঁর উপদেশমতো কাজ করো। জীবনকে আহুতি দাও ঈশ্বরের যজ্ঞে। তবেই না ঈশ্বর তোমায় কোলে টেনে নেবেন।"

যোগীরাজের নিকট বিদায় নিয়া নিজের তাঁবুতে ফিরিয়া আসেন উডরফ। এবারে দৃষ্টি তাঁহার ক্রমে স্বচ্ছ হইয়া উঠে। পরিষ্কারভাবে বুঝিতে পারেন, তন্ত্রাচার্য শিবচন্দ্র এতদিন শুধু তাঁহাকে পরীক্ষা করিয়াছেন। ব্যারিস্টারী এবং জজিয়তী জীবনের অত্যুগ্র বিচার বিশ্লেষণ, অহমিকা বোধ আর সংশয়, এতদিন উডরফকে ঘাটে ঘাটে ঘুরাইয়া মারিয়াছে। এবারে তাঁহাকে নিতে হইবে স্থির সিদ্ধান্ত।

সেইদিনই তাঁবু তুলিয়া সঙ্গীদের সমভিব্যাহারে উডরফ রওনা হইলেন কলিকাতার দিকে।

হাইকোর্টের ছুটি ফুরাইতে তখনো বেশ কিছুটা দেরি আছে। গুপ্তকাশী হইতে ফিরিয়া কয়েকদিনের জন্য উডরফ শৈলাবাস দার্জিলিং-এ বেড়াইতে গিয়াছেন। সেদিন ঘুম্ পাহাড়ের এক বনের মধ্য দিয়া পথ চলিতেছেন, হঠাৎ চোখে পড়িল এক সাধুর ঝুপড়ি। অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, ভস্মমাখা, দীর্ঘবপু এক সাধু ধুনি জ্বালাইয়া ধ্যানমগ্ন রহিয়াছেন। কপালে তাঁহার সিন্দুর ও রক্ত চন্দনের ফোঁটা, গলায় হাড়ের মালা। বুঝা গেল, ইনি তান্ত্রিক সন্ন্যাসী।

ধ্যান ভঙ্গ হইলে উডরফ ভক্তিভরে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। কথা প্রসঙ্গে জানা গেল, দীর্ঘদিন ইনি তিব্বতে তপস্যারত ছিলেন। এবার গুরুর আদেশে ফিরিতেছেন সমতল ভূমিতে।

ভাঙা ভাঙা হিন্দিতে উভয়ের আলাপ চলিতেছে। এ সময়ে স্যার উডরফ তাঁহার মনের কথা খুলিয়া বলিলেন, "মহারাজ, আমি তন্ত্র সাধনার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে পড়েছি, কিন্তু সদ্‌গুরু লাভ এখনো হয়ে ওঠে নি।"

কিছুক্ষণ নীরবে নয়ন মুদিয়া থাকিয়া সন্ন্যাসী কহিলেন, "কেন বেটা, তোর গুরু তো তোর জন্য অপেক্ষা ক'রেই রয়েছেন। তাঁর নাম শিবচন্দ্র। তাঁর কাছ থেকেই মিলবে তোর শান্তি আর মুক্তির সন্ধান।"

সন্ন্যাসীকে প্রণাম জানাইয়া উডরফ সানন্দে বিদায় নিলেন। এবার আর তাঁহার মনে কোনো সংশয় নাই, দ্বিধা দ্বন্দ্ব নাই। ব্যারিস্টার ও বিচারপতি হিসাবে আইনের বহুতর কূট প্রশ্ন ও জটিল রহস্যের মীমাংসা তিনি করিয়াছেন, সেক্ষেত্রে প্রচুর সাহস ও আত্মবিশ্বাস তাঁহার আছে। কিন্তু অধ্যাত্ম জীবনের পথঘাট, গলিঘুঁজি অনেক কিছুই তাঁহার জানা নাই। প্রকৃত সমর্থ গুরু কে? তাঁহার ঈশ্বরনির্দিষ্ট গুরুই বা কোথায় রহিয়াছেন? কোন্ পথে

কোন্ সাধন প্রণালী অনুসরণ করিয়া হইবেন তিনি সিদ্ধকাম?—তাঁহার প্রতিভা ও বিদ্যাবত্তা এ সব প্রশ্নের কোনো সদুত্তর দিতে পারে না।

এজন্যই তো বার বার সাধু মহাত্মাদের কাছে তিনি ঘোরাফেরা করিতেছেন, অপেক্ষায় রহিয়াছেন নির্ভুল পথ নির্দেশের।

হিমালয়ের যোগী তপস্বীদের কথায় ও ইঙ্গিতে তাঁহার ধারণা জন্মিয়াছে তন্ত্রসিদ্ধ মহাপুরুষ শিবচন্দ্রই তাঁহার বিধিনির্দিষ্ট গুরু। কিন্তু এই চিহ্নিত গুরু তো নিজে স্পষ্ট করিয়া কিছু বলিতেছেন না। একটা অনিশ্চিতির মধ্যে তাঁহাকে ঝুলিয়া রাখিয়াছেন।

এবার তান্ত্রিক সন্ন্যাসীর স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন বাণী তাঁহার হৃদয়ে জাগাইয়া তুলিয়াছে দৃঢ় প্রত্যয়ের শক্তি। শিবচন্দ্রের নাম বলিয়া দিয়া সন্ন্যাসী তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছেন দ্বিধা-দ্বন্দ্বের আবর্ত্ত হইতে। এবার লক্ষ্য তাঁহার স্থির। শিবচন্দ্রের নিকট হইতেই গ্রহণ করিবেন বহু আকাঙ্ক্ষিত দীক্ষা, মাতৃসাধনায় হইবেন সিদ্ধকাম।

কলিকাতায় ফিরিয়াই উড়রফ তাড়াতাড়ি হরিদেব শাস্ত্রীকে ডাকাইয়া আনিলেন। বলিলেন, "শাস্ত্রীজী, আমি সংকল্প স্থির ক'রে ফেলেছি, আচার্যবর শিবচন্দ্রের কাছ থেকেই দীক্ষা নেবো।"

শাস্ত্রীর চোখে মুখে প্রসন্নতার ছাপ। কহিলেন, "কাশীতে শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণবের গৃহে আপনার যে অলৌকিক অনুভূতি হয়েছিল, ওঙ্কার মধ্যস্থ মাতৃবীজ আপনি দর্শন করেছিলেন, তা বোধহয় আপনার স্মরণ আছে।"

"সে অনুভূতি, সে দর্শন, কোনোদিনই ভোলবার নয়।"

"আমি তখনি বুঝেছিলাম, সিদ্ধ কৌল শিবচন্দ্রের কৃপা আপনি পেয়ে গেছেন। কিন্তু তারপরও আপনি হেথায় হোথায় অনর্থক গুরুর জন্য এত খোঁজাখুঁজি করেছেন।"

"সে কথা ঠিক। হয়তো আচার্যদেব, নিজেই ইচ্ছে ক'রে আমায় ঘুরিয়েছেন, আমার সংশয় ছেদন করার জন্য, সংকল্পকে দৃঢ় ক'রে তোলবার জন্য।"

"আপনি সাধনার যোগ্য আধার। শ্রদ্ধা, সরলতা ও পবিত্রতা আপনার আছে। আমার কিন্তু কেবলই ভয় হচ্ছে, তান্ত্রিক সাধনায় যে সব আচার আচরণ আবশ্যক, তা কি আপনি ধৈর্য ধরে করতে পারবেন? আচার্য শিবচন্দ্র কিন্তু অতিমাত্রায় আনুষ্ঠানিক ও ক্রিয়াবান্, মাতৃসাধনায় একটু ত্রুটিবিচ্যুতি দেখলে ক্ষেপে ওঠেন। তাঁর সব নির্দেশ পালন ক'রে আপনি কি চলতে পারবেন?"

"আমি সব কিছুর জন্য মনকে তৈরী করেছি, শাস্ত্রীজী। তন্ত্র-সিদ্ধির জন্য প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি ক্রিয়া ও আচার আমি অবশ্য পালন করবো। তাছাড়া, আমার স্ত্রী এলেনের সম্মতিও আমি নিয়েছি। আমার শক্তি হিসেবে তিনিও দীক্ষা আর সাধন নেবেন। শাস্ত্রীজী, আমার মন বড় ব্যাকুল হয়ে পড়েছে। যত সত্বর হয় আপনি আচার্যদেবকে কলকাতায় নিয়ে আসুন।"

উডরফ ও হরিদেব শাস্ত্রীর সনির্বন্ধ অনুরোধে, কিছুদিনের মধ্যে শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব কলিকাতায় উপস্থিত হইলেন। সাক্ষাৎ ও কুশল প্রশ্নাদির পর শিবচন্দ্র স্মিতহাস্যে কহিলেন, "কি সাহেব, তোমার পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবার সব শেষ হয়েছে তো? মনের দ্বন্দ্ব সংশয় তো আর নেই?"

উডরফ জোড়হস্তে নতশিরে দণ্ডায়মান্, কাতর স্বরে কহিলেন, "আচার্যদেব, আমি অবিদ্যার আবর্তে পড়ে মার খাচ্ছি। আমায় উদ্ধার করুন, মাতৃসাধনার দীক্ষা আমায় দিন।"

"সাহেব, কাশীধামে যখন তুমি আমার কাছে গিয়েছিলে, তখনি আমি তোমায় দীক্ষা দিতে পারতাম। দিই নি, তার কারণ আছে। তোমরা ইউরোপীয়রা বড় ভোগসুখী, বাস্তবধর্মী এবং বিচারশীল। বিজ্ঞানের পরীক্ষাগারে না দেখে, চাক্ষুষ না দেখে, তোমরা কোনো কিছু মেনে নিতে চাও না, তাই না?"

"হ্যাঁ, সে কথা যথার্থ।"

"সেই জন্যই তোমায় আমি এদেশের উচ্চকোটির সাধু মহাত্মাদের কাছে যেতে বলেছিলাম। তাঁদের শক্তিবিভূতির পরিচয় নিশ্চয় তুমি প্রত্যক্ষ ক'রে এসেছো।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। তাঁদের যোগবিভূতি অকল্পনীয়। কাছে গিয়ে দাঁড়ালে মনে হয়, তাঁদের দৃষ্টির তুলনায় আমরা অন্ধ, জ্ঞান-বিজ্ঞানের এতো কিছু অধ্যয়ন ক'রেও আমরা অর্বাচীন, মূর্খ।"

"এই মূল্যবোধটি তোমার হোক্, শুধু সেজন্যই তাঁদের কাছে আমি তোমায় পাঠাই নি। সিদ্ধ মহাত্মারা বড় কৃপালু। বিশেষ ক'রে যাঁরা সত্যকার মুমুক্ষু, সত্য উপলব্ধির জন্য ত্যাগ তিতিক্ষায় পশ্চাদ্পদ নয়, তাঁদের প্রতি ঐ মহাত্মাদের স্নেহ ও কৃপার অবধি নেই। তুমি ভিন্নদেশীয় লোক, ভিন্ন সংস্কার ও সংস্কৃতির মানুষ, তবুও তন্ত্রসাধনায় আগ্রহী হয়ে উঠেছো, এটা তাঁরা বুঝেছেন এবং তোমায় আশীর্বাদও দিয়েছেন।"

"মূলে রয়েছে আপনারই কৃপা।"

"আমার শুভেচ্ছা ছিল বৈ কি। যাক্, মহাত্মাদের কৃপায় তোমার সংশয় মিটেছে, যাচাই করার বুদ্ধি হয়েছে দূরীভূত। এবার আমি তোমায় শাক্তী দীক্ষা দেবো। কিন্তু তোমার শক্তি?"

"আজ্ঞে হাঁ, আমার স্ত্রী এলেন এজন্য প্রস্তুত, তিনিও আপনার কাছে দীক্ষা নেবার জন্য উৎসুক হয়ে আছেন।"

লেডি এলেন উডরফ পাশের ঘরেই ছিলেন, আহ্বান পাওয়ামাত্র দ্রুতপদে আসিলেন। শিবচন্দ্রের চরণে লুটাইয়া নিবেদন করিলেন সশ্রদ্ধ প্রণাম।

নির্ধারিত শুভ লগ্নে উডরফ দম্পতির দীক্ষা অনুষ্ঠান এবং দেবী সর্বমঙ্গলার পূজা-হোম সুসম্পন্ন হইয়া গেল।

অনুষ্ঠান সমাপ্ত হইবার পর উডরফ করজোড়ে নিবেদন করেন, "আচার্যদেব, দীক্ষা দিয়ে, মাতৃপূজার অধিকার দিয়ে, আজ আপনি আমায় উদ্ধারের পথে নিয়ে এলেন। এবার আমার কর্তব্য গুরুদক্ষিণা

নিবেদন করা। কৃপা ক'রে আমায় বলুন, কোন্ বস্তু আপনার প্রিয়। যে কোনো উপায়ে আমি তা সংগ্রহ ক'রে আপনার চরণে প্রণামী দেবো।"

শিষ্যের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতেই শিবচন্দ্রের ভাবান্তর ঘটিল। কিছুক্ষণের জন্য মৌনী থাকিয়া প্রশান্ত কণ্ঠে বলিলেন, "বৎস, আমার প্রিয় বস্তু তুমি আমায় প্রণামী দিতে চাও, আমার সন্তোষ বিধান করতে চাও, খুবই আনন্দের কথা। কিন্তু কোনো জাগতিক বস্তুতে আমার বিন্দুমাত্র আকর্ষণ নেই। মায়ের কোলে বসে, মাতৃমূর্তি আমি দর্শন করেছি, মত্ত রয়েছি মাতৃসাধনায়। আর তো কোনো কাম্য বস্তু আমার নেই। তুমি আমার প্রিয় মাতৃতত্ত্ব ও মাতৃনাম জগতে প্রচার করো। যতদিন জীবন থাকে, এই মহান্ কর্মেই তুমি রত হয়ে থাকো। এতেই হবে আমার সত্যকার সন্তুষ্টি বিধান, আর এটাই হবে তোমার গুরুদক্ষিণা।"

মাতৃগত-প্রাণ সিদ্ধপুরুষের কথা কয়টি শুনিয়া বিস্ময় ও আনন্দে উডরফের অন্তর ভরিয়া উঠে। করজোড়ে নিবেদন করেন, "আমায় আশীর্বাদ করুন আপনার ঈপ্সিত কর্ম যেন আমি উদ্‌যাপন করতে সমর্থ হই।"

"তথাস্তু, বৎস। মায়ের তত্ত্ব, মায়ের তারক-নাম প্রচারের ব্রত তোমার সার্থক হোক্।"

এ সময়ে শিবচন্দ্র কিছুদিন কলিকাতায় অবস্থান করেন এবং নূতন শিষ্য উডরফকে তন্ত্রোক্ত আচার অনুষ্ঠান ও পূজা হোমের ক্রিয়া পদ্ধতি দেখাইয়া দিতে থাকেন।

সিংহবাহিনী, দশভুজা মহিষমর্দিনী, দেবী দুর্গা উডরফের ইষ্ট-বিগ্রহ। এই বিগ্রহের অর্চনা তন্ত্রশাস্ত্রের বিধান অনুযায়ী ষোড়শ-উপচারে নিত্য তিনি সম্পন্ন করিতেন। পূজা, ধ্যান জপ, হোম, ভোগরাগ ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হইত নিখুঁত ভারতীয় প্রথায়।

দেবী পূজা সমাপ্ত করিয়া উডরফ ভাবাবেশে উঠিয়া দাঁড়াইতেন। গৌরকান্তি দীর্ঘবপু রক্তচন্দনে চর্চিত, পরনে রক্তবর্ণ ক্ষৌম বসন,

গলায় রুদ্রাক্ষের মালা জড়ানো, আর কেশের শিখায় ঝুলিত এক গুচ্ছ রক্তজবা। তন্ত্রধারক পণ্ডিত ও মণ্ডপের সহকারীরা এই বিদেশী কৌল সাধকের দিকে অবাক্ বিস্ময়ে চাহিয়া থাকিত।

এই সময় হইতে শিবচন্দ্র ও উডরফের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ গড়িয়া উঠে। সুযোগ পাইলেই উডরফ সম্ভ্রম ও সমাদরের সহিত গুরুদেবকে স্বগৃহে আনয়ন করিতেন, গ্রহণ করিতেন নূতন নূতন নিগূঢ় ক্রিয়ার উপদেশ। কখনো বা নিজেই কুমারখালি গ্রামে অথবা কাশীতে শিবচন্দ্রের ভবনে গিয়া উপস্থিত হইতেন। গুরু এবং গুরুপত্নী উভয়কেই তিনি ভূলুণ্ঠিত হইয়া প্রণাম করিতেন। গুরুর সন্নিধানে থাকার সময়ে সকলেরই চোখে পড়িত তাঁহার নগ্নপদ, কাষায় পরিহিত, রুদ্রাক্ষ শোভিত রূপ।

ভারতীয় ধর্ম সংস্কৃতির বহু অনুষ্ঠান বা সভায় উডরফ আমন্ত্রিত হইতেন। সেসব স্থানে ভাষণ দিবার সময় সর্বপ্রথমে তিনি সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করিয়া প্রণাম নিবেদন করিতেন সদ্‌গুরু শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণবের উদ্দেশে।

তন্ত্রশাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাতারূপে এবং তন্ত্র সাধনার সিদ্ধ সাধকরূপে সারা ভারতে তখন আচার্য শিবচন্দ্রের খ্যাতি প্রচারিত। বিশেষত কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি উডরফকে দীক্ষা দিবার পর হইতে তাঁহার খ্যাতি প্রতিপত্তি দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। তাঁহার ব্যক্তিত্ব, সাধনা ও সিদ্ধির তথ্য জানার জন্য অনেকেরই আগ্রহের অন্ত নাই। বহু স্থানে অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিরা উডরফকেও তাঁহার গুরুদেব সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করিতেন। তাই উডরফ মনে মনে স্থির করিলেন, গুরুদেবের একটি প্রামাণ্য জীবনী তিনি লিখিবেন।

কয়েকদিন পরেই শিবচন্দ্রের শুভাগমন হইল তাঁহার কলিকাতার ভবনে। কুশল প্রশ্নের পরে শিবচন্দ্র কহিলেন, "উডরফ, তোমার মুখ দেখে মনে হচ্ছে, তুমি একটা নূতন কাজ শুরু করার সংকল্প করেছো। ব্যাপারটা কি, খুলে বলতো?"

বুঝা গেল, অনেক কিছুই এই অন্তর্যামী সিদ্ধ পুরুষের দৃষ্টি এড়ায় না। উডরফ হাসিয়া কহিলেন, "আচার্যদেব, আপনি ঠিকই ধরেছেন। আমার মনে বাসনা জেগেছে, আপনার একটা প্রামাণ্য জীবনী রচনা করবার জন্য।"

"কেন? তুমি কি ভেবেছো, একাজে আমি খুশী হবো?"

"না, তা নয়।" আম্‌তা-আম্‌তা করিয়া বলেন স্যার জন উডরফ। "ভারতের এবং ইউরোপ আমেরিকার বহু জিজ্ঞাসু ব্যক্তি আপনার জীবন ও সাধনা সম্পর্কে আমায় প্রশ্ন করেন, অজস্র চিঠিপত্র লেখেন। তাই ভাবছি, এটা লিখবো।"

"শোন উডরফ, আমার জীবনী লিখলে আমি কিন্তু মোটেই খুশী হবো না। আমার জীবনী অতিশয় অকিঞ্চিৎকর। আমি সারা জীবন ধরে অনুসন্ধান ক'রে আসছি আমার মা মহামায়ার জীবনী, তাঁর সৃষ্ট সারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ছড়িয়ে আছে তাঁর জীবনকথা। সেই জীবনী বাদ দিয়ে তুমি আমার জীবনী নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছো?"

"আমাদের মতো সামান্য লোক আপনার মতো মহাপুরুষের কথা ভাবতেই খেই হারিয়ে বসে। ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরীর কথা কি ক'রে তারা জানবে বা লিখবে?" পাল্টা প্রশ্ন করেন উডরফ।

"না উডরফ, আমার শিষ্য যে হবে, সে যে মহামায়ার তত্ত্ব নিয়েই নিমগ্ন থাকবে দিন রাত। তুমি সেই তত্ত্বকথাই প্রচার করো। দীক্ষার অব্যবহিত পরেই তন্ত্রশাস্ত্র প্রচারের কথা তোমায় আমি বলেছি। এখন থেকে তাই হোক্ তোমার ধ্যান জ্ঞান।"

গুরুদেবের এই কথা উডরফ শিরোধার্য করিয়া নিলেন। সেই দিন হইতেই শুরু করিলেন আদিষ্ট তন্ত্রপ্রচারের কাজ। ইংরেজী ভাষায় শিবচন্দ্রের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'তন্ত্রতত্ত্ব'-এর অনুবাদ ও ব্যাখ্যা রচনায় তিনি ব্রতী হইয়া পড়িলেন। অসম্ভব ক্ষিপ্রতার সহিত এ গ্রন্থ রচিত হইল এবং ইহার নাম দেওয়া হইল—প্রিন্সিপল্‌স্ অব্ তন্ত্র। তারপর একে একে রচিত ও প্রকাশিত হইল আরও বহুতর তন্ত্রশাস্ত্রের গ্রন্থ।

ইংরেজী ভাষায় রচিত তন্ত্র সাহিত্য প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের শিক্ষিত

সমাজের সম্মুখে উন্মোচিত করিল সাধনা ও দর্শনের এক নবদিগন্ত।[১] শক্তি সাধনার অন্তর্নিহিত শক্তি, মাতৃতত্ত্বের দার্শনিকতা, এবং মন্ত্রের নিগূঢ় রহস্যের উপর ঘটিল নূতনতর আলোকপাত। গুরু শিবচন্দ্র তাঁহার তন্ত্রতত্ত্বে যে শুদ্ধতর বীরাচারী সাধনতত্ত্বের প্রচার করেন, শিষ্য উডরফ তাহাই তুলিয়া ধরেন সারা বিশ্বের অধ্যাত্মরস পিপাসু মানুষের কাছে।

শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণবের জীবনে দুইটি পর্যায় বিশেষভাবে লক্ষণীয়। প্রথম পর্যায়ে রহিয়াছে সাধনা ও সিদ্ধির নিরন্তর প্রয়াস, সারা ভারতের শ্রেষ্ঠ কৌল সাধকদের তিনি খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন, বাছিয়া বাছিয়া জাগ্রত শক্তিপীঠ ও শ্মশানে উপস্থিত হইতেছেন, সিদ্ধ মহাত্মাদের সাহায্যে উদ্‌যাপন করিতেন নিগূঢ় ক্রিয়া অনুষ্ঠান। এই সময়কার জীবনে তন্ত্রের প্রচার সম্পর্কে শিবচন্দ্রকে মোটেই উৎসাহী হইতে দেখা যায় নাই।

পরবর্তী পর্যায়ে আমরা দেখিতে পাই শিবচন্দ্রের আচার্য রূপ। এই সময়ে তন্ত্রতত্ত্বের প্রচার এবং প্রসারের জন্য তাঁহার তৎপরতার অবধি নাই। এজন্য প্রথমে কাশীধামে এবং পরে স্বগ্রাম কুমারখালিতে সর্বমঙ্গলা সভা তিনি প্রতিষ্ঠিত করেন। কামাখ্যা হইতে জ্বালামুখী, কেদারনাথ হইতে রামেশ্বর, সমগ্র ভারতের প্রধান প্রধান শক্তিপীঠের সাধক ও আচার্যদের সঙ্গে তিনি যোগাযোগ স্থাপন করেন, তন্ত্রের উজ্জীবনের জন্য কর্মতৎপর হন। বিশেষ করিয়া তাঁহার রচিত গ্রন্থাদির মাধ্যমে বাংলার শক্তি-সাধক ও আচার্যদের মধ্যে শিবচন্দ্র এক গভীর যোগসূত্র গড়িয়া তোলেন। তাঁহার 'তন্ত্রতত্ত্ব'

১ স্যার জন উডরফের গ্রন্থগুলির নাম: প্রিন্সিপল্‌স্ অব্ তন্ত্র, শক্তি অ্যাণ্ড শাক্ত, সারপেন্ট পাওয়ার গারল্যাণ্ড্ অব লেটার্স, ক্রিয়েশান অ্যাজ্ এক্সপ্লেনড ইন তন্ত্র, ইনট্রোডাকশন টু তন্ত্র, ইজ্ ইণ্ডিয়া সিবিলাইজড্, ইত্যাদি। কোনো কোনো গ্রন্থে ছদ্মনাম, আর্থার আভালন, তিনি ব্যবহার করিয়াছেন।

বাংলার তন্ত্র সাধকদের মধ্যে নূতনতর সাড়া জাগাইয়া তোলে, তাঁহার বজ্রগর্ভ ভাষণে শক্তি সাধনায় আগ্রহী অগণিত নরনারী সে সময়ে নবভাবে উদ্দীপিত হইয়া উঠে।

গুরুদেবের অশেষ কৃপা এবং তাঁহার প্রদত্ত সাধনের কথা বলিতে গেলেই স্যার জন উডরফের দুই চোখ কৃতজ্ঞতায় সজল হইয়া উঠিত। ঘনিষ্ঠ মহলে কখনো কখনো গুরুদেব শিবচন্দ্রের নানা করুণার কথা বিবৃত করিবেন :

"কলিকাতায় একদিন তত্ত্ব ব্যাখ্যানের কালে হঠাৎ আমার ডাক পড়িল—উপস্থিত হইবামাত্র গুরুদেব বলিলেন, 'দেখ সাহেব, তুমি মাতৃসাধনায় রত। আমার ইচ্ছা একবার তুমি কোনো বিশিষ্টা মাতৃ-সাধিকার হস্ত হইতে একটি সিঞ্চন গ্রহণ করো। উত্তরে জানাইলাম, 'আপনি গুরু, পথ নির্দেশক। আপনার ইচ্ছা নিশ্চয়ই সর্বসময়ে সর্বোপরি বলবৎ হইবে। কিন্তু উক্ত কার্যে ক্রিয়াকুশলী যোগ্য দক্ষ সাধিকা কোথায় আছেন তাহা তো আমার জানা নাই। কাজেই আপনার ইচ্ছা পূর্ণ করিবার ব্যবস্থা তো এখন আপনাকেই করিতে হয়।'

"শিবচন্দ্র তদুত্তরে বলিলেন, 'তজ্জন্য তোমাকে ভাবিতে হইবে না। মায়ের ইচ্ছায় সময় পূর্ণ হইলে সকল সুযোগ আপনা হইতেই আসিয়া উপস্থিত হইবে। ইহার কিছুদিনের পর গুরুদেবেরই ব্যবস্থায় কাশীধামের জয়কালী দেবী নামে এক বাঙালী মাতৃসাধিকা কর্তৃক গুরুদেবের ইচ্ছানুযায়ী উক্ত 'সিঞ্চন' অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হইল। শিবচন্দ্র বিরাট রহস্যময় মহাপুরুষ, এরূপ লোকোত্তর চরিত্র মহাপুরুষের চরিত্রের রহস্য ভেদ করা তো সাধারণ মানববুদ্ধির অগম্য[১]।"

জীবনের শেষ কয়েকটি বৎসর শিবচন্দ্র প্রধানত কুমারখালিতেই অবস্থান করেন। দেবী সর্বমঙ্গলার সেবা ও আরাধনা হইয়া উঠে তাঁহার ধ্যান জ্ঞান। মাতৃসাধনায় সিদ্ধ মহাসাধক মাতৃক্রোড়ে বসিয়া মাতৃস্নেহের সুধারসেই বিভোর থাকিতেন দিন রাত।

১ তন্ত্রাচার্য : বসন্তকুমার পাল, হিমাদ্রি পত্রিকা ১৬ই অগ্রহায়ণ, ১৩৭৬

কলিকাতা এবং বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল হইতে শক্তি সাধনার অনুরাগী শত শত লোক এসময়ে দর্শন করিতে আসিতেন একপত্রী তন্ত্রশাস্ত্রবিদ্ শিবচন্দ্রকে। তন্ত্র সাধনার রহস্য, এবং দার্শনিক তত্ত্বের মীমাংসা তাঁহার পদপ্রান্তে বসিয়া তাঁহারা জানিয়া নিতেন।

প্রিয় শিষ্য স্যার জন উডরফ মাঝে মাঝে তাঁহার আচার্যদেবকে কলিকাতার বাসভবনে নিয়া আসিতেন, নিজের 'শক্তি' শ্রীমতী এলেন সহ ভক্তিভরে করিতেন সদ্গুরু শিবচন্দ্রের পাদপূজা। সাধনার নিগূঢ়তর ক্রিয়াগুলি উভয়ে হাতে-কলমে শিখিয়া নিতেন তাঁহার নিকট হইতে।

উডরফ তাঁহার সমধর্মী শক্তিসাধক বন্ধুদের নিয়া প্রায়ই উপস্থিত হইতেন কুমারখালিতে। নগ্নপদ, কাষায় পরিহিত, রুদ্রাক্ষ মালায় শোভিত এই ইংরেজ তন্ত্রসাধক শুধু তাঁহার গুরু শিবচন্দ্রেরই প্রিয় ছিলেন না, কুমারখালি গ্রামের বহু নরনারীর ভালোবাসা ও শুভেচ্ছা লাভেও তিনি সমর্থ হইয়াছিলেন।

সদ্গুরু শিবচন্দ্রের কৃপায় উডরফ রূপান্তরিত হইয়াছিলেন এক উচ্চকোটির শক্তিসাধকরূপে। গুরুর এই কৃপাপ্রসাদের কথা উডরফ সজলচক্ষে ভাবগদ্গদ ভাষায় প্রকাশ্যে সদাই সকলের সম্মুখে বর্ণনা করিতেন। শিবচন্দ্রের তিরোধানের পরেও সদ্গুরুর প্রতি তাঁহার এই শ্রদ্ধা, আস্থা ও কৃতজ্ঞতার এতটুকু তারতম্য দেখা যায় নাই। বসন্তকুমার পালমহাশয় উডরফের এই গুরুভক্তির একটি সুন্দর চিত্র দিয়াছেন।

স্যার জন উডরফ তখন ইংল্যাণ্ডে। কলিকাতা হাইকোর্টের অস্থায়ী প্রধান বিচারপতির পদ হইতে তিনি অবসর নিয়াছেন, লণ্ডনে অবস্থান করিয়া রত রহিয়াছেন আইন অধ্যাপনার কাজে। গুরুদেব শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব ইতিপূর্বে লোকান্তরে চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার স্মৃতির অনুধ্যান, আর তাঁহার শেখানো তন্ত্রোক্ত ক্রিয়া অনুষ্ঠান প্রভৃতিই তখন উডরফের সাধনজীবনের উপজীব্য।

রবীন্দ্রনাথ মিত্র উত্তরকালের বাংলার হোম সেক্রেটারী, উডরফের লণ্ডনস্থ বাসভবনে একবার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। এই সাক্ষাতের কাহিনী উত্তরকালে তিনি বর্ণনা করিয়াছিলেন প্রবীণ সাংবাদিক হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়ের কাছে।[১]

এসময়ে লণ্ডনে থাকিয়া শ্রীমিত্র আই. সি. এস পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। স্যার জন উডরফের কাছে তিনি আইন পড়িতেন। উডরফের স্মৃতিতে তাঁহার গুরুস্থান ভারতভূমির মাহাত্ম্য চির প্রোজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে। ভারতের প্রতিটি ধূলিকণা, প্রতিটি নরনারী তাঁহার অতি প্রিয়। উডরফ একদিন রবীন্দ্র মিত্রকে তাঁহার গৃহে আমন্ত্রণ জানাইলেন, উদ্দেশ্য—ভারতের স্মৃতি, গুরুদেবের স্মৃতি রোমন্থন করিয়া কিছুটা আনন্দ পাইবেন।

উডরফের ভবনে উপস্থিত হইয়াছে মিত্রমহাশয়। সেখানকার পরিবেশ দেখিয়া বিস্মিত ও আনন্দিত হইলেন। উডরফের ড্রয়িংরুমের চারদিকের দেওয়ালে টাঙানো কতকগুলি ভারতীয় দেবদেবীর চমৎকার চিত্র। ইঁহাদের মধ্যে রহিয়াছেন সিংহবাহিনী দশভুজা দুর্গা, গায়ত্রী দেবী, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব প্রভৃতি। আরও আছে উডরফের গুরু শিবচন্দ্র ও তাঁহার পত্নীর সুদৃশ্য ফ্রেমে আঁটা চিত্র এবং রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, চৈতন্য ও অন্যান্য মহাপুরুষদের বিস্তর ছবি।

মিত্রমহাশয় অবাক্ হইয়া এগুলি দেখিতেছেন আর তাঁহার মনে হইতেছে, এ যেন ইংল্যাণ্ডের কোনো স্থান নয়, ভারতের কোনো দেবালয়, আশ্রম বা ধর্মপ্রাণ নাগরিকের গৃহে তিনি আসিয়াছেন।

স্যার জন উডরফ শ্রীমিত্রকে সস্নেহে অভ্যর্থনা জানাইলেন। তারপর নানা কথাবার্তার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখাইতে লাগিলেন বিভিন্ন কক্ষের ফটো ও চিত্রসমূহ।

ভারতের কয়েকটি গুহাবাসী সিদ্ধ মহাত্মার ফটোও এইসব কক্ষে ঝুলানো ছিল। এগুলি দেখানোর সময় উডরফ শ্রদ্ধাভরে তাঁহার

১ তন্ত্রাচার্য শিবচন্দ্র: বসন্তকুমার পাল, হিমাদ্রি পত্রিকা, ৭ই অগ্রহায়ণ, ১৩৭৬

যুক্তকর কপালে ঠেকাইলেন, আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া কহিলেন, "এই সব পবিত্র, দুরধিগম্য সাধনগুহা এবং এইসব মহাত্মাদের আমি স্বচক্ষে দেখে এসেছি। এ পরম সৌভাগ্য আমার হয়েছিল গুরু-মহারাজ শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণবের কৃপা ও নির্দেশ পেয়ে।"

শিবচন্দ্রের কৃপায় তন্ত্রোক্ত নিগূঢ় সাধন পাইয়া জীবন তাঁহার ধন্য হইয়াছে, এবং এই সাধনার তত্ত্ব তাঁহার জীবনে দিনের পর দিন স্ফুরিত হইতেছে, একথা বলিতে গিয়া উডরফের দুই নয়ন অশ্রুসজল হইয়া উঠে, ভাবাবেগে সারা দেহ কম্পিত হইতে থাকে।

কিছুক্ষণ পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া আবার বলিতে থাকেন, "তন্ত্রসিদ্ধ, যোগসিদ্ধ আচার্যেরা প্রত্যক্ষ দর্শন ও উপলব্ধির যে সব কথা শাস্ত্রে লিখে গিয়েছেন, শিষ্য পরম্পরায় বলে গিয়েছেন, তার বাইরে আমাদের মতো সাধারণ স্তরের সাধকদের বলবার কিছুই নেই।"

গুরুদেব শিবচন্দ্রের প্রসঙ্গ আসিয়া পড়ায় আবার তাঁহার ভাবাবেগ দেখা দিল, গদ্‌গদ স্বরে কহিলেন :

"আমার মতো লোকের প্রতি গুরুদেবের ছিল অহেতুক কৃপা, তাঁর জীবিতকালে এবং তাঁর তিরোধানের পরে কত করুণালীলা আমি প্রত্যক্ষ করেছি! তাঁর যোগবিভূতির মাধ্যমে পেয়েছি কত গভীর স্নেহের স্পর্শ। কলকাতায় থাকতে যেমন তাঁর দর্শন ও সাহায্য পেয়েছি, তেমনি লণ্ডনে এসেও তা পেয়ে ধন্য হচ্ছি।

"গুরুদেব একবার স্বপ্নে আমায় দেখা দিয়ে কতকগুলো গুহ্য তান্ত্রিক রহস্য বুঝিয়ে দিলেন। বললেন,—'গুরুর মনুষ্যদেহের বিনাশ হলেও শিষ্যের ওপর গুরুশক্তির ক্রিয়া সমভাবেই বর্তমান থাকে, সকল অপবিত্রতা ও অমঙ্গল থেকে তাকে রক্ষা করে।'

"আমার জীবনে তখন এক বিরাট সংকট চলেছে, গুরুদেব নশ্বর দেহ ত্যাগ ক'রে আমার দৃষ্টির সম্মুখ থেকে অন্তর্হিত হয়েছেন। অন্তরে দিনরাত চলছে শোকের আর্তি। এ সময়ে একদিন কলকাতার হাইকোর্ট বেঞ্চে একটি গুরুতর এবং জটিল মামলা চলছে। আইনের বহু কূট তর্ক উঠেছে এবং বহু চেষ্টাতেও কোনো

স্থির সিদ্ধান্তে আমি পৌঁছুতে পারছিনে। দেহ মন ক্লান্তিতে নৈরাশ্যে মুহ্যমান, অসাড় হয়ে পড়েছে। এমন সময়ে দেখতে পেলাম বিদেহী গুরুমহারাজের আবির্ভাব। তাঁর আত্মিক স্পর্শে সঙ্গে সঙ্গে মন বুদ্ধি সতেজ ও স্বচ্ছ হয়ে উঠল, মামলাটির সম্পর্কে স্থির সিদ্ধান্তে এসে পড়লাম অচিরে।

"তাছাড়া, কলকাতায় ও লণ্ডনে বার বার তাঁর বিদেহী আত্মার স্নেহ স্পর্শ পেয়েছি ঘুমন্ত অবস্থায়, স্বপ্নযোগে। যখন যে সব দুশ্চিন্তা ও সংকটে মুষড়ে পড়তাম, তখনি স্বপ্নে প্রত্যাদেশ পেতাম তাঁর কাছ থেকে। কর্তব্য ও কর্মপন্থা সেই মুহূর্তে সহজ সরল হয়ে উঠতো।

"একবার কলকাতার হাইকোর্টে আমার এজলাসে প্রকাণ্ড ও একটি জটিল মামলা চলছে। প্রধান সাক্ষীরা সুচতুর এবং অতিমাত্রায় অসৎ। তারা বিভ্রান্ত করতে চাচ্ছিল বিচারপতিকে। তাঁদের কথা-বার্তা সতর্কভাবে শুনছি, চোখ মুখের ভাব তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে লক্ষ্য করছি। কিন্তু সত্য উদ্‌ঘাটনের কোনো পথই খুঁজে পাচ্ছিনে। একবার সন্দিগ্ধ মনে একটি সাক্ষীর দিকে তাকিয়ে তার কথার প্রকৃত সত্যতা অনুধাবন করতে চাচ্ছি, এমন সময়ে সহসা আমার দৃষ্টি পড়ল কোর্টের দেওয়ালের দিকে। দেখলাম—বিদেহী গুরুমহারাজের জ্যোতির্ময় মূর্তিটি আকারিত হয়ে উঠেছে সেখানে। গুরুমূর্তি দর্শনে তৎক্ষণাৎ মনে মনে নিবেদন করলাম আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম। গুরুদেবের চোখে মুখে প্রসন্নতা ফুটে উঠেছে। দক্ষিণ হাত উত্তোলন ক'রে অস্ফুটস্বরে বলে উঠলেন, 'কল্যাণমস্তু'। দিবালোকে প্রকাশ্য আদালত কক্ষের দেওয়ালে বিদেহী গুরুজীর এ এক মহনীয় এবং অকল্পনীয় আবির্ভাব। মন প্রাণ আমার আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে সাক্ষীদের জবানবন্দীর প্রকৃত অর্থ ও উদ্দেশ্যও স্বচ্ছ হয়ে উঠল আমার দৃষ্টিতে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলাম।

"শুধু ব্যবহারিক কাজকর্মেই নয়, আত্মিক সাধনার ক্ষেত্রেও বিদেহী সদ্‌গুরুর স্নেহময় হাতটিকে প্রসারিত দেখেছি বার বার। সেবার বাড়িতে বসে গভীর রাতে একটা বড় জটিল মামলার রায়

লিখছি। হঠাৎ দেখলাম, জ্যোতির্ময় তান্ত্রিক ভৈরবের বেশে, ত্রিশূল হস্তে, গুরুদেব কক্ষমধ্যে অদূরে দাঁড়িয়ে আছেন, নয়ন থেকে ঝরে পড়ছে দিব্য আনন্দের আভা। ঐ মূর্তির উদ্দেশে করজোড়ে প্রণাম নিবেদন করলাম। দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন ক'রে, বরাভয় দিয়ে, তিনি বললেন, 'কল্যাণমস্তু'। তৎক্ষণাৎ কক্ষমধ্যে ফুটে উঠল এক অত্যাশ্চর্য অতীন্দ্রিয় দৃশ্য। গুরুদেবের এ মূর্তিটি পরিণত হল অসংখ্য জ্যোতিঃঘন মূর্তিতে, সারা কক্ষটি তাতে একেবারে পূর্ণ হয়ে উঠল। বিস্ময় বিস্ফারিত নয়নে যেদিকে তাকাই, সেদিকেই দেখি ঐ মূর্তি। দিব্য আনন্দে আমি অধীর হয়ে উঠলাম, নয়ন বয়ে ঝরতে লাগল পুলকাশ্রু। নয়ন মুছে, ভাবাবেগ সংবরণ ক'রে, যখন কক্ষের চারদিকে তাকিয়ে দেখছিলাম, তখনো আমার চোখে পড়ছিল ঐসব দিব্যমূর্তি। এমনি অপার ও অহেতুকী ছিল আমার সদ্‌গুরু শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণবের করুণা।"

জীবনের শেষ তিনটি বৎসর শিবচন্দ্র কুমারখালিতেই অতিবাহিত করিয়াছেন ; সহজে এস্থান ত্যাগ করিতে চাহিতেন না। ইষ্টদেবী সর্বমঙ্গলার পূজা ও ধ্যানে অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হইত, এক-একদিন সারা রাত্রিই কাটিয়া যাইত দিব্য ভাবাবেশে। মাতৃসাধক রূপান্তরিত হইতেন মায়েরই এক শিশুরূপে।

অনেক সময় দেখা যাইত, ভাবাবিষ্ট শিবচন্দ্র নিবিষ্ট মনে মা-সর্বমঙ্গলার সহিত কত কথাবার্তা বলিতেছেন, কত আদর আব্‌দার করিতেছেন। ইষ্টদেবী ও ভক্তের এই লীলাখেলার মধ্যে হঠাৎ এক এক সময়ে শিবচন্দ্র ভাবাবেশে প্রমত্ত হইয়া উঠিতেন, পার্শ্বে উপবিষ্ট অন্তরঙ্গ ভক্ত সাধকদের ডাকিয়া বলিতেন, "ঐ ছাখো, মা আমার জ্যোতির ছটায় মণ্ডপ আলো ক'রে সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন আর প্রসন্ন মধুর হাসি হাসছেন। নাও, দেখে নাও তোমরা প্রাণভরে আমার মা'কে।"

শিবচন্দ্রের আহ্বানে জাগ্রতা হইয়া উঠিতেন ইষ্টদেবী সর্বমঙ্গলা।

শুধু তাঁহারই নয়ন সমক্ষেই মা দাঁড়াইতেন তাহা নয়, শিবচন্দ্রের স্নেহভাজন ভক্ত সাধকদের কাছেও হইতেন প্রত্যক্ষীভূত। এভাবে মাতৃদর্শনের দিব্য সুধা শিবচন্দ্র পরমানন্দে বিলাইয়া দিতেন স্বগণদের মধ্যে। তাই ভক্তদের অনেকে কৃপালু গুরুদেবকে অভিহিত করিতেন, 'সদাশিব' নামে।

কুমারখালির কাছাকাছি গ্রাম তেবাড়িয়া। এই গ্রামের নেপালচন্দ্র সাহা ছিলেন শিবচন্দ্রের অন্যতম ভক্ত। সেবার নেপালের ভ্রাতুষ্পুত্র নীরদ এক প্রাণঘাতী ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়াছে, শহর হইতে খ্যাতনামা ডাক্তারদের আনা হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহাদের চিকিৎসায় রোগী নিরাময় হয় নাই। সংকট দিন দিন ঘনাইয়া আসিতে লাগিল।

নেপাল শিবচন্দ্রের কাছে ছুটিয়া আসিলেন। কাঁদিয়া কহিলেন, "বাবা ঠাকুর, আমার ভাইপো নীরদের জীবনের কোনো আশা নেই। আপনি একবার চলুন, কৃপা ক'রে তার প্রাণ ভিক্ষা দিন।"

শিবচন্দ্র মা সর্বমঙ্গলার ধ্যানে আবিষ্ট। কহিলেন, "নেপাল, আমি তাঁর শরণ নিয়ে পড়ে আছি, তাঁর মুখ চেয়ে আছি, তুমি সেই বেটিকে ডাকো। সৃষ্টিস্থিতি লয়ের যে তিনিই কর্ত্রী।"

"বাবা, আমরা পাপী-তাপী মানুষ তাঁকে তো আমরা চিনিনে, চিনি শুধু আপনাকেই। যা করবার আপনি করুন, বা আপনার মাকে দিয়ে করান।"

"ব্রহ্মময়ীর সুধাসমুদ্রে ক্ষুদ্র সফরীর মতো আমি ভেসে বেড়াচ্ছি। আমার সামর্থ্য কতটুকু বল।"

"সে সব কথা আমি বুঝিনে, বাবা। এইতো সেদিন পাঁচুপুরের জমিদার নিকুঞ্জবাবু মারাত্মক অসুখে ভুগে মরতে বসেছিলেন, আপনিই তো কৃপা ক'রে তাঁর প্রাণরক্ষা করলেন।"

"ঠিকই বলেছো, নেপাল, কিন্তু সেটা আমি করি নি। করেছেন আমার ঐ মা বেটি। তাঁর প্রত্যাদেশ পেয়েছিলাম, তাই তো অসম্ভব সম্ভব হল, নিকুঞ্জ বেঁচে উঠল।"

"আপনি সংকল্প করলে মা তা সিদ্ধ করবেন না, তাকি কখনো

হতে পারে ? না বাবাঠাকুর, আপনি আমার নীরদকে এবার বাঁচান। আমার ছোটভাই যখন মৃত্যুশয্যায় শুয়ে, তখন তার এই ছেলেকে আমার হাতে সঁপে দিয়েছিল। ছেলেটি আমার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়। একে যদি বাঁচাতে না পারি আপনার সর্বমঙ্গলা মায়ের দুয়ারে আমি আত্মঘাতী হবো।"

কথা কয়টি বলার সঙ্গে সঙ্গে নেপাল সাহা হাউমাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠেন, খড়মসহ আচার্যবর শিবচন্দ্রের পাদুটি সবলে জড়াইয়া ধরেন। নীরবে কিছুকাল দাঁড়াইয়া থাকার পর শিবচন্দ্র মৃদুস্বরে বলেন, "এ ছেলের বড় দুটি ভাইও তো এই একই বয়সে, একই রোগে মারা গিয়েছে। কি বল, নেপাল, তাই না ?"

"আজ্ঞে হাঁ, আপনি অন্তর্যামী, আপনার অজানা তো কিছু নেই। ডাক্তারেরা বলছেন, এ রোগ কোনোমতে সারানো সম্ভব নয়। আর তাই শুনে বাড়ির মেয়েরা কান্নায় ভেঙে পড়েছে।"

"হুঁ, এ যে মহাকালের ডাক। এ রোগীকে ফিরিয়ে আনা বড়ই কঠিন।"

"বাবাঠাকুর, মা সর্বমঙ্গলার দোহাই, আপনি এ ছেলেকে প্রাণ ভিক্ষা দিন।"

নিঃশব্দে, গম্ভীর মুখে মায়ের পূজা-মণ্ডপে গিয়া শিবচন্দ্র দ্বার রুদ্ধ করেন। দীর্ঘ সময় ইষ্টদেবীর সম্মুখে বসিয়া হন ধ্যানস্থ। তারপর দুয়ার খুলিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়ান, বলেন, "চল নেপাল। মায়ের সঙ্গে আমি কথা বলে নিয়েছি, তোমার বাড়িতে গিয়ে করতে হবে পূজা, হোম ও তন্ত্রোক্ত অভিচার। কিন্তু, এ যে কালব্যাধি, এর অভিচারের ফল অভিচারকারীর পক্ষে ভালো হবে না। আমাকে এজন্য দণ্ড গ্রহণ করতে হবে, নেপাল। খণ্ডন করতে হবে নিজের আয়ু। যাক্, হতভাগ্য পিতৃহীন ছেলেটা তো বাঁচুক।"

রোগীর ভবনে পৌঁছিয়াই শিবচন্দ্র শুরু করিয়া দিলেন দেবীর পূজা, হোম ও অভিচারের ক্রিয়া। কক্ষের দ্বার বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। ভিতরে শুধু রহিলেন শিবচন্দ্র, তাঁহার তন্ত্রধার এবং মুমূর্ষু

রোগী নীরদ। শেষ রাত্রে সকল কিছু অনুষ্ঠান সমাপ্ত হইলে শিবচন্দ্র পরিবারস্থ সবাইকে নিকটে আহ্বান করিলেন। ভাবাবিষ্ট স্বরে কহিলেন, "তোমাদের আর কোনো ভয় নেই, মায়ের কৃপা হয়েছে। নীরদ এবার বেঁচে গেল।"

বলা বাহুল্য, সেই দিনই রোগীর সংকট কাটিয়া যায় এবং অল্প কয়েকদিনের মধ্যে সে সুস্থ হইয়া উঠে। ইহার পর দীর্ঘ পরমায়ু নিয়া সে সংসারধর্ম পালন করিতে থাকে।

তিন মাস পরের কথা। মা সর্বমঙ্গলার ভবনটির সংস্কার ও মেরামতের কাজ চলিতেছে। মিস্ত্রীরা নানা আবর্জনার সঙ্গে কয়েকটা তীক্ষ্ণ বাঁশের খণ্ড আঙিনায় ফেলিয়া গিয়াছে। শিবচন্দ্র নগ্নপদে সেখান দিয়া চলিতেছিলেন, হঠাৎ একটি তীক্ষ্ণ বাঁশের ফলা তাঁহার পায়ে বিদ্ধ হয়, প্রচুর রক্ত ক্ষরণ হইতে থাকে।

পরের দিনই গোটা পা ফুলিয়া উঠে এবং শুরু হয় অসহ্য যন্ত্রণা। স্থানীয় ডাক্তারেরা অভিমত দেন, ক্ষতস্থানটি বিষাক্ত হইয়া উঠিয়াছে, অবিলম্বে শিবচন্দ্রকে কলিকাতার হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা দরকার। আধুনিকতম ইনজেকশান ও ঔষধাদি ছাড়া এ রোগীকে বাঁচানো যাইবে না।

এ সংবাদ কলিকাতায় পৌঁছানো মাত্র উডরফ এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ভক্তেরা তৎক্ষণাৎ চিকিৎসার সব ব্যবস্থা করিয়া ফেলিলেন। স্থির হইল, একটি আধুনিক বড় হাসপাতালের ক্যাবিনে, কোনো খ্যাতনামা সার্জনের চিকিৎসাধীনে শিবচন্দ্রকে রাখা হইবে।

কিন্তু গোল বাধাইলেন শিবচন্দ্র নিজে। শান্ত দৃঢ় স্বরে তিনি কহিলেন, "তোমরা অনর্থক হৈ চৈ ক'রো না। ডাক এসে গিয়েছে, মায়ের কোলে এবার আমায় ফিরতে হবে। এ কটা দিন নিভৃতে, একান্তে বসে, মা সর্বমঙ্গলার শ্রীমুখ আমি দর্শন করবো, তাঁর নামসুধা রসে মত্ত হয়ে থাকবো। অন্তিম সময়ে কুমারখালির এই মাটি, মায়ের মন্দির আর সিদ্ধাসন ছেড়ে আমি কোথাও যাবো না।"

অগত্যা ভক্তগণ কুমারখালি গ্রামেই যথাসাধ্য সুচিকিৎসার বন্দোবস্ত করিলেন। পায়ে অস্ত্রোপচার করিতে হইবে, সার্জন ও তাঁহার সহকারীরা তৈরী হইলেন, এনাস্থেশিয়া দিয়া রোগীকে অচেতন করিবার জন্য। শিবচন্দ্র হাসিয়া বলিলেন, "এত হাঙ্গামায় কি দরকার? এমনিতেই অস্ত্রোপচার শেষ ক'রে ফেলুন।"

ঘণ্টাখানেক ধরিয়া কাটাকুটি ও ড্রেসিং চলিল, মহাপুরুষ দিব্য ভাবে আবিষ্ট হইয়া রহিলেন, মুখ দিয়া একটি কাতরোক্তিও বাহির হইল না।

কয়েক দিনের মধ্যেই দেখা দিল চরম সংকট, চিকিৎসক ও সেবকেরা বুঝিলেন, তাঁহাদের এত কিছু সেবা যত্ন সবই এবার ব্যর্থ হইতে যাইতেছে। রোগীকে আর বাঁচানো সম্ভবপর নয়। শুধু সর্বমঙ্গলার মন্দিরে নয় সারা কুমারখালি গ্রামে নামিয়া আসে আসন্ন শোকের কৃষ্ণছায়া।

১৩২০ সালের ১১ই চৈত্র। চতুর্দশীর তিথিটি পূর্বদিন অতিক্রান্ত হইয়াছে। শিবচন্দ্রের শয্যার পাশে পত্নী, পরিজন ও ভক্তশিষ্যেরা বিষণ্ণ বদনে দাঁড়াইয়া আছেন। অনেকেই অশ্রুমোচন করিতেছেন।

শিবচন্দ্র কহিলেন, "কাঁদবার সময় তোমরা অনেক পাবে, সে সব পরে হবে। অমাবস্যা পড়ে গিয়েছে, আর মোটেই দেরি ক'রো না, মা সর্বমঙ্গলার পুজো যথারীতি সম্পন্ন ক'রে ফেল।"

পূজা সাঙ্গ হইলে কহিলেন, "এবার সবাই মিলে আমায় ধরাধরি ক'রে বাইরে বিল্বমূলে নিয়ে শুইয়ে দাও।"

শিবচন্দ্রের নির্দেশ মতো, তাঁহার পরমপ্রিয় বানলিঙ্গটি আনিয়া রাখা হইল তাঁহার বক্ষোদেশে। আর ইষ্টবিগ্রহ সর্বমঙ্গলাকে স্থাপন করা হইল অদূরে, নয়ন সমক্ষে।

মা সর্বমঙ্গলার দিকে স্থির দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া মহাসাধক উচ্ছ্বসিত স্বরে ডাকিয়া উঠেন, "মা—মা, তারা, তারা—ব্রহ্মময়ী।" বজ্রকঠোর সিদ্ধকৌল শিবচন্দ্র এবার যেন মায়ের কোলের, আদরের শিশুটি হইয়া গিয়াছেন। মা সর্বমঙ্গলার মুখপদ্ম ধ্যান করিতে করিতে

তাঁহার বদনমণ্ডলে ছড়াইয়া পড়ে দিব্য জ্যোতির আভা। তারপর নয়ন দুটি ধীরে ধীরে নিমীলিত হইয়া আসে, ব্রহ্মময়ীর আদরের দুলাল, মাতৃমন্ত্রের সিদ্ধসাধক শিবচন্দ্র মরদেহ ত্যাগ করেন। ভারতের কৌল সাধনার আকাশ হইতে স্খলিত হয় একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক।

স্বামী অভেদানন্দ

স্বামী অভেদানন্দ ছিলেন ঠাকুর রামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ লীলা-পার্ষদ, তাঁহার তত্ত্বের ধারক বাহক এবং রামকৃষ্ণ মণ্ডলীর অন্যতম নেতা। অধ্যাত্ম-শিল্পী শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্য হস্তের স্পর্শে নূতন মানুষে রূপান্তরিত হন তিনি, ত্যাগ তিতিক্ষাময় তপস্যা, মনীষা, শাস্ত্রজ্ঞান ও তত্ত্বোজ্জ্বলা বুদ্ধির দীপ্তিতে ভাস্বর হইয়া উঠে তাঁহার সাধনজীবন। এই জীবনের আলোয় আলোকিত হইয়া উঠে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের শত শত মুমুক্ষু নরনারী

দীর্ঘ পঁচিশ বৎসরকাল বিস্ময়কর নিষ্ঠা ও কুশলতা নিয়া গুরু রামকৃষ্ণের বাণী ও বেদান্তের পরমতত্ত্ব প্রচার করেন অভেদানন্দ। পূর্বসূরী ও গুরুভ্রাতা বিবেকানন্দ আমেরিকা ও ইউরোপের জন-মানসের সম্মুখে হিন্দুধর্মের শাশ্বত রূপটি তুলিয়া ধরেন, সৃষ্টি করেন অদ্বৈত বেদান্তের তত্ত্ব ও আদর্শের ভাবতরঙ্গ। অভেদানন্দ এই তরঙ্গকে আমেরিকার দিকে দিকে ছড়াইয়া দেন, নবসৃষ্ট আন্দোলনকে দাঁড় করান সুদৃঢ় ভিত্তিতে। মাতৃভূমি ভারতের ও ভারত-ধর্মের এক উজ্জ্বল ভাবমূর্তি তিনি সেখানে গড়িয়া তোলেন। ভারতের ধর্ম-সংস্কৃতির ইতিহাসের পক্ষে তাই প্রবর্তক ও আচার্য অভেদানন্দকে কোনোদিন বিস্মৃত হইবার উপায় নাই।

অভেদানন্দের পিতা রসিকলাল চন্দ্র ছিলেন প্রখ্যাত ওরিয়েন্টাল সেমিনারীর কৃতী শিক্ষক। সৎ এবং বিদ্বান্ বলিয়া লোকে তাঁহাকে সম্মান করিত। জননী নয়নতারার চরিত্রে ধর্মভাব খুব প্রবল ছিল, কালীঘাটের মন্দিরে প্রায়ই তিনি পূজা দিতে যাইতেন, দেবীর কাছে প্রার্থনা জানাইতেন একটি ধার্মিক পুত্রের জন্য। দেবী তাঁহার সে প্রার্থনা পূর্ণ করেন—১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের ২রা অক্টোবর তাঁহার অঙ্কে

আবির্ভূত হয় এক প্রিয়দর্শন শিশুপুত্র। দেবীর কৃপায় জন্ম, তাই এ শিশুর নাম রাখা হয়, কালীপ্রসাদ।

কিশোর বয়স হইতেই কালীপ্রসাদের জীবনে দেখা যায় বুদ্ধিমত্তা ও মেধা প্রতিভার বিকাশ। ক্লাসের পরীক্ষায় প্রায়ই ভালো ফল করিতেন, এবং পারিতোষিক ইত্যাদি পাইতেন। অল্প দিনের মধ্যেই বাংলা, সংস্কৃত ও ইংরেজীতে তাঁহার অধিকার জন্মে, জিজ্ঞাসু তরুণ বহুতর গ্রন্থ এসময়ে পড়িয়া ফেলেন।

উইলসনের রচিত ভারতের ইতিহাসে আচার্য শঙ্করের কথা পাঠ করিলেন কালীপ্রসাদ। অদ্বৈত বেদান্তে দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিত ছিলেন শঙ্কর। কালীপ্রসাদের মনে জাগিয়া উঠে উদ্দীপনা, ভাবেন, বড় হইয়া এমনি দুর্ধর্ষ পণ্ডিত ও দার্শনিক তিনি হইবেন।

অনুসন্ধিৎসা ও অধ্যয়নের উৎসাহ ছিল তাঁহার প্রচুর। তাই এই বয়সেই জন স্টুয়ার্ট মিলের রচনা, এবং হের্সেল, গ্যানো, লুইস হ্যামিলটন প্রভৃতির বইএর সহিত তাঁহার পরিচয় ঘটিয়াছে। এই সঙ্গে কালিদাসের রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, শকুন্তলা এবং ভট্টিকাব্যের অধ্যয়নও চলিয়াছে। বুঝুন আর না-ই বুঝুন গোপনে গীতা অধ্যয়ন করিতে থাকেন, এ গ্রন্থের তত্ত্ব আয়ত্ত করিতে প্রয়াসী হন।

বাংলার দিকে দিকে তখন প্রাণের স্পন্দন দেখা যাইতেছে। রাজনীতি, ধর্ম এবং সংস্কার আন্দোলনের প্রবক্তারা কলিকাতার পার্কে পার্কে জ্বালাময়ী ভাষণ দিয়া বেড়াইতেছেন। আর তরুণেরা সব মাতিয়া উঠিয়াছেন, দলে দলে যোগ দিতেছেন এই সব সভায়। কালীপ্রসাদও সুযোগ পাইলেই কোনো কোনোটিতে গিয়া উপস্থিত হন, তরুণ চিত্ত নূতন স্বপ্ন নূতন উদ্দীপনায় উচ্ছল হইয়া উঠে।

অ্যালবার্ট হলে এসময়ে প্রসিদ্ধ ধর্মবক্তা শশধর তর্কচূড়ামণি পাতঞ্জলির যোগসূত্র ও যোগসাধনা সম্বন্ধে ভাষণ দিতেছিলেন। কালীপ্রসাদ এই ভাষণ শুনিয়া উৎসাহিত হইয়া উঠেন। স্কুলের জলখাবারের পয়সা জমাইয়া কিনিয়া ফেলেন একখণ্ড পাতঞ্জল দর্শন। কিন্তু এবয়সে ঐ কঠিন দর্শনতত্ত্ব বুঝিবার ক্ষমতা তাঁহার কই?

ভাবিয়া চিন্তিয়া শশধর তর্কচূড়ামণির সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন, "কহিলেন, আপনি যদি দয়া ক'রে এ বইএর সূত্রগুলি আমায় বুঝিয়ে দেন, তবে আমি কৃতার্থ হই।"

তর্কচূড়ামণি খুশী হইয়া উঠেন, বলেন, "বাবা, এ বয়সে তোমার যোগসূত্র পাঠ করার ইচ্ছে হয়েছে, এতে আমি খুব আনন্দ বোধ করছি। আমার সময় থাকলে অবশ্যই তোমায় আমি সাহায্য করতাম। কিন্তু বক্তৃতার কাজ নিয়ে সদাই আমি ব্যস্ত, তার ওপর এত লোকজনের সঙ্গে দেখাশুনা করতে হচ্ছে। আমার হাতে যে সময় নেই।"

কালীপ্রসাদ ক্ষুণ্ণ মনে ফিরিয়া আসিতেছেন, এমন সময়ে শশধর তর্কচূড়ামণি কহিলেন, "বাবা, তুমি এক কাজ করো। কালীবর বেদান্তবাগীশের কাছে যাও। আমার নাম ক'রে তাঁকে বল, তিনি নিশ্চয় রাজী হবেন।"

কালীবরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলে তিনি কহিলেন, "তোমার মতো ছোট ছেলেদের এ ইচ্ছে হয়েছে, এতো খুব ভালো কথা। কিন্তু আমি যে এসময়ে পাতঞ্জল দর্শনের বাংলা অনুবাদ করছি। সময়ের বড় অভাব। তা হোক, বাবা, তুমি এক কাজ করো, স্নানের আগে রোজ একটি সেবক বেশ কিছুকাল আমায় তেল মাখায়। রোজ সে সময়ে তুমি এসো, কিছু কিছু সূত্র আমি তোমায় বুঝিয়ে দেবো।"

কালীপ্রসাদ তাহাতেই রাজী। কিছুদিন বেদান্তবাগীশের বাড়িতে যাতায়াত করিতে লাগিলেন।

ইতিমধ্যে 'শিবসংহিতা' তিনি পাঠ করিয়াছেন। হঠযোগ, প্রাণায়াম ও রাজযোগের পদ্ধতি এ গ্রন্থে বর্ণিত রয়েছে। কালী-প্রসাদ এসব আয়ত্ত করার জন্য মহাব্যগ্র। কিন্তু শুধু বই পড়িয়া তো কোনো কাজ হইবে না, এই ধরনের সব বইএতেই লেখা রহিয়াছে—সিদ্ধগুরুর সাহায্য ছাড়া যোগসাধন সম্ভব নয়।

যোগীগুরু কোথায় পাওয়া যায়? কালীপ্রসাদের অন্তরে

কেবলি উঁকিঝুঁকি মারিতে থাকে এই প্রশ্নটি। অনেকের কাছে এ সম্বন্ধে খোঁজখবরও নিতে থাকেন।

তাঁহার ব্যগ্রতা দেখিয়া সহপাঠী এক বন্ধু কহিলেন, "ভাই, আমি কিন্তু এক সিদ্ধপুরুষের কথা জানি। খুব বড় যোগী, দক্ষিণেশ্বরে রানী রাসমণির কালীবাড়িতে থাকেন। তাঁর কোনো ভণ্ডামী নেই। শুনেছি, শহরের গণ্যমান্য লোকেরা তাঁর কাছে যাতায়াত করেন। গেলে হয়তো তোমার মনের ইচ্ছা পূর্ণ হতে পারে।"

অতঃপর একদিন কালীপ্রসাদ পায়ে হাঁটিয়া দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে গিয়া উপস্থিত। ঠাকুর রামকৃষ্ণ তখন সেখানে নাই, কলিকাতায় এক ভক্তের গৃহে গিয়াছেন।

ঠাকুরের আর এক তরুণ ভক্ত শশী সেখানে উপস্থিত। পূর্বে সে আরো দুই-চারবার ঠাকুরের কাছে আসিয়াছে। কালীপ্রসাদকে সে উৎসাহিত করিয়া বলিল, "এসো, এবেলা এখানে মায়ের প্রসাদ খেয়ে আমরা অপেক্ষা করি। পরমহংসদেব রাত্তিরে ফিরবেন। তখন তুমি তাঁকে দর্শন ক'রো, তোমার মনের কথা খুলে ব'লো।

রাত্রে বাড়িতে ফেরা হইবে না, ফলে মা এবং বাবা দুশ্চিন্তায় থাকিবেন। কালীপ্রসাদ ভাবিত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু শশী তাঁহাকে সাহস দিল, "আমার তো এরকম মাঝে মাঝেই হয়, দক্ষিণেশ্বরে এসে আর কলকাতায় ফেরা হয় না। বাড়িতে সবাই ভেবে অস্থির হন। তা কি আর করা যাবে, বল। সাধু দর্শনে এসে, শেষদর্শন না ক'রে তো ফেরা ঠিক নয়।"

কালীপ্রসাদ অপেক্ষা করিল। গভীর রাত্রে পরমহংসদেব ফিরিয়া আসিলেন। গাড়ি হইতে নামিয়াই প্রবেশ করিলেন নিজের কক্ষে।

কিছুক্ষণের মধ্যে ঠাকুর কালীপ্রসাদকে কাছে ডাকাইয়া নিলেন। ভক্তিভরে প্রণাম সারিয়া নিয়া কালীপ্রসাদ সম্মুখস্থ একটি মাদুরের উপর বসিলেন নির্নিমেষে চাহিয়া রহিলেন গৌরকান্তি সৌম্যদর্শন এই মহাপুরুষের দিকে।

স্নিগ্ধস্বরে ঠাকুর রামকৃষ্ণ প্রশ্ন করিলেন, "তুমি কতদূর পড়েছো ?"

কালীপ্রসাদ উত্তর দিলেন, "আজ্ঞে, এণ্ট্রান্স ক্লাসে পড়ছি।"

"সংস্কৃত জানো ? কোন্ কোন্ শাস্ত্র পড়েছো।"

"রঘুবংশ, কুমারসম্ভব এসব কাব্য, আর গীতা, পাতঞ্জল দর্শন, শিবসংহিতা পড়া হয়েছে।"

"বেশ, বেশ।" বলিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ কালীপ্রসাদকে আশীর্বাদ জানাইলেন। তারপর উত্তরের বারান্দায় ডাকিয়া নিয়া গিয়া নিভৃতে সম্পন্ন করিলেন একটি বিশেষ ধরনের অলৌকিক ক্রিয়া। উত্তরকালে স্বামী অভেদানন্দ এ ঘটনাটির প্রামাণ্য বিবরণ নিজের আত্মজীবনীতে লিখিয়া গিয়াছেন :

—আমি যোগাসনে উপবিষ্ট হইলে পরমহংসদেব আমায় জিহ্বা বাহির করিতে বলিলেন। আমি জিহ্বা বাহির করিলে তিনি তাঁহার দক্ষিণহস্তের মধ্যমাঙ্গুলির দ্বারা জিহ্বায় একটি মূলমন্ত্র লিখিয়া শক্তি সঞ্চার করিলেন এবং তাঁহার দক্ষিণহস্ত দ্বারা বক্ষঃস্থলের উর্ধ্বদিকে শক্তি আকর্ষণ করিয়া মা কালীর ধ্যান করিতে বলিলেন। আমি তাহাই করিলাম। গভীর ধ্যানে মগ্ন হইয়া সমাধিস্থ হইয়া কাষ্ঠবৎ অবস্থান করিতে লাগিলাম এবং এক অপূর্ব আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলাম। তখন জগতের সমস্ত বিষয় ভুল হইয়া গেল। এইভাবে কতক্ষণ ছিলাম জানি না।

—কিছুক্ষণ পরে পরমহংসদেব আমার বক্ষঃস্থলে হস্ত দিয়া কুণ্ডলিনীশক্তি নিম্নদিকে নামাইয়া আনিলেন। তখন আমার বাহ্য-চৈতন্য ফিরিয়া আসিল এবং অপূর্ব নির্মল এক আনন্দস্রোতে সমগ্র শরীর পূর্ণ হইয়া গেল।

—আমার সেই অবস্থা দেখিয়া পরে রামলালদাদা ও গোপালমা বলিয়াছিলেন : "কি আশ্চর্য! তোমাকে স্পর্শ করামাত্র তুমি কাষ্ঠবৎ ধ্যানমগ্ন হয়ে গিয়েছিলে।" যাহা হউক, আমি গভীর ধ্যানে কি অনুভব করিয়াছিলাম পরমহংসদেব সস্নেহে আমায় জিজ্ঞাসা করিলে

আমি সমস্তই তাঁহাকে বলিলাম। তিনি শুনিয়া আনন্দে হাসিতে লাগিলেন।

তাহার পর জিজ্ঞাসা করিলেন: "তোমার কি বিবাহ করবার ইচ্ছা আছে?" আমি বলিলাম: "না।" তখন পরমহংসদেব বলিলেন: "তুমি বিবাহ ক'রো না।" তাহার পর কিরূপে ধ্যান করিতে হয় তাহা তিনি শিক্ষা দিয়া বলিলেন:

শুচি অশুচিরে লয়ে দিব্য ঘরে কবে শুবি।
দুই সতীনে পিরীত হ'লে তবে শ্যামা মাকে পাবি॥"

উত্তরকালে অভেদানন্দ বলিতেন, "ঠাকুরের এই পদ দু'টির হেঁয়ালীর অর্থ সেদিন বুঝতে পারি নি, পরে বুঝেছিলাম। শুচি ও অশুচি, ভালো ও মন্দ এই দুইয়ের পার্থক্য জ্ঞান বজায় থাকিলে অভেদ জ্ঞান স্ফুরিত হয় না, মায়াতীত হইয়া সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের পূর্ণ উপলব্ধিও সম্ভব হয় না।"

এভাবে শক্তি সঞ্চারিত করার পর শ্রীরামকৃষ্ণ কহিলেন, "রোজ রাতে নিজের বিছানায় বসে ধ্যান করবে, ধ্যানে দর্শনাদি হবে। সে সব এখানে এসে আমায় বলে যেয়ো। এবার যাও কালীমন্দিরে গিয়ে ধ্যানে বসো।"

ধ্যান শেষে ফিরিয়া আসিলে ঠাকুর সস্নেহে কালীপ্রসাদকে কিছু মিষ্টান্ন প্রসাদ খাইতে দিলেন।

এবার তাঁহার কলিকাতায় ফেরার পালা। ঠাকুর মৃদুমধুর স্বরে কহিলেন, "আবার এখানে এসো।" এই সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে আসবার পথঘাট, শেয়ারে কি করিয়া আসা যায়, এসব সুন্দর রূপে বুঝাইয়া দিলেন।

কালীপ্রসাদ সরল তরুণ, প্রশ্ন করিলেন, "যদি ভাড়া যোগাড় না করতে পারি তবে কি হবে?"

ঠাকুর আশ্বাস দিয়া বলেন, "যাহোক ক'রে এসে পড়বে, তারপর এখান থেকে তোমার যাতায়াতের ভাড়াটা যোগাড় ক'রে দেওয়া যাবে।"

একটি ধনী ভক্ত এ সময়ে নিজের গাড়িতে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে আসিয়াছেন ঠাকুরকে দর্শনের জন্য। তিনি ফিরিবার সময় তাঁহারই গাড়িতে কালীপ্রসাদকে ঠাকুর উঠাইয়া দিলেন।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের এই স্নেহস্নিগ্ধ মূর্তি, এই সুধাময় বাক্যের স্মৃতি, বার বার উঁকি দিতে থাকে তরুণ ভক্ত কালীপ্রসাদের মনের দুয়ারে। এই স্মৃতির মধুর রসে সারা অস্তিত্ব তাঁহার রসায়িত হইয়া উঠে।

এদিকে কালীপ্রসাদের জনক-জননী দুশ্চিন্তায় অস্থির হইয়া উঠিয়াছেন। সারাটা দিন রাত কাটিয়া গেল, তবুও ছেলের কোনো খোঁজ নাই। তবে কি সে গঙ্গায় ডুবিয়া মরিয়াছে, অথবা কোনো দুর্ঘটনায় পড়িয়াছে? চারদিকে বহু খোঁজাখুঁজি করিয়াও পুত্রের সন্ধান পাওয়া গেল না।

পরদিন প্রভাতে হঠাৎ নয়নতারা দেবীর মনে পড়িয়া যায়, কয়েকদিন আগে কালীপ্রসাদ তো তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়াছিল দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ি কোথায়, কলিকাতা হইতে কতটা দূরে? ধর্মের দিকে যে পুত্রের প্রবল ঝোঁক, একথা জননীর অজানা নাই, ভাবিলেন হয়তো কাহারো সঙ্গে সে দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরেই গিয়াছে, কোনো কারণে ফিরিয়া আসিতে পারে নাই।

পত্নীর মুখে একথা শুনিয়া রসিক চন্দ্র তখনি দক্ষিণেশ্বরের দিকে ছুটিলেন। মন্দিরে পৌছিয়াই খোঁজ করিতে গেলেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে।

ঠাকুর কহিলেন, "সে তো কাল এখানেই ছিল। এখানেই খাওয়া-দাওয়া করেছে, শুয়ে থেকেছে। আজ একজনের সঙ্গে গাড়িতে তাকে কলকাতায় পাঠিয়ে দিয়েছি।"

এ সংবাদে রসিক চন্দ্র শান্ত হইলেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে পুত্রের জন্য দেখা দিল আর এক দুশ্চিন্তা। দক্ষিণেশ্বরের এই পাগলা ঠাকুরের কাছে সে আসা যাওয়া শুরু করিয়াছে, শেষটায় ঘর-সংসার ত্যাগ করিয়া না বসে।

ঠাকুরকে অনুনয়ের সুরে কহিলেন, "কালীপ্রসাদ আমার ছেলে। সে যাতে মন দিয়ে লেখাপড়া করে, ঘর-সংসার করে, আপনি দয়া ক'রে তাকে সেই উপদেশ দেবেন।"

মৌল এবং গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে ঠাকুর ধোঁয়াটে কথাবার্তা বলিতেন না। পরিষ্কারভাবে কহিলেন, "আপনার ছেলের ভেতর যোগীর লক্ষণ রয়েছে, যোগসাধনার জন্য অধীর হয়েও উঠেছে। এ অবস্থায় তাকে বিয়ে দিলে, তার ফল কি ভালো হবে?"

রসিক চন্দ্র উত্তর দিলেন, "আজ্ঞে, পিতামাতার সেবাই তো পরমধর্ম। তাই নয় কি?"

"তা বটে, তা বটে," বলিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ বার বার আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

উত্তরকালে অভেদানন্দ বলিতেন, "ঠাকুর যে আসলে পিতামাতার সেবা বলতে জগৎ-পিতা ও জগৎ-মাতার সেবা বুঝে নিয়েছিলেন এবং সেইজন্যই আনন্দ প্রকাশ করছিলেন, আমার বাবা তা তখন বুঝে উঠতে পারেন নি।"

প্রথম দর্শনের পর হইতেই কালীপ্রসাদের মন রামকৃষ্ণ চরণে বাঁধা পড়িয়া যায়। বাড়িতে বসিয়া দিনরাত তাঁহারই কথা, তাঁহার বিপুল স্নেহ ভালোবাসা ও কৃপার কথা ভাবিতে থাকেন। লেখাপড়ায় আজকাল আর তাঁহার মনোযোগ নাই, বাড়ির কোনো কিছুতেই নাই পূর্বেকার সেই আকর্ষণ।

শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দেশ মতো রুদ্ধদ্বার কক্ষে প্রতি রাত্রে শয্যায় বসিয়া ধ্যান করেন, কত বিচিত্র কত উদ্দীপনাময় অতীন্দ্রিয় দর্শনাদি তাঁহার হইতে থাকে। পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণ যেন কালীপ্রসাদের জীবনের ভিত্তিমূলে এক প্রচণ্ড নাড়া দিয়াছেন। ফলে বিরাট এক পাষাণপিণ্ড হইয়াছে অপসারিত, আর উন্মোচিত হইয়াছে দিব্যরসের অমৃত নির্ঝর।

তাঁহার এ ভাবান্তর পিতা ও মাতার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়াইতে পারে

নাই। উভয়ে তাঁহাকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন, দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুরের কাছে আর তাঁহার যাওয়া চলিবে না। কিন্তু কালীপ্রসাদকে নিরস্ত রাখা আর সম্ভব হয় নাই।

এক একদিন ঠাকুরকে দর্শনের জন্য কালীপ্রসাদ অধীর হইয়া উঠিতেন। যে কোনো উপায়ে উপস্থিত হইতেন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের চরণতলে।

যাতায়াতের ভাড়া ঠাকুরই প্রায় সময়ে সংগ্রহ করিয়া দিতেন। বিদায় কালে স্নেহপূর্ণ স্বরে কহিতেন, "তুই না এলে, তোকে না দেখলে আমার প্রাণ বড় ব্যাকুল হয়ে ওঠে। রোজই তোকে দেখতে ইচ্ছে হয়।"

মন্ত্রমুগ্ধের মতো কালীপ্রসাদ কহিতেন, "আমিও রোজই আপনার দর্শনের জন্য অস্থির হয়ে উঠি। কিন্তু বাবা মা আমায় কেবলই নিষেধ করেন।"

স্মিতহাস্যে ঠাকুর বলিতেন, "কাউকে জানাবি নে, গোপনে চলে আসবি হেথায়। হাতে পয়সা না থাকলে, এখান থেকে নিয়ে নিবি।"

দেবমানব ঠাকুরের প্রেমঘন মূর্তি আর মধুময় কণ্ঠস্বর। কালীপ্রসাদ কখনো ভুলিতে পারেন না। এ কি অদ্ভুত ধরনের ভালোবাসা স্নেহ প্রেম তাঁহার? এ ভালোবাসায় স্বার্থের লেশমাত্র নাই। ভালোবাসার একমাত্র লক্ষ্য কালীপ্রসাদের ধর্মজীবনকে গড়িয়া তোলা, মুক্তির অমৃতলোকে তাঁহাকে পৌঁছাইয়া দেওয়া। মর্তের মানুষের মধ্যে এ বস্তু কখনো খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।

একদিন কালীপ্রসাদের পিতা সারাদিন বাড়ির সদর দরজায় তালা লাগাইয়া রাখিলেন, পুত্র যাহাতে বাহিরে যাইতে না পারে। বিকালে তিনি ভাবিলেন, দিন প্রায় শেষ হইতে চলিল, আজ এমন অসময়ে কালীপ্রসাদ আর দূরের পথ দক্ষিণেশ্বরে যাইবে না। সদর দরজাটি তাই খুলিয়া দেওয়া হইল। সুযোগ পাওয়ামাত্র কালীপ্রসাদও উন্মাদের মতো ছুটিয়া বাহির হইলেন রাজপথে। দক্ষিণেশ্বরে

পৌঁছিয়া লুটাইয়া পড়িলেন ঠাকুরের চরণতলে। হৃদয় তাঁহার দিব্য আনন্দে ভরপুর হইয়া উঠিল।

ঠাকুর রামকৃষ্ণ স্মিতহাস্যে একদৃষ্টে এতক্ষণ নূতন ভক্তের দিকে চাহিয়া আছেন। এবার প্রসন্ন মধুর কণ্ঠে কহিলেন, "ঠিক হচ্ছে। ও'রকমই করবি। ঈশ্বরের জন্য এমনি ব্যাকুলতাই তো চাই। সুযোগ পেলেই এসে উপস্থিত হবি। যা কিছু দর্শন হবে, অনুভূতিতে আসবে, সব এখানে বলে যাবি।"

ধ্যানের সময় কালীপ্রসাদ প্রায়ই বহুতর দিব্যমূর্তি দর্শন করিতেন। একদিন দেখিলেন অনন্ত আকাশ জোড়া বিস্ফারিত রহিয়াছে এক দিব্যচক্ষু। আর একদিন দেখিলেন, তাঁহার আত্মা যেন দেহপিঞ্জর হইতে বাহির হইয়া মুক্ত বিহঙ্গের মতো মহাশূন্যে বিচরণ করিতেছে। নভোলোকে ঊর্ধ্বে উঠিতে উঠিতে একসময়ে ইহা এক পরম রম্য স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। অসংখ্য দেব-দেবী, অবতার ও সিদ্ধপুরুষ সেখানে বিরাজিত। এই দর্শনের কথা ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে জানাইলে তিনি কহিলেন, "তোর বৈকুণ্ঠ দর্শন হয়েছে।"

পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন সত্যকার ব্রহ্মরসিক। দিনের পর দিন নানা রস নানা ভাববৈচিত্র্য তাঁহার জীবনলীলায় প্রকট হইয়া উঠিত, আর তরুণ কালীপ্রসাদ আকণ্ঠ ভরিয়া পান করিতেন এই লীলার সুধারস। জীবন কথায় তিনি লিখিয়াছেন, "কখনও তিনি ভাবাবেশে হাসিতেন, কখনও কাঁদিতেন ও নাচিতেন এবং কখনও বা সমাধিস্থ হইয়া থাকিতেন। আবার কখনও বা মধুরকণ্ঠে রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত প্রভৃতি সাধকগণের রচিত গান করিতে করিতে বিহ্বল হইয়া থাকিতেন। কখনও কখনও তিনি রাধাকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা কীর্তন করিতেন। কখনও বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব মহাজন রচিত পদাবলী গান করিতেন এবং আপন ভাবে মাতোয়ারা হইয়া গানে নূতন নূতন আখর দিতেন। কখনও বা পরম

বৈষ্ণব তুলসীদাস যেইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন সেইরূপে রামসীতার লীলা বর্ণনা করিতে করিতে ভাবাবেশে পরমানন্দসাগরে মগ্ন হইয়া যাইতেন। সর্বধর্মসমন্বয়ের ভাব পরমহংসদেবের জীবনে প্রত্যহ প্রতিফলিত হইত এবং সকলকে তিনি 'যত মত তত পথ' এই উদার সার্বভৌমিক ভাবের উপদেশ দিতেন। আমি সেই সকল উপদেশ হৃদয়ঙ্গম করিয়া অপূর্ব আনন্দে মগ্ন থাকিতাম।"

দিনের পর দিন ঠাকুরের কত করুণালীলাই না উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে কালীপ্রসাদের নয়ন সমক্ষে। সে-দিন রাম দত্ত মহাশয়ের বাড়িতে শ্রীরামকৃষ্ণ পদার্পণ করিয়াছেন। অভ্যর্থনা করিয়া বৈঠকখানা ঘরে সসম্ভ্রমে তাঁহাকে বসানো হইল। ঠাকুর চারিদিকে একবার দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, "কই, নরেন কই, তাকে তো দেখছি না।

রাম দত্ত কহিলেন, "নরেন খুব অসুস্থ তাই আসতে পারে নি। মাথায় খুব যন্ত্রণা, চোখ খুলতে পারছে না।"

ঠাকুর অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। তাঁহার নির্দেশে তখনি কালীপ্রসাদ প্রভৃতি নরেনের বাড়ি গিয়া হাজির। কহিলেন, "ঠাকুর তোমার প্রতীক্ষায় রয়েছেন, তাড়াতাড়ি সেখানে চল।"

নরেন একটি ভিজে গামছা মাথায় দিয়া নিচের ঘরে শুইয়া আছেন। কহিলেন, "ছাখ আমার অবস্থা। কি ক'রে যাই? আলোয় চোখ মেললেই মাথায় দারুণ যন্ত্রণা হয়।"

কালীপ্রসাদ প্রভৃতির চাপে পড়িয়া নরেনকে অগত্যা যাইতে হইল। মাথায় একটি ভেজা গামছা চাপা দিয়া বন্ধুদের হাত ধরিয়া কোনোক্রমে উপস্থিত হইলেন রাম দত্তের ভবনে।

নরেন আসিয়াছে, শ্রীরামকৃষ্ণের আনন্দের অবধি নাই। কাছে ডাকিয়া মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিলেন, "কিরে, তোর মাথায় কি হয়েছে?"

কি আশ্চর্য, ঠাকুরের হস্তটি মাথায় রাখিবার সঙ্গে সঙ্গে নরেনের তীব্র যন্ত্রণা দূর হইয়া গেল। স্বাভাবিকভাবে চোখ মেলিতেও তিনি সক্ষম হইলেন।

নরেন সবিস্ময়ে কহিলেন, "মশায়, আপনি কি করলেন, আর আমার মাথার বেদনা হঠাৎ কোথায় চলে গেল।"

ঠাকুর তখন মিটিমিটি হাসিতেছেন। একটু পরে নরেনকে কহিলেন, "এবার গান গেয়ে শোনা দেখি।"

নরেন আনন্দে উচ্ছল হইয়া উঠিয়াছেন, তানপুরায় সুর দিয়া মধুর কণ্ঠে গান ধরিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ ধীরে ধীরে ডুবিয়া গেলেন ধ্যানের গভীরে। নরেন কিন্তু পরমানন্দে একের পর এক গান গাহিয়াই চলিয়াছেন। দেখিয়া কে বলিবে, একটু আগেই তিনি শয্যায় শুইয়া তীব্র যাতনায় ছটফট করিতেছিলেন?

নরেনের গানে শ্রীরামকৃষ্ণের দেহে মনে জাগিয়া উঠিল দিব্য-ভাবের প্রবল উদ্দীপনা। প্রত্যক্ষদর্শী তরুণ সাধক কালীপ্রসাদ সেদিনকার এই দৃশ্যটির চমৎকার বর্ণনা দিয়াছেন, "পদকীর্তন শুনিয়া পরমহংসদেব ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়িলেন। সমবেত ভক্তগণও ভাবে মুগ্ধ ও বিহ্বল হইয়া রহিলেন। পরমহংসদেবের মুখে অপূর্ব জ্যোতি ও প্রসন্ন হাসি বিরাজ করিতে লাগিল। তাহার পর যখন আবার 'নদে টলমল করে গৌরপ্রেমের হিল্লোলে' বলিয়া কীর্তন আরম্ভ হইল, তখন পরমহংসদেব দাঁড়াইয়া উঠিলেন এবং কোমরে কাপড় জড়াইয়া মত্ত সিংহের ন্যায় নাচিতে আরম্ভ করিলেন। উদ্দাম সেই নৃত্য, অথচ মুখে প্রসন্ন হাসি ও ভাব। ইহা দেখিয়া মনে পড়ে, শ্রীচৈতন্যের নৃত্য দেখিয়া তাঁহার ভক্তগণের কথা। তাঁহারা বলিয়াছিলেন, 'গোরা আমার মাতাহাতী।' সেইদিন আমরা সেই মত্তহস্তীর ন্যায় শ্রীরামকৃষ্ণের উদ্দাম নৃত্য দেখিয়া আনন্দে বিভোর হইয়াছিলাম।"

নরেন্দ্র প্রভৃতি তরুণ ভক্তদের প্রতি ঠাকুরের অহেতুক স্নেহ ও প্রেম, ইষ্টগোষ্ঠী ও কীর্তনানন্দ দিনের পর দিন কালীপ্রসাদ প্রত্যক্ষ করেন, আর অভিভূত হইয়া যান।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ যেমনি প্রতিভাধর নট ও নাট্যকার, তেমনি ছিলেন উদ্দাম প্রকৃতির। কালীপ্রসাদ শুনিয়াছেন, ইতিপূর্বে গিরিশ ঠাকুরকে তেমন পাত্তা দেন নাই, মদের ঘোরে কয়েকবার তাঁহাকে অশ্রাব্য ভাষায় গালাগালও দিয়াছেন। বীতরাগভয়ক্রোধ ঠাকুর রামকৃষ্ণ তাহাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হয় নাই। অন্তরঙ্গ ভক্তদের বরং বলিয়াছেন, "মদ খেয়ে অমন আবোল-তাবোল বলছে। থাক্ না শালা ক'দিন থাবে।"

ঠাকুরের অগাধ স্নেহ-প্রেমের আকর্ষণ অতঃপর গিরিশকে নরম করিয়া আনে পরিণত করে একনিষ্ঠ ভক্তরূপে।

সেদিন দুপুরবেলায় কালীপ্রসাদ দক্ষিণেশ্বরে গিয়াছেন। দেখিলেন, একটু পরেই গাড়ি করিয়া গিরিশ ঘোষ সেখানে আসিয়া উপস্থিত। কাতর কণ্ঠে কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন, "ঠাকুর আমায় কৃপা ক'রে উদ্ধার করুন।"

শ্রীরামকৃষ্ণ ইতিমধ্যে ভাবাবিষ্ট হইয়া গিয়াছেন, মা-ভবতারিণীর সহিত চলিতেছে তাঁহার অন্তরঙ্গ সংলাপ। মৃদুস্বরে ঠাকুর কহিতেছেন, 'বীরভক্ত গিরিশ ওসব পারবে না মা।"

ক্রমে ঠাকুরের বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসে, স্নেহপূর্ণ স্বরে গিরিশকে বলেন, "মা তোমায় বললেন বকলমা দিতে। তাই করো। তুমি আমায় বকলমা দাও, সব ভার সঁপে দাও, আর কিছু তোমায় ভাবতে হবে না।"

সাশ্রুনয়নে ভক্ত গিরিশ তাহাই করিলেন, ঠাকুরের অভয় আশ্রয় গ্রহণ করিয়া পতিত হইলেন তাঁহার চরণতলে।

কালীপ্রসাদ দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যহ করেন এমনি সব বিস্ময়কর ঘটনা, ঠাকুর রামকৃষ্ণের কৃপা ও অধ্যাত্মশক্তির মাহাত্ম্য অনুভব করেন সারা মনপ্রাণ দিয়া।

তরুণ সাধক কালীপ্রসাদ স্বভাবতই খুব ধ্যানপরায়ণ ছিলেন। গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের অহেতুক কৃপা, আর সাধন সম্পর্কিত পুঙ্খানুপুঙ্খ নির্দেশ, তাঁহার এই ধ্যানপ্রবণতাকে চালিত করে উচ্চতর সিদ্ধি

ও উপলব্ধির দিকে। এসময়কার একটি স্মরণীয় অভিজ্ঞতার তথ্য তাঁহার আত্মচরিতে আমরা পাই। তিনি লিখিয়াছেন :

"দক্ষিণেশ্বরে পরমহংসদেব তাঁহার ছোট ঘরটিতে বসিয়া আছেন এবং আমি তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া পদসেবা করিতেছি। তিনি আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ব্রহ্মজ্ঞান কি সহজে লাভ করা যায়!" আমি বলিলাম, 'পাতঞ্জলদর্শনে একটি সূত্র আছে : তীব্র সম্বেগনামাসন্নঃ—অর্থাৎ যাহাদের অন্তরে তীব্র সংবেগ (শ্রদ্ধা, বীর্যাদি) থাকে তাহাদের শীঘ্র সমাধি হয়। তিনি আমাকে সহাস্যে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, 'তোর ব্রহ্মজ্ঞান হবে।' তাহার পর তিনি আমার কপালে নখদ্বারা জোরে চিমটি কাটিয়া বলিলেন, এ-স্থানে মন স্থির করবি। ন্যাংটা (তোতাপুরী) আমার কপালে একটা কাঁচখণ্ড বিদ্ধ করে সেই বিন্দুতে মন স্থির করতে বলেছিল। আমি সে রকম করলে আমার নির্বিকল্প সমাধি হয়েছিল। সে অবস্থায় বাহ্যজ্ঞান থাকে না। আমিও তিনদিন আর তিন রাত্রি সমাধিস্থ হয়ে ছিলাম। আমার অবস্থা দেখে ন্যাংটা বলেছিল, ক্যা দৈবী মায়া হ্যায়! চাল্লিশ বরষ সাধন করকে হামকো জো নির্বিকল্প সমাধি মিলা হ্যায়, তুম তিন রোজমে সিদ্ধ কর লিয়া?—অর্থাৎ, কি দৈবী মায়া! আমি চল্লিশ বছর কঠোর সাধন ক'রেও যে সমাধি লাভ করতে পারি নি, রামকৃষ্ণ তা তিন দিনে লাভ করল!

"তাহার পর পরমহংসদেব আমাকে পঞ্চবটির নিচে বসিয়া ধ্যান করিতে আদেশ দিলেন। তখন হরিশ নামক অপর একজন সেবক আসিল। আমি পরমহংসদেবের সেবার ভার তাকে দিলাম এবং পরমহংসদেবকে প্রণাম করিয়া পঞ্চবটীর তলায় ধ্যান করিতে অগ্রসর হইলাম। সেইখানে আমি ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে মনস্থির করিয়া ধ্যান করিতে করিতে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া কতক্ষণ সমাধিস্থ ছিলাম জানি না। তবে ধীরে ধীরে বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিলে আমি উঠিয়া আসিয়া পরমহংসদেবের চরণে প্রণাম করিলাম। তিনি সস্নেহে আমার মাথায় হস্ত রাখিয়া আশীর্বাদ করিলেন।

সাধনার গোড়ার দিকে, বিশেষত সাধকদের তরুণ বয়সে, তত্ত্ব ও দর্শনের কত জটিল প্রশ্নই না মনে আসিয়া ভিড় করে। কালীপ্রসাদ স্বভাবতই মননশীল, তাই অনেক প্রশ্নই তাঁহার মনে তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিত। সব প্রশ্নেরই জবাব মিলিত শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে, নিতান্ত আপনার জনরূপে, পিতা ও সখারূপে সতত তিনি তাহাকে এই বিষয়ে সাহায্য করিতেন, জাগাইয়া তুলিতেন ঈশ্বর সম্বন্ধে নূতনতর উদ্দীপনা।

বেদান্তের তত্ত্ব, ব্রহ্ম ও মায়ার তত্ত্ব ঠাকুর তাঁহার নবীন ভক্ত-শিষ্যদের বুঝাইয়া দিতেন প্রাঞ্জল ভাষায়, অতি সহজভাবে কহিতেন, "ব্রহ্ম নির্গুণ এবং সগুণ। নির্গুণ ব্রহ্ম কেমন জানিস্? যেমন সাপ স্থির হয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুমুচ্ছে, আবার সেই সাপ যখন এঁকেবেঁকে চলছে, তখন সগুণ ব্রহ্ম। নির্গুণব্রহ্ম অখণ্ড স্থির সমুদ্র। তাতে তরঙ্গ অথবা ক্রিয়া নেই, অচল ও অটল সুমেরুবৎ। মায়াশক্তি ব্রহ্মে যেন সুপ্তাবস্থায় লীন হয়ে থাকে। সেই অবস্থায় বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জীবজগৎও মহাপ্রলয়ে লীন হয়ে থাকে। মায়াশক্তি জাগ্রত হয়ে উঠলে সেই সচ্চিদানন্দ সমুদ্রে তরঙ্গ হতে থাকে। সেই অবস্থাকে বেদান্তশাস্ত্রে সগুণব্রহ্ম বলা হয়েছে। তখন ত্রিগুণাত্মিকা মায়া বা প্রকৃতিতে গুণক্ষোভ হয় এবং সৃষ্টিকার্য আরম্ভ হয়। এই সগুণব্রহ্মই 'অর্ধনারীশ্বর' 'হরগৌরী' নামে শাস্ত্রে অভিহিত।"

কালীপ্রসাদ প্রভৃতি যুবক ভক্তদের উৎসাহিত করিতে গিয়া ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আরো বলিতেন, "অদ্বৈতজ্ঞান আঁচলে বেঁধে যা ইচ্ছা তাই কর।" অর্থাৎ, সাধকের পক্ষে দরকার আগে অদ্বৈতজ্ঞান লাভ করিতে হইবে। ইহার ফলে সংসারজীবনের কাজকর্মে থাকিয়াও মানুষ অবিদ্যা ও অজ্ঞানের হাত হইতে নিষ্কৃতি পায়, মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হয়।

কালীপ্রসাদ একদিন প্রশ্ন করিলেন ঠাকুরকে, "জীব আর ব্রহ্মে পার্থক্য কি?"

উত্তর হইল,—"নদীর স্রোতে জলের উপরে একটা লাঠি

এজন্য ভক্তেরা রসিকতা করিয়া এই দুই বিশিষ্ট সেবককে বলিতেন,- পার্সোনাল্ আতাসে টু হিজ্ হোলিনেস্ শ্রীরামকৃষ্ণ।

এসময়ে ঠাকুরের দিব্য ভাব এবং ভগবত্তার ভাবটি দিনের পর দিন দেদীপ্যমান্ হইয়া উঠিতে থাকে কালীপ্রসাদ এবং অন্যান্য অন্তর ভক্তদের দৃষ্টিতে।

কোয়েকার সম্প্রদায়ের এক খ্রীষ্টান ভদ্রলোক সেদিন ঠাকু রামকৃষ্ণকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন। কথা প্রসঙ্গে ঐ খ্রীষ্টান যীশুখ্রীষ্টের লীলা ও মাহাত্ম্য কিছু কিছু বর্ণনা করিলেন। সঙ্গে সে শ্রীরামকৃষ্ণের দেহে মনে জাগিয়া উঠিল দিব্যভাবের উদ্দীপন বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া ভাবাবেশে রোগশয্যা ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন খ্রীষ্টান ভদ্রলোকটি তখন ঠাকুরকে যেন দর্শন করিতেছেন তাঁহা ইষ্টদেব খ্রীষ্টরূপে। ভক্তিভরে তিনি স্তব শুরু করিয়া দিলেন।

তারপর তিনি কহিলেন, "আপনারা এঁকে চিনতে পারছেন না ইনি আর আমাদের খ্রীষ্ট অভিন্ন। আজ এঁর যে ভাব দর্শন করলাম প্রভু যীশুখ্রীষ্টেরও ঠিক এমনিতর ভাব হত। আমি এর আগে খ্রী এবং পরমহংসদেব, এ দুজনকেই স্বপ্নে দেখেছি। ইনিই বর্তমা যুগের যীশুখ্রীষ্ট।"

শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত ও সেবকেরা একথা শুনিয়া বিস্ময়ে আনন্দে অভিভূত হইয়া পড়েন।

সেদিন বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী শ্যামপুকুরে শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখিতে আসিয়াছেন। কালীপ্রসাদ ঠাকুরের পাশে অদূরে উপবিষ্ট। এসময়ে উভয়ের মধ্যে যে কথাবার্তা হয় সে সম্পর্কে উত্তরকালে অভেদানন্দ লিখিয়াছেন, "বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী পরমহংসদেবকে বলিলেন, আমি আপনাকে ঢাকায় এই রকম স্থূল শরীরে দেখেছি। আপনি সেখানে গিয়েছিলেন কি?"

"পরমহংসদেব হাসিতে হাসিত বলিলেন, 'আপনার ভক্তির জোরে আপনি আমায় দেখেছেন।' এই কথা বলিয়া পরমহংসদেব ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়িলেন এবং বিজয়কৃষ্ণের বক্ষে দক্ষিণপদ স্থাপন

করিলেন। তখন বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী তাঁহার পাদপদ্ম বক্ষে ধারণ করিয়া ভাবে, অশ্রুজলে, ভাসিতে লাগিলেন। আমরা সকলে অবাক্ হইয়া সেই অপূর্ব দৃশ্য দেখিতে লাগিলাম। ভাবিলাম তাহা দেবলীলাই বটে।"

সেদিন ছিল কালীপূজার দিন। ভক্তেরা ঠাকুরের পূর্বদিনের নির্দেশমতো পূজার উপচার সংগ্রহ করিয়া তাঁহার কক্ষে সাজাইয়া রাখিয়াছেন। পূজার লগ্ন উপস্থিত হইলে ঠাকুর আসনে আসিয়া বসিলেন, নিজদেহে বিরাজমানা জগন্মাতাকে উদ্দেশ করিয়া নিজেই অর্পণ করিলেন পুষ্পাঞ্জলি। সঙ্গে সঙ্গে হস্তে প্রকাশিত হইল বরাভয় মুদ্রা। উত্তরাস্য হইয়া বসিয়া তিনি সমাধিস্থ হইলেন।

প্রধান ভক্ত গিরিশ ঘোষ পাশেই বসিয়া ছিলেন, ঠাকুরের ভগবত্তা ভাবের উদ্দীপন দর্শনে বলিয়া উঠিলেন, "আমাদের সামনে আজ জীবন্ত মা কালী বিরাজ করছেন। এসো সবাই তাঁরই পূজা করি।"

মাল্য ও পুষ্পচন্দন নিয়া গিরিশ প্রথমে ঠাকুরকে অঞ্জলি দিলেন, উচ্চারণ করিলেন ঘন ঘন জয়-মা, জয়-মা রব।

কালীপ্রসাদ, নিরঞ্জন প্রভৃতি ভক্তসেবকেরা সবাই আনন্দে অধীর! সোৎসাহে দিলেন পুষ্পাঞ্জলি, ভক্তিভরে গ্রহণ করিলেন প্রসাদ। স্তবগানের ঝঙ্কারে সারা কক্ষটি মুখরিত হইয়া উঠিল।

উত্তরকালে ঠাকুরের এই ভগবত্তা ভাবের দৃশ্যটি বর্ণনা করিয়া স্বামী অভেদানন্দ বলিতেন, "সে অপূর্ব দৃশ্য এ জীবনে কোনোদিন আমরা ভুলতে পারবো না।"

চিকিৎসায় শ্রীরামকৃষ্ণের তেমন কিছু উপকার হইতেছে না দেখিয়া ডাক্তারেরা স্থান পরিবর্তনের পরামর্শ দিলেন। কাশীপুরে আশি টাকা ভাড়ায় একটি পুরাতন বাগানবাড়ি ভাড়া করা হইল।

ভক্ত সুরেশ মিত্রকে ডাকিয়া ঠাকুর কহিলেন, "এরা গরীব প্রায়ই কেরানী, বেশী টাকা দেবার ক্ষমতা এদের কই? বাড়ি ভাড়াটা তুমি দও। সুরেশ মিত্র তখনি রাজী হইয়া গেলেন।

এবার বলরাম বাবুকে কহিলেন, "ওগো, তুমি আমার খরচটা দিও। চাঁদার খাওয়া আমি পছন্দ করিনে।" বলরাম সোৎসাহে এ নির্দেশ শিরোধার্য করিলেন।

ঠাকুরের দর্শনের জন্য, সেবা শুশ্রূষার তত্ত্বাবধানের জন্য, গৃহী ভক্তদের অনেকে এখানে আসা শুরু করিলেন। আর ত্যাগী তরুণ ভক্তেরা রহিলেন ঠাকুরের সেবা ও চিকিৎসার সকল কিছু দায়িত্ব নিয়া। একদিন কালীপ্রসাদ ও অন্যান্য সেবক ভক্তদের ঠাকুর কহিলেন, "ত্যাখ্, আমার এই গলার ঘা একটা উপলক্ষ মাত্র। এই সূত্রে তোরা সবাই একত্র হয়েছিস।"

এইভাবে ঠাকুর তাঁহার নিজের অসুখটি উপলক্ষ করিয়া উত্তর-কালের রামকৃষ্ণমণ্ডলীর বীজটি রোপণ করিলেন। শুধু তাহাই নয়, যাহাতে এ বীজ অঙ্কুরিত ও পুষ্পিত হইয়া উঠে, সযত্নে তাহার পরিবেশও রচনা করিয়া গেলেন।

নরেন্দ্রনাথ যুবক-ভক্তদের অগ্রণী, তাঁহার নেতৃত্বে সবাই পালা করিয়া গ্রহণ করিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের সেবাকার্যের ভার।

সবার অলক্ষ্যে, সেদিন সামান্য একটু মন্তব্য আর ইচ্ছা শক্তির প্রয়োগে, নরেন্দ্রনাথের জীবনকে ঠাকুর প্রবাহিত করিলেন বিধি-নির্দিষ্ট খাতে।

নরেন্দ্র রাত জাগিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের সেবা করেন। চিকিৎসার তত্ত্বাবধান করেন, আবার এই সঙ্গে অবসর সময়ে তৈরী হইতেছেন নিজের আইন পরীক্ষার জন্য।

কথা প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ সেদিন তাঁহাকে কহিলেন, "ত্যাখ্, তুই যদি উকিল হোস্, তবে তো তোর হাতের জল আর আমি খেতে পারবো না।" কালীপ্রসাদও সেদিন সেখানে উপস্থিত। দেখিলেন, নরেন্দ্র স্তব্ধ হইয়া কি যেন চিন্তা করিতেছেন, তারপর তখনি নিচের ঘরে গিয়া আইনের বইগুলি একধারে সরাইয়া রাখিলেন। কহিলেন, "আইন পরীক্ষাটা দেওয়া আর হল না।"

যে কাজ করিলে প্রাণপ্রিয় ঠাকুর তাঁহার হাতের জলটুকু পর্যন্ত খাইবেন না, সে কাজ তিনি কি করিয়া করিবেন ?

নরেন্দ্র, কালীপ্রসাদ, শরৎ, নিরঞ্জন প্রভৃতি একসঙ্গে সেদিন বেড়াইতেছেন বাগানে। নরেন্দ্র কহিলেন, "ঠাকুর যে কঠিন ব্যাধি নিজ শরীরে নিয়েছেন, মনে হয় তিনি দেহরক্ষার সংকল্পই করেছেন। এসো, এখন আমরা প্রাণ ঢেলে তাঁর সেবাশুশ্রূষা করি, সঙ্গে সঙ্গে চালিয়ে যাই জপ ধ্যান ও সাধনভজন।"

অভেদানন্দ উত্তরকালে এ সময়কার জীবনের এবং বিশেষ করিয়া নরেন্দ্রনাথ ও তাঁহার নিবিড় অন্তরঙ্গতার বর্ণনা দিয়াছেন :

—রাত্রিতে আমরা আপন আপন পালা বা কর্তব্য শেষ করিয়া পূর্বের ন্যায় আগুন জ্বালাইয়া ধুনির পার্শ্বে বসিয়া ধ্যান, বেদান্ত বিচার, গীতাপাঠ ও শাস্ত্রালাপ করিতে থাকিতাম। তাহার পর শঙ্করাচার্যের মোহমুদ্গর ও নির্বাণাষ্টকের স্তোত্রগুলি আবৃত্তি ও তাহাদের অর্থের ধ্যান করিতাম। সেই সময় হইতেই সত্য সত্য আমি ও শরৎ (সারদানন্দ) নরেন্দ্রনাথের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার সমস্ত আদেশ পালন করিতাম এবং তাঁহার ছায়ার ন্যায় সঙ্গে সঙ্গে থাকিতাম। নরেন্দ্রনাথ আমার ও শরতের নাম দিয়াছিল 'কেলুয়া' ও 'ভুলুয়া'। তখন কখনও অষ্টাবক্র সংহিতা, যোগবাশিষ্ট পাঠ করা হইত, কখনও বা ভাগবতের 'গোপী-গীতা' আবৃত্তি করা হইত। নরেন্দ্রনাথ সুমধুর কণ্ঠে রামপ্রসাদী গান, ব্রহ্মসংগীত এবং শ্রীশ্রীঠাকুর যে সমস্ত গান গাহিতেন সেই সমস্ত গাহিয়া আমাদের সকলকে মাতাইয়া রাখিত। আবার কখনও বা আমরা 'জয় রাধে' বলিয়া সংকীর্তনে মাতিয়া নৃত্য করিতাম।

—নরেন্দ্রনাথ আমার অপেক্ষা প্রায় চারি বৎসরের বড় ছিল। আমি নরেন্দ্রনাথকে সেই অবধি আপনার জ্যেষ্ঠভ্রাতার ন্যায় ভালো বাসিতাম। নরেন্দ্রনাথও আমায় আপনার সহোদরতুল্য ভালো-বাসিত। তাহা ছাড়া আমি যে তাহাকে শুধু ভালোবাসিতাম তাহা নহে, তাহার আজ্ঞানুবর্তী হইয়া সকল কাজই করিতাম। বলিতে

গেলে আমি নরেন্দ্রনাথের ছায়ার মতো সর্বদা সঙ্গে সঙ্গে থাকিতাম। এবং নরেন্দ্রনাথ যাহা করিত আমিও নির্বিবাদে তাহা করিতাম। নরেন্দ্রনাথ যাহা করিতে বলিত, অকুণ্ঠিত হৃদয়ে তৎক্ষণাৎ তাহা করিতাম।

—নরেন্দ্রনাথ ও আমি জ্ঞানমার্গের 'নেতি নেতি' বিচার করিতাম এবং অদ্বৈত বেদান্ত-মতের একান্ত পক্ষপাতী ছিলাম। নরেন্দ্রনাথ পাশ্চাত্য দর্শন ও ন্যায়, বিজ্ঞান প্রভৃতি শাস্ত্রে অভিজ্ঞ ছিল। ঐ সকল বিষয়ে তাহার সহিত আলোচনা করিতে করিতে আমার জ্ঞানপিপাসা দিন দিন আরও বর্ধিত হইতে লাগিল। তাহা ছাড়া এই সকল বিষয়ে নরেন্দ্রনাথকে আমি এত অধিক অনুকরণ করিতাম যে, যখন নরেন্দ্রনাথ ধ্যান করিতে বসিত তখন আমিও ধ্যান করিতাম। নরেন্দ্রনাথ যেমনটি ভাবে ও সুরে মোহমুদ্গর কৌপীন পঞ্চক বিবেক-চূড়ামণি ও অষ্টাবক্র সংহিতা প্রভৃতি আবৃত্তি করিত আমিও তদনুরূপে করিতাম। আমাদের দুইজনের মধ্যে ছিল এক নিবিড় সম্পর্ক এবং সেই সম্পর্ক চিরদিন অটুট ছিল।[১]

নরেন্দ্রনাথ ছিলেন তরুণ ভক্তদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাণবন্ত এবং স্বাভাবিক নেতৃত্বের অধিকারী। ব্রাহ্মদের মতো জাতের বিচার পূর্ব হইতেই তিনি মানিতেন না, এবং সর্বদিক দিয়া ছিলেন অত্যন্ত উদারপন্থী। একদিন কালীপ্রসাদ প্রভৃতিকে কহিলেন, "চলো, তোমাদের কুসংস্কার ভেঙে আসি। পিরুর দোকানের কাউলকারী রান্না খাইয়ে দিই।"

বন্ধুরা তখনি সায় দিলেন। চমৎকার মুসলমানী রান্না, নরেন্দ্রনাথ উৎসাহের সহিত প্লেটের সবটা উড়াইয়া দিলেন। কালীপ্রসাদ, শরৎ প্রভৃতি নিজেদের কুসংস্কার ভাঙার জন্য, ঘৃণা দূর করার জন্য, নামমাত্র আহার করিলেন।

এদিকে শ্রীরামকৃষ্ণ বার বার তাঁহাদের ডাকাডাকি করিতেছেন।

১ আমার জীবন কথা: স্বামী অভেদানন্দ

কালীপ্রসাদ তাঁহার সেবার জন্য শয্যার পাশে যাওয়া মাত্র প্রশ্ন করিলেন, "তোরা সবাই কোথায় গিয়েছিলি, বলতো।"

"বিডন স্ট্রীটে পিরুর হোটেলে।"

"কে কে গিছলি?"

"নরেন, শরৎ, নিরঞ্জন আর আমি।"

"সেখানে কি খেলি?"

"মুর্গির ঝোল।"

"ক্যামন লাগলো তোদের?"

"আজ্ঞে, আমার আর শরতের তেমন ভালো লাগে নি। তাই একটুখানি মুখে দিয়ে কুসংস্কার ভাঙলাম।"

উচ্চস্বরে হাসিয়া উঠেন শ্রীরামকৃষ্ণ। বলেন, "বেশ করেছিস, ভালো হল, তোদের কুসংস্কার সব দূর হয়ে গেল।"

এতক্ষণে কালীপ্রসাদের দুশ্চিন্তা দূর হইল, ঠাকুর তবে রাগ করেন নাই বরং বেশ কৌতুক বোধ করিতেছেন তাঁহাদের এই অভিযানের কথা শুনিয়া।

নরেন্দ্রনাথের উৎসাহে কাশীপুর বাগানের পুকুরে কয়েকদিন খুব মাছ ধরার কাজ শুরু হইয়া গেল। ঠাকুরের সেবা পরিচর্যার ফাঁকে ফাঁকে তরুণ ভক্তেরা পুকুরের ধারে আসিতেন, ছিপ হস্তে বসিয়া পড়িতেন। এই কাজে কালীপ্রসাদের দক্ষতা ছিল সব চাইতে বেশী, তাঁহার ছিপেই মাছ ধরা পড়িত বেশী সংখ্যায়।

ঠাকুর সেদিন কহিলেন, "কিরে তুই নাকি ছিপ দিয়ে খুব মাছ মেরেছিস্?"

বিনীত উত্তর হইল, "আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"ছিপ দিয়ে মাছ ধরা পাপ, ওতে জীব হত্যা হয়।"

কালীপ্রসাদ তর্ক তুলেন, "কেন, গীতার শ্লোকে তো রয়েছে, য এনং বেত্তি হন্তারং, ইত্যাদি। আত্মা হন্তা নয়, হতও হয় না কোনোদিন। তবে মাছ ধরায় পাপ কি?"

ঠাকুরও যুক্তি দিয়া তাঁহাকে কিছুক্ষণ বুঝাইলেন, তারপর

কহিলেন, "ছাখ্ ঠিক ঠিক জ্ঞান হলে, তখন আর বেতালে পা পড়ে না। যারা তপস্যা ক'রে, গোড়ার দিকে তাদের অনেক কিছু ভালোমন্দ পাপপুণ্য বিচার ক'রে চলতে হয়।"

একটু থামিয়া আবার বলিলেন, "আমি তোকে ছেলেদের মধ্যে বুদ্ধিমান বলে জানি। আমি যে কথাগুলো বললাম, তুই তা স্মরণে রেখে ধ্যান কর, সব বুঝতে পারবি।"

তিন দিনের মধ্যে ধ্যানাবিষ্ট কালীপ্রসাদের উপলব্ধিতে আসিয়া গেল ঠাকুরের বক্তব্যের যথার্থতা। ঠাকুরের নিকট গিয়া বলিলেন, "এবার আমি বুঝতে পেরেছি, মাছ ধরা কেন অন্যায় কাজ। একাজ আর আমি করবো না। আমায় ক্ষমা করুন।"

শ্রীরামকৃষ্ণের মুখে ফুটিয়া উঠে প্রসন্নতার হাসি। ধীরকণ্ঠে বলেন, "মাছ ধরায় বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়। খাবারের লোভ দেখিয়ে বড়শী লুকিয়ে রাখা, আর অতিথি বা বন্ধুকে নিমন্ত্রণ ক'রে এনে খাবারের ভেতর বিষ লুকিয়ে রাখা, একই ধরনের পাপ।"

কথাগুলি তরুণ সাধক কালীপ্রসাদের মর্মে প্রবিষ্ট হইয়া গেল, ঠাকুরের করুণাঘন মূর্তির দিকে সজলনয়নে তিনি চাহিয়া রহিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ আবার কহিলেন, "আত্মা মরে না, অপরকে মারেও না বটে, কিন্তু এই জ্ঞান যার হয়েছে সে তো আত্মস্বরূপ। কাজেই অপর কাউকে হত্যা করার প্রবৃত্তি তার হবে কেন? যতক্ষণ হত্যার প্রবৃত্তি থাকে, ততক্ষণ তো সে আত্মস্বরূপ হতে পারে না, আত্মজ্ঞানও প্রকাশিত হয় না। তাই বলছি যে, ঠিক ঠিক জ্ঞান হলে মানুষের আর বেতালে পা পড়ে না। জানবি—আত্মা দেহ, ইন্দ্রিয়-মন, বুদ্ধির পারে ও সাক্ষীস্বরূপ।"

বিতর্কিত বিষয় সম্পর্কে কালীপ্রসাদের সর্ব সংশয় ইতিমধ্যে দূর হইয়াছে, আনন্দে অভিভূত হইয়া বার বার কেবলই ঠাকুরের কৃপার কথা ভাবিতেছেন।

কালীপ্রসাদ স্বভাবতই তীক্ষ্ণধী, মননশীল ও প্রতিভাধর। নূতন নূতন জ্ঞান বিজ্ঞানের তত্ত্ব শেখার জন্য তাঁহার কৌতূহল ও ঔৎসুক্যের

অবধি নাই। ঠাকুরের সেবা এবং ধ্যান জপের অবকাশে এ সময়ে প্রায়ই তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের জ্ঞানসমৃদ্ধ গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতেন।

একদিন সেবাকর্মের এক ফাঁকে শ্রীরামকৃষ্ণের পাশে বসিয়া জন স্টুয়ার্ট মিলের একখানি বই পড়িতেছেন। ঠাকুর প্রশ্ন করিলেন, "কিরে, কি বই এটা ?"

"আজ্ঞে, ইংরেজী ন্যায়শাস্ত্র।"

"কি শেখায় ওতে ?"

"এতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণের তর্ক, যুক্তি ও বিচার শেখায়।"

"তুই তো দেখছি এখানে ছেলেদের মধ্যে বইপড়া ঢোকালি। তবে কি জানিস, বই পড়া বিদ্যে আসলে কিছু নয়। আপনাকে মারতে গেলে একটা নরুনই যথেষ্ট। কিন্তু অপরকে মারতে গেলে ঢাল তলোয়ার প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্রের দরকার হয়। অবশ্যি, যারা লোক-শিক্ষা দেবে তাদের এসব পড়ার দরকার আছে।"

এ কথার পর শ্রীরামকৃষ্ণ নীরব হইয়া যান, কালীপ্রসাদের বই পড়া নিয়া আর উচ্চবাচ্য করেন নাই। তিনি অন্তর্যামী, তাই বুঝিয়াছিলেন, উত্তরকালে তাঁহার এই নবীন শিষ্য কালীপ্রসাদ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সভ্যতার কেন্দ্রগুলিতে ভারতীয় ধর্ম ও দর্শনের তত্ত্ব প্রচার করিবে। শ্রেষ্ঠ মনীষী ও ধর্মনেতাদের সম্মুখীন হইবে। তাই কালীপ্রসাদের বই পড়া নিষেধ করেন নাই। ভক্ত ও শিষ্যদের মধ্যে সেসময়ে প্রায়ই ধর্মীয় মতবাদ সম্পর্কে তর্কবিতর্ক হইত। কালী-প্রসাদের প্রতিভা যুক্তি, তর্ক ও পরিশীলিত বুদ্ধি সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। ঠাকুরের কানে সব সংবাদই যাইত। একদিন কালীপ্রসাদকে ডাকিয়া বেশ কিছুটা উৎসাহিতও করিলেন। কহিলেন, "ছেলেদের মধ্যে তুইও বুদ্ধিমান। নরেনের নিচেই তোর বুদ্ধি। নরেন যেমন একটা মত চালাতে পারে, তুইও সেরকম পারবি।"

প্রবীণ ভক্ত বুড়ো-গোপাল একদিন ঠাকুরকে জানাইলেন, "মশায়, কালী কিছুই মানে না। একেবারে নাস্তিক হয়ে গেছে।" শুনিয়া ঠাকুর শুধু একটু মুচকি হাসি হাসিলেন।

একদিন কালীপ্রসাদকে প্রশ্ন করিলেন, "হ্যাঁরে, তুই নাকি নাস্তিক হয়ে গেছিস ?"

কালীপ্রসাদ নিরুত্তর। আবার ঠাকুরের জিজ্ঞাসা, "তুই ঈশ্বর মানিস ?"

সংক্ষিপ্ত একটি উত্তর হইল, "না।"

"অন্য কোনো সাধুর কাছে একথা বললে, সে তোর গালে চড় মারতো।"

"আপনিও মারুন। যতক্ষণ না ঈশ্বর আছেন এবং বেদ সত্য, একথা ঠিক বুঝতে না পারছি, ততক্ষণ আমি অন্ধবিশ্বাসে সে সকল মানবো কি ক'রে ? আপনি আমায় বুঝিয়ে দিন, আমার জ্ঞানচক্ষু খুলে দিন। তখন আমি সব মানবো।"

শ্রীরামকৃষ্ণের মুখে ফুটিয়া উঠে প্রসন্নতার হাসি। সস্নেহে বলেন, "একদিন তুই সব জানবি, আর সব মানবি। এই ছ্যাখ্, নরেন আগে কিছুই মানতো না। কিন্তু এখন 'রাধে রাধে' বলে নাচে আর কীর্তনে নৃত্য করে। এর পর তুইও সব মানবি।"

"আমায় আপনি সব জানিয়ে দিন, তবে তো।"

"সময়ে তুই সব বুঝতে পারবি। একটা কথা মনে রাখিস্—কখনো একঘেয়ে হস্ নি। আমি একঘেয়ে ভাব ভালোবাসিনে।"

উত্তরকালে আপ্তকাম সাধক স্বামী অভেদানন্দ লিখিয়াছেন, "ইহার কিছুদিন পরে শ্রীশ্রীঠাকুর আমার জ্ঞানচক্ষু খুলিয়া দিলেন। তখন আমি সাধন রহস্যের সকল কথাই জানিতে পারিলাম এবং সকল জিনিস তখন মানিতে লাগিলাম। আর শ্রীশ্রীঠাকুরের অশেষ কৃপার কথা ভাবিলে আজিও আমার দুই চক্ষু জলে ভরিয়া উঠে।"

কাশীপুরে কালীপ্রসাদ সেদিন শ্রীরামকৃষ্ণের পদসেবা করিতেছেন, ঠাকুর বলিলেন, "ওরে, তোর বাবা কাল এসেছিলেন, তোর মা তোর জন্যে কেঁদে সারা হচ্ছেন। তাঁর ইচ্ছে, তুই যেন বাড়িতে গিয়ে তাদের সঙ্গে দেখা ক'রে আসিস্। আমি কথা দিয়েছি। তুই তোর মায়ের কাছে একবার যা।"

ঠাকুরের আজ্ঞা শিরোধার্য করিয়া কালীপ্রসাদ আহিরীটোলার বাড়িতে গিয়া উপস্থিত হন। কিন্তু সেখানে প্রায় আধঘণ্টা সময় কাটানোর পরই মন উচাটন হইয়া উঠিল। কাশীপুরে রোগশয্যায় শায়িত শ্রীরামকৃষ্ণের জন্য ছটফট করিতে লাগিলেন, তারপর পিতা মাতার কাছে বিদায় নিয়া তাড়াতাড়ি চলিয়া আসিলেন।

ঠাকুরের সহিত দেখা হইতেই কহিলেন, "কিরে তুই বাড়িতে যাস নি ?"

কালীপ্রসাদ উত্তর দিলেন, "আজ্ঞে গিয়েছিলাম।"

মা বাবা নিশ্চয় থাকতে বলেছিলেন। তবে থাকলিনে কেন ?"

"ছিলুম তো।"

"কতক্ষণ ছিলি ?"

"আধ ঘণ্টা মাত্র।"

"এত তাড়াতাড়ি ফিরে এলি কেন ?"

"মা বাবা খুব যত্ন করলেন, থাকবার জন্য পীড়াপীড়ি করলেন, কিন্তু আমার বোধ হল, আমি যেন অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে রয়েছি। প্রাণ ছটফট করতে লাগল। একটু মিষ্টি মুখে দিয়েই দৌড়ে পালিয়ে এসেছি। এখানে এসে শান্তি পেলাম।"

শ্রীরামকৃষ্ণ খুশী হইয়া উঠিলেন, স্নেহপূর্ণ স্বরে কহিলেন, "এখানে শান্তি পাবি বৈ কি।"

ঠাকুরের স্নেহ মমতার পিছনে ছিল, আত্মিক শান্তি ও আত্মিক আনন্দের স্পর্শ, এই স্পর্শ কালীপ্রসাদ প্রভৃতি তরুণ সাধকদের রূপান্তরিত করিয়াছিল নূতন মানুষে। তাই সংসার জীবন ও পিতা মাতার স্নেহ মমতা তাহাদের কাছে সে সময়ে তুচ্ছ ও অকিঞ্চিৎকর মনে হইত।

পৌষ সংক্রান্তি প্রায় আসন্ন। গঙ্গাসাগরের মেলায় যাওয়ার জন্য কলিকাতার জগন্নাথ ঘাটে সাধু সন্ন্যাসীরা ভিড় করিতেছে। বুড়ো গোপালের ইচ্ছা, সন্ন্যাসীদের একখানি করিয়া গৈরিক বস্ত্র ও রুদ্রাক্ষ-মালা দান করিবেন। শ্রীরামকৃষ্ণের কানে একথা গেল।

বুড়ো গোপালকে ডাকিয়া কহিলেন, "গঙ্গাসাগর যাত্রী সন্ন্যাসীদের গেরুয়া কাপড় দিলে যে ফল পাবি, তার হাজার গুণ বেশী ফল হবে যদি তুই আমার এই ছেলেদের দিস্। এদের মতো ত্যাগী সাধু আর কোথায় পাবি? এদের এক একজন হাজার সাধুর সমান। হাজারী সাধু। বুঝলি?"

বুড়ো গোপালের মত তখনি পরিবর্তিত হইয়া গেল। ঠাকুরের ত্যাগী ভক্তদেরই তিনি ঐ বস্ত্র ও মালা দান করিলেন।

"নরেন্দ্র, কালীপ্রসাদ প্রভৃতি অনেকেই পরমহংসদেবের আদেশে এক একখানি গৈরিক বস্ত্র ও রুদ্রাক্ষের মালা পরিধান করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিতে গমন করিলেন। তাঁহাদিগকে নবীন সন্ন্যাসীর বেশে দর্শন করিয়া পরমহংসদেব আনন্দসাগরে ভাসিতে লাগিলেন। তাঁহারা একে একে প্রণাম করিতে লাগিলেন এবং পরমহংসদেব তাঁহাদিগকে 'ইষ্ট লাভ হোক' বলিয়া আশীর্বাদ করিতে লাগিলেন। তিনি একটি ক্ষুদ্র শিশিতে রক্ষিত কারণবারি সকলকে আঘ্রাণ করাইয়া এবং সিঞ্চন করিয়া তাঁহাদিগকে সন্ন্যাস আশ্রমের অধিকারী করিলেন। একখানি বস্ত্র অতিরিক্ত ছিল, তাহা গিরিশচন্দ্র ঘোষের জন্য রাখিয়া দেওয়া হইল [১]।"

দশনামী সম্প্রদায়ের চিরাচরিত সন্ন্যাস অথবা তান্ত্রিক বা বৈষ্ণবীয় সন্ন্যাস দানের প্রথা হইতে ঠাকুর রামকৃষ্ণের আচরিত এই প্রথাটি স্বতন্ত্র রকমের। তবুও নরেন, রাখাল, কালীপ্রসাদ প্রভৃতি এগারজন ত্যাগী ভক্ত এখন হইতে ঠাকুরের প্রদত্ত এই সন্ন্যাসকেই মনে প্রাণে গ্রহণ করিলেন, এবং সাদা কাপড় ত্যাগ করিয়া পরিতে শুরু করিলেন গৈরিক কাপড়।

কাশীপুর বাগানে রোগশয্যায় শায়িত শ্রীরামকৃষ্ণের সেবকের সংখ্যা যেমন দিন দিন বাড়িতেছে, তেমনি অজস্র গৃহস্থ ভক্তও আসিতেছেন তাঁহাকে দর্শনের জন্য। অনেকে এখানেই খাওয়া-দাওয়া করিতেছেন। ফলে ব্যয় যথেষ্ট বাড়িয়া গিয়াছে।

১ স্বামী অভেদানন্দের জীবন কথা : শঙ্করানন্দ

প্রবীণ গৃহস্থ ভক্তদের মধ্যে কেউ কেউ ব্যয় সংকোচনের জন্য অতিমাত্রায় উৎসাহী। তাঁহারা প্রস্তাব দেন, ঠাকুরের সেবার জন্য দুইজন ভক্ত বাগানে স্থায়ীভাবে থাকুক। আর সবাই যার যার বাড়ি হইতে এখানে আসা যাওয়া করুক।

একথা শুনিয়া ঠাকুর বিরক্ত হইলেন। নরেন্দ্র, কালীপ্রসাদ প্রভৃতিকে ডাকিয়া কহিলেন, "আমার আর এখানে থাকার ইচ্ছে নেই। এত খরচ চলবে কি ক'রে? ভাবছি, ইন্দ্রনারায়ণ জমিদারকে টানবো নাকি? না, তোরা বড় বাজারের সেই ভক্ত মাড়োয়ারীটাকে ডেকে আন্।"

অতঃপর ঐ মাড়োয়ারী ভক্তটি কিন্তু কিছুদিন পরে প্রচুর অর্থ ভেট নিয়া নিজে হইতেই ঠাকুরের কাছে আসিয়া উপস্থিত হন। তিনি টাকার মোড়কের দিকে কিছুক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া বলেন, "নাঃ, তোমার কাঞ্চন আমি গ্রহণ করবো না।"

ভক্তেরা শ্রীরামকৃষ্ণের সুস্পষ্ট নির্দেশের প্রতীক্ষায় তাঁহার দিকে তাকাইয়া আছেন। তিনি কহিলেন, "তোরা আমায় অন্য কোথাও নিয়ে চল। আমার জন্য তোরা ভিক্ষে করতে পারবি? তোরা যেখানে আমায় নিয়ে যাবি, সেইখানেই যাবো। আচ্ছা, তোরা কেমন ভিক্ষে করতে পারিস্, দেখা দেখি। ভিক্ষার অন্ন শুদ্ধ অন্ন। গৃহস্থের অন্ন খাবার ইচ্ছে আমার নেই।"

ভক্তেরা সমস্বরে জানান, "আপনার জন্য নিশ্চয় আমরা ভিক্ষেয় বেরুবো।"

পরদিন প্রভাতে মা-সারদামণির নিকট হইতে ছেলেরা প্রথম মুষ্টি ভিক্ষা গ্রহণ করেন। তারপর ভিক্ষার জন্য বাহির হন পথে-পথে গৃহস্থ বাড়িতে। কেউ দু'মুষ্টি দেয়, কেউবা শ্লেষোক্তি করে, তাড়া করিয়া আসে। কোনো কোনো মহিলা তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলেন, হোৎকা জোয়ান সব মিন্‌সেরা, গতর খেটে খেতে পারে না, ভিক্ষের জন্য দোরে দোরে ঘুরে বেড়ায়। দূর হয়ে যা এখান থেকে।"

ত্যাগ তিতিক্ষার পথে বাহির হইবার পর নবীন ভক্তদের এ এক

কঠোর বাস্তব অভিজ্ঞতা। সংগৃহীত ভিক্ষাদ্রব্য ঠাকুরের চরণতলে রাখিয়া একে একে তাঁহারা প্রণাম নিবেদন করেন।

সারদামণি সেদিন ঐ ভিক্ষান্ন হইতেই ঠাকুরের জন্য প্রস্তুত করেন চালের মণ্ড। খাইতে খাইতে ঠাকুর বলেন, "ভিক্ষান্ন বড় পবিত্র। এতে কারুর কোনো কামনা নেই। আজ ভিক্ষান্ন খেয়ে আমি পরম আনন্দ লাভ করলাম।"

নিজের মরদেহ ত্যাগের পূর্বে, ত্যাগী তরুণ ভক্তদের সন্ন্যাস-বেশ ধারণের পর, ঠাকুর রামকৃষ্ণ ভিক্ষা গ্রহণের কর্তব্যটিও তাঁহাদের শিখাইয়া দিয়া গেলেন।

তরুণ সাধকেরা প্রায়ই বুদ্ধদেবের জীবনী ও আদর্শ সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন। একবার নরেন্দ্র, তারক এবং কালীপ্রসাদ ঠাকুরকে কিছু না জানাইয়া বুদ্ধগয়ায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। উদ্দেশ্য, বুদ্ধের পুণ্যময় সাধনস্থলীতে বসিয়া কিছুটা তপস্যা করা। এইস্থানে ধ্যানাসনে বসিয়া নরেন্দ্রনাথের জ্যোতি দর্শন হয় এবং তারক ও কালীপ্রসাদের অন্তরে দিব্য আনন্দ ও শান্তির প্রবাহ সঞ্চারিত হয়।

অতঃপর উৎসাহী তরুণ তাপসদের মনে অনুতাপ জন্মে, অসুস্থ ঠাকুরকে ওভাবে ফেলিয়া আসা তাঁহাদের উচিত হয় নাই। আর কালবিলম্ব না করিয়া তাঁহারা কাশীপুরে ফিরিয়া আসিলেন। এ কয়দিন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাদের জন্য উদ্বিগ্ন ছিলেন, তাঁহাদের প্রত্যাবর্তনের পরে তীর্থস্থানের তপস্যা, মাধুকরী প্রভৃতির কাহিনী শুনিয়া তিনি খুশী হইয়া উঠিলেন।

সেদিন বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ঠাকুর রামকৃষ্ণকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন। কথা প্রসঙ্গে কহিলেন, কিছুদিন আগে গয়ার বরাবর পাহাড়ে এক প্রসিদ্ধ হঠযোগীকে তিনি দর্শন করিয়া আসিয়াছেন। গোস্বামীজী তাঁহার সুখ্যাতি করিতে লাগিলেন।

কালীপ্রসাদ মনে মনে সংকল্প করিলেন, এই হঠযোগীকে একবার দর্শন করিবেন এবং সম্ভব হইলে তাঁহার নিকট হইতে কিছু কিছু সাধন প্রক্রিয়া শিখিয়া নিবেন।

একদিন কাহাকেও কিছু না জানাইয়া গোপনে রওনা দিলেন, ট্রেনযোগে উপস্থিত হইলেন গয়াধামে। বরাবর পাহাড়ের নিচেই রহিয়াছে একটি ছোট গ্রাম, এই গ্রামের ধর্মশালাতে নিলেন সে রাত্রির মতো আশ্রয়।

একজন দশনামী পুরী সন্ন্যাসী তখন এই ধর্মশালায় অবস্থান করিতেছেন। কালীপ্রসাদ তাঁহার সহিত ভাব জমাইয়া ফেলিলেন। কথা প্রসঙ্গে জানা গেল, সন্ন্যাসীর নিকট সন্ন্যাস-পদ্ধতি এবং বিরজাহোমের তথ্য সমন্বিত একটি ছোট পুথি আছে। কালীপ্রসাদ তো এ সংবাদে মহা উল্লসিত। তখনি তাড়াতাড়ি সেটি হইতে বিরজাহোমের প্রেষমন্ত্র, মঠ, মড়ি, যোগপট্ট ইত্যাদি সন্ন্যাস মন্ত্র লিখিয়া লইলেন।

পরের দিন রওনা হইলেন পাহাড়ের চড়াইয়ের পথে, হঠযোগীর গুহার দিকে। গ্রামের লোকেরা আগে হইতে কালীপ্রসাদকে সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন, হঠযোগীর গুহায় যাওয়া তেমন নিরাপদ নয়। কাহাকেও সেদিকে অগ্রসর হইতে দেখিলে তাঁহার চেলারা বড় বড় পাথর ছুঁড়িতে থাকে, কেহ তাঁহাদের সাধনা বা ক্রিয়াকলাপে বিঘ্ন জন্মায় ইহা তাহাদের অভিপ্রেত নয়।

গুহার নিকট পৌঁছিলে কালীপ্রসাদের উপরও প্রস্তর-খণ্ড বর্ষিত হইতে থাকে। তিনি তখন এক চাতুরীর আশ্রয় নেন। দূর হইতে হঠযোগী ও তাঁহার চেলাদের প্রণাম জানাইয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠেন, 'ওঁ নমো নারায়ণায়'।

এবার সাধুরা শান্ত হয়, প্রস্তর বর্ষণ স্থগিত রাখে। তাহাদের ধারণা হয়, কালীপ্রসাদ একজন সন্ন্যাসী তাহা দ্বারা কোনো অনিষ্ট হওয়ার আশঙ্কা নাই। কিন্তু নিকটে যাওয়া মাত্র কালীপ্রসাদকে মঠাম্নায়, সন্ন্যাস মন্ত্র ইত্যাদি সম্পর্কে বার বার জেরা করিতে থাকে।

কালীপ্রসাদ সন্থ সন্থ এসব তথ্য জানিয়া আসিয়াছেন, তাই তাঁহার উত্তরে হঠযোগীর চেলারা শান্ত হইল।

আলাপ আলোচনার পর কালীপ্রসাদ বুঝিলেন, আসলে এই সাধুটি হঠযোগী নয়, অঘোরপন্থী। অধ্যাত্ম-সাধন সম্পর্কেও তাঁহার কোনো সুস্পষ্ট ধারণা নাই। স্থির করিলেন, আর কাল-ক্ষেপণ না করিয়া এখান হইতে সরিয়া পড়িবেন।

কিন্তু এই হঠযোগীর খপ্পর হইতে পলায়ন করা বড় সহজ নয়। হঠযোগী ইতিমধ্যে কালীপ্রসাদের প্রতি অত্যন্ত আকৃষ্ট হইয়াছেন। স্থির করিয়াছেন, তাঁহাকে চেলার দলে ভর্তি করিয়া নিবেন। প্রস্তাব জানাইয়া স্পষ্ট ভাষায় তিনি বলিয়াই ফেলিলেন, 'তুমহারা মাফিক চেলা বহুত ভাগ্‌সে মিলতা হ্যায়।'

কালীপ্রসাদ পলায়নের সুযোগ খুঁজিতেছিলেন, হঠাৎ এক ফাঁকে হঠযোগীর গুহা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া দিলেন এক দৌড়। হাঁফাইতে হাঁফাইতে নামিয়া আসিলেন বরাবর পাহাড়ের নিচে।

কাশীপুরে ফিরিয়া আসিলে শ্রীরামকৃষ্ণ কহিলেন, "এতদিন কোথায় গিয়েছিলি তুই, বলতো ?"

কালীপ্রসাদ ঠাকুরকে তাঁহার হঠযোগী সন্দর্শনের সব ঘটনা বিবৃত করিলেন। তারপর কহিলেন, "হঠযোগীকে আমার ভালো লাগল না। আপনার তুলনায় সে কিছুই নয়। তাই তো আপনার চরণতলে আবার ছুটে এলাম।"

ঠাকুর প্রশান্ত স্বরে কহিলেন, "যত বড় সাধু বা সিদ্ধযোগী যে যেখানে আছে, আমি সব জানি। চারখুঁট ঘুরে পায়, কিন্তু এখানে (নিজের বুকে হাত দিয়া) যা দেখছিস্, এমনটি আর কোথাও পাবি নি।" বলিতে বলিতে শায়িত অবস্থায় নিজের চরণটি কালীপ্রসাদের বুকে স্থাপন করিলেন, কালীপ্রসাদ নিমজ্জিত হইলেন অপার আনন্দ সাগরে।

ইতিমধ্যে একদিন কালীপ্রসাদের পিতা শ্রীরামকৃষ্ণের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হন। অনুরোধ জানান, "আপনি কালীপ্রসাদকে

এত ভালোবাসেন, আপনি তাঁর সত্যকার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, তাকে বুঝিয়ে শুনিয়ে বাড়িতে পাঠিয়ে দিন। ঘরের ছেলে ভালোয় ভালোয় ঘরে ফিরে যাক্।

ঠাকুর এবার স্পষ্ট ভাষায় জানাইয়া দিলেন তাঁহাকে, কহিলেন, "তোমার ছেলেকে আমি খেয়ে ফেলেছি। সে এখন আর তোমার নয়। এখান থেকে আর সে ফিরবে না।"

গুরুর কৃপার স্পর্শে, বৈরাগ্যময় সাধনার মধ্য দিয়া কালীপ্রসাদ নূতন মানুষে রূপান্তরিত হইয়াছেন—এ সত্যটি তাঁহার পিতাকে ঠাকুর সেদিন বুঝাইয়া দিলেন দ্ব্যর্থহীন ভাষায়।

আর একদিন সেবাব্রত কালীপ্রসাদকে কহিলেন, "তোদের সঙ্গে আত্মায় আত্মায় সম্বন্ধ—এটা পূর্ব জন্মের জানবি। তোরা যেন বাঁদর আর আমি বাঁদরওয়ালা। বাঁদর যখন দুষ্টুমি করে, বাঁদরওয়ালা দড়িটা একটু টেনে ধরে, তখন বাঁদর ঠিক হয়ে যায়।"

১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই আগস্ট। কালীপ্রসাদ এবং তাঁহার গুরু-ভাইদের শোকসাগরে ভাসাইয়া ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মরলীলা সংবরণ করিলেন। ঘর-সংসার ত্যাগ করিয়া তরুণ ভক্তেরা একান্তভাবে ঠাকুরেরই পদপ্রান্তে আশ্রয় নিয়াছিলেন, সে আশ্রয়টি সেদিন অন্তর্হিত হইয়া গেল।

কিছুদিন পরে মা সারদামণি অযোধ্যা, বৃন্দাবন প্রভৃতি স্থানে তীর্থ দর্শন করিতে যান। এ সময়ে কালীপ্রসাদও তাঁহার সঙ্গী হন।

বৃন্দাবনে উপনীত হইবার পর তাঁহার অন্তরে ইচ্ছা জাগে, ব্রজমণ্ডল পরিক্রমায় বহির্গত হইবেন। সুযোগ পাইয়া বৈষ্ণব বাবাজীদের একটি দলের সঙ্গে তিনি জুটিয়া যান, পরমানন্দে শুরু করেন পরিক্রমা।

পথে যেখানে বিশ্রামের ছাউনি পড়ে, কালীপ্রসাদ 'নারায়ণ হরি' বলিয়া ব্রজমায়ীদের দরজায় গিয়া মাধুকরী করেন, দুই এক টুকরা মড়ুয়ার রুটি যাহা মিলে তাহা দিয়াই কোনোমতে করেন জীবন

ধারণ। এ সময়ে তিনি গৈরিক পরিতেন তাই বাবাজীরা তাঁহাকে সোঽহংবাদী সন্ন্যাসী জ্ঞানে যথাসম্ভব পরিহার করিয়াই চলিতেন। ভাবিতেন, কৃষ্ণের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা নাই। শীঘ্রই একদিন তাঁহাদের ভুল ভাঙিয়া গেল। ভাগবতের গোপীগীতা কালীপ্রসাদের মুখস্থ ছিল। একদিন কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর হইয়া আপন মনে উহার শ্লোক তিনি আবৃত্তি করিতেছিলেন, বাবাজীরা মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইলেন। উৎফুল্ল কণ্ঠে কহিলেন, "আপনি যে কৃষ্ণের পরম ভক্ত, এতদিন আমরা তা বুঝতে পারি নি—আপনাকে দূরে সরিয়ে রেখেছিলাম। এখন দেখছি, আপনি আমাদের অতি আপনার জন। আর আপনাকে আমরা মাধুকরী করতে দেবো না। আপনার সেবার ব্যবস্থা আমরাই করবো।"

পরিক্রমার কালে কৃষ্ণলীলাস্থলগুলি দর্শন করিয়া কালীপ্রসাদের প্রাণ মন আনন্দে পূর্ণ হইয়া উঠিল।

বৃন্দাবন হইতে ফিরিয়া শুনিলেন, বরানগরে রামকৃষ্ণ সন্তানেরা একটি ক্ষুদ্র মঠবাড়ি স্থাপন করিয়াছেন। এ অতিশয় সুসংবাদ। মা-সারদামণির সম্মতি নিয়া কালীপ্রসাদ অচিরে বরানগরের মঠে চলিয়া আসিলেন।

মুন্সীবাবুদের একটি ভুতুড়ে পড়ো বাগানবাড়ি ভাড়া নেওয়া হইয়াছে মঠের জন্য। ভাড়া এগার টাকা, ভক্ত সুরেশ মিত্র ভাড়া চালানোর ভার নিয়াছেন। চরম কৃচ্ছ্রের মধ্যে তিনজন ত্যাগী ভক্ত,—তারক—ছুটকো গোপাল ও বুড়ো গোপাল রামকৃষ্ণের স্মৃতি বুকে ধারণ করিয়া এখানে বাস করিতেছেন। কালীপ্রসাদ হইলেন মঠের চতুর্থ স্থায়ী বাসিন্দা।

এই সময় নরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বশক্তি অসম্ভবকেও সম্ভব করিয়া তোলে। শ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শকে কেন্দ্র করিয়া ত্যাগী ভক্তদের একটি মঠ ও মণ্ডলী স্থাপনে তিনি বদ্ধপরিকর হন। নিজেও সিদ্ধান্ত নেন সংসার ত্যাগ করিয়া স্থায়ীভাবে মঠে যোগ দিবার।

নরেন্দ্র এবং কালীপ্রসাদের যুগ্ম প্রচেষ্টায় মঠ স্থাপনার প্রকৃত ভিত্তিভূমি রচিত হয় এই সময়ে। স্বামী শঙ্করানন্দ এ সময়কার অবস্থার এক চিত্র দিয়াছেন, "শ্রীশ্রীঠাকুরের বিছানার সম্মুখে বসিয়াই সকলে ধ্যান জপ করিতেন। ভিক্ষা করিয়া যখন যাহা জুটিত তাহাই পালা ক্রমে রন্ধন করিয়া সকলে আহার করিতেন। আহারের খুবই কষ্ট ছিল। চাল জুটিত তো নুন জুটিত না—এমন অভাব। কোনো দিন বা শুধু ভাত, কোনো দিন বা তেলাকুচা পাতা-সিদ্ধ ও ভাত আহার করিয়া সকলকে থাকিতে হইত। কালীপ্রসাদ আসিবার সঙ্গে সঙ্গেই আবার নূতন উত্তেজনার সৃষ্টি হইল। নরেন্দ্রনাথ, শরৎ, শশী, রাখাল সকলেই বাড়িতে ফিরিয়া গিয়াছিলেন এবং নিজ নিজ পড়াশুনায় মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। কালীপ্রসাদ আসিয়াই নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করিলেন। তাঁহারা দুইজনে মিলিয়া ভাবী কর্মপদ্ধতির কথা আলোচনা করিতে লাগিলেন। ছেলেদিগকে একত্র রাখিতে হইবে—শ্রীশ্রীঠাকুরের এই আদেশ পালন করিতে না পারিলে নরেন্দ্রনাথ মনে অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছিলেন। এক্ষণে কালীপ্রসাদকে সহায় রূপে প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার উৎসাহ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। দুইজনে মিলিয়া তাঁহারা বালক ভক্তগণের বাড়ি গমন করিতে লাগিলেন এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের আদেশ ও তীব্র বৈরাগ্যোদ্দীপক বাক্য দ্বারা তাঁহাদিগকে সংসার ত্যাগ করিতে প্ররোচিত করিতে লাগিলেন।"

"শেষে বালকভক্তগণের মনে এমন আতঙ্কের সৃজন হইল যে, নরেন্দ্রনাথ ও কালীপ্রসাদকে দেখিতে পাইলে তাঁহারা অনেকেই দ্বার বন্ধ করিয়া সরিয়া পড়িবার চেষ্টা করিতেন। নরেন্দ্রনাথও ছিলেন নাছোড়বান্দা। তিনি দরজাতে লাথি ও কিল দিয়া এমনই অবস্থার সৃষ্টি করিতেন যে, তাঁহারা কিংকর্তব্যবিমূঢ় ও ভীত হইয়া দ্বার খুলিয়া দিতে বাধ্য হইতেন। বালকগণের অভিভাবকেরা ইহা ভালো চক্ষে দেখিতেন না। সুতরাং তাহাদের অনুপস্থিতিতেই এই কার্য সকল করিতে হইত। তৎকালে অভিভাবকগণ নরেন্দ্রনাথ ও

কালীপ্রসাদের এই প্রকার আচরণের সংবাদে অত্যন্ত সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। একদিন তাহারা দুইজন ও হুটকো গোপাল, শরৎ ও শশীর বাড়িতে উপস্থিত হইয়া দরজায় ধাক্কা দিতে লাগিলেন। শরৎ দরজা খুলিবেন না, আর নরেনও ছাড়িবেন না। অবশেষে নরেন্দ্রনাথ দরজায় আরও জোরে করাঘাত করিয়া শরৎকে দরজা খুলিতে বাধ্য করিলেন। ঘরে প্রবেশ করিয়াই নরেন্দ্রনাথ অবিরত তীব্র বৈরাগ্য ও ভগবদ্ লাভের প্রসঙ্গ তুলিয়া এক অপূর্ব আধ্যাত্মিক আবেষ্টনীর সৃষ্টি করিলেন। শরৎ ও শশী তাঁহার সেই আবেগময়ী বাক্যস্রোতে সত্যই ভাসিয়া গেলেন। সবশেষে নরেন্দ্রনাথ যখন বলিলেন: 'চল্ বরানগর মঠে যাই,' তখন আর তাঁহারা আপত্তি করিতে পারিলেন না। শরৎ ও শশী গায়ে চাদর ফেলিয়া তখনই তাহাদের সহিত বরাহনগরে রওনা হইলেন।"

বরাহনগর মঠে নবীন সাধকদের ত্যাগ বৈরাগ্য ও কৃচ্ছ্রসাধন চরমে উঠিয়াছিল। কিন্তু নরেন্দ্রনাথের প্রেরণা ও নেতৃত্বের এমনই প্রভাব ছিল যে, এই কঠোর জীবনের দুঃখ কষ্টকে কেহ গায়ে মাখিতেন না। এ সময়কার স্মৃতিচারণ করিতে গিয়া উত্তরকালে স্বামী অভেদানন্দ বলিয়াছেন: "মহা সমাধির পূর্বে একদিন রাত্রে শ্রীশ্রীঠাকুর নরেন্দ্রনাথকে কাছে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন: 'তুই ছেলেদের একত্রে রাখিস্ ও তাদের দ্যাখাশোনা করিস্।' আমরা শ্রীশ্রীঠাকুরের সেই নির্দেশ স্মরণ করাইয়া নরেন্দ্রনাথকেই সকলের প্রধান করিয়া তাহার নির্দেশ অনুসারে চলিতাম এবং মঠে নিয়মিত-ভাবে ধ্যান-ধারণা. পূজা-পাঠ, কীর্তনাদি করিয়া দিন অতিবাহিত করিতাম। প্রকৃতপক্ষে নরেন্দ্রনাথই ছিল আমাদের সকল সময়ের আশা-ভরসা ও সুখ-সান্ত্বনার স্থল। তখন সকলের জীবন অতিশয় দুঃখ-কষ্ট ও দারিদ্র্যের মধ্য দিয়া অতিবাহিত হইলেও একমাত্র শ্রীশ্রীঠাকুরকে জীবনে সহায় সম্বল করিয়া মনের আনন্দেই দিনযাপন করিতাম। অবশ্য খাওয়া-পরার তখন অত্যন্ত কষ্ট ছিল।"

"তারকদাদা, আমি, লাটু গোপালদাদা প্রভৃতি সকলে ভিক্ষায়

বাহির হইয়া সামান্যভাবে যে চাল প্রভৃতি পাইতাম তাহাই সকলে পালা করিয়া রান্না করিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতাম। কোনো কোনো দিন শাক্-সব্জী কোনোরূপ না পাইয়া তেলাকুচার পাতা আনিয়া সিদ্ধ করিতাম ও তাহা দিয়া ভাত খাইতাম। অবশ্য আহার আমাদের একবেলাই জুটিত। সকলের পরনে কাপড় ছিল না। একখানি কাপড় ছিঁড়িয়া কৌপীন করিয়া আমরা তাহাই পরিতাম এবং আর একখানি মাত্র কাপড় আমরা রাখিয়া দিতাম, কেহ কোথাও গেলে সেইখানি পরিয়াই বাহির হইত। সেই সব দুঃখ-কষ্টের দিনের কথা আর কি বলিব! তবে এখন সেই সব দিনের কথা মনে হইলে মন আনন্দে ভরিয়া ওঠে!"

এই সময়ে তরুণ রামকৃষ্ণ তনয়দের মধ্যে কৃচ্ছ্র, ধ্যান ও শাস্ত্র-পাঠের উৎসাহ চরমে উঠে। কালীপ্রসাদের একটি ক্ষুদ্র নিজস্ব ঘর ছিল, সেখানে দিনের পর দিন তিনি তপস্যা ও স্বধ্যায়ে মগ্ন থাকিতেন, দেহের দিকে দৃষ্টি দিবার অবসর ছিল না। তাঁহার ঐ ঘরটিকে গুরুভাইরা বলিতেন, কালীতপস্বীর ঘর।

একদিন মঠের বারান্দায় শুইয়া কালীপ্রসাদ ধ্যান করিতেছিলেন, ক্রমে বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া ফেলিলেন। মধ্যাহ্নের সূর্যকরে বারান্দার ধূলিরাশি উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে, উহারই উপর তিনি শুইয়া আছেন। এসময়ে স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যম ভ্রাতা মহেন্দ্রনাথ দত্ত মঠে বেড়াইতে আসিয়াছেন। কালীপ্রসাদকে অসাড় অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া তাঁহার কাছে গেলেন। হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিয়া দেখিলেন, রৌদ্রে দেহটি তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে, জীবনের কোনো লক্ষণ নাই। মহেন্দ্রনাথ চমকিয়া উঠিলেন, ভাবিলেন, অত্যধিক কঠোর তপস্যা করিতে গিয়া কালীপ্রসাদের মৃত্যু ঘটিয়াছে।

মঠের অভ্যন্তরে গিয়া বিষণ্ণ স্বরে একথা জানানোর সঙ্গে সঙ্গে যোগানন্দ হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "ও কি মরে? ও শালা অমনি ক'রেই ধ্যান করে।" কালীপ্রসাদের ধ্যাননিষ্ঠা সম্পর্কে সে সময়ে সকল গুরুভাই-ই উচ্চ ধারণা পোষণ করিতেন।

মঠের গুরু-ভাইদের মধ্যে এসময়ে যে অচ্ছেদ্য বন্ধুত্ব ও অন্তরঙ্গতা গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহার তুলনা সত্যই বিরল। একদিন নরেন ও কালীপ্রসাদ কোনো কাজ উপলক্ষে কলিকাতায় গিয়াছেন। গৃহী ভক্তদের বাড়িতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া আলাপ আলোচনাদি করিলেন, কিন্তু কোথাও কেহ আহারাদি করার কথা বলিলেন না। ক্রমে বেশ রাত্রি হইয়া আসিল। নরেন্দ্র ও কালীপ্রসাদ এবার নরেন্দ্রের পৈত্রিক বাড়িতে উপস্থিত হইলেন। বাড়িতে তখন চরম আর্থিক দুর্গতি চলিতেছে, জ্ঞাতিদের সহিত মোকদ্দমায় তাঁহারা সর্বস্বান্ত হইয়াছেন, দু-মুঠো অন্নেরও সংস্থান নাই। অবস্থাটি উভয়েরই জানা ছিল, তাই বাড়িতেও আহারের কথা তাঁহারা বলিলেন না।

সারাদিন একেবারে অনাহারে গিয়াছে, রাত্রিতে খাবার মিলিবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু সব চাইতে বড় বিপদ পৌষের প্রচণ্ড শীত। নরেন বা কালীপ্রসাদ কাহারও একটুকরা গাত্রবস্ত্র নাই।

এ অবস্থায় কি করা যায়? কোঁচার কাপড় কোনোমতে গায়ে জড়াইয়া দুইজন পিঠাপিঠি করিয়া শুইয়া রহিলেন। তামাক খাওয়া, বেদান্তের আলোচনা সবই চলিতে লাগিল, কিন্তু শীত কিছুতেই যাইতেছে না। অনাহারে শরীরও অবসন্ন।

কালীপ্রসাদ কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন, "ভাই নরেন, শীতের দাপটে সে আর ঘুমুতে পারছিনে।"

নরেন উত্তর দিলেন, "দূর শালা. ভেবে কি হবে, আর একটু ঠাসাঠাসি করে শো।"

অতঃপর কালীপ্রসাদের খুব কষ্ট হইতেছে বুঝিয়া নরেন উঠিয়া বসিলেন। কহিলেন, "থাম্ শালা, উঠে ব'স, দেখি তো তোর জন্য চায়ের যোগাড় করতে পারি কিনা।" খুঁজিয়া পাতিয়া কিছু চা চিনি ও কেটলী সংগ্রহ করা গেল।

চা তৈরি হইলে, নরেন কহিলেন, "কিরে শালা, জেগে আছিস্?"

কালীপ্রসাদ তখনো শীতে কাঁপিতেছেন, কহিলেন, "এ অবস্থায়

জেগে থাকবো না তো কি? ঘুম আর হল কোথায়। শীতে যে আমার গা কালিয়ে যাচ্ছে।"

"লে শালা, চা খা, একটু গরম হয়ে নে।" বলিয়া নরেন চায়ের বাটিটি কালীপ্রসাদের হাতে দিলেন।

কিছুক্ষণ পরেই রাত্রি প্রভাত হইল, উভয়ে তাড়াতাড়ি চলিয়া গেলেন বরাহনগরের দিকে।

সুখে-দুঃখে আপদে-বিপদে তরুণ রামকৃষ্ণ-তনয়েরা এমনিভাবে দিনের পর দিন একত্রে দিন কাটাইয়াছেন, নিজেদের মধ্যে গড়িয়া তুলিয়াছেন এক অচ্ছেদ্য আত্মিক বন্ধন।

মঠে তরুণ সাধকেরা শাস্ত্রপাঠ, জপধ্যান ও কীর্তনে মাতিয়া রহিয়াছেন। এ সময়ে হঠাৎ একদিন নরেন্দ্রনাথ বলেন, "আমি ভাবছি, সবাই মিলে এবার আমরা শাস্ত্রমতে সন্ন্যাস নিই। তোমাদের কি মত?"

কালীপ্রসাদ মন্তব্য করেন, "শাস্ত্রমতে সন্ন্যাস নিলে আমাদের বিরজা হোম করতে হবে। বিরজা হোমের মন্ত্র কিন্তু আমার কাছে রয়েছে।"

নরেন্দ্রনাথ কৌতূহল হইয়া প্রশ্ন করেন, "তাই নাকি? তুমি ঐ মন্ত্র কি ক'রে পেলে?"

কালীপ্রসাদ জানাইলেন, "বরাবর পাহাড়ে সে-বার হঠযোগীর সন্ধানে গিয়েছিলাম, জান তো? তখন পাহাড়ের নিচেকার ধর্মশালায় এক সন্ন্যাসীর খাতা থেকে এগুলো টুকে রেখেছিলাম।"

নরেন্দ্রনাথ তো মহা আনন্দিত। বলেন, "তাহলে এসব ঠাকুরেরই কৃপা। কেমন শুভ যোগাযোগ দ্যাখো। এসো আমরা বিরজা হোম সম্পন্ন করে শাস্ত্রীয় মতে পুরোপুরি সন্ন্যাসী হই।" সকলে সোৎসাহে একথা সমর্থন করিলেন।

কালীপ্রসাদ এই অনুষ্ঠানের বিবরণ দিতে গিয়া লিখিয়াছেন, "একদিন প্রাতঃকালে সকলে গঙ্গায় স্নান করিয়া বরাহনগরে

মঠে ঠাকুরঘরে শ্রীশ্রীঠাকুরের পবিত্র পাতুকার সম্মুখে উপবেশন করিলাম। শশী বিধিমতো শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজা সমাপ্ত করিল। হোমের জন্য কিছু বিল্বকাষ্ঠ, বারোটি বিল্বদণ্ড ও গব্যঘৃত সংগ্রহ করা হইয়াছিল, অগ্নি প্রজ্বলিত করা হইল। নরেন্দ্রনাথের আদেশে আমি তন্ত্রধারক-রূপে, আমার খাতা হইতে সন্ন্যাসের প্রেষমন্ত্র পাঠ করিতে লাগিলাম। প্রথমে নরেন্দ্রনাথ ও পরে রাখাল, নিরঞ্জন, শরৎ, শশী, সারদা প্রভৃতি সকলে আমার পাঠের সঙ্গে সঙ্গে প্রেষমন্ত্র পড়িতে পড়িতে প্রজ্বলিত অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিল। পরে আমি নিজেই প্রেষমন্ত্র পড়িয়া অগ্নিতে আহুতি দিলাম। অবশ্য সন্ন্যাসদীক্ষা আমরা পূর্বেই শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকটে পাইয়াছিলাম। পূর্বে গোপালদাদা কর্তৃক গঙ্গাসাগর মেলায় আগত সাধুদের উদ্দেশে দান করার জন্য বারোখানি গৈরিক বস্ত্র ও রুদ্রাক্ষের মালা আমরা শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট হইতে পাইয়াছিলাম, তবে শাস্ত্রমতে সন্ন্যাসানুষ্ঠান আমাদের বরাহনগরের মঠে হইয়াছিল।"

সন্ন্যাস গ্রহণের পর নরেন্দ্র নাম গ্রহণ করিলেন বিবিদিষানন্দ,[১] রাখাল—ব্রহ্মানন্দ আর কালীপ্রসাদ—অভেদানন্দ। অপর সকলেও নরেন্দ্রনাথের পরামর্শ মতো নাম গ্রহণ করিলেন।

কিছুদিন পরে মা সারদামণির আশীর্বাদ নিয়া স্বামী অভেদানন্দ তীর্থ ভ্রমণের জন্য বহির্গত হন। প্রথমে উত্তরাখণ্ডের হরিদ্বার, হৃষিকেশ, বদরী, কেদার প্রভৃতি এসময়ে তিনি পরিভ্রমণ করেন।

পরিব্রাজক অভেদানন্দ এসময়ে সংকল্প গ্রহণ করেন, টাকা-পয়সা তিনি স্পর্শ করিবেন না, রন্ধন করিবেন না, জামা পরিধান করিবেন না এবং কাহারও গৃহে শয়ন করিবেন না। তাছাড়া,

১ পরবর্তীকালে নরেন্দ্রনাথ এই বিবিদিষানন্দ নাম পরিবর্তন করিয়া বিবেকানন্দ নাম গ্রহণ করেন। তাঁহার শিষ্য ক্ষেত্রীর রাজা অজিত সিং-এর পরামর্শমতো এই নাম নিয়া তিনি আমেরিকা যান। দ্রঃ স্বামী বিবেকানন্দ: এ ফরগটন্ চ্যাপ্‌টার অব হিজ লাইফ—বি. এস. শর্মা।

মাধুকরী করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিবেন, আর রাত্রিকালে আশ্রয় নিবেন কোনো বৃক্ষতলে।

এই পরিব্রাজনের সময় বহু বিপদে ও সংকটে তিনি পড়িয়াছেন, কিন্তু প্রতিবারই উদ্ধার পাইয়াছেন সদ্‌গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপা বলে। নির্জন অরণ্যে, পথে প্রান্তরে, নিভৃত ধ্যানগুহায় সর্বত্র অলক্ষ্যে থাকিয়া সদ্‌গুরুই জুটাইয়া দিয়াছেন আহার এবং আশ্রয়, প্রতিপদে তাঁহাকে রক্ষা করিয়া চলিয়াছেন।

এই পরিব্রাজনের সময়ে দীর্ঘদিন তিনি হৃষিকেশে অবস্থান করেন। ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বেদান্তী ধনরাজ গিরির আশ্রম ছিল এই স্থানে। অভেদানন্দ তাঁহার নিকট থাকিয়া বেদান্ত অধ্যয়ন করেন এবং জ্ঞানমার্গের উচ্চতম তত্ত্বসমূহে পারঙ্গম হইয়া উঠেন।

ইহার কিছুকাল পরে স্বামী বিবেকানন্দের সহিত হৃষিকেশে ধনরাজ গিরির সাক্ষাৎ ঘটে। স্বামীজী অভেদানন্দ সম্পর্কে প্রশ্ন করিলে গিরি মহারাজ মন্তব্য করেন, "অভেদানন্দ? উসকো তো অলৌকিকী প্রজ্ঞা থে।"

অতঃপর পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতের তীর্থ সম্পর্কে পরিব্রাজন করিয়া অভেদানন্দ কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিলেন। মঠ তখন আলম বাজারে স্থানান্তরিত হইয়াছে। সেখানে পৌঁছিয়া তিনি খুশী হইয়া উঠিলেন। পূর্বেকার মতো আর্থিক দুরবস্থা আর নাই। এখন কিছুটা সচ্ছলতার মুখ দেখিতেছেন তরুণ তাপসেরা। গৃহস্থ ভক্তেরা নানারকমের ভেট পাঠাইতেছেন, ঠাকুরের পূজা ও ভোগরাগের এ সময়ে আর কোনো অসুবিধা নাই।

১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে পাওয়া গেল এক অপ্রত্যাশিত সংবাদ। চিকাগো ধর্ম-মহাসভায় স্বামী বিবেকানন্দ হিন্দুধর্মের প্রতিনিধিরূপে এক ঐতিহাসিক ভাষণ দিয়াছেন, সারা আমেরিকায় তুলিয়াছেন বিপুল আলোড়ন।

কিছুদিনের মধ্যে মঠে স্বামী বিবেকানন্দের এক পত্র আসিল। তিনি লিখিয়াছেন, তাঁহার বিরুদ্ধে অভিসন্ধিমূলক প্রচার চলিয়াছে

এবং বলা হইতেছে, তিনি হিন্দুধর্মের কোনো প্রতিনিধি নহেন এবং আসলে একটি ভ্যাগাবণ্ড মাত্র। তাই অবিলম্বে কলিকাতায় একটি সর্বজনীন সভা আহ্বান করা প্রয়োজন। এই সভার প্রস্তাবে বলিতে হইবে যে স্বামী বিবেকানন্দ হিন্দুধর্মের প্রতিনিধি এবং তাঁহার প্রচার-কর্মে ভারতের জনগণের বিপুল সমর্থন রহিয়াছে।

অভেদানন্দ সারদানন্দ প্রভৃতি গুরুভাইরা এই কার্য সাধনে তৎপর হইয়া উঠিলেন। কলিকাতায় এক বিরাট সভা অনুষ্ঠিত হইল এবং গৃহীত প্রস্তাব প্রেরিত হইল আমেরিকায়।

কলিকাতার এই সময়কার কর্মতৎপরতা সম্পর্কে বিবেকানন্দের ভ্রাতা মহেন্দ্র দত্ত মহাশয় লিখিয়াছেন, "কালী বেদান্তী এই সময়ে প্রাণপণে খাটিয়াছিলেন। উন্মাদের মতো দিবারাত্র কাজ করিয়া টাউনহলের সভা করিয়াছিলেন। তাঁহার পরিচিত ব্যক্তিদিগের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া সভার কার্যপ্রণালী মুদ্রিত করা এবং এই রিপোর্টগুলি নানা প্রেসে পাঠানো প্রভৃতি সমস্ত কার্য তিনি সাধনার মতো করিয়াছিলেন।"

১৮৯৬ সালে স্বামী অভেদানন্দের জীবনে সংযোজিত হয় এক নূতন অধ্যায়। 'কালী বেদান্তীর' অভ্যুদয় দেখা দেয় আধুনিক যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বেদান্ত-প্রচারক সন্ন্যাসীরূপে প্রথমে ইংল্যাণ্ডে পরে আমেরিকায় গিয়া তিনি অদ্বৈত বেদান্ত ও শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবধারা প্রচার করেন। বিশেষত আমেরিকায় প্রায় পঁচিশ বৎসর কাল অবস্থান করিয়া বিবেকানন্দের প্রচারিত ভাবধারাকে বিস্তারিত করেন এবং গড়িয়া তোলেন একটি দৃঢ়সম্বদ্ধ সংগঠন।

বিবেকানন্দ সে-বার আমেরিকা হইতে লণ্ডনে আসিয়াছেন। সেখানকার বেদান্তের প্রচারে প্রয়োজন এক সুযোগ্য গুরুভ্রাতার। এজন্য আহ্বান করিয়া নিলেন স্বামী অভেদানন্দকে।

প্রায় মাসখানেক যাবৎ অভেদানন্দ লণ্ডন শহরে আসিয়াছেন, সেখানকার রীতিনীতি ধীরে ধীরে আয়ত্ত করিয়া নিতেছেন। এ

সময়ে বিবেকানন্দ নানা স্থানে বক্তৃতা দিয়া বেড়াইতেছিলেন। সেদিন হঠাৎ তিনি অভেদানন্দকে ডাকিয়া কহিলেন, "এখানকার ক্রাইস্ট থিয়োসফিক্যাল সোসাইটিতে তোমায় বক্তৃতা দিতে হবে। বক্তা হিসাবে তোমার নাম ওরা ছাপিয়ে দিয়েছে।"

অভেদানন্দ তো আকাশ হইতে পড়িলেন। উদ্বিগ্ন স্বরে কহিলেন, "সে কি কথা! আমি কি ক'রে বক্তৃতা দেব? আমি তো বক্তৃতা করতে জানি নে।"

"ও কথা শুনবো না, বক্তৃতা তোমায় দিতেই হবে।"

"আমার সে ক্ষমতা একেবারেই নেই, আমি কিছুতেই করতে পারবো না।"

"তবে এখানে এলে কেন?" উত্তেজিত স্বরে বলেন বিবেকানন্দ।

"তুমি ডেকেছিলে তাই। বলতো আবার ফিরে যাচ্ছি। বক্তৃতা দিতে হবে এ কথা জানালে কখনই আমি আসতুম না।"

এবার বিবেকানন্দ দৃঢ়স্বরে বলেন, "তা হবে না। এখানে তোমায় থাকতে হবে, আর বক্তৃতা দেওয়া শিখতেও হবে।"

"আমি পারব না।"

"তুমি কি তা'হলে আমায় অপদস্থ করতে চাও?"

"কেন অপদস্থ হবে?"

"এ সভায় বক্তৃতা দিতে আমাকেই নিমন্ত্রণ করেছিল। আমি বলেছি এবার আমি বক্তৃতা করবো না, আমার এক গুরুভ্রাতা এখানে এসেছেন, তিনি মহাপণ্ডিত, তিনিই বক্তৃতা করবেন। তাঁরা শুনে খুব খুশী হলেন এবং নোটিশ ছাপাতে দিলেন।"

"তুমি আমায় আগে কিছু না জানিয়ে ও রকম নিমন্ত্রণ নিলে কেন?"

"নিয়ে ফেলেছি এখন আর কি হবে?"

এতক্ষণে অভেদানন্দ কিছুটা নরম হইলেন। কহিলেন, "তবে বক্তৃতা কি ক'রে আরম্ভ ও শেষ করতে হয় আমায় বলে দাও।"

"আমাকে কে কবে বলে দিয়েছিল? তোমার অন্তর যে ভাবে,

যে রসে, পূর্ণ হয়ে রয়েছে, তাই দাঁড়িয়ে উঠে ঢেলে দেবে। তুমি তো কালী-বেদান্তী, এতদিন বেদান্তের কত আলোচনা করলে, সেই সম্বন্ধে বলবে। এই তো পঞ্চদশী একখানি বেদান্ত গ্রন্থ—এতে যা শিক্ষা দেয় তা ইংরেজীতে লেখ। লিখে কয়েকবার তা পড়ে ফেল। পরে সভায় দাঁড়িয়ে তাই বলবে।”

“ইংরেজীতে লেখা যে আমার অভ্যেস নেই।”

“চেষ্টা কর, ট্রাই ট্রাই ট্রাই এগেন। প্র্যাক্‌টিস কর। প্র্যাকটিস্ মেক্‌স্ এ ম্যান পারফেক্ট।”

অভেদানন্দ মহা সমস্যায় পড়িলেন। নিজের অক্ষমতার কথা ভাবিতে গেলেই হতাশ হইয়া পড়েন। সত্যিই তো নোটিশ দেওয়া হইয়া গিয়াছে, এখন বক্তৃতা না করিলে স্বামী বিবেকানন্দকে যে এখানকার সমাজে অপদস্থ হইতে হইবে। ইহা তো অভেদানন্দ প্রাণ থাকিতে ঘটিতে দিতে পারেন না।

অগত্যা সাহসে বুক বাঁধিয়া বক্তৃতা দিবার জন্য তিনি প্রস্তুত হইলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীমাকে ভক্তিভরে স্মরণ করিয়া ‘পঞ্চদশী’ অবলম্বন করিয়া লিখিয়া ফেলিলেন এক দীর্ঘ প্রবন্ধ। তারপর বার বার সেটি পাঠ করিয়া আয়ত্ত করিয়া নিলেন।

ইষ্ট স্মরণ করিয়া অভেদানন্দ বক্তৃতামঞ্চে দণ্ডায়মান হইলেন। কোনো জনসভাতেই ইতিপূর্বে কখনো ভাষণ দেন নাই, তাছাড়া এ সভা যে ইংলণ্ডের মতো প্রাগ্রসর দেশের এমন একটি সভা যেখানে শিক্ষিত ও সংস্কৃতিবান্ শ্রোতারা সমবেত হইয়াছেন। আর সম্মুখে বসিয়া আছেন স্বামী বিবেকানন্দ। তাই মনে কিছুটা আতঙ্ক ও দৌর্বল্যের সঞ্চার হইল। কিন্তু ধৈর্য সহকারে নিজেকে শক্ত ও দৃঢ় করিয়া নিলেন, শ্রোতারা তাঁহার দৌর্বল্য বা চাঞ্চল্যের কথা জানিতে পারিলেন না। ক্রমে আত্মস্থ হইয়া বিশুদ্ধ ইংরেজী ভাষায় অনর্গল-ভাবে বেদান্তের উচ্চতম তত্ত্বগুলি তিনি চমৎকার ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। দেবী স্বরস্বতী সেদিন যেন তাঁহার কণ্ঠে অধিষ্ঠিতা। মা সারদামণি এক সময়ে অভেদানন্দকে আশীর্বাদ করিয়াছিলেন, ‘বাবা,

সরস্বতী তোমার কণ্ঠে অধিষ্ঠাতা হোন্', সে কথা এবার সর্বসমক্ষে ফলিয়া গেল।

লণ্ডনে দুই গুরুভ্রাতা যে অন্তরঙ্গ পরিবেশে বাস করিতেন, শঙ্করানন্দজী তাঁহার কিছুটার বর্ণনা দিয়াছেন, "নূতন বাড়িতে স্বামীজী, গুড্উইন এবং অভেদানন্দ বাস করিতে লাগিলেন। গুড্উইন স্বামীজীর বক্তৃতা সাঙ্কেতিক লিপিদ্বারা লিখিয়া লইতেন ও বাজার করিতেন। অভেদানন্দ বাড়ির কাজকর্ম ও রন্ধনাদি করিতেন। বাড়িতে দাসদাসী ছিল না। স্বামীজীও মাঝে মাঝে রাঁধিতেন এবং ইংরেজ বন্ধুগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া খিচুড়ী, নিরামিষ ডালনা প্রভৃতি ভারতীয় খাদ্য আহার করাইতেন। গুড্উইন রান্না করিবার চেষ্টা করিতেন কিন্তু কিছুই করিতে পারিতেন না।

"স্বামীজী যেদিন সন্ধ্যার পর সুদীর্ঘ বক্তৃতা দিতেন সেদিন তাঁহার সুনিদ্রা হইত না। মস্তকে রক্ত উঠিয়া মস্তিষ্ক গরম হইয়া যাইত। অভেদানন্দ রাত্রি জাগিয়া তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া দেওয়া প্রভৃতি সেবাকার্য করিতেন। স্বামীজীর আহার সম্বন্ধে কোনো নিয়ম ছিল না। কোনোদিন খুব পেট ভরিয়া মৎস্যাদি আহার করিতেন, আবার কোনো দিন ফলাহার, কোনো দিন উপবাস বা অর্ধ উপবাস করিয়া থাকিতেন। এইরূপ অনিয়মের জন্য তিনি প্রায়ই পেটের অসুখে ভুগিতেন। অভেদানন্দ তাঁহাকে আহার সুনিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য বারম্বার অনুরোধ করিতেন।"

লণ্ডনের বেদান্ত সমিতির সভাপতিরূপে স্বামী অভেদানন্দ প্রায় বৎসরখানেক কৃতিত্বের সহিত কাজ করেন। তারপর স্বামী বিবেকানন্দের আহ্বানে তিনি আমেরিকায় গিয়া উপস্থিত হন।

বেদান্ত আন্দোলনের মধ্য দিয়া স্বামী বিবেকানন্দ তখন সারা আমেরিকাতে এক বিরাট চাঞ্চল্য সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সেখানকার শিক্ষিত সমাজে ভারতের ধর্ম ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে জাগিয়া উঠিয়াছিল বিস্ময়কর শ্রদ্ধা। স্বামী বিবেকানন্দের ঐ আন্দোলন সীমাবদ্ধ ছিল

একটি ক্ষুদ্র উদারপন্থী দলের মধ্যে। পরে স্বামী অভেদানন্দ ঐ আন্দোলনকে স্থায়িত্ব দেন, এবং আরো বিস্তারিত করিয়া তোলেন।

প্রায় পঁচিশ বৎসর তিনি আমেরিকায় বসবাস করেন এবং নিজের প্রতিভা কর্মকুশলতার গুণে সে দেশের শ্রেষ্ঠ মনীষী ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিদের শ্রদ্ধা অর্জন করিতে সমর্থ হন।

সেদেশে গোড়ার দিকে অভেদানন্দকে দারিদ্র্য ও প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে তীব্র সংগ্রাম করিতে হয়। নিজের স্মৃতিচারণে তিনি লিখিয়াছেন[১], "স্বামী বিবেকানন্দ বেদান্ত প্রচারের যতটুকু সূত্রপাত করেছিলেন আমেরিকায়, তা সফল ক'রে তুলতে আমি উপায় খুঁজতে লাগলাম। কাজ চালাবার জন্য আমার কাছে তখন টাকা পয়সা কিছুই ছিল না বা কোনোরকম দানও ছিল না। কাজেই নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে আমাকে একাই ঘরভাড়া ও হোটেলের খরচপত্র, লেকচার হলের ভাড়া, নিজের পকেট খরচা, বিভিন্ন সাপ্তাহিক ও অন্যান্য খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়ার টাকা-পয়সা সবই সংগ্রহ করতে হয়েছিল। ক্লাস ও সাধারণ বক্তৃতার পর শ্রোতারা স্বেচ্ছায় যে যা দিত তা' ছাড়া টাকা-পয়সা পাবার আর কোনো উপায় ছিল না। কিন্তু আমার খরচ, তার তুলনায় আয় খুব সামান্য ছিল। কাজেই নিজের সকল কিছু সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জন দিয়ে সে সময়ে ছাত্রদের কাছেই আতিথ্য গ্রহণ ক'রে আমার অনেকদিন খরচ সংকুলান করতে হয়েছে। এটা ছিল একরকম ভারতের সন্ন্যাসীদেরই ভিক্ষাবৃত্তির মতো।"

ক্রমে এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটে, স্বামী অভেদানন্দের মনীষা প্রতিভাদীপ্ত ভাষণ, বাগ্মিতা এবং পূত চরিত্রে আকৃষ্ট হইতে থাকেন আমেরিকার একদল বুদ্ধিজীবী ও মুমুক্ষু নরনারী। সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় ছিল তাঁহার ধর্মতত্ত্ব ব্যাখ্যানের কৌশল। আবেগ ও ভাবময়তা অপেক্ষা যুক্তিতর্কের সাহায্যই তিনি বেশী পরিমাণে নিতেন। বেদান্তে পরম তত্ত্বের সঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞান ও পাশ্চাত্য

১ লীভস্ অব্ মাই ডায়েরী : অভেদানন্দ (অনুবাদ : প্রজ্ঞানানন্দ)

জীবনধারার কোনো বিরোধ নাই, এ কথাটি সর্বদাই তিনি জোর দিয়া বলিতেন।

"হিন্দুইজ্‌ম ইন্‌ভেডস আমেরিকা'র লেখক মিঃ ওয়েলডন টমাস অভেদানন্দের জনপ্রিয়তা প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন,[১] "স্বামী অভেদানন্দের মধ্যে আপন ক'রে নেবার শক্তি বিশেষভাবে আমাদের নজরে পড়েছে। মার্কিন দেশের প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে তাঁর বাণী এবং জীবনধারাকে তিনি মিশিয়ে নিয়েছিলেন:…ঐতিহাসিক ঘটনাসমূহ এবং কর্মপরিধির দিকে দৃষ্টিপাত করলে আমরা দেখি—স্বামী অভেদানন্দ তাঁর বিশ্ববরেণ্য নেতার চেয়ে প্রাচ্যের বেদান্ততত্ত্বকে পাশ্চাত্যের সংস্কৃতির সঙ্গে বরং অধিকতররূপে খাপ খাওয়াতে পেরেছিলেন। জ্বলন্ত ও অনর্গল ভাষা-নিঃসারী বাগ্মিতা দিয়ে অভিভূত না ক'রে, সত্যকার যুক্তিতর্ক এবং নূতন নূতন আকর্ষণীয় তথ্যের সাহায্যে শ্রোতার মন জয় করার দিকে তিনি বেশী নজর দিয়েছিলেন।"

যীশুখ্রীষ্ট ও খ্রীষ্টান ধর্মসম্পর্কে অভেদানন্দ তাঁহার বক্তৃতায় যে নূতন মূল্যায়ন করেন তাহা আমেরিকার মনীষীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অধ্যাপক কর্সন এ প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, "আপনার বক্তৃতা সম্বন্ধে আমার ধারণার জগতে একটা যুগান্তর এনে দিয়েছে। সম্বন্ধে এমনি এক চূড়ান্ত মীমাংসা আপনি করেছেন যাতে গোঁড়ামি ভাবাপন্ন খ্রীষ্টান মতকেও পরিশেষে আপনার সিদ্ধান্তের কাছে মাথা নোয়াতে হয়েছে।"

অদ্বৈততত্ত্ব নিয়া অভেদানন্দের সঙ্গে আমেরিকার প্রসিদ্ধ দার্শনিক অধ্যাপক উইলিয়াম জেমস-এর দীর্ঘ বিতর্ক হয়। অধ্যাপক জেমস অবশেষে বললেন, স্বামীজীর দৃষ্টিকোণ ও যুক্তিতর্কের দিক হইতে বিচার করিলে অদ্বৈততত্ত্ব অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাঁহার নিজের দিক হইতে ইহা গ্রহণ করা সম্ভব নয়। এই বিতর্কের সময় রয়েস, লানমান, শেলার, লুই জেমস প্রভৃতি প্রখ্যাত

১ মন ও মানুষ: স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ; ২ ঐ-ঐ।

অধ্যাপকেরা উপস্থিত ছিলেন, সবাই স্বামী অভেদানন্দের মনীষা ও পাণ্ডিত্য দেখিয়া মুগ্ধ হন।

১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে স্বামী বিবেকানন্দ দ্বিতীয় বারের প্রচারকর্মে আমেরিকায় উপস্থিত হন। স্বামী অভেদানন্দ ইতিমধ্যে বেশ কিছুটা জাঁকাইয়া বসিয়াছেন, নিউইয়র্কেও বেদান্ত সমিতি তিনি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তাঁহার সাফল্য দেখিয়া বিবেকানন্দ সোল্লাসে কহিলেন, "নিউইয়র্কের দ্বারে আমি তিন তিনবার আঘাত করেছিলাম, কোনো সাড়া পাই নি। আমার খুব আনন্দ হয়েছে, দেখছি তুমি একটি স্থায়ী কেন্দ্র স্থাপন করেছো, নিউইয়র্কে এই প্রথম আমাদের সমিতির নিজস্ব গৃহ হল।"

আমেরিকায় স্বামী অভেদানন্দের পঁচিশ বৎসরের প্রচারের ফল হয় সুদূরপ্রসারী। এ সম্পর্কে নিজের এক ভাষণে তিনি বলিয়াছেন :

"আমার বেদান্ত প্রচারের ফলে আমেরিকায় অনেক খ্রীষ্টান ধর্মযাজকের চোখ খুলিয়া গিয়াছে এবং গীর্জায় উপাসনার সময় তাঁহারা বেদান্তের ভাব গ্রহণ করিয়া ঈশাহী ধর্মের মূলতত্ত্বগুলি নূতনভাবে ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। সত্যান্বেষী ও চিন্তাশীল লোক আর ঈশাহী ধর্মের গোঁড়ামিপূর্ণ ক্রিয়াকাণ্ডে বিশ্বাস করেন না। এখন আমেরিকাতে নূতন নূতন ধর্ম আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে। 'নিউ থট', 'খ্রীষ্টান সায়েন্স', 'স্পিরিচুয়্যালিস্ট সোসাইটী' প্রভৃতি নব ধর্মমত প্রচারিত হইতেছে। আর এই সকলগুলিই হইতেছে মুখ্য গৌণভাবে আমাদের পঁচিশ বৎসর বেদান্ত প্রচারের ফল। খ্রীষ্টান সায়েন্স-এর প্রতিষ্ঠাত্রী মেরী বেকার এডি গীতার কয়েকটি শ্লোকের উপর তাঁহার সম্প্রদায়ের বনিয়াদ খাড়া করিয়াছেন। 'নিউ থট' সম্প্রদায়ের সকলেই স্বামী বিবেকানন্দের ছাত্র এবং তাঁহারা বলেন যে, ঈশ্বর সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত হইয়া আছেন, তিনিই সব হইয়াছেন এবং তাঁহার আর দ্বিতীয় নাই। যীশুখ্রীষ্ট বলিয়া কোনো ব্যক্তিকে তাঁহারা বিশ্বাস করেন না, তবে তাঁহারা 'খ্রীষ্টত্ব' নামক আধ্যাত্মিক আদর্শকে স্বীকার করেন। আর 'খ্রীষ্টত্ব' সর্বব্যাপী; ইহা আমাদের

অন্তরেই বিরাজমান। সত্য কথা বলতে কি তাঁহারা মনে করেন—প্রত্যেক জীবাত্মাই স্বরূপতঃ 'খ্রীষ্ট'। এই উদার মতবাদ গোঁড়ামিপূর্ণ খ্রীষ্টধর্মের গোড়ায় কুঠারঘাত করিয়াছে। কারণ গোঁড়া খ্রীষ্টানগণ যীশুখ্রীষ্ট নামক এক ব্যক্তিতে বিশ্বাসী এবং মনে করেন যে, খ্রীষ্ট তাঁহার রক্ত দিয়া পাপী-তাপীদের পাপতাপ দূর করিয়াছেন। চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ এই প্রকারের পাপ হইতে মুক্তি বিশ্বাস করেন না। শিক্ষিত ব্যক্তিগণ বিশেষত যাহারা বিজ্ঞান ও দর্শন আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারা আর 'অনন্ত নরকে'র মতবাদে আস্থা স্থাপন করেন না। এই সমস্ত ভ্রান্ত ধারণা এখন প্রায় লোপ পাইতে বসিয়াছে।

"পৃথিবী ছয় হাজার বৎসর পূর্বে সৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া আর তাঁহারা বিশ্বাস করেন না। আর ইহাও বিশ্বাস করেন না যে, যীশুখ্রীষ্টের রক্তই সমস্ত পাপ দূর করিবে। তবে তাঁহারা 'খ্রীষ্ট' শব্দের আধ্যাত্মিক অর্থ গ্রহণ করেন। ইহাকে তাঁহারা 'খ্রীষ্টু' বলেন এবং তাঁহারা আরও বলেন যে, এই 'খ্রীষ্টত্ব' প্রত্যেক জীবাত্মাতে সুপ্ত অবস্থায় আছে এবং তাহা জাগরিত হইবে। ইহা সুপ্ত অবস্থায় আছে এবং তাহা জাগরিত হইলে প্রত্যেকেই এক একজন 'খ্রীষ্ট' হইবে। তাঁহারা খ্রীষ্টত্বের এই প্রকারেই ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। পঁচিশ বৎসর পূর্বের খ্রীষ্টধর্ম ও আমেরিকার বর্তমান খ্রীষ্টধর্ম এক নহে। বর্তমানে বেদান্তে প্রচারিত এক অনন্ত ও সত্য সত্তার উপরেই খ্রীষ্টধর্মকে দাঁড় করানোর চেষ্টা হইতেছে। বেদের 'একমেবাদ্বিতীয়ম্,' 'একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি' প্রভৃতি বাণী আজ খ্রীষ্টান সায়েন্স, নিউ থট ও স্পিরিচুয়ালিজম্ গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা যে নূতন ভাব প্রবাহ সৃষ্টি করিয়াছি তাহা দ্বারা তাঁহারা খুবই অনুপ্রাণিত হইয়াছেন।

"ইউরোপেও ধীরে ধীরে এবং নিশ্চিতরূপে তাহার ধাক্কা লাগিয়াছে। তাই ইংলণ্ডেও আজ অসংখ্য 'খ্রীষ্টান সায়েন্স'-এর চার্চ এবং বহু 'নিউ থট' মন্দির গড়িয়া উঠিয়াছে। স্যার আর্থার কনান

ডয়েল, স্যার অলিভার লজ প্রভৃতি প্রেততত্ত্ববিদ্‌গণ বেদান্তের ভাবেই অনুপ্রাণিত হইয়াছেন। বর্তমানে প্রেততত্ত্ব অনুশীলন করিয়া আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, আত্মা নিত্য ও অবিনশ্বর, মৃত্যুর পরে আমাদের অনন্ত নরকে যাইতে হয় না। স্যার অলিভার লজের কথাই ধরুন। তিনি একজন প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক এবং তিনি তাঁহার 'রেমণ্ড' নামক পুস্তকে স্পষ্টই স্বীকার করিয়াছেন যে, আমরা মৃত আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে কথাবার্তা চালাইতে পারি।

দীর্ঘ গবেষণা, ভাষণ এবং লেখার মধ্য দিয়া মনীষী অভেদানন্দ আমেরিকার শিক্ষিত মহলে ভারতের প্রাচীন গৌরবময় ঐতিহ্যটিও তুলিয়া ধরিয়াছিলেন। ইহার ফলে ভারতের একটি অপরূপ ভাবমূর্তি গড়িয়া উঠে। তিনি বলিয়াছিলেন। "আর্য সভ্যতার অরুণালোকে ভারতের দিক্‌চক্রবাল উদ্ভাসিত হয়েছিল প্রথমে। গ্রীস্থে রোমে, আরবে বা পারস্যে নয়; ভারতবর্ষই সকল কিছু অধ্যাত্মশাস্ত্র, দর্শন, ন্যায়, জ্যোতিষ, বিজ্ঞান, কলাবিদ্যা, সংগীত, চিকিৎসাশাস্ত্র ও সত্যিকারের নৈতিক ধর্মের আদিভূমি।

"হিন্দুরাই প্রথমে বৈদিক ঋক্‌ছন্দ থেকে সংগীতকলার বিকাশ সাধন করেছিলেন। বিশেষ ক'রে সামবেদ তো গানের জন্যই নির্দিষ্ট ছিল। গ্রীকদের বহুশত বৎসর পূর্বে সপ্তস্বর ও তিনগ্রামের প্রচলন ভারতবাসীরা জানতেন। সম্ভবত গ্রীকরাই ভারতবর্ষের কাছ থেকে ঐ সমস্ত জিনিস শিক্ষা করেছিলেন। তোমাদের একথা জেনে কৌতূহল হবে যে, পাশ্চাত্যের বিখ্যাত সংগীতবিদ্ ওয়াগ্‌নারও হিন্দু সংগীতের কাছে—বিশেষ করে তার 'লিডিং মোটিভ'-এর জন্য ঋণী ছিলেন। ভারতীয় সংগীতের সঙ্গে ওয়াগ্‌নারের সংগীত পদ্ধতির অনেক মিল আছে। এইজন্যই বোধহয় পাশ্চাত্য সংগীতশিক্ষার্থীদের পক্ষে তাঁর সংগীত তত সহজবোধ্য ছিল না। ওয়াগ্‌নার কয়েকটি ভারতীয় সংগীতশাস্ত্রের লাটিন অনুবাদ পড়েছিলেন এবং জার্মান দার্শনিক সোপেন হাওয়ারের সঙ্গে তিনি ঐ সম্বন্ধে আলোচনাও করেছিলেন।"

স্বামী অভেদানন্দ আরও বলিয়াছেন, "পীথাগোরাস যে ভারতবর্ষে এসেছিলেন—এ'কথা বেশীর ভাগ ঐতিহাসিক স্বীকার করেন। পীথাগোরাস হিন্দুদের কাছে থেকে জ্যামিতি ও অঙ্কশাস্ত্র, জন্মান্তর ও পরলোকবাদ, নিরামিষ আহার ও পঞ্চভূতের তত্ত্ব প্রভৃতি শিক্ষা করেছিলেন এবং গ্রীসে ফিরে গিয়ে সেখানকার লোকেদের ভেতর সেগুলি প্রচার করেছিলেন। ইহুদীদের এসেনী সম্প্রদায়ের মধ্যেও এই সব ভাবধারার প্রচলন ছিল। মনে হয় এসেনারা গ্রীকদের কাছ থেকে পরে ঐ সমস্ত ভাব গ্রহণ করেছিল। ইজিপ্ট ও গ্রীসের লোকেরা চারটি ভূততত্ত্ব (উপাদান বা এলিমেণ্ট) স্বীকার করত, তবে আকাশতত্ত্ব তাঁদের কাছে অজ্ঞাত ছিল। পরে হিন্দুদের কাছ থেকে ঐ দু'টি দেশ আকাশতত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করেছিল।"

আমেরিকায় বিবেকানন্দ ও অভেদানন্দের প্রচারের পূর্বেও বেদান্তের ভাবধারা কোনো কোনো আমেরিকান মনীষীর মাধ্যমে প্রচারিত হইয়াছিল। তবে এ ভাবধারা ছিল অতিশয় ক্ষীণ। এ সম্পর্কে স্বামী অভেদানন্দ বলিয়াছেন: "র‍্যাল্‌ফ ওয়াল্‌ডো এমার্সন আমেরিকার একজন জগদ্বিখ্যাত মনীষী। তিনিই সর্বপ্রথমে আমেরিকায় বেদান্ত প্রচার করেন। তাঁর বইয়ের মধ্যে এসব ভাব আছে। এই তো তাঁর 'এস্‌সেঅন্ ইম্‌মর্টালিটি'-র (আত্মার অমরত্ব প্রবন্ধের) ভিতর নচিকেতার গল্প আছে। তাঁর 'ব্রহ্ম' বলে একটি কবিতা আছে। গীতায় যে আছে,—য এনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতম্। উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে—এই ভাব সে কবিতায় রয়েছে—এরই স্বচ্ছন্দ অনুবাদ। তখন চার্লস উইল্‌কিন্স সাহেবের গীতার ইংরেজী অনুবাদ ছিল। এই অনুবাদ ওয়ারেন হেস্টিংস-এর সময় হয়। এমার্সন আর কার্লাইল দুজনে বন্ধু ছিলেন। কার্লাইলের সঙ্গে এমার্সনের দেখা হলে তিনি এমার্সনকে গীতা উপহার দিয়ে বলেছিলেন—'এ একখানা আশ্চর্য বই। এতে আমার সব সন্দেহের উত্তর পেয়েছি এবং আমার মনে

হয়, আমার ন্যায় আপনিও গীতার উপদেশ থেকে যথেষ্ট প্রেরণা পাবেন।' এমার্সন এই গীতা পড়েই 'ব্রহ্ম' সম্বন্ধে তাঁর ঐ কবিতা লিখেছিলেন।

"এমার্সন ক্লাবের প্রেসিডেণ্ট মিঃ ম্যালয় আমায় ওই 'ব্রহ্ম' কবিতাটির মানে জিজ্ঞাসা ক'রে বললেন, এসব এমার্সন কোথা থেকে পেয়েছিলেন? আমি তাঁকে গীতার ওই কথা বললুম।

"আমি এমার্সনের লাইব্রেরী দেখেছি। সেখানে গীতা, মনু-সংহিতা, বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতির ইংরেজী অনুবাদ আছে [১]।"

আমেরিকায় কৃশ্চিয়ান সায়েন্স নামক তত্ত্ববাদের প্রভাব যথেষ্ট। স্বামী অভেদানন্দ বলিতেন, আমেরিকায় কৃশ্চিয়ান সায়েন্সের খুব প্রভাব। এই তত্ত্ব যে ভারতীয় দর্শন ও ধর্মবিজ্ঞানের কাছে ঋণী তা এই মতাবলম্বীরা স্বীকার করিতে চান না।

এই মতবাদ প্রবর্তন করিয়াছিলেন মিসেস এডি। তাঁহার রচিত 'সায়েন্স অ্যাণ্ড হেল্‌থ' গ্রন্থের অনেকগুলি সংস্করণ আমেরিকায় হইয়াছে। এই গ্রন্থের চতুর্বিংশ সংস্করণ এখন দুষ্প্রাপ্য, ঐ সংস্করণের অষ্টম অধ্যায়ে গীতা হইতে স্পষ্ট উদ্ধৃত বাণী ছিল। কিন্তু বর্তমানে তাহা তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। স্বামী অভেদানন্দ বহু শ্রম স্বীকার করিয়া এই সব তথ্য আমেরিকায় বাস করার কালে উদ্‌ঘাটন করেন এবং চোখে আঙুল দিয়া আমেরিকানদের দেখাইয়া দেন যে তাঁহাদের জনপ্রিয় কৃশ্চিয়ান সায়েন্স মতবাদ ভারতীয় দর্শনের দ্বারা কতটা প্রভাবিত হইয়াছে।

আমেরিকার নানা প্রতিকূল অবস্থায় পড়িয়া এবং ঘাত প্রতি-ঘাতে ক্লান্ত হইয়াও অভেদানন্দ কোনো দিন মানসিক স্থৈর্য হারান নাই। মাঝে মাঝে সহকর্মীদের বলিতেন, শুধু শ্রীশ্রীঠাকুরের দিকে তাকাইয়া আর বিবেকানন্দের অপার স্নেহ প্রীতির কথা স্মরণ করিয়াই এই দীর্ঘ সংগ্রামে তিনি যুঝিতে পারিয়াছেন।

এই সময়ে রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘজননী সারদামণির স্নেহাশিসও তাঁহাকে

১ মহারাজের কথা : স্বামী চিৎস্বরূপানন্দ

যথেষ্ট প্রেরণা যোগাইয়াছে। মা সারদামণির একটি পত্রে তাঁহার কিছুটা পরিচয় মিলে। তিনি লিখিয়াছেন, "কল্যাণীয়েষু গতকল্য তোমার কুশলসহ এক পত্র পাইয়া আনন্দিত হইলাম। তোমার প্রেরিত পার্সেল পাইয়াছি। তুমি শারীরিক ও মানসিক ভালো আছ জানিয়া বড়ই সন্তোষ লাভ করিলাম। তোমার কার্য ভালোরূপ হইতেছে জানিয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম। তোমরাই শ্রীশ্রীঠাকুরের মুখোজ্জ্বল করিতেছ। শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট সর্বদা প্রার্থনা করি এবং আশীর্বাদ করিতেছি, তোমার কার্য যেন সফল হয়। তিনি তোমার এই মহৎ কার্যে সহায় হইবেন তাহাতে আর সন্দেহ কি? আহারাদি সম্বন্ধে আর তাদৃশ কঠোরতা করিবে না। তুমি সেখানে একদম নিরামিষ আহার না করিয়া উত্তম মৎস্যাদি আহার করিবে। ইহাতে তোমার কোনো দোষ হইবে না। আমি তোমাকে অনুমতি দিতেছি, তুমি স্বচ্ছন্দে উহা খাইবে। সর্বদা শরীরের দিকে নজর রাখিবে। মধ্যে মধ্যে নির্জন স্থানে বাস করিবে। মধ্যে মধ্যে তোমার কুশল লিখিয়া সুখী করিবে। তুমি আমার আশীর্বাদ জানিবে। ইতি। তোমাদের মা"

শ্রীমার উদ্দেশে প্রণতি জানাইয়া অভেদানন্দ তাঁহার ভক্তদের মাঝে মাঝে বলিতেন, "আলমবাজার মঠে থাকতে 'শ্রীমার স্তোত্র' রচনা করে শ্রীমাকেই প্রথম শোনালাম। তিনি শুনে আশীর্বাদ করে বললেন, 'তোমার মুখে সরস্বতী বসুক'। 'মূকং করোতি বাচালং,' সত্যই আমার মতো মূককে তিনি বাচাল করেছিলেন। নইলে ইংল্যাণ্ড আমেরিকার মতো দেশে, ধুরন্ধর সব পণ্ডিত ও পাদরীদের কাছ থেকে আমার মতো নগণ্য একজন ভারতবাসী কি জয়টীকা নিতে পারে? সবই শ্রীমা ও শ্রীঠাকুর কৃপা।"

একনিষ্ঠভাবে, সমগ্র মনপ্রাণ দিয়া, সমগ্র সত্তা দিয়া অভেদানন্দ আঁকড়িয়া ধরিয়াছিলেন সদ্‌গুরু শ্রীরামকৃষ্ণকে। কি পরিব্রাজক জীবনে, কি প্রচারক ও আচার্য জীবনে, সর্বত্র সবসময়ে তিনি বিশ্বাস

করিতেন, ঠাকুর রামকৃষ্ণ তাঁহাকে রক্ষা করিতেছেন, ঐশ্বরীয় কর্ম-সাধনায় যোগাইতেছেন দিব্য প্রেরণা।

উত্তরকালে কথা প্রসঙ্গে নিজ ভক্তদের কাছে ঠাকুরের এক করুণালীলার কথা তিনি প্রকাশ করিয়াছেন : "তিনি যে সব সময়েই পিছনে থেকে আমাদের (তাঁর সন্তানদের) সাহায্য ও রক্ষা করতেন ও এখনও সদা সর্বদা করেন তার জ্বলন্ত নিদর্শন আমি ভূরি ভূরি পেয়েছি। তাঁর উপস্থিতি জীবনে অনুভব করেছি বহুবার। তিনি যে অশেষ করুণাময়, আমাদের হাত ধরেই সবদা চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন—একথা মর্মে মর্মে আমি বুঝেছি।

"লণ্ডন থেকে সেবারে আমেরিকায় যাব। জাহাজের টিকিট কেনার সব ঠিক। ইংলণ্ডের বন্দর থেকে যে জাহাজ ছাড়বে তার নাম ছিল লুসিটেনিয়া। টিকিট কিনতে গিয়ে (৬ই মে ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে) এক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটল। টিকিট কিনবো এমন সময় শুনতে পেলাম কে যেন টিকিট কাটতে আমায় স্পষ্ট নিষেধ করল। আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম। ভাবলাম মনের ভুল। এদিকে সেদিকে তাকালাম, কাকেও দেখতে পেলাম না। সুতরাং আবার গেলাম টিকিট কিনতে কিন্তু সেবারেও ঠিক সে'রকম। তখন টিকিট কেনা আর হল না। বাসায় ফিরে আসাই ঠিক করলাম। ভাবলাম—কালই না হয় যাওয়া যাবে। কিন্তু পরের দিন সকালে খবরের কাগজ খুলে দেখি বড় বড় হরফে লেখা S. S. Lusitania is no more, অর্থাৎ লুসিটেনিয়া আটলাণ্টিক মহাসাগরের বুকে কাল রাত্রে ডুবে গেছে। আমি অভিভূত হয়ে পড়লাম। চোখে জল এল। বুঝলাম শ্রীশ্রীঠাকুরই আমায় রক্ষা করেছেন[১]।"

কুসুমের মতো মৃদু এবং বজ্রের মতো কঠোর ছিলেন অভেদানন্দ। অন্তরঙ্গ ভক্তেরা বলিতেন, তাঁহার অন্তর ছিল শিশুর সরলতায় পূর্ণ। বহিরঙ্গ জীবনের যে কোনো কাজে যে কোনো ব্যক্তি তাঁহাকে ভুল

১ মন ও মানুষ : স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

বুঝাইতে সক্ষম হইত। আবার তাত্ত্বিক বিচারের সময় এই মানুষটির ভিতরেই দেখা যাইত বিস্ময়কর বিশ্লেষণ শক্তি, ক্ষুরধার তত্ত্বোজ্জ্বলা বুদ্ধি এবং সিদ্ধান্ত স্থাপনের দৃঢ়তা।

অভেদানন্দের আমেরিকান শিষ্যা সিস্টার শিবানী (মেরী ল' পেজ) দুই একটি ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন, যাহা তাঁহার এই জীবন বৈশিষ্ট্যের পরিচয় বহন করে।[১] শিবানী লিখিতেছেন, আমাদের বর্ষীয়সী বান্ধবী মিসেস কেপ একদিন আমাদের মতো কয়েকটি তরুণী ছাত্রীকে বললেন, "ত্যাখো, যে কোনো সামান্য ঘটনা সম্পর্কে তোমাদের সন্দেহ উপস্থিত হবে, সে সম্পর্কে স্বামীজীর বক্তব্য অবশ্যই শুনে নিতে চেষ্টা করবে। আমি একটা সামান্য ঘটনার কথা বলছি। সেদিন এখানে ছিল রামকৃষ্ণ উৎসব। বেশী টাকা খরচ করে একটি মনোরম পুষ্পস্তবক আমি কিনে নিয়েছিলাম। স্বামীজী তখন ভজনালয়ের বেদীর কাছে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে রয়েছেন, আমি সোৎসাহে তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে স্তবকটি দেখিয়ে বললাম, "স্বামীজী, দেখুন কি চমৎকার আমার এই পুষ্পার্ঘ্য, আপনি কি এটি পছন্দ করছেন না?' মুহূর্তে স্বামীজী তাঁর মুখটি ঘুরিয়ে নিলেন, একটি কথাও আমায় বললেন না, মনোরম পুষ্পগুচ্ছটি সম্পর্কেও করলেন না সামান্যতম মন্তব্য। আমি স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। কথনো তো এমন রূঢ় আচরণ স্বামীজী আমাদের সঙ্গে করেন না। শুধু তাই না, তাঁর মতো এমন ভদ্র ও কোমল আচরণ খুব কম লোকেরই আমরা দেখতে পাই। তবে কেন এমনটি আজ করলেন? আমি অন্তরে তীব্র আঘাত পেলাম, বিভ্রান্ত এবং হতবুদ্ধি হয়ে পড়লাম। সমিতির ভবন ত্যাগ করবার আগে স্বামীজীকে এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করলাম আমি, কিন্তু তিনি তা এড়িয়ে একপাশে সরে পড়লেন।

"আমি সব ব্যাপারই বেশ তলিয়ে দেখতে চাই, এটা আমার চিরদিনের অভ্যাস। কয়েক দিন পরে আবার স্বামীজীকে আমি

১ স্বামী অভেদানন্দ ইন্ আমেরিকা (অ্যান অ্যাপোসল্ অব্ মনিজম্) : সিস্টার শিবানী

চেপে ধরলাম। বললাম, 'সেদিন আপনি নিশ্চয়ই ঐ রূঢ় আচরণের মধ্য দিয়ে আমায় কোনো শিক্ষা দিতে চেয়েছেন। কি সে শিক্ষা তা আমায় খুলে বলুন।' উত্তরে তিনি শুধু বললেন, 'সেদিন ঐ ফুলের গুচ্ছটি কি তুমি আমার জন্য এনেছিলে, না আমার শ্রদ্ধেয় গুরুদেবের জন্য এনেছিলে?"

মিসেস কেপ তৎক্ষণাৎ এ কথার তাৎপর্য বুঝিয়া নিলেন। যে পুষ্পার্ঘ্য প্রভু শ্রীরামকৃষ্ণের জন্য আনা হইয়াছে, তাহা দিয়া প্রভুর দাস অভেদানন্দের মন ভুলাইবার চেষ্টা তাঁহার পক্ষে সমীচীন হয় নাই।

সিস্টার শিবানীর কথিত আর একটি ঘটনায় অভেদানন্দের পুরুষ-সিংহ মূর্তিটির পরিচয় পাই। "সেদিন আশ্রমের লাইব্রেরীতে বসে কাজ করছেন আমাদের প্রিয়দর্শিনী সেক্রেটারী এবং অপর একজন ছাত্রী। হাউসকীপার এ সময়ে একটি অপরিচিত ব্যক্তিকে সেই কক্ষে নিয়ে এল। আশ্রম সম্বন্ধে দু'চারটি প্রশ্ন করার পরই লোকটি নেমে এল ব্যক্তিগত স্তরে। উচ্চ স্বরে শুরু করল স্বামীজী সম্পর্কে অপমান পূর্বক মন্তব্য এবং গালিগালাজ। জানতে চাইল, কেন এই সব কৃষ্ণকায় হিন্দুদের সঙ্গে পাশ্চাত্য দেশের ভদ্রমহিলারা সামাজিকভাবে মেলামেশা করছেন?

"লাইব্রেরীতে উপবিষ্ট মহিলাদ্বয় উত্তেজিত স্বরে ঐ লোকটির কথার প্রতিবাদ জানাচ্ছিলেন। এমন সময় সিঁড়িতে শোনা গেল ভারী জুতোর পদধ্বনি। মুহূর্ত মধ্যে দেখা গেল, স্বামীজী ঐ অপরিচিত অভদ্র লোকটিকে সবলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন বাইরে। সিঁড়ির ওপারে রাস্তার ধারে পড়ে রয়েছে তাঁর দেহ। প্রয়োজন-বোধে স্বামীজীকে নির্দ্বিধায় এ ধরনের বীর্যবত্তা প্রকাশ করতে দেখেছি। এবং তখন কেউ তাঁর গতিরোধ বা প্রতিবাদ করতে সাহসী হতো না। এই ঘটনার কথা আশ্রমমগুলীতে অচিরে ছড়িয়ে পড়ল। ভক্তেরা সবাই আনন্দিত হল এ ঘটনার কথা শুনে, স্বামীজীর প্রতি আস্থা তাদের বহুগুণ বেড়ে গেল, তাঁর ভাবমূর্তি আরো প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠল। গুরু হিসাবে এবং সামাজিক ব্যক্তি

হিসাবে স্বামী অভেদানন্দর জুড়ি নেই, এ উপলব্ধিটি সেদিন এসে গেল অনেকেরই মনে।"

সিস্টার শিবানী বলিয়াছেন, "স্বামী অভেদানন্দের যোগশক্তি, যোগনিয়ামের শক্তি সম্পর্কে অনেকেরই আস্থা ছিল। কিন্তু স্বামীজী নিজে কখনো এ সম্বন্ধে হাঁ বা না, কিছুই বলিতেন না। আমার কাছে সব চাইতে বিস্ময়কর মনে হয়েছে স্বামীজীর একটি যোগবিভূতির প্রয়োগ। আশ্রমের এক ছাত্রীর তরুণী বোনটির মাথা খারাপ হয়ে যায়। আশ্রমে প্রায়ই সে আনাগোনা করতো, স্বামীজীর সঙ্গেও তার বেশ জানাশোনা ছিল। ঐ রুগ্না মেয়েটিকে উন্মাদ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল এবং ডাক্তারেরা শেষটায় বলে দিলেন, চিকিৎসায় আর কোনো ফল হবে না।

"এবার ঐ পাগল মেয়েটির দিদি, আমাদের আশ্রমের ছাত্রীটি শরণ নিল স্বামী অভেদানন্দের। বলল, 'আপনি মহাত্মা, আপনার যোগশক্তির ওপর আমার অগাধ বিশ্বাস। আমার বোনের উন্মাদ-রোগ ভালো করুন, তাঁকে বাঁচিয়ে তুলুন।' অভেদানন্দ যতই বলেন, তিনি যোগী নন, যোগবলে রোগ আরোগ্য করার পদ্ধতি তিনি জানেন না, ছাত্রীটি ততই হয় নাছোড়বান্দা, অবশেষে তাকে সেখান থেকে সরাতে না পেরে স্বামীজী বললেন, 'আচ্ছা, তুমি তিন দিন পরে আমার কাছে এসো, তখন আমি তোমার এ প্রার্থনার জবাব দেবো।'

"ছাত্রীটি তাই করল, তিন দিন পরে উপস্থিত হল আশ্রমে। অভেদানন্দ তাঁর সঙ্গে চলে গেলেন সেই উন্মাদাগারে। সেখানে গিয়ে রোগিণীর পাশে প্রশান্ত বদনে তিনি উপবিষ্ট হলেন, স্নেহভরে তার হাত ধরে রইলেন, আর মাঝে মাঝে দু একটি টোকা দিতে থাকলেন। কথা কিন্তু তিনি বেশী বললেন না, বেশীর ভাগ সময়ই রইলেন অন্তর্লীন অবস্থায়, কোনো চাঞ্চল্যকর ম্যাজিকের ব্যাপার নেই, হৈ-চৈ নেই। প্রশান্ত ও নির্বিকারভাবে বসে একান্তভাবে শুধু তিনি তাকিয়ে রইলেন খানিকটা সময়।

"এর কয়েকদিন পরেই উন্মাদ মেয়েটি আরোগ্য লাভ করল, শুধু তাই নয়, হাসপাতাল থেকে ডাক্তারেরা সানন্দে তাকে ছেড়ে দিল। তখন সে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসেছে, মনের বল আস্থা বিস্ময়কররূপে আবার ফিরে পেয়েছে। কৃতজ্ঞ ছাত্রীটি তার বোনের এই আরোগ্য লাভের পর স্বামীজীর কাছে এসে উপস্থিত হয় তাঁকে কিছু অর্থ ও সোনা গয়না ভেটস্বরূপ দিতে। তার কথা শুনে দৃঢ়স্বরে স্বামী অভেদানন্দ বলে ওঠেন, সত্য কখনো বিক্রি করা যায় না, তা কেনাও যায় না। এক্ষেত্রে আমি কিছুই করি নি। আসলে রোগমুক্তি সম্পর্কে যা কিছু করবার করেছেন আমার পরম কৃপালু গুরুদেব।"

আর একটি কাহিনীও পাওয়া যায় সিস্টার শিবানীর লেখায়। তাঁহার এক নিকট আত্মীয়ের একজন তরুণী বান্ধবী ছিল। এই মেয়েটি কিরূপে অলৌকিকভাবে অভেদানন্দের কৃপাপ্রাপ্ত হয় তাহার বর্ণনা দিয়াছেন সিস্টার শিবানী। 'মেয়েটি সেদিন তার অফিসে মধ্যাহ্ন ভোজনের সময় অতর্কিতে একটা প্রচণ্ড মানসিক আঘাতে মুষড়ে পড়ে এবং আমার বাসকক্ষে ছুটে চলে আসে। আমি তখন বাইরে ছিলাম। আমার অবর্তমানে মেয়েটি সেখানে আত্মহত্যার চেষ্টা করে এবং আমাদের হাউসকীপারের সাবধানতার ফলে তার সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। তারপর আমি ঘরে ফিরে আসি এবং সারা বিকেল-বেলাটা মেয়েটির ঝঞ্ঝাট আমাদের পোহাতে হয়।

"মেয়েটি স্বামীজীর কথা আমাদের কাছে আগে শুনেছিল। সন্ধ্যেবেলায় নিজেই বললে, স্বামীজীর বক্তৃতা শুনতে সে আশ্রমে যাবে। নির্ধারিত সময়ে আমরা সবাই হলঘরে উপস্থিত হলাম। আশ্চর্যের কথা, বক্তৃতা প্রসঙ্গে স্বামী অভেদানন্দ হঠাৎ বলা শুরু করলেন আত্মহত্যার প্রবণতার কথা। বললেন, এই প্রবণতার ফল মানুষের দেহ আত্মার পক্ষে বিপর্যয়কর। এই প্রবণতায় যারা ভুগছে তাদের নানা রকমের আশা ও আশ্বাসের বাণীও তিনি এসময়ে শোনালেন।

"বক্তৃতা শোনার পর আমাদের ঐ মানসিক দৌর্বল্যের রোগীটি বলে উঠল, সে স্বামীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে। সাক্ষাতের সময় সে স্বামীজীকে কৃতজ্ঞতার সুরে ধন্যবাদ জানালে, তাঁকে খুলে বলল নিজের মানসিক দুরবস্থার কথা। খুব আশ্চর্যের কথা, স্বামী অভেদানন্দের সঙ্গে দেখা করার তিন সপ্তাহের মধ্যে ঐ মেয়েটি সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হয়ে উঠল। এবার কেউ যদি আমায় প্রশ্ন করে, কি ক'রে স্বামীজী সেদিন ঐ মেয়েটির মনের সংকটের কথা জানতে পেরেছিলেন, কেনই বা আত্মহত্যার প্রসঙ্গ তুলে আশ্বাসবাণী উচ্চারণ করেছিলেন, তার উত্তরে আমি বলবো, স্বামীজী যথার্থই ছিলেন একজন অন্তর্যামী মহাপুরুষ।"

আমেরিকায় প্রায় পঁচিশ বৎসরকাল অভেদানন্দ অবস্থান করেন এবং ঐ সময়ের মধ্যে সতেরবার তাঁহাকে আটলান্টিক মহাসাগর অতিক্রম করিতে হয়। এই দীর্ঘ সময়ের অক্লান্ত একনিষ্ঠ কর্মসাধনার ফলে আমেরিকায় স্বামী বিবেকানন্দের ঈপ্সিত কর্ম তিনি উদ্‌যাপন করেন। বেদান্তের বাণী আমেরিকায় ও বিশ্বের অগ্রসর দেশগুলিতে ধীরে ধীরে ছড়াইয়া পড়ে। এই সময়ের মধ্যে আমেরিকার বেদান্ত সমিতিও সুসম্বদ্ধ রূপে সংগঠিত হইয়া উঠে।

এবার অভেদানন্দ সংকল্প করেন জন্মভূমি ভারতে প্রত্যাবর্তনের জন্য। জাপান, চীন ও দূর প্রাচ্যের বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে তিনি কলিকাতায় উপনীত হন।

আমেরিকায় থাকিতে অভেদানন্দ রুশ পর্যটক নিকোলাস নটোভিচের রচিত 'দ্য আন্‌নোন্ লাইফ অব জেসাস্ খ্রাইস্ট্' পাঠ করিয়াছিলেন, নটোভিচ তাঁহার এ বইয়ে তিব্বতের হিমিস মঠে রক্ষিত একটি পুঁথির বিবরণ উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাহাতে যীশুখ্রীষ্টের তিব্বত ও ভারতে আসার বিবরণ আছে। তত্ত্ব ও তথ্য সম্পর্কে অভেদানন্দের কৌতূহল ও গবেষণা-নিষ্ঠা ছিল অসাধারণ। তাই ভারতে ফিরিয়া তিনি তিব্বতে উপস্থিত হন এবং হিমিস মঠে গিয়া প্রধান লামার নিকট হইতে নটোভিচ প্রদত্ত তথ্যাদি সম্বন্ধে নানা

অনুসন্ধান করেন। সেই অনুসন্ধানের চাঞ্চল্যকর তথ্য তিনি তাঁহার 'কাশ্মীর ও তিব্বতে' নামক গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন।

১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার নিজস্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী অদ্বৈতবাদ ও রামকৃষ্ণতত্ত্ব প্রচারে অভেদানন্দ আগ্রহী হন। তদনুসারে কলিকাতায় ও দার্জিলিং-এ রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ তিনি প্রতিষ্ঠা করেন। তখন হইতে নূতন প্রতিষ্ঠানটিকে কেন্দ্র করিয়াই তাঁহার জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি অতিবাহিত হইতে থাকে।[১]

কলিকাতায় ও দার্জিলিং-এর মঠ ভবনে বহু মুমুক্ষু ভক্ত, বহু দেশনেতা ও কর্মী তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতেন। কর্মযোগ, মনীষা ও তত্ত্বজ্ঞানের মিলিত মূর্ত বিগ্রহ এই মহাপুরুষের বাণী ও পূত চরিত্র তাঁহাদের জীবনে জাগাইয়া তুলিত আত্মিক সাধনার প্রেরণা।

আচার্য হিসাবে স্বামী অভেদানন্দ ছিলেন এক অসামান্য দিক্-দিশারী, প্রাচ্যে ও প্রতীচ্যে বহু ভাগ্যবান্ ভক্ত সাধক তাঁহার সান্নিধ্যে আসিয়াছেন, তাঁহার অমৃতোপম উপদেশ শ্রবণ করিয়া নিজেদের জীবন গড়িয়া তুলিয়াছেন।

ব্রহ্মানন্দ ও ব্রহ্মসাক্ষাৎকার সম্পর্কে তিনি একদিন বলিলেন, "ব্রহ্মানন্দে ছোট ছোট সমস্ত সুখ অন্তর্নিহিত আছে, আর ছোট ছোট সুখ সমস্ত এই ব্রহ্মানন্দের এক এক কণা মাত্র। বৃহদারণ্যকে আছে—এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি। যারা এই ব্রহ্মানন্দের আস্বাদ পেয়েছে তারা টুকরো টুকরো আনন্দ চায় না। তারা আনন্দময় হয়ে আছে। সংসারসুখের অভাববোধ কখনো তাদের হয় না। ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারের পর এ সংসার তুচ্ছ হয়ে যায়।

১ অজস্র সংখ্যক বক্তৃতাদানের সঙ্গে সঙ্গে স্বামী অভেদানন্দ বহুতর গ্রন্থও রচনা করিয়াছেন। তাঁহার সংগঠিত রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ হইতে স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের ব্যবস্থাপনায় তাঁহার রচনাবলী প্রকাশিত হইয়াছে। অভেদানন্দজীর প্রবর্তিত বিশ্ববাণী পত্রিকা এই মঠের মুখপত্র।

আর এ সুখ তো ক্ষণস্থায়ী। একটু বিচার করলে দুঃখই তো বেশী দেখা যায়।

অপরদিকে ব্রহ্মবিৎ পুরুষের সুখ নিত্য। তিনি যে আনন্দ উপভোগ করেন তা নিরপেক্ষ, অর্থাৎ অন্য কোনো জিনিসের অপেক্ষা করে না।

গীতার 'কর্মণ্যেবাধিকারাস্তে মা ফলেষু কদাচন' শ্লোকটি নিয়া আলোচনা চলিতেছিল। এ প্রসঙ্গে তিনি বলিলেন, "ঈশ্বর ঈশ্বর করছ; কে ঈশ্বর? আকাশে কি বসে আছেন? তাঁকে কি ক'রে সেবা করবে? এই সমস্ত মনুষ্য সমষ্টির মধ্যে তাঁকে দেখ। তাঁকে বলা হয় বিরাট পুরুষ। এইভাবে তোমার সংসারে স্ত্রী পুত্রের ভিতর, পাড়াপ্রতিবেশীর ভিতর—নমঃশূদ্র, চণ্ডাল, ব্রাহ্মণ এই সবার ভিতর যে নারায়ণ আছেন তাকে দেখ। আর এই ঈশ্বরবুদ্ধি ক'রে নাম যশ কি স্বার্থসিদ্ধি কিছুর দিকে লক্ষ্য না রেখে তাদের দুঃখে কাতর হয়ে তাদের সেবা ক'রে যাও।

"তোমরা কি মনে কর—যে কাজ তোমরা করছ ভগবান অমনি তা বসে বসে লিখছেন আর তাই খতিয়ে খতিয়ে তিনি ফল ঢেলে দিচ্ছেন? তা নয়। তাঁর সব কিছুর আইন আছে। তিনি নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত। নিত্য কি—না অনাদি অনন্ত। শুদ্ধ অর্থাৎ তাতে কিছুমাত্র মলিনতা নেই। তারপর তিনি জ্ঞান-চৈতন্যস্বরূপ। তা ভগবান্ লাভ করতে হলে আমাদের সেই অবস্থা পেতে হবে। যেটা অনিত্য, অশুদ্ধ, অজ্ঞান কি বন্ধন, তা ত্যাগ করতে হবে। প্রতিদিন রাত্রিবেলা ভালোই হোক আর মন্দই হোক, পাপ পুণ্য সব ভগবানেই অর্পণ করবে। ঠাকুর একটি ফুল নিয়ে মা'র পায়ে দিয়ে বললেন—'মা, এই নে তোর পাপ, এই নে তোর পুণ্য; এই নে তোর অবিদ্যে; এই নে তোর ভালো, এই নে তোর মন্দ; আমায় শুদ্ধা ভক্তি দে।' উপাসনার এই আদর্শ। ভগবানের চোখে ভালোমন্দ নেই। এই ধর আগুন। এতে যেমন রান্নাও হয়, শীতকালে বেশ গা গরমও রাখে। আবার ছেলেটি হয়তো পুড়ে

গেল কি সর্বস্বান্ত হয়ে গেল, তখন বললে—ঈশ্বরের অভিশাপ। স্বার্থের হানি হলেই আমাদের মনে মন্দ হল। তা বলে আগুনের কি দোষ আছে, বলতো? এই ধর বিদ্যুৎ। দিব্যি ট্রাম চলছে, কিন্তু তার ছিঁড়ে মাথায় পড়লেই মন্দ হয়ে গেল। একই জিনিস ভালো মন্দ দুই-ই। তা ভালোটা নিতে গেলে মন্দটাও নিতে হবে।' "সর্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ।" আগুন জ্বাললে ধোঁয়াটাও নিতে হবে বৈ কি। অ্যাব্‌সোল্যুট্ গুড্ বা নিছক ভালো এখানে নেই মনে করতে হবে, এ সংসার ভগবানের। 'আমি আমার' বললেই ফলভোগ। বাসনাবর্জিত হয়ে কাজ করা অভ্যাস করতে হবে[১]।"

আর একদিন স্বামীজী বুঝাইতেছিলেন, দেহের ভোগেচ্ছা ছাড়িয়া ব্রহ্মানন্দের দিকে মনকে চালিত করিতে হয়, এজন্য দেহ হইতে আত্মাকে পৃথক বলিয়া ভাবার অভ্যাস করা দরকার। এ প্রসঙ্গে বলিলেন, "দেহ থেকে আত্মাকে আলাদা ক'রে নিলে বাহ্যজ্ঞান শূন্য হয়ে যেতে হয়। এ আমরা ঠাকুরের হতে দেখেছি। চোখ হয়তো খোলা আছে তাতে আঙুল দিলেও পাতা নড়ে না। মন নিশ্চল হলেই শরীর জড় হয়ে গেল। এই যে সব ব্যাপার, এ ঠাকুর দেখিয়ে শেখালেন—ব্যাখ্যা করেন নি। প্রত্যক্ষ দেখেছি হাত অসাড় হয়ে গেছে—সব যেন স্টিক্, অনড়। কি কঠোর তপস্যাই না তিনি করেছিলেন। সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত খাওয়া-দাওয়া নেই, স্থিরভাবে সূর্যের দিকে তাকিয়ে থাকতেন। এই রকম কত সাধনাই তিনি করেছিলেন।

"ক্রমে ক্রমে এমন অবস্থা হয়ে গেল যে দিনরাত ভাবের ঘোরে থাকতেন। তখন এক সাধু তাঁকে রুল দিয়ে খুব মেরে মেরে একটু জ্ঞান করাতো। আর সেই অবসরে হৃদয় জোর ক'রে কিছু খাইয়ে দিত। আঘাত বন্ধ হলেই আবার তাঁর সেই অবস্থা। সে যে কী—বারো বছর তিনি ঘুমান নি, চোখের পাতা পড়ে নি। এ

১ মহারাজের কথা: চিৎস্বরূপানন্দ

অবস্থায় খুব কম সাধকই যেতে পারে। পরে তিনি বলতেন, 'ওরে, সে একটা ঝড় ব'য়ে গেছে। দিগ্‌দিক জ্ঞান ছিল না। তখন আমরা বুঝতে পারতুম না—অবাক হয়ে থাকতুম। এখন সব বুঝতে পারছি। দেহ থেকে আত্মা একেবারে আলাদা ক'রে ফেলেছিলেন, তাই এই বিদেহ অবস্থাতেও যাদের দেহ থাকে এমন মহাপুরুষ খুব কম।"

প্রণব তত্ত্বের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া অভেদানন্দ সোৎসাহে বলিতেন, তস্য বাচকঃ প্রণবঃ—যত নাম তুমি চিন্তা করিতে পার, যা-ই কিছু পড় বা শোন, বিষ্ণুর সহস্র নামই হোক বা শিবের লক্ষ নামই বল না কেন—সবই ওই এক প্রণবেতে আছে। এই হচ্ছে যথার্থ তত্ত্ব। মাণ্ডুক্য উপনিষদ্ তো ওঙ্কারেরই ব্যাখ্যা। অকার জাগ্রত অবস্থা, উকার স্বপ্নাবস্থা, মকার সুষুপ্তি এবং নাদ তুরীয় অবস্থা। কণ্ঠ, তালু প্রভৃতি শব্দের এক একটি স্থান। 'অ'-এর কণ্ঠ থেকে উৎপত্তি। এর উচ্চারণে কোনো খিচ্ নেই, বেশ সরল। 'অ'-কারই বেদের মূল। 'ম' শেষ বর্গীয় বর্ণ, ওষ্ঠদ্বয় বন্ধ ক'রে উচ্চারণ করতে হয়, আর 'উ' মাঝামাঝি। তা তুমি যত রকমের শব্দই উচ্চারণ কর না কেন সব এই এক ওঙ্কারেই আছে। খ্রীষ্টানেরা প্রার্থনার শেষে যে 'আমেন' বলে সে এরই অপভ্রংশ।'

"তজ্জপস্তদর্থভাবনম্। এই ওঙ্কার জপ করতে হবে। পাথরেও এক এক ফোঁটা জল ক্রমাগত পড়লে একটা জায়গা ঠিক ক'রে নেবে। সেই রকম ক্রমাগত এক চিন্তা করতে হবে। মন অন্য জায়গায় গেলে হবে না। হাতে হরিনামের মালা ওদিকে কার সর্বনাশ করবে মনে ভাবছ—এতে কিছুই হবে না। আর জপের সঙ্গে সঙ্গে তার অর্থ চিন্তা করতে হবে। এতে মনের মলিনতা, কলুষ প্রভৃতি দূর হয়ে যাবে—চিত্ত শুদ্ধ হবে। সংসারী মন বড় পাজী। তাই ভগবান্ কি শুধু ফুল মধু ছড়িয়ে শিক্ষা দেন? তা নয়। মাথায় ঘা দিয়েও শিক্ষা দিয়ে থাকেন। আত্মীয় স্বজনের মৃত্যু—এই রকম বারে বারে কত ঘা খেয়ে মনের শিক্ষা হচ্ছে।

সংসারীর দিক থেকে এসব মহা অশান্তির কারণ বলে মনে হলেও ভগবানের দিক থেকে এ যথার্থ কল্যাণকর। তাই তো কুন্তী বলেছিলেন—হে ভগবান্, আমায় দুঃখ দাও। বল দিখিনি এভাবে প্রার্থনা জগতে আর কে করতে পারে? ওই যে আছে না—যে করে আমার আমার আশ, আমি করি তার সর্বনাশ। সব শ্মশান হয়ে গেলে মন নিরালম্ব হয়—আর তখনই ভগবান্ আসেন।"

আর একদিন ভক্তদের বলিতেছিলেন,[১] "ব্রহ্ম বা ভগবান্ জ্ঞানস্বরূপ। তুমিও তাই। জ্ঞান স্বতঃপ্রকাশ। জ্ঞান তার প্রকাশের জন্য অন্য কিছু সাহায্যের অপেক্ষা রাখে না। আলোকে জানার জন্য আর আলোর দরকার হয় না। তাই সাধন-ভজন ক'রে যেতে হয়, কবে জ্ঞান লাভ করবে ঐ রকম ক'রে খতিয়ে দেখতে নেই। সাধন-ভজন তো আর আলু বেগুনের, ব্যবসা নয় যে খতিয়ে দেখবে লাভ হল—কি লোকসান হল।

"সাধনভজনের বেলায় লাভ লোকসান যদি হয় তো তা একমাত্র সাধকের নিজের দোষের বা গুণের জন্য হয়। নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সঙ্গে চেষ্টা করলে সিদ্ধিলাভ নিশ্চয়ই হবে, আর লোক দেখানো জপধ্যান কর তো নিজের ফাঁকিতে পড়বে। আসলে সাধন-ভজন ক'রে যেতে হয়, আর চিন্তা করতে হয়, কতটুকু আন্তরিকতার সঙ্গে করছ, কতটুকু তোমার মন উদার ও সংস্কারমুক্ত হয়েছে, পরের দোষদর্শন না ক'রে কতটুকু সকলের গুণের দিকে তোমার দৃষ্টি যাচ্ছে, নিজেকে যেমন ভালোবাস তেমনি কতটুকু অপর সকলকে তুমি ভালোবাস, কতটুকু স্বার্থবুদ্ধি ও কামভাব তোমার ভেতর থেকে দূর হয়ে গেছে—এই সব। এগুলোই তো খতিয়ে দেখার এবং বিচার করার জিনিস। নইলে সাধন-ভজনও করছ, আর মনের মধ্যে কুসংস্কারগুলোকে জাগিয়েও রাখছ, এতে কিছু হবে না।

"তাই সাধন-ভজন করার সময় একান্তই যদি জানতে চাও যে কবে তোমার সিদ্ধিলাভ হবে, তা হলে একথাই মনে রাখবে যে,

১ মন ও মানুষ: স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

মনের সকল সংস্কার যেদিন দূর হবে সে'দিনই তোমার সিদ্ধিলাভ হবে। মনে সংকীর্ণতা থাকবে আর ভগবান্ লাভ করবে—এতো আর হয় না। শঙ্করাচার্য ঠিক এ ধরনের কথাই বলেছেন যে, জ্ঞানলাভ করা মানে অজ্ঞান দূর করা। আলোর প্রকাশ চিরকালই আছে, অজ্ঞান-রূপ আবরণের জন্যই অন্ধকার। তাই অন্ধকার দূর করার জন্য যেমন আলোর দরকার, অজ্ঞান দূর করার জন্য তেমনি সাধন-ভজন অর্থাৎ আত্মতত্ত্ব বিচার দরকার। ব্রহ্মজ্ঞান সর্বদাই আছে, সুতরাং তাকে সাধন-ভজন দিয়ে আর কি লাভ করবে বলো? যা নেই তাকে পাবার জন্যই চেষ্টা, কিন্তু যা সর্বদাই আছে তাকে পাবার জন্য কি আর চেষ্টা করবে, বলো? অজ্ঞান নাশের সঙ্গে সঙ্গেই জ্ঞানের প্রকাশ হয়।"

তরুণ ভক্ত সাধকেরা নিবিষ্ট হইয়া তাঁহার কথা শুনিতেছিলেন, তাঁহারা কহিলেন, "ওসবের ধারণা করা বড় শক্ত মহারাজ।"

উত্তর হইল, "এসবের ঠিক ঠিক ধারণা করতে গেলে চাবিকাঠি দরকার।"

'এই চাবিকাঠিটি কি?'—এ প্রশ্নের উত্তরে অভেদানন্দজী কহিলেন, "ঐকান্তিকতা একনিষ্ঠা ভক্তি বিশ্বাস ব্যাকুলতা এ'গুলোই চাবিকাঠি। উদ্দেশ্যের প্রতি মনের একমুখিতা থাকা চাই। তোমার মন কেবল ইষ্টকেই চাইবে দুনিয়ার আর কিছু চাইবে না। পার্থিব সব কিছু পড়ে থাকবে মনের বাইরে, তোমার মন থাকবে আত্মনিষ্ঠ হ'য়ে। মনের তখন আর আলাদা অস্তিত্ব কিছুই থাকবে না। মনকে এই আত্মনিষ্ঠ বা ব্রহ্মাবগাহী করার কৌশল জানার নামই চাবিকাঠি। 'গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং বরেণ্যং—আত্মা হৃদয়গুহায় অবরুদ্ধ কি—না লুকিয়ে আছেন। সেই গুহার দরজা খুলতে গেলে এই চাবিকাঠি চাই।"

ঈশ্বরপ্রেম ও ঈশ্বরভাবনা কি করিয়া আত্মজ্ঞান ও অদ্বৈতবোধে প্রতিষ্ঠিত হয় তাহার একটি উদাহরণ অভেদানন্দজী প্রায়ই দিতেন। বলিতেন: "একজন সুফী তার বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে দরজায় আঘাত

করলে। ভেতর থেকে প্রশ্ন এল, 'বাইরে কে?' সুফী বললে 'আমি তোমার বন্ধু।' বন্ধু গম্ভীরভাবে উত্তর দিলে, 'যাও বন্ধু, আমার টেবিলে দু'জনের স্থান হবে না।' সুফী বন্ধু তখন মনে গভীর দুঃখ নিয়ে ফিরতে বাধ্য হল, কিন্তু বিরহের আগুন তার হৃদয়কে পুড়িয়ে দিচ্ছিল। সে তাই ফিরল, ভয় ও শ্রদ্ধা নিয়ে তার বন্ধুর দ্বারে এসে আবার আঘাত করলে। ভেতর থেকে আগের মতোই উত্তর এল, 'বাইরে কে?' এবার সুফী বন্ধু উত্তর দিলে, 'হে প্রিয়তম, তুমি।' তখন দরজা খুলে গেল ও তার বন্ধু বললে, 'তোমার আমিত্ব যখন ঘুচে গেছে তখন ভেতরে এসো, কেন না আমার ঘরে দুজন আমির স্থান নেই।'

একদিন মন সম্পর্কে ভক্ত সাধকদের কহিলেন, "মানুষের মন আর কি না পারে বলো। মন এত বলীয়ান্ কেন? তার পিছনে সবশক্তিময় আত্মা আছেন বলে? চন্দ্র যেমন সূর্যের কাছ থেকে আলো ধার করে জ্যোতিষ্মান্, মনও তেমনি। নইলে মন তো আসলে জড় একটা যন্ত্র, আত্মচৈতন্য তার পিছনে থেকে তাকে নিয়ন্ত্রণ করে বলেই সে কাজ করে। মন সব কিছু করে মানে আত্মাই মনকে প্রেরণা দেয়। মন তাই মাধ্যম বা যন্ত্র। কিন্তু আত্মাতে কোনো কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব প্রভৃতি গুণ বা অভিমান নেই, অথচ 'তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি', তাঁরই আলোকে দুনিয়ার সব কিছু আলোকিত। জীবজন্তু সবই তাঁর কাছে থেকে শক্তি ও প্রেরণা পেয়ে কাজ করে। দেদীপ্যমান সূর্য সকলের ওপর সমান ভাবে কিরণ দেয়। পক্ষপাতিত্ব তাতে কিছুমাত্র নেই। সূর্য কিরণ না দিলে আলোর অস্তিত্ব থাকতো না। আগুনই কি পেতে? আত্মাও তেমনি। মন আত্মার দ্বারী, সাধারণ লোক কিন্তু মনকেই কর্তা ভাবে, আর তখনি সে মনের বশীভূত হয় ও সৃষ্টি হয় যত কিছু অনর্থ।

"সাধনা মানেই মনের 'অহং' কর্তৃত্বাভিমানকে নষ্ট করা, মনকে বুঝিয়ে দেওয়া যে, তুমি কর্তা নও, কর্তা হলেন শরীরী আত্মা—যিনি

শরীরে আছেন আবার জগতের সর্বত্র আছেন। যখন এই রকম ভাবতে পারেন তখনি তোমার মন বশীভূত হবে, তুমি মনের পারে যাবে। মনই মুক্তির অন্তরায়, আবার মনই মুক্তির সহায়ক। অন্তরায় —কেননা মনই কর্তা সেজে নিয়ে আত্মা থেকে পৃথক এ কথা মানুষকে জানিয়ে দেয়, আর সহায়ক—কেন না মনই—বুদ্ধিরূপে আত্মাকে জানিয়ে দেয়। বুদ্ধিবৃত্তিতে ব্রহ্মচৈতন্য প্রতিবিম্বিত হন, আর তাতে ক'রে বৃত্তির মধ্যে যে অজ্ঞান তা' নষ্ট হ'য়ে জ্ঞান স্বতঃ প্রকাশিত হয়। এই জ্ঞানই শুদ্ধজ্ঞান বা আত্মজ্ঞান—ইংরেজীতে যাকে বলে, সেলফ নলেজ বা গড্ কনশাসনেস্। শ্রীশ্রীঠাকুর এই কথাকেই একটু ভিন্ন ভাবে বলেছেন। তিনি বলেছেন, মহামায়া অন্তঃপুর পর্যন্ত যেতে পারেন না, তিনি ব্রহ্মকে দূর থেকে দেখিয়ে দিয়ে অদৃশ্য হন। এই দেখিয়ে দেওয়ার কৃতিত্ব কিন্তু মনের অর্থাৎ বুদ্ধির, মন বা বুদ্ধিই আবার মায়া বা মহামায়ার সঙ্গে ব্রহ্মের ভেদ কেবল পার্থিব দৃষ্টিতে, পারমার্থিক দৃষ্টিতে দুইই এক[১]।"

ভক্তের প্রশ্ন করেন, "মহারাজ, শ্রীশ্রীঠাকুর বলেছেন মন প্রসন্ন হলে তা আত্মজ্ঞানও দিতে পারে। ব্রহ্ম মন-বুদ্ধির অগোচর, কিন্তু শুদ্ধ মনের গোচর, তাই কি?"

অভেদানন্দজী উত্তর দেন, "হ্যাঁ, তাই বৈ কি। মন প্রসন্ন হওয়া মানে মন শুদ্ধ হওয়া। মনের সংকল্প-বিকল্প বৃত্তি-দুটো চলে গেলেই মন শুদ্ধ হয়। সাধকের মন শুদ্ধ হলে আর মন থাকে না; তখন তা শুদ্ধচৈতন্যরূপে প্রতিভাত হয়। এটাকেই ভিন্নভাবে বলা হয়েছে যে, মন প্রসন্ন হ'লে তা-ই আত্মজ্ঞান দিতে পারে। একই কথা।"

অভেদানন্দজীর সকল কিছু তত্ত্ব উপদেশের মধ্যে জ্ঞানচর্চা ও আত্মজ্ঞান লাভের কথা শুনা যায়। কিন্তু তাঁহার সব কিছু বক্তব্যের পশ্চাৎপটে রহিয়াছে, মানবপ্রেম, জীবের জন্য অফুরন্ত ভালোবাসা।

"তিনি বলিতেন, এ যুগে বিবেকানন্দই জ্ঞানচর্চার জন্যে চেষ্টা করেছিলেন। দেশ অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছে এখন বেদান্ত উপনিষদের

১ মন ও মানুষ : স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

চর্চা চাই। আত্মজ্ঞান লাভ করতে হবে। তবেই মৃত্যুভয় থাকবে না—জগৎকে ভালোবাসতে পারবে। তা নয় খালি নিজে নিজের বউটি আর ছেলেটি। দুনিয়া ডুবুক আমার কি? এর ওষুধ হচ্ছে ভালোবাসা—তোমার নিজের মতো ক'রে ভালোবাসো তোমার প্রতিবেশীকে—এই ভালোবাসা এখন সন্ন্যাসীদের ভিতরেও নেই। তাই তো বেদান্ত চর্চা করতে হবে—গাছতলায় ব'সে নয়। এবং এ শুধু সন্ন্যাসীদের জন্যেও নয়। বাড়িতে, স্ত্রীপুত্রের ভিতর, পাড়া-প্রতিবেশীর মধ্যে প্রচার করতে হবে। প্রত্যেক মা প্রত্যেক ছেলেকে এই শেখাবে, তবে আমাদের দেশের মঙ্গল হবে।

ভক্তপ্রবর চিৎস্বরূপানন্দের মতে, অভেদানন্দের চরিত্রের ভিত্তি হইতেছে তাঁহার অপার মানবপ্রেম। এই দৃষ্টিকোণ হইতে স্বামীজীর মূল্যায়ন করিতে গিয়া তিনি বলিয়াছেন: এই মনীষা, এই প্রতিভা, এই সাহস, এই ক্ষুরধার বিচারবুদ্ধি, সুনিবিড় দার্শনিকতা, সুগভীর জ্ঞান যা তাঁর জীবনে সুনিহিত, সুবিহিত, সুষমাযুক্ত ঐক্যে পুষ্পিত হয়েছিল, এসবের উপরেও তাঁর চরিত্রের যে পরম মাধুর্য ছিল সেটি হচ্ছে তাঁর আশ্চর্য সরলতা, আর অকারণে সবাইকে ভালোবাসা। আজ যখন সে সব কথা ভাবি তখন মনে হয় তিনি যে কি ছিলেন তা জানি না। কেবল জানি, আমাদের সঙ্গে তাঁর ছিল একটি গভীর অন্তরের টান। তিনি ছিলেন প্রেমিক, সত্যিকার দরদী, তাই যা কিছু প্রাণবান্ তার প্রেরণা পাই তাঁর কাছ থেকে। বিশ্বের দরবারে প্রচার করতে গিয়ে ভোলেননি তিনি স্বদেশের দুঃখ, স্বজাতির ব্যথা। স্বল্প কথায় 'ইণ্ডিয়া অ্যাণ্ড হার পিপল,'-এ যা বলেছেন সেখানে চাপা থাকে নি দেশের দুঃখে কেমন ক'রে কেঁদেছিল তাঁর প্রাণ। তার প্রেম জলধি ভৌগোলিক গণ্ডীতে আবদ্ধ করা যায় না। তিনি শুধু বাংলার নয় ভারতের নয়—নিখিল মানবের অন্তর-বেদীর নিরালায় যুগে যুগে পাতা তাঁর কালজয়ী সিংহাসন।

"মানুষ যে এত সরল হতে পারে তাঁকে না দেখলে তা কখনো বিশ্বাস করতুম না। কতবার তাঁকে দেখেছি ক্ষমার ঠাকুররূপে তাকিয়ে

আছেন ক্ষমাসুন্দর চক্ষে। কত লোক এসেছে, ভক্তি জানিয়েছে, প্রণাম করেছে, কৃতকৃতার্থ হয়ে চলে গেছে। আবার কতজনে এ সোনার আদর্শ নির্মমভাবে অস্বীকার ক'রে গেছে। কিন্তু যাঁর সামনে এসব ঘটেছে, তাঁর হাসি—সেই দেবদুর্লভ হাসি কেউ ম্লান করতে পারে নি[১]।

স্বামী অভেদানন্দের দীর্ঘ কর্মময় জীবনে এবার ধীরে ধীরে আসিয়া পড়ে বিরতির পালা। এ সময়ে মাঝে মাঝে স্মিতহাস্যে অন্তরঙ্গ ভক্তদের দিকে তাকাইয়া কহিতেন, "জানো, এবার ঠাকুর আমায় পেনসন দিচ্ছেন। অনেক খেটেছে এই দেহটা, এবার একটু বিশ্রাম করে নিক্ কি বল ?"

দেহান্তের প্রায় বৎসর দেড়েক আগে হইতেই স্বামীজী নানা অসুখে ভুগিতে থাকেন। অন্তরঙ্গ ভক্ত ও সেবকেরা প্রাণপণ প্রয়াসে তাঁহার চিকিৎসা ও সেবা পরিচর্যার ব্যবস্থা করেন।

রোগশয্যায় শায়িত থাকিয়াও অভেদানন্দ তরুণ সাধনার্থীদের উপদেশদানে বিরত হন নাই। যে কেহ তাঁর নিকট জিজ্ঞাসু হইয়া উপস্থিত হইত, লাভ করিত সাধন উপদেশ, রামকৃষ্ণ-তনয়ের মুখে রামকৃষ্ণের স্মৃতিচারণ শুনিয়া জীবন সার্থক করিত।

এ সময়ে একদিন স্বামীজী বালকের মতো হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, —"দেশের সর্বত্যাগী নায়ক সুভাষ, তাকে দেখতে আমার বড় ইচ্ছে হয়েছে।"

এ সংবাদ পাওয়া মাত্র সুভাষচন্দ্র স্বামীজীর বেদান্ত মঠে আসিয়া উপনীত হন, নিবেদন করেন সশ্রদ্ধ প্রণাম। স্বামীজী তখন অত্যন্ত অসুস্থ, উঠিয়া বসিতে পারেন না। কিন্তু দেশের মুক্তি সংগ্রামের পুরোধা পুরুষ সিংহ সুভাষচন্দ্রকে দেখিয়া তিনি আনন্দে বিহ্বল হইয়া উঠিয়াছেন। সোৎসাহে বলিলেন, "এসো, এসো সুভাষ। তোমায় একবার আলিঙ্গন করি।"

কোনমতে উঠিয়া সস্নেহে সুভাষচন্দ্রকে দুই হাতে বুকে জড়াইয়া

[১] মহারাজের কথা : চিৎস্বরূপানন্দ

ধরিলেন। গদ্‌গদ স্বরে কহিলেন, "আশীর্বাদ করি, তুমি বিজয়ী হও।" অপরিসীম শ্রদ্ধা নিয়া নম্র কিশোর বালকের মতো সুভাষচন্দ্র স্বামীজীর শয্যার পাশে বসিয়া রহিলেন, মাঝে মাঝে দেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে উভয়ের বাক্যালাপ হইতে লাগিল। ঘণ্টাখানেক পরে সুভাষচন্দ্র স্বামীজীকে প্রণাম করিয়া বিদায় নিলেন।

দেহান্তের আর বেশী দেরি নাই এ কথা অভেদানন্দ নিজে ভালোভাবেই জানেন। মাঝে মাঝে অন্তরঙ্গ ভক্তদের বলেন, "কি গো, তোমরা আমার শেষ কৃত্য কোথায় করবে?"

এটা ওটা নানা কথা বলার পর নিজেই নির্দেশ দেন, "সব চাইতে ভালো, ঠাকুরের চরণতলে শুয়ে থাকা।" ভক্তেরা বুঝিলেন, তিনি কাশীপুর শ্মশানে, ঠাকুর রামকৃষ্ণের সংকার হলের কথাটির উল্লেখ করিতেছেন।

অবশেষে নির্ধারিত চিরবিদায়ের লগ্নটি আসিয়া যায়। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই সেপ্টেম্বর সমাধিযোগে মহাপ্রয়াণ করেন আত্মকাম সাধক স্বামী অভেদানন্দ।

অধ্যাত্মশিল্পী শ্রীরামকৃষ্ণ সযত্নে রচনা করিয়াছিলেন তাঁহার সাধক তনয়দের একটি মণিময় হার। সে হার হইতে একটি উজ্জ্বল মণি সেদিন খসিয়া পড়িল।

বেলুড় মঠের সন্ন্যাসীরা তাঁহাদের এই গুরুভাই সম্বন্ধে আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া তাই লিখিয়াছেন,[১] "তিনি (অভেদানন্দ স্বামী) ছিলেন বহির্ভারতে আমাদের জন্মভূমি ও তাহার ধর্ম সংস্কৃতির একজন প্রখ্যাত প্রবক্তা। তাঁর জীবনে সম্মিলিত হয়েছিল সুগভীর অধ্যাত্মশক্তি এবং সেবানিষ্ঠা—এবং তার পুণ্যময় মহাজীবন নিঃশব্দে নিবেদিত হয়েছিল মানবের পরম কল্যাণে। ঈশ্বরের ইচ্ছাক্রমে, তাঁর সদ্‌গুরুর কর্মব্রত উদ্‌যাপনের জন্য আবির্ভূত হয়েছিলেন স্বামী অভেদানন্দ। তারপর সে ব্রত সমাপ্ত ক'রে তিনি অন্তর্ধান করেছেন সেই আলোকেরই উৎসস্থলে যেখান থেকে তিনি নেমে এসেছিলেন এই ধরণীতে।"

১ ডিসাইপল্‌স অব রামকৃষ্ণ : অদ্বৈত আশ্রম

কৃষ্ণপ্রেম

সারা ইয়োরোপে তখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের তাণ্ডব শুরু হইয়াছে। ট্যাংক ও হাউইৎজের কামান নিয়া দুর্ধর্ষ জার্মান সেনা বেলজিয়াম ও ফ্রান্সের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে। বম্বার ও ফাইটার বিমান হইতে চালাইতেছে অশ্রান্ত গোলাবর্ষণ।

জলে স্থলে আকাশে ইংরেজ ও ফরাসী বাহিনীও মরণপণ করিয়া রুখিয়া দাঁড়াইয়াছে। শত্রুর উপর হানিতেছে প্রচণ্ড আঘাত।

দেশের অন্যান্য তরুণের মতো কেমব্রিজের প্রতিভাধর ছাত্র রোনাল্ড নিক্‌সনও সেদিন দেশরক্ষার জন্য উদ্বুদ্ধ। ইউনিভার্সিটির পড়া ছাড়িয়া দিয়া সোৎসাহে যোগ দিয়াছেন রয়েল এয়ার কোর্সে। জার্মানীর ভয়াবহ আক্রমণ রোধ করার জন্য ইংরেজরা সবেমাত্র একটি ক্ষুদ্র বিমান বাহিনী গড়িয়া তুলিয়াছেন। নিক্‌সন সেই বাহিনীরই অন্যতম বিমানচালক। দক্ষ ও দুঃসাহসী পাইলট রূপে অল্প দিনের মধ্যে সম্মানজনক একটি 'এইস'-ও তিনি লাভ করিয়াছেন।

হঠাৎ সেদিন কর্তৃপক্ষের গোপন নির্দেশ আসিল, জার্মান অধিকৃত বেলজিয়ামের একটা সমর ঘাঁটিতে শত্রু নূতন আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হইয়াছে, জড়ো করিয়াছে বিপুল সমর সম্ভার। অবিলম্বে ঐ ঘাঁটির উপর প্রচণ্ড আঘাত হানিতে হইবে।

গুটিকয়েক বম্বার প্লেন তৎক্ষণাৎ ক্ষিপ্রবেগে উড়িয়া চলিল সেই লক্ষ্যের দিকে। চালকরূপে রোনাল্ড নিক্‌সনও রহিলেন তাহার একটিতে।

বেলজিয়ামের আকাশে ঢুকিবার আগেই একটি গুপ্ত ঘাঁটি হইতে উড়িয়া আসে একদল জার্মান ফাইটার বিমান, ক্ষিপ্রবেগে করে নিক্‌সনের পশ্চাৎ-ধাবন। এতক্ষণ সেদিকে তিনি লক্ষ্যই করেন নাই। একমনে লক্ষ্যস্থলের দিকে উড়িয়া চলিয়াছেন, ককপিট-এ বসিয়া

দৃঢ় হস্তে থ্রটল ঠেলিয়া নিতেছেন বার বার, বিমানের গতি আরো তীব্র হইয়া উঠিতেছে।

হঠাৎ তাঁহার নজর পড়িল দূরে আকাশের কোণে, দুর্ধর্ষ জার্মান ফাইটারগুলি তাঁহাকে ঘেরাও করার জন্য ছুটিয়া আসিতেছে। একাকী এতগুলি শত্রুবিমানের সঙ্গে যুঝিয়া উঠা সম্ভব নয়। নিক্‌সন প্রমাদ গণিলেন।

মুহূর্ত মধ্যে এই সংকটকালে তাঁহার নয়ন সমক্ষে ভাসিয়া উঠে এক অতীন্দ্রিয় দৃশ্য। তুষারমৌলী এক উত্তুঙ্গ পর্বত সূর্যের রূপালী আলোয় ঝলমল করিতেছে, আর সেই পর্বতের কন্দর হইতে নির্গত হইতেছে শুভ্র-উজ্জ্বল স্বর্গীয় আলোকধারা। এই আলোকের তরঙ্গে ডুবিয়া যাইতেছে রোনাল্ড নিক্‌সনের সারা অস্তিত্ব।

ক্ষণপরেই এক দিব্য ভাবাবেশে আবিষ্ট হইয়া পড়েন তিনি। অর্ধ-বাহ্য অবস্থায় অনুভব করিতে থাকেন, কোথা হইতে একটা অজানা শক্তি তাঁহার দেহের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, অধিকার করিয়া বসিয়াছে তাঁহার ইচ্ছাশক্তি ও হস্তপদের ক্রিয়া।

ঐ শক্তি-ই এবার চালাইয়া নিতে থাকে নিক্‌সনের বম্বার প্লেনটিকে। ঊর্ধ্বে আরো ঊর্ধ্বে দূর আকাশে সেটি উঠিয়া যায়। তারপর ঘুরিয়া চলিতে থাকে বিপরীত দিকে।

বাহ্য জ্ঞান ফিরিয়া আসিলে নিক্‌সন চাহিয়া দেখেন। বিমানের ককপিটে তিনি আর বসিয়া নাই। রহিয়াছেন লণ্ডনের কাছাকাছি একটি সামরিক হাসপাতালে।

তাঁহার বিমানটি ইংল্যাণ্ডে নিজস্ব বিমান ঘাঁটিতে নিরাপদে অবতরণ করে। কিন্তু অবতরণ করার পর দেখা যায়, পাইলট নিক্‌সন মূর্ছিত অবস্থায় ককপিটের মধ্যে ঢলিয়া পড়িয়া আছেন। অতঃপর তাড়াতাড়ি তাঁহার চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়।

সেদিনকার অভিযানের সঙ্গী পাইলটের অনেকেই হত বা নিহত হইয়াছে। কয়েকটি বৃটিশ বিমান হইয়াছে একেবারে বিধ্বস্ত। পাইলট নিক্‌সন কি করিয়া শত্রু ব্যূহের কাছাকাছি গিয়াও নিরাপদে

ফিরিয়া আসিলেন, এ এক পরম বিস্ময়। সঙ্গী পাইলটেরা কেউ কেউ দেখিয়াছিলেন, নিক্‌সনের বম্বার প্লেনটি আকাশে বহু উঁচুতে উঠিয়া কোথায় উধাও হইয়া গেল। তারপর দেখা গেল, সেটি বৃটিশ বিমান ঘাঁটিতে ফিরিয়া আসিয়াছে, আর নিক্‌সন পড়িয়া আছেন অচেতন অবস্থায়।

এয়ার মার্শাল নিজে সেদিন হাসপাতালে আসিয়া উপস্থিত, নিক্‌সনের শয্যার পাশে বসিয়া করেন প্রশ্নের পর প্রশ্ন। সেদিনকার অভিযানে বৃটিশ বিমান বহর ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, তাই এ সম্পর্কিত তথ্য তিনি সংগ্রহ করিতে চান।

"তোমার বম্বার বিমান কি ক'রে ফিরে আসতে পারল দুর্ধর্ষ জার্মান ফাইটারগুলোর প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে"—প্রশ্ন করা হইল রোনাল্ড নিক্‌সনকে।

সরলভাবে নিক্‌সন খুলিয়া বলিলেন সেদিনের সকল কথা, একটা বিস্ময়কর দৈবী শক্তি হঠাৎ কি জানি কেন, আমায় অধিকার ক'রে বসেছিল। শুধু তাই নয়, আমায় পর্যুদস্ত ক'রে, হাতদুটিকে বাধ্য করেছিল ঘুরপথে পালিয়ে আসার জন্য।

"দৈবী শক্তি? যতো সব অর্থহীন বাজে কথা।" তাচ্ছিল্যের সুরে মন্তব্য করেন এয়ার মার্শাল। যাইবার সময় ডাক্তারকে বলিয়া গেলেন, পাইলট রোনাল্ড নিক্‌সনের স্নায়বিক চাঞ্চল্যের দিকে যেন সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়।

নিক্‌সন কিন্তু মনে মনে হাসিলেন। তিনি যে নিশ্চিতরূপে জানেন, অযথা কোনো অলৌকিকত্বের অবতারণা তিনি করেন নাই। যে দিব্য ভাবাবেশে বেলজিয়ামের আকাশে উড়ন্ত অবস্থায় তিনি আবিষ্ট হইয়াছিলেন, সেই ধরনের ভাবাবেশ আরো কয়েকবার এই হাসপাতালে আসার পর তাঁহার হইয়াছে। স্পষ্টরূপে একাধিকবার তিনি দেখিয়াছেন সেই অলৌকিক দৃশ্য—সূর্য করোজ্জ্বল সেই অভ্রভেদী পাহাড়ের চূড়া, আর সেই পাহাড় চূড়া হইতে নির্গত হইতেছে শুভ্র জ্যোতির প্রবাহ। শুধু তাহাই নয়, এখানে আসার

পর ঐ পাহাড়ের পরিচয়ও উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে তাঁহার কাছে। অন্তরাত্মা হইতে কে যেন বারে বারেই অস্ফুটস্বরে বলিয়া উঠিতেছে, "হিমালয় দেখেছো তুমি সেদিনকার অলৌকিক দর্শনের মধ্যে। পবিত্র হিমালয়ের কন্দরে থাকেন যে সব যোগী ঋষি, তাঁদের কৃপা তুমি পেয়েছ। সেই কৃপাই সেদিন উদ্ধার করেছে তোমায় নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে।'

'হিমালয়', আর 'ভারতবর্ষ' এই দুইটি নাম ঘুরিয়া ঘুরিয়া উপস্থিত হইতেছে নিক্‌সনের মানসপটে। অব্যক্ত আনন্দের রোমাঞ্চ শিহরণ ঘটিতে থাকে বার বার। ভারত সম্পর্কে তেমন বিশেষ কিছু জানা নাই তাঁহার। কলেজ লাইব্রেরী হইতে বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কিত দুই একটি গ্রন্থ পড়িয়াছেন, আর পড়িয়াছেন থিয়োসফিস্ট অ্যালকট্ ও ব্লাভাৎস্কির কয়েকটি রচনা। হিমালয়ের শক্তিধর মহাত্মাদের কাহিনী অল্পস্বল্প তিনি জানেন বটে কিন্তু ইহা নিয়া কোনোদিনই মাথা ঘামান নাই। ইউনিভার্সিটির মেধাবী ছাত্র রোনাল্ড নিক্‌সন, ইংরেজী সাহিত্যের উপর বরাবরই তাঁহার প্রবল অনুরাগ। এই সাহিত্যেই তিনি ব্যুৎপন্ন হইয়াছেন, অনার্স নিয়া পাস করিয়াছেন। আপন খেয়াল খুশীমতো দুই চারিটি ধর্ম দর্শনের বই পড়িয়াছেন বটে কিন্তু তাহাতে তেমন কোনো আকর্ষণ বোধ করেন নাই। এবারকার এই অলৌকিক অভিজ্ঞতা কিন্তু নিক্‌সনের মানসিক স্তরে ঘটাইয়া দিল এক বিপর্যয়। ভারতবর্ষ, ভারতবর্ষের ধর্ম, দর্শন ও সাধু মহাত্মাদের সম্বন্ধে জাগিয়া উঠিল এক নূতনতর মূল্যবোধ।

অলৌকিক অনুভূতি আজ আর তাঁহার কাছে ধোঁয়াটে কোনো বস্তু নয়। অলৌকিক কৃপা ও শক্তির অভিজ্ঞতা তাঁহার নিজ জীবনে স্পষ্টরূপে ধরা দিয়াছে। এই কৃপা এবং এই শক্তি শুধু তাহার প্রাণ রক্ষাই করে নাই, নূতনতর আত্মিক চেতনা জাগ্রত করিয়াছে তাঁহার জীবনে, উদ্বোধিত করিয়াছে নূতনতর বিশ্বাস ও মূল্যবোধ।

বার বারই রোনাল্ড নিক্‌সনের অন্তরে জাগে আলোড়ন, উদগ্র হইয়া উঠে প্রশ্নের পর প্রশ্ন,—'অলক্ষ্যে থেকে কেন ঐ কল্যাণময়

শক্তি এগিয়ে এসেছিলেন তাঁর প্রাণ বাঁচানোর জন্য? কে রয়েছেন ঐ শক্তির পেছনে? কি তাঁর প্রকৃত স্বরূপ? কোথায়, কোন্ পথে পাওয়া যাবে তার প্রত্যক্ষ পরিচয়?'

নাঃ, এসব প্রশ্নের উত্তর তাঁহাকে পাইতেই হইবে, করিতে হইবে সেদিনকার অলৌকিক অভিজ্ঞতার রহস্যভেদ। যুদ্ধের কাজে আর তাঁহার মন বসিল না, রয়েল এয়ার ফোর্সের কর্ম পরিত্যাগ করিয়া ফিরিয়া আসিলেন কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটিতে। বাহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ দুই জীবনের মোড়ই এবার ফিরিয়া গেল।

পড়াশুনার কাজে কিছুদিন তিনি ব্যাপৃত রহিলেন বটে, কিন্তু বেলজিয়ামের আকাশের সেই অলৌকিক ঘটনার স্মৃতি সতত জাগরূক রহিল তাঁহার অন্তরে। সেই সঙ্গে চলিল অন্তরের অন্তস্তলে বারংবার অবগাহন। দুর্জ্ঞেয় দিব্যলোকের হাতছানি কেবলই চঞ্চল করিয়া তোলে নিক্সনকে, একটা নূতনতর আত্মিক আস্বাদের জন্য সারা মন প্রাণ তাঁহার ব্যাকুল হইয়া উঠিতে থাকে।

এই ব্যাকুলতা এবং ভাবান্তরের ভিতর দিয়া ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করে অধ্যাত্ম-জীবনের আকাঙ্ক্ষা। পূর্বে যাহা ছিল নিছক কৌতূহলের বস্তু, এবার তাহা আবর্তিত হয় জীবনের প্রধান লক্ষ্যরূপে। অনির্দেশ্য নিয়তি নিক্সনকে অনিবার্যরূপে ঠেলিয়া নিয়া যায় তাঁহার পরম সম্ভাবনার দিকে। এ পথে অগ্রসর না হইয়া আর কোনো উপায়ান্তর নাই।

এই সময়ে একাগ্র চিত্তে ধর্ম সংস্কৃতির বহুতর গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে থাকেন নিক্সন। বিশেষ করিয়া ভারতের ধর্ম সাধনা ও সাধকজীবনের দিকে তাঁহার মন আরো গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়। থিয়োসফিস্টদের চাঞ্চল্যকর বহু গ্রন্থ পাঠ করেন, কিন্তু তাহাতে কৌতূহলের নিবৃত্তি যতটা হয় মন প্রাণ ততটা ভরিয়া উঠে না। বরং বৌদ্ধ দার্শনিকতা ও বৌদ্ধ সাধক সম্পর্কে তিনি বেশ কিছুকাল ব্যাপকভাবে পড়াশুনা করেন। লণ্ডনের এক প্রবীণ বৌদ্ধ সাধকের নির্দেশ নিয়া ধ্যান জপেও কিছুকাল নিবিষ্ট হন। কিন্তু ইহাতে

অধ্যাত্মজীবনের তৃষ্ণা তো তাঁহার মিটে না। আরো নিবিড় করিয়া পরম তত্ত্বকে যে তিনি আঁকড়িয়া ধরিতে চান। সূক্ষ্মতর আত্মিক উপলব্ধির জন্য, মুক্তির আস্বাদের জন্য রোনাল্ড নিক্সন অধীর হইয়া উঠেন।

অবশেষে তিনি স্থির করেন। ভারতে গিয়াই স্থায়ীভাবে এবার বসবাস করিবেন, সাক্ষাৎভাবে আসিবেন সেখানকার সিদ্ধ মহাপুরুষদের সান্নিধ্যে। ধর্ম ও দর্শনের তত্ত্ব আয়ত্ত করার সঙ্গে সঙ্গে শুরু করিবেন অধ্যাত্ম জীবনের নিগূঢ় সাধনা।

নিক্সন অচিরে উপস্থিত হন তাঁহার ধ্যানের ভারতে, খুঁজিয়া পান তাঁহার নিজস্ব সাধনার পথ। তাঁহার সেই পথ—বৃন্দাবনের গুরুপরম্পরা-ধৃত এক বিশিষ্ট বৈষ্ণবীয় পথ। সাধনজীবনে সন্ন্যাস নিয়া নিক্সন পরিগ্রহ করেন নূতন নাম—'কৃষ্ণপ্রেম।' উত্তরকালে এ নাম তাঁহার সার্থক হইয়া উঠে, কৃষ্ণপ্রেমের সিদ্ধ সাধকরূপে ঘটে তাঁহার মহারূপান্তর। ভারত এবং ইয়োরোপ আমেরিকার বহু মুমুক্ষু ও সাধনকামী নরনারীর পরমাশ্রয়রূপে তিনি খ্যাত হইয়া উঠেন।

রোনাল্ড নিক্সন, উত্তরকালের বহুজনবন্দিত বৈষ্ণব সাধক কৃষ্ণপ্রেম, ভূমিষ্ঠ হন ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই মে। ইংল্যাণ্ডের একটি শিক্ষিত, ধর্মপরায়ণ মধ্যবিত্ত পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন।

বালককাল হইতেই নিক্সনের মধ্যে দেখা যায় অসাধারণ মেধা ও প্রতিভার স্ফুরণ। যৌবনে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি অধ্যয়ন করেন এবং ইংরেজী সাহিত্যের স্নাতক পরীক্ষায় উচ্চতর সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হন।

কলেজে পড়াশুনা করার সময় হইতেই ধর্ম ও দর্শন সম্পর্কে তাঁহার কৌতূহল জাগিয়া উঠে এবং এ সময়ে খ্রীষ্টীয় ধর্ম, বৌদ্ধবাদ এবং থিয়োসফির কিছু কিছু গ্রন্থ তিনি পড়িয়া ফেলেন। আত্মিক

জীবনের যে সংস্কার এতদিন সুপ্ত ছিল, এবার তাহা ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করিতে থাকে। দুর্জ্ঞেয় লোকের রহস্য জানার জন্য নিক্‌সন চঞ্চল হইয়া উঠেন।

ঠিক এই সময়ে জার্মানীর আক্রমণের ফলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের দামামা বাজিয়া উঠে; বৃটেনের অন্যান্য দেশপ্রেমিক যুবকদের মতো রোনাল্ড নিক্‌সনও যোগদান করেন প্রতিরক্ষা বাহিনীতে। রয়েল এয়ার ফোর্সে তিনি কমিশন প্রাপ্ত হন এবং অল্পকাল মধ্যে বিমান চালনায় দক্ষ হইয়া গ্রহণ করেন বোমারু বিমান চালনার গুরুদায়িত্ব। এই সময়ে একদিনকার আকাশ অভিযানের সময় যে চাঞ্চল্যকর অলৌকিক অভিজ্ঞতা নিক্‌সনের ঘটে, তাহাই উন্মোচিত করে তাঁহার জীবনের নূতনতর অধ্যায়। ভারতীয় অধ্যাত্ম সাধনার রহস্য জানিবার জন্য তিনি ব্যগ্র হইয়া উঠেন।

ইংল্যাণ্ডে থাকিতে ভারতে বসবাসের যে সংকল্প রোনাল্ড নিক্‌সন করিয়াছিলেন, শীঘ্রই তাহা সিদ্ধ হইয়া উঠে। লখনৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপচার্য ডঃ জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী তখন লণ্ডনে উপস্থিত। এ সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগের জন্য তিনি একটি সুযোগ্য অধ্যাপকের খোঁজ করিতেছিলেন। এক মধ্যবর্তী বন্ধুর সাহায্যে নিক্‌সন ডঃ চক্রবর্তীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, প্রকাশ করিলেন মনের গোপন বাসনা। তিনি প্রতিভাধর তরুণ ইংরেজ অধ্যাপক তদুপরি ভারতের প্রতি, ভারতের ধর্ম সংস্কৃতির প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা অপরিসীম। উপাচার্য শ্রীচক্রবর্তী সানন্দে তাহাকে নিযুক্ত করিলেন ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপকের পদে।

অল্পদিনের মধ্যেই লখনৌতে পৌঁছিয়া রোনাল্ড নিক্‌সন যোগ দিলেন তাহার নূতন কাজে। নূতন অধ্যাপকের জন্য তাড়াতাড়ি কোনো ভালো বাসস্থানের ব্যবস্থা করা যাইতেছে না, উপাচার্য কহিলেন, "তুমি অবিবাহিত, একটিমাত্র লোক। তুমি আমার বাড়িতেই তো থাকতে পারো। যতদিন স্টাফ কোয়ার্টার তৈরি না

হয়, আমার এখানেই থাকো। অবশ্যি যদি তোমার নিজের দিক দিয়ে কোনো আপত্তি না থাকে।"

নিক্‌সন উত্তরে বলিলেন, "আপত্তি তো আমার নেই-ই বরং উৎসাহ আছে। আপনার বাড়িতে বাস করলে ভারতীয় জীবনযাত্রা সম্বন্ধে আমি জ্ঞান লাভ করতে পারবো এবং এখানকার রীতিনীতিও আয়ত্ত করা যাবে সহজে। এতো আমার সৌভাগ্যের কথা।"

নিক্‌সনের বাসস্থান সম্পর্কে সেই ব্যবস্থাই করা হইল এবং ইহার মধ্য দিয়া অলক্ষ্যে তাহার জীবনধারায় ঘটিল এক দূরপ্রসারী পরিবর্তনের সূত্রপাত।

উপাচার্য ডঃ জ্ঞানেন্দ্র চক্রবর্তীর স্ত্রী মণিকাদেবী রোনাল্ড নিক্‌সনকে গ্রহণ করিলেন পরম স্নেহে এবং পুত্রজ্ঞানে। মণিকা-দেবীর মধ্যে নিক্‌সন কি দেখিলেন তাহা তিনিই জানেন, কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যেই দেখা গেল তিনি তাহাকে 'মা' বলিয়া ডাকিতে শুরু করিয়াছেন। আনন্দরূপিণী, সদা হাস্যময়ী, এই বর্ষীয়সী মহিলা ছিলেন সহজ নেতৃত্বের অধিকারিণী। এই অধিকার নিক্‌সনও সেদিন নিজের অলক্ষ্যে মানিয়া নিলেন।

মণিকাদেবী কহিলেন, "না বাবা, তোমার ঐ নিক্‌সন নামে আমি আর তোমায় ডাকছিনে। ভারতে এসেছো, ভারতের সব কিছুকে ভালোবেসে, তাই একটা ভারতীয় নামই তোমায় দেওয়া যাক্, কি বল?

"বেশ তো মা, আপনার খুশী মতো, নূতন নামই তা হলে একটা দিন।" আনন্দে গদ্‌গদ হইয়া উত্তর দেন নিক্‌সন।

"হ্যাঁ, বাবা, আজ থেকে তোমায় আমি গোপাল বলে ডাকবো। 'গোপাল' এদেশের মায়েদের অন্তরের ধন। এমনটি পৃথিবীর আর কোথাও নেই।'

"মা, আমি আপনার গোপাল হয়েই থাকবো।" সোৎসাহে সম্মতি জ্ঞাপন করেন নিক্‌সন।

মণিকাদেবীর দুইটি কন্যা, কোনো পুত্রসন্তান নাই। এখন হইতে

এই তরুণ সুদর্শন ইংরেজ তনয়ের উপরই বর্ষিত হইতে থাকে তাঁহার মাতৃহৃদয়ের উদার অফুরন্ত অপত্যস্নেহ।

অধ্যাপনার কাজ শুরু করিয়া দেন রোনাল্ড নিক্‌সন, এই সঙ্গে তৎপর হইয়া উঠেন ভারতের ধর্ম ও সংস্কৃতির জ্ঞান আহরণে। বুদ্ধের জীবন ও বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে পূর্ব হইতেই তাঁহার একটা আকর্ষণ ছিল, এবার বৌদ্ধ সাহিত্যের অধ্যয়ন ও ধ্যান্ ধারণায় নিবিষ্ট হইলেন। কিছুদিনের মধ্যে উপলব্ধি করিলেন, মূল বৌদ্ধশাস্ত্র পালি ভাষায় লেখা, ইহার মর্মে প্রবেশ করিতে হইলে পালি শিক্ষা করা দরকার। বহু পরিশ্রম করিয়া, অল্প সময়ের মধ্যে ঐ ভাষা তিনি আয়ত্ত করিয়া ফেলেন। তারপর একে একে শেষ করেন বৌদ্ধবাদের প্রধান গ্রন্থগুলি। কিন্তু এই তত্ত্ব ও সাধনায় নিক্‌সন তৃপ্ত হইতে পারেন কই? সমগ্র জীবনের মূলে তাঁহার প্রচণ্ড নাড়া পড়িয়া গিয়াছে, আধ্যাত্মিক চেতনা জাগিয়া উঠিয়াছে প্রবলভাবে। নিক্‌সন এবার ভারতের সনাতন ধর্ম দর্শন ও সাধনার অনুধাবন করিতে চান, প্রবেশ করিতে চাহেন মর্মমূলে।

এখন হইতে বেদ উপনিষদ, গীতা অধ্যয়নে তিনি নিবিষ্ট হইয়া পড়েন। একাগ্রতা ও নিষ্ঠা তাঁহার জন্মগত বৈশিষ্ট্য, তাই সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপন্ন হইয়া মূল শাস্ত্রগ্রন্থগুলির তত্ত্ব তিনি উদ্‌ঘাটন করিতে থাকেন।

রোনাল্ড নিক্‌সন তখন শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃতী-অধ্যাপকরূপেই সুপরিচিত নন, লখনৌর সমাজজীবন ও অভিজাত-চক্রের তিনি তখন এক বড় আকর্ষণ। সুগৌরকান্তি, দীর্ঘ সুঠাম দেহ, আয়ত নীল নয়ন দুটি অসামান্য বুদ্ধির দীপ্তিতে সদাই ঝক্‌ঝক্ করিতেছে। সাহিত্য, সংস্কৃতি, দর্শন, রাজনীতি যে কোনো বিতর্কে ফুটিয়া উঠে তাঁহার একটা নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী। তীক্ষ্ণোজ্জ্বল বুদ্ধি মুহূর্তে যে কোনো সমস্যার মূলদেশে গিয়া প্রবেশ করে।

শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা প্রতিভাধর তরুণ অধ্যাপক নিক্‌সনকে ভালোবাসেন, সমীহ করেন। ছাত্র ছাত্রীরা তাঁহার ব্যক্তিত্বে ও

পাণ্ডিত্যের ঔজ্জ্বল্যে মুগ্ধ। আর অভিজাত পরিবারের কন্যার মাতারা অনেকেই তখন লুব্ধ নেত্রে তাকাইয়া আছেন এই প্রিয়দর্শন তরুণ অধ্যাপকের দিকে।

বহিরঙ্গ জীবনে, সামাজিক উৎসব, নিমন্ত্রণ ও চা-চক্রে নিক্সনকে সদাই দেখা যায় হাস্যময় এবং প্রাণচঞ্চল। কিন্তু অন্তরের গোপন মর্মকোষে একটু নাড়া দিলেই বাহির হইয়া আসে তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ। একটু লক্ষ্য করিলেই বুঝা যায়, জীবনের গভীরতর স্তরে ডুবুরীর মতো কোন পরম ধন যেন তিনি হাতড়াইয়া ফিরিতেছেন, যা কিছু শাশ্বত, যা কিছু অমৃতময় তাহার জন্য সমগ্র জীবনচেতনা তাঁহার হইয়া রহিয়াছে কেন্দ্রীভূত। ভারতীয় সাধনা ও আত্মিক জীবনের সংস্কারের প্রতি একটা সহজ মমত্ব ও ঐক্যবোধ ধীরে ধীরে তাঁহার মধ্যে জাগিয়া উঠিতেছে।

উপাচার্য জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ছিলেন লখনৌর শিক্ষিত ও অভিজাত সমাজে শীর্ষ স্থানীয়, আর তাঁহার পত্নী, বর্ষীয়সী রূপসী মহিলা মণিকাদেবী ছিলেন সেই সমাজের মধ্যমণি। যে কোনো পার্টি, অ্যাট্‌-হোম এবং উৎসবের প্রাণ ছিলেন মণিকাদেবী। ভারতীয় খানাদানা রীতিনীতি যেমন তিনি জানিতেন, তেমনি রপ্ত ছিলেন ইয়োরোপ ও আমেরিকার আধুনিক আদব কায়দায়। স্বামীর সঙ্গে বিশ্বের বহু স্থানে তিনি ঘোরাফেরা করিয়াছেন, শিক্ষা-দীক্ষা ও সংস্কৃতির অনেক কিছু করিয়াছেন আহরণ। তাই পার্টি বা মজলিসে মণিকাদেবীর জুড়ি তখনকার লখনৌ শহরে আর ছিল না। যে কোনো মিলন সভা বা উৎসবে হাসি আনন্দের ফোয়ারা তিনি খুলিয়া দিতেন, গল্পগুজবে মাতাইয়া রাখিতেন সবাইকে।

এই সব উৎসবে রোনাল্ড নিক্সনও যোগ দিতেন সোৎসাহে, সবার সঙ্গে উপভোগ করিতেন সামাজিক জীবনের আনন্দ রঙ্গ। কিন্তু আসলে তাঁহার সবটা মন এবং সবটা দৃষ্টি পড়িয়া থাকিত হাস্যলাস্যময়ী মণিকাদেবীর উপর। নিক্সন লক্ষ্য করিয়াছেন,

মণিকাদেবীর বহিরঙ্গ জীবনের এই হৈ-হুল্লোড় ও হাসি উচ্ছ্বাসটাই তাঁহার বড় পরিচয় নয়, এই উচ্ছ্বাসের ভিতরকার স্তরে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে আর একটা রহস্যঘন জীবন, সে জীবন—আত্মিক চেতনায় প্রোজ্জ্বল, প্রেমভক্তির মাধুর্যে রসায়িত।

বেশ কিছুদিন যাবৎ নিক্‌সনের অন্তর্দৃষ্টিতে এ বৈশিষ্ট্যটি ধরা পড়িয়াছে। আধুনিক ধরনের ফ্যাসানে সাজসজ্জা করেন মণিকাদেবী, মুখে সুগন্ধ পাউডার, ঠোঁটে লিপস্টিক মাখানো। সিগারেটের ধোঁয়া ছড়াইয়া এ টেবিল হইতে ও টেবিলে ঘুরিতেছেন, আর হাসি গল্পে মাতাইয়া তুলিতেছেন বন্ধু বান্ধবী ও অভ্যাগতদের। কিন্তু এই রসরঙ্গের মধ্যে হঠাৎ এক সময়ে ঘটে ছন্দপতন। অদ্ভুত ভাবান্তর দেখা যায় তাঁহার চোখে মুখে, দ্রুতপদে হলঘর হইতে বাহির হইয়া আসেন, সরাসরি আপন কক্ষের এক কোণে গিয়া নিভৃতে করেন আত্মগোপন।

কি এই ভাবান্তরের রহস্য? কেনই বা হঠাৎ এমনভাবে বন্ধু বান্ধবীদের হইতে নিজেকে তিনি বিচ্ছিন্ন করিয়া নেন? নানা চিন্তা ও দুশ্চিন্তা খেলিয়া যায় নিক্‌সনের মনে। একি মণিকাদেবীর কোনো শারীরিক অসুস্থতা? স্নায়বিক দৌর্বল্যের কোনো উপসর্গ? যদি এসব কিছু না ঘটিয়া থাকে তবে হয়তো ইহার পিছনে রহিয়াছে কোনো অলৌকিক রহস্য। দুর্জ্ঞেয় অপার্থিব লোকের হাতছানি হঠাৎ কখন আসিয়া পড়ে, আর অমনি তিনি সরিয়া পড়েন লোকলোচনের সম্মুখ হইতে, একান্তভাবে নিজেকে গুটাইয়া নেন নিজের গণ্ডীর মধ্যে।

নিক্‌সন মনে মনে স্থির করিলেন, মায়ের এই আকস্মিক অন্তর্ধানের রহস্য তাহাকে ভেদ করিতে হইবে, নতুবা তাঁহার নিজের মনের অশান্তি দূর হইবে না।

চক্রবর্তী ভবনে সেদিন এক বড় মজলিস বসিয়াছে। হাসি আনন্দ গানে গল্পে সবাই মশগুল, নিক্‌সন লক্ষ্য করিলেন, মণিকাদেবী হঠাৎ কেমন যেন উন্মনা হইয়া পড়িলেন। তারপর নীরবে সবার পাশ কাটাইয়া তাড়াতাড়ি চলিয়া গেলেন নিজের কক্ষে।

মজলিস তখনো জমজমাট। কিছুক্ষণ বাদে নিক্‌সনও বিদায় নিলেন, সেখান হইতে ছুটিয়া আসিলেন তাঁহার মায়ের কাছে। দুয়ারে দাঁড়াইয়া দেখিলেন এক অদ্ভুত দৃশ্য। সুসজ্জিত কক্ষের এক কোণে মা ঋজুভঙ্গীতে ধ্যানস্থ হইয়া বসিয়া আছেন, নয়ন দুটি নিমীলিত, দেহ নিস্পন্দ, বাহ্যচৈতন্য নাই।

নির্নিমেষে অবাক্ বিস্ময়ে এই ধ্যানাবিষ্টা মাতৃমূর্তির দিকে চাহিয়া আছেন রোনাল্ড নিক্‌সন। ভাবিতেছেন, এ কোন্ দৈবীলীলা? লখনৌর অভিজাত মহলের মক্ষীরানী মণিকাদেবীর একি অভাবনীয় নূতন রূপ। সব চাইতে আশ্চর্যের কথা, যে মাকে নিক্‌সন এমন প্রগাঢ়ভাবে শ্রদ্ধা করেন, ভালোবাসেন, তাহার এই মহিমময়ী রূপটি আজ অবধি তাঁহার কাছে ধরা পড়ে নাই! আত্মিক জীবনের অন্তঃসঞ্চারী ফল্গুধারাটি গোপনেই এতদিন বাহিয়া চলিয়াছে, বাহিরের লোক ঘুণাক্ষরেও তাহা জানিতে পারে নাই।

ধ্যানাবস্থা হইতে ব্যুত্থিত হইলেন মণিকাদেবী, বাহ্যচেতনা এবার ধীরে ধীরে ফিরিয়া আসিল, আর কপোল বাহিয়া ঝরিতে লাগিল পুলকাশ্রুর ধারা। অতীন্দ্রিয়লোকের মধুময় দৃশ্য মণিকাদেবী এতক্ষণ সম্ভোগ করিয়াছেন, তাহারই আনন্দ শিহরণে কম্পিত হইতেছে সর্বদেহ, নয়নে বহিতেছে দরবিগলিত ধারা।

খানিক বাদেই সুস্থ ও স্বাভাবিক হইয়া উঠেন মণিকাদে[বী।] তাড়াতাড়ি উপস্থিত হন ড্রেসিং টেবিলের সম্মুখে, অশ্রুসিক্ত কপো[ল] মুছিয়া ফেলেন, নূতন করিয়া রুজ্ পাউডার লাগাইয়া আসিয়া দাঁড়[ান] ঘরের দুয়ারে।

নিক্‌সন তখনো সেখানে নীরবে নিস্পন্দভাবে দণ্ডায়মান। বাহিরে আসিতেই ঝটিতি অগ্রসর হইয়া নিবেদন করেন সশ্রদ্ধ প্রণ[াম।] গদ্‌গদ স্বরে বলেন, "মা, তোমার অনুমতি না নিয়েই তোমার এ[ই] স্বর্গীয় দৃশ্য এতক্ষণ দেখছিলুম। আর ভাবছিলুম, মা হয়ে ছেলেকে কি ফাঁকিই তুমি এতদিন দিয়ে এসেছো। মায়ের ধনে ছেলেরই যে অধিকার। তাই না মা?"

সস্নেহে নিক্সনের চিবুকটি স্পর্শ করিয়া বলেন মণিকাদেবী, "গোপাল, তুমি তাহলে এসব দেখে ফেলেছো ! ভালোই হল। সব কথা তোমায় খুলে বলবো, বাবা। কিন্তু আজ নয়, কাল বলবো সব খুলে। পার্টি চলছে আজ বাড়িতে। চলো তাড়াতাড়ি ওদের কাছে যাওয়া যাক্। সত্যি, বড্ডো অভদ্রতা হয়েছে আমার দিক থেকে। আমার বাড়িতে রিসেপশান, আর আমি এড়িয়ে রয়েছি ওদের, ছি-ছি।"

আবার অভ্যাগতদের মধ্যে আসিয়া হাজির হন মণিকাদেবী। হাস্যে লাস্যে ও সরস বাচন ভঙ্গীতে মাতাইয়া তোলেন বন্ধুবান্ধবীদের। তারপর অতিথিরা তৃপ্তমনে একের পর এক তাঁহার ভবন হইতে বিদায় নেন।

পরের দিন প্রাতরাশের পর নিক্সনকে একান্তে ডাকিয়া নেন মণিকাদেবী। বলেন, "গোপাল, এবার তোমায় সব কথা খুলে বলছি। তুমি ঠিকই ধরেছো, বেশ কিছুদিন যাবৎ বড়ো বদলে গেছি আমি। পুরোনো জীবনধারায় ছেদ পড়ে গিয়েছে।"

"তাই তো মা, এত কাছে থেকেও আমি তোমার খোঁজ পাচ্ছিনে"—মন্তব্য করেন নিক্সন।

"গোপাল, আমাদের এই বহিরঙ্গ জীবনটা আসলে কিছু নয়। দেহ আর মনের আড়ালে রয়েছে—আত্মা। সেই আত্মিক স্তরে যখন তরঙ্গ ওঠে মানুষ তখন বদলে যায় ; পরম আত্মা যিনি, ভগবান্ যিনি, তাঁর চরণে গিয়ে সে আছড়ে পড়ে। আমার জীবনে তাই ঘটতে শুরু করেছে।"

"মা, এটা কি ঘটেছে তোমার সঙ্গে আমার সাক্ষাতের পরে, না আগে ?" প্রশ্ন করেন নিক্সন।

"আগে থেকেই গোপাল। জানতো, আমার স্বামী শুধু এদেশের একজন শ্রেষ্ঠ শিক্ষাবিদ্ই নন, থিয়োসফি আন্দোলনের অন্যতম নেতা এবং একজন বড় দার্শনিক তিনি। তাঁর সঙ্গে থিয়োসফি নিয়ে

আমিও মেতে ছিলাম বহুদিন। এ নিয়ে ইয়োরোপে আমেরিকায় কম ঘোরাঘুরি করি নি। কিন্তু থিয়োসফির তত্ত্ব আর অলৌকিক কাহিনীতে আত্মার ক্ষুধা মিটল না, জীবনে এল না পরম শান্তি। স্বামী তাই ঝুঁকলেন বৈষ্ণব দর্শন ও ধ্যান ধারণার দিকে। আর আমি? ঝুঁকে পড়তে গিয়ে, আমি গেলাম একেবারে ডুবে। জন্মগত সংস্কার ছিল ভক্তিপ্রেমের, তাই কে যেন আমায় হিড়হিড় ক'রে টেনে নিয়ে গেল প্রেমের ঠাকুর শ্রীকৃষ্ণের চরণতলে। দীক্ষা নিলাম বৃন্দাবনে গিয়ে, রাধারমণজীউ মন্দিরের বালকৃষ্ণ দাস গোস্বামীর কাছ থেকে।"

"তা হলে, মা, তুমি এতদিন গোপনেই চালিয়ে যাচ্ছো তোমার সাধনভজন?"

"হ্যাঁ গোপাল, আমার এ ভজনময় জীবন বাইরে আমি প্রকাশ করিনে। কিন্তু বাবা, আমার ঠাকুর যে বড়ো দুষ্টু, বড়ো লীলা-চপল। স্থান নেই অস্থান নেই, সময় নেই অসময় নেই, হঠাৎ ডেকে নেন তাঁর কাছে। কৃষ্ণের চরণ থেকে নেমে আসে আলোর ধারা, আমার সবকিছু ওলোটপালোট হয়ে যায়, বাহ্যচৈতন্য হারিয়ে ফেলি। আমার দিক থেকে তেমন কিছুই করিনে আমি, আমার কৃষ্ণ নিজেই আমায় আকর্ষণ ক'রে নিচ্ছেন, বার বার অবগাহন করাচ্ছেন তাঁর অমৃত সায়রে।"

একি অদ্ভুত লীলাকাহিনী নিক্‌সন শুনিতেছেন তাঁহার মায়ের মুখে? আনন্দে বিস্ময়ে তিনি অভিভূত।

মা'কে প্রণাম করেন ভক্তিভরে, করজোড়ে বলেন, "মা, যে পথে তুমি অগ্রসর হয়েছো, সেই কৃষ্ণপথে আমায় নিয়ে যাও। মায়ের সম্পদেই তো ছেলের অধিকার।"

"গোপাল, তুমি ঠিকই বলেছো, কিন্তু এজন্য তো প্রস্তুতি চাই, বাবা। আমি এতদিন লক্ষ্য করেছি, বৌদ্ধ ধর্মসাহিত্য পড়ার ঝোঁক তোমার চলে গিয়েছে। এ দুটো বৎসর উপনিষদ আর গীতা তুমি গভীরভাবে পড়েছো। ভালোই হয়েছে, হিন্দুধর্মের মূল তত্ত্বটি

তোমার জানা হয়েছে। এবার তুমি প্রেম ভক্তি-ধর্মের শাস্ত্র পাঠ করো, স্মৃতি পুরাণের কাহিনী জেনে নাও। সেই সঙ্গে শুরু করো রাধা কৃষ্ণের ধ্যান জপ ও ভজন। কৃষ্ণের কৃপা তোমার ওপর হবে, বাবা।"

রোনাল্ড নিক্সনের জীবনে এবার আসে এক নূতনতর ভাবের জোয়ার, এ জোয়ারে ভাসিয়া যায় তাঁহার বিগত জীবনের সকল কিছু সংস্কার ও ধ্যান ধারণা। কৃষ্ণতত্ত্ব ও কৃষ্ণ কাহিনী অনুধাবন করিতে থাকেন গভীরভাবে, কৃষ্ণপ্রেমের আলোকে আলোকিত হইয়া উঠে তাঁহার সমগ্র জীবন।

এ সময়ে লখনৌর জীবনে হঠাৎ ছেদ পড়িয়া যায়। মণিকাদেবীর স্বামী জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদ গ্রহণ করেন। সপরিবারে তিনি চলিয়া আসেন বারাণসীতে। রোনাল্ড নিক্সন শুধু চক্রবর্তী পরিবারভুক্তই নন, জ্ঞানেন্দ্রনাথ ও মণিকাদেবীর তিনি পুত্রস্বরূপ। তাই নিক্সনও এই সময়ে লখনৌর কাজ ছাড়িয়া দিয়া গ্রহণ করেন বারাণসী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী অধ্যাপকের পদ।

লখনৌর বন্ধু ও শুভানুধ্যায়ীরা উদ্বিগ্ন হইয়া উঠেন নিক্সনের জন্য। তাঁহারা চাপিয়া ধরেন, বলেন, কি অদ্ভূত খেয়ালীপনা তোমার বলতো? এখানকার ইউনিভার্সিটিতে যে সম্মান, যে টাকা পাচ্ছো বেনারসে গেলে তার অর্ধেকও তো তুমি পাবে না। এখনে পাচ্ছো আটশো টাকা, ওখানে তিনশোর বেশী তোমায় দেবে না। কি ক'রে চলবে তোমার?"

নিক্সন হাসিয়া উত্তর দেন, "একটা লোকের তিনশো টাকার বেশী কেনই বা দরকার হবে, বলতো? কোনো বিলাসিতা আমার নেই, সামান্য নিরামিষ আহার করি, কম্বলে শুয়ে থাকি। ঐ টাকাটাই তো আমার পক্ষে বেশী।"

"লখনৌতে থাকলে অদূর ভবিষ্যতে এখানকার ভাইস-চ্যান্সেলার হতে পারবে তুমি, সে কথাটা কি একবার ভেবে দেখেছো?"

সকৌতুকে বন্ধুদের কথা শুনিতেছেন নিক্‌সনে, আর পাইপ টানিতেছেন। একরাশ ধোঁয়া ছাড়িয়া সহাস্যে কহিলেন, "তোমরা কি ভেবেছো, নিজের দেশ ছেড়ে আত্মীয় স্বজনদের মায়া কাটিয়ে সাত সমুদ্রের এপারে এদেশে আমি এসেছি শুধু একটা মোটা মাইনের চাকরি নিতে, আর ভাইস-চ্যান্সেলার হতে? যে পরম পথের সন্ধানে ঘর ছেড়ে বেরিয়েছিলাম একদিন, সে পথ আমি পেয়ে গিয়েছি। আর তো আমার ফেরবার কথা ওঠে না।" একথা বলিয়া সকল বিতর্কের অবসান ঘটাইয়া দিলেন রোনাল্ড নিক্‌সন।

বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্বদিকে, লংকা পল্লীর অনতিদূরে গঙ্গার তীরে, রাধাবাগ নামে এক বিরাট ভবন নির্মাণ করিলেন, মণিকাদেবী ও উপাচার্য জ্ঞানেন্দ্রনাথ। এখন হইতে এই ভবনটিকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠে একটা চমৎকার পরিবেশ। এই রাধাবাগে আরো কয়েকটি পাশ্চাত্য দেশের ভক্ত মণিকাদেবীর আশ্রয় গ্রহণ করেন, প্রেমভক্তি সাধনার পথে তাঁহারা অগ্রসর হন।

নিক্‌সনের জীবনে এবার আসে সাধনভজনের তীব্র আবেগ। আহার বিহারে শুরু করেন তীব্র কঠোরতা, রাধাকৃষ্ণের ভজন ও লীলা অনুধ্যানে দিন রাতের অধিকাংশ সময় কোথা দিয়া কাটিয়া যায়, তাহার হুঁশ থাকে না। কখনো গঙ্গাতীরের মৃত্তিকা গোফায় কখনো বা রাধাবাগের ছাদের নিভৃত কোণে ধ্যান ভজনে তিনি নিমগ্ন থাকেন। এ সময়ে কাশীর যেসব জিজ্ঞাসু ভক্তেরা রাধাবাগে যাইতেন, বিস্মিত হইতেন বিদেশী ভক্ত রোনাল্ড নিক্‌সনের সাধনার কঠোরতা ও নিষ্ঠা দর্শনে।

নিক্‌সনের সাধনভজন দিন দিন যত গভীর হইতেছে, মা মণিকাদেবীর সহিতও তেমনি গড়িয়া উঠিতেছে নিবিড় অন্তরঙ্গতা ও একাত্মতা। বৈষ্ণবীয় শাস্ত্রতত্ত্ব ও সাধনভজনের যে কোনো কূট প্রশ্ন বা রহস্যের সম্মুখীন হন, নিক্‌সন অমনি ছুটিয়া যান তাঁহার মায়ের কাছে। আর মায়ের এক একটি সংক্ষিপ্ত উক্তির মাধ্যমে মীমাংসা

হইয়া যায় সকল প্রশ্নের, সর্ব সংশয় তাঁহার ছিন্ন হয়। মায়ের এই অদ্ভুত অন্তর্দৃষ্টি দেখিয়া দিনের পর দিন তিনি বিস্মিত হন, তাঁহার তত্ত্বোজ্জ্বলা বুদ্ধির আলোকে সাধনপথে চলিতে অভ্যস্ত হইয়া পড়েন নিক্সন।

সেদিন মা কহিলেন, "গোপাল, এবার তুমি ভাগবত পড়ো, আর প্রতিদিন আমার সঙ্গে বসেই তা পড়ো।"

নিক্সনের আনন্দের আর অবধি নাই। মায়ের কাছে ভাগবত অধ্যয়ন করিবেন, কৃষ্ণলীলার গূঢ় রহস্য জানিয়া নিবেন তাঁহার সাধনজাত প্রজ্ঞার আলোকে। মণিকাদেবীর নির্দেশে একখণ্ড হিন্দি ভাষায় লিখিত ভাগবত কিনিয়া আনা হইল, শুরু হইল নিত্যকার পাঠ ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ।

উত্তরকালে কৃষ্ণপ্রেম বলিতেন, "মায়ের কাছে বসে ভাগবত পড়েছি, আর শুনেছি তাঁর মুখ থেকে নিগূঢ় লীলারসের ব্যাখ্যান। তার ওপরেই তো গড়ে উঠেছে আমার সমস্ত কিছু সাধনভজন।"

১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিক। রাসপূর্ণিমার আর বেশী দেরি নাই। চক্রবর্তীদের রাধাবাগ ভবনে এ সময়ে আনন্দের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। রাস উৎসব এবার সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হইবে, তাহার প্রস্তুতির জন্য সবাই ব্যস্ত।

সেদিন নিত্যকার ভজন সারিয়া আসিয়া নিক্সন মাকে প্রণাম করিলেন, যুক্তকরে নিবেদন করিলেন তাঁহার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা। কহিলেন, "মা, আমি সংকল্প করেছি, বৈষ্ণব-মন্ত্রে সন্ন্যাস দীক্ষা নেবো।"

"বেশ তো গোপাল, এ তো খুব ভালো সংকল্প।" প্রসন্ন কণ্ঠে বলেন মা।

"হ্যাঁ, আরো স্থির করেছি, তোমার কাছ থেকেই আমি এ সন্ন্যাস নেবো।"

"তা কি ক'রে হয়, বাবা? আমি মন্ত্র দিতে পারি, কিন্তু সন্ন্যাস তো আমায় দিয়ে হবে না। আমি গৃহী, সন্ন্যাসী নই! শুধু সন্ন্যাসীই পারেন সন্ন্যাস দীক্ষা দিতে।"

"এত সব আমি জানিনে মা, জানতেও চাইনে। কিন্তু এটা স্থির, তোমার কাছ থেকে ছাড়া আর কারুর কাছে আমি সন্ন্যাস নেবো না।"

মা বুঝিলেন, গোপাল তাঁহার সংকল্পে অটল। দৃঢ়, ঋজু ও একনিষ্ঠ স্বভাব তাঁহার মনে প্রাণে যে সংকল্প একবার স্থির করিয়াছে, তাহা হইতে তাঁহাকে বিচ্যুত করা কঠিন।

বেশ কিছুক্ষণ নীরবে নিমীলিত নয়নে মা বসিয়া রহিলেন, আননখানি এক দিব্য আভায় উদ্‌ভাসিত হইয়া উঠিল। অতঃপর কহিলেন, "গোপাল, তাই হবে। তোমার সংকল্প যাতে সিদ্ধ হয়, পরমপ্রাপ্তি যাতে সহজে ঘটে, তা-ই করবো। রাধারানীর অনুমতি এই মাত্র পেলাম। তবে সর্বাগ্রে আমায় যেতে হবে বৃন্দাবনে সেখানে প্রভু বালকৃষ্ণ দাস গোস্বামীর কাছ থেকে আমি সন্ন্যাস নেবো। তারপর তোমায় সন্ন্যাস দেবার অধিকার আমি পাবো।"

সন্ন্যাস গ্রহণের পর মণিকাদেবী নূতন নাম গ্রহণ করিলেন— যশোদা মাঈ। আর নিক্‌সনকে সন্ন্যাস দান করিয়া তিনি তাঁহার নামকরণ করিলেন—কৃষ্ণপ্রেম।

ইতিমধ্যে মনীষী শিক্ষাবিদ্ জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। তাঁহার তিরোধানের পর হইতে সাধিকা যশোদা মাঈর জীবনে শুরু হয় এক নূতনতর অধ্যায়। রাধাবাগের প্রাসাদোপম ভবন ত্যাগ করিয়া তিনি আশ্রয় নেন হিমালয়ের কোলে। আলমোড়ার চৌদ্দ মাইল দূরে মির্তোলায়, যাগেশ্বর শিবস্থানের কাছাকাছি অঞ্চলে ক্রয় করা হয় একটি নাতিবৃহৎ পাহাড়। এই পাহাড়ের উপর স্থাপিত হয় রাধাকৃষ্ণের একটি ক্ষুদ্র মন্দির এবং মন্দির সন্নিহিত আশ্রম-ভূমির নাম দেওয়া হয় উত্তর বৃন্দাবন।

আশ্রম এবং মন্দির নির্মাণের আগে কিছুদিন যশোদা মাঈ আলমোড়ায় বাস করিতে থাকেন। ধর্মপুত্র এবং শিষ্য কৃষ্ণপ্রেম সর্বদা ছায়ার মতো রহিয়াছেন তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে। একদিন যশোদা মাঈ কহিলেন, "গোপাল, ভিক্ষান্ন বড় শুদ্ধ অন্ন। তাছাড়া, সন্ন্যাস নেবার

পর ভিক্ষান্ন দিয়ে দেহ ধারণ করতে হয়। আমি চাই এখানে কিছুদিন তুমি ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন ক'রে থাকো।"

মায়ের আদেশ শুনিয়া কৃষ্ণপ্রেম মহা আনন্দিত। ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে নিয়া ভিক্ষা শুরু করিয়া দিলেন আলমোড়া শহরের গৃহস্থদের ঘরে। মুণ্ডিত মস্তক, গৈরিকধারী, সুগৌরকান্তি সন্ন্যাসীর গলায় বিলম্বিত পবিত্র তুলসীর মালা। প্রশান্ত ললাটে অঙ্কিত মধ্ব বৈষ্ণবদের দীর্ঘ ত্রিপুণ্ড্রক, মাঝখানে তার কৃষ্ণবর্ণ এক সরলরেখা। ঘননীল নয়ন দুটির দিকে পথচারীরা অবাক্ বিস্ময়ে চাহিয়া থাকে। ইংরেজ বৈষ্ণব সন্ন্যাসীর এই ভিক্ষাবৃত্তি আলমোড়ার ছোট শহরটিতে চাঞ্চল্য তুলিয়া দেয়।

অল্প দিনের মধ্যেই আলমোড়ার নরনারী যশোদা মাঈ এবং তাঁহার বিদেশী শিষ্য কৃষ্ণপ্রেমের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়ে। পাহাড়ের ঢালুতে অবস্থিত কুটিরটি পরিণত হয় ভক্ত মানুষ ও দীন দুঃখীজনের আশ্রয়স্থলরূপে।

প্রায় বৎসর খানেক বাদে মির্তোলার উত্তর বৃন্দাবন আশ্রম ও মন্দিরের নির্মাণ কার্য সম্পন্ন হয়। এবার গুরু যশোদা মাঈকে নিয়া কৃষ্ণপ্রেম স্থায়ীভাবে সেখানেই বসবাস করিতে থাকেন।

পাহাড়ের কোলে স্নিগ্ধ-মধুর শান্তিময় পরিবেশ রচিত এই পবিত্র আশ্রম। ঘন সবুজ বৃক্ষরাজির পটভূমিকা, তাহার সম্মুখে নির্মিত হইয়াছে একটি নাতিবৃহৎ মন্দির। মন্দিরের পূজা-কক্ষে শ্বেত প্রস্তরের বেদীতে বিরাজিত রাধাকৃষ্ণের নয়ন ভুলানো যুগলমূর্তি। এই যুগলমূর্তি এবং তাঁহাদের পূজা অর্চনা, আরতি ও ভোগরাগ প্রতিদিন অনুষ্ঠিত হয় পরম নিষ্ঠায়। শঙ্খ, ঘণ্টা ও ঝাঁঝর করতালের ধ্বনিতে সারা পাহাড় মুখরিত হইতে থাকে।

গোড়ার দিকে একটি পূজারী নিয়োগ করা হয় মন্দিরের পূজা ও বিগ্রহ সেবার জন্য। কিছুদিন পরে কৃষ্ণপ্রেম নিজেই পরম আগ্রহ ভরে এ কাজ নিজের স্কন্ধে তুলিয়া নেন। ঠাকুরের ভোগ রন্ধনের

ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিটি একসময়ে হঠাৎ অসুস্থ হইয়া পড়ে। এ অবস্থায় কৃষ্ণপ্রেমই গ্রহণ করেন ভোগ-প্রসাদ রান্নার সকল কিছু দায়িত্ব। কিছুদিন এমন নিষ্ঠা ও দক্ষতা নিয়া একাজ তিনি সম্পন্ন করেন যে সকলেই তাঁহার রান্না-করা প্রসাদের গুণগানে পঞ্চমুখ হইয়া উঠেন। ফলে ঠাকুরের ভোগ রন্ধনের কাজে কৃষ্ণপ্রেমই পাকাপাকিরূপে নিযুক্ত হইয়া পড়েন।

সাধিকা যশোদা মাঈ মাধ্ব বৈষ্ণব শাখার অন্তর্ভুক্ত, তদুপরি গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচারের প্রতি তাঁহার আকর্ষণ ছিল অত্যধিক। তাই ঠাকুর পূজা ও ঠাকুর সেবার প্রতিটি কাজ পবিত্রভাবে ও নিষ্ঠা সহকারে করার দিকে তাঁহার দৃষ্টি ছিল সদা জাগ্রত। মায়ের এই মনোভাব এবং এই নৈষ্ঠিকতার কথা কৃষ্ণপ্রেম জানিতেন। তাই এ বিষয়ে কোনো ত্রুটি বা স্খলন পতন প্রাণ থাকিতে তিনি ঘটিতে দিতেন না।

দোতলা মন্দিরের চারদিকে বিস্তারিত রহিয়াছে আশ্রম প্রাঙ্গণ। ঠাকুরের নিত্যপূজার জন্য ফুলের বাগান রচিত হইয়াছে সেখানে। মন্দিরের নিচতলায় আশ্রমিক সাধকদের বাসস্থান। আশেপাশে নির্মিত তিনটি কুটির। একটিতে স্থাপিত ক্ষুদ্র একটি পাঠাগার, আবার সেটিকে নবাগত অতিথিদের আশ্রয়কক্ষরূপেও ব্যবহার করা হয়। আর একটি ক্ষুদ্র কুটিরে রহিয়াছে স্থানীয় গরীব ছেলেমেয়েদের পড়ানোর ব্যবস্থা। গোড়ার দিকে, শরীর অসুস্থ না হওয়া অবধি, যশোদা মাঈ নিজেই ছেলেমেয়েদের পড়াইতে বসিতেন। স্নেহময়ী মায়ের ধর্মপুত্রদের মধ্যে ইউরোপ আমেরিকার সুশিক্ষিত ব্যক্তিরা যেমন ছিল, তেমনি ছিল মির্তোলা ও যাগেশ্বরের দীন দুঃখী ছেলে-মেয়েরা। সবারই জন্য সদা উন্মুক্ত ছিল এই মহীয়সী জননী যশোদা মাঈর হৃদয়দ্বার।

আশ্রমের একপাশে স্বল্পব্যয়ে সাধুদের জন্য একটি ধর্মশালা তৈরি করা হয়। কৈলাস ও যাগেশ্বরের যাত্রী যে সাধু সন্ন্যাসীরা এ অঞ্চলে আসিতেন, তাঁহাদের অনেকে আশ্রয় নিতেন এখানে।

উত্তরকালে পাহাড়ের আরো একটু উঁচুতে একটি ছোট ডিসপেনসারীও স্থাপন করা হয়। রোগক্লিষ্ট দরিদ্র পাহাড়ীদের প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য এটি ব্যবহৃত হইতে থাকে।

আশ্রমের সন্নিহিত ঢালু জায়গায় খাঁজে খাঁজে কিছুটা চাষের ব্যবস্থা হয়। স্থানীয় লোকদের নিয়া কৃষ্ণপ্রেম ও তাঁহার সহকর্মীরা ঐসব চাষের ক্ষেতে ফসল ফলাইতেন, আর একাজকে সবাই গণ্য করিতেন ঠাকুরের সেবারূপে।

ডাক্তার আর. ডি. আলেকজাণ্ডার ছিলেন কৃষ্ণপ্রেমের কেমব্রিজ-জীবনের বন্ধু। কৃষ্ণপ্রেমের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হইয়া তিনিও ভারতের ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতি আকৃষ্ট হন, স্বদেশ ছাড়িয়া এখানে উপস্থিত হন। কৃষ্ণপ্রেম কিন্তু এদেশে আসা মাত্রই বন্ধুকে তাঁহার পথ অনুসরণ করিতে দেন নাই। তাঁহাকে বলিয়াছেন, "অ্যালেক্, হঠাৎ ঝোঁকের বশে বা ভাবালুতার বশে, তুমি কিছু ক'রে বসো না। কিছুদিন অপেক্ষা করো, তোমার নিজের মতামতকে যাচাই করো, তারপর নাও স্থির সিদ্ধান্ত।"

আলেকজাণ্ডার একথায় রাজী হইলেন। উচ্চতর ডাক্তারী ডিগ্রি এবং চিকিৎসার দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা তাঁহার ছিল। লখনৌর এক বড় হাসপাতালে তিনি চাকুরী নিলেন, বেশ কিছুদিন সুনাম ও কৃতিত্বের সহিত কাজ চালাইয়া গেলেন। তারপর সে কাজে আর মন বসিল না, ভবিষ্যতের সকল কিছু উজ্জ্বল সম্ভাবনায় জলাঞ্জলি দিয়া শরণ নিলেন কৃষ্ণপ্রেমের কাছে. তাঁহার কাছ হইতে নিলেন বৈষ্ণবীয় মন্ত্র ও সন্ন্যাস দীক্ষা। নূতন নাম হইল—হরিদাস। মির্তোলা আশ্রমের চাষবাস আর ডিসপেনসারীর কাজ দেখাশুনার পর বাকিটা সময় হরিদাস অতিবাহিত করিতেন ঠাকুরের ধ্যান ভজনে। এই প্রতিভাধর নূতন শিষ্যের জীবনে কৃষ্ণপ্রেমের ত্যাগ তিতিক্ষা, সেবা-নিষ্ঠা ও ভক্তি-প্রেমের মূর্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

উত্তর বৃন্দাবনের অপর আশ্রমিক ছিলেন মাধব-আশীষ। তাঁহার দীক্ষা গ্রহণের কাহিনীও বড় অদ্ভুত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এই তরুণ

ইংরেজ তনয় পশ্চিম বাংলায় আসেন সামরিক বিমানক্ষেত্রের গ্রাউণ্ড ইঞ্জিনিয়ার রূপে। তারপর একবার ছুটির সময় বেড়াইতে যান হিমালয় অঞ্চলে। সেখানে কৃষ্ণপ্রেমের জীবন-কথা শুনিতে পাইয়া ব্যাকুল হইয়া উঠেন, মির্তোলায় আসিয়া উপস্থিত হন কৃষ্ণপ্রেমকে দর্শন করার জন্য। এই প্রথম দর্শন পরিণত হয় প্রগাঢ় শ্রদ্ধায় ও প্রেমে। অতঃপর আনুষ্ঠানিকভাবে শিষ্যত্ব ও সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া, গুরুসেবা ও কৃষ্ণসেবায় উৎসর্গ করেন তনুমনপ্রাণ।

যশোদা মাঈর কনিষ্ঠা কন্যা মতিরানীও বাস করিতেন মির্তোলার আশ্রমে। যশোদা মাঈএর তিরোধানের পরে কৃষ্ণপ্রেমের কাছ হইতেই তিনি গ্রহণ করেন মন্ত্রদীক্ষা ও সন্ন্যাস। মতিরানী যতদিন বাঁচিয়া ছিলেন কৃষ্ণপ্রেমকে ডাকিতেন 'ছোট-বা', অর্থাৎ ছোটবাবা বলিয়া। আনন্দ চঞ্চল মতিরানী সকল সাধুদেরই ছিলেন স্নেহভাজন, মির্তোলার আশ্রমের দিকে দিকে সদাই তিনি ঘুরিয়া বেড়াইতেন মুক্ত বিহঙ্গিনীর মতো। কৃষ্ণপ্রেমের এই শিষ্যা ও স্নেহের দুলালী বেশীদিন জীবিত থাকেন নাই, অকালে লোকান্তরে চলিয়া যান।

গুরু সেবা আর কৃষ্ণবিগ্রহের সেবা—এই দুইটি কৃত্যের উপর সিদ্ধ সাধিকা যশোদা মাঈ আরোপ করিতেন সর্বাধিক গুরুত্ব। তাই সেবা মাহাত্ম্যের এই তত্ত্বটি ছিল কৃষ্ণপ্রেমের জীবন সাধনার ভিত্তি। দীর্ঘকালের ত্যাগ তিতিক্ষা ও একৈকনিষ্ঠার মধ্য দিয়া এই সেবাকর্মে তিনি সিদ্ধ হইয়াছিলেন, গুরুকৃপায় লাভ করিয়াছিলেন পরমপ্রভু কৃষ্ণকে, জীবন হইয়াছিল কৃতকৃতার্থ।

কৃষ্ণপ্রেমের কাছে যশোদা মাঈর প্রতিটি কথা, প্রতিটি নির্দেশ ছিল বেদবাক্যের মতো। গুরুর প্রতিটি পদক্ষেপের দিকে, নিমেষ-পাতের দিকে, অনন্য নিষ্ঠা নিয়া তাকাইয়া থাকিতেন, আর নিজের সাধনজীবনকে গড়িয়া তুলিতেন, নিয়ন্ত্রিত করিতেন তাঁহারই ইচ্ছা অনুসারে। গুরুর সহিত একাত্মক হইয়া গিয়াছিলেন তিনি, ফলে সাধিকা যশোদা মাঈর জীবনে যে ইষ্টকৃপা ও সিদ্ধি স্ফুরিত

হইয়াছিল, অতিশয় সহজ ও স্বাভাবিকভাবে তাহাই আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল কৃষ্ণপ্রেমের জীবনে।

গুরুর কাছে তাঁহার এই আত্মসমর্পণ এবং গুরুর সঙ্গে তাঁহার এই একাত্মকতা সম্ভব হইয়াছিল কৃষ্ণপ্রেমের নিজস্ব বিশ্বাসের শক্তি ও একনিষ্ঠা ভক্তির ফলে। চরিত্রের এই দুইটি বৈশিষ্ট্যই কৃষ্ণপ্রেমকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল চরম ত্যাগের পথে। নিজের দেশ, আত্মপরিজন ও ধর্ম সংস্কৃতি ছাড়িয়া এই মহাবৈরাগী ঝাঁপ দিয়াছিলেন কৃষ্ণঅনুরাগের সাগরে। সারা জীবনে আর পিছন ফিরিয়া তাকান নাই।

কৃষ্ণপ্রেম সম্পর্কে শ্রীঅরবিন্দ একবার তাঁহার শিষ্য স্যাডউইক্-কে এক পত্রে লিখিয়াছিলেন: "কৃষ্ণপ্রেমের মধ্যে একটা শক্তি ছিল যার বলে তিনি বহিরঙ্গ জীবনের চিন্তাস্রোত এবং ভাবাবেগ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে রাখতে পারতেন, পৌঁছুতে পারতেন শাশ্বত জ্ঞানের উৎসস্থলে। তাঁর এ শক্তি সত্যিই বড় প্রশংসার্হ। যদি তিনি জাগতিক চিন্তাস্রোতের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলতেন তাহলে হয়তো রমঁ্যা রলঁ্যা বা এই ধরনের সংস্কৃতিবান্ মনীষীদের স্তরেই তাকে পড়ে থাকতে হতো। কিন্তু কৃষ্ণপ্রেম আসলে জীবনকে দেখেছিলেন যোগদৃষ্টির দিক থেকে, সম্যক্ দৃষ্টির দিক থেকে, এবং তাঁর জীবনসাধনায় যে প্রস্তুতি নিয়ে তিনি অগ্রসর হয়েছিলেন তা সত্যিই বিস্ময়কর। ভক্ত এবং শিষ্যের প্রকৃত আত্মসমর্পণের ভাবটি দ্রুততার সহিত এবং পরিপূর্ণরূপে তিনি গ্রহণ করেছেন। তাই তাঁর সাধনা হয়েছে এমন সাকল্যমণ্ডিত। একটি আধুনিক মানুষের পক্ষে, তা সে শিক্ষিত ইয়োরোপীয়ই হোক আর ভারতীয়ই হোক, এ সাকল্য অর্জন করা অতি কঠিন। তার কারণ, আধুনিক মানুষের মধ্যে রয়েছে অত্যধিক বিচার বিশ্লেষণ, সংশয় এবং ছন্নছাড়া ভাব, ইচ্ছে থাকলেও এ থেকে সে মুক্ত হতে পারে না। ফলে সাধন জীবনে যে আলো, যে শক্তি এগিয়ে আসছে, তা দেখে সে পিছু হটতে থাকে, তার ভেতরে সে দুর্বার বেগে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে না,

বলতে পারে না—যদি আমায় তোমার ভেতরে প্রবেশ করতে দাও, তবে এখনি আমি দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারি আমার নিজের বলতে যা আছে তার সব কিছুকে, আমার চৈতন্যকে নিয়ে যাও তোমার পরম পথ দিয়ে তোমার পরম সত্যে, তোমার ভাগবত সত্তায়। আমাদের ভেতর এ মনোভাব এবং এ প্রস্তুতি ঠিকই রয়েছে, কিন্তু সংশয় ও দৌর্বল্য করছে তার পথরোধ, একটা যবনিকা রচনা ক'রে আছে অন্তরাল। আমি আমার নিজের অভিজ্ঞতা এবং অন্যান্য সাধকদের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, সত্য উপলব্ধির পথ কখনোই এত দীর্ঘ হতে পারে না, সাধনার পথে এত ঘুরপাকও খেতে হয় না, যদি অত্যধিক বিচার বিশ্লেষণ ও সংশয়ের বাধা থেকে মুক্ত থাকা যায়। কৃষ্ণপ্রেমকে আমি প্রশংসা জানাই, তিনি অবলীলায় এবং অতি সহজে ঐ বাধা অতিক্রম করেছেন[১]।"

গুরুকৃপা এবং মাতৃস্নেহ এই দুই-ই কৃষ্ণপ্রেম লাভ করিয়াছিলেন যশোদা মাঈর নিকট হইতে। সন্ন্যাস দীক্ষা নিবার পূর্বে এবং পরে, বিভিন্ন সময়ে মায়ের মাধ্যমে বহুতর অলৌকিক লীলা তিনি দর্শন করিয়াছিলেন। ফলে কৃষ্ণ ভজনের আস্থা ও কৃষ্ণরতি তাঁহার হইয়াছিল গভীরতর। পরবর্তীকালে সিদ্ধপুরুষ কৃষ্ণপ্রেমের কৃপায় তাঁহার ভক্ত শিষ্যেরা ঐ ধরনের নানা অলৌকিক ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

যশোদা মাঈর নৈষ্ঠিক বৈষ্ণবজীবনের প্রতিটি খুঁটিনাটি সতর্কভাবে অনুসরণ করিতেন কৃষ্ণপ্রেম। এ সম্পর্কে কোনো শৈথিল্য বা আপোস রফার স্থান তাঁহার মনে পাইত না।

বিজ্ঞানী বশী সেন এবং তাঁহার স্ত্রী জারট্রুড এমারসন সেনের সঙ্গে যশোদা মাঈ ও কৃষ্ণপ্রেমের ঘনিষ্ঠতা ছিল। মির্তোলায় আসা যাওয়ার পথে মাঝে মাঝে তাঁহারা আলমোড়া শহরে মিঃ সেনের বাংলোতে অবস্থান করিতেন। সাধুদের নৈষ্ঠিকতার কথা শ্রীমতী

---

[১] যোগী কৃষ্ণপ্রেম • দিলীপকুমার রায়

সেনের জানা ছিল। তাঁহারা আসিলেই বাংলোর বারান্দা ধুইয়া পুঁছিয়া নূতন রন্ধন পাত্র কিনিয়া যথাযোগ্য ব্যবস্থা করিয়া দিতেন। কৃষ্ণপ্রেম এবং যশোদা মাঈ স্বহস্তে রান্না করিতেন এবং ঠাকুরের ভোগ চড়াইয়া নিজেরা করিতেন প্রসাদ গ্রহণ। এ সময়ে বশী সেন মহাশয় কৃষ্ণপ্রেমের সঙ্গে সপ্রেম ভঙ্গীতে নানা ধরনের রঙ্গ রসিকতা করিতেন।

শ্রীমতী জারট্রুড সেন লিখিয়াছেন,[১] "সেদিন আমার স্বামী কৃষ্ণপ্রেমকে ঠাট্টার স্বরে বললেন, ভোগ রান্নার এসব ছ্যুৎমার্গী কাণ্ড যদি আমার বিধবা বৃদ্ধা ঠাকু'মা করতেন, তাহলে না হয় বুঝতাম। কিন্তু আপনি কেন এসব করতে যাবেন? আপনার আগেকার জীবনের পরিবেশ যে ছিল একেবারে পৃথক ধরনের। কেমব্রিজে পড়ার সময়, ছাত্রাবস্থায় নিশ্চয় প্রচুর গোমাংস আপনি খেয়েছেন, তবে আর এত সব গোঁড়ামি আর বাধানিষেধের মধ্যে আছেন কেন, বলুন তো?

"গোপাল কিন্তু একটুও বিরক্ত হলেন না এই ঠাট্টা শুনে। হেসে উঠলেন সঙ্গে সঙ্গে, আর এমন একটি উত্তর দিলেন, যা প্রত্যেকটি শ্রোতার অন্তরে জাগিয়ে তুলল প্রগাঢ় শ্রদ্ধা। এর পর আমার স্বামী আর কখনো এসব নিয়ে ঠাট্টা অথবা রসিকতা করেন নি। গোপাল বললেন, "এ যুগে ব্যক্তিগত এবং সামাজিক জীবনের সব কিছু সংযম আর নিয়ন্ত্রণই তো জানালা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হচ্ছে, আমার তো মনে হয়, এমন দুঃসময়ে নিজের ওপরে এ ধরনের সংযমের বাঁধ কিছুটা চাপিয়ে রাখা ভালো। তাছাড়া, আমার আগে যাঁরা এ পথ ধরে এগিয়েছেন, তাঁরা লক্ষ্যস্থলে ঠিকই পৌঁছে গেছেন। তাহলে আমার মতো লোক, যে এ পথে যাত্রা শুরু করেছে, তার পক্ষে কি বলা শোভা পায়—আমি এটা ক'রবো, ওটা ক'রবো না, এ নিয়ম মানবো, আর ওটা মানবো না? আমি তাই এ পথের সবটাই মেনে চলেছি।"

[১] যোগী কৃষ্ণপ্রেম, ভূমিকা : জারট্রুড ইমারসন সেন

মির্তোলার আশ্রমে কোনো রেডিও বা খবরের কাগজ রাখা হইত না। কৃষ্ণ ও কৃষ্ণের আশ্রম নিয়া এককেন্দ্রিক জীবনযাপন করিতেন কৃষ্ণপ্রেম, সেখানে অবান্তর কোনো কিছুর প্রবেশাধিকার ছিল না। দেশ বিদেশের সমস্যা ও তৎসম্বন্ধীয় আলোচনার কোনো প্রয়োজন-বোধই তাঁহার ছিল না। তাছাড়া কেনই বা থাকিবে? নিজে হইতে যে জীবনের উপর যবনিকা টানিয়া দিয়াছেন, সে সম্বন্ধে কোনো কৌতূহল বা অনুসন্ধিৎসা জাগ্রত থাকার তো কোনো কারণ নাই। শাশ্বত পরম সত্য, কৃষ্ণ, তাঁহার লক্ষ্যবস্তু। সেই লক্ষ্যে পৌঁছিতে হইলে সমগ্র জীবনটাকে পরিণত করিতে হইবে একটি ঋজু ক্ষিপ্রগতি ধনুঃশররূপে। আর সেই শরকে তীক্ষ্ণতর করিয়া তুলিতে হইবে পূজা অর্চনা ও ধ্যান ভজনের মধ্য দিয়া।

আলমোড়ায় সেনেদের বাংলোয় বসিয়া চা-পানের পর নানা কথাবার্তা হইতেছিল। জাতি বর্ণের প্রসঙ্গ উঠিলে কৃষ্ণপ্রেম কহিলেন প্রাচীন যুগের জাতি বিভাগ প্রাচীন ভারতেই অনেক কল্যাণসাধন করেছে, তাতে সন্দেহ নেই। আবার এটাও ঠিক যে, যে ধরনের জাতিবর্ণ বিভাগ আজকের দিনে রয়েছে তা আর টিঁকবে না, যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাকে বিদায় নিতে হবে। কিন্তু আমি জিজ্ঞেস করি, আজকাল অত্যধিক সংস্কার সাধন, শিল্পের প্রসার, পরিসংখ্যান এসব নিয়ে যে বাড়াবাড়ি আর পাগলামি চলছে, এর ফল শেষটায় কি কল্যাণকর হবে? মানুষকে কি শুধু সংখ্যাতত্ত্বে পরিণত করা হচ্ছে না? আত্মিক উন্নয়নের মূল্য কি ক্রমেই কমে আসছে না? ভারতের পক্ষে কি নিজের ঐতিহ্যের শেকড় আঁকড়ে ধরে প্রভূত কল্যাণের দিকে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়? পাশ্চাত্যের দ্বিতীয় শ্রেণীর নকলরূপেই কি তাকে গড়ে উঠতে হবে? হ্যাঁ, তবে এটা ঠিক, আমরা যে যা-ই বলি, পেছন থেকে ঠাকুরই যে টেনে চলেছেন তাঁর সুতো। তিনি যেমনি আমাদের চালাচ্ছেন, তেমনি চলছি আমরা। তিনি নাচান, আর আমরা নাচি—এইটেই হচ্ছে প্রকৃত কথা।"

চীন তখন ভারত আক্রমণ করিয়াছে। এ আক্রমণের ফল কি দাঁড়াইবে, একথা ভাবিয়া সবাই উদ্বিগ্ন। মিসেস সেনও এ সম্পর্কে তাঁহার দুশ্চিন্তা প্রকাশ করিতেছিলেন।

কৃষ্ণপ্রেম কিছুকাল নীরবে কি ভাবিতে লাগিলেন। তারপর প্রশান্ত কণ্ঠে আত্মবিশ্বাসের সুরে কহিলেন, "আপনাদের তো নিশ্চয় মনে আছে, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অর্জুনকে বধ করার জন্য অশ্বত্থামা হেনেছিলেন অমোঘ বাণ। সে বাণ ছিল ব্রহ্মাস্ত্র, কোনো কিছু দিয়েই তার প্রতিরোধ সম্ভবপর ছিল না। সেই সংকটে সারথীরূপে কৃষ্ণ তার চরণ দিয়ে রথটি চেপে ধরলেন, সঙ্গে সঙ্গে রথের চাকা গেল বসে। গোটা রথটা নীচু হ'য়ে গেল, আর ঐ মারাত্মক বাণ উড়ে চলে গেল অর্জুনের মাথার ওপর দিয়ে। আমি বিশ্বাস করি, ভারতের যে-কোনো সংকটে কৃষ্ণ তেমনিভাবে তাঁর চরণ দিয়ে আমাদের চেপে ধরবেন—এদেশ রক্ষা পাবে। ভারতের আত্মা কখনো বিনষ্ট হতে পারে না।"

কৃষ্ণপ্রেম আরো বলিতেন, "ভারত হচ্ছে বিশ্বের একমাত্র দেশ যা পাশ্চাত্যের জড়বাদী সভ্যতার কাছে পরাজিত হয় নি, তলিয়ে যায় নি। কারণ, আজ অবধি তাকে বর্মের মতো ঘিরে রেখেছে, সদাই রক্ষা ক'রে চলেছে তাঁর অগণিত সিদ্ধ মহাপুরুষদের আত্মিক জ্যোতির কল্যাণ-বলয়।"

তাই আধুনিক তার্কিকেরা এ দেশের সাধু-সন্তদের পরগাছা বলিয়া অভিহিত করিলে তিনি শ্লেষের হাসি হাসিতেন, মন্তব্য করিতেন, "ভগবানের কৃপায় পাশ্চাত্য দেশে যদি এ ধরনের পরগাছা বেশী ক'রে জন্মাতো, তাহলে বোধহয় দু' দুটো বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ ধ্বংস থেকে রক্ষা পেতো।"

বারাণসীতে থাকার সময়ে কৃষ্ণপ্রেম একদিন বারাণসীর মাহাত্ম্য এবং শিবের জ্যোতির কথা বর্ণনা করিতেছিলেন। অতি আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত উন্নাসিক এক শ্রোতা কৃষ্ণপ্রেমকে প্রশ্ন করেন, "আচ্ছা বলুন দেখি, এই ধুলো কাঁকরময় বিশ্রী শহরে আপনি শ্রদ্ধা করবার মতো সত্যই কি কিছু পেয়েছেন?"

কৃষ্ণপ্রেমের চোখ মুখ দিব্য আভায় উদ্‌ভাসিত হইয়া উঠে। প্রশা মধুর কণ্ঠে বলেন, "পেয়েছি বই কি, বন্ধু। পেয়েছি এখানে সোনা ধুলো কাঁকর, আর গঙ্গার স্বর্গীয় সংগীত!" প্রত্যয়-সমুজ্জ্বল সাধকে চোখ মুখের ভাব আর শ্রদ্ধাপূর্ণ উক্তি শুনিয়া প্রশ্নকর্তার মুখে কোনে কথা সরিল না।

গুরু যশোদা মাঈ সম্পর্কে একবার আমরা কৃষ্ণপ্রেমকে প্র করিয়াছিলাম। কি তিনি পাইয়াছেন তাঁহার মায়ের কাছে, কিভাবে পাইয়াছেন, তাহাও জানিতে চাওয়া হইয়াছিল। প্রশান্ত কণ্ঠে তিনি উত্তর দিলেন, "আমার একটা বড়ো সুবিধে—মা, গুরু আর কৃষ্ণ একই পথের ধাপ বেয়ে আমার কাছে এসে গেছেন। মা কি কোনোদিন সন্তানকে বর্জন করতে পারে? যত দুর্বল যত দুষ্কৃতই হোক না কেন মা তাকে দু'হাত দিয়ে আগলে রাখবেন। আমার এই মা-ই আবার আমায় দিয়েছেন সাধন-আশ্রয়। তারপর সিদ্ধা মাতা আর সিদ্ধা গুরুর মাধ্যমে পরম প্রভু কৃষ্ণও এসেছেন আমায় কৃপা করতে। মার থেকে স্নেহরস ধারা যেমনি স্বাভাবিকভাবে এসেছে আমিও তা পান করেছি স্বাভাবিকভাবে। জীবন আমার কৃতার্থ হয়ে উঠেছে। সর্বদাই ভেবে এসেছি, কৃষ্ণও যদি আমায় ত্যাগ করেন, মা—সদ্‌গুরুরূপী মা, আমায় কখনো ফেলে দেবে না তাঁর আশ্রয় থেকে।"

১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে যশোদা মাঈর তিরোধানের পরে মির্তোলার আশ্রমে নামিয়া আসে শোকের কৃষ্ণচ্ছায়া। আর এ শোক তীক্ষ্ণ শায়কের মতো বিদ্ধ হয় গুরুগতপ্রাণ কৃষ্ণপ্রেমের বক্ষে। জীবনে এমন দুঃসহ আঘাত আর কখনো তিনি পান নাই।

এই সময়ে শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রয়ের কাছে শোকসংবাদ জ্ঞাপন করিয়া তিনি লিখিয়াছিলেন, "...গলস্টোনের ব্যাধিতে মা মরদেহ ত্যাগ ক'রে চলে গেছেন। দেহান্তের সময় যে পরিপূর্ণ শান্তি বিরাজ করছিল তাঁর ভেতরে তা অবর্ণনীয়। কৃষ্ণ দর্শনের পরিতৃপ্তির আভা ছড়িয়ে পড়েছিল তাঁর চোখে মুখে, মনে হচ্ছিল

বিগত জীবনের বৎসরগুলো সব যেন ঝরে পড়ে গেছে তাঁর দেহ থেকে। আমি ঠিক জানি, তিনি এখনো আমাদের মধ্যে বিরাজ করছেন, এবং আগের চাইতে আরো ঘনিষ্ঠতর রূপেই রয়েছেন, তবু তাঁর দৈহিক সান্নিধ্য হারিয়ে ফেলার ক্ষতি যেন আমি সহ্য করতে পারছিনে। যদিও আমি জানি কৃষ্ণের অবিস্মরণীয় কথা —বৃন্দাবনের ব্রাহ্মণ পত্নীদের তিনি বলেছিলেন—দৈহিক সান্নিধ্য দিয়ে তো শ্রীভগবান্‌কে কখনো লাভ করা যায় না। মা আমাদের আগে থেকেই বলেছিলেন, তাঁর শেষ সময় আসন্ন। কিন্তু এত শীঘ্র যে তিনি চলে যাবেন তা ভাবতে পারি নি। তুমি তো জানো, মা আমার কাছে কোন্ পরমবস্তু ছিলেন—বিশ বছরের অধিক কাল তিনি ছিলেন আমার—সদ্‌গুরু, আর ছিলেন আমার মা। তিনি ছিলেন সেই কেন্দ্রটি, যার চারদিকে আমার সমগ্র জগৎ এতকাল আবর্তিত হয়েছে। এখনো তিনি সেই কেন্দ্ররূপেই বিরাজিতা রয়েছেন, কিন্তু দেহে তাঁকে দর্শন করতে পারছি না, এটাই হয়ে উঠেছে অসহনীয়।"

গুরু এবং গুরুতত্ত্বের আদর্শ সম্পর্কে কৃষ্ণপ্রেমের নিষ্ঠা ছিল অতুলনীয়। এ প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায় একটি মনোজ্ঞ বিবরণ দিয়াছেন। যশোদা মাঈ তখনো জীবিত, সে-বার তাঁহাকে নিয়া কৃষ্ণপ্রেম এলাহাবাদে অবস্থান করিতেছেন। দিলীপকুমারও তখন সেখানে, যশোদা মাঈ এবং অন্যান্য অভ্যাগতদের সম্মুখে বসিয়া সেদিন তিনি গাহিতেছিলেন শঙ্করাচার্যের রচিত প্রসিদ্ধ এক গুরু-স্তোত্র। কৃষ্ণপ্রেম এই স্তোত্রসংগীত শুনিতে শুনিতে ভাবতন্ময় হইয়া গিয়াছেন।

সংগীত থামিলে, একজন ভক্ত শ্রোতা কৃষ্ণপ্রেমকে প্রশ্ন করিলেন, "গুরুর কৃপা লাভের প্রধান উপায় কি?"

উত্তর হইল, "গুরুর প্রতি একাগ্রতা ও ভক্তিনিষ্ঠা।"

"প্রার্থনা ও ধ্যান ধারণা কি গুরুকে উদ্দেশ ক'রে করতে হবে, না ভগবান্‌কে ভেবে করতে হবে?"

"দুই-ই করতে পারেন, ফল হবে একই। আসলে, দুই-ই যে এক বস্তু।"

এক কূটতার্কিক অধ্যাপক সেখানে উপবিষ্ট। কহিলেন, "তা কি ক'রে হবে? ভগবান্ একমেবাদ্বিতীয়ম্, তাঁর দ্বিতীয় কেউ নেই, আর গুরু আজকাল গজাচ্ছে পাড়ায় পাড়ায়। তাছাড়া, তন্ত্রসার তো সোজা বলে দিয়েছেন,—মধুলুব্ধ ভৃঙ্গ যেমন পুষ্প থেকে পুষ্পান্তরে ঘুরে ঘুরে মধু সংগ্রহ করে, তেমনি জ্ঞানলুব্ধ শিষ্যও এক গুরু থেকে আর এক গুরুর কাছে যাবে, আহরণ করবে জ্ঞান।"

কৃষ্ণপ্রেম বলিয়া উঠিলেন, "জানি, মশাই, ও শ্লোকের কথা জানি। স্যর জন উডরফের তন্ত্রের বই-এ ঐ উদ্ধৃতি বারো বৎসর আগে আমি পড়েছি। কিন্তু উডরফ নিজেই বলেছেন, তান্ত্রিকদের মধ্যে উচ্চকোটি এবং সাধারণ, নানা স্তরের সাধক রয়েছেন। তাছাড়া, এ শ্লোকটিও তিনি সংকলন করেছেন—গুরৌ তুষ্টে শিবস্তুষ্টঃ, গুরুকে তুষ্ট করলেই শিবকে তুষ্ট করা হয়।"

তার্কিক অধ্যাপক তাঁহার খুঁটি কিছুতেই ছাড়িবেন না। বলিলেন, "আসল প্রশ্ন হচ্ছে, জ্ঞানান্বেষী সাধক বিভিন্ন গুরু থেকে জ্ঞান আহরণ করতে পারে কিনা?"

কৃষ্ণপ্রেম দৃঢ়স্বরে বলিয়া উঠিলেন, "মশাই, আপনার কিন্তু গোড়াতেই গলদ রয়েছে। শিক্ষক আর গুরুতে আপনি গোল পাকিয়ে ফেলেছেন। যে সাধক গুরুকে শুধু শিক্ষক বলে মনে করে সে বহুগুরুর কাছে অবশ্য যেতে পারে। কিন্তু যে গুরুকে গুরুর দেহের বাইরে, সূক্ষ্মতর সত্তায় পেয়েছে, নিজের হৃদয়ের ভেতরে স্থাপন করেছে, সে কখনো স্বপ্নেও ভাবতে পারে না গুরুকে ত্যাগ করার কথা।"

যশোদা মাঈ এবার মুখ খুলিলেন। কহিলেন, "গোপাল, তুমি ঠিকই বলেছো। যে সাধ্বী স্ত্রী তার স্বামীকে সারা মনপ্রাণ দিয়ে ভালোবেসেছে, সত্যিকার ভালোবাসার স্বাদ পেয়েছে, ভালোবাসার তৃষ্ণা মেটাতে সে কি কখনো অপর কোথাও যায়, না যেতে পারে?"

সংশয়ী, তার্কিক অধ্যাপক একথার পর তাড়াতাড়ি সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন।

তিরোধানের পরও গুরু যশোদা মাঈর দৃষ্টি তাঁহার অধ্যাত্ম-তনয় কৃষ্ণপ্রেম হইতে সরিয়া যায় নাই। অন্তরঙ্গ ভক্ত ও বন্ধুদের কাছে কৃষ্ণপ্রেম এ সম্পর্কিত কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন।

সেদিন দণ্ডেশ্বরের ঝর্ণার পাশে যশোদা মাঈর মরদেহ ভস্মীভূত হইবার পর কৃষ্ণপ্রেম ও অন্যান্য ভক্তেরা আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন। সারা দিন দুশ্চিন্তা ও ছুটাছুটিতে কাটিয়াছে, দেহ অতিশয় পরিশ্রান্ত। শয্যায় শয়ন করার পর আসিল গভীর নিদ্রা। অভ্যাসমতো শেষ রাত্রে উঠিয়া প্রত্যহ তিনি ধ্যান ভজন করেন, কিন্তু সেদিন দেহ অবসন্ন, তাই যথাসময়ে নিদ্রা ভাঙে নাই। হঠাৎ এসময়ে তিনি শুনিতে পান বিদেহী যশোদা মাঈর কণ্ঠস্বর, "গোপাল, একি, এখনো ঘুমিয়ে আছো? ভজনে বসবার সময় যে চলে যাচ্ছে" একটু থামিয়া, আশ্বাসের সুরে মা আবার বলিলেন, "গোপাল, আমি কিন্তু এখনো আগের মতো তোমার পাশে রয়েছি।"

কৃষ্ণপ্রেম ধড়মড় করিয়া উঠিয়া পড়েন। মায়ের কণ্ঠস্বর শুনিয়া দুইচোখ সজল হইয়া উঠে, কাতর স্বরে বলিয়া উঠেন, "মা, যদি তুমি আমার পাশেই রয়েছো, তবে তোমায় দেখতে পাচ্ছিনে কেন? আর কি আমায় দেখা দেবে না?"

"না বাবা, ধাপের পর ধাপ এগিয়ে, তোমারই যে আসতে হবে আমার কাছে। তোমার সাধনা ঠিক মতো চালিয়ে যাও, এখানে এই লোকে এসে আমার দেখা পাবে।" অদৃশ্যলোকের ঐ বিশেষ চৈতন্য-স্তর হইতে যশোদা মাঈ ইহার পর আরো কিছুকাল তাঁহার গোপালকে নির্দেশাদি দিয়াছেন। পরবর্তীকালে, এই দৈবী কণ্ঠস্বর আর শোনা যায় নাই।

আমাদের প্রীতিভাজন ডঃ গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় তাঁহার একবারকার একটি অভিজ্ঞতার কথা প্রকাশ করিয়াছেন। কৃষ্ণপ্রেম

ও মতিরানী সে সময়ে বৃন্দাবনে গিয়াছেন। তাঁহাদের আহ্বান পাইয়া কাশী হইতে গোবিন্দগোপালও সেখানে গিয়া উপস্থিত হন। সবাই মিলিয়া কুঞ্জে কুঞ্জে ঘুরিতেছেন, ঠাকুর দর্শন করিতেছেন; ভজন কীর্তন ও অন্তরঙ্গ কথাবার্তায় দিন বেশ আনন্দে কাটিতেছে।

ইতিমধ্যে গোবিন্দগোপালের দাদার এক টেলিগ্রাম সেখানে হাজির। কৃষ্ণপ্রেমের সহিত তাঁহার দীর্ঘদিনের বন্ধুত্ব, তিনি সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইয়াছেন, মির্তোলায় ফিরিবার আগে কৃষ্ণপ্রেম যেন তাঁহার কাছে বৈদ্যনাথধামে একবার অবশ্য যান।

সেখানে যাওয়া সম্পর্কে সোৎসাহে আলাপ আলোচনা চলিতেছে, এসময়ে কৃষ্ণপ্রেম হঠাৎ কহিলেন, "তোমরা একটু অপেক্ষা করো, আমি ভেতর থেকে আসছি।"

কিছুক্ষণ পরে নিজকক্ষ হইতে বাহির হইয়া আসিয়া গম্ভীরকণ্ঠে তিনি কহিলেন, "মায়ের নির্দেশ এইমাত্র আমি পেলাম। বললেন, 'সরাসরি মির্তোলায় চলে যাও। সেখানে তোমাদের উপস্থিতির প্রয়োজন আছে। ব্যাপারটা খুব জরুরী।"

ত্রস্তব্যস্ত হইয়া কৃষ্ণপ্রেম মির্তোলায় গিয়া উপস্থিত হন। দেখেন, আগের দিন ভারপ্রাপ্ত পূজারীটি আশ্রম হইতে পলায়ন করিয়াছে। সেদিন তাঁহারা মির্তোলায় না পৌঁছিলে ঠাকুরের পূজা অর্চনা হইত না, এবং তাঁহাকে উপবাসীও থাকিতে হইত।

রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহের নানা লীলা বৈচিত্র্য উত্তর বৃন্দাবন আশ্রমের ভক্তেরা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

অধিকাংশ দিন ঠাকুরের ভোগ কৃষ্ণপ্রেম নিজেই অতিশয় শ্রদ্ধা সহকারে প্রস্তুত করিতেন। একদিন আশ্রমে খুব ভালো ঘৃত সংগৃহীত হইয়াছে। কৃষ্ণপ্রেম সযত্নে ইহা দিয়া হালুয়া তৈরি করিলেন। ভোগ নিবেদন করার পর দরজা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল, প্রাঙ্গণে বসিয়া সবাই শুরু করিলেন জপধ্যান। কিছুক্ষণ পরে কৃষ্ণপ্রেম হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইলেন, কহিলেন, "মনে হচ্ছে, ঠাকুর আজ ভোগ আস্বাদন ক'রে

খুশী হয়েছেন। চলতো, সবাই গিয়ে দেখি প্রসাদের অবস্থা কি। সত্য সত্যই আজ কিছুটা খেয়েছেন কিনা।"

যশোদা মাঈ পাশেই বসিয়াছিলেন। গোপালের কথা শুনিয়া তিনি নীরবে শুধু মুচকি হাসিলেন। অতঃপর আশ্রমিকেরা মন্দির কক্ষে ঢুকিয়া দেখেন, ঠাকুর স্থুল দেহীর মতো সত্য সত্যই সেদিন ভোগ গ্রহণ করিয়াছেন, শুধু তাই নয়, হালুয়ার বেশীটা অংশই প্রভু উড়াইয়া ফেলিয়াছেন, বালগোপালের কচি আঙুলের ছাপটি দেখা যাইতেছে স্পষ্টরূপে। এই দৃশ্য দেখিয়া সবাই মহা আনন্দিত। সোৎসাহে তাঁহারা শুরু করিলেন ভজন ও কীর্তন।

ঠাকুর এবং ঠাকুরানীর প্রেমলীলার বৈচিত্র্যও মাঝে মাঝে দেখা যাইত। একদিন প্রত্যুষে মন্দিরের দ্বার খুলিয়া কৃষ্ণপ্রেম ঘরে ঢুকিয়াছেন। শ্রীমূর্তির দিকে নজর পড়িতেই চমকিয়া উঠিলেন। একি অদ্ভুত দৃশ্য! কৃষ্ণের পায়ের সোনার নূপুর দুটি স্থানান্তরিত হইয়াছে রাধারানীর পায়ে, আর রাধারানীর সোনার হারটি চলিয়া আসিয়াছে কৃষ্ণের গলায়।

কৃষ্ণপ্রেম উচ্চ স্বরে সবাইকে ডাকিয়া আশ্রমের মন্দিরে জড়ো করিলেন। আগের রাত্রে আরতির পরে সর্বসমক্ষে শ্রীবিগ্রহের শয়ান দেওয়া হইয়াছে। তারপর সারা রাত তো মন্দিরের দুয়ার ছিল তালাবদ্ধ। ভক্তেরা মহা উল্লসিত, শ্রীবিগ্রহের এই মানুষী লীলার কথা নিয়া তাঁহারা সোৎসাহে আলোচনা করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণপ্রেমের চোখে মুখে দিব্য আনন্দের আভা। কহিলেন, "ছ্যাখো দেখি ঠাকুর ঠাকুরানীর কি কাণ্ড! ভক্তের হৃদয় মঞ্চে, মন্দিরের বেদীতে, আর অপ্রাকৃত ব্রজধামে সবখানেই সেই একই লীলা-বিলাস।"

কৃষ্ণপ্রেমের সাধনার একটা বড় ধাপ—রাধারানীর কৃপাপ্রাপ্তি। এই কৃপা দিনের পর দিন তাঁহার সাধনজীবনের নানা প্রশ্নের মীমাংসা যেমন করিয়া দিত, তেমনি করিত আশ্রমজীবনের এবং বহিরঙ্গ জীবনের নানা কর্মের দিক্‌দর্শন।

কোনো ভক্ত কখনো দীক্ষাপ্রার্থী হইলে অথবা কোনো ভগবৎ-তত্ত্বের দিক্‌দর্শন প্রার্থনা করিলে কৃষ্ণপ্রেম বলিয়া উঠিতেন, "অপেক্ষা করো, রাধারানীর অনুমতি আগে নিয়ে নিই।" তারপর প্রবেশ করিতেন মন্দিরে, কিছুকাল ধ্যানাবিষ্ট থাকার পর ফিরিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসু ভক্তকে দিতেন তাঁহার প্রার্থিত সাহায্য।

জীবনের শেষ পর্যায়ে যাহারা তাঁহাকে দেখিয়াছেন, লক্ষ্য করিয়াছেন, তাঁহার জীবন যেন শ্রীরাধার ভাবেই আবিষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। কীর্তনে রাধার নাম, ভাষণে রাধা, আবার কাহাকেও অভিবাদন বা সম্বোধন করিতে হইলেও 'জয় রাধে'।

বন্ধুবর হেরম্ব মুখোপাধ্যায় একবার কয়েক মাস মির্তোলায় কৃষ্ণ-প্রেমের অতিথিরূপে আহ্বান করেন এবং তাঁহার অশেষ স্নেহ ও কৃপালাভ করেন। এ সময়ে কৃষ্ণপ্রেমের প্রমুখাৎ রাধারানীর এক মনোজ্ঞ লীলা কাহিনী তিনি শুনিয়াছিলেন।

ভক্ত সুনীল এবং তাঁহার স্ত্রী আরতি দেবী মির্তোলার আশ্রমের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। কৃষ্ণপ্রেমের কাছে দীক্ষা প্রাপ্ত হইয়া তাঁহারা সাধনভজন করিতেন। সুনীল থাকিতেন এলাহাবাদে, আর মাঝে মাঝে অফিসের কাজে ছুটি নিয়া সপরিবারে উপস্থিত হইতেন গুরুর সকাশে।

সেবার উভয়েরই মনে প্রবল ইচ্ছা জাগিয়াছে, মির্তোলা আশ্রমে গিয়া কয়েকদিন কাটাইয়া আসিবেন। মাসের শেষ, হাতে তখন তেমন টাকাকড়ি নাই, পাথেয় কি করিয়া যোগাড় করা যায়?

ভক্তিমতী স্ত্রী আরতি এ সমস্যার সমাধান করিয়া দিলেন। হাতের সোনার বালা-জোড়া বিক্রয় করিয়া সংগ্রহ করিলেন রেল ভাড়ার টাকা। অতঃপর পরমানন্দে তাঁহারা মির্তোলার আশ্রমে চলিয়া আসিলেন।

কয়েকদিন পরের কথা কথা। ঠাকুরের সেবা পূজা ও ভজনাদি শেষ হওয়া মাত্র কৃষ্ণপ্রেম আঙিনায় আসিয়া দাঁড়ান। হাতে তাঁহার এক জোড়া সোনার বালা। সুনীল ও আরতি কাছে আসিতেই স্নিগ্ধ

স্বরে কহিলেন, "আচ্ছা আরতি, তোমার বালা দু'গাছা কি করেছো বলতো? সত্যি ক'রে বলো।"

আরতির মুখে কোনো কথা নেই, সসংকোচে তিনি দাঁড়াইয়া আছেন।

স্মিতহাস্যে কৃষ্ণপ্রেম এবার কহিলেন, "দ্যাখো, রাধারানী এই মাত্র আমায় সব কথা জানিয়ে দিলেন। মির্তোলায় আসবার খরচপত্র তোমরা তাড়াতাড়ি জোটাতে পারছিলে না, তাই শেষটায় আরতির সোনার বালা বিক্রি করতে হয়েছে। তাইতো রাধারানী বললেন, "আমার হাতের বালা জোড়া খুলে নাও, আরতিকে দিয়ে দাও। ওর হাত বড্ডো খালি দেখাচ্ছে।"

রাধারানীর নির্দেশ মতো তাঁর ঐ অলংকার আরতি দেবীকে দিয়ে দেওয়া হল। ভক্তের তপস্যায় জাগ্রত উত্তর বৃন্দাবনের রাধারানী বিগ্রহ আরো বহুতর লীলা উত্তরকালে প্রকটিত করিয়াছেন।

১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের কথা। দাক্ষিণাত্যের কয়েকটি তীর্থ ভ্রমণের উদ্দেশ্যে কৃষ্ণপ্রেম সেবার মির্তোলা হইতে বাহির হইয়াছেন। প্রথমে মাদ্রাজ ও পণ্ডিচেরী হইয়া পৌঁছিলেন তিরুভন্নামালাই-এ মহর্ষি রমণের আশ্রমে। মহর্ষির জ্ঞানময় সাধন পথ এবং যশোদা মাঈর প্রেমের পথে পার্থক্য প্রচুর, তবুও এই আত্মজ্ঞানী মহাপুরুষের উপর চিরদিনই কৃষ্ণপ্রেমের অগাধ শ্রদ্ধা ছিল। মহর্ষিকে প্রণাম করিয়া দুই চারিটি প্রধান বিগ্রহ দর্শন করিয়া মির্তোলায় ফিরবেন, ইহাই তাঁহার মনোগত ইচ্ছা। মহর্ষি সন্দর্শনের মনোজ্ঞ অভিজ্ঞতার কাহিনীটি বিভিন্ন সময়ে অন্তরঙ্গ ভক্তদের কাছে কৃষ্ণপ্রেম বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার দর্শনের অব্যবহিত পরেই আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু 'দাদাজী' ডুরাই স্বামী আইয়ার, তিরুভন্নামালাই-এ-উপস্থিত হন। মহর্ষির ঘনিষ্ঠ মহল হইতে কৃষ্ণপ্রেমের দিব্য অনুভূতিময় অভিজ্ঞতার কথা তিনি শুনিয়াছিলেন। মহর্ষি এবং কৃষ্ণপ্রেমের তখনকার সাক্ষাৎকারের ঘটনাটি এইরূপ:

আহার ও বিশ্রামের পর কৃষ্ণপ্রেম মহর্ষির হলঘরে গিয়া তাঁহাকে প্রণাম নিবেদন করেন, নিচে এক পাশে উপবিষ্ট হইয়া শুরু করেন ধ্যান মনন। মহর্ষি তাঁহার কৌচটিতে হেলান দিয়া শুইয়া আছেন। আয়ত নয়ন দুটির দৃষ্টি কোন্ দুজ্ঞেয় রহস্যলোকে উধাও হইয়া গিয়াছে। ঠোঁটের কোণে অর্ধস্ফুট প্রসন্নতার হাসি। ত্রিশ-চল্লিশটি ভক্ত ও দর্শনার্থী তাঁহার সম্মুখে উপবিষ্ট। কেহ অবাক বিস্ময়ে এই আত্মজ্ঞানী মহাত্মার দিকে নির্নিমেষে চাহিয়া আছেন, কেহবা রত রহিয়াছেন প্রাত্যহিক এবং নিয়মিত ধ্যান জপে।

অল্পক্ষণের মধ্যেই কৃষ্ণপ্রেম দিব্য ভাবে আবিষ্ট হইয়া পড়েন। সঙ্গে সঙ্গে অন্তরের অন্তস্তল হতে বার বার ধ্বনিত হইতে থাকে একটি অস্ফুট স্বরের প্রশ্ন—'কে তুমি? কে তুমি? কি তোমার প্রকৃত স্বরূপ?'

রাধাকৃষ্ণের প্রেমের একনিষ্ঠ সাধক কৃষ্ণপ্রেম, ভক্তিপ্রেম, আর বিগ্রহ সেবায় দিনরাত থাকেন মশগুল। অন্তর্লোক হইতে উত্থিত ঐ প্রশ্ন শুনিয়া চমকিয়া উঠিয়াছেন বটে, কিন্তু গোড়ার দিকে তেমন আমল দেন নাই। কিন্তু তিনি এড়াইতে চাহিলেও, এ প্রশ্ন এবং নেপথ্যচারী প্রশ্নকর্তা তো তাঁহাকে ছাড়িতে চাহে না। আবার তাঁহার চৈতন্যের দ্বারে বার বার আসে করাঘাত। কে যেন বলিতে থাকে—কে তুমি, কে তুমি, কি তোমার স্বরূপ?

ভাবাবিষ্ট অবস্থাতেই উত্তর দিতে চেষ্টা করেন কৃষ্ণপ্রেম, বলেন, "আমি কৃষ্ণের নগণ্য দাস মাত্র।"

আবার ধ্বনিত হয় দৈবী প্রশ্ন—"কে কৃষ্ণ কে কৃষ্ণ?"

"কৃষ্ণ শ্রীনন্দের নন্দন। বংশীধর, রসময়, ভক্তের প্রাণধন।"

তবুও বিরাম নাই অন্তরাত্মা হইতে উত্থিত সেই দৈবী প্রশ্নের। এবার কৃষ্ণপ্রেম কৃষ্ণের স্বরূপ ও পরিচিতির পরিধি বাড়াইতে থাকেন, বলেন, "কৃষ্ণ অবতার, পরাৎপর, সারাৎসার। তবুও দৈবী প্রশ্নকর্তার নিরস্ত হইবার লক্ষণ নাই। অতঃপর অনন্যোপায় হইয়া কৃপাময়ী রাধারানীর শরণ নেন কৃষ্ণপ্রেম। রাধারানী বলিয়া দেন 'কৃষ্ণ ছাড়া

বিশ্ব সৃষ্টিতে দ্বিতীয় কোনো বস্তুর অস্তিত্ব নেই। তবে কৃষ্ণের পরিচয় কে দেবে? কে জ্ঞাপন করবে তাঁহার স্বরূপ আর মাহাত্ম্য? শুধু কৃষ্ণই যে বলতে পারেন কৃষ্ণের কথা। যতো বাচা নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসাসহ—মানুষের সাধ্য কি যে তাঁর সম্বন্ধে বলবে?"

পরের দিন প্রভাতে কৃষ্ণপ্রেম আশ্রমের হলঘরে মহর্ষির পায়ের কাছাকাছি বসিয়া আছেন। মহর্ষি একটু ঘুরিয়া বসিয়া তাঁহার দিকে করিলেন প্রসন্নমধুর দৃষ্টিপাত—অগাধ অতলস্পর্শী দৃষ্টি হইতে স্বর্গের সুধা যেন অঝোরে ঝরিয়া পড়িতেছে। নীরবে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া মহর্ষি মুচকি হাসি হাসিলেন। সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণপ্রেমের কাছে মহর্ষির লীলা খেলাটি পরিষ্কার হইয়া উঠিল। উপলব্ধি করিলেন, গতকাল যে দৈবী প্রশ্ন বার বার তাঁহার অন্তরাল হইতে উত্থিত হইয়াছে, মহর্ষিই ছিলেন তাহার পিছনে।

প্রসন্ন মনে, নয়ন নিমীলিত করিয়া, কৃষ্ণপ্রেম ধ্যানে বসিলেন। অল্পক্ষণের মধ্যে অনাস্বাদিতপূর্ব দিব্য আনন্দে তাঁহার সারা দেহমন প্রাণ প্লাবিত হইয়া গেল।

এই আনন্দের আবেশ কিছুটা কাটিয়া যাইতেই মহর্ষির দিকে তাকাইয়া কৃষ্ণপ্রেম মনে মনে প্রশ্ন করিলেন, 'যদি এতটা কৃপাই আমায় করেছেন, হে মহাত্মন্, তবে এবার আমায় জানিয়ে দিন কে আপনি, কি আপনার স্বরূপ, কি আপনার তত্ত্ব?'

এই নীরব প্রশ্নটি করার পর মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখেন, এ কি অদ্ভুত কাণ্ড, মহর্ষি তাঁহার কৌচে নাই! এতগুলি ভক্ত ও দর্শনার্থীর দৃষ্টির সম্মুখ হইতে মুহূর্ত মধ্যে স্থূলদেহটি কোথায় উড়িয়া গেল? কোথায় তিনি অন্তর্হিত হইলেন? এ কি কৃষ্ণপ্রেমের দৃষ্টি বিভ্রম না মহর্ষিরই অলৌকিক লীলা?

নিজের চোখ দুইটি ক্ষণতরে নিমীলিত করিয়া কৃষ্ণপ্রেম আবার তাকাইলেন কৌচের দিকে। এ কি! এবার যে মহর্ষি সশরীরে জীবন্ত শিবের মতো সেখানেই উপবিষ্ট রহিয়াছেন। শুধু তাহাই নয়, কৃষ্ণপ্রেমের দিকে অপাঙ্গে স্মিতহাস্যে একটু তাকাইয়া মুখটি

ফিরাইয়া নিলেন অন্যদিকে। স্থূল শরীরের এই চকিত আবির্ভাব আর অন্তর্ধান, এই 'ঝাঁকি দর্শন', সেদিন কৃষ্ণপ্রেমকে কোন তত্ত্ব জানাইয়া দিয়া গেল? শ্রদ্ধায় বিস্ময়ে অভিভূত কৃষ্ণপ্রেম এ সময়ে অস্ফুট স্বরে আপন মনে কহিতে লাগিলেন, "মহর্ষি, আপনার কৃপায় আমি বুঝেছি।—স্থূল সূক্ষ্মের গণ্ডীর বাইরে, দ্বন্দ্বাতীতলোকে, আপনি রয়েছেন সদা বিরাজিত। আত্মজ্ঞানী হে মহাসাধক, আপনাকে প্রণাম, বার বার প্রণাম।"

আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু, উচ্চকোটির গুপ্ত সাধক শ্রীএস. ডুরাইস্বামী আইয়ারের সহিত মহর্ষি রমণের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল।[১] কৃষ্ণপ্রেমের তিরুভন্নামালাই-এ যাওয়ার কিছুদিন পরে ডুরাইস্বামী মহর্ষি রমণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যান। সে সময়ে মহর্ষি কথা প্রসঙ্গে তাঁহাকে বলেন, "তুমি কি কৃষ্ণপ্রেমকে জানো? এবার সে এখানে এসেছিল।"

ডুরাইস্বামী উত্তরে বলেন, "আমি তাঁর কথা, তাঁর ত্যাগ তিতিক্ষার কথা, অনেক শুনেছি। আমার কয়েকটি বন্ধু কৃষ্ণপ্রেমকে অন্তরঙ্গ ভাবে জানেন। তবে আমার সঙ্গে তাঁর দেখা হয় নি কখনো।"

মহর্ষি রমণ কহিলেন, "দেখা ক'রো তার সঙ্গে। ত্যাগী, প্রাণ-সুন্দর পুরুষ—জ্ঞানী আর ভক্ত একাধারে সে দুই-ই।"

কয়েক বৎসর পরে ডুরাইস্বামীর সহিত কৃষ্ণপ্রেমের সাক্ষাৎ ঘটে কলিকাতায়, হিমাদ্রি পত্রিকার অফিসে। সে সময়ে উভয়ে উভয়কে ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে পাইয়া আনন্দে উচ্ছল হইয়া উঠেন।

তিরুভন্নামালাইর পর ত্রিচিনপল্লী হইয়া কৃষ্ণপ্রেম শ্রীরঙ্গমে উপনীত হন। এ স্থানে প্রভু রঙ্গনাথের সম্মুখে যে অলৌকিক দর্শন

---

১ এস ডুরাইস্বামী আইয়ার কর্মজীবনে ছিলেন মাদ্রাজ হাইকোর্টের শ্রেষ্ঠ অ্যাডভোকেট। শ্রীঅরবিন্দের অধ্যাত্ম-জীবনের অন্তরঙ্গ সহচর ছিলেন তিনি, আর ছিলেন মহর্ষি রমণের স্নেহধন্য, কৃপাধন্য। পরবর্তীকালে ডুরাইস্বামী যোগীশ্বর কালীপদ গুহরায়ের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসেন এবং তাঁহার কৃপাপ্রাপ্ত হন।

ও দিব্য অনুভূতি তিনি লাভ করেন, তাহার স্মৃতি জীবনে কোনো দিন তিনি ভুলিতে পারেন নাই। হঠাৎ কখনো কখনো মনের দুয়ার খুলিয়া গেলে, কৃষ্ণপ্রেম অন্তরঙ্গ মহলে এই অধ্যাত্ম-অভিজ্ঞতার কথা বিবৃত করিতেন।

পুণ্যতোয়া কাবেরীতে স্নান সমাপন করিয়া কৃষ্ণপ্রেম শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করিয়াছেন। শেষশায়ীপ্রভু রঙ্গনাথের মূর্তির দিকে কিছুক্ষণ মুগ্ধনেত্রে তাকাইয়া থাকার পর তাঁহার ধ্যাননেত্রে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে এক অলৌকিক দৃশ্য। দেখেন, দিব্যলোকের তরল জ্যোতির ধারা সারা বিশ্ব সৃষ্টিতে ওতপ্রোত রহিয়াছে আর ঐ জ্যোতির সাগরে বিরাজিত রহিয়াছেন পরম প্রভু শ্রীকৃষ্ণ এবং রাধারানী। ঠাকুর আর ঠাকুরানীর চরণপদ্ম হইতে নিঃসৃত হইতেছে দিব্যপ্রেমের অনন্ত প্রবাহ—আর এই প্রবাহে সমস্ত বিশ্বসংসার হইয়া উঠিয়াছে প্রেমময় চৈতন্যময়।

উত্তরকালে যখনি কৃষ্ণপ্রেম এই দিনকার দিব্য উপলব্ধির কথা বলিতেন, তখনি মন্তব্য করিতেন, "ভরতের মন্দির ও সিদ্ধপীঠগুলো আধ্যাত্মিকতার এক একটি শক্তি-কেন্দ্র। নিষ্ঠা নিয়ে, অহংবোধ বিবর্জিত হয়ে, এসব পুণ্যস্থলীতে গিয়ে তপস্যা করলে পরম বস্তু পাওয়া যায় বৈ কি।"

নির্মোহ, অভিমানহীন, প্রেমিক মহাপুরুষ ছিলেন কৃষ্ণপ্রেম। তাঁহার চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্য সাক্ষাৎভাবে দেখার সুযোগ আমরা একবার পাইয়াছি এলাহাবাদে থাকার সময়ে কৃষ্ণপ্রেমের (তৎকালীন রোনাল্ড নিক্সন) সহিত শ্রীযুক্ত বীরেন ব্যানার্জির ঘনিষ্ঠতা জন্মে। এই ঘনিষ্ঠতা উত্তরকালে পরিণত হয় শ্রদ্ধায় ও ভালোবাসায়। বীরেন ব্যানার্জি মহাশয় কলিকাতার একটি প্রতিষ্ঠানের অফিসার ছিলেন। দূরে থাকেন বলিয়া কৃষ্ণপ্রেমের হিমালয় আশ্রমে সব সময়ে যাওয়া ঘটিত না, কিন্তু পত্রের মাধ্যমে সর্বদা যোগাযোগ রাখিতেন।

কলিকাতায় যোগীশ্বর কালীপদ গুহরায়কে বীরেনবাবু ভক্তি-

শ্রদ্ধা করিতেন এবং নিয়তই হিমাদ্রি পত্রিকার অফিসে, তাঁহার নিভৃত কক্ষে আসিয়া তাঁহার পুণ্যসঙ্গ লাভ করিতেন।

একদিন শ্রীগুহরায়ের কক্ষে বসিয়া লেখক দুই একটি ব্যক্তিগত কথা বলিতেছেন এমন সময়ে বীরেনবাবু সেখানে ঢুকিলেন। চেয়ারে বসার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীযুক্ত গুহরায় বলিলেন, "কি ব্যাপার? কয়েকদিন দেখি নি কেন? আপনাকে যেন এক নূতন মানুষ দেখ্‌ছি?"

"না-না নূতন আর কি হবো, যথা পূর্বং পরং", বলিয়া ব্যানার্জি মহাশয় ঢোক গিলিতেছেন।

"ফাঁস ক'রে দেবো নাকি আপনার গোপন প্রেমের কথা? এখানে বাইরের কেউ নেই।"

"কি যে বলছেন—" বলিয়া ব্যানার্জি মহাশয় তখন বিপন্নভাবে আমতা-আমতা করিতেছেন।

শ্রীযুক্ত গুহরায় উচ্চরবে হাসিয়া কহিলেন, "আরে, ভালো সন্দেশ, সবাইকে তা বেঁটে দিতে হয়। লুকোচ্ছেন কেন? কৃষ্ণপ্রেমের কাছে দীক্ষা নিয়েছেন, এতো ভালো কথা। কোথায় কিভাবে কোন ভঙ্গীতে বসে, কি মন্ত্র নিয়েছেন, সব যে আমার জানা।"

"আপনার কাছে, দাদা, কিছুই লুকানো যায় না, তা দেখেছি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান্ যোগী আপনি। তা আমাদের মতো চুনোপুঁটিবে নিয়ে টানা-হ্যাচড়া করা কেন?"

"আপনি বুঝি ভাব্‌ছিলেন, লোকে বলবে—বীরেন ব্যানার্জি অনেক দিন বিলেতে ছিলেন, এখানে এসেও সাহেব-গুরু ছাড়া আর কাউকে পছন্দ করলেন না—এই তো? এ জন্যই তো এতে গোপনতা।" কৌতুকের সুরে বলেন শ্রীযুক্ত গুহরায়।

"না না, তা নয়। ভাবছিলুম, আমার মতো লোকের দীক্ষা, এ আর আপনাকে জানাবার মতো কি সংবাদ।"

"না না, এ খুব সুসংবাদ। আমি আপনাকে ভালোবাসি, তাই বিশেষ ক'রে খুশী হয়েছি এই দেখে যে আপনি উপযুক্ত গুরু পেয়েছেন। কৃষ্ণপ্রেম খাঁটি বস্তু।"

বীরেন ব্যানার্জি মহাশয়ের বয়স হইয়াছে, শরীরও তেমন ভালো নয়, গুরুর কাছে সব সময়ে যাওয়া আসা করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব নয়। যোগীশ্বর কালীপদ গুহরায়ের প্রতি তাঁহার প্রচুর শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস, নির্ভরতাও ছিল। গুরুকে তিনি সব সময়ে কাছে পান না, তাই অনন্যোপায় হইয়া একদিন নিজের সাধন সম্পর্কিত একটি সমস্যায় গুহরায় মহাশয়ের পরামর্শ চাহিলেন।

শ্রীযুক্ত গুহরায় বলিলেন, "তা তো হয় না। আপনার গুরু কৃষ্ণপ্রেমের কাছ থেকে তাঁর অনুমতি আনিয়ে নিন, নইলে আপনাকে আমি সাহায্য করি কি ক'রে ?"

কয়েকদিন পরে ব্যানার্জি মহাশয় বলিলেন, "গোপাল-দা'র (কৃষ্ণপ্রেমের) কাছে চিঠি দিয়েছিলাম, তিনি লিখেছেন,—বীরেন, তুমি যোগীবরের কাছ থেকে উপদেশ অবশ্যই নিতে পারো। তোমার কথা রাধারানীর কাছে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, তিনি জানালেন, এতে তোমার কল্যাণই হবে।"

শ্রীযুক্ত গুহরায় একথা শুনিয়া সহাস্যে কহিলেন, "এই দেখুন আপনার গুরু কৃষ্ণপ্রেমের প্রকৃত মহত্ত্ব। আমার কাছ থেকে আপনি নির্দেশ নিলে গুরু হিসেবে তাঁর আপত্তির কারণ নেই। আচ্ছা, সারা ভারতবর্ষে ক'জন গুরু এমন কথা, এমন মন খুলে বলতে পারেন ?"

বীরেন ব্যানার্জি মহাশয়ের সম্পর্কিত এই ঘটনাটি হইতে বুঝা যায়, প্রেমসাধনার কোন্ উত্তুঙ্গ স্তরে কৃষ্ণপ্রেম বিরাজিত ছিলেন, আর ভারতের উচ্চকোটির মহাত্মাদের সহিত তাঁহার যোগাযোগ ছিল কত ঘনিষ্ঠ।

সে-বার কিছুদিনের জন্য কৃষ্ণপ্রেম কলিকাতায় আসিয়াছেন। যোগীশ্বর কালীপদ গুহরায় এবং কৃষ্ণপ্রেম উভয়েরই উভয়কে দেখার প্রবল ইচ্ছা। হিমাদ্রি পত্রিকার অফিসে সাক্ষাতের ব্যবস্থা হইল, আমরা পূর্বাহ্ণেই জানাইয়া দিলাম, কৃষ্ণপ্রেমের ভজন কীর্তন আমরা শুনিব। কয়েকটি ভক্ত শিষ্য নিয়া, সন্ধ্যার পর 'জয় রাধে' বলিয়া

কৃষ্ণপ্রেম সেখানে উপস্থিত হইলেন। এই দুই মহাত্মার মিলনে আনন্দের জোয়ার বহিয়া গেল।

কীর্তন শুরু হইয়াছে। ভাবাকুল নেত্রে কৃষ্ণপ্রেম গাহিতেছেন, আর তরুণ ভক্ত মাধবাশীষ বাজাইতেছেন মৃদঙ্গ। সারা দেহ-মন-প্রাণ দিয়া যে কীর্তন গাওয়া হয়, ভক্তের অন্তস্থল হইতে উৎসারিত হইয়া যে কীর্তন সরাসরি পৌঁছে গিয়া ইষ্টদেবের চরণ-কমলে, এ সেই প্রাণময় চৈতন্যময় কীর্তন। মরমী শ্রোতারা উপলব্ধি করিলেন, এই ভজন কীর্তন কৃষ্ণপ্রেমের ঠাকুর-সেবা ও ঠাকুর-পূজার এক প্রধান অন্যতম উপচার।

নয়ন মুদিয়া, গদ্‌গদ কণ্ঠে, করতাল জোড়া বাজাইয়া কৃষ্ণপ্রেম গাহিয়া চলিয়াছেন :

সুন্দরী রাধে আওয়ে ধনি।
ব্রজ রমণীগণ মুকুটমণি।

সারা হলঘরটি সুধী ভক্ত শ্রোতাদের সমাগমে ভরিয়া উঠিয়াছে। কোথাও তিলধারণের স্থান নাই, কাহারো মুখে একটি শব্দ নাই। ভাবতন্ময়, দীর্ঘবপু, শালপ্রাংশু মহাভুজ এই ইংরেজ বৈষ্ণবের দিকে নির্নিমেষে অবাক্ বিস্ময়ে শ্রোতারা সবাই চাহিয়া আছেন, আর ভাবিতেছেন রাধারানী এবং কৃষ্ণের কৃপা কি অঝোর ধারেই না ঝরিয়াছে এই মহাবৈষ্ণবের আধারে। এ গান শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ধরিলেন রাধা-প্রেমের ভিখারী কৃষ্ণের আর এক মর্মস্পর্শী গান :

কিশোরীর দাস আমি পীতবাস
ইহাতে সন্দেহ যার।
কোটিযুগ যদি আমারে ভজয়ে
বৃথাই সাধনা তার।

প্রায় রাত একটা অবধি ভজন কীর্তন চলিল। শ্রোতারা সবাই মন্ত্রমুগ্ধ, সার্থকনামা সাধকের চৈতন্যময় সংগীত তাঁহাদের পৌঁছাইয়া দিয়াছে রামকৃষ্ণ-প্রেমের দিব্যলোকে।

কীর্তনের শেষে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিলেন কৃষ্ণপ্রেম। একজন শ্রোতা কহিলেন, "রাধারানীর উদ্দেশে নিবেদিত আপনার গানগুলি অনেকেরই চোখে জল এনে দিয়েছে। আজকাল আপনি দেখছি, রাধাপ্রেমেই বেশী বিভাবিত।"

"রাধা কৃষ্ণশক্তি। রাধা আর কৃষ্ণে তফাত কোথায়? কৃপাময়ীর কৃপার বলেই যে কৃষ্ণকে ধরা ছোঁয়া যায়। আজকাল রাধারানীই চালাচ্ছেন আমায়, যা কিছু পাবার পাচ্ছি তাঁর কাছ থেকেই।"

আবার একজন শ্রোতা কৃষ্ণপ্রেমকে অনুরোধ করিলেন "কৃষ্ণ ভজনের পথ কি, সংক্ষেপে আমাদের একটু বলুন?"

তিনি উত্তর দিলেন, "পথ তো একটাই। সেটি হচ্ছে ঠাকুরের রাজপথ, সবারই তা চেনা। সব দিয়ে, সর্বময়কে পেতে হবে? তবে কে কিভাবে সে পথে এগুবে, সেইটাই প্রশ্ন। গীতায় ভগবান্ কৃষ্ণ তা নিজেই তাঁর কথাটি সহজ ক'রে পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছেন—

মন্মনা তব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাম্ নমস্কুরু।
মামেবৈশ্যসি সত্যম তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে।

—মনকে একাগ্র করো আমার দিকে, তোমার ভক্তি দাও আমায়, সব কিছু কর্ম অর্পণ করো আমার সেবা পূজায়, তাহলেই তুমি আসবে আমার কাছে, আমার প্রিয় হবে, এ প্রতিশ্রুতি তোমায় আমি দিচ্ছি।

আরো কয়েকবার দেখা হইয়াছিল কৃষ্ণপ্রেমের সঙ্গে। একদিন ভজন ও তত্ত্বালোচনা শুনিতে অনেকে সেখানে জড়ো হইয়াছেন। প্রসঙ্গক্রমে কৃষ্ণপ্রেমকে বলিলাম, "বেশ আছেন আপনারা হিমালয়ের কোলে মির্তোলায়। সমস্যা-জর্জর আধুনিক সমাজের ছোঁয়া সেখানে পৌঁছে না, কানে আসে না হিংসা ও আর্তির কণ্ঠস্বর। কৃষ্ণ আর রাধারানীকে নিয়ে পরমানন্দে রয়েছেন উত্তর বৃন্দাবনের আশ্রমিকেরা।"

সাধক কৃষ্ণপ্রেমের দৃষ্টি সদাই ছিল স্বচ্ছ, নির্মোহ এবং একাগ্র। ভাবালুতা আর সংশয়ী কূটতার্কিকতা দুইয়েরই ঊর্ধ্বে ছিলেন তিনি,

আর সাধনজাত সূক্ষ্ম অনুভূতির বলে যে কোন প্রশ্নের মর্মমূলে পৌঁছিতে পারিতেন মুহূর্তমধ্যে। উত্তরে কহিলেন, "এই পাগ্‌লাটে পৃথিবী থেকে দূরে আমরা রয়েছি, মানুষের হানাহানি আর হিংস্র কলরব সেখানে নেই, তা ঠিক। সাধনজীবনের পক্ষে সে পরিবেশ অনুকূল তা স্বীকার করতেই হবে। কিন্তু সেইটেই তো বড় কথা নয়। বড় কথা হচ্ছে, মনকে কেন্দ্রভূত করে কৃষ্ণচরণে স্থায়ীভাবে ন্যস্ত করা, মিলিয়ে দেওয়া। একৈকনিষ্ঠা আর একাগ্রতা নিয়ে 'এক'-কে ধরতে হবে, তাছাড়া তো অন্য পথ নেই। মাণ্ডুক্য উপনিষদের উপমাটি সব সাধকেরই মনে রাখা উচিত। 'ওম' হচ্ছে ধনু, আত্মা—শর, আর লক্ষ্য হচ্ছেন ভগবান্, ব্রহ্ম—যাঁর ভেতরে বিদ্ধ করতে হবে ঐ শর, মিশিয়ে দিতে হবে সম্পূর্ণরূপে। শরবৎ তন্ময়ো ভবেৎ—তা নইলে কিছুই হবে না। উত্তর বৃন্দাবন আর বৃন্দাবন বড় কথা নয়, বড় কথা তাঁর চরণে আত্মার আহুতি—পূর্ণাহুতি।"

সমাগত সবাইকে লক্ষ্য ক'রে প্রসন্ন মধুর স্বরে বলিলেন, "কৃষ্ণ আমাদের সবটা নিতে চান, আর দিতে চান নিজের সবটা একেবারে পুরোপুরি। আংশিক দেওয়া নেওয়া তাঁর ধাতে নেই। অখণ্ড পরম বস্তু কিনা, তাই। কৃষ্ণকে পেতে হলে, দুহাত দিয়ে তাঁর চরণ ধরতে হবে, একহাত কৃষ্ণের চরণে আর এক হাত নিজের দিকে—বিষয়ের দিকে, তা হলে কৃষ্ণপ্রাপ্তি কখনো হবে না।"

আবার প্রশ্ন করিয়াছিলাম কৃষ্ণপ্রেমকে, "কোন শাস্ত্র পাঠ ক'রে কৃষ্ণতত্ত্বের প্রকৃত সন্ধান আপনি পেয়েছেন?"

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন, 'শ্রীমদ্‌ভাগবত'। এই মহান্ গ্রন্থ প্রথমে পড়েছি গুরুমায়ের কাছে, শেষেও পড়েছি তাঁরই কাছে। তাঁর সঙ্গে আমি এই পুরাণের প্রতিটি লাইন বার বার ক'রে পড়েছি, তাঁর শ্রীমুখ থেকে তত্ত্বোজ্জ্বলা ব্যাখ্যা শুনে উপলব্ধি করেছি কৃষ্ণের জীবন ও বাণীর রহস্য। আমি তো মনে করি, উপনিষদের হৃদয় হচ্ছে ভাগবত, আর উপনিষদের জ্ঞান-সায়রে ভাগবত যেন মধুময় শতদলের মতো ফুটে রয়েছে যুগযুগান্তের ভক্তদের কল্যাণে।"

ভারতের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য সম্পর্কে কৃষ্ণপ্রেম যেমন শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন, তেমনি তিনি বিশ্বাস করিতেন, এ যুগেও ভারতের মানুষ আধ্যাত্মিক সত্যের মূল্য বেশী দেয়।

শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায়কে একদিন তাই তিনি বলিয়াছিলেন, "গোড়ার দিকে ভারতের অন্তর্জীবন সম্বন্ধে সংশয় ও সন্দেহ কিছুটা ছিল। কিন্তু দীক্ষা নেবার পর সে সব দূরীভূত হল দৃষ্টি আমার স্বচ্ছ হয়ে এল। দেখলাম, ভারতই বিশ্বের একমাত্র দেশ যেখানে দীর্ঘকাল যাবৎ বজায় রয়েছে সিদ্ধ সাধকদের রাজত্ব, কখনো সে রাজত্বে ছেদ পড়ে নি, আর এ দেশের কোটি কোটি মানুষ তাকে শ্রদ্ধা ও সম্মান দিয়ে আসছে। প্রায় এক শতক আগে মানসিকতার কিছুটা পরিবর্তন ঘটেছে। যদিও অধিকাংশ ভারতবাসী আজ অবধি প্রাচীন যুগের ধ্যান ধারণা ও আধ্যাত্মিক আদর্শের প্রতি অনুরক্ত, কিন্তু একদল আধুনিক শিক্ষিত লোক হঠকারী মনোবৃত্তি নিয়ে, পাশ্চাত্যের লোকদের অনুসরণ ক'রে বলতে শুরু করেছে—হিন্দুধর্ম মধ্যযুগীয়, হিন্দুর দেবদেবীর পূজা আসলে গাছ পাথরের পূজা, হিন্দু সাধুরা সমাজের পরগাছা, আর হিন্দুর অবতারগণ শূন্যগর্ভ ধর্মনেতা। যারা এসব কথা বলছে, তারা পাশ্চাত্যের চোখ ঝলসানো মেকি বৈষয়িক সাফল্য দেখে মোহাবিষ্ট হয়েছে, তাহাদের আমি অনুকম্পার চোখে দেখি। কিন্তু সুখের কথা, সে সব লোকের সংখ্যা নিতান্ত মুষ্টিমেয়, ভারতের আত্মার স্পন্দন তাঁদের কানে কোনো দিন পৌছায় নি, অথচ একটু স্থির হয়ে কান পেতে শুনলে আজো ভারতের জনজীবনে তার সন্ধান মেলে। তাই দেখতে পাই এক টুকরো গৈরিক-পরা যে কোনো সাধু এদেশের সাধারণ মানুষের কাছে পায় রাজোচিত সম্মান, শুধু পাশ্চাত্যের গোলামিতে অভ্যস্ত যারা, সংখ্যায় যারা খুবই কম, তারাই এঁদের অবজ্ঞা করে। আসল কথা, ভারতের সাধারণ মানুষ আজো সাধু-জীবনের পবিত্রতাকে সম্মান দেয়, ভক্তি ও জ্ঞানকে শ্রদ্ধা জানায়। যদি নিজে সে ভজন

১ যোগী কৃষ্ণপ্রেম : রেমিনিসেন্সেস্ : দিলীপকুমার রায়

সাধন কিছু নাও করে, তবুও ভগবানের প্রতিনিধিরূপে যে সব সিদ্ধপুরুষ হাজার হাজার বছরের পুরাতন আত্মিক ঐশ্বর্য বহন ক'রে চলেছেন তাদের চরণে প্রণত হয়।

"কুম্ভমেলায় কি দেখ? লক্ষ লক্ষ নিরক্ষর দীন দরিদ্র লোক মাঘের প্রচণ্ড শীতে গঙ্গায় অবগাহন করছে, ছিন্নবাস পরিহিত সাধুদের পায়ে প্রণাম ক'রে নিজেদের ধন্য মনে করছে। শুধু কুম্ভমেলা কেন, যে কোনো হিন্দু পূজা পার্বণের পেছনে রয়েছেন ভগবান্ আর তার প্রতীক দেবদেবীর প্রেরণা।"

ভারতবর্ষে থাকিয়া ভারতের বৈরাগ্যময় তপস্যায় ব্রতী হইয়া কৃষ্ণপ্রেমকে মাঝে মাঝে কটুবাক্য শুনিতে হইয়াছে, নিগ্রহও ভোগ করিতে হইয়াছে।

একবার তিনি ট্রেনে চড়িয়া মাদ্রাজের দিকে যাইতেছিলেন। কামরায় এক পাশে বসিয়া একটি অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মহিলা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে তাকাইয়া আছেন। কৃষ্ণপ্রেমের পরনে গৈরিক বহির্বাস, মুণ্ডিত মস্তকে দীর্ঘ শিখা, গলায় তুলসীর মালা, আর হস্তের ঝুলিতে রহিয়াছেন ঠাকুরের বিগ্রহ—এটি তাঁহার নিত্যকার পূজার বিগ্রহ।

কৃষ্ণপ্রেমের কথাবার্তা শুনিয়া মহিলাটি বুঝিলেন ইনি একজন খাঁটি ইংরেজ। একটু বাদেই কৃষ্ণপ্রেমের দিকে রোষভরে তাকাইয়া তিনি গালাগালি শুরু করিলেন, "ধর্মত্যাগী অপদার্থ কোথাকার। তোমার কি লজ্জা নেই একটুও? কোন্ মুখে পবিত্র খ্রীষ্টধর্ম ছেড়ে, নিজের আত্মীয়স্বজন ও দেশ ছেড়ে, এই সব বাজে দলে ঢুকেছো?"

মনে হইল মহিলাটি যেন ক্রোধে ক্ষেপিয়া গিয়াছেন। সঙ্গীয় সহযাত্রীরা চঞ্চল হইয়া এ উহার মুখের দিকে চাহিতেছেন। কৃষ্ণপ্রেম কিন্তু নীরব রহিয়াছেন, আর মিটিমিটি হাসিতেছেন।

মহিলাটি এবার আরো উত্তেজিত স্বরে কহিলেন, "আমি জিজ্ঞেস করি, কি পেয়েছো তুমি? কি পেয়েছো তোমার নিজের দেশ, ধর্ম, সংস্কৃতি সব কিছু ছেড়ে এসে?"

কৃষ্ণপ্রেম প্রশান্তভাবে ঝুলি হইতে ঠাকুরের শ্রীবিগ্রহটি বাহির করিলেন, তারপর সেটি হাতে নিয়া প্রাণখোলা হাসি হাসিয়া কহিলেন, "ম্যাডাম, পেয়েছি এটিকে—আমার কৃষ্ণকে আমি পেয়েছি এখানে এসে।"

মহিলাটির আর বাক্‌স্ফূর্তি হইল না, ঘাড় বাঁকাইয়া জানালার বাহিরে তাকাইয়া রহিলেন।

নিজের সাধ্য ও সাধনা বিষয়ে কৃষ্ণপ্রেম বলিয়াছেন. "আমার আদর্শ বা তত্ত্বকে চারটি কথায় প্রকাশ করা যায়,—'কিছুই চেয়ো না, দাও সর্বস্ব।' এক সময়ে অধ্যাত্ম জীবনের অনুভূতি ও দর্শনাদির জন্য মন বড় ব্যাকুল হ'তো। তারপর বুঝতে পারলাম, এসব চাইলে কৃষ্ণ বড় কৃপণ হয়ে পড়েন, পিছিয়ে যান। আরো উপলব্ধি করলাম, কৃ কে যখন ভালোবাসা দিচ্ছি, তখন তার মধ্যে দিব্য অনুভূতি লাভ করার লোভ জড়িত থাকবে কেন? কৃষ্ণ তাঁর ইচ্ছে মতো, আর আমার প্রয়োজন বুঝে, সেসব দেবেন। আলো হাওয়ার মতো সহজ ও মুক্ত হবে আমাদের ভালোবাসা।

"কেউ তাঁকে ব'লে নিরাকার, কেউ বলে সহস্রপাদ। আমার কাছে পর্যাপ্ত তাঁর ঐ দুটি চরণ। কী অপূর্ব, কা মধুময় তাঁর চরণ! ঐ চরণ দুটি হারিয়ে গেলে, তার বদলে ব্রহ্মানন্দ বা মুক্তিও আমায় কাম্য নয়। পরম বস্তু বিশ্বসৃষ্টির বস্তুতেই রয়েছেন। কৃষ্ণ আনন্দময় না হলে এই বিশ্ব আনন্দে ওতপ্রোত থাকতো না, একথা যদি সত্য হয়, তবে আমি বলবো, কৃষ্ণ বস্তুময় এবং বাস্তব না হলে এই বিশ্বপ্রপঞ্চে বাস্তব বলে কোনো কিছু থাকতো না, অনুভবেও তা আসতো না। কৃষ্ণের বিগ্রহ কৃষ্ণের জ্যোতি, কৃষ্ণের মাধুর্য সবই আমার কাছে বাস্তব[১]।"

অনেক স্থলে, অনেকের কাছে, কৃষ্ণপ্রেম বার বার বলিয়াছেন, "কৃষ্ণ প্রাপ্তি হলে, কৃষ্ণের দেখা পেলে, মায়া প্রপঞ্চ বলে আর কিছু

১ যোগী কৃষ্ণপ্রেম : দিলীপকুমার রায় (পত্রাবলী

থাকে না, যা কিছু চোখে পড়ে, যা কিছু অনুভবে আসে, অনুভবের বাহিরেও যা কিছু থাকে, সবই হয়ে যায় কৃষ্ণময়। কৃষ্ণের ভেতরেই সব কিছু রয়েছে, কৃষ্ণই বিরাজ করছেন সব কিছুকে নিয়ে। তিনিই ব্রহ্মানন্দ, তিনিই নন্দ-নন্দন, তিনিই গোপীবল্লভ, আবার তিনিই কুরুক্ষেত্রের সারথি—তিনিই একাধারে সব কিছু[১]।"

সাধনা সম্পর্কে কৃষ্ণপ্রেমের ধারণা ছিল অতি স্বচ্ছ ও সুস্পষ্ট। সাধক কবি দিলীপকুমার রায়কে এক পত্রে তিনি লিখিয়াছেন: "ধর্ম অথবা যোগ, যে নামেই আত্মিক সাধনাকে অভিহিত করা হোক না কেন, তার অর্থ কিন্তু শুধু একটিই। শক্তি লাভের জন্য কোনো কোনো সাধক বিশেষ ধরনের জ্ঞান আহরণে প্রয়াসী হয়. কখনো বা শুধু জ্ঞান লাভের জন্যই সচেষ্ট হন। এ কিন্তু যোগ নয়। সাধকের ভাবময়তা অনেক সময় মনোরম স্বর্গীয় সৌন্দর্যময় দৃশ্যের সৃষ্টি করে, এটাও যোগ নয়। কোনো কোনো সাধক তাঁদের ধ্যান ধারণার বলে অতীন্দ্রিয় ধোঁয়াটে ধরনের চিন্তারাশিকে ফুটিয়ে তোলেন, তাও যোগের পর্যায়ে পড়ে না। দুর্গত মানবের সেবাকে যোগ বলে আমি অভিহিত করবো না, যদিও সিদ্ধি সাধকেরা বিশ্বের সর্বজীবকে এমন ভালোবাসার দৃষ্টিতে দেখে থাকেন, বুদ্ধের মতে—যে ভালোবাসা শুধু মায়ের বুক থেকে ঝরে পড়ে তাঁর একমাত্র সন্তানের জন্য। হঠযোগীর আসন মুদ্রা প্রাণামের ফলে ব্যাঙের মতো বিস্ফারিত হওয়া আর ফেটে পড়া, তাকে তো প্রকৃত যোগের পর্যায়ে ফেলা যায়ই না। আসলে যোগের স্বরূপ হচ্ছে, কৃষ্ণে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ—এ সমর্পণে কোনো দাবি নেই, আকাঙ্ক্ষা নেই, কোনো বাসনার লেশমাত্র নেই, আছে কেবল নিজেকে নিঃশেষে বিলিয়ে দেওয়া।

---

১ কৃষ্ণপ্রেমের ব্যাখ্যাত তত্ত্বের পরিচয় মিলে প্রধানত তাঁহার রচিত তিনটি গ্রন্থে। এগুলির নাম সার্চ ফর ট্রুথ, যোগ অব্ ভগবৎ গীতা, যোগ অব্ কঠোপনিষদ্। ইহা ছাড়া 'এরিয়ান পাথ্' সাময়িকীতে বিভিন্ন সময়ে বহু প্রবন্ধাদি তিনি লিখিয়াছেন। মুমুক্ষুদের কাছে লেখা তাঁহার মূল্যবান সংখ্যাও কম নয়।

যেসব কাজ বা চিন্তা এই পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণকে সম্ভব ক'রে তোলে তাই হচ্ছে, সাধনা। আর এই পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণের ফলশ্রুতি হিসেবে যে আত্মিক বস্তু এগিয়ে আসে সাধকের সামনে, তাই হচ্ছে ভাগবতী লীলা।"

কৃষ্ণপ্রেমকে একবার প্রশ্ন করা হইয়াছিল ভগবৎ-কৃপা বলিয়া কোনো বস্তু আছে কিনা এবং সে কৃপার প্রকৃত স্বরূপ কি?

তিনি উত্তর দিলেন, "আমি দ্ব্যর্থহীন সুস্পষ্ট দৃঢ় ভাষায় বলবো, ভগবৎ-কৃপা বিরাজ করছে সারা সৃষ্টি জুড়ে, আর সেই কৃপার মাধ্যমেই মানুষ পৌঁছুতে পারে কৃষ্ণের চরণে। মহাভারতের উদ্যোগ-পর্বে কৃষ্ণ পুরুষকার আর দৈবের মানুষের ইচ্ছাশক্তি আর ঐশ্বরীয় বিধানের কথা বলেছেন, পুরুষকার যেন ক্ষেত্রকর্ষণ, আর দৈব—আকাশের বৃষ্টি-ধারা। এ তুলনাটি পড়বার সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে হল, তাহলে তপস্যা হচ্ছে—বীজবপন, যে বীজ সাধক তার অভীপ্সা অনুযায়ী বপন করে থাকে। আর সেই বীজের ওপর যে বৃষ্টিধারা ঝরে পড়ে তা আসে ভগবানের কাছ থেকে।"

এই ভগবৎ কৃপাপ্রসঙ্গে বিশদভাবে আরো তিনি কহিলেন, "এই ধূলিধূসর কোলাহলময় পৃথিবীতে যখনই কেউ আত্মাহুতি দেয়, নিজেকে উজাড় ক'রে ঢেলে দেয় ভগবৎ প্রেমের আগুনে, তখনই ঘটে একটা অলৌকিক বিস্ফোরণ। তাই হচ্ছে ভগবৎ কৃপার প্রকৃত স্বরূপ।

হরিদাস (ডাঃ আলেকজাণ্ডার) ছিলেন একবার অন্যতম শ্রোতা। রসিকতার সুরে তিনি কহিলেন, "উপমাটি চমৎকার সন্দেহ নেই। কিন্তু একজন শুধু শুধু ঐ আগুনের ভেতর নিজেকে নিঃশেষ ক'রে দেবে কেন? আমরা সবাই ঐ আগুনে ভস্ম হতে যাবো কেন?"

স্মিতহাস্যে কৃষ্ণপ্রেম বলিলেন, "এ মন্তব্যের উত্তর আমি অবশ্যই দিতে পারি। সূর্যের ভেতর যখনই যে কোনো জ্যোতিষ্ক প্রবেশ ক'রে বিলীন হয়ে যায়, তখনই তা বিশ্বজগতে সৃষ্টি করে এক নূতন প্রাণদায়িনী শক্তি ও উত্তাপ। প্রকৃতপক্ষে, কোনো আত্মাহুতিই তো এই পৃথিবীতে ব্যর্থ হয়ে যায় না।"

লোকচক্ষুর অন্তরালে, হিমালয় অঞ্চলের নিভৃত অঞ্চলে, প্রেম-ভক্তির সাধনায় দীর্ঘকাল নিরত ছিলেন কৃষ্ণপ্রেম। অতিমাত্রায় প্রচারবিমুখ ছিলেন এই বৈরাগী মহাপুরুষ, সহসা কাহাকেও শিষ্য করার সম্মতি তিনি দিতেন না। শহর বন্দর ও জনসংঘট্ট সতর্কভাবে এড়াইয়া চলা ছিল তাঁহার চিরন্তন অভ্যাস। কিন্তু ফুল ফুটিলে ভ্রমর আসিয়া জুটিবেই। তেমনি সাধক কৃষ্ণপ্রেমের সিদ্ধিময় জীবনের সৌগন্ধ আকর্ষণ করিয়া আনিয়াছিল শত শত ভক্ত ও মুমুক্ষুকে। ইউরোপ ও আমেরিকার বহু জিজ্ঞাসু শরণ নিয়াছিলেন তাঁহার কাছে। যুদ্ধোত্তর সমাজের হিংসা দ্বেষ ও অশান্তিতে উত্ত্যক্ত হইয়া অনেকে আসিতেন, অনেকে আসিতেন জড়বাদী আধুনিক সভ্যতার বন্ধ্যা জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া। ভাবুক ও স্বপ্নবিলাসী একদল বিদেশী আসিতেন রহস্যময় হিমালয়ের আশ্রমে সাধনভজন করার জন্য। ইহাদের অনেকেই হয়তো শেষ অবধি স্থায়ীভাবে এদেশে থাকতে পারেন নাই কিন্তু কৃষ্ণপ্রেমের সান্নিধ্য ও উপদেশ তাঁহাদের জীবনে প্রেরণা যোগাইয়াছে, সাধনজীবনের দুয়ার খুলিয়া দিয়াছে।

সব চাইতে বিস্ময়কর, কৃষ্ণপ্রেমের প্রতি ভারতীয় ভক্ত ও মুমুক্ষুদের আকর্ষণ। সংখ্যায় ইহারা বিদেশী ভক্তদের চাইতে বেশী। সত্যকার বিশ্বাস ও নিষ্ঠা নিয়া ইহাদের অনেকেই কৃষ্ণপ্রেমকে আঁকড়িয়া ধরিয়াছিলেন, অগ্রসর হইয়াছিলেন প্রেম ভক্তিময় সাধন-পথে। এ প্রসঙ্গে লক্ষণীয়, ভারতের বহু আশ্রমেই ভারতীয় সাধকদের কাছে বিদেশী ভক্তদের ভিড় করিতে দেখা যায়, কিন্তু কোনো বিদেশী গুরুর কাছে ভারতীয় ভক্ত ও মুমুক্ষুরা শরণ নিতেছে, এমন দৃশ্য সহসা দৃষ্টিগোচর হয় না। কৃষ্ণপ্রেমের বেলায় এই ব্যতিক্রমটি দেখা গিয়াছে। শিক্ষিত অশিক্ষিত ধনী নির্ধন, ব্রাহ্মণ শূদ্র, সর্বশ্রেণীর ভারতীয় ভক্তকে নির্বিচারে আশ্রয় দিয়াছেন কৃষ্ণপ্রেম, গড়িয়া তুলিয়াছেন তাঁহাদের অধ্যাত্মজীবন।

সাধনা ও সিদ্ধিময় জীবন এবার ধীরে ধীরে তাহার শেষ পর্যায়ে

। কৃষ্ণপ্রেম এবার প্রস্তুত হইয়া বসিয়া আছেন চির-
প্রতীক্ষায়।

দনের পুরানো হুক্-ওয়ার্ম রোগ আবার সেদিন আত্মপ্রকাশ
শরীর হইতেছে জীর্ণ ও বিধ্বস্ত। চিকিৎসার কথা উঠিলেই
হাস্যে কৃষ্ণপ্রেম বলেন, "চিরদিন ঠাকুরই তো আমার ডাক্তার। আর
কার কাছে যাবো, বলতো?"

অন্তরঙ্গ শিষ্য মাধবাশীষ ও অন্যান্য ভক্তেরা পীড়াপীড়ি করিয়া
নাইনিতালের বড় ডাক্তারের কাছে তাঁহাকে নিয়া গেলেন, কিন্তু তেমন
কছু উন্নতি দেখা গেল না।

ভক্তেরা অনুনয় করিয়া কহিলেন, "গোপালদা, ঠাকুর ও রাধারানীর
কাছে কত কথাই তো আপনি নিবেদন করেন, কখনো তাঁরা তা
প্রত্যাখ্যান করেন না। এবার বলুন, আপনি যাতে ভালো হয়ে ওঠেন।"

স্মিতহাস্যে উত্তর দেন, "আয়ু বাড়ানোর কথা বলছো? একবার
তা ঠাকুর বাড়িয়ে দিয়েছেন, সেই বাড়ানো মেয়াদই এখন চলছে।"

এ সময় দেহ সম্পর্কে একেবারে নির্বিকার হইয়া উঠিয়াছেন
কৃষ্ণপ্রেম। কথাবার্তায় সদাই দেখা যায় আত্মস্থ ও নৈর্ব্যক্তিক ভাব।
ভক্ত শিষ্যেরা আপ্রাণ চেষ্টায় সেবা পরিচর্যা করিয়া চলিয়াছেন।
সকলেরই চোখে মুখে প্রবল উৎকণ্ঠার ছাপ। তাঁহাদের প্রশ্নের উত্তরে
কৃষ্ণপ্রেম বলেন, "জানতো, ঠাকুরের হাতে দুটো ডোর রয়েছে, একটা
উপরের দিকে টানেন, আর একটা নিচের দিকে। এবার নিচেরটা
টানবার পালা।"